আচার্য্য কেশবচন্দ্র

তৃতীয় খণ্ড

উপাধ্যায়

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

তৃতীয় খণ্ড

উপাধ্যায়

কেশব-শতবার্ষিকী—এলাহাবাদ সিরীজ্।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

দরস্থ বারো বিপুলস্থ পুংসাং
সংসারজন্তোস্ত নিদেশমত্র।
আলভ্য তৎস্বৈরতিচিত্রমেত-
চ্চরিত্রমার্য্যস্থ নিবদ্ধমঙ্গ ॥

"Rest assured, my friends, when we are dead and gone, all the events that are transpiring around us in these days shall be written and embodied in history, and shall be unto future generations a new Gospel of God's saving grace."—*Lect. Ind.*

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত

শতবার্ষিকী সংস্করণ

তৃতীয় খণ্ড

(১৪৩৭—২৩০২ পৃঃ)

কলিকাতা
১৯৩৮ খৃঃ, ১৮৬০ শক

৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" হইতে
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

অন্ত্যবিবরণ

১

চরমভাবের পূর্ব্বাভাস

সাধুভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ

কেশবচন্দ্রের মধ্য জীবনে অন্তিম জীবনের সমুদায় উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। এখন সেই সকলের নব নব বিকাশ হইবার সময় উপস্থিত। ব্রহ্মোপাসনার ভূমি তিনি সুদৃঢ় করিয়াছেন; ভগবদারাধনা রসস্বরূপের সাক্ষাৎ দর্শনে পর্য্যবসন্ন হইয়াছে। তিনি এখন ভক্তির সাগরে সন্তরণ দিতেছেন; ব্রহ্ম এখন তাঁহার জীবনে আবির্ভূত। ভক্তবৎসল কি কখনও একাকী ভক্ত-হৃদয়ে আবাস নির্ম্মাণ করেন? তিনি আসিলেই তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে আসিবেনই আসিবেন। কেশবচন্দ্র অনেক দিন পূর্ব্বে (১৭৯৮ শক, ১৫ই ফাল্গুন; ১৮৭৭ খৃঃ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী; "যেখানে ঈশ্বর, সেখানে ভক্ত" উপদেশে) বলিয়াছেন, "যেখানে ঈশ্বর, সেখানে তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ বসিয়া আছেন। যেখানে ঈশ্বর, সেখানে ভক্তবৃন্দ; যেখানে ভক্তবৃন্দ, সেখানে ঈশ্বর। স্বর্গ কখনও খালি হইয়া আছে, ইহা ভাবিতে পার না। অতএব ইহা সত্য কথা যে, ঈশ্বরকে ডাকিলে, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ভক্ত সাধকগণও আসেন।" এখন (১৮০১ শক, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ; ১৮৭৯ খৃঃ, ১লা জুন; "পরলোকবাসী সাধু" উপদেশে) তিনি বলিতেছেন, (১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) "ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি বলিয়া কেবল ব্রহ্মকে লইয়া নির্জ্জনে থাকিব, সাধুসঙ্গে প্রয়োজন নাই, এরূপ কখনও বলিতে পারি না। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাঁহার সাধুকে

ভালবাসিতেই হইবে। ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে দেখিব, এই স্পৃহায় ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্পৃহা ঈশ্বরকে আনয়ন করে, সেই স্পৃহাই আবার সাধুকে আনয়ন করে। ভক্তি ভক্তবৎসলকে আনয়ন করে, ভক্তি সাধুসজ্জনকে দেখাইয়া দেয়। এক ইচ্ছায় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হই। যে ভক্তবৎসলের রূপ দেখে, সে ভক্তের রূপ দেখে। এই দুই বিধি, দুই মন্ত্র এক। সাধু ছাড়া ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর ছাড়া সাধু নহেন।"

পরলোকবাসী সাধুগণ আমাদের দর্শনের বস্তু হইতে পারেন কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার মীমাংসাস্থলে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন ঃ—"যখন নয়ন হইতে প্রেমধারা বহে, তাহার ভিতরে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হয়েন, ব্রহ্মের সত্তা প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার আমার ইচ্ছাধীন একথা নহে। আমাদের ইচ্ছা চরিতার্থ হইবে, আশা করিতে পারি না। এসব ভক্তির নিয়মে নিয়মিত হইবে। আজ সাধুর নাম উচ্চারণ করিতেছ না, এমন সময় আসিতেছে, এমন সময় আসিবে, যে সময় সমস্ত সাধুকে নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহাদের সকলের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। ইহলোকেই জীবন শেষ হইল, তাহা নহে। কত সাধু আছেন, যাঁহাদিগকে দেখি নাই, নাম শুনি নাই, পরলোকে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইবে। ক্ষুদ্র বুদ্ধির কথা পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তির কথা শ্রবণ কর। ভক্তিপূর্ণ চক্ষু উজ্জ্বল হইবে, নদী পর্ব্বত সংসার যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে কেবল ভক্তির নয়ন খুলিবে, আর দেখিতে পাইবে, অমুক সাধু আসিয়াছেন। আর একটি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাত্মা আসিলেন, ভক্তি-সাগরে টানিয়া লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যদি ভক্তিনয়ন থাকে, এখনই দেখিতে পাইবে, সুখ অনুভব করিবে, অনেক দিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। এ সব সত্য কথা, ভক্তি হইলে চেষ্টা না করিয়াও দেখিতে পাইবে। যত সাধু উদিত হইয়াছেন, ধর্ম্মজগৎ আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিবে, বিচিত্র নহে। যদি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, হৃদয় আপনি বলিয়া দিবে। সাধু সজ্জন যাঁহারা পরলোকে আছেন, যাঁহাদের নাম শুনিয়াছ, যাঁহাদিগের কথা পুস্তকে পাঠ করিয়াছ, অথবা বন্ধুমুখে শুনিয়াছ, সেই নাম, সেই চরিত্র, সেই কথা একত্র করিয়া তুমি ভাব, তাঁহাদিগের মত ও তত্ত্ব চিন্তা কর, সেই মত ও তত্ত্বের ভিতর হইতে এক আশ্চর্য্য জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ বাহির হইবেন.

ভক্তিচক্ষুর নিকট প্রকাশিত হইবেন।" এই সাধুগণকে মনের কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে, ঈশ্বরপর্য্যন্ত উড়িয়া যান, কেশবচন্দ্র একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। "ভক্তের পর ভক্ত, সাধুর পর সাধু একটি একটি করিয়া কি বিদায় করিয়া দিতে পার? মনের যদি সে ক্ষমতা থাকে, এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া চেষ্টা কর। শরীর হইতে কিছু কিছু রক্ত বাহির করিয়া জীবিত থাকিবে, ইহা যেমন অসম্ভব, মহাত্মা পবিত্রাত্মাগণকে বিদায় দিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা তেমনই অসম্ভব।"

সাধুগণ কখন সর্ব্বব্যাপী নন, অথচ ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থল ভগবচ্চরণতলে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র তাহাই বলিতে-ছেন:—"ভক্ত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, ইহা না মানিয়াও, ইহা মানিবে যে, চক্ষুর দ্বারা ভক্ত-দর্শন হয়। ইহা অনুমান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহলোক পরলোক এ দুইয়ের মধ্যে এমন এক স্থান আছে, যেখানে বসিলে, চক্ষে দেখা যায় না, অতএব অনুমান, ইহা বলিয়া তাড়ান যায় না। তুমি বলিলে, ভক্ততো দেখা যায় না, কোথাও তিনি নাই। তবে কি ও ছবি? কল্পনা? এক একটি শুদ্ধ মত, এক একটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, যাহা তাঁহার সম্বন্ধে লেখা আছে, তাহাতে মনের সন্দেহ উপস্থিত হয়। অমুকসম্বন্ধে অলৌকিক ক্রিয়া লিখিত হইয়াছে, অমুককে ঈশ্বরবৎ লোকে পূজা করিয়াছে, অমুকের চরিত্রে অসীম পুণ্য আরোপ করা হইয়াছে, নানা অদ্ভুত ভাব অর্পণ করা হইয়াছে, সমাদর করা হইয়াছে, ভক্তি করা হইয়াছে, পক্ষান্তরে আবার সেই সকল সাধুকে ঘৃণা করা হইয়াছে, প্রতারক বলিয়া পৃথিবী হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এস্থলে সরলহৃদয় ভক্ত সময়ে সময়ে বলেন, এমন ভয়ানক তুফানের মধ্যে তরী রক্ষা কঠিন; ভক্তিতরী জলে মগ্ন হইবেই হইবে। এ পথে না চলিয়া কতক-গুলি স্থির সিদ্ধান্ত লইয়া জীবন গঠন করা উচিত। বলিলে বটে, কিন্তু পারিবে না। তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রহ্ম ব্রহ্মসন্তানকে আনিবেন; তিনি তোমার মতে সায় দিবেন না। যে ভক্তির শাস্ত্র তিনি পড়াইবেন, তাহাতে তাঁহার পদতলে তাঁহার সন্তানগণকে দেখিবে। যদি তাহাই হইল, তবে এখন হইতেই দেখা কর্ত্তব্য। সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া সাধুর সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ সংস্থাপন করা উচিত।"

সাধুদর্শন কেবল মতে থাকিলে চলিবে না, উহা জীবন্ত হওয়া চাই, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। "সাধুসম্বন্ধে যাহা শুনিব, যাহা দেখিব, তাহা জীবন্ত। যদি বল, জীবন্ত না হইয়া সাধু সম্বন্ধে মত থাকিতে পারে, তাহা হইলে মরণ। যদি সাধুসম্বন্ধে মতামত হয়, তবে ঈশ্বরসম্বন্ধে মতও মতমাত্র হইতে পারে। সাধুসম্বন্ধে মত সত্য, উহাতে জীবন আছে, কেবল মত নহে। সাধুগণকে পুরুষ বলিয়া ধারণ করিব। সত্যকে মত বলিয়া উপেক্ষা করিও না। ব্রহ্মকে মত বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সাধুকেও মত বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ঈশ্বরকে দেখা চাই। ঈশ্বরের পূর্ণমঙ্গল মতে থাকিলে চলিবে না। সেই মত পুরুষ হইয়া মঙ্গলমূর্ত্তি প্রকাশ পায়। যাই বলিলে, সেই সাধু জগতের জন্য প্রাণ দিলেন, অমনি তৎসম্বন্ধের সে কথা মূর্ত্তিমতী হইল, শব্দ পুরুষ হইল। সাধু জীবন্ত হইয়া যদি মনকে অধিকার না করিলেন, তবে আলোচনাই সার হইবে। যাই শব্দ উচ্চারণ করিলে, অমনি ঈশা-চৈতন্য-শব্দ জীবন্ত হইল। জীবন্ত পুরুষ আমাদিগকে জয় করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, আমাদের মনে সুখসঞ্চার করিয়াছেন। প্রাণ, বিলম্ব করিও না, সাধুকে অভ্যর্থনা কর, তাঁহার পদধূলিতে সমস্ত কণ্ঠ ভূষিত কর। ধন্য জগতের স্রষ্টা, তিনি সাধুগণকে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে তৃপ্ত করিলেন। ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু আমাদিগের বন্ধু, আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু, মনোহর পদার্থ, সাধুকে হৃদয়ে স্থান দিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

সাধুগণসম্বন্ধে বিচার বিতর্ক উপস্থিত করিলে, তাঁহারা দূরস্থ হইয়া পড়েন। সরল শিশুর ন্যায় তাঁহাদিগের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলে, তাঁহারা প্রত্যক্ষ হন। "ভক্তির শাস্ত্রে অতি আশ্চর্য্য সঙ্কেত দেখিতে পাওয়া যায়। অল্পক্ষণমধ্যে কি সুন্দর মনোহর ব্যাপার উপস্থিত হয়। ঐ একটি ছাত্র কত পুস্তক পড়িল, কত সাধুজীবন পাঠ করিল, কিন্তু তাহার হৃদয় সন্দেহবাণে বিদ্ধ। অমুক বৎসরে অমুক ঘটনা হইয়াছিল, না, সে বৎসর নয়; অমুক মাসে, বোধ হয়, সে মাসে নয়; এইরূপ করিয়া কিছুই নিশ্চয় হয় না। দশ বৎসর অধ্যয়ন করিল, অথচ সংশয় ঘুচিল না। অমুক সাধু কি অমুক প্রকার ছিলেন? বিদ্বানের চক্ষে সাধু প্রকাশিত হইলেন না, কিন্তু সরলের নিকট প্রকাশিত হইলেন। ইহা ঈশ্বরের নিজের কথা যে, পণ্ডিত দেখিতে পায় না, কিন্তু

শিশুসন্তান দেখিতে পায়। এই পবিত্র বেদী হইতে বলিতেছি, সাধুকে তর্ক বিতর্ক করিয়া জানা যায় না, ইহাতে কেবল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। বালকস্বভাব ভক্তের নিকট ঈশ্বর স্থলভ, ভক্তবৎসল আশুতোষ। তবে তাঁহার ভক্ত সাধুগণ দুর্ল্লভ হইবেন কেন? ঈশ্বর স্থলভ, সাধুও স্থলভ। ভক্তিশাস্ত্রে নির্ভর করিলে সহজে সাধু দেখা যায়। যদি সহজে সাধুকে না দেখিলে, তবে আর তাঁহার দেখা পাইবে না। অনেক তপস্যা করিলে, অনেক পুস্তকের সামঞ্জস্য করিলে, ভক্তচরিত্র নিরূপিত হইবে, এ আশা দুরাশা! পলকে ভক্তের পরিচয়। পলকে পরিচয় হইল তো হইল, নয় আর হইল না। ভক্ত সূর্য্যলোকে? না, চন্দ্রলোকে? কোথায় জানি না। ভক্ত সর্ব্বব্যাপী নহেন, তিনি কোথায় থাকেন, জানি না। ঈশ্বর যাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহা জানিবার প্রয়োজন কি? হয় তো কোন সাধকের নামও জানি না, ধামও জানি না, তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ জানি না, তাঁহার জাতির পরিচয় নাই, তথাপি তিনি আমার বন্ধু। যদি বন্ধু হন, তবে এতটুকু জানি, যাহাতে উদ্ধার পাইতে পারি।"

ভক্ত সর্ব্বব্যাপী নহেন যে, তিনি সর্ব্বত্র থাকিবেন, অথচ ভক্তিতে যেখানে সেখানে তাঁহার সাক্ষাৎকার সম্ভব। এ সাক্ষাৎকার আধ্যাত্মিক। "বিদ্বান্ নই, আমি কাঙ্গাল। কাঙ্গাল হইয়াও যখন ভক্তিরত্ন পাইয়াছি, তখন চেষ্টা করিব। ভক্ত এক সময়ে এই পৃথিবীতে ছিলেন; কেহ বলিবে, তিনি এই স্থান দিয়া গিয়াছেন, এখানে আজও আছেন, তাঁহার আত্মা এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই ভাব আকাশময় রহিয়াছে। পৃথিবীর ধূলিতে তাঁহার পদধূলি আছে, সেই ধূলিতো স্পর্শ করিতেছি; পৃথিবীর কোন স্থান দিয়া এক দিন তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এদেশের কি ওদেশের, তিনি ব্রাহ্মণ কি ম্লেচ্ছ, ইহা জানিবার প্রয়োজন নাই; এই যথেষ্ট যে, তিনি মেদিনীর কোন স্থানে এক সময়ে ছিলেন। সেই পৃথিবীর একমুটো ধূলিও বিশুদ্ধ। এই বায়ু এক সময়ে তাঁহার পবিত্র নিশ্বাসে প্রবাহিত হইয়াছে; এই বায়ু কেমন মনে হয়! তাঁহার চরিত্রে সত্যের জয় হইয়াছে, দয়া পরোপকারের গঠন হইয়াছে। ঈশ্বরের নির্ম্মল চরিত্রের স্বরূপ লইয়া ভক্তের ছোট দয়া, ছোট ক্ষমা, ছোট ভালবাসা গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত না হইয়া অধ্যয়ন কর, শুষ্কচিন্তা

করিও না, ভক্তকে বুকে রাখিয়া, প্রাণের ভিতরে রাখিয়া দিন কাটাও। নাম ধরিয়া ডাকিতে চাও, নাম চলিয়া গিয়াছে। যে নামে তিনি বিখ্যাত ছিলেন, আর কি সে নাম আছে, না, সে শরীর আছে? তাঁহাদের চৈতন্য, আনন্দ, জ্ঞান প্রাণরূপে ধরিব। কোথায় আছেন, জানি না; এই জানি যে, জ্যেষ্ঠ ভাই আছেন। আহ্বান করিব না, এই মন্দিরে দেখিব, শরীরমন্দিরে দেখিব, ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া এই বসিয়া আছেন। হৃদয়ের ভিতরে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিব। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আমার সমাদরের পাত্র, তিনি আমার জন্য রক্ত দিয়াছেন। তিনি অমূল্য নিধি, তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ আদর হউক, ভক্তিতে চক্ষের জল পড়ুক। নির্দ্দোষচরিত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতাদিগের নিকট সমস্ত ব্রাহ্মের মস্তক অবনত হউক। দশলক্ষ মহাত্মা সাধুর মধ্যে অন্ততঃ এক জনও পরলোকে আছেন, যাঁহার চরিত্রে আমি জীবিত আছি। তাঁহার পিতা আমার পিতা, আমার রক্তের মধ্যে, শরীরের মধ্যে, জীবনের মধ্যে তিনি বাস করিতেছেন। তাঁহাতে আমাদের সমস্ত জীবন আলোকময় মধুময় হউক।"

যোগানুরক্ত ভক্তপরিবার-স্থাপন

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেশবচন্দ্র 'সুখী পরিবার' প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচারক-সভায় বলিয়াছিলেন, "বাহিরের আশ্রম আর আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে না, এই 'সুখী পরিবার' সেই পবিবারের আদর্শ হইল, যে পরিবার-স্থাপনের জন্য বাহিরে ভারতাশ্রমসংস্থাপন।" এই পরিবারস্থাপনের জন্য তিনি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরে বক্তব্য। তিনি তজ্জন্য মণ্ডলীকে উপযুক্ত করিয়া লইবার জন্য, এ সময়ে (২৯শে বৈশাখ, ১৮০১ শক; ১১ই মে, ১৮৭৯ খৃঃ) যে উপদেশ ("সপরিবারে ব্রহ্মসাধন",—১লা আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইলঃ—"সপরিবারে ধর্ম্মসাধন হিন্দুস্থানের সর্ব্বোচ্চ ভাব। ঈশ্বরের বিধি নহে, সংসার ত্যাগ করিয়া, পরিবার বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। ধর্ম্মসাধনে ইহা আবশ্যকও নহে। ইহা কঠিন ব্যাপার, কেন না সংসারে থাকিয়া কেহ কোন মতে ধ্যান করিতে পারে না; কিন্তু মানুষ যদি সংসারে নিমগ্ন হয়, সংসার ছাড়িয়াও ধর্ম্মসাধন করিতে পারে না। জঙ্গলে অরণ্যে বাস করিয়াও সংসার স্মরণ হয়, সেখানেও স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করা হয়। ফল মূল আহার করিয়া কি হইবে? প্রাচীন

আর্য্যস্থানে আশ্রমের সুন্দর ছবির উপন্যাস আছে। ইহা যেন সুমিষ্ট পদ্য-রচনা, অতি সুন্দর ভাষা, শুনিতে আরম্ভ করিলে আর শেষ হয় না। সে দেশ, সেখানকার বায়ু সকলই মনোহর। সেখানকার কথা শুনিলে হৃদয় সুখী হয়, সে বায়ু স্পর্শ করিলে অঙ্গ সুশীতল হয়। সুন্দর নদীর স্রোত চলিয়া যাইতেছে, সেই নদীকূলে মনোরম আশ্রম। সে সুন্দর ছবি দেখিতে ভাল, সে গল্প শুনিতে ভাল। তেমন দ্রব্যটি পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। এটি সুন্দর ছবি নহে. আশ্রম সম্ভব, আশ্রম ঘটিয়াছে। বনের ফল খাইয়া, কুটিরে বাস করিয়া, রিপুগণকে বশীভূত করিয়া, ঋষিগণ পরিবারদ্বারা পরিবেষ্টিত, মন শুদ্ধ, হৃদয় পবিত্র, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। সকলে সেই পথাবলম্বী হও। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যাহাতে বৈরাগ্যতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব শিখা যায়, সেই দিকে চল। প্রাচীন আর্য্যসমাজে চল, সেখানে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া যোগপথে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিবার বিধান। সে পথে চলিলে তোমার স্ত্রী তোমার অনুগামিনী হইবেন। ব্রাহ্ম, তোমায় এই দৃশ্য প্রদর্শন করিতে হইবে। যে দেশে জনকঋষি জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশে তোমার জন্ম হইয়াছে; যে স্থান ঋষিগণের আশ্রমে পূর্ণ, সেই হিন্দুস্থান, সেই ব্রহ্মের ক্রোড় তোমার জন্মভূমি। এমন উপায় কর, যাহাতে সপরিবারে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পার।"

সেকালের আশ্রমধর্ম্ম কেশবচন্দ্র কি মধুর ভাবেই না বর্ণন করিয়াছেন এবং তাহার পুনরুদ্দীপনবিষয়ে কি আশা ও মহোৎসাহই না প্রকাশ করিয়াছেন। "সংসারের ভিতরে নানা প্রলোভন, সেখানে যোগধ্যান ভাল চলে না; সুতরাং ঋষি অরণ্যবাসী হইলেন, পর্ব্বত নদী গিরি গুহা সুরম্য বন উপবন আশ্রয় করিলেন, কিন্তু সেখানেও ঋষিকন্যা ঋষিপুত্রগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ঋষিপুত্র ঋষিকন্যাগণকে আশ্রমে স্থান দিতেন, আদর করিতেন, তাঁহারা তাহাদিগের মুখ দর্শন করিয়া উচ্চ ধর্ম্ম সাধন করিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। একথা পুস্তকে লিখিত আছে, অনুষ্ঠানে জীবনক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সেই সময়ের আশ্রম স্মরণে পড়িলে কাহার না আহ্লাদ হয়? আশ্রমে দূষিত বিষ প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে শোকমোহের বার্ত্তা নাই, সেখানে দুষ্ট লোক বসতি

করে না, সেখানে পাপ প্রলোভনের প্রবেশাধিকার নাই, তাহা সুরম্য পর্ব্বতে, নদীতীরে বনে অবস্থিত। ঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে থাকিয়া উচ্চতম ধর্ম্ম সাধন করেন। পরিবারগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মের অংশী হইতেছেন, পুত্রগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী হইতেছেন। আমরা ইহা ভাবিয়া কি উৎসাহিত হইব না? যখন এক সময়ে এরূপ হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমানে তাহার পুনরুদ্দীপন হওয়া অসম্ভব নহে। যদি একবার উচ্চসোপানে তাঁহারা আরোহণ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি হইয়া আমরা সেই উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিব না কেন? অন্ধকার জঘন্য কপট আচার ব্যবহার সভ্যতা যাহা দেখিতেছি, ইহা আর্য্যস্থানের বলিব না। আর্য্যস্থানের গৌরব, আর্য্যস্থানের সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে। কাল-নদীর উপর দিয়া তাঁহাদিগের নৌকা চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও দশ বিশ শতাব্দী অতি-বাহিত হইবে, তবে আমরা, যেখানে তাঁহারা উপনীত হইয়াছিলেন, সেখানে উপনীত হইতে সক্ষম হইব।"

ব্রাহ্মগণ যাহাতে এই পথ আশ্রয় করেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপে প্রোৎসাহিত করিতেছেন:—"ব্রহ্মকন্যার স্বর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকন্যা দুজনেরই জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত আছে। এক জন আর এক জনকে ভাসাইয়া দিয়া জঙ্গলে প্রস্থান করিবে, ইহা ব্রহ্মের রাজ্যে হইতে পারে না। তোমার স্ত্রীপুত্রকন্যাকে ডাক, যেখানে যিনি তোমার প্রিয় আছেন, ডাকিয়া আন, সকলে ঈশ্বরের চরণতলে মিলিত হও। তোমরা এখানে যে সংসার করিতেছ, ইহা প্রকৃত সংসার নহে। যখন ধর্ম্মের সংসার হইবে, তখন স্বর্গের ব্যাপার হইবে। হে ব্রাহ্ম, তুমি তোমার স্ত্রীকে ডাকিয়া তোমার ধর্ম্মে দীক্ষিত কর, উভয়ে যোগপথে ভক্তির পথে চল, উভয়ে উভয়ের ধর্ম্ম বর্দ্ধন করিয়া, পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক, সমুদায় পাপের মূল, কলঙ্ক, অপরাধ সমুদায় বিদূরিত করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। কোন ব্রাহ্ম যদি তাঁহার স্ত্রীকে ডাকেন, হৃদয়ের সহিত ডাকিতে পারেন, তাঁহার আহ্বানধ্বনি শুনিয়া বর্ত্তমান কলঙ্কিত হিন্দু-স্থান আবার জনকঋষির উচ্চ দৃষ্টান্তস্থান হয়। হয় না, হয় না, এ কথা মুখে আনিও না। একবার যদি ডাকিয়া যোগপথে ভক্তিপথে চলিবার উপায় করিতে পার, সংসার আর কণ্টকময় থাকিবে না, এই বঙ্গদেশ সমস্ত পৃথিবীর

পক্ষে একখানি ছবি হইবে। ইহার দিকে সকলের নয়ন স্থির হইয়া থাকিবে।” “এমন সময় আসিতেছে, যে সময় এই বিচিত্র দৃশ্য প্রকাশিত হইবে। যাহাতে এই সময় শীঘ্র আসিতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। স্বার্থপর হইয়া প্রিয় ভাই ভগিনীদিগকে ভাসাইয়া দিও না, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ কর। তাঁহাদিগের ভিতরে যে সকল সদ্গুণ আছে, তাহা প্রস্ফুটিত করিবার উপায় কর। সকলের সহধর্ম্মিণী উপস্থিত হউন, যাহা কিছু পূর্ব্বের উচ্চ ভাব ছিল, তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক। ব্রাহ্মিকা স্ত্রী সংসারের জীব না হইয়া, বেশভূষাতে জলাঞ্জলি দিয়া মৈত্রেয়ী হউন, স্বামীর নিকটে বসুন; সে কি পদার্থ, যাহাতে অমর হওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করুন। স্ত্রী স্বামিসহবাসে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। ভারতভূমি মৈত্রেয়ীসদৃশ শত শত নারীতে পূর্ণ হইবে। এখন যেমন তাঁহারা বিষয়ের আলোচনা করেন, তেমন আর বিষয়ের আলোচনা না করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করুন। স্বামী সুখী হইবেন, সন্তানগণ ধর্ম্মপথে চলিবে, বংশপরম্পরা পুণ্য শান্তির নিকেতন হইবে। এই ভাবে, এই ব্রহ্মভাবে সর্ব্বদা পরিবার নিকটে রাখ। আপনি গভীর যোগে নিমগ্ন হও, সহধর্ম্মিণী যোগে মগ্ন হউন, পরস্পর মগ্ন হইয়া কৃতার্থ হও। সন্তান সন্ততি প্রিয়জন সকলের সঙ্গে ব্রহ্মনাম সংকীর্ত্তন করিয়া নৃত্য কর। পরিবার সংসার সমুদায় ব্রহ্মযোগে, জলে জলের ন্যায়, একাকার হইয়া যাইবে; আর সংসার সংসার থাকিবে না, সংসার ব্রহ্মধাম হইয়া উঠিবে। জনক যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ভাব পুনরুদ্দীপন হইতে পারে, বিশ্বাস কর এবং সর্ব্বদা এই অভিলাষ পোষণ কর যে, সেই ভাব পুনরুদ্দীপন করিব, আপন চক্ষে দর্শন করিব, এবং দর্শন করিয়া সুখী হইব।”

সংশয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রতিবাদ

পৃথিবীতে যোগানুরক্ত-ভক্তপরিবার-স্থাপন শুদ্ধতা বিনা কখন সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মগণমধ্যে কোন কোন স্থলে এই শুদ্ধতার বিরুদ্ধাচরণ এই সময়ে প্রকাশ পায়। সংশয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সমাজমধ্যে প্রবেশ করিলে, পারিবারিক উচ্চতম সাধন কখন সিদ্ধ হইতে পারে না, এ জন্য প্রকাশ্য ভাবে প্রচারকসভা হইতে ৩রা আশ্বিন, ১৮০১ শকে, বৃহস্পতিবার, (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ) সংশয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার এইরূপ প্রতিবাদ হয় (১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্ব):—“যেহেতু রাজধানীতে এবং অন্যান্য স্থানে যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যে মতব্যতিক্রম

এবং চরিত্রদোষ সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিদিত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নামে, তাঁহার আদেশে, আমাদিগের সমাজের কল্যাণের জন্য, দেশের সকল স্থানে অবস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলীকে এমন সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত যে, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মত ও নীতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইতে পারে। পরমেশ্বর সকল সময়ে অল্পবিশ্বাসিগণকে শাসন করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগত লোকদিগের বিন্দুমাত্র সংশয়কে জঘণ্য পাপ বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। সংশয় ও অস্থিরতা পরিত্যাগ করিয়া, প্রত্যেক বিশ্বাসীর সম্পূর্ণ সুদৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া উচিত। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক মূলমতসম্বন্ধে সংশয় পোষণ করে. অথবা ধর্ম্মের সার সত্য লইয়া উপহাস করে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর এবং আমাদের সমাজের শত্রু। যে কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতা, ধ্যান ধারণা উপাসনা এবং বিশ্বাসে আপনাকে খর্ব্ব হইতে দিয়া, ক্রমে জ্ঞানোন্নতি হইতেছে বলিয়া গর্ব্ব করে, সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। তাহার অণুমাত্র সংসর্গে লোকসমাজ কলুষিত হয়। এই সকল লোকের প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার করা উচিত যে, তাহারা তাহাদিগের বিপদ দেখিতে পাইয়া উহা পরিহার করিতে পারে। আমরা অতি বিনীতভাবে ভারতবর্ষীয় সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও আচার্য্যগণকে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদিগের সমাজের সার সার মতগুলি, যথা ঐশ্বরিক আবির্ভাবের বাস্তবিকতা, বিধাতৃত্ব, প্রত্যাদেশ, দৈনিক উপাসনা, যোগ, আত্মার অমরত্ব ইত্যাদি রক্ষা করিবেন এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে যথাসাধ্য ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতা এবং ধ্যান ধারণা উপাসনা বর্দ্ধন করিবেন। আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের পবিত্র প্রিয় সমাজকে তাঁহারা সকল প্রকার সংশয়ী, জড়বাদী, অবিশ্বাসী এবং উপহাস-পরায়ণদিগের দূষণীয় প্রভাব হইতে সর্ব্বথা সযত্নে নির্ম্মুক্ত রাখেন। সামাজিক পবিত্রতার অত্যুচ্চ আদর্শে আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে আমরা মনে করি, স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি আচারব্যবহারসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শিথিলতাও সমাজের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। আপাততঃ অনিষ্টকর না হইলেও, অযথোচিত স্বাধীনতা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দ্বারা প্রণোদিত হয়, তবে উহা ঈশ্বর এবং আমাদিগের পবিত্র সমাজের চক্ষে অতীব ঘৃণিত। ঈশ্বরের আদেশ এই, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সর্ব্বদা পবিত্রতম সম্বন্ধ অবস্থিতি করিবে, এবং যে কোন

অবস্থা হউক না কেন, অত্যল্প পরিমাণেও এইরূপ স্বাধীনতা লইতে দেওয়া হইবে না, যাহা আত্মার মঙ্গলের পক্ষে অন্তরায়। অতএব আমরা এই সভাতে গম্ভীরভাবে সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, ঈশ্বরাদেশে যে প্রচারব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, যত দিন আমাদের সেই ব্রতে ব্রতী থাকিবার অনুমতি ও অধিকার থাকিবে, আমরা কর্ত্তব্য জানিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা স্ত্রীজাতির অধিকার ও কল্যাণের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিব, সতর্কতার সহিত তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা করিব, তাঁহাদিগের লজ্জাশীলতা ও সতীত্ব দৃঢ়তাসহকারে রক্ষা করিব, সকল প্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অননুমোদন ও পরিহার করিব এবং যে সকল দুর্নীতিদ্বারা গূঢ়ভাবে সামাজিক ধর্ম্মের পত্তনভূমি উৎখাত হয়, তাহা হইতে ব্রাহ্মসমাজকে নির্ম্মুক্ত রাখিব। আগ্রহাতিশয়সহকারে আমরা দেশস্থ বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও ধর্ম্মজ্যেষ্ঠগণকে নিবেদন করিতেছি যে, নরনারীর সম্বন্ধ শিথিল করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহা তাঁহারা সাধ্যানুসারে নিবারণ ও দমন করেন এবং আমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষগণকে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবারস্থ বিশুদ্ধ ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ শিক্ষা দেন। যে কোন স্থানে অপবিত্র সাহিত্য, দূষিত নাটক, অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোক এবং বিলাসপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল যুবকবৃন্দের সংসর্গে চরিত্র দূষিত হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানে আমাদিগের স্ত্রীদিগের গমনাগমন না হয়, এজন্য আমাদিগের পবিত্র সমাজের নামে আমরা বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে দায়িত্ব অনুভব করুন এবং সতর্ক হইয়া চেষ্টা করুন, যেন সভ্যতার ছদ্মবেশে এবং ভদ্রতা ও স্বাধীনতার নামে আমোদ প্রমোদ, হাস্য কৌতুক এবং অবৈধ ব্যবহার আমাদের সমাজমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ইহার উচ্চনীতি এবং আর্য্যনারীগণের সুপ্রসিদ্ধ লজ্জাশীলতা ও নির্দ্দোষ পবিত্রতা অণুমাত্র খর্ব্ব না করে। এ বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
প্রচারকসভার সম্পাদক।"

ঈশ্বরসংসৃষ্ট ধার্ম্মিকদল-স্থাপনের যত্ন

সাধুভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ, যোগানুরক্ত-ভক্তপরিবার-স্থাপন, এবং এ উভয়ের প্রতিকূল সংশয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে মণ্ডলীকে বাঁচাইবার জন্য

বিশেষ যত্ন, এ সকল, ভবিষ্যতে কি আসিতেছে, তাহার পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করিল সত্য, কিন্তু সর্ব্বোপরি একটি ঈশ্বরসংসৃষ্ট ধার্ম্মিক দল পৃথিবীতে স্থাপিত হয়, এজন্য কেশবচন্দ্র শেষজীবনে যে অক্ষুণ্ণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সে পরিশ্রমের সূত্রপাত এই সময়ে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার মধ্যজীবনে এ সকল ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, এখন সেই সকল ভাবের ঘনীভূত অবস্থা প্রদর্শন করিবার জন্য 'চরমভাবের পূর্ব্বাভাস' বলিয়া আমরা ঐ সকলের এখানে উল্লেখ করিতেছি। তিনি দলসম্বন্ধে (২০শে আশ্বিন, ১৮০১ শক; ৫ই অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃঃ) বলিয়াছেন (১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য):—"যদি বল, দল ছাড়িয়া অন্যস্থানে কি পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, ঈশ্বর জানেন; কিন্তু এই ধার্ম্মিক দল গঠন করিয়া ঈশ্বর অধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রণালী স্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং ধার্ম্মিক সৈন্যদিগকে একত্র করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করেন, এইরূপ এক একটি দলকে উপায় করিয়া জগৎকে উদ্ধার করিবেন। যদি বস্তু অতি গুরু হয়, তাহা চূর্ণ করিবার জন্য ঘনীভূত বলের প্রয়োজন। এই জন্য পৃথিবীর নাস্তিকতা এবং অধর্ম্ম নিতান্ত অধিক হইলে, ঈশ্বর নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মবলকে একস্থানে আনিয়া সম্বদ্ধ এবং ঘনীভূত করেন। সেই ঘনীভূত বলের নামই দল। সেই দলের ভিতরে রাশি রাশি ব্রহ্মতেজ ঘনীভূত হয়। যেন এক স্থানে একটি প্রকাণ্ড অগ্নি জলিয়া উঠে; অথবা একস্থানে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণাজল ঘুরিতেছে। সেই প্রকাণ্ড অগ্নির মধ্যে পড়িয়া পৃথিবীর সমস্ত পাপ অধর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায়। সেই প্রকাণ্ড ঘূর্ণাজলে পড়িয়া সমুদায় জঞ্জাল চূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে এক একটি প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা প্রকাণ্ড ঘূর্ণাজলের ন্যায়, এক এক স্থানে এক একটি ধর্ম্মদল গঠিত হয়। চারিদিকের মনুষ্য সকল সেই দলকে ভয় করে। ধর্ম্মবীরেরা একত্র হইলে, অধার্ম্মিক পৃথিবী ভয়ে কম্পিত হয়। ভীরু বঙ্গদেশ যদি শুনিতে পায়, দশ জন বিশ্বাসী একত্র হইয়াছেন, তাহার ভীরুতা আরও বৃদ্ধি হইবে। আর একটি কথা এই, যখন এই সকল ধার্ম্মিক লোক একত্র হন, তখন যে কেবল তাঁহাদের দল ঘনীভূত হয়, তাহা নহে; কিন্তু দলবলের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও ঘনীভূত হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে আর অবসন্নতা, নিস্তেজ ভাব ও নিরুৎসাহ দেখা যায় না। পরস্পরের মুখ দেখিয়া তাঁহাদিগের সকল দুঃখ বিষাদ ঘুচিয়া যায়; দলের মধ্যে শোক

মনস্তাপ স্থান পায় না। দলস্থ লোকেরা যে পল্লীতে যান, সেই পল্লীর লোক জানিতে পারে, আনন্দের দল আসিয়াছে। দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে, ধার্ম্মিকের সুখের আস্বাদন, আনন্দের ব্যাপার, আনন্দের লীলা কেহ দেখাইতে পারেন না। দলের আনন্দ দেখিয়া লোকেরা মনে করে, যখন এতগুলি লোক একেবারে হাসিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন সুখের বস্তু পাইয়াছেন। সেই আনন্দচন্দ্রোদয় দেখিয়া জগতের দুঃখী পাপীরা সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। দলের লোকেরা নানাপ্রকার সুখে মত্ত। কেহ প্রেম ভক্তির সহিত ঈশ্বরের স্তবস্তুতি করিতেছেন, কেহ গভীর ধ্যানে মগ্ন, কেহ সঙ্গীতে মগ্ন, কেহ সৎপ্রসঙ্গে মগ্ন। এ সকল সুখের ব্যাপার দেখিয়া জগতের লোক মোহিত হয়।"

এই দলের আনন্দ কোন বাহ্য কারণ হইতে নহে, কিন্তু যোগে নিমগ্নতা হইতে উপস্থিত। তাই তিনি বলিয়াছেন :—"আকাশে এক দল কপোত ছাড়িয়া দাও, সেই কপোতদল উড়িতে উড়িতে উপরে উঠিল, ক্রমে ক্রমে আরও উপরে উঠিল, উপরে উঠিয়া ছোট কপোতের মত দেখাইতে লাগিল, আরও যত উপরে উঠিতে লাগিল, ততই ক্ষুদ্রতর হইয়া গেল। কপোতদল উচ্চ আকাশে উঠিয়া আনন্দে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া আবার পৃথিবীতে অবতরণ করিল। সেইরূপ যখন একটি প্রকাণ্ড বিস্তৃত ধার্ম্মিকের দল উচ্চ ধর্ম্মাকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন পৃথিবীর আশা হয়। ধার্ম্মিকদল যোগধ্যানবলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর ধর্ম্মাকাশে আরোহণ করিয়া, ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমবায়ুতে বিচরণ করেন। সেই উচ্চ আকাশে মনের সুখে বিহার করিয়া, সেই ধর্ম্মকপোতগুলি এক একবার পৃথিবীতে অবতরণ করেন। দেখিতে কেমন আহ্লাদ !! একদল পাখী উড়িল। একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়িতেছে কেন ? কপোতেশ্বর ঈশ্বর তাহাদিগকে ডাকিয়া লইলেন। ঊর্দ্ধে উড়িয়া যাওয়া কেমন আহ্লাদের ব্যাপার। সময়ে সময়ে এক এক দল পাখী উড়িতেছে দেখিলে, পৃথিবীর আশা এবং আহ্লাদ বর্দ্ধিত হয়। কপোতগুলি উচ্চ হইতে উচ্চতর ধর্ম্মাকাশে উঠিতেছে দেখিলে, সকলের তাক লাগিয়া যায় ; পৃথিবী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়।" দলস্থ হইয়া ধর্ম্মসাধনাদি যে কি সুখকর, কি আশা ও উৎসাহকর, তাহা তিনি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—"দলস্থ হইয়া ধর্ম্মসাধন এবং ধর্ম্মপ্রচার করা অপেক্ষা উচ্চতর সুখের ব্যাপার আর কিছুই

নাই। ব্রাহ্ম, দল ছাড়া হইয়া থাকিও না। অহঙ্কারী যদি হও, তাহা হইলে একা থাকিবে, কিন্তু তাহা হইলে তোমার আশা নিস্তেজ হইবে, এবং তোমার মুখ ম্লান হইবে। পক্ষান্তরে যাহার দক্ষিণে বামে ধর্ম্মবন্ধু, যে ব্যক্তি একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মদলের অধীন, তাহার কত আশা, কত উৎসাহ। দলস্থ সাধুদিগকে সর্ব্বদাই জমাট প্রেম, জমাট পুণ্য এবং জমাট বুদ্ধি উৎসাহী করে। যতক্ষণ দলের মধ্যে আছ, ততক্ষণ দশ মত্ত হস্তীর বল তোমার বাহুর ভিতরে চলিতেছে। দল ছাড়িয়া দূরে বসিয়া থাক, কেবল তোমার নিজের রক্ত, দলের রক্ত আর তোমার ভিতরে নাই। যত ক্ষণ দলের মধ্যে থাক, তত ক্ষণ তোমার বুদ্ধি সতেজ, উৎসাহ অগ্নিময়, প্রেমপুণ্য ঘনীভূত, তথায় একগুণ পুণ্য শান্তি শত গুণ হইতেছে।" ভগবৎসংসৃষ্ট এই বিশ্বাসিদলের মধ্যে যে সকলকেই প্রবিষ্ট হইতে হইবে, তাহা তিনি এইরূপে বলিয়াছেন:—"ইহা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলা যায়, এই ধার্ম্মিক দলের টান কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না। সেই ঘূর্ণ-জলরাশির ভিতরে, সেই মত্ততার ভিতরে সকলে পড়িবে। অতএব, বন্ধুগণ, কেহই দলভ্রষ্ট হইও না। একাকী কিছুই করিতে পারিবে না।" দলের সহিত সংযুক্ত ব্যক্তি যেখানেই কেন থাকুন না, তিনি দলেতে সঞ্জীবিত। "আমরা এমন কোন লক্ষণযুক্ত হইব যে, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিব, আমরা সেই দলভুক্ত। এক হৃদয়ের রক্ত যেমন হস্ত পদের অঙ্গুলি ও সমস্ত শরীরে চলিতেছে, সেইরূপ আমরা যদি দলভুক্ত হই, কি লাহোরে, কি মান্দ্রাজে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সেই দলের রক্ত আমাদিগের ভিতরে চলিতে থাকিবে।"

কেশবচন্দ্রের বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্ব

কেশবচন্দ্রের বিজ্ঞানের উপরে কি প্রকার প্রগাঢ় আস্থা, তাহা এই সময়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। মাঘোৎসবের ইংরেজী বক্তৃতায় তিনি আপনার বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েক মাস পরে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথনে (২৭শে জুলাই, ১৮৭৯ খৃঃ) বিজ্ঞানসম্বন্ধে যে কথাগুলি নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ঐ ভাব যে আরও ঘনীভূত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিজ্ঞানগুলিই যে প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রের সমকক্ষ, কিছুতেই

তদপেক্ষা ন্যূন নহে, তাহা এই কথোপকথনে সুস্পষ্ট বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞান ক্রমোন্মেষ প্রভৃতি যে সকল নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাতে ভীত না হইয়া, ঐ সকলকে গ্রহণ ও স্বীকার করা যে প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে কর্ত্তব্য, তাহাও উহাতে অতি সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসিচিত্তে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা অতি স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, হক্‌সালে, ডারউইন্ প্রভৃতি অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের কার্য্য ও ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারা বিজ্ঞানের যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরের সত্য বলিয়া সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। যেরূপ গাম্ভীর্য্যসহকারে ধর্ম্মশাস্ত্র পঠিত হইয়া থাকে, ঠিক সেইভাবে বিজ্ঞান সকল বিশ্বাসিগণ অধ্যয়ন করিবেন। ধর্ম্মের নামে যেমন অসত্য প্রচারিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের নামেও সেইরূপ অসত্য প্রচারিত হইতে পারে; সুতরাং বিজ্ঞানের কোন স্থলে অসত্য প্রচারিত হইলে, তাহা ধর্ম্মার্থিগণ দূরে পরিহার করিবেন। বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া ঈশ্বর কি ব্যক্ত করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর বলিয়াছেন, "সমুদায় প্রাকৃতিক ও মানসিক বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া আমি আমার করুণা, শক্তি, জ্ঞান, এবং আমার সন্তানগণের প্রতি আমার অবিচ্ছিন্ন প্রগাঢ় যত্ন ও আমার বিধাতৃত্ব ব্যক্ত করিয়া থাকি। কোন একটী তারকা, কোন একটী বৃক্ষ, কোন একটী জীবদেহ, বিদ্যুৎ ও চুম্বকাকর্ষণ, জল ও বায়ু, চিন্তা ও ভাবের নিয়মরাজি, সুবৃহৎ পর্ব্বত ও অতিক্ষুদ্র বালুকাকণা, ফল পুষ্প, যাহা কিছু অধ্যয়ন কর, তন্মধ্যে তুমি আমায় স্পষ্ট বলিতে শুনিবে, 'আমি আছি' 'আমি তোমার প্রভু' 'আমি জীবন্তশক্তি, তোমায় ধারণ করিয়া আছি' 'আমি প্রেমময় বিধাতা, তোমার অভাব সকল পূরণ করিতেছি।' এইরূপ আরও অনেক চিত্তমুগ্ধকর কথা এবং পরিত্রাণপ্রদ সত্য শুনিতে পাইবে।"

কেশবচন্দ্রের অবুদ্ধতা

কেশবচন্দ্র দিন দিন সাধারণ জনগণের নিকটে অবুদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই অবুদ্ধতা কি ভাবের, তাহা এ সময়ে মিরারে এই প্রকারে নিবদ্ধ হইয়াছে:—"আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন, যাঁহার জীবনে অন্যান্য জীবিত ব্যক্তি অপেক্ষা অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী বিবিধ প্রকারের দোষ আরোপিত হইয়াছে। বৎসরে বৎসরে এই ব্যক্তির নামে যে সকল দোষ

আরোপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিগত বিংশতি বর্ষের ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। এই ব্যক্তির প্রতি যে সকল দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকও যদি সত্য হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি পৃথিবীতে একটি অদ্ভুত জীব। এই দোষারোপগুলি যখন বিবিধ প্রকারের এবং পরস্পরবিরোধী, তখন কোন স্বস্থচিত্ত বিচারক বিচারনিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিবেন না। যে কোন ব্যক্তি নিরাশ হইয়া বলিবেন, হয় যে ব্যক্তির নামে দোষারোপ করা হইয়াছে, সে ব্যক্তি পাগল, নয় দোষারোপকর্ত্তা পাগল হইবেন। উন্মত্ততা ভিন্ন উভয়পক্ষের আচরণের কোন অর্থই নাই। সমগ্র দোষের গণনা পাঠ করিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে আমরা বুদ্ধিহারা হইয়াছি, এবং আমাদের মনে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে, এ কিরূপ ব্যক্তি? মানুষের জীবনে কি এরূপ অসম্বদ্ধ পরস্পরবিরোধী ভাব সম্ভবে? একি সেই মানব বহুরূপী, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাহার রং বদলায়? এ কি চাঞ্চল্যের অবতার? এ ব্যক্তির জীবন কি সেই চিত্রদর্শনী, যাহাতে দৃশ্যের পর দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া যায়? এ ব্যক্তি কি প্রবঞ্চক? এ কি প্রতিক্ষণ ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ায় জনচক্ষু মায়াচ্ছন্ন করিয়া আমোদ করে? এ ব্যক্তি কি অতি অধম জনরঞ্জনান্বেষী? যদি তাহাই না হইবে, তবে এত প্রকারের মত, এত প্রকারের চরিত্রের ভিতর দিয়া ইহার গতিবিধি কেন? দোষারোপকারিগণ ইহার প্রতি কি কি প্রকারের দোষ দিয়াছে, আমরা তাহার বর্ণনা করিতেছি।

দোষারোপকারিগণের প্রদর্শিত দোষ

"১ সং। এ ব্যক্তি ঈশ্বরের অবতার। ইহার শিষ্যগণের সম্মুখে আপনাকে অবতাররূপে উপস্থিত করাকে এ গৌরব মনে করে, এবং শিষ্যগণও ইহার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে এবং পরিত্রাণ ভিক্ষা করে।

"২ সং। দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এ ব্যক্তি ভৃত্যভাব অবলম্বন করিয়া দুজন বন্ধুর পদতলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণিপাত করিতেছে এবং তাহাদিগকে বাড়াইতেছে ও তোষামোদ করিতেছে।

"৩ সং। এ ব্যক্তি ঈশার সমান এবং তাঁহার সহিত এক সিংহাসনে উপবিষ্ট। উনবিংশশতাব্দীতে এ ঈশা হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

"৪ সং। এ ব্যক্তি ঈশার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট এবং তাঁহাকে গুরু

ও ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মহিমান্বিত করিতেছে। এ ব্যক্তি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে এবং অবতরণের পূর্ব্বে তাঁহার স্থিতিতে বিশ্বাস করে। এ প্রায় খ্রীষ্টান।

"৫ সং। এ ব্যক্তি লোকাতীতত্ব ও অদ্ভুতক্রিয়া অস্বীকার করে, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে বিজ্ঞানবিরোধী যাহা কিছু আছে, তাহাতে অবিশ্বাস করে। এ ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মবিরোধী এবং বৌদ্ধ।

"৬ সং। এ ব্যক্তি বৌদ্ধ নহে, কিন্তু ভাবুক ব্রাহ্ম। ইহার অশ্রুপাত, ভাববিকার, এবং আনন্দোন্মত্ততা হয়। ইহার ধর্ম্ম অতিরিক্ত ভাবুকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"৭ সং। এ ব্যক্তিতে একটু কোমল ভাব নাই। এ কঠোর কার্য্যকুশল লোক, ইচ্ছার বেদীসন্নিধানে এ জ্ঞান ও ভাব উভয়কেই বলি অর্পণ করে। 'কাজ' ইহার মূলমন্ত্র; এ কেবলই উৎসাহ। কার্য্যানুরত না হইলে ইহার আর কিছুই থাকে না। শুষ্ক কার্য্য এবং নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম ইহার ধর্ম্ম।

"৮ সং। এ ব্যক্তি সমুচিত কার্য্যে অবহেলা করে এবং অসঙ্গত বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্র সাধনে সময় নষ্ট করে। এ আপনার হস্তে রন্ধন করে এবং আত্মকর্ষণেতে পরিত্রাণ খোঁজে। এ ব্যক্তি বিষণ্নমুখ, শুষ্ক, আহ্লাদবিহীন ফকীর, এ পারিবারিক এবং সামাজিক কর্ত্তব্যসকলকে তুচ্ছ করে, ঘৃণা করে।

"৯ সং। নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি বৈরাগী নয়। এ নিতান্ত সংসারী এবং সর্ব্বদাই আমোদ ও সুখে আসক্ত। এই নামমাত্র ভক্তের কোন গাম্ভীর্য্য নাই। এ নাট্যশালায়, সায়ংসমিতিতে এবং পশুরক্ষণ উদ্যানে গমন করে এবং যেন সর্ব্বদা হাসিয়াই আছে। এ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে যায় এবং আপনি যেন ধনী ও বড়লোক, এইরূপ দেখায়।

"১০ সং। দেখ, এ সন্ন্যাসী প্রচারকের ন্যায় শূন্যপদে রাজপথে বেড়াইতেছে। বাউল বৈষ্ণবের জঞ্জালপূর্ণ ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়া দেখ, এ অতি দরিদ্র ও অধমদিগের সঙ্গ করে।

"১১ সং। এ ভীষণ পৌত্তলিকতাবিরোধী, এ পুত্তলের বিদ্বেষী।

"১২ সং। এ ঘোর পৌত্তলিকতার দোষগ্রস্ত। এ চৈতন্যকে ভক্তি করে, মাতা গঙ্গার পূজা করে।

"১৩ সং। এ পৌত্তলিকও নয়, ব্রাহ্মও নয়, কিন্তু এ এক জন অদ্বৈতবাদী। এ যোগানুরক্ত, এবং বিশ্বাস করে যে, সকলই ঈশ্বর।

"১৪ সং। এ ব্যক্তি রহস্যবাদী। এ স্বপ্ন দেখে এবং কাল্পনিক দর্শন ও উৎকট আনন্দ লইয়া ব্যস্ত।

"১৫ সং। এ ব্যক্তি স্বপ্নদর্শী নয়। এ ধনের পূজা করে; এ টাকার জন্য সকলই করে।

"১৬ সং। এ ব্যক্তির ধর্ম্মজীবনের মূল লোভ নহে, উচ্চাভিলাষ। ইহার সকলই নামের জন্য।"

২

দশম ভাদ্রোৎসব

৯ই ভাদ্র (১৮০১ শক) (২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৯ খৃঃ) ভাদ্রোৎসব হইবার কথা হয়, কিন্তু আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পীড়ানিবন্ধন সে দিন ভাদ্রোৎব হইতে পারে না। আচার্য্যের পীড়োপশমের পর, ২৩শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর) রবিবার, নিম্নলিখিত প্রণালীতে ভাদ্রোৎসব (উৎসব-বিবরণ ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) সম্পন্ন হয়।

ব্রহ্মসঙ্গীত	৭॥	৮
প্রাতঃকালীন উপাসনা	৮	১১
মধ্যাহ্ন উপাসনা	১	১॥
অধ্যাপকদিগের প্রতি উপদেশ ও গৈরিক বস্ত্র দান	১॥	২
পাঠ	২	৩
উপদেশ ও সঙ্গীত	৩	৩॥
ধ্যান ও ৫ মিনিট যোগ	৩॥	৪॥
প্রার্থনা ও সঙ্গীত	৪॥	৫॥
উপদেশ ও সঙ্গীত	৫॥	৬
কীর্ত্তন	৬	৭
সায়ংকালীন উপাসনা	৭	৯॥

ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা আশ্বিনের) লিখিয়াছেন :—"উৎসবের দিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দির মধুর সঙ্গীতধ্বনিতে পূর্ণ হইল। সঙ্গীতলহরীতে তাড়িত হইয়া উপাসকগণের মন তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতার চরণসমীপে উপনীত হইল। সকলের মন আশাতে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইল; ব্রহ্মমন্দিরের বেদী আচার্য্যের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে সুশোভিত হইল; উপাসনার সুমিষ্ট ধ্বনি সকলের হৃদয় ভেদ করিয়া স্বর্গের দিকে উত্থিত হইল; উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ধারণা মিলিত হইয়া,

উপাসকগণকে স্বর্গের দ্বারে উপনীত করিল।" এ সময়ে আচার্য্য যে উপদেশ দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"ঈশ্বর কি আছেন ?"

"ঈশ্বর কি আছেন ? ধর্ম্মার্থীর প্রথম প্রশ্ন এই। ব্রহ্মার্থীর শেষ প্রশ্নও এই,—ঈশ্বর কি আছেন ? যদি ব্রাহ্মসমাজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তবে আর কিছুর প্রয়োজন রহিল না। চারি দিক্ দেখিয়া মনে হয়, যেন ঈশ্বর নাই, তাই লোকগুলি বুকে পাপ জড়াইয়া মরিতেছে। পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, যেন কখনও হরি ছিলেন, কিন্তু এখন যেন হরি নাই, এবং পরেও হরির জন্ম হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দেখিয়াও মনে হয়, যেন প্রাণের হরির কার্য্য—জীবন্ত ব্রহ্মের কার্য্য শেষ হইয়াছে। অল্প-বিশ্বাসী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে গোপনে গোপনে এই ভাব চলিতেছে। হায়, হরি! হৃদয়ের হরি! তুমি কি নাই ? তুমি নাই, এই কথা শুনিলে যে আমার হৃদয় চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবে। আর যদি বন্ধুরা সকলে বিশ্বাসের জয়ধ্বনি করিয়া বলেন, আমার হরি আছেন, তাহা হইলে আমার হৃদয় শীতল হইবে; আমি আনন্দসাগরে ডুবিয়া মরিব। এত দিন পরে যদি হরির জীবনের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনি, হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। দেশীয় লোক, তোমরা কি নাস্তিক ? হরিকে কি তোমরা বিশ্বাস কর না ? কল্পনার হরি, অনুমানের হরির কথা বলিতেছি না। আসল হরিকে কি চেন না ? হরিকে কি তোমরা দেখ নাই ? হরির সঙ্গে কি তোমরা আলাপ কর নাই ? হরির নিরাকার পাদপদ্ম কি তোমরা কখনও ছোঁও নাই ? এতকাল ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও যদি হরিকে না দেখিয়া থাক, এতকাল পরেও যদি হরিদর্শনের কথা নিঃসন্দেহ না হইয়া থাকে, তবে সকলই পণ্ডশ্রম হইয়াছে। যদি হরিকেই না দেখিলে, তবে সংসারে বাঁচিয়া থাকা বৃথা। এখনও অবিশ্বাসী, এখনও সংসারের কীট হইয়া থাকিবে ? এখনও মায়াজাল কাটিলে না ? হরি তোমাদের হৃদয়দ্বারে এবং মন্দিরে দাঁড়ায়ে আছেন; তাঁহাকে কি দেখছ না ? ভাই, তুই নাস্তিক। নাস্তিককে যে ভয় করে। নাস্তিকের প্রকাণ্ড দন্ত দেখিলে যে ভয় করে। কি ভয়ানক ! হরি কি আছেন, এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে হইল ? ব্রাহ্মগণ,

হরি নাই—এ নিষ্ঠুর নিদারুণ কথা বলিয়া হয় কষ্ট দাও, নতুবা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বল, হরি আছেন। কিন্তু হরি আছেন, অর্দ্ধেক বিশ্বাসের সহিত এই কথা বলিলে চলিবে না। মুখে বলিবে, হরি আছেন, কাজে দেখাইবে, হরি নাই; এইরূপে আর কত দিন হরির অপমান করিবে? এ কি হরির সঙ্গে উপহাস! মুখে হরিকে স্বীকার করিলে, কিন্তু জীবনটা নাস্তিকের মত চালাইলে; এই কি হরির প্রতি বিশ্বাস? সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে কার্য্য কর, কি পুস্তকালয়ে পুস্তক পড়, কি অন্যত্র অন্য কোন কার্য্য কর; সে সকল স্থানে কি হরি নাই? হরির কথা না শুনিয়া কেন কার্য্যালয়ে যাইবে? হরির আদেশ না হইলে কেন পুস্তক পড়িবে? ধিক্, ব্রাহ্মকে ধিক্! অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্ম জীবন্ত হরিকে দেখিল না। হে ব্রাহ্ম, তুমি যদি পূর্ণ বিশ্বাসী হও, ভারত কাঁপিবে। হরিকে দেখিলে ভারতবর্ষে বিশ্বাসের চৌদ্দহাজার সূর্য্যোদয় হইবে। যাহার অন্তরে এই বিশ্বাসের আলো নাই, সে কি ব্রাহ্ম? যাহার চোখে এক ফোটা জল নাই, যাহার মুখে একবিন্দু প্রেমরস নাই, বেশ বুঝা যায়, সে হরিকে দেখ্‌ছে না। সে মুখে হাজার বলুক না কেন, ঈশ্বর আছেন, তাহার সে কথা কপট হৃদয়ের উক্তি। যে হরিকে দেখে, সে কি, যাই উপাসনা হইল, অমনি আবার কপট ব্যবহার করিবার জন্য সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারে? তোমাদের দেশের কেন দুঃখ দূর হইতেছে না? তাহার প্রধান কারণ এই,—তোমরা মুখে বল, হরি আছেন; কিন্তু তোমাদের চরিত্র বলিতেছে, হরি নাই। ······হে অনুমানের উপাসক ভ্রান্ত নর, যদি হরি না দেখিয়া থাক, তবে তোমার সাধন ভজন পণ্ডশ্রম। অধিক দিন আর তোমার এরূপ সাধন ভজন চলিবে না। পৃথিবী তোমার কল্পিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। পৃথিবীকে কিছু দেখান চাই। খুব সুন্দর বস্তু না দেখিলে পৃথিবী ভুলিবে কেন? ব্রাহ্মবন্ধুগণ, এমন খাটি বস্তু কি তোমাদের কাহারও কাছে আছে? যদি থাকে, আমি বলি, বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ তোমাদের। কেন না তোমরা জগতের মনোরঞ্জন ভুবনমোহন মনোহর ঈশ্বরকে পাইয়াছ।······বন্ধুগণ, তোমরা কি দেখিতেছ না, এই নূতন ধর্ম্মবিধানে নিরাকার নিত্যানন্দ হরির অবতরণ হইয়াছে? নিরাকার সচ্চিদানন্দের এমন রূপের লাবণ্য, এই কথা আর কেহ কখন বলে নাই। যে নিঃসংশয়ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, সে মৃত্যুর পথে

চলিতেছে। যে বলে, ঈশ্বর আছেন, এরূপ অনুমান হয়, বিষাক্ত সর্প তাহার আত্মাকে দংশন করিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও ছদ্মবেশে এ সকল গূঢ় নাস্তিকতা আসিয়াছে।……ইহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, ধ্যানের সময় চক্ষু বুজিয়া মনে করে, ঈশ্বর আকাশ বা পাথরের মত। বন্ধুগণ, সাবধান, এ সকল নাস্তিকদের হস্ত হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বদা মুক্ত রাখিবে। আস্তিক ব্রাহ্ম হইয়া ঈশ্বরের সত্তারূপ মহাতেজের মধ্যে হাত রাখিয়া বল, এই ঈশ্বর আছেন, ইহাতেই নিজের এবং জগতের পরিত্রাণ হইবে, আর কিছু বলিতে হইবে না। সকলে আস্তিক হইয়া বল, আমাদের হৃদয়বন্ধু আছেন, তিনি এবার বিশেষরূপে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রত্যেকের বাড়ীতে এসেছেন, প্রত্যেক ব্রাহ্মের ভার লইয়াছেন।……হরি আছেন এবং হরি কথা বলেন, তোমরা কেবল এইরূপ ছোট ছোট গুটী দুই কথা বলিয়া বেড়াও ; তাহা হইলে বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষ তোমাদেরই হইবে।……তোমরা তোমাদের মনোহর দেবতাকে হাতে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে সকলের নিকট যাও। হরির অরূপ রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইবে। হরির অবতরণ হইয়াছে। এবার কিছু বিশেষ ব্যাপার করিবার জন্য হরি আসিয়াছেন। এই বিধানে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে হরি আপনি বসিয়াছেন, আর হরি তাঁহার সমুদায় প্রিয় সাধুপুত্র-দিগকে মনোহর সাজে সাজাইয়া আনিয়াছেন। তাঁহার সমুদায় সাধু সন্তানদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে ; আমরা যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলিকে বাছিয়া লইব, তাহা হইবে না, সমস্তগুলিকে লইতে হইবে। দেশীয় বিদেশীয় সমস্ত সাধুদিগের নিকটে হরির সত্যসকল গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা যত সত্য ভালবাসি, যত রঙ্গ ভালবাসি, যত শব্দ ভালবাসি, সে সমুদয়ই হরির বর্ত্তমান বিধানে আছে।……পঞ্চাশ বৎসরের ব্রাহ্মসমাজ গল্প নহে। নিরাকার ব্রহ্ম মনুষ্যের অসত্য কল্পনা নহে। ও পাড়ার কাণা ব্রহ্মকে দেখেছে। আকাশ নয়, অন্ধকার নয়, জ্যোতি নয়, নিরাকার ঘন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ছদ্মবেশী নাস্তিক ব্রাহ্মেরা শুষ্ক উপাসনার মন্ত্র পড়িয়া আফিসে চলিয়া যায়, তাহাদের মনে নিরানন্দ এবং মুখে দুঃখের অন্ধকার ; কিন্তু যিনি নিরাকার আনন্দময়ের পূজা করেন, তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল এবং মুখ হাস্যপূর্ণ। যদি ভক্তের মুখে হাসি না দেখ, তবে নিশ্চয়ই জানিবে, ঠিক ব্রহ্মদর্শন হয় নাই। ব্রহ্মদর্শন

হইলেই ভক্তের মুখে সুখের হাসি প্রকাশিত হয়। যিনি নিত্য হাসিতেছেন, তাঁহাকে দেখিলে কে না হাসিয়া থাকিতে পারে? প্রসন্নবদন ঈশ্বরের হাসি ভক্তের মুখকে সহাস্য করে।......সেই হাস্য দেখিতে দেখিতে ঘন আনন্দের সঞ্চার হয়। ঠিক তোমরা যেমন পরস্পরকে দেখ, আর পরস্পরের সঙ্গে কথা কহ, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মকেও দেখা যায়, আর তাঁহার সঙ্গে আলাপ করা যায়।......হরিকে দেখিতে হইবে, হরির কথা শুনিয়া চলিতে হইবে, যদি এই মত মান, তবে আমার সঙ্গে যোগ দাও। আমি হরিকে একেবারে পূর্ণভাবে দেখিয়াছি, তাহা নহে। হিমালয় অপেক্ষা হরি উচ্চ, সাগর অপেক্ষা হরি বড়, আমি একেবারে তাঁহাকে কিরূপে দেখিব? কিন্তু হরি যতই বড় হউন না কেন, হরি আমার প্রাণের ভূষণ, হরি আমার কণ্ঠের হার, হরি আমার নয়নরঞ্জন, হরি আমার হস্তের ভূষণ। তাহা না হইলে আমি সাহস করিয়া হরির কথা বলিতাম না। হরির সঙ্গে থাকিয়া ভবিষ্যতে আমার যে কত আনন্দ হইবে, তাহার তুলনায় হরিদর্শনে হরিকথাশ্রবণে আমার যে সুখ হইয়াছে, তাহা কিছুই নহে। সকলে কেবল হরিদর্শনের কথা বল।......আসল হরিকে দেখা যায়, তাঁহার কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। তাঁহার সঙ্গে তোমরা সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন কর, নতুবা দস্যু নাস্তিকদের হস্তে পড়িয়া মরিবে। তখন বিপদে পড়িয়া আর বলিতে পারিবে না যে, আমাদের বন্ধু আমাদিগকে যথাকালে সাবধান করিয়া দেন নাই। হরিভক্তিবিহীন শুষ্ক পথে থেকো না, ডাকাতের দেশে থেকো না। যাহারা হরির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়া, ভাই-ভগ্নীগুলিকে অবিশ্বাসের অন্ধকারে এবং পাপহ্রদে ডুবায়, তাহারা ভয়ানক ডাকাত। সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, পাঁচ বার নিষেধ করিলাম। যেখানে হরিকে দেখা যায়, শুনা যায়, সেখানে এস। হরি সকলকে তাঁহার রাজ্যে নিতে এসেছেন। আজ উৎসবে সেই সমাচার দেওয়া হ'ল, সেই দেশে গিয়া চল আমরা ধন্য হই।"

বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপকগণকে গৈরিক বস্ত্রদান ও উপদেশ

মধ্যাহ্নের উপাসনানন্তর খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, মোসলমান ও হিন্দুশাস্ত্রের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন এবং গৌর-গোবিন্দ রায়কে গৈরিকবস্ত্র দেওয়া হয় ও তাঁহাদিগের প্রতি নিম্নলিখিত উপদেশ অর্পিত হয়।

"ধর্ম্মাচার্য্য অধ্যাপকগণ, সত্যধর্ম্মের অধ্যাপক তিনি, যাঁহাকে ঈশ্বর মনোনীত করেন, আহ্বান করেন এবং দীক্ষিত করেন। সত্যধর্ম্মের আচার্য্য তিনি, ঈশ্বর যাঁহাকে আচার্য্যপদে নিযুক্ত করেন। যদি তোমরা আপনারা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, মনে কর, তবে তোমাদের এই কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত। যদি মনে কর, জগদ্‌গুরু আচার্য্যের আচার্য্য তোমাদিগকে দশজনের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন, তবে এই গম্ভীর কার্য্যে জীবন সমর্পণ কর। ঈশ্বরচিহ্নিত ভিন্ন অন্য কাহারও অধ্যাপকের কার্য্য করিবার অধিকার নাই। অন্তরে অন্তরে নিয়োগপত্র দেখিবে, এবং মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল হস্ত দেখিয়া মনে আশা ও উৎসাহ সঞ্চয় করিবে। বিভুর পত্র, বিভুর হস্তাক্ষরিত নিয়োগপত্র দেখিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মস্তকে গ্রহণ কর। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর হইতে ঈশ্বরের ধর্ম্মশাস্ত্র উদ্ধার করিয়া লইবে। অবনতমস্তকে জ্ঞানবান্ সাধুদিগের নিকট সত্য সকল গ্রহণ করিবে। তাঁহাদিগের রচিত শাস্ত্র সকল যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিবে। পক্ষপাতী হইবে না, শাস্ত্রকে ঘৃণা করিবে না। মনের শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়াও, যোগী সাধুদিগের পদতলে পড়িয়া তাঁহাদিগের পরীক্ষিত সত্যসকল আদরের সহিত গ্রহণ করিবে। তোমরা যে গাত্রাবরণ পাইলে, তাহা স্মরণার্থ। ঈশ্বরচিহ্নিত প্রচারক তোমরা। আপনারা মনকে উন্নত না করিলে লোকে তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে না। তোমরা ঈশ্বর হইতে যে সকল সত্য লাভ করিবে, অকুতোভয়ে সেই সকল সত্য প্রচার করিবে। ঈশ্বর নিজেই তাঁহার সত্যের নিদর্শন। যেমন ঈশ্বরের সত্যলাভ করিয়া তোমরা জ্ঞানী হইবে, তেমনই তাঁহার পবিত্র সহবাসে থাকিয়া তোমরা চরিত্রকে নির্ম্মল রাখিবে। বুদ্ধি জ্ঞান অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। পবিত্রতা জ্ঞানের আগে গমন করে। এই গৈরিক বস্ত্র পবিত্রতার নিদর্শন। এইদেশে বহুকাল হইতে ইহা শ্রদ্ধার বস্তু। তোমাদের দ্বারা এই বস্ত্রের কলঙ্ক না হয়, তোমরা ইহা স্মরণ রাখিবে। ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তোমরা দেশবিদেশে ধর্ম্ম-প্রচার কর। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে তোমরা পড়িবে পড়াইবে, শুনিবে শুনাইবে,

শিখিবে শিখাইবে। ব্রহ্মকল্পতরুতলে বসিয়া সত্য গ্রহণ করিবে। চারিবেদ হিন্দুশাস্ত্র। তোমরা চারি জন চারি শাস্ত্র সম্মুখে লইয়া বসিয়াছ। ব্রহ্ম তোমাদিগের হৃদয়ে তাঁহার অমর অক্ষর শাস্ত্র প্রকাশ করুন। ব্রাহ্মধর্ম্মের চারি অধ্যাপক, তোমরা চারিদিকে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ণনা কর। তোমাদিগের পবিত্র চরিত্র দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ হউক, তোমাদের বাক্য অগ্নিময় হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সপ্রমাণ করুক। সেই জীবন্ত জাগ্রৎ ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তোমরা তাঁহার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত কর।"

ধ্যানের উদ্বোধন

অধ্যাপকগণ পর্য্যায়ক্রমে হিন্দু, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ এবং মুসলমান ধর্ম্মের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে শ্লোকাবলি ব্যাখ্যা করিলে, ধ্যান ও যোগ হয়। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ধ্যানের উদ্বোধন করেন। ধ্যান ও যোগে সাধকগণের সাহায্য হইবে, এই অভিপ্রায়ে ধ্যানের সমগ্র উদ্বোধনটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"গম্ভীরপ্রকৃতি ব্রাহ্মগণ, ব্রহ্মধ্যানের জন্য তোমরা প্রস্তুত হও। হৃদয়কে যত গম্ভীর করিতে পার, সাধ্যানুসারে চেষ্টা কর। লঘু ভাব, অসার বাসনা পরিত্যাগ কর। গভীর অটল ঈশ্বরের কাছে মনকেও গম্ভীর ও স্থির করা আবশ্যক। নিত্য বস্তুকে আয়ত্ত করিবার জন্য অনিত্য বস্তু ছাড়া আবশ্যক। যোগীদিগের প্রকৃতি ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে অধিকার করুক। অতি গম্ভীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সশরীরে ব্রহ্মসাগরে ডুবিতে হইবে। ঘটের কথা শুনিয়াছ? ঘটে ঘটে ব্রহ্ম বিরাজমান। ঘটের ভিতরে ব্রহ্মধ্যানের এক অঙ্গ, ঘটের বাহিরে ব্রহ্মধ্যানের অপরাঙ্গ। এই রক্তের ভিতরে রক্তরূপে প্রাণরূপে পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। যেমন রক্ত দৌড়িতেছে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মও শক্তি হইয়া দৌড়িতেছেন। শরীর-ঘট ব্রহ্মে পরিপূর্ণ। দেহের মধ্যে ব্রহ্ম। ব্রহ্মের গুরুত্ব অনুভব কর। ব্রহ্মের ভারে অসার শরীর গুরুতর হইল। ভিতরে ব্রহ্মকে পাইলাম; বাহিরেও ব্রহ্মকে লাভ করিব। ঘটকে জলে পূর্ণ করিয়া লইলাম, তারপর ঘটকে সাগরের মধ্যে নিক্ষেপ করিব। ভারি ঘট ভাসিল না, জলে ডুবিল। পূর্ণঘট কোন কালে কোন অবস্থায় ভাসে না। ব্রহ্মসাগরে ব্রহ্মপূর্ণ দেহঘট ডুবিল। হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখি, চারিদিকে ব্রহ্মজল। গলা পর্য্যন্ত, তারপর মস্তকের উপরেও ব্রহ্মজলের তরঙ্গ উঠিতেছে। অন্তর্দৃষ্টিতে

দেখি, ভিতরে ব্রহ্ম, বাহিরেও ব্রহ্ম। ভিতরের ব্রহ্মশক্তি, ভিতরের ব্রহ্মজল ক্রমাগত বাহিরের দিকে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। ভিতর বাহির এক হইল। মধ্যে নামবিশিষ্ট এক এক জন মানুষ রহিল। ভিতর বাহির ব্রহ্মময়, মধ্যে মধ্যে নামধারী এক একটি জীবাত্মা। সংসার বিলুপ্ত হইল। অসার ব্রহ্মাণ্ড উড়িয়া গেল। এখন কেবল ব্রহ্মের ভিতরে মগ্ন হওয়া বিনা আর কোন কার্য্য নাই। খুব ভাবিয়া দেখ। সঙ্গে কোন অসার চিন্তা আসে নাই ত? আসিয়া থাকিলে ভাসিয়া আবার সংসারে পলায়ন করিবে। ব্রহ্মসাগরে কত যোগী ডুবিলেন, আর ফিরিলেন না। তাঁহাদিগের ইহকাল পরকালে পরিণত হইল। আমরাও ব্রহ্মসাগরে ডুবিলাম। যে জলে ডুবিলাম, ইহার কি স্বাদ-রস আছে? হাঁ, ইহা যে সুধা। নিরাকার ব্রহ্মসাগরের রূপ, রস, গন্ধ* আছে; কিন্তু সমুদায় আধ্যাত্মিক। ব্রহ্ম কান্তিসাগর এবং ব্রহ্ম সৌন্দর্য্যসাগর। ক্রমে ক্রমে ডুবিলে ইহার মধ্যে আরও ডুবিতে ইচ্ছা হয়। ডুবিয়া যত গভীরতর স্থানে যাওয়া যায়, ততই ঘনতর মিষ্টতা লাভ করা যায়। ব্রহ্মসাগর জড় নহে, বাস্তবিক এক অনন্ত পুরুষের রূপসাগর। এক সুন্দর চিরযুবার অরূপ কান্তি। তোমাদের পরমেশ্বর লাবণ্যসাগর। তিনি এবং তাঁহার রূপ স্বতন্ত্র নহে। তাঁহার স্বরূপ এবং তিনি একই। তাঁহার রূপসাগরে ডুবিয়া আমরা তাঁহার পুণ্যের সৌরভ এবং প্রেমরসাস্বাদ করিতেছি। ধ্যান মনোহর সুখপ্রদ হউক! ব্রহ্মের ধ্যান নীরস শুষ্ক দ্রব্যের ধ্যান নহে। কলিযুগে ব্রাহ্মেরা নিরাকার রূপসাগরে ডুবিয়া সুধা খান।

"ধ্যান করিতে করিতে যোগাবস্থা লাভ করিব। এবার ধ্যান দুই ভাগে বিভক্ত হইল। ধ্যানের সময় ব্রহ্মের এক একটি স্বরূপ চক্ষের সমক্ষে অবধারণ করি। ধ্যান শেষ হইলে, অমনি যিনি সমস্ত গুণের সমষ্টি, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগসাধন করিতে আরম্ভ করি। ধ্যানেতে ব্রহ্মের এক একটি স্বরূপদর্শন, যোগেতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার সম্মিলন ও বন্ধন হয়। এই তুমি, এই তোমার লক্ষণ, এই গেল ধ্যান। ডুবিতে ডুবিতে এমন স্থানে আসিলাম, যেখানে

* চিৎসত্তা বা চিচ্ছক্তি রূপ, প্রেম রস, পুণ্য গন্ধ। ধ্যানের সময়ে অন্তশ্চক্ষুর নিকটে ক্রমে এই সকল স্বরূপের প্রকাশ ও তজ্জনিত বিশেষ স্বাদানুভব হয়। যাঁহার এই সকল স্বরূপ, যোগে তাঁহার সহিত জীবের ঐক্য ঘটে।

দেখিলাম, সকল রূপ এক স্থানে একত্র হইয়াছে। ধ্যানান্তে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের সমস্ত স্বরূপগুলি একটি বিন্দুতে আসিয়া পড়ে। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সমুদায় জ্যোতি একস্থানে ঘনীভূত হইয়া ভয়ানক উত্তাপ সৃজন করে। এইরূপ সমস্ত ধ্যান ঘনীভূত হইয়া যোগেতে পরিণত হয়। যোগেতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইয়া যায়। পূর্ণ ঘট ব্রহ্মসাগরে ডুবিতে ডুবিতে ভাসিয়া গেল। ঘটের ভিতরের জল এবং বাহিরের জল একাকার হইয়া গেল। ছোটর সঙ্গে বড়র মিলন হইয়া গেল। দ্বিধা রহিল না, অহং রহিল না। অহঙ্কার একেবারে গেল। প্রথমে ধ্যান, তৎপরে যোগ। ব্রাহ্ম, তবে যোগসাধনে বস, শরীরকে স্থির কর, গ্রীবা উন্নত কর। সমস্ত দৃষ্টিকে ভিতরের দিকে যাইতে দাও। পৃথিবী দূর হও। জয়, চিদাকাশের জয়! ক্রমে ক্রমে সেই মহাতেজোময় যোগেশ্বর প্রকাশিত হইতে থাকুন। যোগাসনে স্থির হইয়া বসিয়া সেই দয়াময় ঈশ্বরের ধ্যান করি। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে দেখা দিন এবং তাঁহার পবিত্র সহবাসমধ্যে রাখিয়া, আমাদিগের প্রতিজনের শরীরমনকে শুদ্ধ করুন।"

"ধর্ম্মপ্রচারক" বিষয়ে ভাই কেদারনাথ দের বক্তৃতা পাঠ

ধ্যান ও যোগের পর প্রার্থনা ও বক্তৃতা হয়। ভাই কেদারনাথ 'ধর্ম্ম-প্রচারক' বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ করেন। প্রকাশ্যে নববিধানঘোষণার অগ্রে কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের হৃদয়ে কি আকারে উহা প্রকাশ পাইয়াছিল, ইঁহার বক্তৃতার অন্তিম ভাগে উহা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। "মন, তুমি কি প্রচারক হইতে অভিলাষ কর? তবে আমিত্ববিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়সিংহাসনে ব্রহ্মকে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। আর ঐ আদর্শ ভক্তের রক্ত তোমার রক্তে অনুপ্রবিষ্ট হউক, তোমার আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। যদি একান্তই প্রচারব্রত-গ্রহণে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া থাক, তবে নিজের কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত করিয়া, ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হও। তুমি যন্ত্র হও, তুমি চিন্তা করিও না, তুমি কথা কহিও না, তুমি মৃৎপিণ্ড হইয়া পড়িয়া থাক। ঈশ্বর তোমাকে লইয়া, যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন। আর পূর্ব্বকালে এই দেশে এবং অন্যান্য দেশে যত ভক্ত সময়ে সময়ে আসিয়া তাঁহাদের পদধূলি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পদধূলি এবং পরলোকগত ও ইহলোকবাসী সকল নরনারীর পদধূলি এবং আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, তুমি প্রচারক্ষেত্রে অবতরণ কর, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আর এক সহজ

উপায় বলি, সত্য সত্যই যদি প্রচারক-নামের সার্থকতা নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া, মানবলীলাসংবরণ করিবার মানস হইয়াছে, তবে বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী সহজ পরিত্রাণপ্রদ নববিধান, যাহা পূর্ব্বাগত সমুদায় বিধানের চরম ফল এবং সেই সমুদায় বিধান যাহার অন্তর্গত, সেই এই সুবৃহৎ নববিধানের আশ্রয় গ্রহণ কর। যে বিধানে মধ্যস্থলে উন্নত রাজসিংহাসনে স্বয়ং ব্রহ্ম অবতীর্ণ, দক্ষিণে ঈশা, বামে চৈতন্য, সম্মুখে রাম, কৃষ্ণ, মুষা, মহম্মদ, গৌতম, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নানক, কবির, যুধিষ্ঠির, শুকদেব, জনকাদি রাজর্ষিগণ, নারদাদি দেবষিগণ, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ঋষিকন্যাগণ এবং চতুষ্পার্শ্বে সমস্ত ভক্তমণ্ডলী ব্রহ্ম-স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। কি জন্য আজ ধরাতলে এই মহাসভা আহূত হইয়াছে ? কোন্ যজ্ঞ এখানে সম্পন্ন হইবে ? ভবিষ্যদ্বংশ ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করিবে। তুমি এখন ইহার শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে ইহার মধ্যে প্রবেশ কর, মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, মানবজন্ম সফল হইবে।"

সন্ধ্যার উপদেশে কেশবের অন্তরের বিশেষ গঠন প্রদর্শন

সায়ংকালে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরের গঠন কি, সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। তাঁহার অন্তরের বিশেষগঠনপ্রদর্শনার্থ তাঁহার উপদেশের কোন কোন অংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—"এক একটি বিশেষ ভাব দেখিয়া, এক একটি ধর্ম্মদল নির্দ্ধারণ করা যায়। অমুক জাতির মধ্যে অমুক মহাপুরুষ কি বলিয়াছেন, আমরা জানিতে পারি। তাঁহার দশ সহস্র শিষ্য সেই বিশেষ ভাবের প্রচারক। বেদে এক ভাব, উপনিষদে এক ভাব, পুরাণে এক ভাব, যোগশাস্ত্রে একভাব, ভক্তিশাস্ত্রে এক ভাব, খৃষ্টধর্ম্মে এক ভাব, মহম্মদধর্ম্মে এক ভাব। এইরূপে এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এক এক ভাব। প্রায় চিরকালই মানুষ বাছিয়া এক একটি বিশেষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যখন ব্রাহ্ম চক্ষু খুলিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার চারি দিকে সহস্র সহস্র স্বর্গের রত্ন। একটিও তিনি পরিত্যাগ ক'রতে পারেন না। একটি রত্নে তাঁহার সন্তোষ হয় না। সমুদায় গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার লোভ হইল। তাঁহার হৃদয় সার্ব্বভৌমিক সত্যসকলের প্রতি অনুরক্ত। সমুদায় অঙ্গ সত্য-রত্নে ভূষিত করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। ব্রাহ্ম শিশুর ভয়ানক আব্দার। ঈশ্বর ব্রাহ্ম শিশুর সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। শিশুর মনের ভিতর উচ্চ

আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। তাহার বাহিরের ধর্ম্মগঠনের প্রণালীও অদ্ভুত হইল। ব্রাহ্ম শিশু বলিল, আমি কিছুই ছাড়িব না, চাঁদও লইব, সূর্য্যও লইব, বৃষ্টিও লইব, অগ্নিও লইব। সরলহৃদয় শিশু সম্ভব অসম্ভব জানে না। শিশু জানে না, তাহার হৃদয় ছোট, না বড়। সে সোণা, রূপা, হীরক, মুক্তা সকলই লইবে। শিশুর লোভ অসীম লোভ। শিশু ব্রাহ্ম কোন বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝে নাই, একেবারে সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই স্বর্গের শিশু কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুকরণ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সে ধর্ম্মাকাশে কোটি কোটি তারা দেখিল। সমুদায়ের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল। সে জগৎপতির সন্নিধানে এই নিবেদন করিল. আমি ইহাও লইব, উহাও লইব, সমস্ত লইব, একটিকে ছাড়িলেও আমার চলিবে না। এখন যাহা হইতেছে, তাহাত লইবই, আবার চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাও আমি লইব। ঋষিদিগের কাছে বসিয়া আমি যোগ ধ্যান শিখিব, আবার ভক্তদলের ভিতরে থাকিয়া ভক্তিসুরাপানে উন্মত্ত হইব। উৎসাহ বৈরাগ্য কিছুই ছাড়িব না। যেখানে যে কোন গভীর সত্য পাইব, অবনতমস্তকে গ্রহণ করিব।" "ব্রাহ্মদিগের একটি পরামর্শ স্থির থাকা আবশ্যক, উৎসবক্ষেত্রে একটি বিষয় বিচার করা আবশ্যক। সেই বিষয়টী এই, যাহাতে যোগের সঙ্গে ভক্তি মিলিত হয় এবং প্রেমের সহিত ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, এমন উপায় শীঘ্র অবলম্বন করিতে হইবে।……প্রতিজনকেই যোগ, ভক্তি, সেবা ইত্যাদি সমুদায় আভরণ পরিধান করিতে হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ভালবাসিতে হইবে, অথচ ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং অপর সম্প্রদায়দিগের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট রেখা রাখিয়া দিতে হইবে।……অন্যান্য ধর্ম্মদলে এখানে একটু অগ্নি, ওখানে একটু অগ্নি, এখানে একটু জল, ওখানে একটু জল, এখানে একজন যোগী, ওখানে একজন অনাসক্ত জীবন্মুক্ত গৃহস্থ; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মরাজ্যে অগ্নি এবং জল, উৎসাহ এবং প্রেম, যোগ ও ভক্তি, পবিত্রতা ও শান্তি এক স্থলে। ব্রাহ্মরাজ্যে যিনি যোগী তিনিই ভক্ত, যিনি বৈরাগী তিনিই গৃহস্থ। এ সকল আপাতবিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য করিবার জন্য, ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বর তোমাদিগকে ব্রাহ্ম করিয়াছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্ম এক একটি অমূল্য রত্ন, ব্রাহ্মধর্ম্ম একটি রত্ন নহে, কিন্তু উহা সে সমুদায় রত্নের মালা। এত দিন

বিস্তার, এখন সংগ্রহ। এতদিন স্বর্গ হইতে বৃষ্টি পড়িয়াছে, এখন একাধারে সে সমস্ত জল সঞ্চিত হইতেছে।"

সঙ্গীতপ্রচারকের অভিষেক

উৎসবান্তে, ৩০শে ভাদ্র, (১৮০১ শক; ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ) রবিবার, শ্রীযুক্ত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল সঙ্গীত-যোগে প্রচার করিবার জন্য অভিষিক্ত হন। উপাধ্যায় তাঁহাকে গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত করিয়া, বেদীর সম্মুখে উপস্থিত করিলে, আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—"তোমার সমক্ষে ভূমা পরব্রহ্ম। ত্রৈলোক্যনাথ, তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস কর। তুমি আহূত, তুমি চিহ্নিত। পরমেশ্বরকর্ত্তৃক তুমি আহূত এবং চিহ্নিত। অতএব গম্ভীরভাবে ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া, তোমার ব্রত বুঝিয়া লও। ব্রাহ্মসমাজ তোমাকে এই ব্রতে ব্রতী করিতেছেন, আমি করিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা তুমি তোমার জীবনের কার্য্যে অভিষিক্ত হইতেছ। ইহা অপেক্ষা গুরুতর সত্য এই, তোমার জীবন তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছে; তোমার প্রকৃতি, তোমার মাতৃগর্ভ তোমার ব্রতের পক্ষে প্রমাণ। আমি প্রমাণ নহি, ঈশ্বর প্রমাণ, তোমার চরিত্র প্রমাণ। ঈশ্বরের আহ্বান পুস্তকে লিখিবার বস্তু নহে। অপর লোকের দ্বারা ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বানের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বরের হস্তের পাণ্ডুলিপি অন্যত্র পাওয়া যায় না। তোমার সমস্ত জীবন এই কার্য্যের সাক্ষী। ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে তোমার জীবনের এই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমরা তোমার ভাই বন্ধুগণ চারি দিকে সাক্ষী হইয়া, এই মনোহর দৃশ্য দেখিতেছি। তোমার জীবনের সমস্ত রক্তের ভিতরে ব্রহ্মের প্রেমবিন্দু। ব্রহ্ম তোমাকে তাঁহার কার্য্যে উত্তেজিত এবং তেজস্বী করিতেছেন। ঈশ্বর নাই, ইহা যদি বলিতে পার, তবে বলিও, ঈশ্বর তোমাকে আহ্বান করেন নাই। তুমি তোমার জীবনের ব্রতে বিশ্বাস কর। ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তোমার জীবনের বিশেষ ব্রত। লোকে তোমার সঙ্গীতবিদ্যাতে দোষ দেখাইয়া দিক্, তুমি কাহারও কথায় তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিবে না; সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, এই কার্য্যে তুমি ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত। ঈশ্বর তোমার নেতা,

তাঁহার সঙ্গে লোকের মন হরণ করিবার জন্য চলিয়া যাও। তুমি ব্রাহ্মসমাজের, তুমি আপনার নহ। তোমার রসনা, তোমার গাথা বন্ধুদিগের ও জগতের নর-নারীদিগের সম্পত্তি। এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র, যাহা তোমার সমক্ষে স্থাপিত রহিয়াছে, এ সকলের উপর ঈশ্বরের পবিত্র মঙ্গল হস্ত স্থাপিত হউক, তাঁহার সংস্পর্শে এ সকল জ্বলন্ত জীবন্ত হইয়া উঠুক। এ সকল যন্ত্রযোগে তোমার কণ্ঠ হইতে যে লহরী উঠিবে, তদ্দ্বারা যেন ভ্রাতা ভগ্নীদের মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। গান করিয়া ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচার করা তোমার জীবনের বিশেষ কার্য্য। কিন্তু তুমি কি ভাবে গান করিবে? দরিদ্র ভাবে, না, ধনী ভাবে? বিনয়ী হইয়া তুমি সর্ব্বত্র হরিগুণ গান করিবে। সকল স্থান তোমার প্রচারক্ষেত্র, সর্ব্বত্র তোমার আসন। পর্ব্বতশিখরে তোমার আসন, বৃক্ষতলে তোমার আসন, সমুদ্রগর্ভে তোমার আসন, গৃহস্থ ঘরে তোমার আসন। তোমার স্থান সেখানে, যেখানে আত্মা একাকী হয়; আবার তোমার স্থান সেখানে, যেখানে নগরসঙ্কীর্ত্তন করিয়া তুমি নগর কাঁপাইয়া দিবে। শত্রুদিগের মধ্যে তোমার স্থান, বন্ধুদিগের মধ্যে তোমার স্থান। চিহ্নিত বলিয়া অভিমান করিবে না। দর্প করিলে দর্পহারী তাহা চূর্ণ করিবেন। তুমি চিহ্নিত হইলে, বিনয়ী হইয়া সকলের সেবা করিবার জন্য। এই দেশ তোমার গান শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। যদি ভক্তির সহিত গান করিতে না পার, তোমার জীবন বৃথা। তুমি যদি অবিশ্বাসী কিম্বা কপট হইয়া গান কর, তাহা হইলে তোমার ব্রতভঙ্গ হইবে। গানের অর্থ ভক্তি। গর্ব্বের অর্থ অভক্তি। সঙ্গীতের শব্দ কিম্বা স্বর ভাবিবে না; ভাবিবে কেবল ভক্তি। ভক্তি তোমার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, ভক্তি তোমার রসনার মধু। থাকে যদি তোমার ভক্তি, যাহা রচনা করিবে, তাহাই সঙ্গীত হইবে। ভক্তি নিত্যকালের সামবেদ। এই ভক্তিশাস্ত্র মস্তকে লইয়া, প্রাণ মন ব্রাহ্মসমাজের সেবায় অর্পণ কর। আমরা দেখিব, ভাই, গান করিতে করিতে তুমি ভাল হইতেছ। তুমি কেবল ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নিকটে গান করিবে, ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে তোমার গান শুনাইবার জন্য নানা স্থান হইতে তোমার নিকট লইয়া আসিবেন। অদ্যকার মনোহর দৃশ্য ভাবিয়া ধন্য হও। ভ্রাতঃ, তোমার মস্তকের উপর ঈশ্বরের পবিত্র মঙ্গল হস্ত স্থাপিত হউক।" (১৮০১শকের ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।)

"সঙ্গীতবিদ্যা ধর্ম্মের ভগ্নী" বিষয়ে উপদেশ

সঙ্গীতপ্রচারকের অভিষেকানন্তর 'সঙ্গীতবিদ্যা ধর্ম্মের ভগ্নী' এই বিষয়ে উপদেশ হয়। আমরা ঐ উপদেশের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "অনন্তকালের সামবেদ সঙ্গীতবেদ। আমরা ইহার মর্য্যাদার হানি করিতে পারি না। ঈশ্বর স্বয়ং এই অত্যাশ্চর্য্য জগন্মোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মের নিগূঢ় কঠোর সত্য সকল সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এই জন্য ঈশ্বর কোমল প্রকৃতি দিয়া সকলের মনোহরণ করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য, সঙ্গীতবিদ্যাকে পাঠাইলেন। সহস্র পুস্তকে যাহা না হয়, এক সঙ্গীতে তাহা হয়। সঙ্গীতে কঠোর হৃদয় আর্দ্র হয়, পাষণ্ড ক্রমে ক্রমে ভক্ত হইয়া উঠে। ব্রহ্মসঙ্গীত যাহাদিগকে মোহিত করে, সে সকল লোককে সংসার ভুলাইতে পারে না।……কেবল গানেতেই তাঁহারা ব্রহ্মরূপসাগরে ডুবিলেন।" "যিনি ব্রহ্মসঙ্গীত করেন, তাঁহার প্রধান লক্ষ্য এই হইবে যে, তিনি যে সকল সঙ্গীত করিবেন, তাহার দ্বারা যেন তাঁহার নিজের এবং শ্রোতাদিগের মনে ভক্তিরসের সঞ্চার এবং দুষ্প্রবৃত্তি দূর হয়। যাঁহাদিগের এরূপ লক্ষ্য, তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রচারক বলিয়া মনোনীত। তাঁহারা সঙ্গীতদ্বারা ভক্তিপ্রচার করিবার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা অনুরুদ্ধ।……যাঁহার ভাল গান করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাকে অন্য কার্য্য করিতে হয় করুন, কিন্তু তিনি জানিয়া রাখুন যে, তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য গান করা। গান করিয়া ভাই ভগ্নীদিগের মনে ভক্তিরস সঞ্চার করা তাঁহার প্রধান ব্রত। ভাল রসনা পাইবার উদ্দেশ্য এই। সঙ্গীত দ্বারা নিজে ভক্তিসুধা পান করি এবং অন্যকেও সেই সুধা পান করাইব, ইহাই ভক্তের লক্ষ্য। ইহাই অভিষেকের মূলমন্ত্র। যাঁহাদের এই ক্ষমতা আছে, তাঁহাদিগের সমক্ষে সুবিস্তীর্ণ ভক্তিরাজ্য।" "সঙ্গীতে অল্পকাল মধ্যে অনেকের প্রাণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়। অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীত করিতে পারেন, তাঁহারা একটী দলবদ্ধ হইয়া দেশ দেশান্তরে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে গিয়া ব্রহ্মনাম গান করুন। একটি একটি ছোট দল অনিমন্ত্রিত হইয়া যেখানে সেখানে গিয়া হরিগুণ গান করুন। পাঁচ সাত জন বন্ধু একত্র হইয়া স্থানে স্থানে গিয়া, সর্ব্বাগ্রে ইষ্টদেবতাকে এবং পরে পুরাতন ও বর্ত্তমান সাধুদিগের পবিত্র আত্মা-সকলকে স্মরণ করিয়া, একটি প্রার্থনার গান করিয়া

ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তন কর। দীর্ঘ প্রার্থনা করিবে না, দীর্ঘ উপাসনা করিবে না। আপনার দেবতাকে আপনি গান করিয়া শুনাইবে। যখন আপনার গানে আপনি মোহিত হইবে, তখন পথিকেরা ও নগর এবং পল্লীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তোমাদের গান শুনিয়া মোহিত হইবে। তোমরা ঈশ্বরের নিকট গান করিয়া কেবল আপনাপনি মোহিত হইতে চেষ্টা করিবে, ঈশ্বর তোমাদের গান দ্বারা তাঁহার অন্যান্য সন্তানদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবেন। তোমরা এমন কি কোন বস্তু পাও নাই, এমন কি এক জনকেও পাও নাই, যাঁহার মনোহর রূপ দেখিলে তোমাদের প্রেমাশ্রু পড়ে? আপনারা মাতিয়া জগৎকে মাতাও। আপনারা মোহিত হও, টলিয়া পড়। প্রাণেশ্বরের গুণ-গান করিয়া তাঁহার রাজ্যবিস্তার কর। হরিগুণগানভিন্ন অন্য কথা কহিও না। কিছুমাত্র বক্তৃতা করিও না। তোমরা ভক্তির সহিত কেবল ঈশ্বরকে ডাকিবে, ঈশ্বর ডাকিবেন তাঁহার সন্তানদিগকে। সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া তোমরা আপনারা আনন্দিত হও, ব্রহ্ম তাঁহার আপনার লোকদিগকে আনিয়া তাঁহার আনন্দের রাজ্য দিন দিন বিস্তার করিবেন।"(১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।)

বেলঘরিয়া তপোবনে ব্রাহ্মসম্মিলন ও তথায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের আগমন

৩১শে ভাদ্র (১৮০১ শক; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ) বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে ব্রাহ্মসম্মিলন হয়। তথায় পরমহংস রামকৃষ্ণ আগমন করেন। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই আশ্বিনের) লিখিয়াছেন:—"বিগত ৩১শে ভাদ্র বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে ২৫।৩০ জন ব্রাহ্ম সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংসমহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বরপ্রেম ও মত্ততা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। এমন স্বর্গীয় মধুরভাব আর কাহার জীবনে দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে 'ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্য-লৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।' 'ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হয়েন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নামগান করেন, কখন তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে

অশ্রুবিসর্জ্জন করেন।' পরমহংসমহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। তিনি সে দিন ঈশ্বরদর্শন, যোগ ও প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কত বার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কত বার হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, সুরামত্তের ন্যায়, শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয়ভাবদর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হয়, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা, নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যায়।" ৬ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ), রবিবার, পরমহংস কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করেন। সে দিন সমাধির অবস্থায় তাঁহার ফটোগ্রাফ (১) তোলা হয়।

---

(১) এই ফটোগ্রাফ হইতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিলিপি লইয়াছেন। তাঁহারা পরমহংসের ফটোগ্রাফ তাঁহার জীবিতাবস্থায় লইতে পারেন নাই। (সম্পাদক)

৩

প্রচারযাত্রা

কেশবচন্দ্র সদলে পূজার বন্ধের সময়ে পশ্চিমে প্রচারে যাত্রা করিবেন, এইরূপ স্থির হয়। পূজার বন্ধের সময়ে বন্ধুগণ স্ব-স্ব-কর্ম্মস্থলে উপস্থিত থাকিবেন না, অতএব প্রচারযাত্রার সময় পরিবর্ত্তন করা হউক, এইরূপ তাঁহাদের নিকট হইতে অনুরোধ আসাতে, বন্ধের সময়ে পশ্চিমে গমন স্থগিত হয়। কিন্তু অচিরে কার্য্যারম্ভ করা শ্রেয়; জানিয়া, সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় কার্য্যারম্ভ হয়। ২৯শে আশ্বিন, ১৮০১ শক (১৪ই অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃঃ) গোল-দীঘির ধারে কেশবচন্দ্র প্রায় সাত শত শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া 'ঈশ্বর কি সত্যই আছেন' এই বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার সার মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্বে তৎকালে প্রকাশিত হয়। আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা কার্ত্তিকের) হইতে উহার সার উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"ঈশ্বর কি সত্যই আছেন?"

"গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে গোলদীঘির ধারে ভক্তিভাজন আচার্য্যমহাশয় 'ঈশ্বর কি সত্যই আছেন?' এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করেন। প্রায় সহস্র লোক তাঁহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধার সহিত এই বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। জড়জগৎ এবং প্রাণিজগৎ অপেক্ষাও ঈশ্বরের সত্তা অসীমগুণে দৃঢ় ও উজ্জ্বল, বক্তা ইহা জলন্ত উৎসাহ ও অলৌকিক তেজের সহিত সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, সাধারণ লোক আপনার এবং জগতের অস্তিত্বে কখনও সন্দেহ করে না; কিন্তু তাহারা এমনি মূঢ়, জড়াসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ যে, সহজে ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে পায় না। তাহাদিগের জড়তা এবং পশুভাব তাহাদিগের আত্মাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদিগের মনশ্চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, মিথ্যা বিজ্ঞান অথবা মিথ্যা ন্যায়শাস্ত্র নাস্তিকতার কারণ; কিন্তু গূঢ়ভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, জঘন্য সংসারাসক্তিই নাস্তিকতার যথার্থ কারণ। পূর্ব্ব

কালে যে সকল আর্য্য মুনি ঋষি সংসারাসক্তি ছেদন করিয়া যোগ তপস্যা করিতেন, তাঁহারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতাগর্ব্বিত অল্পবিশ্বাসী এবং নাস্তিকেরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে দূরে থাকুক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত। ইহা কেবল অতিরিক্ত জড়াসক্তি এবং পাপবিকারের বিষময় ফল। স্বভাবতঃ মনুষ্য আস্তিক। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা মনুষ্যের স্বভাব। নিতান্ত বিকৃত না হইলে, মনুষ্য এই বিশ্বাসকে নিস্তেজ করিতে পারে না। এই বিশ্বাস যতই উজ্জ্বলতর হয়, ততই সকল প্রকার বিলাসলালসা ছাড়িতে হয়; এই জন্য পাপাসক্ত লোকেরা এই ব্রহ্মবিশ্বাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়পর লোকেরা দেখিতে পায়, জীবন্ত ঈশ্বর সর্ব্বত্র উপস্থিত রহিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিলে আর তাহাদিগের কুবাসনা চরিতার্থ হয় না; এই জন্য তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্তরস্থ ব্রহ্মজ্ঞানকে মলিন করিয়া ফেলে। তাহারা বিশ্বাসের জীবন্ত ঈশ্বরকে অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়া, তাহাদিগের মনের মত এক কল্পিত সুবিধার দেবতা গঠন করিয়া লয়। কখন কখন তাহাদের খুসী হইলে সেই মিথ্যা দেবতার নিকটে কপট প্রার্থনা করে। সেই প্রার্থনা দ্বারা তাহারা শুদ্ধ এবং সুখী হইবে দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগের অপবিত্রতা এবং অশান্তি বৃদ্ধি হয়। প্রকৃত আস্তিক এই কল্পিত দেবতাকে ঘৃণা করেন। তাঁহার ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। তিনি দেখিতে পান, তাঁহার শরীরের রক্তনদী সেই ঈশ্বরের শ্রীচরণরূপ নিরাকার হিমালয় হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে, এবং সেই ঈশ্বর তাঁহার শারীরিক মানসিক সমুদায় শক্তির মূলশক্তি। তাঁহার শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা সকলেই আস্তিক। সকলেই অবিশ্রান্ত বলিতেছে, 'ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন।' যেমন বাষ্প ভিন্ন বাষ্পীয় শকট নড়িতে পারে না, সেইরূপ মূলশক্তি ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের কোন প্রকার শক্তি পরিচালিত হইতে পারে না। ঈশ্বর না খাওয়াইলে কেহ খাইতে পারে না, তিনি না পান করাইলে কেহ পান করিতে পারে না। ঐ গোলদীঘির জলকে জিজ্ঞাসা কর, জল, তুমি কোথা হইতে আসিলে? ঐ শুন, জল বিশ্বরাজের অধীন হইয়া বলিতেছে, 'প্রভু পরমেশ্বর আমাকে এখানে রাখিয়াছেন। আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই।' সামান্য জড় জল আস্তিক হইল, মনুষ্যগণ, তোমরা

কিরূপে নাস্তিক হইবে? ঈশ্বর জলপান করান, তাই জলপান করি; ঈশ্বর বাঁচাইয়া রাখেন, তাই বাঁচিয়া আছি। অতএব আমি জলপান করি, আমি অমুক কার্য্য করি, এইরূপ অহঙ্কার এবং নাস্তিকতা-পূর্ণ ভাবা ব্যবহার করিয়া ঈশ্বরকে আর ঢাকিয়া রাখিও না। আমি জীবন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক, অলীক অদ্বৈতবাদের দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমার ঈশ্বর জগজ্জীবন, জগতের পিতা, তিনি আবার জগতের মাতা জগদ্ধাত্রী। আমাদের দেশে শাক্তেরা ঈশ্বরকে জননীর ন্যায় এবং বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে পুরুষের ন্যায় জ্ঞান করেন। বর্ত্তমান নূতন বিধান এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য। এবার জগজ্জননী হিন্দু, খ্রীষ্টান, মোহম্মদীয় প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মের সার সত্য সকল সঙ্গে লইয়া, ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়াছেন। স্বর্গের জননী অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি দেখাইয়া, জগতের মন হরণ করিবেন। রাজরাজেশ্বরীর স্নেহরাজ্য এই ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। দেশীয়গণ, ভ্রাতৃগণ, তোমরা আসিয়া তাঁহার শরণাগত সন্তানদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি কর। তোমাদের ধনের অভাব কি? সত্যের অক্ষয় ধনাগার তোমাদের জন্য অবারিত। তোমাদের এই অনুগত ভৃত্য এবং বন্ধু বিনীতভাবে তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছে, তোমরা এস। আর ভারতের দুর্দ্দশা সহ্য হয় না। শুষ্ক জ্ঞানগত বিশ্বাসে ভারতের পরিত্রাণ নাই। তোমরা ভক্তবৎসলা ভগবতী জগদ্ধাত্রীকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া এবং দেখাইয়া, ভারতের দুঃখ দূর কর।” মিরারে ইংরাজীতে এই বক্তৃতার যে সার বাহির হয়, তন্মধ্য হইতে এই অংশটী আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি:—“অহঙ্কৃত, গর্ব্বিত, জ্ঞানপ্রধান মানবগণ, তোমরা কি জান না যে, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির? তাঁহার বিদ্যমানতার প্রমাণের জন্য বৃন্দাবন বা কাশীতে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলিতেছে, ‘ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন।’ এই ঈশ্বরের অপরোক্ষ জ্ঞান আমায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে। আমি এ জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারি না। এ জ্ঞান সর্ব্বাভিভবকারী সর্ব্বগ্রাসী, আমি কিছুতেই ইহাকে তাড়াইতে পারি না। তাহারা বলে যে, ঈশ্বর সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় নহেন, কিন্তু আমার দর্শনশাস্ত্র আমায় বলে, ঈশ্বরকে চিন্তা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া অসম্ভব।”

৭ই কার্ত্তিক (১৮০১ শক; ২৩শে অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃঃ), বৃহস্পতিবার, গঙ্গার অপর পারে হাওড়ায় এবং ৯ই কার্ত্তিক (২৫শে অক্টোবর), শনিবার, নৈহাটীতে প্রচারযাত্রা হয়। আমরা ঐ উভয় স্থলের কার্য্যবিবরণ প্রচারযাত্রী ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের লেখা (১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হাওড়া

"৭ই কার্ত্তিক (২৩শে অক্টোবর), বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে, আচার্য্যমহাশয় ও প্রচারকগণ এবং অপর কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু 'সত্যমেব জয়তে' অঙ্কিত বৃহৎ পতাকা সহ হাওড়ায় উপস্থিত হন। ৫টার সময়ে তথাকার গিরজার মাঠে বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন হওয়ার কথা ছিল। বৃষ্টি হওয়াতে সেই সময় কার্য্যারম্ভ হইতে পারে নাই। ৬টার সময় বৃষ্টির বিরাম হয়, তখন সকলে মাঠে উপস্থিত হয়েন। মৃদঙ্গ করতাল সহ সঙ্কীর্ত্তন হইলে পর আচার্য্যমহাশয় গম্ভীরস্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। 'মনুষ্যজীবনের সঙ্গে ঈশ্বরের জীবন্ত সম্বন্ধ' বক্তৃতার বিষয় ছিল। বক্তা জলন্ত উৎসাহানলে প্রদীপ্ত হইয়া গভীর আধ্যাত্মিক ভাব সকল সুললিত ভাষায় নানা উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কাররূপে শ্রোতাদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। দুই শত আড়াই শত লোক প্রায় এক ঘণ্টা কাল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তার মুখের বিশ্বাস-প্রদীপ্ত ভাব দর্শন ও তাঁহার রসনানিঃসৃত জলন্ত জীবন্ত সত্য সকল শ্রবণ করিয়াছিল। বক্তৃতান্তে দুইটি সঙ্কীর্ত্তন হইয়া সে দিনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

নৈহাটী

"৯ই কার্ত্তিক (২৫শে অক্টোবর), শনিবার, একটার সময় বাষ্পীয়শকটযোগে আচার্য্যমহাশয় ও প্রায় সমুদায় প্রচারক এবং কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় ব্রাহ্মবন্ধু সর্ব্বশুদ্ধ ৩২।৩৩ জন নৈহাটী গ্রামে যাত্রা করেন। সকলেই চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীতে একযোগে যাইবেন বলিয়া টিকেট ক্রয় করেন, কিন্তু আচার্য্যমহাশয় ও তাঁহার ২।৩ জন বন্ধু ট্রেণ মিস্ করিলেন। তিনটার সময় বক্তৃতা হইবার কথা ছিল, চারিটার পর অপর ট্রেণে আচার্য্যমহাশয় উপস্থিত হন। প্রায় পাঁচটার সময় একটি সঙ্কীর্ত্তন হওয়ার পর বক্তৃতারম্ভ হয়। ষ্টেশনের অদূরে, বড় রাস্তার পার্শ্বে, সব্‌রেজিষ্টরের অফিসের রোয়াকে বক্তৃতার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আচার্য্যমহাশয়

সেই উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় জ্বলন্ত উৎসাহে গম্ভীরস্বরে চন্দ্র, সূর্য্য, নদ, নদী, বৃক্ষ লতাদি প্রকৃতি যে সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরের সত্তা প্রচার করিতেছে, নিরাকার ঈশ্বরকে যে করতলন্যস্ত আমলকফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ করা যায়, ইহা অগ্নিময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন। প্রায় চারি শত (পাঁচ শত) শ্রোতা উপস্থিত ছিল। নৈহাটী অতি জনাকীর্ণ ভদ্রগ্রাম, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ভদ্রলোক ছিলেন, নানা শ্রেণীর সামান্য লোকও অনেক ছিল। শ্রোতাদিগের অনেকে বক্তৃতার মধুরভাবে আকৃষ্ট হইয়া আনন্দ ও উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ বলা হইলে, বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বক্তা ও শ্রোতা বৃষ্টির জলে স্নান করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রোতৃবর্গ এমনি ভাবে মোহিত হইয়াছিলেন যে, বৃষ্টিতে ভিজিয়াও স্থিরভাবে বক্তার মুখের দিকে তাকাইয়া শুনিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টারও অধিক কাল বক্তৃতা হয়, পরে মৃদঙ্গ করতাল সহ প্রমত্তভাবে কয়েকটি সঙ্কীর্ত্তন হইলে, নগরসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে সেই আর্দ্রবসনে তারিণীচরণ সরকারের ভবনাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনটি সুন্দর পতাকা বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছিল। দুইটিতে 'সত্যমেব জয়তে' অপরটীতে 'Come all nations unto the true God.' (সত্য ঈশ্বরের নিকটে সমুদায় জাতি আগমন কর) এই কথা অঙ্কিত ছিল। ব্রহ্ম-নামের ধ্বনির সঙ্গে ভেরীর গম্ভীর ধ্বনি আকাশকে নিনাদিত করিল। রজনীতে আমরা এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সরকারের ভবনে উপস্থিত হই। গৃহস্বামী বৃদ্ধ ভক্তিমান্ সমৃদ্ধ হিন্দু। তিনি স্বয়ং আলো ধারণ করিয়া, সবান্ধবে উপস্থিত হইয়া, কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ গান হইলে পর, তিনি অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে অন্তঃপুরে লইয়া যান। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পরম যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত আতিথ্যসৎকার করেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর, তাঁহার প্রতিবেশী কয়েকটি শিক্ষিত ভদ্রলোক উপদেশের প্রার্থী হইয়া, আচার্য্যমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হন। একজন উপাসনা ও পরলোকাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন, অনেকক্ষণ তাঁহাদের সহিত সৎপ্রসঙ্গ হয়। প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া সকলে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। তৎপর বহির্ভবনে অনেক লোক সমাগত হন।

তাঁহাদের মধ্যে দুই তিন জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। সেখানে সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল। এক জন পণ্ডিত ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে আচার্য্যমহাশয়ের সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ করেন। প্রায় দ্বিতীয়প্রহর রজনী এইরূপে আনন্দে যাপিত হয়।

গৌরীভা

"১০ই কার্ত্তিক (২৬শে অক্টোবর), রবিবার দিন পূর্ব্বাহ্নে ৮।৯টার সময়ে, সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়েন, বাঁধা ঘাটে স্নানাবগাহন করিয়া নৌকায় আরোহণ করেন। চারিখানা নৌকা একত্র বাঁধিয়া গৌরীভা গ্রামাভিমুখে চালনা করা হয়। ভাগীরথীর বক্ষে ব্রহ্মোপাসনা নামকীর্ত্তন হইতে লাগিল, ভাগীরথীর স্রোতের সঙ্গে মধুময় ব্রহ্মনামধ্বনি ও ভক্তিস্রোত মিশিল। 'সত্যমেব জয়তে' পতাকা গঙ্গার বক্ষে উড়িতে লাগিল, প্রকৃতির শোভার ভিতর দিয়া জগজ্জননীর সুন্দর মুখ প্রকাশ পাইল। উপাসনা অতি গভীর ও সুমিষ্ট হইল। নৌকা গৌরীভাগ্রামের ঘাটে যাইয়া পঁহুছিল। সকলে তীরে নামিলেন এবং সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ......আমরা আচার্য্য মহাশয়ের পৈতৃক ভবনে প্রবেশ করিলাম; অট্টালিকা সকলের জীর্ণ শীর্ণ ভাব, প্রকাণ্ড নাট্যমন্দিরের ছাদ হইতে ইট খসিয়া পড়িতেছে, কতকটা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ভবনের অবস্থা দেখিয়া মনে দুঃখ হইল। সেখান হইতে আচার্য্য মহাশয়ের এক জ্ঞাতির বাড়ীতে উপস্থিত হই। বহির্ভবনে কতক্ষণ কীর্ত্তন হয়, পরে গান গাহিতে গাহিতে নৌকাভিমুখে যাত্রা করা যায়।......বেলা দুপ্রহরের সময় নৈহাটির ঘাটে উপস্থিত হই। ঘাট হইতে পুনরায় কীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ মহাশয়ের ভবনে উপনীত হওয়া যায়। তখন প্রচারক মহাশয়গণ খেচরান্ন রন্ধন করিয়া সকলকে খাওইয়াছিলেন।...

চুঁচড়া

"বেলা প্রায় চারিটার সময় (১০ই কার্ত্তিক) গঙ্গার অপর পারে চুঁচড়ার অভিমুখে যাত্রা করি। পূর্ব্বানুরূপ কীর্ত্তন করিয়া যাত্রা করা গেল। গ্রামের লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিল, ঘাটে খুব জনতা হইল, আমরা নৌকায় আরোহণ করিলাম। সকলে বিষণ্ণবদনে একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। এই সময় অতি

আশ্চর্য্য দৃশ্য হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গের ১০।১২ জন বন্ধু এখানেই কলিকাতার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমরা ২০।২১ জন চুঁচড়া নগরে যাত্রা করিলাম। চুঁচড়া হইতে দুই জন ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া নদীতেই আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। হরিনামের ধ্বনি, ব্রহ্মনামের ধ্বনি করিতে করিতে, ভাগীরথী পার হইয়া আমরা চুঁচড়ায় উপনীত হইলাম। পাঁচটার পর চুঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের রোয়াকে বক্তৃতা করিবার জন্য আচার্য্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইলেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালা বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত লোক উপস্থিত দেখিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়। দেখিতে দেখিতে রোয়াকের সম্মুখস্থ প্রশস্ত ভূমি ৭।৮ শত লোকে পূর্ণ হইল। কয়েক জন সাহেবও আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। নিরাকার ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা যে উজ্জ্বলরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, জলন্ত বিশ্বাস ও উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া অগ্নিময় বাক্যে তিনি তাহা প্রমাণিত করিতে লাগিলেন। প্রেমে মত্ত ধর্ম্মবীর কাহাকে বলে, এই কয় দিন বক্তাকে দেখিয়া স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে। সত্যের তেজ, বিশ্বাসের বল তিনি আশ্চর্য্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। বক্তৃতার মধুরতায় চুঁচড়ার শিক্ষিত লোক বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হয়, তৎপর সঙ্কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যার পর আচার্য্যমহাশয় মন্দিরে উপাসনা করেন; দেড় শত দুই শত লোক উপস্থিত ছিলেন। এক জন ধনীর সুন্দর উদ্যান-বাটীতে আমরা রাত্রি যাপন করি।

হাটখোলার ঘাট

"প্রত্যূষে (১১ই কার্ত্তিক, ২৭শে অক্টোবর) কয়েক জন প্রচারক ও ব্রাহ্মবন্ধু একতারা ও খোল করতাল বাদ্য সহ ব্রহ্মের অষ্টোত্তর-শতনাম গান করিয়া পাড়া ভ্রমণ করিয়া আসেন। স্নানান্তে সেই উদ্যানস্থ লতাপাদপবেষ্টিত একটি মনোহর স্থানে উপাসনা হয়। সেই উপাসনায় চুঁচড়ার অনেক ব্রাহ্ম আসিয়া যোগদান করেন।......আহারান্তে বেলা তিনটার সময় শ্যামনগরাভিমুখে যাত্রা করা যায়।......কতক দূর চলিয়া আসিলে, শ্যামনগর পঁহুছিতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া, ফরাসডাঙ্গায় উত্তীর্ণ হই। গঙ্গাতীরস্থ হাটখোলার বৃহৎ বাঁধা ঘাটে বসিয়া নামকীর্ত্তন আরম্ভ করা হয়। আচার্য্যমহাশয় গেরুয়া উত্তরীয় স্কন্ধে ও একতারা যন্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া,

ব্যাঘ্রচর্ম্মে মধ্যস্থলে উপবেশন করেন। কেশববাবু দলবলে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ নগরে প্রচার হয়। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ দৌড়িয়া আসিল; বাঁধাঘাটে লোকারণ্য হইল। ভদ্র অভদ্র নরনারী সকলে স্থিরভাবে ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ অন্তর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে এক জন ভদ্রলোকের ভবনে উপনীত হওয়া গেল।......সে দিন রাত্রি প্রায় ১০টার সময় বাষ্পীয় শকটযোগে ফরাসডাঙ্গা হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হই।...”

কলিকাতা—দ্বিতীয় শারদীয় উৎসব—“অন্নে ব্রহ্ম” উপদেশ

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া, কেশবচন্দ্র ১৩ই কার্ত্তিক (২৯শে অক্টোবর), বুধবার, শারদীয় উৎসব করেন। পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ‘অন্ন ব্রহ্ম নন, অন্নে ব্রহ্ম,’ এই বিষয়ে উপদেশ (১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) হয়। “প্রাচীন কালের ভক্তসকল অন্নকে ব্রহ্ম জানিয়া অন্নপূজা করিতেন, পৌরাণিক সময়ে সাধকেরা তত উচ্চ অদ্বৈতবাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, লক্ষ্মীর হস্তে অন্নকে রাখিয়া, লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন ঘোর কলি আপনার অযথার্থ সভ্যতা লইয়া আসিল, তখন উহা অন্নকে একেবারে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিল। কোথায় অন্ন খাইয়া প্রাচীনেরা ধার্ম্মিক হইতেন, আর কোথায় সেই অন্ন খাইয়া আধুনিকেরা অসুরের ন্যায় অসৎকার্য্য করিতে লাগিল। যথার্থ ভক্তেরা অন্নের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন; তাঁহারা অন্নকে ব্রহ্ম বলিলেন না; কিন্তু অন্নের ভিতরে ব্রহ্ম আছেন, ইহা স্বীকার করিলেন। কোন সৃষ্টবস্তু সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না, অন্ন লক্ষ্মী নহে, কিন্তু অন্ন স্বর্গীয় বস্তু। অন্ন যোগীর হৃদয়ের রক্ত, অন্ন আত্মার ভক্তি বৃদ্ধি করে, অন্নের ভিতরে ব্রহ্মের সিংহাসন। প্রত্যেক অন্নখণ্ডের মধ্যে স্বয়ং প্রভু ভগবান্ বাস করেন, অন্ন দেখিয়া ভক্ত কাঁদেন। ভক্ত বলেন, হে অন্ন, তুমি যদি না আসিতে, তবে কি মনুষ্য বাঁচিত? তোমার ভিতরে রক্ত বিরাজ করিতেছে, তুমি শক্তিদাতা, বলবিধাতা, তেজের কারণ।......অন্নের মধ্যে দেববল। প্রত্যেক অন্নখণ্ডের মধ্যে যোগীর রক্ত, ভক্তের রক্ত লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রকাণ্ড ধান্যক্ষেত্র প্রকাণ্ড রক্তসাগর। যে রক্তের বলে ভক্ত হরিসেবা করেন, সেই বল হরি প্রথমতঃ ধান্যক্ষেত্রে

উৎপাদন করেন।……শারদীয় উৎসবে ধান্যক্ষেত্রে গিয়া ধান্যক্ষেত্রের ঈশ্বরকে দেখ।..এই শস্য ব্রহ্মভক্তের রক্ত হইবে। হরির চাউল, মার অন্নকে তাচ্ছীল্য করিও না। জগজ্জননীর স্নেহলক্ষ্মী ধান্যরূপে চাউলরূপে প্রতি ঘরে যাইতেছে। লক্ষ্মীর লক্ষ্মী অন্নদাতা যিনি, এস, এই শারদীয় উৎসবে তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। ঈশ্বর খেলা করিতে করিতে, প্রতিজনের বাড়ীতে লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণ হইয়া, অন্নের ভিতর দিয়া আমাদিগের বল, বীর্য্য এবং ভক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন ধন-ধান্যের মধ্যে তাঁহাকে মা জগজ্জননী, জগতের লক্ষ্মীরূপে দেখিয়া শুদ্ধ ও সুখী হই।"

দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা

বেলা একটার সময়ে (১৩ই কার্ত্তিক) নৌকাযোগে সকলে দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করেন। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই কার্ত্তিকের) লিখিয়াছেন:—"এক খানা বজ্রা, ছয় খানা ভাওয়ালিয়া ও দুই খানা ডিঙ্গী প্রায় আশি জন যাত্রী লইয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। যাত্রিকদিগের মধ্যে ১০।১২ জন ব্রাহ্মিকা ছিলেন। বজ্রা পতাকা ও পুষ্পপল্লবালঙ্কৃত হইয়াছিল। খোল, করতাল ও ভেরীর ধ্বনি সহ গমন করিতে করিতে সকলে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাঁধাঘাটে পঁহুছিলে, পরমহংসমহাশয়ের ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর বজ্রায় আসিয়া, প্রমত্তভাবে, 'জাহ্নবীতীরে হরি বলে কেরে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে, নৈলে কেন তাপিত পরাণ অন্তর শীতল হতেছে, হরিনামের ধ্বনি শুনে পাষণ্ডদলন হতেছে'. এই গানটি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকদল ভক্ত মত্ত হইয়া যোগ দিলেন। অতি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল। পরে সকলে গান করিতে করিতে পরমহংসমহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন। 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-রূপানন্দঘন' সকলে এই সঙ্কীর্ত্তনটি করিতে করিতে, পরমহংসের সাধনভূমি হইয়া, তাঁহার নিকটে চলিয়া আসিলেন। গানশ্রবণে ও ভক্তগণের সমাগমে পরমহংস মহাশয়ের মূর্চ্ছা হইল। সমাধিভঙ্গ হইলে, পরব্রহ্মস্বরূপ ও আমিত্বনাশ বিষয়ে তিনি কয়েকটী চমৎকার কথা বলেন। সন্ধ্যার সময় বান্ধাঘাটে সংক্ষেপে উপাসনা হয়। আচার্য্যমহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া চন্দ্র ও ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দান করেন, তাহাতে ব্রহ্মপ্রেমের গভীরতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হয়। উপদেশের মধুরভাবে পাষাণহৃদয় বিগলিত হইয়া প্রেমধারা প্রবাহিত

হয়। উপদেশশ্রবণে পরমহংসমহাশয় পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। প্রার্থনান্তে ঈশ্বরের মাতৃভাবের একটি নূতন রচিত সুমধুর সঙ্গীত হয়। তাহাতে পরমহংসমহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকলকে মত্ত করিয়া তোলেন। 'মধুর হরি-নাম নিস্ রে জীব যদি সুখে থাকবি আয়' সুমধুরস্বরে এই গানটি করিয়া সকল লোককে মোহিত করেন। তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা করা যায় না। রাত্রি ৮ টার সময় সকলে কলিকাতায় যাত্রা করি। গত বৎসর অপেক্ষা এবার শারদীয় উৎসব অধিকতর মধুর ও জমাট হইয়াছিল।"

"চন্দ্র ও গঙ্গা" বিষয়ে উপদেশ

দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে (১৩ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর, সায়ংকালে) যে উপদেশ (১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) হয়, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিঃ— "ভক্তগণ, ভক্তির সহিত আজ একবার পূর্ণচন্দ্র দেখ। দেখ, এই পূর্ণিমার চন্দ্র কাহার চন্দ্র? আমাদের হরির চন্দ্র। আমাদের প্রাণের হরি আকাশে চাঁদ ধরিয়া বসিয়া আছেন। ভুবনমোহন হরি চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ভিতরে থাকিয়া ভক্তের মন মজাইতেছেন। হে চন্দ্র, আজ তুমি পূর্ণমাত্রায় জ্যোৎস্না বিতরণ করিতেছ, তোমাকে দেখিয়া আজ জীবের কত আহ্লাদ হইতেছে। আজ তুমি জাহ্নবীর শোভা দশগুণ বৃদ্ধি করিলে। আমার প্রাণের হরির চন্দ্র, সুধার আধার, তুমি আমার কাল হৃদয়কে সুন্দর করিলে। চন্দ্র, তুমি যাঁহার চন্দ্র, তাঁহাকে দেখাইয়া দেও। তুমি ভক্তির চন্দ্র, প্রেমচন্দ্র হও। যাঁহার প্রেমমুখ দেখিলে ভক্তের হৃদয় চক্ষের জলে ভাসে, যাঁহাকে স্মরণ করিয়া পরম ভাগবত চৈতন্যের প্রেম উথলিত হইত, সেই মা জগজ্জননীকে তুমি দেখাইয়া দেও। আজ ঈশ্বর কোথায়? যথার্থই জগজ্জননী আমাদের কাছে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ, তোমরা সেই মার ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ। ভুবনমোহিনী মার রূপের সঙ্গে এই পূর্ণিমার চন্দ্রের তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার পায়ের তলায় এমন কোটি কোটি চন্দ্র গড়াইতেছে। সেই মা, বন্ধুগণ, আমাদিগকে ভালবাসেন। পৃথিবীর মা অপেক্ষাও তিনি আমাদিগকে সহস্র-গুণে ভালবাসেন। হে চন্দ্র, হে ভাগীরথি, তোমরা বল না, আমাদের সেই চিদানন্দময়ী মা কোথায়? মা তাঁহার অমৃতনিকেতনে আমাদিগের জন্য

কত সুখরত্ন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। জীব তরাইবার জন্য মা তাঁহার স্নেহের ভাণ্ডার খোলা রাখিয়াছেন।

"ভক্তগণ, এখন এক বার গঙ্গার প্রতি তাকাইয়া দেখ। গঙ্গা কেমন আনন্দের সহিত হরির শ্রীচরণ ধুইয়া দিতেছে। হিমালয় হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা কত শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিতেছে। গঙ্গা নিঃস্বার্থভাবে জমিদার কাঙ্গাল সকলেরই সেবা করে, সকলকে ধৌত করে, সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে, সকলকেই জল দেয়। লক্ষ লক্ষ কলস জল উঠিতেছে, তবুও গঙ্গার জল ফুরায় না। ভক্ত, তুমিও এই নদীর ন্যায় হও। গম্ভীর প্রশান্ত জল ফুরায় না। পৃথিবীর সামান্য জ্ঞানের জল ফুরাইয়া যায়; কিন্তু হরিভক্তের প্রেমজল শুকায় না। ভক্ত, তোমার প্রাণের ভিতরে এক দিকে যেমন সর্ব্বদা প্রেমচন্দ্র উদিত থাকিবে, অপর দিকে যেন সর্ব্বদা ভক্তিজাহ্নবী বহিতে থাকে। ভক্ত যে তাঁহার নিজের হৃদয়ে কি অনির্ব্বচনীয় সুধারস আস্বাদন করেন, তাহা কেবল ভক্তই জানেন। দয়ার চন্দ্র প্রেমজলধি যিনি, তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, কি আর সুখের সীমা থাকে? চারি দিকে কেমন সুন্দর দৃশ্য!! আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র, নীচে একটানা গঙ্গা, গঙ্গার দুই দিকে নানাপ্রকার বৃক্ষলতা ও ধান্যক্ষেত্র। এ সমস্ত শারদীয় উৎসবের অনুকূল।

"মা জগজ্জননি, এস, কাছে এস; আর কেন বিলম্ব কর? মা, তোমার প্রেমনদীতে আমাদিগকে ডুবাইয়া দেও। মা, তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব, আর হাসিব, কাঁদিব, গাইব, নাচিব, আর মনে আনন্দ ধরিবে না। মা, তোমার ছেলেদের সকল পাপের বন্ধন কাটিয়া দেও। আর সংসারে ডুবিব না। জননীর কাছে বসে সকলে মিলে খুব আনন্দের সহিত জননীর পূজা করিব। মা, তুমিত সুন্দর আছই; কিন্তু তোমার ভক্তেরা যখন তোমার পূজা করেন, তখন বিশেষরূপে তোমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। মা, তোমার মনের বড় সাধ যে, তুমি জীব তরাইবে; তোমার সাধ তুমি মিটাও। এয়েছ, জননি, আমাদের নিকটে বস, আমাদের মস্তকের উপর তোমার মঙ্গল হস্ত স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরকাল, হে করুণাময়ি ঈশ্বরি, আমরা তোমারই থাকি।"

ফরাসডাঙ্গা

শারদীয় উৎসবসমাপনের দুদিন পরে পুনরায় প্রচারযাত্রার আরম্ভ হয়। ভাই গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রচারযাত্রাবিবরণে (১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে) লিখিয়াছেন:—"গত ১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০১ শক (১লা নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু ও প্রচারক সহ পুনরায় ফরাসডাঙ্গায় উপনীত হন। সে দিন তথাকার ব্রাহ্মগণ মাঠে বক্তৃতার আয়োজন করিয়া, বেলা দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে আহ্বান করেন, তিনি তিনটার ট্রেণে কলিকাতা হইতে সবান্ধবে যাত্রা করেন। আমরা কয়েক জন তাহার পরের গাড়ীতে ফরাসডাঙ্গায় উপস্থিত হই। ক্রমে ক্রমে কলিকাতা হইতে ১০ জন ব্রাহ্ম ফরাসডাঙ্গায় যাইয়া উপনীত হন। উক্ত দিবস পূর্ব্বে সংবাদ না পাওয়াতে, অনেক ব্রাহ্ম যোগ দিতে পারেন নাই। সঙ্গীতপ্রচারক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় অসুস্থতাপ্রযুক্ত প্রথম যাত্রায় নৈহাটী প্রভৃতি স্থানে যোগদানে অক্ষম হইয়াছিলেন, এই যাত্রায় তিনি আচার্য্যমহাশয়ের সঙ্গী হইলেন। সাড়ে পাঁচটার সময় লালদীঘির উত্তরপার্শ্বস্থ মাঠে ঈশ্বরের করুণা-বিষয়ে বক্তৃতা (১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে দেখ) অত্যন্ত মধুর ও করুণরসপূর্ণ হইয়াছিল! বক্তৃতার ভাবে সকলের হৃদয় বিশেষরূপে আকৃষ্ট ও আর্দ্র হয়। তথা-কার হরিসভার সভ্যগণ আনন্দে মত্ত হইয়া উঠেন। দুইটী সঙ্গীত হইয়া বক্তৃতারম্ভ হয়, বক্তৃতার অন্তে সকলে নগরসঙ্কীর্ত্তন করিয়া পথে বাহির হন। এক জন মুণ্ডিতমস্তক, গোঁপশ্মশ্রুবিহীন, তুলসীমালাধারী, স্থূলোন্নত, গম্ভীরাকৃতি পুরুষ অগ্রে অগ্রে উল্লম্ফন ও নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ হরিবোলধ্বনি করিতে লাগিলেন; আরও কয়েক জন লোক তাঁহার সঙ্গে সেই ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন।......বক্তৃতায় ও মধুর সঙ্গীতে তাঁহার মন প্রেমে বিগলিত হইয়াছিল, তিনি ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া আচার্য্য মহাশয়ের চরণে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছিলেন। শুনিলাম, অল্পদিন যাবৎ তাঁহার জীবনের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি নাচিতে নাচিতে, গাইতে গাইতে, সহচর-গণ সহ আমাদের সঙ্গে আমাদিগের বাসাবাটী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেন। প্রায় চারি শত লোক বক্তৃতাশ্রবণে ও সঙ্কীর্ত্তনে উপস্থিত ছিল। সে দিন ডাক্তার

অঘোরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহার ডাক্তারখানায় রজনী যাপন করা হয়।

"পর দিন (১৭ই কার্ত্তিক, ২রা নবেম্বর, রবিবার) মধ্যাহ্নে এক জন ব্রাহ্মবন্ধু কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার ভবনে উপাসনা ও ভোজন করি। উপাসনায় পল্লীর অনেক ভদ্রলোক আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে আচার্য্যমহাশয় ইংরাজিতে বক্তৃতা করিবেন, এরূপ প্রস্তাব ছিল; কিন্তু হরিসভার সভ্যদিগের একান্ত অনুরোধে ও আগ্রহে, পালপাড়ার রাস্তায় তাঁহাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে 'চৈতন্যের ভক্তির ধর্ম্ম' এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে হয়। যে স্থানে বক্তৃতা হইয়াছিল, সেই স্থান চন্দ্রাতপ, নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর পতাকা এবং উৎকৃষ্ট চিত্রপটে সাজাইয়া মনোহর করা হইয়াছিল। রাস্তার পার্শ্বস্থ অট্টালিকা-সকলেতে শত শত স্ত্রীলোক চিক্ ফেলিয়া বসিয়া গিয়াছিলেন। রাস্তার উপরে ন্যূনাধিক সহস্র লোক, কতক দণ্ডায়মান, কতক কাষ্ঠাসনে, কতক সতরঞ্চ আসনে শ্রেণীবদ্ধরূপে উপবিষ্ট ছিলেন। বক্তা উপস্থিত হইলে, হরিসভার সভ্যগণ তাঁহাকে অত্যন্ত আদর ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। বক্তা স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া, ভক্তি ও ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যের মাহাত্ম্য ও বর্ত্তমান শতাব্দীর শুষ্কতা ও নাস্তিকতার জঘন্য ভাব চমৎকাররূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে সুমধুর ভক্তিরসাত্মক কথা সকল শ্রবণ করিয়া, শ্রোতৃবর্গের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল; অনেকে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, অনেকে পুনঃ পুনঃ প্রেমোন্মত্ত ভাবে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। বক্তৃতা এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া হয়। তৎপর সকলে প্রমত্তভাবে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে রাস্তা দিয়া চলিয়া যান। পূর্ব্বোক্ত হরিসভার সভ্য কখন আনন্দে নৃত্য করেন, কখন পথের ধূলিতে গড়াগড়ি দেন, কখন বা সিংহধ্বনিতে হরিবোল বলিয়া উঠেন। যতদূর নগরসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, এই ভাবে তিনি সঙ্গে চলিয়া যান। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময়ে সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ হয়। উপাসনান্তে এক জন ব্রাহ্মবন্ধুর ভবনে আহার করিয়া, গঙ্গার উপরে এক উদ্যান-বাটীতে অবস্থান করা হয়।

জগদ্দল

"পর দিন (১৮ই কার্ত্তিক, ৩রা নবেম্বর), সোমবার পূর্ব্বাহ্নে, আমরা সকলে

গঙ্গাস্নান করিয়া উদ্যানস্থ তরুচ্ছায়ায় বসিয়া উপাসনা করি; স্থানীয় অনেক ব্রাহ্ম আসিয়া সেই উপাসনায় যোগদান করেন। উপাসনান্তে তরুমূলে ২।৩ জন প্রচারক রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া সকলকে ভোজন করান। জগদ্দলনিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের যত্নে ও নিমন্ত্রণে, ২টার পর নৌকাযোগে তথায় গমন করা হায়। তিনি আমাদের জন্য নৌকা পাঠাইয়া দেন। জগদ্দল গঙ্গার অপর পারে, আমাদিগকে নৌকায় কেবল পার হইতে হইয়াছিল। চন্দন-নগরের কয়েকজন বন্ধুও আমাদের সঙ্গে জগদ্দল গমন করেন। দুইখানা নৌকায় নামকীর্ত্তন করিতে করিতে, আমরা ২৫।৩০ জন পারে উত্তীর্ণ হই। জগদ্দল অতি প্রাচীন ভদ্রাশ্রম, সেখানে প্রথমতঃ নগরকীর্ত্তন করিয়া যদুবাবুর বাড়ীতে যাওয়া যায়। আচার্য্যমহাশয় ভেরী বাজাইতে বাজাইতে, শূন্যপদে অগ্রে অগ্রে চলিয়াছিলেন। দুই জন ব্রাহ্মের হস্তে দুইটি নিশান ছিল। যদু-বাবুর বাড়ী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, অন্য এক জন ভদ্রলোকের বহিরঙ্গনে উপস্থিত হওয়া যায়। সেখানে আসন সকল সজ্জিত ও 'সত্যমেব জয়তে' বৃহৎ পতাকা স্থাপিত ছিল। সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ অট্টালিকাসকলের দ্বারদেশে ও গবাক্ষে স্ত্রীলোকসকল বসিয়াছিলেন। সেখানে আচার্য্যমহাশয় প্রায় এক শত শ্রোতার নিকটে ভক্তিবিষয়ে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তৎপর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ঘাটে আসিয়া উক্ত নৌকাযোগে হরিনামের সারি গাইতে গাইতে গঙ্গা পার হওয়া যায়।

মোকামা

"১৮ই কার্ত্তিক (১৮০১ শক; ৩রা নভেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ) সোমবার সন্ধ্যা-সময়ে লুপলাইন মেলে আচার্য্যমহাশয় দশ জন সহযোগী সঙ্গে করিয়া চন্দননগর হইতে মোকামা যাত্রা করেন। চন্দননগরের ব্রাহ্মবন্ধুগণ ও কলিকাতার কতিপয় ব্রাহ্ম ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া সকলকে বিদায় দিলেন। যে দশ জন আচার্য্যমহাশয়ের সঙ্গে বিহারপ্রদেশে যাত্রা করিলেন, তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইতেছে:—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (সঙ্গীতপ্রচারক), শ্রীযুক্ত অঘোর-নাথ গুপ্ত (প্রচারযাত্রার সম্পাদক), শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নন্দন। উল্লিখিত দশ জনের মধ্যে আমি

এক জন। আমরা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী। গাড়ীতে (গয়ার) যাত্রিকের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল, স্থানাভাবে আমাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হয়। আচার্য্যমহাশয় দুই তিন বার শকট পরিবর্ত্তন করিয়াও স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিবার স্থান প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালমহাশয় ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, রামপুরহাট ষ্টেশনে নামিয়া পড়েন। এখানে তাঁহার সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। পুনর্ব্বার তিনি রোগাক্রান্ত হন, প্রচারযাত্রায় আর যোগদান করিতে পারেন না। আমরা পর দিন (১৯শে কার্ত্তিক, ৪ঠা নবেম্বর) বেলা প্রায় নয়টার সময় মোকামায় উপস্থিত হই। এখানে প্রিয়-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পালের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া এক দিন অবস্থান করি। সে দিন স্নানান্তে তাঁহার গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়। সন্ধ্যার সময় আমরা সকলে মিলিয়া ষ্টেশনের অন্যূন এক মাইল দূরে পরশুরাম-বৃক্ষ দর্শন করিতে যাই। ইহা একটি প্রাচীন বিচিত্র আশ্চর্য্য তরু, চতুর্দ্দিকে মূল-বৃক্ষের শাখাশ্রেণী বাঁকিয়া ভূমি সংলগ্ন হইয়াছে, এবং তাহা হইতে এক একটি অশ্বত্থতরু জন্মিয়াছে। আবার সেই তরুর শাখা তদ্রূপ ভূমিতে পতিত হইয়া অপর বৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে বৃক্ষশ্রেণী উৎপন্ন হইয়া মণ্ডলাকারে তিন চারি বিঘা ভূমি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই বৃক্ষকে এদেশের লোকেরা দেবাশ্রিত বলিয়া পূজা করে। স্থানটি অতি নিভৃত ও রমণীয়, উপাসনা সাধনার প্রশস্ত ভূমি। পরশুরাম-তরু-দর্শনানন্তর পোষ্টাফিসের নিকটে এক গৃহে উপাসনা হয়। তাহাতে ষ্টেশনের প্রায় সমুদায় বাঙ্গালী বাবু আসিয়া যোগদান করেন। 'ব্রাহ্মধর্ম্মে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের সম্মিলন' বিষয়ে সুমধুর উপদেশ হয়। উপাসনান্তে 'মন একবার হরিবল' খোল করতাল সহ এই গানটি করিতে করিতে, আমরা সকলে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর ভবনে উপস্থিত হই। ষ্টেশনের ব্রাহ্মগণ উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে গানে যোগদান করিয়াছিলেন। পর দিন অর্থাৎ ২০শে কার্ত্তিক (৫ই নবেম্বর), বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার সময়, পারিবারিক উপাসনার পর মোজাফরপুরে যাত্রা করি। এখানে আমাদের মোজাফরপুর-গমনের পাথেয়ের অকুলন হইয়াছিল, দুই তিন জন যাত্রী অর্থাভাবে এখানেই যাত্রা স্থগিত করিতে বাধ্য হইতেছিলেন, কেহ কেহ পুস্তকবিক্রয় করিয়া পাথেয়ের সংগ্রহের উপায় দেখিতেছিলেন। কিন্তু

অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া, সেই অভাব মোচন করেন। তৎকৃত উপকার আমরা ভুলিব না।

মোজাফরপুর

"মোকামা পাটনা জিলার অন্তর্গত একটি প্রশস্ত গ্রাম। রেলওয়ে ও পোষ্টাফিসের কার্য্যোপলক্ষে, এখানে পঁচিশ ত্রিশ জন বাঙ্গালী অবস্থিতি করিতেছেন। মোকামা হইতে আমরা বাড়ঘাটের টিকিট ক্রয় করিয়া, নয়টার সময় (২০শে কার্ত্তিক) বাড় ষ্টেশনে উপস্থিত হই। তথা হইতে বেলা একটার সময় বাড়ঘাটে ট্রেণ যায়। এই সময়ের মধ্যে এক জন প্রচারক বন্ধু বাজারের এক বাটিতে রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করান। অর্থাভাবে আমাদের পাছে কষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় মোকামার পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মবন্ধু টাকা পাঠাইবার অভিপ্রায়ে এখানে টেলিগ্রাফ করেন। একটার পর আমরা বাড়ঘাটে উপনীত হই। সে দিন জাহাজ পারে না যাওয়াতে, ষ্টেশনমাষ্টারের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বাড়ঘাটে থাকিতে হইল। সন্ধ্যার সময় নৌকার উপর গঙ্গার বক্ষে সঙ্কীর্ত্তন হয়। নৌকায় পাঁচটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পতাকা বায়ুভরে উড্ডীন হইতেছিল, সকলে উৎসাহের সহিত নামের সারি গাইতেছিলেন। পর পারে উঠিয়া আমরা বাজারের রাস্তায় কতক ক্ষণ হিন্দি ও বাঙ্গালা গান করিয়া, ষ্টেশন মাষ্টারবাবুর গৃহে উপস্থিত হই। ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পরম যত্ন ও আদরের সহিত আমাদিগকে এক বৃহৎ ভোজ দেন।

"পর দিন (২১শে কার্ত্তিক, ৬ই নবেম্বর), বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে, জাহাজে গঙ্গা পার হইয়া ত্রিহুত ষ্টেট্‌রেলওয়ে আরোহণ করি। কেহ কেহ গঙ্গার অবগাহন ও অনেকে জাহাজে স্নান করিয়াছিলেন। গাড়ীর দুইটি কামরা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখিয়া যথারীতি উপাসনারম্ভ করি, ট্রেণের গতির সঙ্গে উপাসনার স্রোত চলিল। এই ভাবে আমরা ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন ও আরাধনা প্রার্থনাদি করিতে করিতে, কয়েক ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম। বেলা দুই প্রহরের সময়ে মোজাফরপুর ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। আমরা তথাকার একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায়ের বাসায় যাইব। ষ্টেশন হইতে তাঁহার বাসা প্রায় এক ক্রোশ দূর। একখানা গাড়ীও পাওয়া গেল না। সকলেই এক্কা করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলাম, আচার্য্যমহাশয় একখানি

একা করিয়া আমাদেরঅগ্রে অগ্রে চলিলেন। আমরা যে আসিব, মাধববাবু তাহা জানিতেন না। তিনি পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময়ে কর্ম্মোপলক্ষে ছাপরা নগরে গিয়াছিলেন। আমরা বাসায় পৌঁছিলেই, দুই জন লোক তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া যায়। এখানে আচার্য্য মহাশয়ের অগ্রজ মহাশয়কে প্রাপ্ত হইয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হই। বাবু মাধবচন্দ্র রায় শনিবার (২৩শে কার্ত্তিক) দশটার সময় পাল্কিযোগে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতি বশতঃ দুই দিন বিশেষ কোন কার্য্য হইতে পারে নাই। উক্ত দিবস অপরাহ্ণে পাঁচটার সময় সাহাজীর পুষ্করিণীর তটে বক্তৃতা হয়। প্রায় তিন শত হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মদর্শনবিষয়ে প্রথমতঃ বাঙ্গালায়, পরে সংক্ষেপে হিন্দিতে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার পূর্ব্বে দুইটী সঙ্গীত, পরে নগরসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। হিন্দী সঙ্গীতে অনেক হিন্দুস্থানী উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া, গান করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে চলিয়াছিল।

"২৪শে কার্ত্তিক (৯ই নবেম্বর), রবিবার, গণ্ডকীনদীতীরে অশ্বত্থমূলে উপাসনা হয় এবং সেখানে বটমূলে কয়েক জন প্রচারক রন্ধন করেন ও পট-মণ্ডপে বসিয়া সকলে আহার করেন। বিশপ জনসন ভ্রমণে মোজাফরপুর আসিয়াছিলেন; অপরাহ্ণে কেশবচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যার পর এক জন ভূম্যধিকারীর বাটীতে সামাজিক উপাসনা হয়। তাহাতে প্রায় দুই শত লোক উপস্থিত ছিলেন। উপাসনান্তে কতক দূর পথ নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়। ২৫শে কার্ত্তিক (১০ই নবেম্বর) সোমবার সন্ধ্যার পর সোসাইটী (সায়েন্স আসোসিয়েসন) হলে—'India and India's God' (ভারতবর্ষ এবং ভারত-বর্ষের ঈশ্বর) বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা হয়। প্রায় দুই শত লোক উপস্থিত হন। শ্রোতাদিগের মধ্যে দশ বার জন সাহেব ছিলেন। বক্তৃতাশ্রবণে সকলে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মঙ্গলবার (২৬শে কার্ত্তিক) অপরাহ্ণে স্কুলপ্রাঙ্গণে আচার্য্যমহাশয় সাত আট শত শ্রোতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বক্তৃতা করেন। প্রথমতঃ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদিগের কর্ত্তব্যবিষয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে ১০।১৫ মিনিট করিয়া বলেন, তৎপর ৪০।৪৫ মিনিট 'অন্তরে ব্রহ্ম-দর্শন' বিষয়ে হিন্দীতে গভীর প্রেমপূর্ণ সুমধুর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাশ্রবণে হিন্দুস্থানীরা বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়েন। বক্তৃতার ভাবানুযায়ী দুই

একটী হিন্দী সঙ্গীত হইলে, সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রমত্তভাবে নগরের পথে বাহির হন। হিন্দুস্থানীরা উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। পথে অত্যন্ত জনতা হয়। ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে নগর যেন কাঁপিতে লাগিল। সেই অবস্থায় গান করিতে করিতে, তত্রত্য প্রধানতম উকিল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে উপস্থিত হওয়া যায়। তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে অত্যন্ত মত্ততা ও উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন হয়। পরে সেখানে সকলে কিছুকাল বিশ্রাম করেন। তখন কয়েক জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ববিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহা লইয়া অনেক ক্ষণ আলোচনা হয়। আচার্য্য-মহাশয়ের প্রশ্ন সকলের পরিষ্কার মীমাংসা শুনিয়া, সকলে পরম তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করেন। তথা হইতে আমরা সকলে আবাসে প্রত্যাগমন করি। প্রেমাস্পদ মাধববাবুর মধুর ব্যবহারে ও তাঁহার সাদর আতিথ্যসৎকারে আমরা বিশেষরূপে পরিতোষ প্রাপ্ত হই। বুধবার দিন (২৭শে কার্ত্তিক, ১২ই নবেম্বর) আহারান্তে গয়াভিমুখে যাত্রা করি। গয়া ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতায় থাকিতেই, আগ্রহসহকারে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, কতক পাথেয় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যাত্রাকালে মোজাফরপুর আর্য্যসমাজ আচার্য্যমহাশয়কে কৃতজ্ঞতাসূচক এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। বিদায়কালীন মাধববাবুর অশ্রুপাত আমাদিগকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল*। (বাড়ঘাটে পার হইতে দেরী হয়। যদি ষ্টেশনমাষ্টার তাঁহাদের প্রতীক্ষায় ট্রেণ না রাখিতেন, যাত্রিকগণকে ট্রেণ না পাইয়া বড়ই ক্লেশ পাইতে হইত। যাহা হউক, ষ্টেশনমাষ্টারের অনুগ্রহে তাঁহাদিগকে এ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না।)

* এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন. যাহাতে কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণের সহিত মধুর সম্বন্ধ, এবং তাঁহাদিগকে তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। মোজাফরপুরে মাধব বাবু আদরপূর্ব্বক কেশবচন্দ্রকে উৎকৃষ্ট খট্টায় শয়ন করিবার আয়োজন করিয়া দেন; তিনি সে খট্টায় শয়ন না করিয়া, বন্ধুগণের সঙ্গে ঢালা বিছানায় মেঝিয়ার উপরে শয়ন করেন। আসিবার বেলা বাড় ষ্টেশনে রাত্রিযাপন করিতে হয়, সেখানে বন্ধুগণের সঙ্গে ভূমিশয্যায় রাত্রিযাপন করেন। বাঁকিপুরে গিয়া কেশবচন্দ্রের সর্দ্দী কাশি হওয়াতে, প্রচারযাত্রার সম্পাদক গলায় বান্ধিবার জন্য ফ্ল্যানেল ক্রয় করিয়া আনিলেন; প্রচারযাত্রার মুদ্রায় উহা ক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া, তিনি তাহা ব্যবহার করিলেন না।

গয়া

"রাত্রি ৯টার সময়ে (২৭শে কার্ত্তিক, ১২ই নবেম্বর) আমরা পিক্‌আপ্ ট্রেণে বাঁকিপুরে উপস্থিত হই। বাঁকিপুর ষ্টেশনে তথাকার মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু এবং গয়াসমাজের প্রতিনিধি এক জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্ম আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। আমরা সে দিন বাঁকিপুরে বাবু কেদারনাথ রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রজনী যাপন করি, পর দিন (২৮শে কার্ত্তিক, ১৩ই নবেম্বর) পূর্ব্বাহ্ণের উপাসনায় বাঁকিপুরের প্রায় চল্লিশ জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী আসিয়া যোগদান করেন। আহারান্তে ১১টার সময়ে আমরা সকলে গয়ায় যাত্রা করি। আচার্য্যমহাশয় ছেক্‌ড়া গাড়ীতে সকলের পশ্চাতে ছিলেন, দুর্ব্বল ঘোড়ায় প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে না পারায়, যথাসময়ে তিনি ষ্টেশনে পঁহুছিতে পারেন নাই। ষ্টেশনমাষ্টার, তিনি আসিতেছেন জানিয়া, তাঁহার প্রতীক্ষায়, পাঁচ ছয় মিনিট বিলম্বে গাড়ী ছাড়িবার হুকুম দিয়াছিলেন। চারিটার সময়ে গয়া ষ্টেশনে উপনীত হইয়া দেখি যে, প্রায় চল্লিশ জন ভদ্রসম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী ষ্টেশনে আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাঁহারা আমাদিগকে দেখিয়াই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এক জন আসিয়া কতকগুলি পুষ্প আমাদিগের মস্তকে বর্ষণ করিলেন। ষ্টেশনের বাহিরে কতক জনে মিলিয়া খোল করতাল বাজাইয়া নিশান তুলিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য। আমরা সকলে তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ীতে ইতর-লোকের শ্রেণীভুক্ত হইয়া আসিয়াছি। এদিকে ষ্টেশনে আসিয়া দেখি, বড় বড় ফেটিং ও জুড়ী আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য স্থাপিত রহিয়াছে। আচার্য্যমহাশয় ফেটিংগাড়ীতে না চড়িয়া পাল্কীগাড়ীতে আরোহণ করিলেন। গয়ার বন্ধুগণ আমাদিগের কয়েক জনকে বলপূর্ব্বক বড় এক ফেটিঙে চড়াইয়া দিলেন। সে দিন ফল্গুনদীর তীরে এক জন হিন্দুস্থানী ভূম্যধিকারীর উদ্যান-বাটীতে তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়া রজনী যাপন করা হয়। রজনীতে পর-লোকতত্ত্ববিষয়ে কতক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছিল।

"প্রাতঃকালে (শুক্রবার, ২৯শে কার্ত্তিক, ১৪ই নবেম্বর) জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র সরকার আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার ভবনে

লইয়া যান। সেখানে উপাসনা হয়, গয়ার ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া তাহাতে যোগদান করেন। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় স্কুলপ্রাঙ্গণে বক্তৃতা হয়, সেখানে সামিয়ানার নিম্নে শ্রেণীবদ্ধরূপে আসন সকল স্থাপিত ছিল। সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। একটি সঙ্গীত হওয়ার পর প্রথমতঃ ইংরাজীতে, পরে হিন্দিতে উপদেশ (১৬ই পৌষের 'ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) হয়। 'যথার্থ তীর্থ ও ধর্ম্ম অন্তরে' উপদেশে গভীর ভাবে ইহাই আলোচনা হইয়াছিল। বক্তৃতার মধুর ভাবে আকৃষ্ট হইয়া সকলে পুনঃ পুনঃ করতালিদানে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উপদেশান্তে আমরা হিন্দী সঙ্গীত করিতে করিতে রাজপথে বাহির হই। সে দিন রাত্রি অনেকক্ষণপর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত নগরসংকীর্ত্তন হয়, নগরসঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে চারিটী সুন্দর পতাকা চলিয়াছিল, তাহার একটীতে বৃহৎ দেবনাগর অক্ষরে 'সত্যমেব জয়তে' অঙ্কিত। সেই রাত্রিতে এক জন বন্ধু তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ান। আমরা গয়ায় উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মগণের ভবনদ্বার পুষ্প, পল্লব, মালা ও কদলীতরু ইত্যাদি মঙ্গলচিহ্নে চিহ্নিত ও অলঙ্কৃত দেখি, কেহ বা গৃহদ্বারে নহবতও বাজাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তি, আনন্দ ও উৎসাহের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। গয়া প্রাচীন সমৃদ্ধ নগর, হিন্দুদিগের পিতৃশ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদি পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রধান তীর্থ। বিশেষ বিশেষ সময়ে ভারতবর্ষের নানাবিভাগ হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রিক এস্থানে সমাগত হয়। গয়ার সমুদায় ব্যাপার পিতৃলোক পরলোককে স্মরণ করাইয়া দেয়।

"৩০শে কার্ত্তিক (১৫ই নবেম্বর), শনিবার সকালে, এক জন ব্রাহ্মবন্ধুর ভবনে ব্রাহ্মিকাসমাজ ও উপদেশ হয়। তথায় ভোজন করিয়া চারিখানি অশ্বশকটে সকলে বুদ্ধগয়ায় যাত্রা করেন। বুদ্ধগয়া গয়া হইতে ছয় মাইল দূরে। গয়ার অনেক বন্ধুও সঙ্গে গিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহর্ষি শাক্যসিংহের ধ্যানস্তিমিতলোচন, সমাধিমগ্ন, সুবর্ণমণ্ডিত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি এক মহোচ্চ পুরাতন মন্দিরের ভিতরে স্থাপিত। তেইশ শত বৎসর হইল, পাটনার রাজা অমরসিংহ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে, দুই হাজার ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, অশ্বত্থমূলে ভগবান্ শাক্যসিংহ যোগসাধন করিয়া সিদ্ধ হন। সেই

বৃক্ষের কিয়দংশ শুষ্কাবস্থায় এখনও পতিত আছে। তাহার মূল উচ্চ বেদীতে সংবদ্ধ। স্থানটী অতি রমণীয়, চতুর্দ্দিকে শস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, উদ্যান ও পর্ব্বতমালা শোভাবিস্তার করিয়া রহিয়াছে, দেখিয়া হৃদয় প্রসারিত, উন্নত এবং পুলকে পূর্ণ হয়; আবার বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের কঠোর বৈরাগ্য, গভীর যোগ-তপস্যা ও তাঁহার পবিত্র জীবন স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া মনকে আরও উন্নত করিয়া তোলে। সেখানে নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যার সময় আচার্য্যমহাশয় সবান্ধবে উক্ত তরুমূলে উচ্চ বেদীতে উপবেশন করিয়া কতক্ষণ ধ্যান ধারণা করিলেন, পরে শাক্যসিংহের বৈরাগ্যবিষয়ে গভীর উপদেশ (১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দিলেন। উপদেশের গূঢ় মধুর ভাবে এবং স্থানের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতায় সকলের মনে আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইয়াছিল। সেই বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দিরের উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে অনেকগুলি হিন্দু দেবমন্দির আছে, প্রস্তরে অঙ্কিত ক্ষুদ্র বৃহৎ সহস্র সহস্র বুদ্ধমূর্ত্তি পথে পতিত এবং প্রাচীরে সংলগ্ন দৃষ্ট হইল। সেখানে এক জন বৌদ্ধ (?) মহন্ত প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বসিয়া রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ ভোগ করিতেছেন। আচার্য্য-মহাশয় সবান্ধবে তাঁহার সদাব্রতে লুচি ফলার করিয়া নিশীথসময়ে গয়ায় প্রত্যাগমন করেন।

"১লা অগ্রহায়ণ (১৬ই নবেম্বর), রবিবার প্রাতঃকালে, ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে উপাসনা এবং পর্ব্বতকে সম্বোধন করিয়া, প্রকৃতির নিকটে শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ হয়। পর্ব্বতের প্রতি আচার্য্যের উক্তিটী (১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—'হে নিকটস্থ ও দূরস্থ পর্ব্বত সকল, তোমরা ব্রহ্মের বাসস্থান। হে গিরিমালা, যত দূর নয়ন যায়, তোমাদিগকে দেখিতেছি। তোমাদের প্রত্যেকের মস্তক উন্নত, তোমরা সামান্য নহ। ঈশ্বর যে তোমাদিগকে এরূপ উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার গূঢ় অর্থ আছে। আমাদিগকে দৃঢ়তা এবং উন্নতির দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, ঈশ্বর তোমাদিগকে অটল এবং উন্নত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তোমরা অকারণে পৃথিবীমধ্যে বসিয়া আছ, ইহা সত্য কথা নহে। তোমাদিগকে যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। তোমরা অচল এবং অটল। তোমরা কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় দাঁড়াইয়া

আছ। তোমরা দেখাইতেছ, আমাদের বিশ্বাস কিরূপ দৃঢ় এবং অটল হওয়া উচিত। তোমরা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। তোমরা নড়িবে না, তোমাদিগকে কেহ স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমান্ হস্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কোন্ সম্রাট্ এমন প্রতাপশালী যে, তোমাদিগকে আক্রমণ করে? তোমরা যে জন্য ভূতলে আছ, তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেও। তোমরা যেমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তেমনি আবার তোমরা ভূমি হইতে উন্নত হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছ। ভূমির জীবসকল তোমাদের নিকটে আসিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে উচ্চতা শিক্ষা দেও। তোমাদের মস্তকের উপরে কেবল নীল আকাশ তোমাদিগকে ঢাকিয়া রহিয়াছে। আকাশের সঙ্গে তোমরা আলাপ করিতেছ। তোমাদের উন্নত মস্তক নীচ পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়াছে। তোমাদিগের অনাসক্ত স্বভাব পৃথিবীর সমস্ত হীন বস্তুতে পদাঘাত করিয়া উচ্চ দিকে চলিয়াছে। এক দিকে তোমরা ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এবং অটল হইয়া বসিয়া আছ, কোন দিকে বিচলিত হইবে না; অন্য দিকে তোমাদিগের স্বর্গগামী স্বভাব উপরের আকাশে উঠিয়াছে। মেঘের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রেমবারি আগে তোমাদিগের মস্তকের উপর পড়ে, তোমাদিগের মস্তক শীতল করিয়া, পরে সেই ব্রহ্মপ্রেরিত বারিধারা পৃথিবীকে আর্দ্র করে। হে পর্ব্বতসকল, হে গিরিমালা, হে আমাদের হৃদয়ের বন্ধুসকল, তোমরা কথা কহ। জড় বলিয়া মনুষ্য তোমাদিগকে ঘৃণা করে; কিন্তু তোমরা ব্রহ্মপদাশ্রিত হইয়া গম্ভীর অটলভাবে ধ্যান করিতেছ, তোমরা শ্রেষ্ঠ যোগী। তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে যোগ শিক্ষা দেও। হে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি সকল, তোমরা বাক্যহীন থাকিও না। তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক ভাষায় কথা কহ। বল, হে পর্ব্বত ভাই সকল, তোমরা এমন অটল হইলে, আর আমরা কেন চঞ্চল? তোমরা এমন উন্নত, আমরা কেন নীচ? তোমরা অচেতন হইয়াও আসল যোগী হইলে; আর যাহারা চেতন, তাহারা কেন যোগী হইল না? মানুষ জানে না, তোমরা কে? তোমরা ব্রহ্মভক্তের বন্ধু। তোমাদিগকে আমি ভুলিব কিরূপে? তোমাদের সঙ্গে যে আমার গাঢ় প্রণয়। তোমরা আমাকে কত শিখাইলে। এতকাল ধর্ম্মসাধন করিয়াও তোমাদের মত অটল হইতে পারিলাম না। তোমরা যে চিরকালের বেদ বেদান্ত খুলিয়া বসিয়া

আছ। তোমাদিগের প্রতি তাকাইলে কত লাভ হয়। ভাই পর্ব্বত সকল, তোমরা কথা কহিবে না? তোমরা কথা কহ। তোমরা যাঁহার, আমরাও তাঁহার। যাঁহার হস্ত তোমাদিগকে স্থাপন করিয়াছে, তিনিই আমাদিগকে তোমাদের নিকটে ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা এক পিতার হস্তের রচিত। পর্ব্বত ভাই সকল, তোমরা সরলপ্রকৃতি, তোমরা আমার বুকের ভিতর এস। তোমরা আমার বন্ধু, এস, খুব হস্তপ্রসারণ করিয়া তোমাদিগকে আলিঙ্গন করি। আমার প্রাণের হরি, পর্ব্বতবিহারী ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। সেই প্রেমময় বন্ধু তোমাদিগকে এমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার প্রেমবৃষ্টির জল তোমাদের মস্তক শীতল করে। তোমরা আমাকে এই উপদেশ দেও, যেন আমি হৃদয়ের ভিতরে বিশ্বাসপর্ব্বতের উপরে বসিয়া, যাঁহার কান্তি মেঘে এবং যিনি সাগরে পর্ব্বতে সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাঁহাকে দেখিতে পাই।'

"সেই গিরিমূলে এক উদ্যানে রন্ধন করিয়া সকলে ভোজন করেন। সন্ধ্যার পর (১লা অগ্রহায়ণ) সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা হয়। ৫০।৬০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন, আন্তরিক গয়াতীর্থ ও পরলোক বিষয়ে উপদেশ (১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) হইয়াছিল। এই উপদেশের কিছু কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—'আমাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন যাঁহারা ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমরা কি মনে করিব, তাঁহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেন? তাঁহাদিগের কি জীবন নাই? আমরা কি মনে করিব, চৈতন্যদেব প্রভৃতি যত মহাত্মা এই দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগের জীবনপ্রদীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়াছে? গয়াতে বসিয়া পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে। যিনি গয়াবাসী, তিনি যেন নিশ্চয়ই পরলোক মানেন। এই স্থানে বসিলে মনের উপরে পরলোকের জ্যোতি পড়ে। এখানে চারি দিকে পরলোকের মন্ত্র পাঠ হইতেছে, এখানে বসিয়া পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া লইতে হইবে।··· বাল্যকালে মনে করিতাম, পরলোক বহু দূরে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, বিশ্বাসীর এক হস্তে নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম এবং আর এক হস্তে পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাগণ। এক হস্তে ব্রহ্ম, অন্য হস্তে পরলোক।······এই হৃদয়ের ভিতরে

ঈশ্বর বৈকুণ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন। ধ্রুবকে যে ভগবান্ ধ্রুবলোক দিলেন, তাহা বাহিরে নহে, কিন্তু ধ্রুবের আত্মার মধ্যে। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে বাহিরের গয়া কাশীতে লইয়া যান না; কিন্তু ভক্তের নিজের হৃদয়ের মধ্যেই সমস্ত তীর্থ এবং অমৃতনিকেতন দেখাইয়া দেন। জননী যেমন শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য দেন, সেইরূপ বিশ্বজননী আপনার ভক্তকে নিজের প্রাণের মধ্যে বসাইয়া পুণ্য-দুগ্ধ পান করান। স্বর্গ বাহিরে নহে, আকাশে পর্ব্বতে কিম্বা সমুদ্রে স্বর্গ নহে; যথার্থ স্বর্গ আমাদের চিত্তের ভিতরে। আমাদের মন খাটি হইলে, মনের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সকল তীর্থ দেখিতে পাই। যথার্থ গয়াধাম যোগভূমি। সেই যোগভূমিতে বসিয়া, যোগী ঋষি মুনিরা যোগধ্যান করিতেছেন। সেই ভূমির উপরে আরোহণ করিলে, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিমালয়ের উপরে যাঁহারা যোগাভ্যাস করিয়াছেন এবং চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে যে মহাত্মা ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকেই দেখিতে পাইবে। যদি যথার্থ গয়াবাসী হইতে চাহ, তবে যোগের আসন পাত। যোগাসনে বসিয়া, যখন তুমি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' বলিয়া ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিবে, তখন তুমি গয়া কাশীধাম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ এক স্থানে দেখিবে। দেখ এক যোগের ভিতরে সমস্ত যোগীদিগকে এবং ভক্তির ভিতরে সমুদায় ভক্তদিগকে পাইলে।' উপাসনান্তে এক জন বন্ধুর ভবনে প্রীতিভোজন করা হয়।"

"২রা অগ্রহায়ণ, (১৭ই নবেম্বর), সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে গয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপাসনা ও ভোজন হয়। সন্ধ্যার পর স্কুলগৃহে 'Dangerous Perhaps' (বিপজ্জনক হয়তো) এই বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় অনেক প্রয়োজনীয় কথা ও গভীর সত্যের আলোচনা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রহ্মসত্তার নিশ্চয়তা প্রমাণ করিতে বক্তা অলৌকিক তেজ ও ওজস্বিতা এবং জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। বক্তৃতা নয়, যেন অগ্নিবর্ষণ হইয়াছিল। সমুদায় শ্রোতা স্তম্ভিত, পুলকিত এবং চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ করতালিধ্বনি দ্বারা আনন্দোৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্যে গয়ার কালেক্টর (মেস্তর বার্টন) সাহেব ছিলেন। বক্তৃতার অন্তে তিনি বলিলেনঃ—'ইনি (বাবু কেশবচন্দ্র সেন) বাগ্মিতা, উৎসাহ, উদ্যম এবং জীবনের পবিত্রতার

নিমিত্ত জগদ্বিখ্যাত। ইহার অদ্যকার বক্তৃতাটি শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী। আশা করি, শ্রোতৃবর্গ বক্তার উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন। আমি ভরসা করি, আমারও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। অতএব বক্তাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।' বক্তৃতান্তে মুন্সি রেওয়ালালের নিমন্ত্রণানুসারে তাঁহার ভবনে ভোজন, ভজন এবং শ্লোকাদির ব্যাখ্যা হয়। অদ্য বাঁকিপুরে সত্বর যাইবার জন্য তথা হইতে টেলিগ্রাফে সংবাদ আইসে।

"৩রা অগ্রহায়ণ (১৮ই নবেম্বর), মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে এক বন্ধুর ভবনে পারিবারিক উপাসনা ও অপর বন্ধুর ভবনে ভোজন হয়। এখানকার প্রধান ধনী ও সম্ভ্রান্ত গয়ালী ছোটালাল সিজর আসিয়া একটী মূল্যবান পাথরের গেলাস ও এক থাল উৎকৃষ্ট পেড়া মিষ্টান্ন উপহারদানে আচার্য্যমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পরম আদর ও যত্ন-সহকারে তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান। তাঁহার বাড়ীতে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তনাদি করিতে অনুরোধ করেন। কালই বাঁকিপুরে যাইতে হইবে বলিয়া, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা যায় না। ছোটালাল প্রচারের সাহায্যের জন্য পঞ্চাশ টাকা দান করেন। এক জন গয়ালী ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য দান করিলেন, এই এক আশ্চর্য্য নূতন ব্যাপার। ছোটালাল বলিয়াছিলেন যে, আপনি সত্য বুঝিয়াছেন এবং উত্তম জ্ঞান অনুভব করিয়াছেন। আপনি আচার্য্য, আপনাকে সম্মান করা আমার কর্ত্তব্য। পাঁচটার সময় রমণার মাঠে বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। প্রায় চারিশত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তা প্রথমতঃ বাঙ্গালীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিষয়ে ইংরেজীতে কিছু, তৎপর হিন্দীতে (তিন তীর্থ ও) ব্রহ্মপ্রেম বিষয়ে * বক্তৃতা (১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) করেন। বক্তৃতা

---

* বক্তৃতায় হৃদয়স্থ তিনটি তীর্থের উল্লেখ হয়,—গয়া, কাশী ও বৃন্দাবন। প্রথমতঃ গয়া হইয়া তবে বৈকুণ্ঠধামে যাওয়া যায়। গয়া বৈরাগ্যভূমি, এখানে সকল সাধুর সঙ্গে মিলন হয়। সকল ইন্দ্রিয় জয় করিয়া, ক্রোধাদিবিরহিত হইয়া, সংসারাশ্রমে বাস গয়ায় বাস। এখানে বসিয়া বৈরাগ্য-ও-পরলোকসাধন হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কাশীধাম। এখানে বেদ বেদান্ত ও জ্ঞানের আলোচনা। যে বিদ্যা হইতে ব্রহ্মাণ্ডপতি পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হয়, উহাই পরাবিদ্যা। তৃতীয় তীর্থ বৃন্দাবন। এখানে ভক্তি সাধন হইয়া থাকে। এই তীর্থে ব্রহ্মকৃপারই প্রাধান্য। এই ব্রহ্মকৃপায় ভক্তির সঞ্চার হয়, ভক্তিতে শ্রীহরি প্রাণের প্রিয় সামগ্রী হন। গয়াতীর্থে বৈরাগ্য, কাশীধামে পরাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, বৃন্দাবনে ভক্তি সাধন দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্রীহরির পাদপদ্মদর্শন হয়।

বড়ই মধুর ও করুণরসপূর্ণ হইয়াছিল। বক্তা অনেক কাঁদিলেন এবং শ্রোতা-দিগকে কাঁদাইলেন। বক্তৃতার পর বিশেষ উৎসাহ ও প্রমত্তভাবে অনেক দূর ব্যাপিয়া (প্রায় চারি মাইল) নগরকে কাঁপাইয়া সঙ্কীর্ত্তন হয়। পরে এক বন্ধুর ভবনে সৎপ্রসঙ্গ ও ভোজন হয়। গয়ায় এত অধিক ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল যে, যাঁহার আতিথ্যস্বীকার করিয়াছিলাম, তিনি একবেলার অধিক আর আমা-দিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই। আমাদের দলটি সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী, কাহাকেও আমাদের জন্য কোনরূপ জীবহত্যা করিতে হয় নাই। ৪ঠা অগ্রহায়ণ (১৯শে নবেম্বর), বুধবার, এক বন্ধুর ভবনে উপাসনার নিমন্ত্রণ, অপর বন্ধুর ভবনে ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, ১১টার ট্রেণে সকলে বাঁকিপুরে যাত্রা করেন। সে দিন চারিটার সময় বাঁকিপুরে উপস্থিত হওয়া যায়।"

রমণার মাঠে বাঙ্গালী বাবুগণকে সম্বোধন করিয়া কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে চিরমুদ্রিত থাকা প্রয়োজন, এই বিবেচনায় আমরা উহা (১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"হে বাঙ্গালী বন্ধুগণ, সর্ব্বপ্রথমে তোমাদিগকে কয়েকটী কথা বলিয়া, তৎপর হিন্দীতে এই দেশীয় ভ্রাতাদিগকে কিছু বলিব। কে তোমাদিগকে এই বিহার অঞ্চলে আনিয়াছেন? স্বয়ং ভগবান্ দয়া করিয়া, উন্নত সংস্কৃত বাঙ্গালীদিগকে দেশ দেশান্তরে চারিদিকে প্রেরণ করিতেছেন। ঈশ্বর তাঁহার নিজের গূঢ় উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য তোমাদিগকে চারিদিকে নিক্ষেপ করিতেছেন। যখন বিহার, বম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন বাঙ্গালীরা ইংলণ্ড ও পশ্চিম দেশের সভ্যতা এবং জ্ঞানালোক লাভ করেন। যাই বাঙ্গালীরা উন্নত, পবিত্র এবং সচ্চরিত্র হইতে লাগিলেন, অমনি ঈশ্বর তাঁহাদিগকে গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীরা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মোপলক্ষে চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগের দ্বারা আপনার গূঢ় অভিপ্রায় সকল

পৃথিবীর রাজার গৃহে সকলের প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু হরির দরবারে ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। হরি বলেন, হে জীব, আমায় কোথায় অন্বেষণ কর, আমিতো তোমার পাশে। যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, সেই তাঁহাকে পায়। তাঁহাকে দেখিলে, সকল দুঃখ দূরে চলিয়া যায়, জীবন আনন্দে পূর্ণ হয়।

সাধন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীরা টাকা উপার্জ্জন করিতে আসিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগের দ্বারা তাঁহার জ্ঞান এবং সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এক এক জন সাধু বাঙ্গালী এক এক স্থানে এক একটি প্রদীপ-স্বরূপ বাস করিতেছেন। হে বাঙ্গালী, তুমি আপনার নামের কলঙ্ক করিও না, তুমি স্বার্থসাধন করিবার জন্য এস নাই। এক সাধু দশ জনকে সাধু করিবে, এক জন বিদ্বান্ দশ জনকে বিদ্বান্ করিবে, ঈশ্বরের এই ইচ্ছা। বাঙ্গালী, যদি তোমার চরিত্র মন্দ হয়, সমস্ত হিন্দুস্থান বলিবে, কি লজ্জা, কি লজ্জা, বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কুলাঙ্গার আছে। বাঙ্গালী, তুমি এই প্রতিজ্ঞা কর, আমি মিথ্যা কথা বলিব না, ঘুষ লইব না, পরের মন্দ করিব না। যদি তোমার চরিত্র ভাল হয়, তাহা হইলে হিন্দুস্থানের লোকেরা বলিবে, আহা !! বাঙ্গালীর কেমন নির্ম্মল চরিত্র !! বাঙ্গালীকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। আমরাও কবে বাঙ্গালীর ন্যায় সত্যপরায়ণ, ঈশ্বরপরায়ণ, এবং দয়ালু হইব। বঙ্গদেশ কেমন অপ্রতিহত যত্নের সহিত সভ্যতার পথে দৌড়িতেছে; কবে বম্বে, পঞ্জাব এবং সমস্ত হিন্দুস্থান এই রূপে দৌড়িবে? বন্ধুগণ, তোমাদিগকে বিনীতভাবে হাত যোড় করিয়া বলিতেছি, যাহাতে বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত হয়, তোমরা প্রাণপণে এরূপ যত্ন কর। তোমরা এমন সত্যজ্যোতি দেখাও যে, চারিদিকের দুঃখীরা সুখী হইবে। তোমরা যদি স্বার্থপর হইয়া কেবল খাও, আর আমোদ কর, আর দুশ্চরিত্র হও, তাহা হইলে হিন্দুস্থান বাঙ্গালী নামে ধিক্কার দিবে। কবে বাঙ্গালীর সাধুজীবন গোলাপফুলের ন্যায় সৌন্দর্য্য এবং শোভা বিস্তার করিবে? তোমরা সাধু সচ্চরিত্র হইয়া যেখানে যাও, সেখানেই ঈশ্বরের নাম শুনাইবে এবং গৃহস্থের কি কি করা উচিত, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ঈশ্বর তোমা-দিগের নেতা এবং সেনাপতি। সমস্ত সৈন্যদল সেই সেনাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সত্যের জয় এবং প্রেমের জয় লাভ কর।"

বাঁকিপুর

"৫ই অগ্রহায়ণ (২০শে নবেম্বর), বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর, রোজবাওয়ার হলে ইংরাজিতে উপাসনা ও উপদেশ হয়। তৎপর মুনসেফ কেদারনাথ রায়ের ভবনে আচার্য্যমহাশয়ের জন্মোৎসবোপলক্ষে প্রায় দেড় শত লোক উপস্থিত ছিলেন। শুক্রবার (৬ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নবেম্বর) রাত্রি

৯টার পর অত্রত্য কলেজগৃহে 'Heaven's Command to Educated India' (শিক্ষিত ভারতের প্রতি স্বর্গের আদেশ) এ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। কলেজের প্রিন্সিপল (মেস্তর ম্যাকৃক্রিণ্ডল) সাহেব সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, কমিশনর সাহেব (মেস্তর হ্যালিডে) সভাপতি হইয়াছিলেন। পাঁচ ছয় শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ১৪।১৫ জন ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীপুরুষ। বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল; তাহাতে রাজপুরুষ, শিক্ষক এবং ছাত্রদিগের প্রতি অনেক উপদেশ ছিল। শনিবার (৭ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নবেম্বর) সন্ধ্যার পর জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ভবনে সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা এবং 'ভক্তের গুরু ঘোর সংসারী' বিষয়ে চমৎকার উপদেশ হয়।"

উপদেশটি (১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে :—"আপাততঃ শুনিতে নূতন কথা; কিন্তু ইহা সত্য কথা, 'ভক্তের গুরু সংসারী'। লোকে বলে, সংসারীর গুরু ব্রহ্মভক্ত, কিন্তু ভক্তের গুরু সংসারী। যে ঘোর সংসারী, যে বিষয়ে মগ্ন, যাহার দিন যায়, রাত্রি যায় বিষয়ের মধ্যে, সেই ব্যক্তি ভক্তের আদর্শ এবং অনুকরণের বস্তু। ভক্ত সংসার হইতে উৎপন্ন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম জন্মিয়াছেন সংসারে, বাড়িতেছেন সংসারে। সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যেককে সংসারীর কাছে থাকিতে হয়, কোন দুঃখ বিপদ আসিলে সংসারীর মুখের প্রতি তাকাইয়া থাকিতে হয়। সংসারী কিরূপে ভক্তের পক্ষে গুরু হইবেন? সংসারী ধর্ম্মকে অবহেলা করেন। ধর্ম্ম ভক্তের প্রাণ। দুইয়ের মধ্যে মতভেদ অনেক। ভক্ত সংসারীর পদতলে পড়িয়া ব্রহ্মানুরাগ শিক্ষা করেন। সংসারী ধনলোভে লোভী; ভক্ত বলেন, আমি পরমধন-লোভে লোভী হইব। ভক্ত দেখেন, সংসারী দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করেন; তিনি বলেন, আমিও সংসারীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া পুণ্যধন উপার্জ্জন করিব। সংসারী গাঢ় অনুরাগের সহিত কিসে বিষয়বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য ব্যস্ত। হে ব্রাহ্ম, যদি ঈশ্বরেতে সুখী হইতে চাও, তবে ঠিক বিষয়ীর মত হইতে হইবে। বিষয়ীর যেমন কেবল বিষয়ের প্রতিই মন রহিয়াছে ভক্তের মনও সেইরূপ কেবল এক হরিপদ চিন্তা করে। তাঁহার মন দুই দিকে যায় না। বিষয়ী স্তুতিনিন্দাতে অবিচলিত থাকিয়া, বিষয়বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। ভক্তও তেমনি স্তুতি নিন্দাতে অবিচলিত থাকিয়া, দশ সহস্র

ভক্তিটাকাকে দশ লক্ষ ভক্তিটাকাতে, সামান্য পুণ্যকুটীরকে পুণ্য অট্টালিকাতে পরিণত করেন। ভক্তের ব্যবহারে লোকে বিরক্ত হইয়া বলে, এ ব্যক্তি পাগলের ন্যায় কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, পরিবার-স্বজনের জন্য ভাবে না। সংসারী এক সহস্র টাকা বেতন পাইলে দুই সহস্র টাকা পাইতে লোভ করে। লোভ চরিতার্থ করিলে লোভ বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ ব্রহ্মভক্তের লোভও মিটে না। তিনি এই লোভের স্বভাব পোষণ করেন। দশ মিনিটের উপাসনায় সন্তুষ্ট না হইয়া, তিনি দশ ঘণ্টা উপাসনা করেন। ভক্ত কার্য্যালয়ে কার্য্য করিতে যান, সেখানেও এক এক বার কলম রাখিয়া ঈশ্বরের মুখদর্শন করেন। বার বার ব্রহ্মকে না দেখিলে, তাঁহার প্রাণ আকুল হয়। মানুষ ভক্তের স্বভাব জানে না, এই জন্য ভক্তকে বলে, এই যে তুমি ঠাকুর ঘর হইতে আসিলে, আবার কেন ঠাকুর ঘরে যাইতেছ? সংসারী ভক্তকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি প্রতিদিন পূজা কর কেন? ভক্ত সংসারীকে বলেন, তুমি প্রতিদিন আহার কর কেন? তোমার যেমন আহার না করিলে শরীর পুষ্ট হয় না, আমারও সেইরূপ হরির আরাধনা না করিলে আত্মা পুষ্ট হয় না। অন্তরালে থাকিয়া ভক্ত বিষয়ীর সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বলেন, আমিও প্রতিদিন প্রার্থনারূপ আত্মার অন্ন আহার করিব, সাধনরূপ কতকগুলি মুদ্গর ব্যবহার করিয়া আত্মার ব্যায়াম করিব, সৎপ্রসঙ্গরূপ উদ্যানে গিয়া ভাল বায়ু সেবন করিব। সংসারী দিন দিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জন আহার না করিলে তেমন তৃপ্তি সম্ভোগ করিতে পারে না; ভক্ত বলেন, আমিও দিন দিন নূতন প্রার্থনা করিব। হে ভাই, সংসার হইতে আমরা সমুদায় শিখিলাম। সংসারও ঈশ্বরের, ধর্ম্মও ঈশ্বরের। সংসারসাধন করা পাপ নহে। যিনি ব্রহ্মভক্ত, তিনি সংসারেই বৈকুণ্ঠভোগ করেন; কিন্তু ব্রহ্মভক্তিবিহীন সংসারী অতি হতভাগ্য, কেন না সে গুরু হইয়া শিষ্যের নিকটে হারিল। সে শিষ্যকে হরিভক্তি শিখাইল, কিন্তু আপনি স্বর্গে যাইতে পারিল না এবং সংসারেও সুখী হইতে পারিল না। যথার্থ সংসার হরির সংসার। স্ত্রী পুত্র সকলকে লইয়া হরিসেবা কর। ব্রহ্মপাদপদ্ম ভক্তের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। হরি-কল্পতরু ভক্তের সংসারের ভিতরে। অত্যন্ত প্রসন্ন হরি, ইহকাল এবং পরকালের ধন, হরির নিকটে থাকিলে কোন অভাব থাকে না। খুব সংসারী হও, ক্ষতি নাই; কিন্তু হরিসংসারে সংসারী হও।"

"(উপাসনার) পরে মুক্তিতত্ত্ব বিষয়ে এক জন প্রশ্ন করেন, তদুপলক্ষে কতক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ হয়। এখানে আমরা সকলে ভোজন করি। রবিবার (৮ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নবেম্বর) পূর্ব্বাহ্নে এক উদ্যানে উপাসনা, রন্ধন ও ভোজন হয়। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় কলেজগৃহের রোয়াকে আচার্য্যমহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমতঃ ইংরাজীতে, পরে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন ; ঈশ্বরের বিদ্যমানতাবিষয়ে জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত অনেক কথা বলেন। হাজার বার শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রমত্তভাবে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে নগরের পথে বাহির হয়েন। অনেক হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ক্রোশাধিক পথ ব্যাপিয়া নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়, তৎপর সামাজিক উপাসনা হয়। ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে প্রেমপূর্ণ গভীর উপদেশ হইয়াছিল।"

এ উপদেশ (১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) হরির করুণাবিষয়ে নহে, 'হরি সর্ব্বমূলাধার' এই বিষয়েঃ—"হরি পূর্ণ ঈশ্বর ; কিন্তু হরির ভিতরে যিনি প্রবেশ করেন তিনি অল্পে অল্পে অগ্রসর হন। হরির ভিতরে অনেক সহর, গ্রাম, নদী, উদ্যান প্রভৃতি আছে। হরির ভিতর কত পুস্তকালয়, কত গ্রন্থ, কত আনন্দের ফুল। এক হরির ভিতরে সহস্র লোক, সহস্র পন্থা। হরির কাছে বসিয়া কেহ জ্ঞানচর্চ্চা করিতেছে, কেহ ভক্তি চরিতার্থ করিতেছে, কেহ যোগ করিতেছে। হরির গৃহে হরির লোকেরা নানা প্রকার সুখভোগ করিতেছে। হরি এক দিকে দণ্ডদাতা, ন্যায়বান্ ধর্ম্মরাজ হইয়া, সূক্ষ্ম বিচার করিয়া, পাপাত্মাদিগকে দণ্ড দিতেছেন, আর এক দিকে জননী হইয়া সাধু অসাধু সকলকে স্নেহের সহিত প্রতিপালন করিতেছেন। হরির ভিতরে বৈষ্ণব শাক্ত সকলেই বসিয়া আছেন। হরির ভিতরে কত মন্ত্র তন্ত্র, কত শাস্ত্র। যুগে যুগে হরির ভিতর হইতে কত বিধান বাহির হইল। এক হরি প্রকাণ্ড রত্নাকর। যে কেহ সেই রত্নাকরে ডুবে, নূতন নূতন রত্ন তুলিয়া আনে। যিনি হরির মধ্যে বসিয়া আছেন, তিনি কত লীলা দেখিতেছেন। এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায় হরির এক এক ভাব দেখিতেছেন; কিন্তু যিনি ব্রহ্মপন্থী, তিনি সমুদায় দেখিতেছেন। যথার্থ ব্রহ্মপন্থী হরির প্রাণের ভিতরে বসিয়া আছেন, তিনি হরির সঙ্গে

একত্র হইয়া মধ্যবিন্দুতে এক হইয়া থাকেন। অন্য সকল লোক কেহ জ্ঞান, কেহ ভক্তি, কেহ যোগ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া মোহিত হইল; কিন্তু ব্রহ্মপন্থী বলিলেন, আমি ব্রহ্মের গুণ চাহি না, আমি ব্রহ্মকেই চাহি, আমি ব্রহ্মবস্তু নেব। যখন ব্রহ্মপন্থী এই কথা বলেন, তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। ব্রহ্মপন্থী স্বর্গ লইলেন না, তিনি ব্রহ্মকে লইলেন। যখন ভক্ত ভক্তবৎসলকে প্রাণের ভিতরে রাখিলেন, তখন তিনি সকল তীর্থ এবং সকল পুস্তকালয়ের চাবি পাইলেন। ব্রহ্মপন্থী অন্য পন্থীর ন্যায় এক একটী বিশেষ গুণ গ্রহণ করিলেন না, তিনি একেবারে সর্ব্বগুণাধার হরিকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্কীর্ণ বক্ষস্থল, ক্ষুদ্র মন, কিন্তু সেই ক্ষুদ্রস্থানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সন্নিবেশিত হইলেন। আবার হরির সঙ্গে পৃথিবীর সমুদায় সাধুভক্তেরাও ভক্তের হৃদয়-আলমারীতে বসিয়া আছেন। যথার্থ ব্রহ্মপন্থীর হৃদয় অতি আশ্চর্য্য বস্তু। এমন পূর্ণ ধর্ম্ম ছাড়িয়া, বন্ধুগণ, তোমরা অন্য পথ ধরিতেছ কেন? ব্রহ্মপন্থী কে? যিনি সকল পন্থীকে এক পন্থী করেন। যিনি সকল পন্থার আকর, ব্রহ্মপন্থী তাঁহাকে লইয়াছেন। ব্রহ্মপন্থী ব্রহ্মকে বলেন না যে, আমাকে জ্ঞান দেও, পুণ্য দেও, প্রেম দেও; তিনি বলেন, হরি, আমি তোমাকে চাই। হরিকে রাখিলে, হরি আর কিছু হইতে ভক্তকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। হরিভক্তের ঘরে যখন হরি আসিলেন, তখন হরির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্বর্গরাজ্য আসিল। এই যে আমরা ব্রহ্মপন্থী হইয়াছি, ইহাতে আমরা আদি তীর্থে গিয়া বসিয়াছি। এখানে সকল সত্যের মিলন, সকল সাধুতার মিলন, সকল প্রেরিত মহাপুরুষদিগের মিলন। হরি তাঁহার বীর ভক্তদিগকে বলিতেছেন, তোমরা যে সুধা পান করিতেছ, যাও, সমস্ত ভারতবর্ষকে সেই সুধা পান করাও। যাহারা সেই সুধা খাইবে, তাহারা বাঁচিবে এবং যাঁহারা খাওয়াইবেন, তাঁহারাও বাঁচিবেন।"

"আমরা প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, বাঁকিপুরে সাত দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। বাঁকিপুরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়ের যত্ন ও সেবা আমরা ভুলিতে পারিব না। বিহারপ্রদেশের প্রধান নগর বাঁকিপুর। এ নগরে পাটনাকলেজ প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে সহস্রাধিক বাঙ্গালী

অবস্থান করেন। এখানকার সাধারণ কৃতবিদ্যদিগের ধর্ম্মভাব নিতান্ত নিস্তেজ। তাঁহাদের মধ্যে সংশয় নাস্তিকতা প্রবল, ধর্ম্মসম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ও উপহাসপ্রিয় লোকই অধিক *। প্রথমতঃ এখানে অনাবৃত স্থানে বক্তৃতা ও নগরসঙ্কীর্ত্তনের প্রস্তাবে অনেক কৃতবিদ্যের বিশেষ আপত্তি ছিল। উক্ত বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তনের সময় কয়েক জনকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু পরে অনেক ভদ্রসন্তান শিক্ষিত লোক তাহাতে উৎসাহ ও আনন্দের সহিত যোগ দিয়াছেন। হোষ্টেলনিবাসী শিক্ষক ছাত্রগণ সঙ্কীর্ত্তনের প্রোসেশনকে আগ্রহ করিয়া হোষ্টেলে লইয়া যান, কেহ কেহ গায়কদিগের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করেন। অনেকে গানে যোগ দেন, কেহ বা আসিয়া নিশান ধরেন। অনেক কৃতবিদ্য যুবক উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তনের ভাবে আকৃষ্ট হইয়া অধিকাংশেরই যে মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, উৎসাহ ও মত্ততা জন্মিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। গয়ার ব্রাহ্মগণ টেলিগ্রাফে নিমন্ত্রণ পাইয়া, খোল করতাল সহ আসিয়া, সে দিন নগরসঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। এইক্ষণ বাঁকিপুরের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ডোমরাওয়ের বিষয় লেখা যাইতেছে। (১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)

ডোমরাও

"১০ই অগ্রহায়ণ (২৫শে নবেম্বর), মঙ্গলবার, দশটার ট্রেণে বাঁকিপুর হইতে গাজীপুরে যাত্রার উদ্যোগ হইতেছিল, এমন সময়ে ডোমরাও যাইবার জন্য ডোমরাও মহারাজার পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ পত্র উপস্থিত হইল; তখন আমরা গাজিপুরগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, সন্ধ্যার ট্রেণে ডোমরাও যাত্রা করিলাম। রাত্রি ৯টার সময়ে আমরা ডোমরাওয়ে উপস্থিত হই। মহারাজের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ লাল এবং ম্যানেজারের গুরু নাগাজীস্বামী ষ্টেশনে আমাদিগকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া, রাজার উদ্যানস্থ প্রাসাদে লইয়া যান। সেখানেই রাজার

---

* কেশবচন্দ্র-লিখিত "Missionary Expedition" প্রবন্ধে লিখিত আছে, মোজাফরপুরে অজ্ঞানতা, গয়াতে পৌত্তলিকতা এবং বাঁকিপুরে বৌদ্ধভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। যে প্রণালীতে অন্যত্র কার্য্য করা হইয়াছে, এখানে সেরূপে কার্য্য করা উপহাসের ব্যাপার ছিল; কিন্তু উপহসিত হইবার ভয়ে সৈনিক দল ক্ষুব্ধ হন নাই, বরং তাঁহাদের উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে রজনী যাপন করিতে হয়। সে দিন ইংরেজদের মত এক টেবিলে বসিয়া কাঁটা চামচাযোগে আহার করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছিলাম। আমাদের জন্য কুক্কুটাদি হত্যা হইয়াছিল, তৎসঙ্গে নিরামিষ ডাল তরকারি ও মিষ্টান্নাদি ছিল বলিয়া আমরা কোনরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছিলাম। ম্যানেজার জানিতেন না যে, আমরা সকলে নিরামিষভোজী।

"পরদিন (১১ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নবেম্বর) প্রাতঃকালে রাজা আসিয়া আচার্য্যমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমরা স্নানান্তে একটি গভীর অরণ্যে উপাসনা করিতে গেলাম। নগরের প্রান্তভাগে ক্রোশাধিক স্থান ব্যাপিয়া সেই অরণ্য। ঘনসন্নিবিষ্ট নানাজাতীয় পাদপ-শ্রেণী শাখাবিস্তার করিয়া সূর্য্যরশ্মি আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, ইতস্ততঃ হরিণ সকল বিচরণ করিতেছে, বানরগণ ক্রীড়া করিতেছে; কাননের শোভা ও গাম্ভীর্য্যে আমাদের মন আনন্দে পুলকিত হইল, অদূরে বন্য পশুদলকে অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া মনে অধিকতর আহ্লাদ জন্মিল। এই বন তপোবনের ভাব অন্তরে উদ্দীপন করিয়া দিল। বনের মধ্যভাগ দিয়া চারি দিকে চারিটি প্রশস্ত পথ প্রসারিত, চৌমাথায় রাজার একটি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা। সেই অট্টালিকার উপরে বসিয়া আমরা উপাসনা করিলাম। নাগাজিস্বামী আমাদের উপাসনায় যোগ দিলেন। নাগাজি এক জন নানকপন্থী সন্ন্যাসী। তিনি অতি সৌম্যমূর্ত্তি, প্রফুল্লানন, উদারস্বভাব, ধর্ম্মোৎসাহী, মহর্ষি-তুল্য লোক; ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ও অনুরাগ এবং আচার্য্যমহাশয়ের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। উপাসনান্তে আমরা নাগাজির নিমন্ত্রণা-নুসারে তাঁহার আশ্রমে ভোজন করিতে যাই। বনের ভিতর দিয়া যাইবার সময় অনেকের ভাব হওয়াতে, তাঁহারা কতক্ষণ তরুমূলে ধ্যানে বসিয়াছিলেন। নাগাজির আশ্রমে আমরা বৃক্ষতলে বসিয়া কদলীপত্রে ভোজন করিলাম। ভোজনসামগ্রী অতি উপাদেয় ও সাত্ত্বিক ভাবের হইয়াছিল। পূর্ব্ব রজনীতে কাঁটা-চামচা-যোগে রাজপ্রাসাদে ইংরেজী আহার, অদ্য সন্ন্যাসীর পবিত্র আশ্রমে তরুমূলে বসিয়া কদলীপত্রে বৈরাগ্যভোজন। আমাদের জীবনে কত স্থানে যে কতরূপ ভোগই হইল। পূর্ব্বোক্ত অরণ্যের এক প্রান্তে একটি সুন্দর উদ্যানের মধ্যে নাগাজির কুটীর। স্থানটি পবিত্র ভাবের উদ্দীপক ও রমণীয়।

আবাস কুটীরটি ত্রিতল সুদৃশ্য। ভোজনান্তে নাগাজি কুটীরে বসিয়া গ্রন্থসাহেব হইতে ফকীরের জীবনবিষয়ে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য কথা পড়িয়া শুনাইলেন। তৎপরে আমরা শকটযোগে ভোজপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গেলাম। সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ৪টার পর পুনর্ব্বার অরণ্যে প্রবেশ করি। তথায় আচার্য্যমহাশয় এক তরুমূলে বসিয়া গেলেন, আমরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। তিনি বন্য তরুদিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী সুমধুর স্বর্গের কথা (১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) বলিলেন ও প্রার্থনা করিলেন।"

আমরা সেই কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—"হে তরুরাজি, তোমরা এই বনের মধ্যে বসিয়া, জনকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, বনদেবতার পূজা করিতেছ। তরুশ্রেণী, তোমরাই জান, কিরূপে বনদেবতার পূজা করিতে হয়। তোমরা মনুষ্যের দুর্গন্ধ হইতে দূরে থাকিয়া, নীরবে তোমাদিগের মহাপ্রভুর সেবা করিতেছ। তোমরা প্রভুর সেবা ভিন্ন আর কিছু জান না; কিন্তু আমরা তোমাদের দেবতা এবং আমাদিগের প্রভুকে ভুলিয়া যাই। হে বন্ধু তরু, তুমি আমার নয়নবন্ধুর পরিচয় দিবার জন্য এখানে দাঁড়াইয়া আছ, তোমার মাথার উপরে জগজ্জননী বসিয়া আছেন। সমস্ত বন উপবন তাঁহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। হে বন্ধু তরু, তুমি প্রকৃতির সরলতা দেখাইতেছ। তুমি নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে বিভুর অর্চ্চনা করিতেছ, তোমার গভীর পূজা দেখিয়া যোগীর মন স্তব্ধ হয়। সহরের লোক তোমাকে চিনে বা না চিনে, তুমি আপনার দেবতার মহিমা প্রকাশ করিতেছ। শত শত শাখা বিস্তার করিয়া তুমি আনন্দ সম্ভোগ করিতেছ। তোমার ছায়ায় বসিয়া প্রাচীনকালের ঋষিরা যোগ-তপস্যা করিতেন। তরুশ্রেণী, তোমাদিগের মস্তকের উপর ঈশ্বরের চরণ ছায়াবিস্তার করিতেছে, এই জন্য তোমাদের তলায় বসিয়া যোগী ঋষিরা সাধন ভজন করিতেন। তোমাদের মত নম্র ও সহিষ্ণু আর কেহ নাই। ভাই তরু, বলিয়া দেও, কেমন করিয়া তোমার মত নিঃস্বার্থভাবে বনদেবতার মঙ্গলাভিপ্রায় সাধন করিব। ভাই তরু, তোমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়, তুমি সেই বন-দেবতা মাতাকে দেখাইয়া দেও। এই গহন বনে কেবলই প্রকৃতির শোভা, এখানে লোকালয়ের ন্যায় জনকোলাহল নাই। এই প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ও

সৌন্দর্য্যের মধ্যে সহজেই মন বসিয়া থাকিতে চাহে। অতএব তরু বন্ধুগণ, তোমরা আমাদের সহায় হও। সহরে নরনারীদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা সাধন করিয়াছি, আজ তোমাদের সভায় বসিয়া, তোমাদিগকে ভাই বলিয়া, তোমাদের সমাজের সভাপতি বনদেবতাকে নূতন ভাবে ডাকিতেছি। তোমরা আমার সঙ্গে যোগ দাও।

"হে বনদেবতা, গভীর বনের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া মন স্তম্ভিত হইতেছে; শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। করুণাসিন্ধু হরি, তুমি বনে বাস করিতে বড় ভালবাস। হে চিরকালের স্নেহময়ী মা, এখানেও তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য ক্রোড় পাতিয়া বসিয়া আছ। মা, এখানেও যে তোমাকে পাইব, আমাদের এমন কি আশা ছিল? এস, মা, তোমাকে বুকের ভিতরে বসাইয়া রাখি। বাড়ীতে মাকে দেখিয়াছি, জঙ্গলেও মাকে দেখিলাম। হে মা জগজ্জননী, হে মা বন উপবনের দেবতা, পূর্ব্বকালের যোগী তপস্বীরা যেমন বনের মধ্যে বসিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেন, আমাদিগকে সেইরূপ নির্জ্জনে বিরলে প্রেমভক্তির সহিত তোমার পাদপদ্মপূজা করিতে সামর্থ্য দেও। গোপনে গভীর প্রেমভক্তির সহিত তোমার উপাসনা করিয়া, যাহাতে আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হই, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।"

"অনন্তর আমরা স্কুলগৃহে আসিলাম। আচার্য্যমহাশয় স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া জাতীয় ভাব এবং প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মবিষয়ে প্রথমতঃ ইংরেজীতে, পরে হিন্দীতে বক্তৃতা করিলেন। সভায় প্রায় দুই শত ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। গেরুয়াবসনধারী নাগাজিস্বামী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী বক্তৃতা অত্যন্ত তেজস্বিনী হইয়াছিল। হিন্দী উপদেশ-শ্রবণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া, বক্তাকে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। উপদেশান্তে আমরা খোল করতাল সহ ভজন গাইতে গাইতে, মেনেজার মহাশয়ের ভবনে উপনীত হই। সেখানে আমাদের ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। তথায় গৃহে বসিয়া কয়েকটি হিন্দী গান হয়। মেনেজারবাবু জয়প্রকাশলাল নানা উপাদেয় উপকরণে আমাদিগকে আহার করাইয়া, প্রচারের জন্য রাজসরকার হইতে দুই শত টাকা দান করিলেন। আমরা গাজিপুরে যাওয়ার সঙ্কল্প একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, ডোমরাও

হইতে আরায় যাইব, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এদিকে গাজীপুর হইতে গাজীপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায় মহাশয় আমাদিগকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য, যুমানিয়া-ষ্টেশন পর্য্যন্ত গাড়ীর ডাক বসাইয়া, স্বয়ং ডোমরাও উপস্থিত হইলেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া, রাত্রি ৯টার ট্রেণে (১১ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নবেম্বর) ডোমরাও হইতে আমাদিগকে গাজিপুরাভিমুখে যাত্রা করিতে হইল।

গাজিপুর

"বাঁকিপুর হইতে গয়া ও বাঁকিপুরের কয়েক জন ব্রাহ্মবন্ধু আমাদের সঙ্গে প্রচারযাত্রায় যোগদান করিয়া আসিয়াছিলেন; ডোমরাও হইতেও এক জন ব্রাহ্মবন্ধু আমাদের সঙ্গী হইলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা যুমানিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তথায় ওয়েটিংরুমে রজনী যাপন করিয়া, পর দিন (১২ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে নবেম্বর) বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে, কতক ঘোড়ার গাড়ীযোগে, কতক এক্কাযোগে গাজিপুরে যাত্রা করিলাম। এখান হইতে গাজিপুর ১৪ মাইল দূরে, গঙ্গার অপর পারে। বেলা প্রায় ৯টার সময়ে গাজিপুরে উপনীত হইলাম। সে দিন অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে সুপ্রশস্ত থরণহিল ঘাটে আচার্য্যমহাশয় ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তাবিষয়ে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন। চারি পাঁচ শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতার মধুর ভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই ঘাটে কয়েকটি ভজন গান হয়, তৎপর হিন্দীতে নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়। নগরসঙ্কীর্ত্তন ছোটলোকের ব্যাপার ভাবিয়া, গাজিপুরের সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুদিগের প্রথমতঃ তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল। কেশববাবুর ন্যায় লোক দীনভাবে ভেরী বাজাইয়া ও গান গাইয়া নগরের পথে পথে বেড়াইবেন, ইহা অনেক ব্রাহ্মের পক্ষে কিছু অসহ্য হইয়াছিল; কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের ভাবের জমাট দেখিয়া, সকলেই বিশেষ আহ্লাদিত হন, তাঁহাদের মনে আর কোন দ্বিধা থাকে না।

"১৩ই অগ্রহায়ণ (২৮শে নবেম্বর) শুক্রবার, সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা হয়। ৫০।৬০ জন হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী সেই উপাসনায় যোগ দান করেন। প্রথমতঃ হিন্দীতে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ হয়, পরে ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যাত্মার জীবন্ত সম্বন্ধবিষয়ে অতি করুণরসপূর্ণ সুমধুর উপদেশ হয়। সেই উপদেশ শুনিয়া অনেকেরই

বদনমণ্ডল প্রেমাশ্রুতে প্লাবিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে এক বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রণাহার হইল। সন্ধ্যার পর ভিক্টোরিয়া স্কুলগৃহে 'Our March to the Promised Land' (অঙ্গীকৃত স্থানে আমাদের গতি) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। প্রায় দুই শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ওপিয়ম এজেণ্ট কার্ণেক সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া, বক্তার অনেক প্রশংসা করেন। কার্ণেক সাহেব আচার্য্যমহাশয়ের ব্যবহারের জন্য নিজের গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া ও তাঁহার বাড়ীতে অবস্থিতিপূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য আচার্য্যমহাশয়কে অনুরোধ করিয়া ও অন্য অনেক-ভাবে তাঁহাকে সম্মানিত করেন। বক্তৃতান্তে সমাজ হয়, তৎপরে আমরা এক বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রণ ভোজন করি।

শোণপুর

"পরদিন (১৪ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নবেম্বর) শনিবার প্রত্যুষে স্নানান্তে আমরা শোণপুরের মেলায় গমনের অভিলাষে গাজিপুর পরিত্যাগ করি; নৌকায় ভাগীরথী পার হইয়া কতক ঘোড়ার গাড়ীযোগে, কতক এক্কাযোগে যুমানিয়ায় উপনীত হই। আমরা ষ্টেশনে পঁহুছিয়াই শুনিলাম যে, মেলট্রেণের আর বিলম্ব নাই, গাড়ী ষ্টেশনে পঁহুছিয়া তিন মিনিটের অধিক সময় থাকে না। এদিকে আমাদের আহারের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতেছিল। ভাবিলাম যে, খাওয়া বুঝি হইল না। ভাগ্যক্রমে ট্রেণ আসিতে পনর মিনিট দেরি হইল। কোনরূপে অন্ন হইল, ব্যঞ্জন আর হইয়া উঠিল না। বেগুণপোড়ামাত্র উপকরণে উষ্ণ অন্ন শীঘ্র শীঘ্র ভোজন করিয়া ট্রেণ ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সে দিনের বেগুণপোড়া ভাত, অন্য দিনের পায়স পলান্ন অপেক্ষা মিষ্ট বোধ হইল। বেলা প্রায় পাঁচটার সময়ে আমরা বাঁকিপুরে উপনীত হইলাম। বাঁকিপুরে গঙ্গাপার হইয়াই শোণপুরে যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ীযোগে সন্ধ্যাসময়ে আমরা গঙ্গাতীরে আসিলাম। পারাপারের ষ্টীমার ছাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং এক জন দেশীয় কন্ট্রাক্টারের একখানি সুন্দর ষ্টীমবোট পাইয়া, পার হইবার জন্য আচার্য্যমহাশয় ও আর চারি জন বন্ধু তাহাতে আরোহণ করিলেন। আমরা দশ জন এক ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িলাম। নৌকার মাঝি দশ জনকে পার করিতে চাহে নাই বলিয়া, তাহার সঙ্গে কোন কোন বন্ধুর কিছু বচসা হইল। দুই জন বন্ধু সেই নৌকায়

থাকিলেন, অন্য সকলে নামিয়া পড়িলেন ও অপর নৌকায় পার হইলেন। উক্ত দুই জন বন্ধুকে মধ্যগঙ্গার মধ্যস্থলে লইয়া গিয়া মাঝি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিল; কিন্তু তাঁহাদিগের তেজ দেখিয়া মাঝি অত্যন্ত ভয় পাইয়া পরাস্ত হইল। আমরা পারে যাইয়া গাড়ী পাইলাম না। তথা হইতে তিন মাইল দূরে মেলাস্থান, আচার্য্যমহাশয় এক্কাযোগে পূর্ব্বেই মেলাস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছিল বলিয়া আমরা প্রথমতঃ এক্কা যোটাইতে পারি নাই, পরে আমরা কষ্টে পুলিশের সহায়তায় কয়েকখানা এক্কা করিয়া, রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মেলাস্থলে উপনীত হই। তথায় প্রচারযাত্রিক দলের জন্য এক ক্ষুদ্র ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছিল। ডোমরাও মহারাজের সরকার হইতে তাম্বু ইত্যাদি আসিয়াছিল।

"শোণপুরের মেলার ন্যায় দ্বিতীয় মেলা এ দেশে নাই। এই মেলা উপলক্ষে বেহারপ্রদেশের সমুদায় জেলার বিচারালয় সকল বন্ধ হয়। কমিশনর অবধি প্রায় সমুদায় বিচারক, নানা স্থানের রাজা জমিদার উপস্থিত হন। তাঁহাদের জন্য সুবিস্তীর্ণ ক্যাম্প স্থাপিত হইয়া থাকে। ঘোড়দৌড়, নাচ ইত্যাদি নানা আমোদ হয়। মেলাস্থল একটি প্রকাণ্ড সহরের ন্যায়। গাড়ী ঘোড়া দৌড়িতেছে, সাহেব বিবিরা নাচিতেছে খেলিতেছে; সহস্র সহস্র হস্তী অশ্ব গো গর্দ্দভাদি পশু, নানাজাতীয় পক্ষী, গাড়ী, বগী, ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদি নানাবিধ সামগ্রী বিক্রী হইতেছে, দেখিলে মনে বড় আহ্লাদ হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় গণ্ডকের গঙ্গাসঙ্গমে স্নানোপলক্ষে এই মেলা হইয়া থাকে। শোণপুরেই গণ্ডক-নদ গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। রবিবার দিন (১৫ই অগ্রহায়ণ, ৩০শে নবেম্বর) মেলাদর্শনমাত্র হয়, প্রচারের কোন কার্য্য হইতে পারে নাই। রজনীতে ক্যাম্পে সামাজিক উপাসনা হয়। সোমবারের প্রাতঃকালে (১৬ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর) মিনাবাজারের চৌমাথায় আচার্য্যমহাশয় হিন্দী বক্তৃতা করেন। লোক সকল ক্রয় বিক্রয়ে ব্যস্ত, অতি অল্প লোকেই উপস্থিত হইয়া বক্তৃতাশ্রবণে মনোযোগ করিয়াছিল। বক্তৃতান্তে প্রধান মেলাস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন হয়। আহারান্তে বেলা দুইটার সময় আমরা মেলাস্থান হইতে যাত্রা করি। হাতুওয়ার রাজার তিনটী হাতীতে আরোহণ করিয়া আমরা ঘাটে আসিলাম, আচার্য্য মহাশয় ও আর এক জন

বন্ধু গাড়ীতে আসিলেন। জাহাজে গঙ্গাপার হইয়া, সে দিন বাঁকিপুরে আসিয়া অবস্থিতি করি।

আরা

"পর দিন (১৭ই অগ্রহায়ণ, ২রা ডিসেম্বর) উপাসনান্তে, ১০টার সময়, মেল ট্রেণে আমরা আরাভিমুখে যাত্রা করি; দ্বিতীয় প্রহরের সময় আরায় উপস্থিত হই। আরার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ মিত্র কতিপয়বন্ধুসমভিব্যাহারে ষ্টেশনে আমাদিগকে গ্রহণ করেন। ভগবতী বাবুর আলয়ে আমরা আতিথ্যগ্রহণ করি। সে দিন সাড়ে চারিটার সময় স্কুলপ্রাঙ্গণে ইংরাজীতে ও হিন্দীতে বক্তৃতা ও ভজন হইয়া নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতাস্থলে প্রায় ছয় শত লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতাদিগের অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্রসন্তান লোক ছিলেন। হিন্দীতে বক্তৃতাকালে তিনি একটি চারা হাতে লইয়া যাহা বলেন, তাহার মূল বিষয় এই যে, ঈশ্বর এই চারাতে, এই চারা ঈশ্বর নহে। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় স্কুলগৃহে 'Truth triumphs, not untruth' (সত্যের জয় হয়, অসত্যের নয়) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। আরার জজ সাহেব (মেস্তর ওয়ার্গান) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বক্তৃতান্তে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—'বাবু কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা অদ্য রাত্রে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একহৃদয় হইবেন যে, তিনি অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা দ্বারা আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। যে বিষয়টী কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বারা অদ্য রাত্রে বিবৃত হইল, তৎসম্বন্ধীয় চিন্তাসকল এরূপ বাগ্মিতাসহকারে প্রকাশ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু সকলেই তাহার সমাদর করিতে পারেন! তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দলের চিন্তা করিবার বিষয়। অদ্য রাত্রে যাঁহারা একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই অধিক। তাঁহাদের প্রতি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অধিক প্রয়োজনীয়। আমি কেবল এই বলিতে চাই যে, বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতার যে একটি বিষয় আমার নিকট বিশেষরূপে গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা এই—ইংরাজগবর্ণমেণ্ট এই দেশস্থ প্রজাদিগকে শিক্ষা দান করেন, কিন্তু সেই শিক্ষার সদ্ব্যবহার করা প্রজাদিগের

কার্য্য।' বক্তৃতাস্থলে দুই শত লোক উপস্থিত ছিলেন। রাত্রিতে অনেকক্ষণ বিশেষ উপাসনা হয়, আরার বহুসংখ্যক ভদ্র স্ত্রীপুরুষ আসিয়া উপাসনায় যোগদান করেন।

প্রত্যাবর্ত্তন

"বুধবার (১৮ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর) পূর্ব্বাহ্ণে আহারান্তে আমরা মেল ট্রেণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করি। ভোর বেলা শ্রীরামপুরে নামিয়া সাধনকাননে উপনীত হই, সেখানে বৃক্ষতলে উপদেশ হয়। পরে তথা হইতে আমরা সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের ভবনে উপনীত হই, তথায় আহারাদি হয়। অপরাহ্ণে শ্রীরামপুরে গঙ্গা পার হইয়া বারাকপুরে আগমন করি। পার হইবার সময় নৌকায় নামকীর্ত্তন হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল কোর্টস্ সাহেব আমাদের নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্কীর্ত্তনের খোলবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে করতালিদান করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, 'আমার নিকটে এই গান বড় মিষ্ট বোধ হইল।' বারাকপুর হইতে সন্ধ্যার ট্রেণে আমরা শিয়ালদহে উপস্থিত হই। কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গনদানে গ্রহণ করিলেন, আমাদের সকলের গলদেশে পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন এবং মহানন্দ ও উৎসাহে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া কমলকুটীরে লইয়া আসিলেন। ভবনদ্বারে মঙ্গলসূচক কদলীতরু স্থাপিত হইয়াছিল, নহবত বাজিতেছিল, প্রাঙ্গণবর্ত্মে আলোক দীপ্তি পাইতেছিল। উপাসনাকুটীর আলোক ও পুষ্পমালায় অলঙ্কৃত হইয়াছিল। কমলকুটীরের প্রাঙ্গণে অনেকক্ষণ উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন হয়, উপাসনাগৃহে যাইয়া আচার্য্যমহাশয়, ব্রহ্ম জননীরূপে এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এই বলিয়া গভীর প্রার্থনা করিলেন। বাড়ী বাড়ী হইতে ব্রাহ্মিকাগণ আসিয়া তখন বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিলেন।"

প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ধর্ম্মতত্ত্বে (১লা পৌষের) আমরা এই সংবাদটি লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই:— "প্রচারযাত্রিক দল দেড় মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান সকলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। হাওড়া, নৈহাটী, গৌরিভা, চুঁচড়া, চন্দননগর, মোকামা, বাড়ঘাট, মোজাফরপুর, গয়া, বাঁকিপুর, ডোমরাও, গাজিপুর, শোণপুর, আরা, মোড়পুকুর।

ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দীতে ছত্রিশটী উপদেশ ও বক্তৃতা হইয়াছে। প্রায় দশ সহস্র লোক বক্তৃতা শুনিয়াছে। চব্বিশটী নগরসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। ভিক্ষার ঝুলিতে পাঁচ শত আশি টাকা দান পাওয়া গিয়াছে, পুস্তক বিক্রয় হিসাবে পঁয়ষট্টি টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।" এই পাঁচ শত আশি টাকার মধ্যে চারি শত পঁয়তাল্লিশ টাকা ব্যয় হয়। প্রচারযাত্রায় প্রায় ছয় শত মাইল যাত্রিগণ ভ্রমণ করিয়াছেন।

প্রচার-সম্বন্ধে শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ

প্রচারযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনানন্তর, ২৩শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর, সোমবার) প্রচাবকসভায় নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ হয়:—

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ হইতে পূর্ব্বে যেমন, এখনও সেইরূপ আহ্বানপত্র আসিতেছে। যাঁহারা আমাদের বিরোধী, এমন সকল সমাজ হইতেও নিমন্ত্রণ পাওয়া যাইতেছে। ইহা সত্যের গৌরবরক্ষণার্থ অথবা উদার ভাবপ্রদর্শনার্থ অথবা উপকার পাইবার ইচ্ছা হইতেই হউক, আমরা এরূপ নিমন্ত্রণ সাদর ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকগণ বিরোধী সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে যাওয়াতে, পাছে উক্ত সমাজের উচ্চ আদর্শের কিঞ্চিন্মাত্র লাঘব হয় এবং তাঁহাদিগকে বিরুদ্ধ-মতের প্রতিপোষক বলিয়া সাধারণের মনে পাছে ভ্রান্তি জন্মে, এই হেতু প্রচারকসভা হইতে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যাঁহারা আমাদের প্রচারক ভ্রাতাদিগকে আহ্বান করিবেন, তাঁহাদের যেন স্মরণ থাকে যে, প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণের প্রতি ভক্তি, যোগ, বৈরাগ্য, নামকীর্ত্তন, বর্ত্তমান বিধান, সামাজিক উন্নতি অপেক্ষা ধর্ম্মোন্নতির প্রাধান্য ও স্ত্রীজাতির পবিত্রতাসংরক্ষণ প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক এই মতে আমরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি, এবং যাঁহারা এই সকল মত না মানেন, তাঁহা-দিগকে আমরা ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী মনে করি।"

বিশ্বজননীর নামে ঘোষণাপত্র

এই সময়ে (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ) বিশ্বজননীর নামে, এই ঘোষণাপত্র 'মিরারে' প্রকাশিত হয়:—

"ভারতবর্ষস্থ আমার সমুদায় সৈন্যগণের সমীপে।—

"সকলের নিকটে আমার প্রিয় সম্ভাষণ। এই ঘোষণাপত্র গ্রহণ কর; বিশ্বাস

কর যে, ইহা তোমাদের মাতার নামে, মাতার প্রেমসহকারে স্বর্গ হইতে তোমাদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে। অনুগত সৈনিক এবং ভক্তিমান্ সন্ততিগণের ন্যায় ইহাতে যে সকল আদেশ আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত কর। তোমরা আমার সেনা, আমার অঙ্গীকারবদ্ধ সেনা। আমার পতাকার নিম্নে সাহস ও বিশ্বাস-সহকারে সংগ্রাম করিতে তোমরা বাধ্য; তোমরা আর কোন ঈশ্বরের সেবা করিতে পার না। আমি তোমাদিগকে জয় দান করিব, এবং চিরন্তন গৌরব তোমাদেরই হইবে। জাতীয় উদ্ধারসম্পাদনার্থ আমার বিশেষ বিধাতৃত্বের ক্রিয়া সমুদায় জাতির নিকটে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, আমি ভারতবর্ষকে মনোনীত করিয়াছি। ব্রিটিযশাসন আমার শাসন; ব্রাহ্মসমাজ আমার মণ্ডলী। এ উভয়মধ্যে যাহা কিছু মন্দ আছে, তাহা মানবীয়, এবং উহা আমার তিরস্কারভাজন হইবে; কিন্তু এ উভয়ের সার ঐশ্বরিক এবং আমার। ভারতবর্ষে আমার পথ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্রিটিষ জাতিকে প্রেরণ করিয়াছি, এবং আমার গৃহনির্ম্মাণের জন্য ব্রাহ্মমণ্ডলীস্থাপন করিয়াছি। লোকদিগকে শাসন, তাহাদিগকে শিক্ষা ও বিষয়সুখ অর্পণ এবং তাহাদিগের স্বাস্থ্য ও সম্পদ রক্ষা করিবার জন্য, আমার কন্যা কুইন ভিক্টোরিয়াকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছি, এবং দেশ শাসন করিবার জন্য তদুপরি আধিপত্য দিয়াছি। তোমাদের দেশকে সুশাসনের সকল প্রকার আশিষ অর্পণ এবং তোমাদিগকে অজ্ঞানতা, রোগ, দুর্ভিক্ষ, শাসনোচ্ছৃঙ্খলতা, অত্যাচার এবং বিধিহীনতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আমার নিকট হইতে সে আদেশ পাইয়াছে; তাহার অনুগত হও, কেন না তাহার নিয়োগপত্রে আমার স্বাক্ষর আছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে সে আমা হইতে ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে; সুতরাং তাহাকে ভক্তি ও বাধ্যতা অর্পণ কর। যাহা সিজরের, তাহা সিজরকে দাও, এবং তোমাদের রাজ্ঞীর যাহা প্রাপ্য, তাহার দশাংশের একাংশ হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিও না। আমার ভৃত্য ও প্রতিনিধিস্বরূপে তাহাকে ভালবাস ও সম্মান কর, এবং তাহাকে তোমাদের আনুগত্যসম্ভূত কার্য্যসমর্থন ও সহকারিতা দাও যে, সে আমার অভিপ্রায় সকল অবাধে সম্পন্ন করিতে পারে এবং ভারতবর্ষকে রাজ্যসম্পর্কীয় এবং বিষয়সম্পর্কীয় সৌভাগ্য অর্পণ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে রক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে গমন কর এবং তথায় সম্মুখসমরে আমার মারাত্মক

শত্রুগণকে পরাজয় কর, বধ কর। দেশমধ্যে প্রচলিত বিবিধাকারের অবিশ্বস্ততা, ইন্দ্রিয়াসক্তি, অসত্য, অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থপরতা এবং সকল প্রকারের অসত্যমূলক পূজাপদ্ধতি আমার শত্রু। এই সকলের বিরুদ্ধে তোমাদের মিলিত বল নিয়োগ কর, এবং তোমাদের বিক্রমপূর্ণ প্রার্থনায় তাহাদিগকে চূর্ণ কর। প্রেমের তরবারিতে সাম্প্রদায়িকতা এবং অভ্রাতৃভাব খণ্ড খণ্ড কর; যে কোন অসত্যের গড় ও সংশয়ের দুর্গ তোমাদের সম্মুখে পড়ে, তাহাকে বিশ্বাসাগ্নিতে দগ্ধ কর; এবং সকল প্রকারের অপবিত্রতা এবং দুরাত্মতা ভক্তি ও উচ্চতম দৃষ্টান্তের অগ্ন্যস্ত্রে উড়াইয়া দাও। যেমন আমার শত্রুগণকে বিনাশ করিবে, অমনি আমার নাম-ঘোষণা এবং আমার সিংহাসনস্থাপন কর। কোন মধ্যবর্ত্তী বা ক্ষমাপ্রার্থনা-কারীর সাহায্য বিনা, সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার নিকটে লোকদিগকে আসিতে বল। গৃহাধিষ্ঠিত পার্থিব জননীর এবং রাজ্যশাসনের শীর্ষদেশস্থ মাতা রাজ্ঞীর প্রভাব আমার ভারতসন্ততিগণের হৃদয়কে পরম মাতার দিকে উত্থাপিত করিবে এবং তাহাদিগকে স্বর্গরাজ্যে একত্র মিলিত করিয়া শান্তি ও পরিত্রাণ দিবে। সৈনিক-গণ সাহসসহকারে সংগ্রাম কর এবং আমার রাজ্য স্থাপন কর।" "ভারতের মা"

১৮ই ডিসেম্বর (১৮৭৯ খৃঃ) বৃহস্পতিবার, মেডিকাল কলেজ থিয়েটরে, বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে, কেশবচন্দ্র 'জড়বাদ ও বিজ্ঞানবাদ' (Materialism and Idealism) বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মেস্তর টনি সাহেবের অনুপস্থিতিনিবন্ধন মেস্তর সি এচ্ এ ডল সভাপতি হন। এই বক্তৃতায় গৃহ-পরিবারাদির উপরে বিজ্ঞানবাদ ও জড়বাদ কি প্রকার আত্মপ্রভাব বিস্তার করে, ইতিহাসে এ দুইয়ের কি প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিশেষ-রূপে প্রদর্শিত হয়। ভারতবর্ষ বিজ্ঞানবাদ-প্রধান; ইহার বিজ্ঞানবাদিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়া, ইউরোপ হইতে জড়বাদসম্পর্কীয় শিক্ষণীয় বিষয় সকল গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা তিনি শ্রোতৃবর্গকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। বিজ্ঞানবাদিত্বে বিবেকিত্ব, অসাংসারিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, এবং জড়বাদিত্বে সাংসারিকতা, নীতির অনৈকান্তিকতা ও অনাধ্যাত্মিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এ উভয়ের সমভাবে সন্নিবেশ হইলে, বিজ্ঞানবাদিত্ব দ্বারা জড়বাদের দোষ অপনীত হয় এবং কেবল বিজ্ঞানবাদ দ্বারা সংসারবৈমুখ্য উপস্থিত হইয়া তৎসম্পর্কীয় কর্ত্তব্যের প্রতি যে অবহেলা হয়, তাহা জড়বাদের প্রভাবে তিরোহিত হয়।

৪

পঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক—নবশিশুর জন্ম

যুগধর্ম্মব্রত

এবার সাংবৎসরিক উৎসবের (১) প্রারম্ভদিনে, ১লা মাঘ, ১৮০১ শক (১৪ই জানুয়ারী, ১৮৮০ খৃঃ), বুধবার প্রাতঃকালে, নয় জন যুবা যুবধর্ম্মব্রত গ্রহণ করেন। প্রাত্যহিক প্রাতঃকালীন উপাসনার সময় ব্রতার্থী যুবকগণের নিকটে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত ব্রতের নিয়মগুলি পঠিত হয়; তদনন্তর তাহাদিগকে কেশবচন্দ্র এই উপদেশ দেন:—"ঈশ্বর তোমাদিগকে হাত ধরিয়া আনিলেন। তাঁহার সমক্ষে দুই সপ্তাহের জন্য এই উচ্চ পবিত্র ব্রত গ্রহণ কর। নিরাশা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, এই ব্রত সাধন করিবে। ইহার নাম যুবধর্ম্মব্রত। এই ব্রতসাধনে অশেষ কল্যাণ। গৃহস্থ যুবা ঈশ্বরের নিকট এই ব্রত গ্রহণ করিয়া, দিন দিন কল্যাণ এবং শান্তি অর্জ্জন করুন।

"এই যুবধর্ম্মব্রতে নীতিকে শ্রেষ্ঠ জানিবে। এমন নীতি গ্রহণ কর, যাহাতে চরিত্র শুদ্ধ হইবে। তোমাদের চরিত্রের সুগন্ধে এবং সৌন্দর্য্যে চারিদিক্ মুগ্ধ হইবে। সাধু যুবা, ঈশ্বরপরায়ণ যুবা হইয়া, দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার জন্য, উৎসবের প্রারম্ভে তোমরা এই যুবধর্ম্মব্রত গ্রহণ কর। চিরযৌবন, চির উৎসব তোমাদের জীবনকে আমোদিত করুক। তোমাদিগের অটল বিশ্বাস এবং জীবন্ত উৎসাহ দেখিয়া, আমাদের আশা পূর্ণ হউক। তোমাদের উচ্চ দৃষ্টান্তদর্শনে দেশের অন্যান্য যুবকদিগের জীবন পবিত্র হউক। তোমরা সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এই ব্রত ধারণ কর।"

ব্রতের নিয়ম

(কখন করিব না)

১। নরহত্যা করিব না।

২। ব্যভিচার করিব না।

---

(১) পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবের বিবরণ ১৮০১ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৬ই ফাল্গুন এবং ১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

৩। মাদকসেবন করিব না।

৪। অসাধুসঙ্গ করিব না।
(কখন হইব না)

৫। মিথ্যাবাদী হইব না।

৬। অবিশ্বাসী হইব না।

৭। কপট হইব না।

৮। বিধর্ম্মী হইব না।

(২রা মাঘ হইতে ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত)

১। প্রাতঃস্মরণীয়-পাঠ।

২। স্নানাদি।

৩। উপদেশ।

৪। পিতামাতাকে প্রণাম।

৫। ধর্ম্মপুস্তক-পাঠ।

৬। কোন ভ্রাতাকে সেবা।

৭। নির্জ্জন চিন্তা ও প্রার্থনা।

৮। একটি বৃক্ষ-সেবা।

৯। পশুপক্ষি-সেবা।

১০। দৈনিক-দোষগুণ-লেখা।

উৎসবের দ্বারোদ্ঘাটন

সায়ঙ্কালে (১লা মাঘ) ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার এইরূপ প্রার্থনাদিতে উদ্ঘাটিত হয়ঃ—"ঈশ্বরের আনন্দপ্রদ কুশলপ্রদ উৎসবের দ্বারোদ্ঘাটন হইতেছে, আমরা তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করি।" প্রার্থনা—"হে ঈশ্বর, তোমার হস্তরোপিত ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধশতাব্দী অতিক্রম করিতেছেন। হে বিঘ্নবিনাশন, তুমি কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়াছ। পঞ্চাশ বৎসর ইহাকে রক্ষা করিলে, আরও কত কাল ইহা স্থায়ী হইবে, আশা হইতেছে। ইহার তেজস্বিতা ও কোমলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার শ্রীচরণ ধরিতেছি। শত শত শত্রুর মধ্যে তুমি এই পবিত্র সমাজকে দ্রঢ়িষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার এই ঋণের

কি পরিশোধ আছে? এই ধর্ম্মসুধা পান করিয়া সংসারের শোকযন্ত্রণা ভুলিতেছি। আমাদের প্রতিদিনের অবলম্বন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বৎসরান্তে আবার সাংবৎসরিক উৎসব আসিতেছে, মা বলিয়া তোমাকে ডাকি। নূতন অনুরাগের সহিত তোমাকে ডাকিতেছি। আবার সবান্ধবে কত সুধা পান করিব। আবার মলিন কামনা, অবিশুদ্ধ বাসনা দূর করিয়া নির্ম্মল হইব। নূতন বিধির নূতন গান করিব। আমাদের মা বাপ তুমি, পুণ্য শান্তি সকলই তুমি। সকলের মস্তকের উপর শান্তিজলবর্ষণ কর। মা হইয়া আসিয়াছ, পৃথিবীর উদ্ধারের উপায় হইল। তোমার শুভাগমন-বার্ত্তা সকলকে জানাই। সমস্ত সাধু মহাপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, মা, এবার সকল ধর্ম্ম এক করিবে। তুমি কৃপা করিয়া, বিশ্বব্যাপী পূর্ণ বিশ্বাস হস্তে করিয়া আমাদিগের নিকট এস, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা।"

"শুন হে নূতন বিধি আনন্দের সমাচার" এই সুদীর্ঘ সঙ্গীতটি গীত হইলে, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অবরুদ্ধ করিতে না পারিয়া, এইরূপ প্রার্থনা করেন :—"হে জ্যোতির্ম্ময়, নূতন বিধির সংবাদ আসিল। স্বর্গের বায়ু পাপভারাক্রান্ত ধরাতলে নামিল। জয় দয়াময়, তোমারই জয়, জয় উৎসবময়। জয় আনন্দময় ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের জয়। আমরা সপরিবারে সবান্ধবে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ কর। রক্তের সঙ্গে মিলিত হও, শব্দকে অগ্নিময় কর, বিশ্বাসকে সতেজ কর। পাপাত্মা হইয়াও তোমার কৃপাতে উৎসবভোগ করি। অনেক আমাদের পাপ, তোমার চক্ষুর অগ্নিতে আমরা দগ্ধ হইতেছি, তোমার শব্দ গর্জ্জিত হইতেছে, তোমার বিক্রম ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে; যুগে যুগে তোমার নামে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, এখনও সে সকল ব্যাপার হইতেছে। তোমার স্পর্শ, তোমার প্রত্যাদেশ, তোমার শুভাগমনে আমরা কৃতার্থ হইতেছি। তোমার নিঃশ্বাসবায়ু আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের, প্রচারকদিগের, সঙ্গীতপ্রচারকের এবং আচার্য্যের আত্মাতে বিশেষরূপে অবতীর্ণ হও এবং আমার ন্যায় পাপীদিগের কল্যাণ কর। হে ঈশ্বর, তুমি আসিয়াছ, তোমার আজ্ঞা হইয়াছে যে, আমরা উৎসব করি। জয় উৎসবের রাজা।"

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক

২রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী), বৃহস্পতিবার, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক হয়; রেবারেণ্ড ডল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরাজীতে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে বলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন সমুদায় ধর্ম্মের তুলনা দ্বারা, কিরূপে ধর্ম্মবিজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বলেন, সমুদায় ধর্ম্মের তুলনা দ্বারা ধর্ম্মবিজ্ঞানোৎপাদন চরম কার্য্য নহে। সমুদায় বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য একত্বসম্পাদন। সমুদায় ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া যদি পরিশেষে অনেককে এক করিতে না পারা যায়, বহুত্বকে একত্বে পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে কেবল তুলনা নিষ্ফল। তিনি প্রস্তাব করেন, আগামী বর্ষে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য যথোপযুক্তরূপ নির্ব্বাহিত হয় এবং এজন্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ে, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বর্ত্তমান দর্শন বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন জড়বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ, রেভারেণ্ড ডল খৃষ্টধর্ম্ম এবং শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুধর্ম্মের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তাদি-বিষয়ে বলিবেন। রেবারেণ্ড ডল কেশবচন্দ্রের কথিত বিষয়ের অনুসরণ করিয়া, 'ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব' ধর্ম্মে উচ্চ একত্ব উল্লেখ করেন। অনন্তর সভাভঙ্গ হয়।

"আশালতা"

৩রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী), শুক্রবার, আলবার্ট স্কুলের সুরাপাননিবারণী সভার 'আশালতা' বাহির হয়। প্রায় দুই শত ছাত্র রক্তবর্ণ ফিতায় শোভিত হইয়া, পতাকাধারণপূর্ব্বক, ইংরাজী ব্যাণ্ডের সঙ্গে সুরাপাননিবারক সঙ্গীত গান করিতে করিতে, আলবার্ট স্কুল হইতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রের ভবন কমলকুটীরে উপনীত হয়। সেখানে সমবেত লোকমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, সুরার বিষময়-ফলপ্রদর্শক সঙ্গীতগানকরণানন্তর 'আশালতা' সৈন্যদল মিষ্টান্ন, নেবু ও শীতল জল পান করিলে, কেশবচন্দ্র সম্মুখবর্ত্তী দাহার্থ নির্ম্মিত 'সুরারাক্ষসের' মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া, সুরার অপকারিতা এবং তাহার উচ্ছেদসাধনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে হাস্য, সন্তোষ ও উৎসাহোদ্দীপক বক্তৃতা করেন। পরিশেষে 'আশালতা' সৈন্যদল আহ্লাদ ও উৎসাহ সহকারে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে, সুরারাক্ষসকে

চূর্ণবিচূর্ণ এবং অগ্নিতে দগ্ধ করে। অদ্যকার দিনের কার্য্যে সমূহ উদ্যম, উৎসাহ ও জীবন্তভাব লক্ষিত হয়।

গড়ের মাঠে বক্তৃতা—'যোগ ভক্তির বিবাহ'

৪ঠা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী), শনিবার অপরাহ্ণে, গড়ের মাঠে 'অনাচ্ছাদিত-প্রান্তর-গত' বক্তৃতা হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বহুবিধ বহুসংখ্যক লোক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নূতনবিধানাঙ্কিতপতাকাশোভিত নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে সমবেত হইলে, সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্গীত আরম্ভ হয়। কেশবচন্দ্র প্রথমতঃ বাঙ্গলাতে, তৎপরে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাঙ্গলা বক্তৃতা অতি সুদীর্ঘ, আমরা উহার শেষাংশমাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিঃ—"সত্যভূমিতে যবন এবং হিন্দু এক হইয়া গেল। ঈশ্বরের নিকটে সকলের মিলন রহিয়াছে। অতএব পৃথিবীতে যতগুলি মুসলমান আছেন, সকলকেই হরিদাস হইতে হইবে এবং যতগুলি হিন্দু আছেন, সকলকে একেশ্বরবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে হইবে। সেই আনন্দের সময়, সেই শুভ বিবাহের দিন আসিতেছে। সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে আমরা সহোদরজ্ঞানে আলিঙ্গন করিব। সকল বিবাদের মীমাংসাস্থল ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্মে বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রীষ্টান, নানক, কবীরপন্থী প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের মিলন হইয়াছে। প্রেমের সঙ্গে যোগের মিলন হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা, বেদ পুরাণের করস্পর্শ হইবে। চারি হাজার বৎসরকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিব। এস আর্য্য ভ্রাতা সকল, এস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ, এস যোগী ঋষিগণ, তোমরা আসিয়া গভীর যোগ-সমাধির দৃষ্টান্ত দেখাও। এস প্রেমোন্মত্ত ভক্তবৃন্দ, তোমরা আমাদিগের শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির প্রমত্ততা সঞ্চারিত কর; ঈশ্বরের কৃপাতে, এই কোলাহলপূর্ণ সভ্যতার মধ্যে, আমরা যোগী এবং ভক্ত হইব। নিস্তব্ধ ধ্যানের সঙ্গে খোলের শব্দ মিলিয়া যাইবে। বৈকুণ্ঠ এখানে নহে, ওখানে নহে, বাহিরে নহে, বৈকুণ্ঠ ভিতরে। যাহার যোগবল, ভক্তিবল আছে, সে সংসারেই স্বর্গ দেখিতে পায়। সে আপনার স্ত্রী-পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া, নিত্যানন্দ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরে মগ্ন হয়। ঈশ্বরের কৃপাবলে সে তাহার স্ত্রীর মুখে হরির কথা শুনিতে পায় এবং তাহার প্রিয়দর্শন সুকোমল-মতি শিশু সন্তানেরাও ধ্রুব-প্রহ্লাদের ন্যায় হরিনাম করিয়া তাহার প্রমত্ততা বৃদ্ধি করে। যে হরিকে ভজে, হরিই তাহার রাজা হন। হরি আমাদের

রাজা, আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার দাসী হইয়া এই ভারতরাজ্য রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার রাজ্যে আমরা কেমন কুশলে রহিয়াছি। এই মাঠে আগে কত লোকের গলা কাটা গিয়াছে, কত দস্যু কত নরহত্যা করিয়াছে; কিন্তু আজ আমরা কেমন নিরাপদ। ইহাতে কি তোমরা ঈশ্বরের হস্ত দেখিতেছ না? হরির শাসন সর্ব্বত্র। সকলই হরির লীলা। সেই হরির পাদপদ্ম হইতে অপ্রতিহতভাবে যোগ ও প্রেমের স্রোত বহিতেছে। কাহার সাধ্য, সেই স্রোত অবরুদ্ধ করে? সমুদ্র কি কেনিউট নরপতির আজ্ঞা শুনিয়াছিল?......সমুদ্রের গতি অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রেম-স্রোতের বেগ অধিক। কে সেই বেগ নিবারণ করিবে? নূতন বিধান আসিয়াছে। যোগভক্তির বিবাহ উপস্থিত। কাহাকেও সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে না; কিন্তু সংসারে থাকিয়াই প্রমত্ত বৈরাগী হইতে হইবে। কাহাকেও অকারণে কষ্ট দেওয়া হরির ইচ্ছা নহে। তিনি মার মত মধুরপ্রকৃতি, সকলকে কোলে করিয়া তিনি পবিত্র এবং সুখী করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায়।"

দোষস্বীকারবিধির প্রবর্ত্তন

৫ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী), রবিবার প্রাতে, ব্রহ্মমন্দিরে আরাধনা, ধ্যান ও পাঠানন্তর নিম্নলিখিত প্রণালীতে কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক দোষস্বীকারবিধি প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব বলিতেছেন, "সে দিনকার গাম্ভীর্য্য ও ভয়শঙ্কোদ্দীপক ভাব আজও আমাদিগের চিত্রপটে মুদ্রিত আছে।" এত বৎসর পরে আমরাও এই কথাগুলিই প্রতিধ্বনিত করিতেছি। দোষস্বীকারপ্রবর্ত্তনবিধি নবীন ব্যাপার বলিয়া, আমরা উহার সমগ্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"হে ব্রাহ্মগণ, এই সময়ে গত বৎসরের পাপ স্বীকার করিবে, অনুতাপ করিবে; এবং আগামী বৎসরের জন্য ব্রত গ্রহণ করিবে। অতএব গম্ভীরভাবে আত্মচিন্তা কর। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর যিনি মস্তকের কেশ গণনা করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ যিনি অনন্ত ঘৃণার সহিত পাপকে ঘৃণা করেন, তিনি এখানে আপন সিংহাসনে বসিয়া আছেন। উৎসবের সহিত নববর্ষের আরম্ভ হইল। আমি কি করিলাম, কি না করিলাম, কি করা উচিত, ভাবিব। সর্ব্বসাক্ষীর কোটি কোটি চক্ষু। তাঁহার চক্ষুর অগ্নি সমুদায়ের হৃদয়কে আলোকিত করুক। সেই

আলোকে আপন আপন দোষ দেখিয়া হৃদয়কে পবিত্র করি। ঈশ্বর বিচারাসনে বসিলেন, প্রত্যেক অপরাধী ব্রাহ্ম বিচারে আনীত হইল। এই যথার্থ বিচারক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন কর। আমরা সেই বিচারের ভিতরে মস্তক স্থাপন করি। যে পূর্ণবিশ্বাসী হয় নাই, ভক্ত হয় নাই, চরিত্র বিশুদ্ধ করে নাই, মিথ্যা কথা কহিতেছে, ভ্রাতাকে নিষ্ঠুর ভাবে নির্য্যাতন করিতেছে, নরনারীর প্রতি পবিত্র এবং সুকোমল ব্যবহার করে নাই, যে প্রচারক ষোল আনা অনুরাগ উৎসাহের সহিত প্রচার করেন নাই, তাঁহারা এই বিচারাসনের নিম্নে দণ্ডায়মান। ঈশ্বর পবিত্র নিশ্বাস দ্বারা ভয়ানক পাপ চূর্ণ করিতেছেন। প্রত্যেক পাপী নম্র হইয়া, হাত যোড় করিয়া, ধর্ম্মবল প্রার্থনা করুক, যেন ভবিষ্যতে সেই বলে পাপবিকার দূর করিতে পারে, এজন্য দেব-প্রসাদ ভিক্ষা করুক।

"হে ঈশ্বর, তোমার কাছে বন্দী হইয়া আনীত হইলাম। তোমার কাছে মনের দোষ স্বীকার করি। সরলতা বিনয় দাও। ভবিষ্যতে সাধুস্বভাব সুনির্ম্মলচরিত্র হইব, তোমার নিকট এই ব্রত গ্রহণ করি। সমস্ত রিপুকে দমন করিতে ক্ষমতা প্রদান কর। আমি পতিত, আমি ঘৃণিত, ইহা যেন কথায় না বলি। ভবিষ্যতে যেন যথার্থ সাধু হই। এই হস্তদ্বয় যেন সত্যের, দয়ার অনুষ্ঠান করে। এই হৃদয়ের ভিতরে বিবেকের সিংহাসনতলে যেন সমস্ত প্রকৃতি বশীভূত থাকে, সর্ব্বদা যেন পবিত্রতার সূর্য্য উজ্জ্বল থাকে; প্রত্যেক ব্রাহ্মকে শুদ্ধচরিত্র কর। মা, চিরকালের জননি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ পুণ্য দাও, সেই পদার্থ তোমার ভিতরে আছে বলিয়া তোমার এত মহিমা। ব্রহ্মতেজ প্রেরণ কর, অস্থির ভিতরে সেই তেজ প্রবিষ্ট হউক। প্রাণকে সচ্চরিত্র কর, বৈরাগী কর, ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র কর, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বসিয়া হুঙ্কার কর। তোমার বিজয়ভেরী শুনিয়া শত্রুকুল পলায়ন করুক। পাপের দৌরাত্ম্য হইতে সকলে বিমুক্ত হউন। যেমন এক একটি করিয়া কাঁটা বাহির করে, তেমনি পাপ-কাঁটাগুলি এক একটী করিয়া বাহির কর। হস্ত, পদ, শরীর, মন, রসনা সমস্ত শুদ্ধ কর, শুদ্ধতার মধ্যে টানিয়া লইয়া যাও। তোমার সমুদায় উপাসক যেন আজ পবিত্রতা লইয়া যান। আজ দোষ স্বীকার করার দিন। মা, পুণ্য দাও, পুণ্য দাও। কলঙ্কিত ব্রাহ্মসমাজ পুণ্য চাহিতেছে।

শিশুর মত, নির্ম্মলচিত্ত বালক বালিকার মত কর; প্রবঞ্চনা কি, জানিব না, সরলভাবে ব্রহ্মপদাশ্রিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইব। ক্ষণকাল আমাদিগকে এই বিষয় ভাবিতে দাও, আত্মচিন্তা করিতে দাও, তব প্রসাদে যেন নির্ম্মল হই, তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাহিতেছি।

"হে আত্মন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি মিথ্যাবাদী হইয়াছ কি না? মিথ্যা কথা দ্বারা আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি না?

"হে আত্মন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি অপবিত্র নয়নে তোমার কোন ভাই ভগ্নীর প্রতি তাকাইয়াছ কি না? তুমি ঈশ্বর-সমক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দাও।

"হে আত্মন্, তুমি কোন ভাই ভগ্নীর শরীরের কোন প্রকার হানি হউক, শ্রীভ্রষ্ট হউক, এমন ইচ্ছা করিয়াছ কিনা? তাহা স্বীকার কর।

"হে আত্মন্, তুমি অহঙ্কারী হইয়া, তোমার কোন ভাই ভগ্নীকে নীচ মনে করিয়াছ কি না? সেই বিষয়ে যদি দোষ থাকে, তাহা স্বীকার কর।

"হে আত্মন্, তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কখন অবিশ্বাস করিয়াছ কি না? ঈশ্বর ও সত্যের প্রতি সন্দেহ হইয়াছে কি না, স্মরণ করিয়া দেখ, দোষ স্বীকার কর।

"হে আত্মন্, তুমি ভক্তিবিহীন হইয়া শুষ্ক পূজা, শুষ্ক আরাধনা করিয়াছ কি না? ঈশ্বরের কাজে শুষ্কতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছ কি না? তাহা ভাবিয়া দেখ।

"হে আত্মন্, তুমি স্বর্গীয় সাধুদিগকে কখনও অপমান করিয়াছ কি না? যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া জগতের কল্যাণ করিয়াছেন, তুমি জঘন্য অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের অপমান করিয়াছ কি না? তুমি জীবিত ও মৃতদিগের কোন প্রকার অনাদর করিয়াছ কিনা? স্মরণ কর।

"হে আত্মন্, ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এবং সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তদুপযুক্ত বল, বুদ্ধি, পরিশ্রম, অর্থনিয়োগ করিতে কৃপণ ও কুণ্ঠিত হইয়া, আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি না? ধর্ম্মের জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়াছ কি না? যদি না করিয়া থাক, অপরাধী বলিয়া স্বীকার কর।

"হে ধর্ম্মপ্রচারকগণ, তোমরা যত পরিমাণে ঈশ্বরের নিকট অন্ন বস্ত্র পাইয়াছ, যত পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের নিকট অন্ন জল পাইয়াছ, যাহাতে ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, সাধ্যানুসারে সেই পরিমাণে যত্নবান্ হইয়াছ কি না? যদি অনেক খাইয়া থাক, অল্প দিয়া থাক, যদি কখন নিরাশ হইয়া জড়ের মত বসিয়া থাক, যদি ঈশ্বরের নামে প্রচারে তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া থাক, যদি কেবল আপনার সুখসম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিয়া থাক, যদি ভারত ও সমস্ত পৃথিবীর জন্য না ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে ঘোর অপরাধী বলিয়া স্বীকার কর। ব্রহ্মের সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

"হে দয়াসিন্ধু, তোমার গম্ভীর বিচারে আমাদিগকে পরীক্ষা কর, আমাদিগকে দণ্ড দাও; হে স্নেহময়ী জননী, তোমার দণ্ড দ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধচরিত্র কর, এই তোমার নিকট প্রার্থনা। কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

'নূতনত্ব' বিষয়ে উপদেশ

সায়ঙ্কালের উপাসনাতে (৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী) কেশবচন্দ্র নূতনত্ব-বিষয়ে উপদেশ (১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন। নূতনতা না থাকিলে উৎসব হয় না, নূতনতা না থাকিলে ধর্ম্মবিধান হয় না। "ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব কোথায়? যেখানে নূতন সামগ্রী। নূতন ব্যাপার যদি কিছু না থাকে, তবে মাঘমাসে উৎসব হইতে পারে না। জগৎকে এমন কিছু দেখাইতে হইবে, যাহা বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাঠে, ঘাটে, হাটে ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন করিলে উৎসব হয় না। ইহা অপেক্ষা দশ গুণ অধিক ভক্তির উন্মত্ততা পৃথিবী দেখিয়াছে। অনেকক্ষণ যোগধ্যান করিলেও উৎসব হয় না। পুরাতন যোগী ঋষিরা দীর্ঘকাল এ সকল করিয়াছেন। যদি অন্যান্য ধর্ম্ম যাহা দিয়াছে, তুমি আবার তাহাই দিতে আসিয়া থাক, তবে, হে ব্রাহ্মসমাজ, তোমার পৃথিবীতে না আসাই ভাল ছিল। যদি তোমার নিজের কিছু দিবার না থাকে, যদি তুমি পুনরুক্তি করিতে আসিয়া থাক, তবে তুমি চলিয়া যাও, পৃথিবীতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন ধর্ম্ম। তোমার ধর্ম্ম যদিও হিন্দু. বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সমুদায় ধর্ম্ম পূর্ণ করিতে আসিয়াছে, তথাপি তুমি নূতন।......বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মবিধান ঈশ্বরকে যেরূপ প্রকাশ করিতেছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মে হয় নাই।......পূর্ব্ব

পূর্ব্ব ধর্ম্মবিধানে যোগ ধ্যান বৈরাগ্য প্রেম ভক্তি এ সমুদায় ভাবের প্রাদুর্ভাব ছিল; কিন্তু এখনকার যোগভক্তি নূতন প্রকারের। পূর্ব্বকার সাধকেরাও 'ঈশ্বরের প্রসন্ন বদন', 'সহাস্য মুখ' এ সকল কথা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু আমরা নূতন ভাবে এ সকল কথা ব্যবহার করিতেছি। আমাদের ঈশ্বর নিরাকার, অথচ 'ব্রহ্মদর্শন' 'ব্রহ্মবাণীশ্রবণ' 'ব্রহ্মপাদপদ্ম' এ সকল কথা ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু এ সকল কথা অপূর্ব্বভাবে ভাবের উদ্রেক করে।......কথা পুরাতন, ভাব নূতন। বর্ত্তমান বিধানানুসারে আমরা যাঁহাকে বৈরাগী বলি, তিনি অন্যান্য ধর্ম্মের সন্ন্যাসী বৈরাগীর ন্যায় নহেন। আমরা যাঁহাকে সংসারী বলি, তিনি প্রচলিতভাবের সংসারী নহেন। আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, প্রত্যাদেশ, পরলোক, স্বর্গরাজ্য, এ সমস্ত নূতনভাবে পরিপূর্ণ।......যাঁহারা নূতন হইতে নূতনতর জীবন লাভ করিবেন, তাঁহারাই কেবল এই বিধানভুক্ত থাকিবেন।...... নিত্য নূতন ভক্তিপুষ্পে ব্রহ্মার্চ্চনা করিতে হইবে। গত কল্য যে ভাবে ঈশ্বর-দর্শন করিয়াছ, আজ সে ভাবে ঈশ্বরদর্শন করিলে চলিবে না, আজ উজ্জ্বলতর রূপে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। অদ্যকার বিশ্বাসের তুলনায় কল্যকার বিশ্বাস অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতা মনে হইবে। যাহাদের অদ্য কল্য অপেক্ষা এত নূতন, তাহাদের ধর্ম্মে পুরাতন কিছু থাকিতে পারে না। প্রতিদিন স্বর্গ হইতে নূতন বায়ু আসিতেছে, ঘন ঘন ব্রহ্মের নূতন নূতন নিঃশ্বাস বহিতেছে, প্রতিদিন নবভাব আসিতেছে। ঈশ্বরের এত অনুগ্রহ।......যাহারা নির্জীব মৃতভাবে কল্পিত দেবতার পূজা করে, তোমরা কখনই তাহাদের সমান হইবে না। বিশেষ এবং নূতনভাবে তোমরা ব্রহ্মপূজা করিবে।......পুরাতন তোমরা নহ, সাধারণ তোমরা নহ। নূতন জননী তোমাদের, নূতন ধর্ম্মবিধান তোমাদের, নূতন ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হও।"

৬ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী), সোমবার, ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার রাত্রি আটটার সময়, 'ব্রাহ্মসমাজ কি স্থায়ী হইবে?' এতৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা

৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী), মঙ্গলবার, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণসভা হয়। এই সভাতে প্রথমতঃ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ হইলে,

প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র বার্ষিক আয়ব্যয়বিবরণ উপস্থিত করিয়া, ঈশ্বর কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে সামান্য উপায়ে এতগুলি পরিবারকে ভরণপোষণ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ-পাঠানন্তর নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণগুলি স্থিরতর হইল ঃ—

১। এই সভা ইউরোপ এবং আমেরিকাস্থ সমুদায় উদার, একেশ্বরবাদী, দেশহিতৈষী এবং দেশসংস্কারকগণকে বার্ষিক সাদর সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন। এই নির্দ্ধারণে মিস্ ফ্রান্সিস্ কবের আরোগ্যসংবাদ প্রদত্ত হইল এবং প্রফেসর ম্যাক্সমূলরকে ইউরোপ এবং ভারতবর্ষে উদারমতপ্রবর্ত্তনের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

২। গবর্ণমেণ্ট এদেশে যে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া, সম্রাট্ ভিক্টোরিয়া, যাঁহার রাজত্বে বিশেষ কুশল হইয়াছে, তৎপ্রতি একান্ত রাজভক্তি প্রকাশ করা হয়।

৩। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য কমিটী সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্বসভ্যগণের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত সভ্যগণ মনোনীত হন ঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচাঁদ ধর

" " দীননাথ চক্রবর্ত্তী

" " ক্ষেত্রমোহন দত্ত

সভাপতি কেশবচন্দ্রের কথা

সভাপতি কেশবচন্দ্র যে সকল কথা বলিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন, সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন; কেননা তদ্দ্বারা তৎকালের বিশেষ অবস্থা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি বলেন ঃ—"যদিও আমরা অনেক সময় আশার কথা বলিয়া থাকি, তথাপি সময়ে সময়ে আমাদিগের জীবনে ঘন অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। সত্য সত্যই আমাদিগের উন্নতি হইতেছে কি না, বৎসরান্তে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। এই সভাতে সর্ব্বপ্রথমে এই কর্ত্তব্য, দেশস্থ বিদেশস্থ যে সকল ভ্রাতা ভগ্নী ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে আমাদিগের আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া। যে সকল কার্য্যবিবরণ পাঠ হইল, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, গত বৎসর কোন প্রকার আনুকূল্যের অভাব হয় নাই।

"গত বৎসর প্রায় দশ সহস্র টাকা প্রচারের জন্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় কথা, লোকের সাহায্য। ঈশ্বরের কার্য্যনির্ব্বাহজন্য যত লোকের সাহায্য আবশ্যক, ঈশ্বর তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন। বিশ্বাসীদিগের দল অটল রহিয়াছে। লোকসংখ্যা হ্রাস হয় নাই, এবং বিশ্বাসীদিগের আশা উৎসাহ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। এ সকল উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া, বিবেকের আলোকানুসারে আমি এই প্রস্তাব করি যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আক্রমণকারীদিগকে ধন্যবাদ করা হয়। পৃথিবীতে শত্রু বলিয়া একটি শব্দ আছে, সে শব্দ শুনিলেই মানুষের হৃদয়ের প্রেম শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু আমি জানি, এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পৃথিবীর ব্যাপার নহে, ইহা ঈশ্বরের হস্তরচিত, সুতরাং ইহার শত্রু নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের শত্রু নাই। ঈশ্বর শত্রু মিত্র সকলের দ্বারাই তাঁহার রাজ্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বিপদ্ দ্বারা তিনি তাঁহার সাধকদিগের বিশ্বাস প্রবল করেন। বিরোধীদিগের আক্রমণে সাধকদিগের সমূহ উপকার হয়। এই জন্য সাধকেরা বিরোধীদিগের চরণতলে পড়িয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন। যদি গত বৎসর আক্রমণ এবং আন্দোলন না হইত, তাহা হইলে এখন যেরূপ বিশ্বাসের প্রাবল্য হইয়াছে, আর দশ বৎসরেও তাহা হইত না। বিরোধ যদি না হইত, এ সকল উন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাইতাম না। গত বৎসরের আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের এক শত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মেরা নিরুৎসাহী হইতেছিলেন, প্রচারকদিগের উৎসাহ হ্রাস হইতেছিল, এই বিরোধ না হইলে তাঁহাদিগের উৎসাহ উত্তেজিত হইত না। প্রচারযাত্রা (Expedition) না হইলে ঈশ্বরের সন্তানগণ উত্তেজিত হইতেন না। আক্রমণে ও কুৎসিতকথাশ্রবণে বিশ্বাসীদিগের হৃদয় আরও সাধু ও উৎসাহী হইল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ক্ষমাগুণ দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। একদিকে যেমন ক্ষমাগুণ বাড়িয়াছে, অন্যদিকে কার্য্যসম্বন্ধে আবার সিংহের আস্ফালন। গত বৎসর স্থানে স্থানে প্রচারযাত্রা এবং নানাপ্রকার পুস্তকাদিপ্রচার হইয়াছে। অনুরাগ উৎসাহের হ্রাস দেখা যায় না। হাটে মাঠে গরিবদিগের জন্য কীর্ত্তন এবং বক্তৃতাদি, যুবাদিগের জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রভৃতি রীতিপূর্ব্বক পূর্ব্বে ছিল না। পূর্ব্বে ঘরের ভিতর আসিয়া সহস্রাধিক লোক সুশিক্ষা লাভ করিত, কিন্তু গত বৎসর হাজার

হাজার অশিক্ষিত লোকের নিকটেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। কোথাও ভক্তি, আশা, উৎসাহের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় নাই। এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের কীর্ত্তি। যাঁহারা এই সমাজকে গালাগালি দেন এবং আক্রমণ করেন, তাঁহারা ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতএব বিরোধীদিগকেও এই সমাজের কৃতজ্ঞতা দেওয়া উচিত। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শত্রু নাই, এই সমাজের শত্রু হইতে পারে না। শত্রুতা করিয়া কেহই এই সমাজের বীজ নষ্ট করিতে পারে না। যে ভূমির উপরে এই সমাজ স্থাপিত, সেই ভূমির গুণে এবং এই সমাজের বীজের গুণে এই সমাজবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শত্রু নাই, প্রত্যেকেই ইহার মিত্র। শত্রুদের আক্রমণে এই সমাজের উন্নতি হয়, এই সমাজের সাধকগণের উপাসনা মিষ্টতর হয়। বিরোধীদিগের কঠোর আক্রমণে সাধকদিগের ঈশ্বরদর্শন উজ্জ্বলতর হইয়াছে। গত বৎসর যে প্রকার ধর্ম্মের আন্দোলন দেখা গিয়াছে, এমন আর বহুকালে দেখা যায় নাই। ঈশ্বর দেখিলেন, অবিশ্বাস, নিরাশা, সংসারাসক্তিতে সকল শ্রেণীর লোক মারা যাইতেছে, এ জন্য তিনি যথাকালে এক মহান্দোলন অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও এখন বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। এখন একটি উপদেশের বিজ্ঞাপন দিলেই, শত শত লোক আসিয়া তাহা শ্রবণ করে। কিন্তু বঙ্গদেশ এখন লোকসংখ্যা চায় না, এখন দেশ এই চায় যে, ধর্ম্ম গঠিত হউক। খাটি অটল বিশ্বাসী দুই জন দেখাও, সমস্ত ভারতবর্ষ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। বার জনে পৃথিবী জয় করিয়াছে, ইহা তোমাদের মনে আছে। তোমরা পনর কুড়ি জনে কি একটি ক্ষুদ্রদেশ ভারতবর্ষ জয় করিতে পার না? ঘনীভূত সাধন দেখাও। তোমাদের শত্রু নাই। যাহারা মনে করে, তোমাদের শত্রুতা করিতেছে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহারাও কল্যাণ করিতেছে। বিলাতের কুমারী কলেট অনেক দিন তোমাদের বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, এখন যদি তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করেন, তাহা দ্বারা তোমাদের কল্যাণ হইবে। তাঁহার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র অনুরাগ কমে নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পরাক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। জননীর গর্ভে সিংহ ছিল

এখনও সিংহের সমস্ত পরাক্রম প্রকাশ পায় নাই। সিংহরবে এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার হইবে। গোটা পঞ্চাশ সিংহ দেশদেশান্তরে ছুটিবে, আশা করি, সমুদ্রপারে যাইতে পারে। ঈশ্বরের এমনি কৌশল যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের শত্রুদিগের অভিশাপ আশীর্ব্বাদে পরিণত হয়। শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে যুদ্ধের সময় প্রচারযাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব যেমন ভাই বন্ধুদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া থাক, সেইরূপ যে সকল শত্রুদ্বারা তোমাদের এত উপকার হইল, যাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ হয়, ঈশ্বরের নিকট এজন্য একটি প্রেমফুল ফেলিয়া দিও। দেখ, স্নেহময়ীর স্নেহে, প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত শত্রুরা আমাদিগের গায়ে যত বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, সে সমস্ত বাণ অলঙ্কার এবং তাঁহাদের অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হইয়াছে। যাঁহারা ঈশ্বরের অধীন, তাঁহাদের কাছে কামানের গোলা সন্দেশ হইয়া যায়। আর দেখ, ঈশ্বরের কেমন বিশেষ করুণা, এত আন্দোলনের মধ্যেও একটি ব্রহ্মভক্তও ব্রাহ্মসমাজ ছাড়েন নাই। ঈশ্বর সকলের মা, ভক্ত তাঁহাকে ছাড়িতে পারেন না, ঈশ্বরকে ছাড়া ভক্তের পক্ষে সম্ভব নহে। কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন, দুই এক জন বিশ্বাসী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া গিয়াছেন; কিন্তু কাহার মনে কি আছে, কে জানে? এইটি অভ্রান্ত সত্য যে, একটি বিশ্বাসীও যান নাই। যদি কোন বিশ্বাসী লুকাইয়া থাকেন, ঈশ্বর তাঁহার বিশ্বাস অনুরাগ পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন। এই যে প্রচারকেরা নিকটে আছেন ইঁহারাও বিশ্বাসসম্পর্কে কেহ দশ হাত, কেহ বিশ হাত দূরে রহিয়াছেন।

"যত রকম অবিশ্বাস আছে, বৎসর বৎসর তাহা বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ ঝাড়া হইতেছে। এক্ষণে অবিশ্বাসী, অল্পবিশ্বাসী থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর নিজে এসে জঞ্জাল পরিষ্কার করিতেছেন। ঈশ্বর এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিচারপতি এবং নেতা। ইহা কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজ নহে। ঈশ্বর তাঁহার বিশ্বাসীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন। তিনি লোকসংখ্যা চাহেন না। তিনি এমন গুটি কতক লোক চাহেন, যাহারা রাস্তার লোকের জ্বালায় জ্বলে, তাঁহার অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়া জমাট সাধন করিবে। অতএব শত্রুদিগের আক্রমণে যদি সাধন ঘনীভূত হয় এবং

বিশ্বজননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ঘনতর প্রেমসুধা পান করা যায়, তবে সেই শত্রুদিগকে কি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নহে? এই সভাতে এই প্রস্তাব হইল যে, বিরোধীদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।"

মল্লিকের ঘাটে বক্তৃতা

৮ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী), বুধবার, মল্লিকের ঘাটে সাধারণ লোকদিগের প্রতি হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষায় উপদেশ ও ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন হয়। এ স্থলে লোকসংখ্যা অন্যূন দুই সহস্র হইয়াছিল। ভাই অমৃতলাল বসু হিন্দীতে এবং দীননাথ মজুমদার বাঙ্গলাতে বক্তৃতা করেন। ইঁহাদের বক্তৃতান্তে, লোকদিগের নিতান্ত উৎসাহ ও অনুরোধে, কেশবচন্দ্র কিছু বলেন। লোকের উৎসাহধ্বনিতে স্থানটি একান্ত পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেলঃ—"দেশীয় বন্ধুগণ, আমার কোন কথা বলিতে অভিলাষ ছিল না; কিন্তু যখন সকলে এখনও দাঁড়াইয়া রহিলেন, বন্ধুগণের অনুরোধে এই দাসের রসনা দুই চারিটি কথা বলিবে। আমি সমস্ত হৃদয়মনের বলের সহিত বলিতেছি, ভারতবর্ষে যাঁহারা নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহারা জাগ্রৎ হইবেন। সৌভাগ্য তাঁহাদের, যাঁহারা এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমন অপূর্ব্ব ঘটনা সকল অনেক শতাব্দী দেখে নাই। ঈশ্বর এখন জাগাইয়া দিতেছেন। এই বঙ্গদেশ আবার ধার্ম্মিক হইবে। এই দেশের কপাল ফিরিয়াছে। প্রাতঃকাল হইবামাত্র যেমন সূর্য্য প্রকাশ হয়, তেমনি ভারতের সৌভাগ্য-প্রাতঃকালের সূর্য্য উদিত হইয়াছে। এত দিন মীমাংসা ছিল না। ধর্ম্মের নামে অনেক রক্তপাত হইয়াছে। ঈশ্বর বলিলেন, এবার কুশল-শান্তিবিস্তার হউক! ঈশ্বর বলিলেন, এস পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, এস দেশ দেশান্তরের ইহলোক পরলোকের যত সাধুপুরুষ, এস। পৃথিবী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভয়ানক বানের শব্দ উঠিল। বেদ জাগে কেন? যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি জাগিয়া উঠেন কেন? বঙ্গদেশে কি হইতেছে? ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি আসিতেছে। ভেড়া একদিকে, বাঘ আর দিকে। হিন্দুর ভিতরে বৈষ্ণব শাক্তের কত কলহ! গরিব ধনীকে মানে না, বৈষ্ণব শাক্তকে ক্ষমা করিতে পারে না। সংসারী লোকের সহবাস সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষবৎ, আবার গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে মানে না। তাকে

ডালে বিবাদ। কি ভয়ানক ব্যাপার! এ সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়া, পৃথিবীতে সকল ধর্ম্মকে এক করা চাই। জলে তেলে মিশিবে! গাড়ী ঘোড়া এক দিকে, যোগ আর এক দিকে। যোগবলে সমস্ত সোণাকে ঈশ্বরের সোণা করিতে হইবে।

"মাটী হ'ল সোণা, অট্টালিকা হ'ল সোণা। যোগবলে যোগস্পর্শে সমস্ত সংসার সোণা হইল। সে পৃথিবী আর দেখি না। ঈশ্বরের চরণস্পর্শমণি-স্পর্শে সমস্ত সোণা হইল। সংসারজঙ্গলে বাঘভল্লুককে ভয় নাই। ধ্রুব জঙ্গলকে ভয় করে না। ছাদের উপর পাঁচ মিনিট বসিয়া, 'পদ্মপলাশলোচন হরি, দেখা দাও' বলিয়া প্রার্থনা কর। 'এখনও ধ্রুব ডাকৃছে, সংসারের ভিতরে থেকেও আমাকে মা বলে ডাকৃছে', এই বলিয়া ঈশ্বর বলিবেন, অপূর্ব্ব লীলা এখানে দেখাতে হ'বে। হরি বলেন, 'যে সংসারের কিছু চায় না, যে আমার ভক্ত হয়, তাকে একবার রাজা করিব, আবার ছেঁড়া কাপড় পরাব।' হরির লীলা কে জানে? রাজর্ষি জনককে তিনি সংসারে বৈকুণ্ঠ দেখাইলেন। এ সকল আশ্চর্য্য লীলা দেখাতে হরি এসেছেন। জলন্ত লৌহের উপরে কামারের ঘা পড়িলে যেমন শক্ত লোহাও গলে যায়, তেমনি পাপের উপরে ঘা পড়িলে পাষাণ-মনও গলিয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে প্রাণকে বৈরাগ্য কর, দেখিবে, কালপেড়ে ধুতিও গেরুয়া হইয়া যাইবে। এবার বঙ্গদেশ দেখ্‌বে, এই কয় জন ক্ষেপিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় বাড়ী বাড়ী হরির নিশান উড়িবে। হরি যখন সহায়, ভয় কি? চন্দ্র, ঈশ্বরের হস্তরচিত চন্দ্র, তুমি বলিয়া দাও, দায়ালচন্দ্র কত বড় চন্দ্র। সেই প্রেমচন্দ্রকে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষ ভজ।"

মঙ্গলবাড়ীর প্রতিষ্ঠা

৯ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী), বৃহস্পতিবার, মঙ্গলবাড়ীর প্রতিষ্ঠা। কমল-কুটীরে নিয়মিত উপাসনান্তে, ব্রাহ্মগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে উপাসনাগৃহ হইতে বাহির হইয়া, কমলকুটীরস্থ পুষ্করিণীর অপর পারে বৈরাগ্যসাধনকুটীরের নিকট এবং তথা হইতে মঙ্গলবাড়ীতে গমন করেন। সেখানে সঙ্কীর্ত্তনান্তে কেশবচন্দ্র মঙ্গলবাটীগৃহের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় জানূপরি উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করেন:—"হে স্নেহময়ী জননী, তোমার হস্তরচিত এই মঙ্গলবাড়ী। ইহার ইটগুলি আমার হৃদয়ে তোমার অপূর্ব্ব স্নেহের পরিচয় দিতেছে।

আমি এই মাটী গ্রহণ করিতেছি, আর আমার শরীর শুদ্ধ হইতেছে। চক্ষে দেখিলাম, হরি, যাহারা তোমাকে প্রাণ মন অর্পণ করিল, তুমি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে। তুমি যে বলিয়াছ, যুগে যুগে যাহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আমার চরণে মাথা রাখে, তাহাদের সকল অভাব আমি মোচন করি; এই যুগে ত তুমি তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে। এই বাড়ীগুলি ছায়া নহে। ইহা তোমার কীর্ত্তি। ব্রহ্ম একজন আছেন, সকলে জানে; কিন্তু ব্রহ্ম আসিয়া দুঃখী দুঃখিনীর আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করেন, ইহা সকলে জানে না। ধ্রুবলোকনির্ম্মাণ হইল। সামান্য স্থান ইহা নহে। এ মার হাতের জিনিষ। এ বাড়ী যে ছোঁবে, সে পবিত্র হবে। প্রচারকবন্ধুদিগকে তুমি সমাদর করিতেছ। যাহাতে তাঁহাদের হরিভক্তি বৃদ্ধি পায়, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। অবিশ্বাসীদের চক্ষু প্রস্ফুটিত কর। কাল্‌কের জন্য ভাবছে না যাহারা, তুমি তাহাদের জন্য ভাব। আমরা সকলে ভক্তির সহিত, আশার সহিত বার বার তোমাকে প্রণাম করি।” অদ্য রজনীতে প্রচারকগণ স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া, ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া সেবাব্রতপ্রতিপালন করেন।

ব্রাহ্মিকাগণের উৎসব—‘সংসারে স্বর্গভোগ’ উপদেশ

১০ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী), শুক্রবার, ব্রাহ্মিকাগণের উৎসব। প্রায় এক শত মহিলা উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। আমরা কেশবচন্দ্রের উপদেশের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—“যদি অবিশ্বাস কর, হে বঙ্গবাসিনী ব্রহ্মকন্যা, তাহা হইলে ভাল কিছু দেখিতে পাইবে না। আর যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে এমন সকল ব্যাপার দেখিতে পাইবে, যাহা কখন দেখ নাই, এবং কখন যে দেখিতে পাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাব নাই। দুঃখিনী সে, যে এখনও ঐ সকল ব্যাপার না দেখিয়া সংসারে বসিয়া কেবল টাকা গণিতেছে। সেও দুঃখিনী, যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও কেবল সংসার সংসার বলিয়া আপনাকে বিষয়কর্ম্মে মত্ত রাখিতেছে। ব্রাহ্মিকা হইয়া যাহার সংসারাসক্তি ঘুচিল না, সে দুঃখিনী। দুঃখিনী কে? যে স্বর্গের কাছে আছে, অথচ স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। যে জানে, মা বাঁচিয়া আছেন, অথচ মাকে দেখিতে পায় না, সে অত্যন্ত দুঃখিনী। যে, মা বাঁচিয়া আছেন কি না, সংবাদ পায় নাই, সে তেমন দুঃখিনী নহে। বঙ্গদেশের ব্রহ্মকন্যা, তুমি কি মনে কর যে, তুমি

সকলই জানিয়াছ? এখনও স্বর্গের নরনারীদের সঙ্গে তোমাদের আলাপ করা হইল না।......যেখানে প্রাচীন কালে আর্য্যকন্যাগণ, মৈত্রেয়ী, গার্গী, সাবিত্রী, সীতাদেবী প্রভৃতি বসিয়া সৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন, সেই স্থান কেমন সুখের স্থান! সেই সুখধামে প্রবেশ করিতে না পারিলে, তোমাদের দুঃখ যাইবে না। এখনও তোমরা দুঃখিনী, কেন না তোমরা সেই দেবকন্যাদিগের সঙ্গে তোমাদের সুর মিলাইতে পার নাই। যখন সেই ব্রহ্মকন্যাদিগের কোমল হৃদয় হইতে সুমধুর ব্রহ্মস্তব উঠিতে থাকে, তখন স্বর্গের জননী নিজে সেই কন্যাদিগকে তাঁহার ক্রোড়ে লইয়া, তাঁহাদের মুখে অমৃত ঢালিয়া দেন; সেই উপরের ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিলে, তোমাদিগের দুঃখ ঘুচিবে না।...... মৃত্যুর পরে সতী সাধ্বী সকল বৈকুণ্ঠে যায়, এই কথা তোমরা সকলে শুনিয়াছ; কিন্তু এই পৃথিবীতেই সশরীরে স্বর্গভোগ করা যায়, ইহা বুঝি তোমরা জান না। মৃত্যুর পরে আমরা যে স্বর্গভোগ করিব, আমি আজ সেই স্বর্গের কথা বলিতেছি না; কিন্তু এই ঘরে এখনই আমরা যে স্বর্গের মধ্যে রহিয়াছি, তাহারই কথা বলিতেছি। আমাদের প্রতিজনের আত্মার ভিতরে যে যথার্থ উপাসনা ঘর আছে, তাহার ছাদের উপর পরলোকবাসিনী সাধ্বী ভগিনীগণ মধুর বীণাযন্ত্রে ঈশ্বরের গুণগান করিতেছেন।......মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইবে, এই আশা করিয়া, ইহলোকে বর্ত্তমান স্বর্গ অবহেলা করিও না। ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিয়া, বর্ত্তমান পরিত্যাগ করিও না। স্বর্গভোগ করিতে আর বিলম্ব করিওনা। আজ সংসারকার্য্যে ব্যস্ত, কাল স্বর্গে যাইব, আর এরূপ বলিও না। যখনই স্বর্গের শব্দ শুনিবে, তখনই স্বর্গে যাইবে। ভবিষ্যতে শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া, বিলম্ব করিও না। যেখানে পাপ দুঃখ অশান্তি নাই, সেখানে যাইতে কেন বিলম্ব করিবে!...তোমাদের প্রতিজনের বুকের ভিতর প্রেমদ্বার আছে, সেই দ্বার খুলিলে একটি কুটীর দেখিতে পাইবে, সেখানে ঈশ্বর নিত্যকালের জন্য আপনার স্বর্গধাম খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই কুটিরমধ্যে গিয়া জগদীশ্বরীকে বলিবে, মা, আমি কি স্বর্গে স্থান পাইব না? যে একবার বলে, আমি ঈশ্বরকে চাই, সে ঈশ্বরকে পায়। তোমরা যদি বল, আমরা পৃথিবীতে থাকিব না, আমরা আমাদের প্রাণের স্বর্গীয়া ভগ্নীদের সঙ্গে থাকিব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা স্বর্গের অধিকারিণী হইবে।......তোমরা কি ধ্রুব

প্রহ্লাদকে দেখিয়া বলিবে না, 'ওরে ধ্রুব, ওরে প্রহ্লাদ, তোরা বালকমতি, নিতান্ত শিশু তোরা, তোরা আমাদের কোলে আয়।......ভক্তির অবতার তোরা।' কোন ভক্ত মরেন নাই। স্বর্গের ছেলে মেয়েরা মার কাছে বসে আছেন। তাঁহাদের যদি 'বাছা' বলে আদর করিতে পার, তরিয়া যাইবে। নিরাকার মাকে ডাকিলে, নিরাকার ভাই ভগ্নীকেও পাওয়া যায়। এক হরির বাড়ীতে গিয়া সমস্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হইলাম।"

আর্য্যনারীসমাজের অধিবেশন—'আদর্শ চরিত্র' বিষয়ে উপদেশ

সন্ধ্যার পর (১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী), কমলকুটীরে আর্য্যনারীসমাজের অধিবেশন হয়। সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ দেন, তাহার সার এই :—"আর্য্যনারীসমাজের সভ্যগণ, তোমাদের জীবন এরূপ হওয়া চাই যে, দেখিলেই যেন তোমাদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার উদয় হয়। তোমাদিগের চরিত্র নারীচরিত্রের আদর্শ হইবে, তোমরা ধর্ম্মালঙ্কারে ভূষিত হইবে, প্রেম-পুণ্য-বিনয়ের জীবন ধারণ করিবে। সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ভারতের পুণ্যবতী নারীগণের জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত তোমাদের অনুকরণীয়। তোমরা সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তির সাধনা কর, পরম জননীকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া ধন্য হও, সংসারে ও জীবনের সমুদায় ঘটনায় তাঁহার প্রেম দর্শন কর। ইহলোক-পরলোকবাসী সাধুদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে। দুঃখীদিগের প্রতি দয়া করিতে শিক্ষা কর। এখন হইতে তোমরা জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া লও। আপনাদিগের ভার আপনারা লও। নির্জ্জন সাধনার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট কর, নির্জ্জনে সজনে ব্রহ্মপূজা কর, সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও সৎসঙ্গ করিয়া সুখী ও শুদ্ধচরিত্র হও।" উপদেশান্তে ফাদার লাফোঁ বৈদ্যুতিক প্রদর্শন করিয়া, তদ্বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। এ দিন ব্রাহ্মিকাগণের নিরতিশয় আনন্দ ও উৎসাহ হইয়াছিল।

'জলাভিষেক' বিষয়ে উপদেশ

১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী), শনিবার প্রাতঃকালে, ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও জলাভিষেকবিষয়ে উপদেশ (১৮০১ শকের ১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) হয়। এই উপদেশের শেষাংশমাত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"ব্রহ্মমন্দিরের আকাশ একটি প্রকাণ্ড সমুদ্র। উৎসবের সময় এই মন্দিরের করুণাসিন্ধু দেবতা প্রচুর পরিমাণে জলসেক করিবেন। হে ব্রাহ্ম, হৃদয়কে অভিষিক্ত না করিয়া,

ব্রহ্মমন্দিরে আসিও না। ঈশ্বরের ব্যাপ্তিজলে আগে স্নান কর। সেই ব্যাপ্তি-বারি শরীরে প্রণালীর ভিতর দিয়া রক্তরূপে প্রবাহিত হইতেছে। এই জীবন্ত বিশ্বাসের অভিষেক প্রাণপ্রদ। একবার এই ঈশ্বরের সত্তাতে, এই বিশ্বাসের গঙ্গাতে অবগাহন কর। তুমি যখন কাল প্রত্যূষে এখানে আসিবে, সর্ব্বাঙ্গে এই ব্রহ্মজলে আর্দ্র হইয়া আসিবে। ঈশ্বরেতে অবগাহন করিলে, ঈশ্বর প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করেন। যথার্থ অন্তরের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, ব্রহ্ম প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন কি না? কেমন, প্রাণ! ব্রহ্মব্যাপ্তিজল তোমার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কি? বুকে হাত দিয়া দেখিবে, যদি যথার্থ ব্রহ্মবিশ্বাসী হও, দেখিবে, ব্রহ্মজলাভিষেকে তোমার সেই সন্তপ্ত বক্ষ আর নাই। যেমন শরীর জলে প্রবিষ্ট হয়, জলও শরীরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যেমন জীবাত্মা নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া পরমাত্মাতে প্রবেশ করে, পরমাত্মাও প্রাণরূপে, জ্ঞানরূপে, ভক্তিশান্তিরূপে জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। আগে অভিষিক্ত, পরে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মসহবাসের সুখ পাইয়া কৃতার্থ হইবে।"

'উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদর্শন' বিষয়ে বক্তৃতা

অপরাহ্ণে (১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী), টাউনহলে "উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদর্শন" এই বিষয়ে কেশবচন্দ্রের ইংরেজীতে বক্তৃতা। দুই সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত। ব্রহ্মদর্শনের গূঢ় তত্ত্ব বলিতে গিয়া, তিনি এইরূপ কথায় ও প্রার্থনায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন—"আমি অদ্য এখানে ব্রহ্মদর্শনের নিগূঢ় বিষয় বলিতে উপস্থিত হইয়াছি। এই বাহ্যাড়ম্বর এবং জড়বাদের সময়ে জীবন্ত জগতের ঈশ্বরকে দর্শন করা সম্ভব কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অভিপ্রায়। হে ঈশ্বর, হে কালপরম্পরার আলোক, হে নিত্যকালের জ্ঞান, যখন আমি এই গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিব, তখন তুমি আমার হৃদয়কে আলোকিত ও আত্মাকে বলিষ্ঠ কর, যেন আমি তোমার সত্যের সাক্ষী হইতে পারি, অবসন্ন হইয়া না পড়ি।" ঈশ্বর-দর্শন ও বিজ্ঞান এ উভয়ের মধ্যে যে কোন বিরোধ নাই, ইহা প্রদর্শন করিতে গিয়া তিনি বলেন, "উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরদর্শন এবং বিজ্ঞান এ দুইয়ের মধ্যে কোন বিসংবাদ নাই। বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ একত্ব ভালবাসেন। ...বৎসর বৎসরে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন, বিমিশ্র অবিমিশ্রে, বহুত্ব একত্বে পরিণত হইতেছে, প্রকৃতিস্থ 'বল' (force) সমুদায়ের সংখ্যা দিন দিন

ন্যূন করা হইতেছে এবং সমুদায় 'বলকে' একটি 'বলে' পরিণত করিবার জন্য প্রবল অভিলাষ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, কি মনুষ্যমন, কি বাহ্য জগৎ, সর্ব্বত্র একটি বল আছে, সমুদায় প্রকৃতি যাহার অধীন। এই আদিম বল জড় বা চেতন, এ সম্বন্ধে একালের বড় বড় লোকেরা অন্ধকারে আছেন। অবশ্য জড়বাদিগণ ইহাকে জড় বলরূপে স্থির করিতে ব্যগ্র; এমন কি, কেহ সমুদায়কে বৈদ্যুতিক বলে পরিণত করেন। এ বল যাহা হউক, তাহা হউক, সমগ্রবলের একত্বে সকলে একমত, এই বিষয়টি লইয়া আমাদের বিচার। এই এক আদিম মূল বল হইতে, যাহাই কেন ইহার নাম হউক না, সমুদায় সৃষ্টির জীবনীশক্তি ও ক্রিয়াশীলতা প্রবাহিত হইতেছে। বিশ্বের পরিধি বিস্তৃত, কিন্তু একটিমাত্র ইহার মধ্যবিন্দু। এই একটি কি? এই একটি বল কি, যাহাতে মন ও জড়ের মূল নির্দ্দিষ্ট হয়, যাহা বিজ্ঞানবিদ্‌গণের চিরকালের আশা এবং অভিলাষকে পূর্ণ করিবে? এই গৃহের প্রাচীরে, স্তম্ভে, সমবেত নরনারীতে, পৃথিবীতে এবং উপরিস্থ আকাশে, আলোকে এবং বায়ুতে, সমুদ্র এবং মহাসমুদ্রে, শিলোচ্চয়ে এবং পর্ব্বতে, বাহ্য জগতে ও অন্তর্জগতে, ইতিহাস এবং জীবনবৃত্তান্তে কি সেই এক বল, যাহা সকলেতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সকলকে পরিচালিত করিতেছে এবং উভয় মন ও জড়কে জীবনীশক্তি ও ক্রিয়াশীলত্ব অর্পণ করিতেছে? জগতে জড় ও চিন্তার পরিচালনের মূলে কি অবস্থিতি করিতেছে? এ কি বৈদ্যুতিক বল? তাই হউক। বৈদ্যুতিক বলই কি এতগুলি বল, এতগুলি বিবিধ আকারের বস্তু ও জীবজন্তুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে? একটি বল অবশ্য সকলের নিম্নে, সকলের গভীরতম স্থানে অবস্থিতি করিতেছে; এমন কি, সে বৈদ্যুতিক বলের নিম্নে অবস্থিতি করিয়া উহা তাহাকে বলপ্রদান করিতেছে। কি সেই গূঢ় বল, যাহা আলোকের আলোক, বৈদ্যুতিক বলের প্রাণ, প্রকৃতিস্থ সমুদায় জ্ঞাত অজ্ঞাত বলসমুদায়কে পোষণ করে, উদ্যমশীল করে? এই গূঢ় অব্যক্ত আদিম বলকে আমি অসংশয়িতরূপে ঈশ্বরবল বলি। একটি জ্ঞানময় ইচ্ছাশক্তি সমুদায় রহস্য উদ্ঘাটন করে. এবং চিরদিনের অভিলষিত সমাধান আনিয়া উপস্থিত করে।" সর্ব্বত্র এই ঈশ্বরবল প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি বলিতেছেন, "এক স্বর্গীয় হস্ত সমুদায় বস্তুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। নিম্নস্থ পৃথিবী,

উপরিস্থ আকাশে দেখ, দেবাগ্নি প্রজ্বলিত। দেখ, চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ঈশ্বরের সংস্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সমুদায় প্রকৃতি অগ্নিময় হইয়াছে। সেই স্বর্গীয় অগ্নি প্রত্যেক স্থানে কিরণ বিস্তার করিতেছে, ঈশ্বরবল জগতের বিবিধ বলের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছে। সৃষ্টির প্রত্যেক জীবন্তবলমধ্যে এই সর্ব্বগত অনুপ্রবিষ্ট বলকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ কর। অহো আমার দক্ষিণ হস্ত! আমি তোমাতে নাড়ীর গতি অনুভব করিতেছি। কি গূঢ় রহস্য! তোমার শিরায় গুপ্তভাবে কি অবস্থিতি করিতেছে? এ কি মৃত জড়শক্তি, এবং তদ্ব্যতীত আর কিছু নয়? আমি তোমার ভিতরে ঈশ্বর হইতে প্রসূত জীবন্ত বল অনুভব করিতেছি, যে বলে সমুদায় রক্ষিত এবং বিধৃত রহিয়াছে। এইখানে সেই বল আমি অনুভব করিতেছি, দেখিতেছি এবং আমি উহাকে বাস্তবিক ঘটনা, অপরিহার্য্য তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করি।" এই ঈশ্বরবলের সহিত পুত্ররূপী অধ্যাত্মবল সকল যে চিরসংযুক্ত, তাহা তিনি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"সেই মহান্ পরমাত্মার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিংহাসনে তাঁহারা বসিয়া আছেন, যাঁহার মহিমা তাঁহাদিগেতে এবং যাঁহার মহিমাতে তাঁহারা বাস করেন। আহা ধন্য শরীরবিযুক্ত আত্মার সমাজ! কেমন তাঁহারা মধ্যগত সূর্য্যের আলোকে আলোকিত এবং তাঁহার মহিমা প্রতিফলিত করিতেছেন। স্বর্গীয় অধ্যাত্মবলসকল মহান্ আত্মা কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত। কেহ পৃথক বাস করেন না, কেহ ঈশ্বর হইতে পৃথক বাস করিতে পারেন না। তাঁহাতেই তাঁহারা জীবিত, তাঁহাতেই তাঁহারা গতিবিশিষ্ট, তাঁহাতেই তাঁহারা অবস্থিত। পিতাকে ছাড়িয়া পুত্রের জীবন নাই। যেমন এখানে পার্থিব এবং জড় বল সকল, তেমনি উর্দ্ধে সমুদায় স্বর্গীয় নৈতিক বল সকল—যাঁহাদিগকে আমরা অলোকসামান্য পুরুষ বলি—তাঁহারা সেই আদিম নৈতিক বলে জীবন প্রাপ্ত।" শয়ন, জাগরণ, অশন, পান, পচন, পোষণ, বারণ, বোধন, এই সকলের মধ্যে নিত্যব্রহ্মদর্শন প্রদর্শনপূর্ব্বক, সেই দিন আসিতেছে, যে দিন সকলেই ঈশ্বর ও স্বর্গগত মহাপুরুষগণকে দেখিবেন, এই আশা দিয়া কেশবচন্দ্র বক্তৃতা শেষ করেন।

ব্রহ্মোৎসব—'নবশিশুর জন্ম' ঘোষণা

১২ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী), রবিবার, ব্রহ্মোৎসব। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন:—

"ব্রহ্মমন্দিরের বেদী-সন্নিহিতস্থান বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত হইয়া, শাস্ত্রের প্রধান তপোবনের অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ করিতে লাগিল। তপনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র গৃহ সঙ্গীত-লহরীতে পূর্ণ হইল। আচার্য্য স্বীয় প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে বেদীর শোভাবৃদ্ধি করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তৎকৃত উদ্বোধনে সকলের মন উদ্বুদ্ধ হইল। আরাধনা ধ্যান ধারণাতে সকলের মন স্বর্গীয় দেবগণের সহবাস-লাভের উপযুক্ত হইল। মানবগণমধ্যে দেবগণ অবতীর্ণ হইলেন। যিনি যে আশীর্ব্বাদ-পুষ্প লইয়া স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহা হস্তে লইয়া নবজাত ব্রাহ্মসমাজ-তনয়ের মস্তকে বর্ষণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আচার্য্যের মুখ হইতে নবশিশুর জন্মসংবাদ ঘোষিত হইল। দেবগণ অদৃশ্য দিব্য পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকল দিক প্রসন্ন হইল, নির্ম্মল সুশীতল সুগন্ধ অনুকূল বায়ু বহিতে লাগিল। নবজাত শিশুর সিংহগম্ভীর ধ্বনি সকলের হৃদয় ভেদ করিল, চতুর্দ্দিকে উৎসাহের লহরী উঠিল। এবার ক্রন্দনের ধ্বনি নাই, সকলের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত। এমন জন্মদিনে কে চক্ষুর জল ফেলে? দেবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া জন্মোৎসব করিতে পারে, এমন সৌভাগ্য কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? অদ্য দেবগণের সম্মিলন কেন? অনেক দিন যাহা হয় নাই, অদ্য আজ ধরাধামে তাহা কেন হইল? আজ যাঁহার জন্ম, তিনি যে ধর্ম্মরাজ্যের সকল বিবাদের মীমাংসা করিলেন, পরস্পরের নিকট ঘৃণিত সম্প্রদায় সকলের মহাপুরুষগণ পরস্পর স্কন্ধধারণ করিয়া দণ্ডায়মান, ইহা দেখাইয়া দিলেন। ধর্ম্মরাজ্যসম্বন্ধে, পৃথিবীসম্বন্ধে উহা অতি শুভ সংবাদ। নাস্তিক অবিশ্বাসিগণ যে ছল ধরিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্ষে বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিতেছিল, এতদিনে তাহা তিরোহিত হইল।" অদ্যকার উপদেশের কোন কোন অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"গৃহস্থের ঘরে আজ আনন্দধ্বনি কিসের জন্য? আজ তুরী ভেরী বাদ্য বাজিতেছে কিসের জন্য? দেশ দেশান্তর হইতে লোক সকল আসিয়াছে কিসের জন্য? কুলকামিনীরা ব্যস্ত কিসের জন্য? যুবা বৃদ্ধ বালক সকলে আজ আনন্দিত কেন? অদ্যকার দিন এত আনন্দের দিন হইল কেন? পৃথিবী বঙ্গদেশকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আজ তুমি নূতন কাপড় পরিয়াছ কেন? বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন, 'পৃথিবি, শুন, পঞ্চাশৎবৎসর ব্রাহ্মসমাজগর্ভে

ধর্ম্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের প্রসব-যন্ত্রণার পর…এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদায় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই শিশুর অন্তরে বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র বাইবেল কোরাণ সমুদায় রহিয়াছে। শিশুর মুখের ভিতরে সরস্বতীর মুখ লুক্কায়িত রহিয়াছে। যোগী ঋষিরা যেমন পর্ব্বত কাননে যোগসাধন করেন, শিশু তেমনই জননীর গর্ব্ভে থাকিয়া সকল বিদ্যা শিখিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর, স্বয়ং জ্ঞানপ্রদায়িনী নিরাকারা সরস্বতী শিশুর জিহ্বা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। শিশুর কিছুমাত্র ভয় ভাবনা নাই। কি খাইব, কি পরিব, তিনি এ সকল নীচ ভাবনা ভাবেন না; নিরাকারা লক্ষ্মী সমস্ত ধন ধান্য লইয়া, তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মীর সংসারে তাঁহার বাস। পূর্ণলক্ষ্মী পূর্ণাকারে তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। তাঁহার বৈরাগ্য তাঁহার সুখের সংসার। ……ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মোহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া, শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের একটি ভাই জন্মিয়াছে শুনিয়া, তাঁহাদের কত আহ্লাদ।……স্বর্গের কুলকামিনীরা, যাঁহারা প্রেমপুণ্যে পরমা সুন্দরী, যাঁহারা আমাদের স্বর্গের মা, যাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে আমাদিগের প্রাণ পবিত্র হয়, এই প্রিয়দর্শন শিশুকে 'বাছা' বলিয়া আদর করিতেছেন।…… যাহারা স্বর্গের দেবদেবীদিগের কোলে এই শিশুকে দেখিতে পাও নাই, অন্তঃপুরে যাও। স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ, চক্ষে গিয়া দেখ। আমরা যে কয়জন এই স্বর্গ দেখিলাম, ধন্য হইলাম। আজ মেয়ে পুরুষ যাঁহারা এসেছেন, সকলকে ভিতরে যাইতে হইবে। বন্ধুগণ, সকলে আপন আপন প্রাণের নিগূঢ় স্থানে মনকে প্রেরণ কর। সেখানে স্বর্গীয় যোগী, ঋষি, সাধু, ভক্তগণ, সাধ্বী ঋষি-কন্যাকে দেখিতে পাইবে। যোগবলে দেখ, রূপলাবণ্যময় স্বর্গ। মহাদেব মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন, আর এই শিশু তাঁহার সমস্ত সাধু ভক্ত সন্তানগুলিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। ছোট শিশু হিন্দুস্থানের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। পৃথিবীতে যত ভাবের অবতার হইয়াছে, শিশু সকলকে আপনার ভিতরে এক করিয়া লইয়াছেন। শিশু জন্মিবামাত্র অল্প-ক্ষণের মধ্যে সকলের পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। শিশু বলিলেন,

প্রণাম মহাদেব, প্রণাম দেবতাগণ।……দেবর্ষি, যোগর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি সকলেই হৃদয় খুলিয়া শিশুকে আপন আপন যোগবল ভক্তিবল প্রভৃতি স্বর্গের ধন দিলেন।……মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী প্রতিজনে শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তুমি আমার মত সুখী হও। তুমি পুরুষ, তথাপি নারীর ভাব, স্ত্রীর ভাব, কোমল ভাব তোমার মধ্যে প্রবেশ করুক। এইরূপে শিশু স্বর্গের দেবতাদিগের নিকট নরভাব নারীভাবরূপ আশীর্ব্বাদ পাইয়া, নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে চলিলেন। সে কি সামান্য শিশু! সেই শিশুর জন্ম হইল, আর দুই ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, দুই বিধান থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম্ম এক হইল, সকল বিধান এক বিধানান্তর্গত হইল।……আজ ব্রহ্মমন্দিরে এত লোক কেন এলেন? পৃথিবীর পুরুষদের কাছে স্বর্গের দেবগণ, পৃথিবীর মেয়েদের কাছে স্বর্গের দেবীরা বসিয়া আছেন। যখন আমরা ব্রহ্মস্তব পাঠ করিতেছিলাম, তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে সেই স্তব পাঠ করিলেন। আজ ধরেছি স্বর্গ। স্বর্গ, আর তুমি উড়িয়া যাইও না, আর কাঁদাইয়া যাইও না।……যাও, দুর্গন্ধ অবিশ্বাস, নতুবা গলা টিপিয়া মারিব। এই নূতন বিধান, এই নবকুমারকে না মানিলে মরিবে।……যারা অভক্ত, যারা অবিশ্বাসী, তারা ব্রাহ্ম নহে। যারা মার ভক্ত, তারা সংসারে বৈকুণ্ঠ দেখে। যে মাকে দেখিয়াছে, সে তার স্ত্রীকে আসিয়া বলে, ওরে স্ত্রী, জানিস্, আমি কে? আমি সেই পুরাতন স্বামী নহি, আমি আমার মার দাস; যদি মাকে দেখবি, তবে আমার সঙ্গে আয়, দুজনে যোগসাধন করি। মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া, যোগবলে তেজস্বী হইয়া, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী এবং ছেলেগুলিকে ধ্রুব প্রহ্লাদ করিয়া লইতে হইবে। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। রন্ধনশালায়, শিলনোড়ার মধ্যে, অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে, আপনার শরীরের রক্ত ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে। নববিধান শিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছেন।……নূতন বিধান, নূতন শিশু সকল ঘরে কল্যাণ বিস্তার করুন।"

'সাধুদর্শন ও সত্যগ্রহণ' বিষয়ে প্রসঙ্গ

অদ্য সাধুদর্শন ও সত্যগ্রহণ বিষয়ে এইরূপ প্রসঙ্গ (১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) হয়ঃ—"১ম প্রশ্ন—সাধুদিগকে দর্শন করিতে হইলে কিরূপ

সাধন আবশ্যক ?" "উত্তর—ঈশ্বর মধ্যবর্ত্তী হইয়া সাধুদিগকে দেখান, ইহা বিশ্বাস না করিলে সাধুদিগের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক বুঝা যায় না। যখন বিশ্বাস হয় যে, পরলোকগত সাধুরা ঈশ্বরেতে জীবিত আছেন, তখনই আমরা সাধুদের অস্তিত্ব অনুভব করি। বিশ্বাসের যোগ দৃঢ় হইলে, ভালবাসার যোগ স্থাপন করিতে হয়। সাধুরা অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে বিধর্ম্মী বলা উচিত নহে; বিদেশী বলিয়া কোন সাধুর প্রতি প্রণয়ের হ্রাস কিংবা দুর্ব্বল হইতে দেওয়া উচিত নহে। বিশ্বাস ও অনুরাগ দূরকে নিকট এবং পরকে আপনার করে। সক্রেটিস্, মুষা, ঈশা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের সন্তান এবং আপনার ভ্রাতা জানিয়া ভালবাসিব। এই ভালবাসা এক দিনে হয় না। যতই তাঁহাদের সাধুগুণ দেখিব এবং তাঁহাদের মুখবিনিঃসৃত জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিব, ততই তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইব। তাঁহাদের সঙ্গে (১) বিশ্বাসের যোগ, (২) প্রেমের যোগ, (৩) চরিত্রের যোগ হইবে। চরিত্রের মিলন—ইচ্ছা রুচির মিলন। শুদ্ধ তাঁহাদের সদৃশ হইলে হইবে না ; কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে এক হইতে হইবে। কেবল ঈশা ঈশা বলিলে হইবে না, কিন্তু ঈশার সঙ্গে এক হইতে হইবে। কোন সাধু সর্ব্বব্যাপী অথবা অনন্তকালবর্ত্তী লোক নহেন, সুতরাং সাধুকে দেশ-কালে নিকট করিতে পারা যায় না; কিন্তু বিশ্বাস, প্রেম ও চরিত্রে তাঁহারা নিকট। তাঁহাদের পবিত্র আদর্শ লইয়া জীবন গঠন করিতে হইবে।" "২য় প্রশ্ন—অন্যান্য ধর্ম্মের ভিতর যে সকল সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় কি ?" "উত্তর—সত্য জানিবার জন্য যত নিয়ম আছে, সমস্ত অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যেও কত অসত্য রহিয়াছে। সত্য বাছিয়া লওয়া সহজ নহে। কখন সহজ হয় ? যখন মানুষ আপনার উপর নির্ভর না করিয়া, যে দিকে সত্যের স্রোত চলিতেছে, সেই দিকে আপনাকে ভাসাইয়া দেয়। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এবং মনুষ্যের বুদ্ধি, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপদেশ এবং মনুষ্যের জ্ঞান, এই দুইয়ের ঐক্য হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর বুঝাইয়া দিতেছেন, আমি বুঝিতেছি। যতক্ষণ না এই দুই অদ্বৈত হয়, ততক্ষণ অন্যের কিংবা নিজের মতে সত্য নির্ণয় করা উচিত নহে। মনুষ্যের দেখিবার শক্তি আছে; কিন্তু

সে যদি সূর্য্যের দিকে বিমুখ হইয়া বসে, তাহা হইলে কিরূপে দেখিবে? সত্য ধারণ করিবার জন্য মনকে একটী বিশেষ অবস্থায় রাখিতে হইবে। আমি ঘোর বিষয়ী, আমি কিরূপে বৈরাগ্যের সত্য অবধারণ করিব? ঈশ্বরকে একমাত্র গুরু করিয়া, নিরপেক্ষ, উদারচিত্ত, প্রার্থনাশীল হইয়া সত্যনির্ণয় করিতে হয়। বুদ্ধিতরীর হাল ঈশ্বরকে দিতে হইবে। আপনি নেতা হইব না, কেন না সত্যের উপর পরিত্রাণ নির্ভর করে। অতএব ঈশ্বরের সাহায্যে সর্ব্বদা সত্য অবধারণ করা উচিত।"

'নিরাকারের সৌন্দর্য্য' বিষয়ে উপদেশ

সায়ংকালে (১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী), উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র যে উপদেশ (১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন, তাহারও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। "বৎসরের পর বৎসর নিরাকারের উপাসকের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। যখন বুদ্ধিতে নিরাকারকে ধারণ করা হইল, তখনও অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, নিরাকারকে কি ভালবাসা যায়? নিরাকারকে কি হৃদয় দেওয়া যায়? নিরাকার ঈশ্বর কি একটি ভাব, না, সত্য সত্যই এক জন সুন্দর পুরুষ? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জ্ঞানেতে নিরাকারকে বুঝিলেন, কিন্তু হৃদয়েতে নিরাকারের নিকট পৌঁছিলেন না। প্রেমিক ভক্তেরা দেখিলেন, যিনি নিরাকার সত্য, তিনি শিব, তিনি মঙ্গল, তিনিই সকলকে ধনধান্য দিতেছেন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুখসম্পদ্ দিতেছেন, তিনি আমাদের প্রয়োজন জানিয়া বিবিধ সুন্দর বস্তু সকল রচনা করিতেছেন। এ সকল দেখিয়া নিরাকার ঈশ্বরকে তাঁহারা ভালবাসিতে লাগিলেন।......এইরূপে কিছুদিন যায়, কিন্তু ভালবাসার মত্ততা হয় না। কেবল কার্য্য দেখিয়া হরিকে ভালবাসায় মত্ততা জন্মে না। কীর্ত্তি দেখিয়া ভালবাসিলে ব্যক্তিগত প্রেম হইল কোথায়?...... হরিকে যদি না দেখিলাম, তবে কিরূপে তাঁহার প্রেমে প্রমত্ত হইব? যখন ব্রহ্মসাধকেরা নূতন ভাবে ব্রহ্মারাধনারম্ভ করিলেন, তখন হইতে ভক্তির প্রমত্ততার সূত্রপাত হইল। আরাধনা ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন বস্তু আনয়ন করিয়াছে। আরাধনা দ্বারা সাধক যতই ব্রহ্মের এক একটি স্বরূপ আয়ত্ত করিয়া তাহা সম্ভোগ করেন, ততই মনের মত্ততাবৃদ্ধি হয়। হরির বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে হৃদয়ে প্রগল্ভা ভক্তির সঞ্চার হয়। যখন আরাধনা দ্বারা

হরিভক্তেরা হরির নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলেন, তখন তাঁহারা বুঝিলেন, হরিপ্রেমে মত্ত না হওয়া কঠিন। যাঁহারা হরির নূতন নূতন রূপ দেখিলেন, প্রেমেতে তাঁহাদের গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা হইল। তাঁহারা হরিকে প্রগল্‌ভা ভক্তি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। যিনি সমস্ত গুণের আকর, এবং সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমষ্টি, সেই এক ব্যক্তি, সেই জগতের পিতা মাতা ও বন্ধু, সেই এক সচ্চিদানন্দ মহান্ পুরুষকে তাঁহারা দেখিলেন। এই হরিকে দেখিলে কি মত্ত না হইয়া থাকা যায়? আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির প্রমত্ততা বৃদ্ধি হইতে চলিল।······আগে ঈশ্বরকে পিতা, রাজা, পরিত্রাতা বলিয়াছি, এখন ভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেছি। মার কোমলতা, মার মধুরতাসম্পর্কে যত কথা বলিবে, যত গান বাঁধিবে, ততই বঙ্গদেশ মোহিত হইবে।······এখনকার ভিতরের ব্রাহ্মসমাজের কাছে বাহিরের ব্রাহ্মসমাজ দাঁড়াইতে পারে না। এখন ভিতরের ব্রাহ্মসমাজে লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুটিয়াছে। এখন যখন প্রাণের ভিতরে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' বলি, তখন লক্ষ লক্ষ যোগী ঋষি একত্র হইয়া তাহাতে যোগ দেন। ভাই বন্ধুগণ, কাল নগরকীর্ত্তন হইবে; যাহারা ঈশ্বরকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহারা পথে পথে মার নাম কীর্ত্তন করিবে।······মার নামে কাল নিশান ধরিবে। গোপনে বলিতেছি, শুন; ভক্তির সহিত মার গুণের কথা বলিবে, মাকে গোপনে দেখাইবে। মা বলে ডাকে যে, তখনি স্বর্গে যায় সে। মা বলে যে ডাকে একবার, তার মন হয় প্রেমের আধার। ভাই ভগ্নীগণ, আজ তোমরা সকলে এই উৎসব-মন্দির হইতে মাকে মাথায় করে সংসারে লইয়া যাও। প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর সঙ্গে, মা, তুমি যাও।"

নগরকীর্ত্তন—'তেজোময় ব্রহ্ম' বিষয়ে উপদেশ

১৩ই মাঘ (২৬ জানুয়ারী), সোমবার, প্রাতঃকালে নগরকীর্ত্তনে প্রস্তুত হইবার জন্য যে উপদেশ (১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেওয়া হয়, তাহাতে অগ্নি উদ্গিরিত হয়। 'তেজোময় ব্রহ্ম' উপদেশের বিষয় ছিলেন। "ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দর্শন দিলেন; অথচ সকলে এক কথা বলে কেন? সময়ের পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের রঙ্গ ফিরিল না। তেজোময় ব্রহ্মকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না। হিন্দু যোগী

এবং য়িহুদী বিশ্বাসী উভয়েই এক তেজের ভাব কেন দেখিতেছেন ? দুইয়ের কত প্রভেদ ; কিন্তু উভয়ের দৃষ্ট বস্তু এক হইল কিরূপে ? উভয়কেই নিরাকার পুরুষ অতীন্দ্রিয় তেজের আকারে দেখা দিলেন। কিন্তু এই তেজ কি? এই জ্যোতি কি ? ক্ষুদ্র যোগবলে আমরা বর্ত্তমান শতাব্দীতে দেখিতেছি, ঈশ্বরকে যে তেজোময়রূপে না দেখিল, সে মূল সত্যকে বিনাশ করিল। যে অন্ধকার দেখিল, সে যথার্থ ঈশ্বরকে দেখিল না। ঈশ্বর এক প্রকাণ্ড পুণ্যজ্যোতি, এক মহাতেজ, এক অনন্ত প্রাণ, জ্বলন্ত পাবন অপেক্ষাও অধিক জ্বলন্ত। কিন্তু তিনি পৃথিবীর আগুন অথবা পৃথিবীর বিদ্যুতের ন্যায় নহেন; অথচ তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিতে তেজস্বী হইয়া যায়। যে তাঁহাকে দেখে, সে এক মহাবল এবং মহাতেজ অনুভব করে। জীবনের ঈশ্বর তেজের ঈশ্বর। অগ্নির অর্থ কি ? যাহার ভিতর হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া, নিকটস্থ বস্তু সকলকে উত্তপ্ত করে।......জ্বলন্ত হরি যে দেশে প্রকাশিত হন, তাঁহার তেজঃপ্রভাবে সেই দেশের অন্ধকার, দুর্গন্ধ, পাপ, ব্যভিচার, নাস্তিকতা চলিয়া যায়। যদি আমরা বলি, আমাদের মধ্যে তেজোময় হরি আসিয়াছেন, অথচ আমরা নিস্তেজ শীতল থাকি, তাহা হইলে আমরা এক দল প্রবঞ্চক। তেজোময় ঈশ্বরের উপাসনা করিলে, মন তেজস্বী হইবেই।......যদি দেশস্থ এক জনের হৃদয়েও অগ্নিময় ব্রহ্ম অবতরণ করিয়া থাকিতেন, তাঁহার অগ্নিতে সমস্ত দেশ জ্বলিয়া উঠিত।......প্রাণের ভাই বন্ধু, এই বিশ্বাস কর, হরি আর কিছুই নহেন, তিনি গাছও নহেন, পাথরও নহেন, মুখও নহেন, চক্ষুও নহেন, তিনি এক প্রকাণ্ড তেজ।......যেখানে তেজ থাকে, সেখানে কোন ব্যভিচার থাকিতে পারে না। তেজোময় ঈশ্বরের সাধক হইতে হইলে, সচ্চরিত্র সাধু হইতে হইবে।......প্রচারক, আচার্য্য, উপাচার্য্য. কেবল এই হরিনামের তেজে পাপ-ভূতকে নির্ব্বাসন করিবে। যে পাপকে প্রশ্রয় দেয়, সেও ভূত। অতএব হে পাপপ্রশ্রয়কারী; তুমিও ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূর হও। .....হরি পাপকে প্রশ্রয় দিবেন ? হরি পাপকে উৎসাহ দিবেন ? দীনবন্ধু নাম নিশানে লিখিয়া যদি একজন মদ্যপান করে, সে দীনবন্ধুকে বিশ্বাস করে না। এক জন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, অথচ সে পাপ করে, ইহা ভয়ানক মিথ্যা।..... এক দিকে যেমন ঈশ্বর প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় পাপাত্মাদিগকে দহন করেন, আর এক দিকে তিনি কোমল

চন্দ্রের ন্যায় অনুতপ্ত আত্মা সকলকে সুশীতল করেন। এক দিকে দণ্ডদাতা পিতা হইয়া পাপী সকলকে শাসন করেন, আর এক দিকে স্নেহময়ী মা হইয়া দুঃখী পাপীদিগকে স্নেহ করেন।······সূর্য্য তেজোময়, চন্দ্র ঠাণ্ডা।······এই চন্দ্র সূর্য্য ঈশ্বরের দুই ভাব প্রকাশ করে। ভক্তগণ, তোমরা দুইয়ের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবে। · পুণ্যসূর্য্যের প্রতাপে পাপ নষ্ট হইবে ; চন্দ্রের কান্তিতে পাপী রক্ষা পাইবে।····· সূর্য্য দণ্ডদাতা পিতাস্বরূপ, চন্দ্র মাতাস্বরূপ। দণ্ডদাতা পিতার দণ্ডে পাপী পাপ ছাড়িল, পরে দ্বার খুলিয়া স্নেহময়ী মাতা আসিয়া বলিলেন—'বাছা, বাপের কথা শুনিয়া পাপ ছেড়েছ, এখন আমার কোলে এস।' মা আছেন বলিয়া, এই পাপী পৃথিবী বাঁচিয়া আছে। সত্য পিতা, প্রেম মাতা। কিন্তু ভাই, মার নাম করিতে গিয়া বাপের নাম ভুলিও না। প্রেম প্রেম করিতে গিয়া অসত্য পাপকে প্রশ্রয় দিও না। হে কলিকাতারাজধানি; তুমি আমাদের অনেকের জন্মস্থান। তুমি রোগী হইয়াছ, তোমাকে তিক্ত ঔষধ খাইতে হইবে ; কিন্তু তোমার দুঃখভারাক্রান্ত বক্ষে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িবে। তুমি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া, জ্যোতির্ম্ময় হইয়া, বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া যাইবে।"

অপরাহ্ণে (১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী), কমলকুটীরে ব্রাহ্মগণ সমবেত হন। "সঙ্কীর্ত্তনের সহায় ব্রাহ্মগণ গৈরিক বস্ত্রে ও পুষ্পমালায় সজ্জিত হইয়া, 'নববিধান' এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অঙ্কিত বৃহৎ পতাকাদ্বয় শকটযোগে এবং উনপঞ্চাশৎ পতাকা বালক ও যুবকগণের হস্তে, চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গ ও করতালাদি লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, বিডনস্কোয়ারাভিমুখে প্রস্থান করেন। ঠিক অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের যুদ্ধসজ্জা। সে দিবস লোকের ব্যগ্রতা, উৎসাহ, ব্যাকুলতা কেহ বলিয়া বুঝাইতে পারে না। সাধারণের প্রতি উপদেশের স্থলে সমবেত লোক-মণ্ডলী উর্দ্ধমুখে উপদেষ্টা এবং সঙ্কীর্ত্তয়িতৃগণের প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রায় ছয় সহস্র লোকের সমাগম, সকলেই সম্মুখস্থল অধিকার করিতে ব্যগ্র, কাহার সাধ্য তন্মধ্যে প্রবেশ করে। সঙ্গীতান্তে আচার্য্য মহাশয় নয়নোত্তোলন করিয়া, প্রার্থনানন্তর···উপদেশ প্রদান করেন। লোকের উৎসাহধ্বনি ও আনন্দ-প্রকাশে স্থান পরিপূর্ণ। এই ঘোর শুষ্কভাবের প্রাবল্যের সময়ে মনুষ্যমন ঈশ্বর-প্রেম, ঈশ্বরভক্তির জন্য যে কত দূর লালায়িত, তাহা অদ্য বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যে দৃশ্য দেখা হইয়াছে, ইহা আর কখন বিস্মৃত হইবার নহে।" কেশবচন্দ্রের

অদ্যকার হৃদয়ভেদী সুদীর্ঘ বক্তৃতা আমরা গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, আমরা উহার শেষভাগ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বিডন স্কোয়ারে 'গৌরচন্দ্র' বিষয়ে বক্তৃতা

"দুঃখী ভাই, দুঃখিনী ভগিনীগুলি, আর তোমরা কেঁদ না; কেন না, হরি ধরাতলে এসেছেন, হরি ধরাতলে আছেন। হরি ছাড়া কিছুই হয় না, হরি ছাড়া কিছুই থাকিতে পারে না। 'জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অনলে, অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।' হরি বলিতেছেন, আমি দুঃখী তাপী সকলের ঘরে যাইব, সকলকেই দেখা দিব। ভক্তগুলিকে বুকে করে হরি সর্ব্বত্র বসে আছেন। হরির বুকের ভিতরে লক্ষ্মীস্বরূপ কোমল প্রেম আছে, যত ভক্ত সেই লক্ষ্মীর কোলে গিয়া বসে আছেন। যখনই কোন পাপী কাঁদে, তখনই হরি বলেন, ঐ পাপী কাঁদিতেছে, আর আমি বসিয়া থাকিতে পারি না। ঐ দুঃখী কেঁদেছে, ঐ বিধবা কেঁদেছে, ঐ বঙ্গবাসীরা আমার নামে ক্ষেপেছে, তাহাদিগকে দেখা না দিয়া আর থাকিতে পারি না। জীবনের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য, হরি নূতন সমাচার, নূতন বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। আমি যদি ভ্রান্তির কথা বলি, আমার কথা কাট, খণ্ডন কর; কিন্তু হরির কথা অবিশ্বাস করিও না, তাঁহার কথা অবহেলা করিও না। এমন সুধামাখা হরিতত্ত্ব কে আনিল, জানি না। ধন্য ভক্তগণ, নারদ প্রভৃতি ভক্তদিগকে কোটি কোটি নমস্কার। আমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতেছিল, এই জন্যই গরিব কাঙ্গালদের দুঃখমোচন করিবার জন্য হরি ভক্তদল লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন। আজ পৃথিবী ধরিলেন স্বর্গের হাত; স্বর্গ বলিলেন, এবার সব এক করিব, যোগ ভক্তির বিবাহ দিব। সূর্য্যের তেজের সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার বিবাহ দিব। হরিনামের জয়ধ্বনিতে ধনী দুঃখী সমান হইবে। মার নিকটে ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খের প্রভেদ নাই। আকাশের চন্দ্র, তুমি যখন প্রসন্ন, তোমার মাতা বিশ্বজননীও আমাদের প্রতি প্রসন্ন। তুমি মার প্রেমচক্ষু, তোমার ভিতর দিয়া মা আমাদের পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তোমার বাপ, তোমার রাজা বেঁচে আছেন। তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা বসিয়া আছেন, অতএব বঙ্গবাসী সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া হরি হরি বল।"

বেলঘরিয়ার তপোবনে সাধন ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত মিলন

১৪ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী), মঙ্গলবার অপরাহ্ণে, ব্রাহ্মগণ বেলঘরিয়া তপোবনে গমন করিয়া, দীর্ঘিকাকূলস্থ বৃক্ষতলে ধ্যান ধারণা করেন। সায়ংকালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস আসিয়া মিলিত হন এবং তাঁহার সুমধুর শিক্ষাপ্রদ উক্তিতে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন।

প্রচারযাত্রা

১৫ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী), বুধবার, প্রচারযাত্রা। "অদ্য অপরাহ্ণে, চাঁদপালের ঘাট হইতে সুদৃশ্য বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া, প্রায় এক শত ব্রাহ্ম প্রচারযাত্রিক হইয়া, উত্তরপাড়া গ্রামে যাত্রা করেন। বাষ্পীয় পোত বিচিত্র পতাকামালা ও পুষ্পপল্লবালঙ্কারে সুশোভিত হইয়াছিল। মৃদঙ্গ, করতাল, ভেরীর ধ্বনি সহ ব্রহ্মভক্তগণ গভীরনাদে ভাগীরথীবক্ষে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, সন্ধ্যাকালে উত্তরপাড়ায় আসিয়া নঙ্গর করেন ও সকলে মিলিয়া মহোৎসাহে প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন করিয়া গ্রামটিকে প্রতিধ্বনিত করেন। উত্তরপাড়ার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির গৃহে যাত্রিকদল যাইয়া প্রমত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

ব্রহ্মসাধকব্রত

১৯শে মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী), রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত নবকুমার রায়, শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু, শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নন্দন, শ্রীযুক্ত কালিদাস সরকার, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দে, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বসু, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ, এই দ্বাদশ জন 'ব্রহ্মসাধকব্রত' গ্রহণ করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রসন্নিধানে উপাধ্যায় তাঁহাদিগকে এই বলিয়া উপস্থিত করেন—"ইহারা ব্রহ্মসাধকব্রতগ্রহণের অভিলাষী হওয়াতে, আমি ইঁহাদিগকে আপনার নিকটে আনয়ন করিলাম।" ব্রতার্থিগণ প্রতিজন এই প্রতিজ্ঞা ও নিয়মে ব্রত গ্রহণ করিলেন:—"অদ্য ১৮০১ শকে, রবিবার, ১৯শে মাঘ দিবসে, আমি শ্রী— ব্রহ্মসাধকের ব্রত গ্রহণ করিলাম। (১) প্রতিদিন বিধিমত ব্রহ্মোপাসনা। (২) ধন প্রাপ্ত হইলে সমুদায় ব্রহ্মপাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া নমস্কার।

(৩) অর্থের সদ্ব্যয় এবং অঋণী থাকিবার চেষ্টা। (৪) প্রতিমাসে দীনসেবাজন্য অর্থদান। (৫) সময় নষ্ট করিলে অনুতাপ। (৬) গৃহমধ্যে স্বাস্থ্যনিয়ম-রক্ষা। (৭) পরিবারমধ্যে উপাসনা ও ধর্ম্মসংস্থাপনজন্য বিশেষ চেষ্টা। (৮) দৈনিক আহারের পূর্ব্বে, অত্যন্ত তৃষ্ণায় জলপান করিবার সময়ে, সাংসারিক সমুদায় শুভ কর্ম্মে এবং বিপদ্ভঞ্জন ও রোগশান্তি হইলে ব্রহ্মকে ধন্যবাদ। (৯) বৎসরের প্রথম ফল-ভোজনের সময় ব্রহ্মস্মরণ। (১০) সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থপাঠ। (১১) ইন্দ্রিয়সংযমন ও চিত্তশুদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা। (১২) জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ, সমানের প্রতি ভ্রাতৃভাব। (১৩) অবকাশ, ক্ষমতা ও সঙ্গতি অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারচেষ্টা।" শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব-কৃষ্ণ পাল বুধবার (?) (৪ঠা ফেব্রুয়ারী), শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস শুক্রবার (৬ই ফেব্রুয়ারী) কমলকুটীরে এই ব্রত গ্রহণ করেন।

ব্রতগ্রহণোপলক্ষে আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্রতধারিগণকে এইরূপ উপদেশ (১৮০২ শকের ১লা আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন:—"হে ব্রাহ্মগণ, সংসারের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য তোমরা এই অতি উচ্চ সাধকব্রত গ্রহণ করিলে। মঙ্গলময় বিধাতা স্বয়ং তোমাদিগকে এই দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছেন। তিনি তোমাদিগের অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান। তোমাদের এই ব্রত এক মাসের ব্রত নহে, এক বৎসরের ব্রত নহে, ইহা যাবজ্জীবনের ব্রত। ঈশ্বরের সাহায্যে যাবজ্জীবন তোমরা এই ব্রত পালন করিবে। তাঁহার নিকটে তোমরা নিত্য ভক্তি, প্রেম ও শুদ্ধতা অর্জ্জন করিয়া স্বর্গের জন্য, পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইবে। তোমরা এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের উচ্চ ব্রত কায়মনোবাক্যে পালন করিবে। পৃথিবীর লোকেরা বলে, সংসারে ধর্ম্মসাধন করা যায় না; তোমরা আপনাদিগের জীবন ও চরিত্র দ্বারা সেই অপবিত্র মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করিবে। ঈশ্বরবিহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকেরা বলে, সংসার-মরুভূমিতে স্বর্গের জীবনবৃক্ষ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় না। তাহারা বলে, যাহারা বিবাহ করে, যাহারা সন্তানের পিতামাতা হয়, তাহারা ধ্যানশীল, যোগপরায়ণ যোগী ঋষি হইতে পারে না। আমার এই বিনীত ইচ্ছা এবং তোমাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ যে, তোমরা এই ব্রতসাধনদ্বারা এই বহুদিনের পচা দুর্গন্ধময় অসত্যের প্রতিবাদ কর। হে ব্রাহ্মগণ, যদিও

তোমরা প্রচারকের উচ্চতম ব্রত গ্রহণ কর নাই, যদিও তোমরা 'কল্য কি খাইব?' এ চিন্তা ছাড় নাই, তথাপি তোমরা সংসারে স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করিবে। ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদিগের শ্রেণীর অভাব রহিয়াছে। যাহা প্রচারকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে নাই, তাহা তোমাদিগের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে। তোমরা সংসারে থাকিয়াও সংসারের অতীত স্থানে বাস করিবে। সংসার অন্যান্য লোককে যেমন ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতেছে, তোমাদিগকেও সেইরূপ ধর্ম্মবিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু তোমরা অটলভাবে 'জয় জগদীশ, জয় জগদীশ' বলিতে বলিতে, ভবকাণ্ডারী নামের পাল তুলিয়া দিয়া, অনায়াসে ভবার্ণব পার হইয়া যাইবে। কেমন করিয়া গৃহস্থ হইয়াও, অচলা ভক্তির সহিত ঈশ্বরের অভয় চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া থাকা যায়, তোমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। যখন তোমরা এই ব্রতসাধনে সিদ্ধ হইবে, তখন সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর নিজমুখে জগতের লোককে বলিবেন, 'ইহারা সংসারী হইয়াও ব্রহ্মভক্ত বৈরাগী হইয়াছে। ইহারা নানাপ্রকার সংসারের কার্য্যব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও, ব্রহ্মপূজা এবং ব্রহ্মসেবা-বিধি পরিত্যাগ করে নাই।' ইতিপূর্ব্বে এক ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারব্রত চলিতেছিল, প্রচারকেরা একশ্রেণী, এখন তাঁহাদিগের হস্তধারণ করিয়া তোমরা আর এক শ্রেণী দাঁড়াইলে! তোমরা দেখাইবে, এই মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও পাপপূর্ণ সংসারের মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীশ্রবণ করা যায়, স্ত্রীপুত্রাদি এবং টাকাকড়ি দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও ধ্যানযোগ সাধন করা যায়। বিষয়কর্ম্ম করিলেই যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে হয়, তাহা নহে, এবং আত্মীয় বন্ধুদিগের সঙ্গে থাকিলেই যে ঈশ্বরেতে অনুরাগ থাকে না, তাহা সত্য নহে, অথবা সুনিপুণ বিষয়ী হইলেই ধ্যানযোগ এবং উপাসনাবিহীন হইতে হইবে, তাহা নহে। সংসারের মধ্যে কিরূপে ব্রহ্মরাজ্যস্থাপন করিতে হয়, তোমরা যতগুলি ব্রাহ্ম এই ব্রহ্মসাধক-শ্রেণীভুক্ত, তোমাদিগকে তাহা দেখাইতে হইবে। তোমরা যদি এই উচ্চ সাধনে কৃতকার্য্য হও, শত শত লোক তোমাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। আজ হইতে তোমরা পৃথিবীর আশার বস্তু হইলে। যদিও আশা করা যায় না যে, সকলে প্রচারক হইবেন, কিন্তু সকলেই সংসারে ধর্ম্মসাধন করিতে প্রস্তুত। সংসারে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য এই

বর্ত্তমান নববিধান। অল্প কয়েক জন উদাসীন প্রচারক প্রস্তুত করা এই বিধানের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু জগতের সমুদায় লোককে তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ এবং স্বর্গীয় পরিবারভুক্ত করিবার জন্যই মঙ্গলময় ঈশ্বর এই নববিধান গঠন করিতেছেন। অতএব তোমরা ঈশ্বরের প্রসন্নমুখের দিকে তাকাইয়া, এই উচ্চ ব্রত গ্রহণ এবং অনুসরণ কর। তোমরা তোমাদিগের স্ত্রীপুত্রদিগকে বলিয়া দাও, তাঁহারাও যেন তোমাদিগের সহায় হন। ঈশ্বর স্নেহময়ী জননী, তিনি কৃপা করিয়া তোমাদিগকে এই নূতন বিধানের আশ্রয়ে রাখিয়া, এই ব্রতপালন করিতে সামর্থ্য দিন!"

বর্দ্ধমানে প্রচারযাত্রা

বৎসরান্তে ৫ই ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী), বর্দ্ধমানে প্রচারযাত্রা হয়। ইহার বৃত্তান্ত ধর্ম্মতত্ত্বে (১৬ই ফাল্গুনের) এইরূপ নিবদ্ধ রহিয়াছে:—"গত ৫ই ফাল্গুন, সোমবার, অপরাহ্নে তিনটার সময়, আচার্য্যমহাশয় ও সমুদায় প্রচারক এবং কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু দলবদ্ধ হইয়া, প্রচারার্থ বর্দ্ধমানযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয়েন, তত্রত্য ব্রাহ্মবন্ধু সবান্ধবে ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন। সে দিন ষ্টেশন হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, সকলে অম্বিকাচরণ বাবুর আবাসে উপস্থিত হয়েন। পরদিন স্নানান্তে অম্বিকা বাবুর গৃহে উপাসনা হয়। অপরাহ্ণ প্রায় চারিটার সময় সকলে নগরসঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। এবার যাত্রিকদলে তেইশ জন ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহারা গেরুয়াবস্ত্র ধারণ করিয়া, খোল, করতাল, ভেরী ও ১৫।১৬টী পতাকা ও নূতন বিধানের প্রকাণ্ড নিশান সহ সিংহনাদে ব্রহ্মনামধ্বনি, হরিনামধ্বনি করিতে করিতে, নাচিয়া নাচিয়া নগরের পথে বাহির হন। পথে লোকের এরূপ ভিড় হয় যে, ঠেলাঠেলিতে চলিয়া যাইতে বিষম কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। প্রায় তিন মাইল স্থল ব্যাপিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, সকলে নগরকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। নগরবাসী অনেক ভদ্রলোক কোমর বান্ধিয়া, উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া, ব্রহ্মভক্তদিগের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছেন। এক জন মুসলমান মৌলবী আসিয়া পতাকা ধারণ করেন ও উৎসাহের সহিত সকলের সঙ্গে হরিনামকীর্ত্তন করিয়া সমুদায় পথপর্য্যটন করেন। দুই জন শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ বৈষ্ণব নানা

ভঙ্গীতে অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া বেড়ান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাছারীর মাঠে আচার্য্যমহাশয় ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে বক্তৃতা করেন। আর্য্য যোগী ঋষি ভক্তদিগের সময়ে ভারতের অবস্থা এবং বর্ত্তমান সভ্যতা, সংশয় ও নাস্তিকতার সময়ের অবস্থা তুলনা করিয়া, অগ্নির ন্যায় তেজস্বিনী কথা সকল বলেন। তিনি বিশেষরূপে যোগী, ভক্ত, সাধকদিগের মহত্ব ও গৌরব বর্ণনা করেন। দুই সহস্র, কি দেড় সহস্র শ্রোতা হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতাশ্রবণে চমৎকৃত, আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া, সকলে পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন। বক্তৃতান্তে পুনর্ব্বার সকলে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, শ্যামসাগরদীর্ঘিকার কূলে আসিয়া ক্ষান্ত হন। পরদিন প্রত্যূষে ৬টার ট্রেণে যাত্রিকদল কলিকাতায় যাত্রা করেন। সকলে একখানা শকটে উপবেশন করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত ৬৭ সাতষট্টি মাইল। শকটে অবিশ্রান্ত উৎসাহপূর্ণ সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। এক এক ষ্টেশনে আগ্রহসহকারে লোকে কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল। প্রত্যেক ষ্টেশনে নূতনবিধানের সঙ্গীতের কাগজ সকল বিতরণ করা হইয়াছিল।”

৫

মহাজনসমাগম

স্বর্গীয় মহাত্মাদের উৎসব

রবিবার, ২৮শে পৌষ, ১৮০১ শক (১১ই জানুয়ারী, ১৮৮০ খৃঃ), ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে উপদেশ (১লা মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন, বলিতে হইবে, উহারই মধ্যে মহাজনসমাগমের মূল উদ্দেশ্য বিবৃত রহিয়াছে। তিনি ঐ উপদেশে বলিয়াছেন, "লোকাভাব মনুষ্যকে বিষণ্ণ করে। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ দশ জনের সহবাস পাইবার জন্য ব্যাকুল। যদি দশ জন আসিয়া প্রশংসা করে, মানুষের উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়; আর যদি সে কাহাকেও না দেখিতে পায়, তাহার মন নিরাশ এবং অসুখী হয়, তাহার বক্ষঃস্থল হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া, সে ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দেয়। দশ জনের সহবাসের উপর যাহাদের সুখ নির্ভর করে, লোকাভাবে যে তাহাদের এরূপ দুর্গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মৎস্যের পক্ষে যেমন জল, সামাজিক মনুষ্যের পক্ষে সেইরূপ দশজনের সহবাস। মৎস্য যেমন জলভ্রষ্ট হইলে অবসন্ন ও নির্জীব হইয়া পড়ে, সেইরূপ মনুষ্যও লোকাভাবে নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হয়। মীন যেমন জলের মধ্যে থাকিলে জীবন ও উদ্যমের লক্ষণ সকল প্রকাশ করে, মনুষ্যও জনতার মধ্যে থাকিলে উৎসাহী এবং সুখী হয়। ঈশ্বর মানুষের মনে লোকসহবাসের জন্য এইরূপ স্বাভাবিক ক্ষুধা রাখিয়াছেন এবং সেই ক্ষুধা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি বাহিরের আয়োজনও করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আজ কাল মনুষ্যসমাজের যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে এখানে যত ধর্ম্মভাববৃদ্ধি হয়, যত বৈরাগ্যের তেজ, ধ্যানের গভীরতা এবং ভক্তির প্রমত্ততা বৃদ্ধি হয়, ততই সঙ্গীর সংখ্যা হ্রাস হয়। এখানে যে পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইবে, সেই পরিমাণে লোকের অনুরাগ হারাইবে। যত ধর্ম্মভাব কমাইবে, তত অধিক লোকের সঙ্গ পাইবে। দুই ঘণ্টা ধ্যান কর, দুই শত লোক পাইবে, পাঁচ ঘণ্টা ধ্যান কর, হয়ত

কাহাকেও সঙ্গী পাইবে না। যত ঈশ্বরের কৃপাভোগ করিবে, তত লোকের সহানুভূতি কমিবে। আর যত ধর্ম্মের মত্ততাকে শাসন করিবে, যত ভিতরের ধর্ম্মভাব নির্ম্মূল করিবে, ততই ধর্ম্মের হ্রাস দেখিয়া পৃথিবীর অপর্য্যাপ্ত আনন্দ হইবে এবং বিষয়াসক্ত ব্রাহ্মদলের বৃদ্ধি হইবে। যোগ কমাও, ধ্যান কমাও, বৈরাগ্য ছেদন কর, দেখিবে, এক শত ব্রাহ্মের স্থানে দশ সহস্র ব্রাহ্ম পাইবে। কিন্তু যখন ব্রহ্মপ্রেমে প্রমত্ত হইয়া, দ্বারে দ্বারে গিয়া ব্রহ্মনাম বিতরণ করিতে লাগিলে এবং গভীর ধ্যানযোগে ব্রহ্মানন্দরসপানে মগ্ন হইলে, তখন আর পৃথিবী তোমাদের নিকট আসিবে না। ব্রাহ্মসমাজের যখন খুব উন্নতি হইবে, তখন হয়ত কেবল দুই তিন জন লোক থাকিবে। পৃথিবী সেই উন্নত ব্রাহ্মসমাজকে শত্রু বলিয়া কাটিবার জন্য উদ্যোগী হইবে। কোন্ ব্রাহ্ম না ইচ্ছা করেন যে, ব্রাহ্মসমাজ প্রবল হউক। কিন্তু কতকগুলি উপাসনাবিহীন, সাধনবিহীন, বৈরাগ্যবিহীন, যেমন তেমন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, কি প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ প্রবল হইবে? যাহারা সংসারে ডুবিয়া থাকিতে চাহে, তাহারা কিরূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিবে? অনেকে ব্রাহ্মনাম ধারণ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা কি গভীর উপাসনা চায়? বস্তুতঃ সংসারী লোকদিগের প্রতি তাকাইলে, আর আশা ভরসা থাকে না।

"কিন্তু জড় জগতে যেমন ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে, ধর্ম্মজগতেও সেইরূপ ক্ষতিপূরণ হয়। যোগী ভক্ত সাধক পৃথিবীতে বন্ধু পাইলেন না; কিন্তু অন্য এক্ দিক হইতে তাঁহার বন্ধুসহবাসস্পৃহা চরিতার্থ হইতে লাগিল। পৃথিবীর এক এক দেশ সাধকের প্রতিকূল হইল; কিন্তু স্বর্গ হইতে আহ্বান নিমন্ত্রণ পাইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভিতর স্বর্গের সাধুসকল আসিয়া বসিতে লাগিলেন। স্বর্গবাসী যোগীদিগের সহাস্যবদন তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। পৃথিবীতে লোকাভাব দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গের দিকে পড়িল। সেখানে তিনি সাধু মহাত্মাদিগের মহাভিড় এবং ব্যস্ততা দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেখানে কোটি কোটি যোগী গভীর সমাধিযোগে মগ্ন এবং সহস্র সহস্র মৃদঙ্গ লইয়া ভক্তগণ মহানন্দে মত্ত হইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতেছেন। সেখানে কত ভক্তমণ্ডলী, কত নূতন নূতন বিধান, কত রাশি রাশি গ্রন্থ। এ সকল দেখিয়া বিশ্বাসী সাধক পৃথিবীর লোকাভাব-প্রযুক্ত আর খেদ করিলেন না। তিনি প্রত্যক্ষ

অনুভব করিতে লাগিলেন, ঈশ্বর তাঁহার অসংখ্য ভক্ত সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া নিত্যোৎসব করিতেছেন, এবং তাঁহার আর কোন অভাব রহিল না। তিনি এক ঈশ্বরকে লাভ করিয়া সকলই লাভ করিলেন। ঈশ্বরের মধ্যে কত নূতন সত্য, কত সাধু দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মসাধক এই বিস্তীর্ণ পরিবার দেখিয়া, একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তাঁহার আর কোন দুঃখ রহিল না, স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের সঙ্গ পাইয়া তিনি সুখী হইলেন।

"স্বর্গের এক এক সাধু এক শত; অতএব ব্রাহ্মগণ, যদি পৃথিবীতে তোমাদিগের বন্ধুসংখ্যা কমিতেছে, মনে করিয়া থাক, তাহার সঙ্গে এই আশার কথা বিশ্বাস কর যে, স্বর্গের মহাত্মারা প্রেমানন্দ লইয়া তোমাদিগের নিকট আসিতেছেন। একটিবার ভক্তির সহিত হৃদয় খুলিয়া স্বর্গের ঈশ্বরকে নিমন্ত্রণ কর, দেখিবে, তোমাদের নিমন্ত্রণ পাইবামাত্র, ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদল সঙ্গে লইয়া, তোমাদের বাড়ীতে আসিবেন। তোমরা উৎসব করিবে, মনে করিয়াছ; তোমাদের আয়োজন কৈ? প্রেম পুণ্য কৈ? ধন ধান্য কৈ? ধন ধান্যের প্রয়োজন হইলেই পৃথিবীতে যাইতে হয়; কিন্তু পৃথিবীতে যাইবে বলিয়া, কি পৃথিবীর পায়ে পড়িয়া ধর্ম্মকে ছোট করিবে? পৃথিবীর মনের মত যদি আংশিক ধর্ম্ম দিতে পার, যদি যোগ, বৈরাগ্য, ধ্যান কমাইয়া দাও, তাহা হইলে পৃথিবীর নিকটে রাশি রাশি টাকা পাইবে; কিন্তু সেই অসার মিথ্যা ধন লইয়া কি করিবে? তুচ্ছ কর সেই মিথ্যা অপবিত্র ধন, যাহা মনুষ্য দেয়। তোমরা যদি পৃথিবীর সামান্য ধন না চাহ, তোমাদের জন্য স্বর্গ হইতে ধন জন আসিবে। কেবল বিশ্বাস চাই। উৎসাহের মূল বিশ্বাস। বিশ্বাস থাকিলেই তোমরা দেবলোকের আশীর্ব্বাদ পাইবে। তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবন্ত বিশ্বাস উৎসাহ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি লইয়া তোমাদের ঘরে আসিবেন। যতই তোমরা সাধনগিরি আরোহণ করিয়া স্বর্গের দিকে উঠিবে, ততই পৃথিবীর লোক নিম্নে পড়িয়া থাকিবে। পৃথিবীর জনতা আর দেখিতে পাইবে না; কিন্তু স্বর্গের ভিড় দেখিবে।

"স্বর্গের নিত্যোৎসবে সাধুদিগের মহাভিড়। সেখানে শুকদেব, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ঈশা, মুষা, মোহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি সকলে বসিয়া রহিয়াছেন। সেখানে যোগভক্তির ভয়ানক ব্যস্ততা। সেই স্বর্গীয় মহাত্মাদের উৎসবই যথার্থ ব্রহ্মোৎসব।

পৃথিবীর লোক প্রকৃত ব্রহ্মোৎসব চাহে না, গভীর যোগধ্যান, গভীর প্রেম ভক্তি পৃথিবী ঘৃণা করে; কিন্তু স্বর্গের লোকেরা এ সকলকে আদর করেন। বন্ধুগণ, সেই বৈকুণ্ঠধামের উৎসব প্রার্থনা কর। পৃথিবীর অনিত্য উৎসব আমরা চাহি না। কিন্তু সজীব বিশ্বাস ভিন্ন, কেহই ইহলোকপরলোকের ব্যবধান বিনাশ করিয়া, স্বর্গীয় মহাত্মাদের উৎসব ভোগ করিতে পারে না। অতএব এই সজীব বিশ্বাস চাই। আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার বিশ্বাস প্রবল হইতেছে, অথচ তিনি স্বর্গ হইতে কোন নিমন্ত্রণপত্র পান নাই। তোমরা যে পরিমাণ বিশ্বাসী হইবে, সেই পরিমাণে পৃথিবী তোমাদের প্রতিকূল হইয়া, তোমাদিগকে ভবসাগরের পরপারে বিদায় করিয়া দিবে; কিন্তু তোমরা দিব্য চক্ষে পরপারে শান্তিনিকেতন দেখিতে পাইবে। সেখানে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন যোগী ঋষিরা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।"

মিরারে সাধুসমাগমের বিজ্ঞাপন ও 'ব্রাহ্মসমাজের স্বগতসম্ভাষণ' শীর্ষক প্রবন্ধ

এবারকার উৎসব যে এই ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। ২৬শে মাঘ, ১৮০১ শক (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খৃঃ) অগ্রসর ব্রাহ্মগণ সাধুসমাগমে প্রবৃত্ত হইবেন, এ বিষয়ে মিরারে একটি সংবাদ এবং 'ব্রাহ্মসমাজের স্বগতসম্ভাষণ' শীর্ষক এই প্রবন্ধটি বাহির হয়ঃ—

"আমার কি একজন নেতার প্রয়োজন? হাঁ, আমার একজন নেতার প্রয়োজন হইতে পারে। লোকে বলে, আমার মত ও অনুষ্ঠানগুলি নিয়মসঙ্গত করিবার জন্য আমার একজন মানবনেতা চাই। কেবল দেবনিঃশ্বসিতের উপরে নির্ভর করিলে চলিবে না। আমাকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে। সংশয়, সঙ্কট, পরীক্ষা ও বিপদের সময় আছে, যে সময়ে আত্মা দৈব পরিচালনাপেক্ষা দৃশ্য স্পৃশ্য পরিচালনা চায়। প্রার্থনা প্রার্থনারূপে ভাল এবং আমার আচরণ নিয়মিত করিবার জন্য পূর্ণ পবিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করা সমুচিত কিন্তু মানবীয় আদর্শসমূহও অপরিহার্য্য। এজন্য যে কোন ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করি, তিনিই আমায় সাধু মহাজনগণের শিক্ষা ও আচরণ হইতে আলোক ও শক্তি অন্বেষণ করিতে পরামর্শ দেন। আমিও অনেক সময়ে এই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি; কিন্তু মনে প্রশ্ন উপস্থিত হয়— কে আমার শিক্ষক ও পরিচালক হইবেন? আমার লোকদিগের মধ্যে এমন

কেহ নাই, যাঁহাকে আমি এই ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমি ভূতকালের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি এবং বড় বড় সাধু মহাজনগণকে দেখিতে পাই, যাঁহাদের নিকটে আমার নিরতিশয় অগ্রসর ব্যক্তিগণও কিছুই নহেন। ঐ সকল সাধুমহাজন প্রেম, পবিত্রতা, বিশ্বাস ও ভক্তি যেরূপ শিক্ষা দেন, তদপেক্ষা ব্রাহ্মগণের মধ্যে কে ভাল শিক্ষা দিতে পারে? যে সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনায় বিশ্বাসাভিমানী ব্রাহ্মগণ হেয়বংশীয়। আমাদের মধ্যে পবিত্রতায় ঈশার সমকক্ষ কোন লোক কি আছে? তবে কেন আমি তাঁহার চরণালিঙ্গন করিব না এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিব না? অপিচ যদি আমি প্রেমের দৃষ্টান্ত চাই, যতদূর ভাল দৃষ্টান্ত আমি অনুভবগোচর করিতে পারি, তাদৃশ দৃষ্টান্ত কি সাধু চৈতন্য নহেন? তাঁহাদের ছাড়া ইতিহাসে অনেকগুলি ধর্ম্মার্থনিহত, সাধু ও উপদেষ্টা আছেন, যেমন সক্রেটিস্, পল, নানক, জনক, শাক্যমুনি এবং অন্যান্য, যাঁহারা আমার আত্মাতে শান্তি ও আলোক বিতরণ করিতে পারেন। আমার পরিচালনার জন্য বর্ত্তমান কালের এক জন প্রচারক বা গুরু গ্রহণ করিব না, কিন্তু ইহাদের সকলকে গ্রহণ করিব। পৌরোহিত্য আমি ঘৃণা করি। মধ্যবর্ত্তী ও ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আমি চাই না। আমার মণ্ডলীমধ্যে আমি পোপের আধিপত্য পুনরুজ্জীবিত করিব না, অথবা কোন আকারের কুসংস্কারকে আমার ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে দিব না। আমার সম্মুখে এবং হৃদয়ে আমার পরিচালনার জন্য সমগ্র সাধুমহাজনমণ্ডলী সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন এবং নববিধানাধীন থাকিয়া আমি তাঁহাদিগেরই মধ্যে পবিত্রতা ও পরিত্রাণ অন্বেষণ করিব।"

মুষা

১১ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খৃঃ), রবিবার প্রাতঃকালে, মুষাসমাগম হয়। তিন দিন পূর্ব্ব হইতে এজন্য প্রাস্তুতিক উপাসনা হইয়াছিল। প্রথম দিনের প্রার্থনার ভাব এই—বিবেকপ্রস্তরে খোদিত নববিধি প্রাপ্ত হইয়া, মুষার ন্যায় অঙ্গীকৃত দেশ লাভ করিবার জন্য, হে মাতঃ, আমরা তোমার অনুগমন করি। দ্বিতীয় দিনের প্রার্থনার ভাব এই—বিশ্বাসশৈলে আরোহণপূর্ব্বক তোমার দর্শনে পবিত্রচরিত্র হইয়া, হে বিভো, আমরা তোমার আদেশবাণী শ্রবণ করি; বিশুদ্ধ

নীতি আমাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হউক। তৃতীয় দিনের প্রার্থনার ভাব এই—বিশ্বাসহীনতা এবং কল্পনা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার দাসাগ্রগণ্য, তোমার অধীন হইয়া কার্য্যকারী মুষাকে তোমাতে দর্শন করি; হে জগদীশ, তাঁহার ভাবের সহিত এক হইবার জন্য প্রার্থনা করি।* এই কয়েক দিন মুষার বিবরণ পাঠ এবং তাঁহার জীবন ও চরিত্র আলোচিত হয়। ১১ই ফাল্গুন (২২শে ফেব্রুয়ারী), উপাসকগণ স্নানান্তে বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিয়া, উপাসনালয়ের সোপাননিম্নে সমবেত হন। প্রাচীন কুসংস্কার ও ভ্রম পরিহার করিয়া, মুষার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত; কেন না, তাঁহাদের মনে এই মূল মতগুলি বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল :— (১) প্রাচীনকালের ঋষি মহাজনগণকে সম্মান করিতে হইবে ও ভালবাসিতে হইবে; (২) যদিও তাঁহারা স্বর্গস্থ, তথাপি তাঁহাদের সঙ্গে ভাবতঃ যোগসমাধান করা যাইতে পারে; (৩) ইঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী না হইলেও, নিজ নিজ হৃদয়ে ইঁহাদের সঙ্গলাভ করা যায়; (৪) সকল ধর্ম্মের সাধুমহাজনগণের সঙ্গলাভে অনুরাগী হইতে হইবে, এবং তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে; (৫) তাঁহাদিগকে দেবতা করা হইবে না, কিন্তু স্বর্গস্থ জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাদের সম্মান করা হইবে; (৬) তাঁহাদিগকে দেহবিশিষ্টরূপে চিন্তা করা হইবে না, কিন্তু বিদেহ আত্মা এইভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে; (৭) তাঁহাদের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ভিতর দিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে; (৮) দেশে নহে, কিন্তু বিশ্বাস ও চরিত্রের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ও একতায় তাঁহাদের নৈকট্য অনুভব করিতে হইবে। সোপাননিম্নে কেশবচন্দ্র এই ভাবে প্রার্থনা করেন :— "প্রভো, আমরা তোমার প্রিয় সন্তান মুষাকে দেখিব, তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত

---

* এ বৎসর প্রতিদিনের প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া এক একটী শ্লোক গ্রথিত হইত। সেই শ্লোক হইতে তিন দিনের প্রার্থনার ভাব নিবদ্ধ হইল। শ্লোকগুলি এই:— "অঙ্গীকৃতং দেশমবাপ্তুকামাঃ ক্ষুণ্ণং বিবেকোপল এতমুচ্চৈঃ। নবং বিধিং প্রাপ্য মুষাঃসদৃক্ষাঃ কুর্ম্মোহস্য যাত্রাং সহগামিনস্তে ॥ আরুহ্য বিশ্বাসশিলোচ্চয়ং বিভো পূতৈশ্চরিত্রৈস্তবদর্শনেন। আদেশবাণীং শৃণুমস্তদস্তু নীতির্বিশুদ্ধা হৃদয়াধিদেবতা ॥ বিশ্বাসহীনত্বমপোহ্য কল্পনাং দাসাগ্রগণ্যং ত্বদধীনকৃতাম্। মুষ:সমালোক্য চ তস্য ভাবৈরেকত্বমাপ্তুং জগদীশ প্রার্থয়ে ॥"

হইব, এবং তাঁহার জীবনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিব, এই আমাদের অভিলাষ। হে করুণাময় পিতা, তিনি তোমাতেই আছেন, তাঁহাকে আমাদের নিকটে প্রকাশ কর। তিনি তোমার চরণতলে বসিয়া কিরূপ কথা কহিতেছেন, তোমার গৌরবের জ্যোতিতে মিশিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা দেখিতে চাই। হে নিত্য পরমাত্মন্, তুমি এ বিষয়ে আমাদের সহায় হও।" তদনন্তর উপাসকগণ দূরে পাদুকাপরিহারপূর্ব্বক 'থাকিবনা আর এ পাপরাজ্যে' এই গান গাইতে গাইতে, সোপান দিয়া উপাসনালয়ে প্রবেশ করিলেন। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা সকলেতেই মুষার উল্লেখ ও তাঁহার ভাবের প্রাধান্য ছিল। কেশবচন্দ্র যে প্রার্থনা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এবং কথোপকথন 'মিরার' হইতে আমরা এখানে দিতেছি *।

"হে দয়াসিন্ধু, প্রাচীন ও বর্ত্তমান সময়ের ঈশ্বর, যিহুদীর জিহোবা, হিন্দুর ব্রহ্ম, তুমি এখানে বিদ্যমান। তোমার ভক্তগণ তোমার সাধুসন্তান মুষাকে খুঁজিতেছে। এই যোগগিরি সাইনা পর্ব্বতের উপরে তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিতেন এবং তোমার নিকট বড় বড় সত্য শুনিতেন। আমরা যেন তাঁহাকে এখানে দেখিতে পাই। আজ আমরা তাঁহার ভাবে ভাবুক হইয়া, তাঁহার বিবেকে ও বিশ্বাসে ভূষিত হইয়া, তাঁহার সঙ্গে এক হইব। আমরা নিম্নভূমি হইতে তোমার সঙ্গে আমাদের ভক্তিভাজন ভ্রাতার আত্মাকে দেখিতে আসিয়াছি। তিনি কোথায়? তোমার মধ্যে লুক্কায়িত। প্রভো, তোমার সন্তানকে আমাদের নিকটে প্রকাশ কর এবং তাঁহার ভাবে আমাদিগকে ভাবুক কর। হে মুষার ঈশ্বর, আত্মাকে মুষার মত কর। বিশ্বাসে, আত্মত্যাগে, বিবেকে এবং বিধির আনুগত্যে, মুষা যেমন ছিলেন, আমরাও যেন তেমনি হই। তুমি তাঁহাকে দশাজ্ঞা দিয়াছিলে। আমাদিগকে তোমার বিধি দাও। সকল কার্য্যে বিস্তৃত বিধি দিয়া তুমি যেমন যিহুদিদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলে, বর্ত্তমান ইজরাইলবংশীয়গণকে দৈনিকজীবনসম্বন্ধে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আজ্ঞা দিয়া পরিচালিত কর। মুষার নিকটে তুমি আপনাকে ব্যবস্থাপয়িতা

* 'সাধুসমাগম' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে প্রার্থনাদি মুদ্রিত আছে; এখানে এবং অন্যত্র সংক্ষিপ্তবিবরণমাত্র 'মিরার' হইতে প্রদত্ত হইল। (১৮০১ শকের ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে মুষাসমাগম প্রার্থনাটী দ্রষ্টব্য।)

এবং পরিচালকস্বরূপে প্রকাশ করিয়াছিলে। বিবেকের অবতাররূপে তুমি তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলে। মুষার রাজ্য বিবেকের রাজ্য। হে নিত্যবিধিদাতা, আমাদের মধ্যে বিবেক ও বিধির রাজ্য প্রবর্ত্তিত কর, এবং নবীন ইজরাইলবংশীয়গণকে অন্ধকার, কুসংস্কার ও নাস্তিকতার রাজ্য হইতে অঙ্গীকৃত সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের দেশে লইয়া যাও। তোমার পূর্ণ করুণায় আমাদের পরিচালনার জন্য নববিধান প্রেরণ করিয়াছ। বর্ত্তমান যুগে মুষার ন্যায় যেন এই বিধানের আমরা সম্মাননা করি এবং আমাদের জীবনে ও চরিত্রে পূর্ণভাবে উহাকে কার্য্যে পরিণত করি। মতে নয়, কিন্তু শোণিতমাংসে, মুষা যেন আমাদের সঙ্গে, আমাদের মধ্যে নিত্য বিদ্যমান থাকেন।"

"তদনন্তর এইরূপ কথোপকথন হয়।

"আমি সেই প্রাচীন ঈশ্বর 'আমি আছি'। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মুষা আমাকেই দেখিয়াছিল। বঙ্গদেশের ক্রন্দন শুনিয়া আমি সেই ঈশ্বর আসিয়াছি।

"জয় তোমারই জয়। তোমার মুখের জ্যোতি যেন আমরা সহ্য করিতে পারি।

"আমাকে পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না। আমি মহান্। আমার সমান কেহ নাই, আমি কাহাকেও ভয় করি না।

"উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল দিকের সর্ব্বশক্তিমান্ শাস্তা তুমি। আমরা তোমায় ভয় করি।

"আমি হিন্দু জাতিকে উদ্ধার করিব, এবং তাহাদিগকে স্বর্গধামে লইয়া যাইব।

"তাহাই হউক, আমরা ভক্তির সহিত বলি, প্রভো, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

"অন্যদেবতার পূজা করিও না। মধ্যবর্ত্তী বা অবতার গ্রহণ করিও না। নববিধানে মানুষ গুরু বা নেতা নাই। যিনি মহাতেজা, তিনি তোমাদের নেতা। আমার কথা তোমাদের শাস্ত্র।

"প্রভো, তোমার কথা, আমাদের শাস্ত্র হউক। তোমার মুখ হইতে যে বেদ বিনিঃসৃত হয়, তাহাই আমাদের বিধি হইবে।

"বিবেকের কথা আমার কথা, বিজ্ঞানের বাণী আমার বাণী। সুতরাং এ উভয়ের সম্মান কর।

"হে ঈশ্বর, তাহাই হউক।

"নবীন নগরে তোমাদের স্ত্রীপুত্রগণকে লইয়া যাও। আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি যে, তোমাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব গৃহ পরিবার আমার নামে উৎসর্গ কর এবং আমায় অর্পণ কর।

"প্রভো, আমরা তোমাকে গ্রহণ করি, তোমায় ধন্যবাদ দি। আমরা সকলে মিলিত হইয়া বলি—'শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ'!"

পরলোকবাসী ভক্তদর্শন

অদ্য (রবিবার, ১১ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী) সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে, কেশবচন্দ্র ভক্তদর্শনসম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, তাহাতে উহার তত্ত্ব বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। আমরা উপদেশের শেষাংশ (১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে উপদেশটী দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"এইরূপ পরলোকবাসী অশরীরী নিরাকার আত্মা সকলও একস্থান হইতে আর এক স্থানে আসিতে পারেন না। স্বর্গবাসীরা কি পাখীর ন্যায় স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিবেন? অথচ আমরা কেন বলি, হে যুধিষ্ঠির, হে প্রিয়তম চৈতন্য, হে ঈশা, তোমরা পৃথিবীতে এস; হে শাক্যমুনি, আর একবার ভারতে আসিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা দেও। এ সকল কথা হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পৃহা হইতে উপস্থিত হয়। আমরা যখন বলি যে, আমরা স্বর্গবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, অথবা তাঁহাদিগের নিকট হইতে নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছি, এ সকল কথা কি ভাবে বলি? এ সকল ভাবহীন কথা নহে। তাঁহারাও আসেন না, আমরাও তাঁহাদের নিকট যাই না, অথচ বিশ্বাসে সকলই ঘটায়। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি, এই আমার চৈতন্য, এই আমার ঈশা। যদি আমার বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমি বলিব, ঐ স্বর্গে স্বর্গবাসী সকল; কিন্তু স্বর্গবাসীদিগকে কিরূপে নিকটে দেখিব? তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী নহেন। তাঁহারা আমাদের নিকটে আসিতে পারেন না, আমরা তাঁহাদের নিকটে যাইব। তাঁহারা স্বর্গে আছেন। স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর নিজেই স্বর্গ। সুতরাং যত ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিব, ততই সেই স্বর্গবাসী সাধুদিগকে নিকটে দেখিব। ব্রহ্মের মনোহর স্বরূপের মধ্যে যোগী ঋষি ভক্তদিগকে দেখিলাম। যাহারা পার্শ্বে বসিয়াছিল, তাহারা চমকিত হইয়া বলিল, তবে কি স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে? না, স্বর্গ স্থানান্তরিত

হয় নাই, স্বর্গ যেখানে ছিল, সেখানেই আছে; কিন্তু ভক্ত পৃথিবীতে নাই, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভক্ত ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ সেই প্রতাপশালী মহাপুরুষসকলকে নিকটে দেখিয়াছেন। সাধুরা এখানে আসিলেন না, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে, ছোট ছোট সাধু আত্মা, ছোট ছোট শক্তি দেখিতে পাইলেন। যেমন গায়ে গা ঠেকে, তেমনি যোগিস্বভাবের সঙ্গে যোগিস্বভাবের যোগ, ভক্তের সঙ্গে ভক্তের যোগ। হে যোগী, তুমি আমার নিকটে উপস্থিত হও, ইহা যদি পরিষ্কার ভাষায় ভাষান্তর করা হয়, অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ এই যে, আমি যোগাভাবে সেই যোগীর সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; কিন্তু যোগবলে, চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যাঁহারা যোগসাধন করিতেছিলেন, তাঁহাদের নৈকট্য অনুভব করিতে পারিব। যদি ভক্ত হই, কেবল ভক্তিপ্রভাবে প্রাচীন ভক্তের নিকটস্থ হইব। অতএব ভাব গ্রহণ কর, ভাষ্য গ্রহণ করিও না। যখনই বিশ্বাসের সহিত বলিবে, এই আমার ঈশ্বর, এই আমার ভক্তিভাজন স্বর্গবাসিগণ, তখনই তাঁহাদিগকে হস্তগত করিতে পারিবে। যোগবলে, প্রেমবলে সকল ব্যবধান চলিয়া যায়। প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বল, এই যে ভক্তবৎসল হরি আমার হৃদয়ের ভিতরে, এই যে বৈকুণ্ঠপতি হরির বুকের ভিতরে বৈকুণ্ঠ, এই যে বৈকুণ্ঠের ভিতরে আমার প্রাণের ভক্তগণ। এক হরির ভিতরে সকল জাতির এবং সকল যুগের সাধুদিগের সম্মিলন। বিশ্বাস-ভক্তি-বলে যত এ সকল অনুভব করিবে, তত প্রমত্ত হইবে। যত দিন অবিশ্বাস, তত দিন ঈশ্বর ও স্বর্গ বহু দূর। কিন্তু বিশ্বাসীর নিকট ঈশ্বর ও স্বর্গ খুব নিকট, প্রাণের ভিতর।"

সক্রেটিস্

২৫শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ্চ), রবিবার, সক্রেটিস্-সমাগম হয়। (১) উপাসকগণ যাত্রীর ভাবে সঙ্গীত করিতে করিতে, গম্ভীরভাবে অধ্যয়নাগার-রূপে পরিণত উপাসনালয়ে প্রবেশ করেন। প্রবেশকালে. 'সক্রেটিসের পবিত্র গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হউক, আমরা যেন ভক্তির সহিত উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি' এই বলিয়া গৃহে প্রবেশ করা হয়। গৃহের অভ্যন্তরে

(১) ১৮০২ শকের ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে আচার্য্যের প্রার্থনার একাংশ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থাধারে বিবিধকালের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সকল এবং বেদীর সম্মুখে সক্রেটিসের জীবনী ও কার্য্যঘটিত পুস্তকসমূহ ছিল। সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে, কেশবচন্দ্র এইরূপে উদ্বোধন করিলেনঃ—"ইহা কলিকাতা নহে, ইহা এথেন্স নগর; ইহা ভারত নহে, ইহা গ্রীস্ রাজ্য। সক্রেটিসের আত্মা আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান। আমাদের হৃদয়ে আমরা তাঁহার সঙ্গ সাধন করি। নিত্য পরমেশ্বর দূর দেশ ও দূর কালকে একত্র করেন, তিনিই মনোবিজ্ঞানের জন্মদাতার আত্মার সহিত আমাদিগকে এক করুন এবং তাঁহার চরিত্র আমাদের জীবনে আবির্ভূত হউক। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যে এই পবিত্র উৎসবের আমরা ফলভোগ করিতে পারি।"

"প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর, স্বর্গস্থ ভক্তগণ সকলে তোমাতে একত্র স্থিতি করিতেছেন। তোমার বক্ষে ঐ যে আত্মতত্ত্বতারকা জ্বলিতেছে, উনি কে? প্রভো, তাঁহার নাম ও তাঁহার জন্মস্থান আমাদিগকে বলিয়া দাও। বঙ্গদেশের যুবকগণ বাহ্য সভ্যতা, জড়ের আরাধনা ও বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; এমন সময় সাধু সক্রেটিস ধমক দিয়া বলিলেন, 'রে মোহাচ্ছন্ন যুবকগণ, যে জ্ঞানে হৃদয়কে গর্ব্বিত এবং কলঙ্কিত করে, ইন্দ্রিয়পূজা হয়, সে জ্ঞান হইতে নিবৃত্ত হ, এবং আত্মজ্ঞান অন্বেষণ কর্।' হে সত্য ঈশ্বর, আমরা বুঝিতে পারিতেছি, দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আথেন্সের যুবকদিগকে তোমার সন্তান 'আপনাকে আপনি জান' এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ তিনি আমাদিগকে দিতেছেন। আমরা তোমার সন্তানকে আত্মতত্ত্বের অবতার বলিয়া মান্য করি। হে ঈশ্বর, বাহ্য জীবনের শূন্যগর্ভতা এবং আত্মার সত্যত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দাও। আমরা রক্ত মাংস নই, আমরা আত্মা, ইহা বুঝিবার পক্ষে তুমি আমাদিগের সহায় হও, এবং সক্রেটিস হইতে আমাদিগকে এই শিখাও যে, আমাদের আত্মার মধ্যে 'দেব' বা 'দেবাত্মা' আছেন, যিনি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন এবং জীবনের সকল প্রকার উচ্চ ব্যাপারে আমাদিগকে পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত করিতে প্রস্তুত। ঐ বস্তু কি, তিনি তাহা জানিতেন না, অথচ সর্ব্বদাই সেই অন্তরস্থ শাস্তার প্রেরণা সকল তিনি অনুসরণ করিতেন। তোমার প্রেমনদীর ধারে, সক্রেটিসের আত্মার মধ্যে, তুমি যে আত্মজ্ঞানের বীজ পুতিয়াছিলে, সেই বীজ হইতে

সমগ্র মনোবিজ্ঞান ও জ্ঞান তুমি উদ্ভূত করিয়াছ। তোমার অন্তরস্থ বাণীতে যে সত্য ও নিশ্বসিত তাঁহার নিকটে প্রকাশ পাইত, তৎপ্রতি তিনি এত দূর অনুগত ছিলেন যে, ধর্ম্মার্থ জীবনদানের গৌরবমধ্যে তিনি আপনার প্রাণ দান করিলেন। হে সক্রেটিসের ঈশ্বর, পথপ্রদর্শক গভীররহস্যময় তোমার বাণীর প্রতি আমাদিগকে বিশ্বস্ত ও বাধ্য কর, এবং আমাদিগকে ঈদৃশ দৃঢ় বিশ্বাস দাও যে, জীবনাপেক্ষা সত্যকে আমরা অধিক মূল্যবান্ মনে করি।"

নন্দলাল বসুর বাটীতে ও বিডনপার্কে উপদেশ

শাক্যসমাগমের পূর্ব্বদিন, ১লা চৈত্র, ১৮০১ শক (১৩ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ), শনিবারে, বাগবাজারস্থ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বাটীতে এবং ঋষিসমাগমের দশ দিন পরে, ১৯শে চৈত্র (৩১শে মার্চ্চ), বুধবার, বিডনপার্কে কেশবচন্দ্র উপদেশ (১) দেন ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮০২ শকের ১লা বৈশাখের) লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বোক্ত স্থানে প্রায় দুই সহস্র লোক এবং শেষোক্ত স্থানে চারি সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। সকলে নিঃশব্দ গম্ভীরভাবে উপদেশ শ্রবণ করেন এবং মধ্যে মধ্যে আনন্দধ্বনিতে সকল দিক্ পূর্ণ করেন। সাধারণের ব্যগ্রতা ও পিপাসাতে আমরা একান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি।"

শাক্য

২রা চৈত্র (১৪ই মার্চ্চ), রবিবার, শাক্যসমাগম। অদ্য উপাসকযাত্রিকগণ একত্র হইলেন, সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর উপরে গেলেন এবং দ্বারদেশে ভক্তি-সহকারে প্রণামপূর্ব্বক উপাসনালয়ে প্রবেশ করিলেন। আরাধনা ও ধ্যানের পর, কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হে প্রাচীন পরমাত্মন্, যুগের উপরে আরোহণ করিয়া, তুমি অপর যুগে চলিয়া যাইতেছ। আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্বে শাক্যের যে যুগ ছিল, সেই যুগকে তুমি আমাদিগের নিকট আনিয়াছ। পিতঃ, তোমার সন্তান শাক্য-মুনি প্রশান্ত মূর্ত্তিতে তোমার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার চিদাত্মা আমাদের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হউক। তিনি মহাবীর, তিনি বৈরাগ্যের অবতার।

(১) ১লা চৈত্রের উপদেশ "আত্মাপক্ষী" ও ১৯শে চৈত্রের উপদেশ "অখণ্ড ঈশ্বর" আচার্য্যের উপদেশ ১০ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য। তৎকালে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল।

তিনি যেমন ছিলেন, আমরা যেন তেমনই হই। বেদ, ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম, জাতি এবং পৌরোহিত্য-পরিহারে আনন্দিত নবীন ইজরায়েলবংশীয় অনুগামিগণকে, হে ঈশ্বর, মহানেতা গৌতম হিন্দুস্থানরূপ মিসর হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। বৈরাগ্যভাবে তিনি সাংসারিকতা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার পরিবার ও বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইলেন। আত্মত্যাগসাধনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি একটি করিয়া মনের সকল অভিলাষ ও প্রবৃত্তি, চিন্তা ও উদ্বেগ নিবাইলেন এবং নির্ব্বাণে অনির্ব্বচনীয় শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আপনি যে শান্তি পাইলেন, অপরকে তাহার সমাংশী করিতে অভিলাষ করিলেন। হে ঈশ্বর, তোমার সন্তান নির্ব্বাণের শুভসংবাদ সর্ব্বত্র এমনই বিস্তার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে, কালে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক সেই শুভসংবাদকে আলিঙ্গন করিয়াছে। প্রভো, আমরা নির্ব্বাণ চাই। পাপপ্রবৃত্তি, অভিলাষ এবং দুঃখ ও ক্লেশের মূল অচিরে নির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষা করি। আমাদের সকলের হৃদয় রিপুর আগুনে নিরন্তর জলিতেছে; এই রিপুর আগুন বৈরাগ্যো-চিত জ্ঞানের জলে নিবাইয়া দাও।

"হে শাক্যমুনির চিদাত্মা, বল, তুমি কেমন করিয়া বৈরাগ্য অর্জ্জন করিলে। কিসে তোমায় আধ্যাত্মিকতা, ধ্যান এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত এবং সকল জীবের প্রতি দয়াযুক্ত করিল? এমন কি, নীচ প্রাণিগণকে বিস্মৃত হইতে দিল না? হরির সন্তান, তোমার পবিত্র জীবনবৃত্ত, তোমার ভিতরকার জীবন বল এবং তোমার অন্তিম মোক্ষাবস্থা নির্ব্বাণ শিখাও।

"হে করুণাময় ঈশ্বর, আমরা বুঝিতেছি, আমরা গোপনে গোপনে বুদ্ধের শত্রু; কেন না আমরা মানুষ ও ইতর প্রাণীর প্রতি দয়ালু নই। আমাদের যত দূর উচিত, তত দূর মানবীয় দুঃখক্লেশের আমরা সহানুভূতি করি না; আমাদের এবং অপর সকলের ভিতরে যে সকল সাংসারিক ভাব, অভিলাষ, এবং স্বার্থানুসন্ধান আছে, সে সকল নির্ব্বাপিত করিতে আমরা প্রযত্ন সহকারে যত্ন করি না। পিতঃ, তোমার সন্তানকে আমাদের বন্ধু করিয়া দাও, এবং তিনি যেমন দয়ালু, পবিত্রমনা এবং সংসারস্পৃহাশূন্য ছিলেন, আমাদিগকে সেইরূপ হইতে সাহায্য কর। তিনি যেমন বৈরাগ্যবৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন, তেমনি আমাদিগকে বসিতে শিখাও, এবং ভোগাভিলাষ,

পাপ, আমিত্ব ও বিষয় যেন এরূপ পরাজয় করিতে পারি যে, আমরা নির্ব্বাণেতে শান্তিলাভ করিতে পারি। গৌতমের ঈশ্বর, আমাদের পাপ ও সন্তাপ সম্যক্ প্রকারে নিবাইয়া দাও এবং আমাদিগকে সেই যথার্থ বৌদ্ধজ্ঞান দাও, যদ্দ্বারা আমরা, যেখানে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, আমোদ ও ক্লেশ আমিত্ব-তিরোধানে অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেই চিরশান্তির রাজ্যে যাইতে পারি।"

ঋষিগণ

৯ই চৈত্র (২১শে মার্চ্চ), রবিবার, উপাসকযাত্রিগণ হিমালয়শিখরে ঋষিগণের আশ্রমদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববৎ তাঁহারা প্রার্থনা ও নমস্কারপূর্ব্বক চারিসহস্র বৎসরের পুরাতন বৈদিক উপাসনালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ গৃহ তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণের গৃহ, পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র প্রয়াণস্থল। সুতরাং ভক্তি ও দেশানুরাগ এ উভয় একত্র মিলিত হইয়া, অদ্যকার যাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নিয়মিত উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র যে প্রার্থনা করেন, তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে:—

"হে অনাদ্যনন্ত প্রাচীন নিত্য ব্রহ্ম, এই উৎসবমধ্যে তুমি আত্মপ্রকাশ কর এবং ইহাকে সফল কর। তোমার পন্থা গভীর রহস্যপূর্ণ। আমরা সাইনা পর্ব্বতে মুষাকে তোমার বিধিগ্রহণ করিতে দেখিয়াছি; এখন হিমালয় পর্ব্বতে নির্জ্জনে যোগমগ্ন আর্য্য ঋষিগণকে দেখিতেছি। যখন তুমি যিহুদী সাধু মহাজনকে তাঁহার আপনাকে এবং ইজরাইলবংশীয়গণকে অঙ্গীকৃত দেশে লইয়া যাইবার জন্য তোমার ভীষণ অনুজ্ঞা সকল দিলে, তখন সাইনাগিরি ধূম ও অগ্নি, বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি-মধ্যে কাঁপিতেছিল; কিন্তু হিমালয়ের শৃঙ্গ সকল গভীর চির শান্তিতে বিশ্রান্ত। এখানে তুমুল রব, সংগ্রামযাত্রা, উত্তেজনা বা প্রচার-বিষয়ক কর্ম্মশীলতা নাই। সকলই স্থির শান্ত। তোমার প্রিয় ঋষিগণ অবাক্, চিন্তাভিনিবেশে সম্যক্প্রকারে আত্মহারা হইয়াছেন। সে স্থলে তুমি কর্ম্মিগণ-মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলে, এস্থলে ধ্যাননিমগ্ন সাধকগণমধ্যে তুমি আত্ম-প্রকাশ করিতেছ। সেখানে লক্ষ লক্ষ জন মধ্যে সেনাপতিরূপে দণ্ডায়মান, এখানে তুমি নির্জ্জনপ্রিয় সন্ন্যাসিগণের বন্ধু! যোগীর আশ্রম কি বিচিত্র! তোমার সঙ্গে সুখদ যোগে মগ্ন হইয়া যে স্থানে তিনি স্থিতি করেন, সে স্থান কি মনোহর! তুমি তাঁহাকে স্বর্গের এরূপ সম্পদ্ দিয়াছ যে, তিনি সংসারের

ধনমানে পদাঘাত করিয়াছেন। তুমি তাঁহার আত্মাকে এরূপ অধিকৃত ও মগ্ন করিয়াছ যে, তিনি আপনাকে ও সংসারকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছেন। হে পরমাত্মন্, ধর্ম্মিষ্ঠ ঋষি কেবল তোমাকেই দেখেন, আরাধনা করেন এবং ভালবাসেন ; আত্মা ও জীবন, আনন্দ ও সম্পৎ, পরিত্রাণ ও আর যাহা কিছু নিত্যকালের জন্য, সে সকল তাঁহারই। তোমা ছাড়া আর কিছুই তাঁহাতে দেখিতে পাই না। তুমি তাঁহাকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ, তাঁহার সমুদায় অভিলাষ তোমাতেই পূর্ণ হইয়াছে। অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী ও বন্ধু হইয়া তুমি তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা আছ। হে প্রভো, দুই সুন্দর পাখী এক বৃক্ষে বসিয়া আছেন, আমরা দেখিতেছি। এ দুইয়ের একটি হরি পরমাত্মা, আর একটি ঋষি আত্মা। একটি খাওয়াইতেছেন, আর একটি খাইতেছেন; একটি দিতেছেন, আর একটি গ্রহণ করিতেছেন ; একটী ব্রহ্ম, আর একটি ব্রাহ্ম ; একটি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, আর একটি কেবল প্রাণ, চক্ষু ও শ্রোত্রমাত্র। এই দুই পাখীর মধ্যে মধুর অনির্ব্বচনীয় বন্ধুতা। প্রাচীন কালে উত্তুঙ্গ হিমালয়ে এই দুই পাখী এবং ইহাদের পরস্পর যোগ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। হে হরি, দয়া কর, তোমার সঙ্গে এই যোগ আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে দাও। ঋষি যে বলিয়াছেন, দুই পাখী পরস্পর বন্ধু, তাঁহারা কুশলে দেহপিঞ্জরে সর্ব্বদা একত্র বাস করেন, সেই কথা আমাদের মধ্যে প্রমাণিত হউক। মহান্ আত্মা ক্ষুদ্র আত্মার সহিত প্রেমযোগে যুক্ত, হে নিত্য গম্ভীর আত্মন্, আমাদের মধ্যে এইটি প্রত্যক্ষ করিতে তুমি সাহায্য কর। এই যোগ প্রত্যক্ষ করিবার এবং এই দুই পাখীকে একত্র দেখিবার উদ্দেশে আমরা আর্য্যযোগী ও ঋষিগণের পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছি। এই সন্ন্যাসিগণ কেমন নিঃস্বার্থ, কেমন অনুরত। ইহারা নির্জ্জনে বাস করিয়া, লোকের প্রশংসার অণুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না। নির্জ্জনে তোমায় ও তোমার স্বর্গ অবলোকন করিয়া, বাহিরের সংসার ইহাদের বিষয়ে কি ভাবে, তাহা জানিবার জন্য ইহারা কিছুই যত্ন করেন না।

"হে আত্মবিস্মৃত ঋষিগণ, যেখানে চক্ষু বা কর্ণ যায় না, সেখানে তোমরা গোপনে যথার্থ যোগ সাধন কর। শতাব্দীর পর শতাব্দী তোমাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। হে ভক্তিভাজন পূর্ব্বপুরুষগণ, এখনও তোমরা

তোমাদের আন্তরিক গৌরবের নূতনত্বে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। ভক্তিভাজন যোগিগণ, তোমরা কি প্রকারে যোগসম্পৎ লাভ করিলে? ঋষি, বল, তুমি গোপনে কি দেখ? চক্ষু খুলিতে কেন তোমার ইচ্ছা হয় না? তুমি অন্ধও নও, বধিরও নও। তবুও তুমি দেখিতে চাও না, শুনিতে চাও না। তুমি অন্তরে কি আনন্দ পাইয়াছ, যাহার জন্য তুমি সংসারের সকল আমোদ ছাড়িয়া দিয়াছ? হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তোমার পত্নী মৈত্রেয়ীর সঙ্গেও ধর্ম্মের উচ্চতম সত্য লইয়া আলাপ করিতেছ। যোগভূমিতে তিনি তোমার সঙ্গিনী! হে ঋষি, তুমি অসম্ভব সম্ভব করিয়াছ। আজিকার দিনে ভারতের নারীগণ যেন ঈদৃশ স্বামী লাভ করেন এবং মৈত্রেয়ী যেমন বলিয়াছিলেন, 'যাহাতে অমৃতত্ব লাভ না হয়, তাহা লইয়া আমি কি করিব', তেমনি বলিয়া তাঁহারা যেন সংসারকে পদাঘাত করিয়া দূরে অপসারিত করেন।

'হে ঈশ্বর, প্রাচীন ঋষিগণের চিদাত্মা আমাদিগের নিকটে প্রেরণ কর, এবং এই দেশে পুনরায় যোগের অগ্নি প্রজ্বলিত কর। মুষা এবং ঋষিগণ উভয়ের নিকট 'আমি আছি' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। 'আমি আছি' রূপে আইস এবং এই দেশ হইতে পৌত্তলিকতা ও জড়োপাসনা অপসারিত কর, এবং আমাদের সকলকে যোগী কর। আমরা যেন আমাদের জন্য ছোট ছোট দেবতা না গড়ি, কিন্তু অনন্ত পরমাত্মাতে নিমগ্ন হইতে পারি। 'একমেবা-দ্বিতীয়মের' পতাকা উত্তোলন কর, এবং প্রতি হিন্দুগৃহকে ঋষির তপোবন কর। ক্রীড়নশীল হরিণশিশু এবং মধুর মাধবীলতা কেমন সেই ক্ষুদ্র কুটীরে আনন্দ ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে। সেই শান্ত নির্জ্জন প্রদেশের ব্যবস্থা-পনায় কেমন পরিচ্ছন্নতা ও দেবত্ব একত্র মিলিত হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ কর যে, ভারতবর্ষ আবার যোগীর তপোবনের পবিত্র আনন্দ ভোগ করিতে পারে। হে পরমাত্মন্, আগমন কর, এবং আমাদের ভক্তিভাজন পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমাদিগকে তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও। তুমি আমাদের আত্মার মধ্যে প্রবেশ কর, এবং তোমার পবিত্রতা ও আনন্দে আমাদিগকে পূর্ণ কর। তুমি আমাদিগের ভিতরে, আমরা তোমার ভিতরে, এই যোগ। প্রভো, আমাদিগের মধ্যে এই যোগ অধিক হইতে অধিকতর ও গভীর কর, এবং যথার্থ যোগে আমাদিগকে তোমার সঙ্গে এক কর।"

ঈশা

৫ই বৈশাখ (১৮০২ শক, ১৬ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ), শুক্রবার, উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র সপরিবারে নৈনীতাল গমন করেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা নৈনীতালের কার্য্যবিবরণ নিবদ্ধ করিব। ৯ই আষাঢ় (২২শে জুন) তিনি নৈনীতাল হইতে প্রত্যাগত হইয়া ১৮ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট), রবিবার হইতে সাত দিন খ্রীষ্টসমাগমের জন্য প্রাস্তুতিক উপাসনা করেন। প্রথম দিনে ঈশাতে অবতীর্ণ বিবেক, দ্বিতীয় দিনে ঈশার বৈরাগ্য, তৃতীয় দিনে ক্ষমা, চতুর্থ দিনে বালকপ্রকৃতি, পঞ্চম দিনে চিত্তনৈর্ম্মল্য, ষষ্ঠ দিনে পরের পাপভারে শোকিত্ব, সপ্তম দিনে অধ্যাত্মদৃষ্টি-লাভার্থ* প্রার্থনা হয়। ২৫শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট), রবিবার, ব্রাহ্মযাত্রিকগণ আঠার শত বৎসর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া, জাতীয় ভাব-সহকারে ভ্রমণ করিতে করিতে, পবিত্রভূমিতে আসিয়া উপস্থিত। এখানে তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং যিহুদিদিগের সঙ্গী হইয়া যিহুদী হইলেন এবং তাঁহাদের দেশ আপনার দেশ করিয়া লইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের যাত্রিকগণ ঈশার জন্য ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া, তাঁহার প্রিয় পুত্র ঈশাকে দেখাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন :—"প্রভো পরমেশ্বর, কি পরিবর্ত্তন! আমরা কোথায় ছিলাম? এখন কোথায়? এই সকল ঘর, বিপণি, পথ, এই সকল বৃক্ষ ও পর্ব্বত আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, ইহা ভারতবর্ষ নয়, ইহা যিহুদিগণের দেশ পালেস্তাইন। এখানে নাজারথে এক জন সূত্রধরের সন্তান জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি রোগের প্রতীকার করিতেন, এবং মানবগণকে বিশুদ্ধ করিতেন। পিতঃ, তাঁহাকে দেখাও এবং এই পরিশ্রান্ত যাত্রিকগণকে আনন্দ বিতরণ কর।

"অহো, এই যে ইনি মেরীর ক্রোড়ে, উজ্জ্বল মূল্যবান্ রত্ন, মধুর স্বর্গীয় শিশু। জননীর ক্রোড়ে হাসিতেছেন মেরী, মেরীর ক্রোড়ে হাসিতেছেন ঈশা। তিন জনের আলোকেতে ত্রিভুবন আলোকিত। কি সুন্দর উজ্জ্বল

---

* প্রতিদিন যে প্রার্থনার সার শ্লোকে লিখিত হয়, তদনুসারে এইরূপ লিখিত হইল। অবতীর্ণ বিবেক স্থলে ঈশ্বরের সহিত একত্ব এবং বালকপ্রকৃতির স্থলে প্রেম ('মিরারে') দৃষ্ট হয়। (১৮০২ শকের ১লা ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে ২৪শে শ্রাবণের প্রার্থনা ও সংবাদস্তম্ভে ঈশা-সমাগমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ২৫শে শ্রাবণের প্রার্থনা ১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে ও 'সাধুসমাগম' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

মুখগুলি একত্রিত হইয়াছে। হে মধুর শিশু, তুমি কি আসিবে না, এবং আমাদের বক্ষে তোমায় আলিঙ্গন করিতে দিবে না? প্রিয়তম, আইস এবং আমাদের হৃদয়কে আনন্দিত কর। তোমার মস্তক আলোকমণ্ডলে আবেষ্টিত। মেরীর তনয় প্রতাপান্বিত শিশু। যেন একটি ছোট সিংহ, তেজে ভরা। ঈশা, তুমি বাড়িলে, বাড়িয়াই চলিয়া গেলে; কোথায় গেলে, তাহারা বলিতে পারে না। তুমি গহনবনে গেলে. এবং সেখানে তোমার স্বর্গীয় মাতা তোমার ভবিষ্যৎ কার্য্যের জন্য তোমায় শিক্ষা দিলেন। ঈশ্বর ও মানবের শত্রু সেই দৈত্য তোমায় প্রলুব্ধ করিল, পরীক্ষা করিল এবং যে রবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য কম্পিত হয়, সেই রবে তুমি বলিলে, 'রে সয়তান, দূর হ।' আবার তুমি জনসমাজে উপস্থিত হইলে, পূর্ণ ফকির, গরিব একেবারে। ধনহীন, অথচ তোমার পিতা তোমায় যে অগণ্য ধন দিয়াছেন, সেই ধনে তুমি অধিকারী। তোমার বাসের জন্য ঘর নাই, তোমার আর কেহ নাই। হে পবিত্র ঈশা, পৃথিবীতে তোমার একটি পয়সাও নাই, অথচ এই সম্মুখস্থ পাহাড়ে তুমি রাজতনয়ের ন্যায় দাঁড়িয়েছ। তোমার সম্রাট্ পিতা তোমায় সমুদায় পৃথিবীর অধিকার দিয়াছেন, এবং যাহা কিছু তাঁহার, সে সকলই তোমার। চারি বিস্তীর্ণ জমীদারী— এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা—তোমারই এবং তোমারই কুবেরের সকল ধন। যদিও তুমি দরিদ্র, তবু তুমি কল্যকার জন্য চিন্তা কর না। ধন ও নির্ধন তোমাতে মিলিত। তোমার পরিচ্ছদ রাজোচিত বৈরাগ্য দেখায়। হে প্রতাপশালী ফকীর, স্থান হইতে স্থানান্তরে, পথ হইতে অন্য পথে কত লোক তোমার অনুবর্ত্তন করিতেছে? ঐ সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতে, তোমার পদতলে বসিয়া, তোমার মুখ হইতে যে জ্ঞানের কথা আসিতেছে, তাহা তাহারা শুনিতেছে। তবু এ গুলি তোমার কথা নয়, কিন্তু তাঁহার কথা, যিনি আড়ালে থাকিয়া এই কথাগুলি তোমার মনে উদিত করিয়া দিতেছেন। এ কেবল মানবমুখ, যে মুখ দিয়া স্বয়ং পরমাত্মা পর্ব্বতোপরি উপদেশ প্রচার করিতেছেন। পিতার জ্ঞান তোমার জ্ঞান, তিনি তোমার ভিতর দিয়া কথা কন। তোমার আপনার কোন জ্ঞান নাই। হে ঈশা, তুমি সিংহ, অথচ মেষ; নম্রতা এবং ক্ষমাপূর্ণ মেষের ন্যায় তুমি যথার্থই পথ দিয়া চলিয়া যাও। তাহারা তোমায় অপমান করিতেছে, নির্য্যাতন করিতেছে; তুমি কেবল, যে তোমার

বামগণ্ডে আঘাত করিয়াছে, তাহাকে দক্ষিণগণ্ড ফিরাইয়া দিতেছ। তুমি ক্ষমার অবতার এবং তুমি তোমার শত্রুকেও ভালবাস। ঈশা, বল, তোমার কাঁধে গোলপানা ওটী কি? যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, ওটী কি সেই পৃথিবী? হাঁ, পৃথিবীর সকল উদ্বেগ, শোক ও পাপ তোমার মাথায় লইয়াছ। আমাদের দুরাত্মতা তোমার অশ্রুমোচন করায়, আমাদের ক্লেশ যাতনা তোমার শোণিতপাত করায়। এজন্যই তুমি শোকগ্রস্ত। তোমার মস্তকোপরি গুরু ভার, এজন্য তোমার আকুঞ্চিত ভ্রূ। তোমার হৃদয় স্ফটিকসদৃশ নির্ম্মল, তোমার পিতার সহিত তোমার আত্মার যোগবশতঃ তুমি সুখী, কেবল দুঃখী অপরের জন্য। তোমার জীবন অপরের সেবায় এবং পৃথিবীর দুঃখ লঘু করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। দিবা রজনী তুমি সৎকর্ম্ম করিয়া বেড়াও; অথচ যে পৃথিবীর কল্যাণের জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে ও চিন্তা পরিশ্রম করিলে, সেই পৃথিবীই তোমাকে বধ করিবার জন্য তোমার বিরোধী হইল। যিহুদিগণের ভূমি ভীষণ অন্ধকারাবৃত। দেশের আনন্দ শীঘ্রই শোকে পরিণত হইল, এবং তখনই চারি দিক্ বিলাপে পূর্ণ হইল। হে ঈশা, যাত্রিকগণ তোমার জন্মে এইমাত্র আনন্দ করিল। এত সত্বরই কি তোমার মৃত্যুর জন্য শোক করিবে? হায়, তোমার শিষ্যই তোমায় শত্রুহস্তে অর্পণ করিল এবং যাহাদের তুমি কিছু ক্ষতি কর নাই, তাহারাই তোমার মৃত্যুর উপক্রম দেখিয়া আনন্দ করিতেছে। ক্রুশোপরি তাহারা তোমায় প্রেকে বিদ্ধ করিয়া ক্রুশনিহত করিল। তুমি মরিলে! আবার তুমি জীবিত হইয়া উঠিলে। পিতার নিকটে ফিরিয়া গেলে বলিয়া নিরতিশয় আমোদ করিতেছ। আর আমরা তোমায় দেখিতে পাই না। স্বর্গের গৌরবের অভ্যন্তরে তুমি লুকাইলে। ঈশ্বরের সুন্দর পুত্র সৌন্দর্য্যমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন।

"হে পিতঃ, তুমি এখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে। ঈশা এখন তোমার বক্ষে প্রচ্ছন্ন। আপনাকে অস্বীকার, ত্যাগ ও বিনাশ করিয়া, তোমার সঙ্গে তিনি এক হইয়া গিয়াছেন। যাহা তাঁহার আছে, সকলই তিনি তোমায় প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। তিনি আর ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া নাই, পিতাতে পুত্র অন্তর্লীন। আমরাও যেন ঈশার মত নিত্যকাল পরমাত্মাতে অন্তর্লীন হই।"

মোহম্মদ

৪ঠা আশ্বিন, ১৮০২ শক (১৯শে সেপ্টেম্বর,১৮৮০ খৃঃ), মোহম্মদ-সমাগম। ১লা আশ্বিন (১৬ই সেপ্টেম্বর) হইতে ৩রা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর) পর্য্যন্ত প্রাস্তুতিক উপাসনা হয়। (১) প্রথম দিনে মোহম্মদের পুনঃ পুনঃ উপাসনা, দ্বিতীয় দিনে মধ্যবর্ত্তিত্ব ও পৌত্তলিকতারূপ অংশিবাদের সহিত বিরোধ, তৃতীয় দিনে ঈশ্বরের প্রতি মিত্রতা ও তাঁহার শত্রুর প্রতি শত্রুতা প্রার্থনার বিষয় ছিল। ৪ঠা আশ্বিন (১৯শে সেপ্টেম্বর), রবিবার, উপাসকগণ আরেবিয়ার হিতৈষী বন্ধু এবং প্রেরিত মহাপুরুষের নিকটবর্ত্তী হন। তাঁহারা হিন্দুর সঙ্কুচিতভাব এবং বর্ণসংস্কার পরিহার করিয়া ভাবতঃ মুসলমান হইলেন। প্রাতঃকালের উপাসনা, উদ্বোধন, আরাধনা ও সঙ্গীতের পর, পরমাত্মা কর্ত্তৃক তাঁহারা মোহম্মদের নিলয়ে নীত হইলেন এবং সেখানে তাঁহারা ইসলামধর্ম্মের গভীর বিশ্বাস ও জ্ঞান অর্জ্জন করণার্থ কতক ক্ষণ ব্যয় করিলেন। সেই প্রেরিত মহাপুরুষের পদতলে বসিয়া তাঁহারা তাঁহার দেবনিশ্বসিত অন্তরস্থ করিলেন, এবং তাঁহার সত্য আত্মার সহিত একীভূত করিলেন। তাঁহারা যোগে তাঁহার সহিত এক হইলেন, এবং তাঁহার শিক্ষা ও চরিত্র-মধ্যে যাহা কিছু ভাল, সত্য এবং স্বর্গীয় আছে, তাহা অন্তরস্থ করিতে যত্ন করিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর এই প্রেরিতপুরুষের যথার্থ জীবনের কার্য্য কি, যাত্রিকগণকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং উহা তাঁহাদিগের আয়ত্তের বিষয় করিলেন। মনে হইল, প্রতিজনেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন, সাম্প্রদায়িকগণের মোহম্মদ যাহাই হউন, ঈশ্বরের মোহম্মদ দেশীয় বা বিজাতীয় নহেন, কিন্তু ভাই এবং স্বজন, অধ্যাত্ম-সম্বন্ধবন্ধনে একত্র বদ্ধ। এ সময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেরই মনে সম্পূর্ণ এই নূতন ভাবের উদয় হইয়াছিল। মোহম্মদকে ম্লেচ্ছ এবং তাঁহার ধর্ম্মকে অবিশুদ্ধ বলিয়া সকলেরই মনে ছিল, এখন তাঁহাকে ভালবাসা ও সম্মানের যোগ্য, নিকটসম্পর্কীণ প্রিয় বলিয়া তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদের বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেওয়ামাত্র, তাঁহারা মোহম্মদের চিদাত্মাকে দেবালোকে আলোকিত, দেবজ্ঞানে অনুপ্রাণিত দেখিলেন। অন্যান্য মহাজন-

(১) ১লা, ২রা ও ৩রা আশ্বিনের প্রাস্তুতিক প্রার্থনা ১৮০২ শকের ১৬ই আশ্বিনের এবং ৪ঠা আশ্বিনের সমাগম-দিনের প্রার্থনা ১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

গণের ন্যায় পৃথিবীকে দেওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বর হইতে সুসংবাদ পাইয়াছিলেন। এ সুসংবাদ কি? যাত্রিক ভাইগণ মোহম্মদের নিকট হইতে কি শিখিলেন? তিনটি স্বর্গীয় বিধি তাঁহার নিকটে তাঁহারা শিখিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, তিনি তেজঃপূর্ণ, সন্ধিবন্ধনবিমুখ, একেশ্বরবাদের প্রতিপোষক এবং পৌত্তলিকতার স্থিরপ্রতিজ্ঞ শত্রু। ইহার মত ভীষণ পুত্তলভঙ্গকারী আর কখন কেহ ছিলেন না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ইনি ঈশ্বরের সিংহাসন স্পর্শ করিতেও দেন নাই। অপিচ তিনি প্রেরিত মহাপুরুষগণের সম্মান করিতেন। তিনি তাঁহাদের পূজা নিষেধ করিলেন এবং তাঁহাদের কোন প্রকারের মধ্যবর্ত্তিত্ব বা অবতারত্ব তিনি সহ্য করিলেন না; কিন্তু নবী বা প্রেরিতপুরুষপরম্পরায় বিশ্বাস তিনি প্রবর্ত্তিত করিলেন। তৃতীয়তঃ তিনি ঈশ্বরের বিরোধিগণের বিপক্ষে ঘোরতর প্রতিকূল ভাব প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি ঈদৃশ অনুগত এবং বিশ্বাসী ছিলেন যে, কোন প্রকারের অবিশ্বাস বা কোন শ্রেণীর অবিশ্বাসীর উপর উৎসাহদানের ভাবও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে কোন মানুষ প্রতিহিংসার হস্তোত্তোলন করিবে না; তাহার শত্রুতাসত্ত্বেও সে তাহাকে ক্ষমা করিবে এবং ভালবাসিবে। নিজের সম্পর্কে বিরোধ ও বিরুদ্ধাচরণ-বিষয়ে ক্ষমার সার্ব্বভৌমিক বিধি প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি মান্য করিতে বাধ্য। যখন কোন অবিশ্বাসী স্বর্গের ঈশ্বরের বিরোধে সংগ্রাম করে, তাঁহার অবমাননা করে, তাঁহার সিংহাসন বিপর্য্যস্ত এবং তাঁহার পৃথিবীস্থ রাজ্য ধ্বংস করিতে যত্ন করে, ঈশ্বরের প্রত্যেক যথার্থ সৈনিক ঈশ্বরের পবিত্র জয়পতাকা হস্তে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে, এবং কোন দয়া না করিয়া অবিশ্বাস ও উপহাস বিমর্দ্দিত করিবে। এই তিনটি বিষয়ে তাঁহাদিগকে মোহম্মদের মত করিবার জন্য যাত্রিকগণ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। যাত্রিকগণ একেশ্বরের উপাসক হইবেন, সকল প্রেরিতপুরুষকে সম্মান করিবেন, এবং নিজের শত্রুদিগকে ক্ষমা করিবেন, লোকের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করিবেন, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের বিশ্বস্ত অনুগত সৈনিক হইয়া সর্ব্বপ্রকারে অধর্ম্ম, অবিশ্বাস এবং কুসংস্কার ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবেন। যাত্রিকগণ যখন মোহম্মদের নৈশজাগরণ, আনন্দে নিমগ্ন ভাব, বিশ্বস্ত অনুরক্ত পত্নী খদিজাকে পার্শ্বে লইয়া হিরাপর্ব্বতগহ্বরে

দীর্ঘকালব্যাপী প্রার্থনা ও যোগ দেখিলেন, তখন তাঁহাদের মন নিরতিশয় ভাবমগ্ন হইল। তাঁহার সংশয় ও জীবনসংগ্রামের ভিতর দিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রেরিতত্বলাভ ও স্বর্গের দূত কর্ত্তৃক 'ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ' বলিয়া ঘোষণা পর্য্যন্ত যাত্রিকগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ভারতের ব্রহ্মবাদিগণ যেন নিরন্তর এই ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষের সম্মান করিতে পারেন, এবং তিনি স্বর্গ হইতে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন।

চৈতন্য

১১ই আশ্বিন, ১৮০২ শক (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ), "চৈতন্য-সমাগম"। ১) "চৈতন্য-সমাগম" অতি আনন্দ ও জীবনপ্রদ ব্যাপার। বাঙ্গালীর হৃদয়ের নিকট ঐ নাম অতি প্রিয় ও নিকটতম। দূরবর্ত্তী পালেস্তাইন, গ্রীস ও আরেবিয়া ভ্রমণের পর, নবদ্বীপের প্রেরিত মহাজনের গৃহ দর্শন করাতে আমাদের যাত্রিক বন্ধুগণের নিশ্চয়ই শ্রান্তির অপনয়ন হইল। ধর্ম্ম ও জাতীয়ভাব উভয় একত্র মিলিত হওয়াতে, এই তীর্থযাত্রা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দেশের গৌরব ও জাতির ভূষণস্বরূপ বাঙ্গালী প্রেরিত মহাজনকে দেখিবার নিমিত্ত বাঙ্গালিগণ গমন করিলেন; এজন্য তাঁহাদের মহামোদ উপস্থিত। উদ্বোধন-স্বরূপ প্রার্থনানন্তর দলবদ্ধ হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে দেবালয়ে গমন করা হইল; সেখানে নিয়মিত উপাসনান্তে প্রার্থনার সময়ে, আচার্য্য (কেশবচন্দ্র) ঈশ্বরের মধ্য দিয়া চৈতন্যের চিদাত্মার সহিত এক হইবার জন্য উপাসকগণকে অগ্রসর করিলেন। প্রার্থনায় তিনি যাহা বলেন, তাহার সার এই :—

"প্রেমময়ী জননী, তোমার যে সন্তানকে তুমি এত সুকোমল ভাবে ভালবাস, তোমার সেই প্রিয় স্নেহপাত্র সন্তানকে দেখিবার জন্য আমাদের সহায় হও। মনে হয়, স্বর্গে সুন্দর মনোহর কত ভাল ভাল ফুল আছে, তাই তুমি তাঁহার উপরে ঢালিলে। আধ্যাত্মিকতা ও ভজনমধ্যে যে সকল সুকোমল, মধুর ও মনোহর, সেই সকল দিয়া তুমি তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছ। তাঁহার

(১) ৮ই, ৯ই, ১০ই আশ্বিনের চৈতন্যসমাগমের প্রাস্তুতিক প্রার্থনা ১৮০২ শকের ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে এবং ১১ই আশ্বিন সমাগমদিনের প্রার্থনা ১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

মাথায় তুমি প্রেমের মুকুট পরাইয়াছ এবং শান্তি, ক্ষমা, আনন্দ ও গভীর সুখে তুমি তাঁহার হৃদয়কে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়াছ। মেরীর ক্রোড়স্থ সন্তান ঈশাতে আমরা পুণ্যের বরণীয় মুর্ত্তি দেখিয়াছি, এখন আমরা শচীমাতার ক্রোড়ে প্রেমপূর্ণ ভক্তির সন্তানকে দেখিতেছি। এ উভয় স্বর্গের সূর্য্য এবং চন্দ্র। কেমন আনন্দে ছোট শিশু চৈতন্য হাসিতেছেন এবং সমুদায় দেশের উপরে আনন্দ ও শান্তি ছড়াইতেছেন। যেমন তিনি দেহে বাড়িতেছেন, তেমনি জ্ঞানে ও সৌন্দর্য্যে বাড়িতেছেন। তিনি সকলেরই প্রিয়, সমুদায় নবদ্বীপ তাঁহাতে সুখী। হে প্রভো, তোমার কার্য্যপ্রণালী বুদ্ধির অগম্য; হঠাৎ সমুদায় দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। চৈতন্য কাঁদিতেছেন, চীৎকার করিতেছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 'হা হতোঽস্মি' করিতেছেন। হে ঈশ্বরের প্রিয় শিশু, এ কি, যাতে তোমার হৃদয় আকুল হইল, তোমার মধুর প্রশান্ত ভাব আন্দোলিত হইয়া গেল? তোমার আত্মা দোষশূন্য সাধুতাময়, তোমার চরিত্র উজ্জ্বল। তবে কেন তোমার রোদন ও অশ্রুবিসর্জ্জন? তোমার ললাটে প্রকাশিত ঘনান্ধকার তোমার পরিবার এবং সমুদায় পল্লীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছে। আগে তোমার জন্মস্থান এত মনোহর ছিল, এখন উহা অন্ধকারাবৃত। পৃথিবীর পাপ ও অপরাধ তোমাকে কাঁদাইতেছে। লোকে কেন মধুর হরিনাম অধরে লয় না, এই চিন্তায়, হে ধন্যাত্মা মহাপুরুষ, তোমার হৃদয়ের যাতনা। সংসারে এত দুর্দ্দশা, পাপ ও দুঃখ কেন? অপরের ক্লেশের চিন্তা তোমায় দুঃখী ও অসুখী করিয়াছে; হঠাৎ তুমি তোমার পরিজন, বন্ধুবর্গ, মাতা এবং প্রিয় পত্নী ও গৃহ ত্যাগ করিলে এবং এক দল বিশ্বস্ত অনুবর্ত্তিগণকে লইয়া দেশের লোকমধ্যে ঈশ্বরের প্রেমসম্পদ্ বিতরণ করিবার জন্য এখানে ওখানে যাইতেছ। এমন সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি বৈরাগ্য ও দারিদ্র্যের নিকটে বিক্রয় করিয়াছ। কাল গৃহের মধুরাস্বাদে মগ্ন ছিলে, আজ যুবক সন্ন্যাসী, দীন ভিক্ষু, পথের কাঙ্গাল। তবু তোমার হৃদয় দীন নয়, উহাতে ভগবদানন্দ অতিরিক্তপ্রমাণ। অন্যান্য বৈরাগীরা যে প্রকার ম্লান ও বিষণ্ণ, তুমি সেরূপ নও। তুমি নিয়ত আনন্দ করিতেছ। অপিচ তুমি নাচিতেছ এবং তোমার আনন্দ প্রমত্ত ভক্তি ও প্রমত্ত প্রেমের আনন্দ। তোমার আনন্দাশ্রু সংসারকে অশ্রুপূর্ণ করে! তোমার নৃত্য আমাদের হৃদয়কে নাচায়। নৃত্যকারিগণের

অধিনায়ক, আজও তুমি স্বর্গে, তোমার পিতার প্রাঙ্গণে, তোমার শিষ্য ও বন্ধুগণকে লইয়া কেমন সুন্দর নাচিতেছ! শ্রদ্ধেয় প্রিয় ভ্রাতঃ, আমাদের হৃদয়ের গভীর স্থানে নাচ, আনন্দে নাচ, এবং আমরা সকলে প্রভুর সিংহাসনের চারিদিকে নাচি। তোমার হৃদয় প্রেমে— অতিহীনতম নীচতম পাপীর জন্য প্রেমে—পূর্ণ। তুমি তোমার পিতার ভাবে কুষ্ঠাক্রান্ত চণ্ডালকে তোমার বক্ষে আলিঙ্গন কর এবং যে সকল অতি ঘৃণ্য পাপী তোমাকে মারিতে আইসে, তাহাদিগকে তুমি প্রেম এবং অতি পরম সম্পৎ ঈশ্বরের নাম দাও। পুণ্যের অনুরোধে তুমি আপনাকে এবং আপনার অনুগত দলকে স্ত্রীগণের সঙ্গ হইতে দূরে রাখিয়াছিলে এবং তোমার মণ্ডলীতে স্ত্রী ও পুরুষগণকে স্বতন্ত্র করিয়াছিলে। হে প্রখ্যাত সাধু, তোমার ভাব আবার এদেশে জাগিয়া উঠিয়াছে। তোমার চিদাত্মাকে পুনরাহ্বান করিতেছি। এস, এস, আমাদিগকে তোমার কীর্ত্তন, নৃত্য, তোমার পুণ্য প্রেম দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।"

বিজ্ঞানবিৎ

১৮ই আশ্বিন, ১৮০২ শক (৩রা অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ) 'বিজ্ঞানবিৎ-সমাগম' হয় *। "বিগত রবিবারে যাত্রিক ভাইগণ বিজ্ঞানবিদ্‌গণের চিদাত্মা সহ যোগ সাধন করেন। উপাসকগণ বিজ্ঞানমন্দিরে মিলিত হইয়াছেন, ইহা দেখাই-বার জন্য, দেবালয়ের প্রাচীরে বাষ্পযন্ত্র প্রভৃতির চিত্র এবং মাপিবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সকল স্থাপিত হইয়াছিল। সঙ্গীত ও আরাধনা শেষ হইলে, কেশবচন্দ্র সেই অন্তরতম আলয়ে যাত্রিকগণকে লইয়া গেলেন, যেখানে সত্যের নিত্যালোকে গ্যালিলিও ও কেপ্‌লার, নিউটন ও ফেরাডে, সুশ্রুত, চরক ও লীলাবতী প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের বিজ্ঞানের প্রেরিত পুরুষগণ দীপ্যমান হইয়া দণ্ডায়মান। এই সকল উন্নত চিদাত্মার সন্নিধানে আমাদের ভ্রাতৃগণ গভীর ভক্তিতে উপবেশন করিলেন। এই ভাবে আচার্য্য (কেশবচন্দ্র) প্রার্থনা করেন ঃ—বিজ্ঞানের ঈশ্বর, আমরা তোমার অজ্ঞান সন্তান, আমাদের উপরে দয়া কর, এবং আমাদিগকে বিজ্ঞানের মহাজনগণের নিকটে পরিচিত

* এ দিনের প্রার্থনাদি লিখিত হয় নাই, এজন্য 'সাধুসমাগমে' সে প্রার্থনাদি মুদ্রিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্ববৎ মিরার হইতে 'বিজ্ঞানবিৎ সমাগম' অনুবাদ করিয়া দিলাম। (১৮০২ শকের ১লা কার্ত্তিকের সংবাদস্তম্ভে 'বিজ্ঞানবিৎসমাগমের' কথা দৃষ্ট হয়।)

করিয়া দাও যে, আমরা তাঁহাদের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ভাবের ভাবুক হইতে পারি। তাঁহাদের মস্তকে তুমি গৌরবের মুকুট স্থাপন করিয়াছ, এবং যে সকল গৃহ বিজ্ঞাবিদ্গণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই সকল গৃহে তোমার সিংহাসন-পার্শ্বে তাঁহারা বসিয়া আছেন। প্রভো, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কতক ক্ষণের জন্য নিম্নদেশস্থ সংসারের ভোগ ও উদ্বেগ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া, এই সকল আলোকের সন্তান সহ মধুর যোগ সম্ভোগ করিতে পারি। সকল প্রকারের সংশয় ও কুসংস্কার, ভ্রান্তি ও মোহ, আভাস ও অনুমান, অসঙ্গতি ও অযুক্তবিশ্বাস হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, এবং বিজ্ঞানের আলোকে আমাদিগের হৃদয়কে আলোকিত কর। বিজ্ঞান তোমার আপনার শাস্ত্র, তোমার নিজহস্তলিখিত, বাইবেলাপেক্ষা প্রাচীন, বেদাপেক্ষা বিশুদ্ধ। বিজ্ঞানে সেই অভ্রান্ত সত্য আছে, যাহাতে আত্মা স্বাধীন হয়। আমরা যেন এই পবিত্র শাস্ত্র, এই অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী অধ্যয়ন করি, এবং দিন দিন জ্ঞানী ও শুদ্ধ হই। সর্ব্বশক্তিমান্, তোমার হস্ত যে সকল শাস্ত্র লিখিয়াছে, অদ্ভুত গ্রন্থ সকল যাহাতে তোমার পাবন জ্ঞান প্রতিফলিত রহিয়াছে, তোমার সিংহাসনের সম্মুখে সেই সকল বিবিধ শাস্ত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। এখানে বিজ্ঞান সকল তাহাদের বিশেষ বিশেষ মহাজন ও প্রেরিতগণ সহ শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত রহিয়াছে। এখানে একদিকে ব্রহ্মবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ন্যায় ও সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান, অন্য দিকে জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, রসায়ন, শরীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান। তোমার জ্ঞানের লিপি ও তোমার প্রেমের শুভসংবাদ-স্বরূপ এই সকল চিরজীবন্ত শাস্ত্রকে ভক্তি ও সম্ভ্রম করিতে শিক্ষা দাও, এবং আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা এ সকল শাস্ত্রকে সাংসারিক জ্ঞানের মত মনে করিয়া তুচ্ছ না করি। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শৈশবোচিত গ্রন্থকেও স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র অপৌরুষেয় বাক্যরূপে, এবং সংসারকে পরিত্রাণপ্রদ জ্ঞান অর্পণ করিবার জন্য তোমা কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতস্বরূপ প্রত্যেক বিজ্ঞানানুরত বিজ্ঞানবিৎকে যেন আমরা সম্মান করি। আমরা খ্রীষ্টের স্বর্গ, মুষা, সক্রেটিস, এবং চৈতন্যের নিলয় দেখিয়াছি। এখন তোমার অনুগ্রহে বিজ্ঞানের স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছি। ইহার মহাজনগণের সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে আমাদের সহায় হও।

"গ্যালেলিওর মহান্ চিদাত্মা, পবিত্রতর মহাজনগণ যেমন নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনি জ্যোতিষের জন্য নির্য্যাতিত হইয়াছিলে। হে ধন্যাত্মা নিউটন, আতার পতনমধ্যে স্বর্গীয় নিয়ম আবিষ্কার করিতে দেব-নিশ্বসিত তোমায় শিক্ষা দিয়াছিল। হে ফেরাডে, হে প্রাচীন হিন্দু সুশ্রুতের আত্মা, তোমরা পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্র আনয়ন করিলে, তোমাদের আলোকে প্রভু আমাদিগকে আলোকিত, আনন্দিত এবং মুক্ত করুন। ঈশ্বরের সন্তানগণ, আমাদের সম্মুখে তোমাদের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাউক, তোমাদের মধ্যে আমাদের পিতাকে, আমাদের পিতার মধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে দাও। ভক্তিভাজন সত্যের প্রেরিত পুরুষগণ, সত্য বিজ্ঞানে আমাদিগকে কৃতার্থ কর।"

৬

নৈনীতালে গমন

৫ই বৈশাখ, ১৮০২ শক (১৬ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃঃ), শুক্রবার, কেশবচন্দ্র তাঁহার পত্নী, মাতা এবং সন্তানবর্গ, ভাই প্রতাপচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী, কুমারী মোহিনী খাস্তগিরি এবং ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র সহ নৈনীতালে গমন করেন। ভাই উমানাথ গুপ্ত পরে গিয়া ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র নৈনীতালে গেলেন বলিয়া, খ্রীষ্ট প্রভৃতি সাধু মহাজনগণের সমাগম বন্ধ থাকে।

"ইংলণ্ডের মহত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা

১৪ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ), শুক্রবার, কেশবচন্দ্র 'নৈনীতাল এসেম্‌ব্লিরুমে' 'ইংলণ্ডের মহত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাস্থলে অধিকাংশ ইউরোপীয় উপস্থিত ছিলেন। মেস্তর আর এম্ এডওয়ার্ডস্, সি এস্ কমিশনর, রোহিলখণ্ড ডিভিসন, কর্ণেল এইচ এ ব্রাউনলো সি বি, গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী পবলিকওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, মেজর জি, ই, এর্‌স্কাইন্ গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী আয়ুধ বেরিলির উক্ত ডিপার্টমেণ্ট, কাপ্তেন বুয়চাম্প আর ই গবর্ণমেণ্ট অণ্ডার সেক্রেটারী পবলিকওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, কর্ণেল জি এস মাকবীন ডেপুটি কমিশনর জেনেরল, ডাক্তার ওয়াকর ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল অব্ প্রিজন্স, ডাক্তার প্ল্যাঙ্ক স্যানিটারি কমিশনর, মেস্তর আর ওয়াল কমিশনর অব্ একসাইস আণ্ড ষ্টাম্প, মেস্তর রাইট্ সি এস্ অফিসিয়েটিং কমিশনর অব্ আগ্রিকলচর আণ্ড কমার্স, রেবারেণ্ড বি টি আর্টে এম এ, রেবারেণ্ড বক, কর্ণেল হণ্টার টম্পসন্ এবং অন্যান্য অনেকগুলি সৈনিক পুরুষ, ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রোতৃবর্গমধ্যে ছিলেন। এই বক্তৃতায়, ইংলণ্ডের বাহুবল নহে, কিন্তু ধর্ম্মবল বৃহত্তম রাজ্যের উপরে অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব দান করিয়াছে, এবং প্রত্যেক ইংরাজের ঈশার জীবনের দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়া উচিত, ইহাই বিশেষরূপে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। খ্রীষ্টের ভাব এক স্থলে ঘনীভূত হইয়া,

ইংলণ্ডের আত্মার সঙ্গে ভারতের আত্মার বিবাহ হইয়া ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে; পূর্ব্বে ও পশ্চিমে যাহা কিছু ভাল আছে, তাহা ইহাতে একীভূত হইয়াছে। যুবক দেশসংস্কারকগণের চরিত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দিক্ মিলিয়াছে, তাঁহাদের উপাসনা প্রভৃতি সকলই এই মিশ্রভাব প্রদর্শন করে; তাঁহারা অর্দ্ধেক ইউরোপিয়ান্, অর্দ্ধেক আসিয়াটিক, অর্দ্ধেক ইংরেজ, অর্দ্ধেক ভারতীয়, অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান, অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক প্রতীচ্য, অর্দ্ধেক প্রাচ্য। তাঁহারা ঋষিগণের গভীর আধ্যাত্মিকতা ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মার্থনিহতগণের উচ্চতর নৈতিকোৎসাহের প্রতিনিধি; তাঁহারা স্বদেশীয় সাধু মহাজনগণের পদতলে উপবিষ্ট, অথচ খ্রীষ্টের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবিশিষ্ট, তাঁহারা প্রতীচ্য খ্রীষ্টকে বা খ্রীষ্টধর্ম্মকে গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের ধর্ম্ম সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম। স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, প্রাচীন ও নবীন সাধনপ্রণালী ও সাধুতা নববিধানে একীকৃত; বিশ্বাস ও বিজ্ঞান, দেবনিশ্বসিত এবং দর্শন, বৈরাগ্য এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য, ভক্ত্যুচ্ছ্বাস এবং নব্য সভ্যতা, খ্রীষ্ট ও হিন্দু ধর্ম্ম ইহাতে সমঞ্জসীভূত, ইত্যাদি বক্তৃতায় বিশেষভাবে বিবৃত হয়। খ্রীষ্ট উপাসনার্থ পর্ব্বতোপরি গমন করিতেন, ভারতের ঋষিগণও যোগার্থ হিমালয়শৃঙ্গ আশ্রয় করিতেন; অতএব খ্রীষ্টের শুদ্ধি ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ভক্তি, এ দুই যাহাতে আমরা একত্র মিলিত করিতে পারি, তজ্জন্য সকলের যত্ন প্রয়োজন, এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ হয়। বক্তৃতান্তে মেস্তর এডওয়ার্ডস্ ধন্যবাদের প্রস্তাব করেন, শ্রোতৃবর্গ একহৃদয় হইয়া তাহার অনুমোদন করেন।

প্রান্তরগত বক্তৃতা

২২শে মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ), শনিবার, কেশবচন্দ্র প্রান্তরগত বক্তৃতা করেন। প্রায় চারিশত ব্যক্তি বক্তৃতা-স্থলে উপস্থিত হয়, ইহাদিগের অধিকাংশই পাহাড়ী। প্রথমতঃ একটি সংস্কৃত ও দুইটী হিন্দিসঙ্গীত গীত হয়। কেশবচন্দ্র দেশীয় পরিচ্ছদে ও লাল বনাতে আবৃত হইয়া বেদীর উপরে দণ্ডায়মান হন। বাঙ্গালাতে প্রার্থনা করিয়া, তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করেন। অর্দ্ধঘণ্টা ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া, সাধারণ লোকদিগকে এক ঘণ্টার উপরে হিন্দিতে উপদেশ দেন। সম্মুখে নৈনীতাল হ্রদ, উভয় দিকে ঘনবৃক্ষরাজিশোভিত উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, ঊর্দ্ধে পূর্ণ চন্দ্র, এই সকল কেশবচন্দ্রের হৃদয়কে সবিশেষ উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। প্রাচীন

কালে সাধকগণ ঈশ্বরের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতেন, এ কালে কেহ তাঁহার দর্শন পায় না, এই মিথ্যা সংস্কারের তিনি প্রতিবাদ করেন, এবং উপস্থিত সকলকে, চিৎস্বরূপকে চেতনা দ্বারা, প্রেমস্বরূপকে প্রেম দ্বারা দর্শন করিতে অনুরোধ করেন। প্রাচীন ঋষিগণ হিমালয়শিখরে যেরূপ পরব্রহ্মেতে যোগ সমাধান করিতেন, আধুনিকগণ তেমনি গিরিশিখরে তাঁহাতে যোগসমাধান এবং হর-গৌরীর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া, সংসার-মধ্যে পুরুষভাব ব্রহ্মজ্ঞান ও নারীভাব ব্রহ্ম-ভক্তি মিলিত করিতে তিনি উপদেশ দেন। বক্তৃতার অন্তিমভাগে পূর্ণচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি যে সকল কথা বলেন, তাহাতে উপস্থিত সকলেরই হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়। বক্তৃতার অন্তিমভাগে হিমালয়কে সম্বোধন করিয়া, যোগ ভিক্ষা করিতে করিতে, যখন তাঁহার মন নিতান্ত উদ্দীপ্ত হয়, তখন বলিতে থাকেন, "তু অচল অটল হৈ, তু হমে অচল অটল কর। মৈ বহুত দূর সে আয়া হুঁ, তেরে পাঁও কে নীচে বৈঠকে মৈ তুঝে গুরু সমান কর, ভিক্ষা মাঙ্গতা হুঁ কি তুমে হমে যোগ সিখলা। প্রাচীন আর্য্যজাতি জৈসে যোগী থেঁ বর্ত্তমান হিন্দু বংশকী অয়সাহী যোগী কর। আজ ভাইয়ো, হামারা চিত্ত কৈ সা প্রসন্ন হোতা হৈ। চন্দ্রমা, পাহাড়, হ্রদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, ফুল সব ব্রহ্মনাম গান করো, জাগো ভাই। আভি উঠো, কোমর বান্ধো। আও নববিধানকা ঝাণ্ডা লেকে পূর্ণ ব্রহ্মকা জয় ঘোষণা করো। সব বিশ্বকা সাথ মিলকে, আওর ধনী দুঃখী ব্রাহ্মণ শূদ্র সব একহৃদয়প্রাণ হোকে, বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরকা নামকীর্ত্তন করো, আপনে পরিচিত আওর বান্ধবোঁকো সাথ লেকে সব প্রেমধাম অমৃতধামকী তরফ্ চলো।" এই বক্তৃতা হিন্দু মুসলমান সকলেই স্ব-স্ব-ধর্ম্মানুরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং কেশবচন্দ্র যে জাতিভেদ মানেন না, এরূপ না মানাতে তাঁহার অধিকার আছে, হিন্দুগণ বলিতে থাকেন। যাঁহারা দোষদর্শী হইয়া বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও বক্তৃতার ভূরি প্রশংসাবাদ করিয়া, তাঁহাদের দোষদর্শনের দোষক্ষালন করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের সম্মানার্থ নৈনীতাল 'ইন্‌ষ্টিটিউটে' সায়ংসমিতি

২৯শে মে (১৭ই জ্যৈষ্ঠ), শনিবার, কেশবচন্দ্রের সম্মানার্থ নৈনীতাল "ইন্‌ষ্টিটিউটে" সায়ংসমিতি হয়। গৃহটি পত্রপুষ্পাদিতে পরিশোভিত এবং আলোকমালায় উজ্জ্বল করা হইয়াছিল। গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে সম্মুখস্থ হ্রদে

কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্গকে লইয়া নৌক্রীড়া হয়। অন্যান্য সকলের সঙ্গে ইহারাও নৌকায় দাঁড় টানিয়া আমোদ করেন। নৌক্রীড়াসমাপ্তির পর যখন ৭টার সময়ে ইহারা কূলে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ইহাদিগকে আনন্দধ্বনিতে গ্রহণ করিলেন। স্বাগতাঙ্কিত গৃহদ্বারে সভ্যগণ কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশমাত্র উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্ভাষণ করিলেন। সকলে উৎকৃষ্ট গালিচায় উপবেশন করিলে, সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মুন্সি রামজীমল আতর ও পান বিতরণ করিলেন। ফটোগ্রাফ ও ছায়াবাজী প্রদর্শন দ্বারা সকলকে আমোদিত করণানন্তর, পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ শিওপুরী উর্দ্দুতে লিখিত সময়োচিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ জ্যোষি ইহাদের অভ্যর্থনার কারণ বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করেন। তদনন্তর ইটালীয় বাদকগণের বাদনের পর, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কবিবর টেনিসনের 'মে কুইন' খণ্ড-কাব্যের এবং বাবু হেমচন্দ্র সিংহের বক্তৃতার পর, কেশবচন্দ্র সেন সেক্সপিয়রের 'হ্যাম্‌লেট' নাটিকার বাচনা করেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতার পর সাড়ে দশটার সময় সভাভঙ্গ হয়।

যোগসাধন—'স্বামী আত্মার স্ত্রী আত্মাকে সম্বোধন'

নৈনীতালে অবস্থানকালে কেশবচন্দ্র যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার পত্নীকে যোগের সঙ্গিনী করিয়া, একত্রে উভয়ের ফটো গ্রহণ করেন। কি ভাবে এই ফটো গৃহীত হয়, 'স্বামী আত্মার স্ত্রী আত্মাকে সম্বোধনে' (১৮০২ শকের ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) প্রকাশ পাইবে :—"প্রিয়ে, তুমি আমার নিকটে এক বুদ্ধির অগম্য বস্তু। যখন তোমাকে বিবাহ করি, তাহার পূর্ব্বে তুমি আমার নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলে, কিন্তু তুমি আমার এক জন বন্ধু। আমি তোমাকে চিনিতাম না, তুমিও আমাকে চিনিতে না। তোমার বাড়ী এক স্থানে ছিল, আমার বাড়ী এক স্থানে। এক্ষণে যাহা আমার বাড়ী, তাহাই তোমার বাড়ী, এবং আমার সমুদায় দ্রব্যাদি তোমার। আমাদের সন্তানেরা তোমাকে মা বলিয়া এবং আমাকে বাপ বলিয়া ডাকে। প্রিয়ে, আমরা ছিলাম দুই জন, এক্ষণে হয়েছি এক জন, অর্থাৎ একের ভিতরে দুই জন। ইহা আশ্চর্য্য এবং বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার! কে ইহার

অর্থ করিবে? যে দুই হৃদয় পরস্পর অপরিচিত বলিয়া অতিশয় বিচ্ছিন্ন ছিল, তাহাদের মধ্যে এ প্রকার নিকট সম্পর্ক এবং যোগ কোন্ শক্তি স্থাপন করিল? সত্যই সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ, যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চালাইতেছেন, তিনিই আমাদিগকে মিলিত করিয়াছেন। যদি বল, কেন? তাহা আমি জানি না। যদি বল, কিরূপে? তাহাও আমি জানি না। যাঁহাকে লোকে দয়াময় বলে, তাঁহার কার্য্য সকল কে বুঝিতে পারে? তাহা অনুসন্ধানের অতীত। হে প্রিয় আত্মা, কেন এবং কিরূপে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহা আমি যথার্থই জানি না। আমার মনে হয়, কে যেন তোমাকে ঈশ্বরের দয়ার পক্ষপুটে আরোহণ করাইয়া হঠাৎ আমার নিকটে লইয়া আসিয়াছে। এ লোকটা কে, আমার মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভিতর হইতে একটি শব্দ বলিয়া উঠিল, তোমার জীবনের কার্য্যে তোমাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য এবং তোমাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তোমার আনন্দ এবং দুঃখের সহভাগিনী হইবার জন্য, ইনি স্বর্গ হইতে প্রেরিত। ইঁহাকে গ্রহণ কর, ইঁহাকে প্রণাম কর, এবং ইঁহাকে তোমার আপনার করিয়া লও। আমি ইহা শুনিলাম, সেই মত কার্য্য করিলাম, কিন্তু আমার বুদ্ধি ব্যাপারটি বুঝিতে পারিল না, এবং অদ্যাপিও বুঝিতে পারে নাই। তোমার মুখপানে যখন আমি প্রথম দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন আমার ভিতরে বিচিত্র ভাব সকল উত্তেজিত হইয়া, আমার হৃদয় তোমার দিকে আকৃষ্ট হইল। নিশ্চয়ই যিনি তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি তোমাকে যে গুপ্ত আকর্ষণ দিয়াছেন, তুমি তাহার দ্বারাই আমাকে টানিয়াছিলে; নতুবা আমি কেন উক্ত প্রকার ভাব সকল অনুভব করিলাম। মনের এই ভাবকে লোকে প্রণয় বলে। প্রণয়—ইহা কি? আমি ইহা মনে মনে জানি, কিন্তু ইহা যে কি, তাহা বলিতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসি, অর্থাৎ তোমার প্রতি আমি একটি গভীর ভাব অন্তরে অন্তরে পোষণ করি, ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। প্রশস্ত ভূমণ্ডলমধ্যে আমি তোমাকে যে প্রকার ভালবাসি, কেনই বা আমি আর কাহাকে সে প্রকার ভালবাসি না। তোমার মত কি আর কেহ উৎকৃষ্ট নাই? আর কেহ কি এমন গুণসম্পন্ন নহে? তবে তুমি আমার হৃদয়ের আনুগত্য এবং অনুরাগকে যত আকর্ষণ কর, কেন আর কেহ সেরূপ

করিতে পারে না? বলিতে কি, আমার ভালবাসাকে বান্ধিয়া রাখিবার এবং হৃদয়কে টানিবার ভার তোমাকে দান করা হইয়াছে, নতুবা তুমি কখনই তাহা পারিতে না। তোমার ঈশ্বরই তোমাকে আমার উপর এই গূঢ় শক্তি এবং কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। হে স্বর্গের সুন্দর সন্তান, তোমার পিতা আমার হৃদয়রজ্জুতে তোমাকে দৃঢ় করিয়া বান্ধিয়াছেন, সুতরাং স্বর্গীয় ভালবাসাতে আমি তোমার এবং তুমি আমার। কি বলিলাম, স্বগীয় ভালবাসা? হাঁ। পৃথিবী যাহা ইচ্ছা বলুক না, বিবাহসম্বন্ধীয় যে যথার্থ প্রণয়, তাহা একটি পবিত্র ভাব। স্বামী এবং স্ত্রীর যে প্রণয়, উহা স্বর্গীয় আসক্তি। কে এ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারে? তাহারা পরম পবিত্র পুরুষকে অপমান করে, যাহারা ইহাকে পার্থিব প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করে। হে প্রিয় আত্মা, ইহা কি হইতে পারে যে, আমার মধ্যে যে পশুপ্রকৃতি আছে, তাহা তোমাকে ভালবাসে? কখনই না। একটী অমর আত্মার আর একটির ভিতরে লয়, ইহা কেবল স্বর্গীয় উদ্রিক্ত ভাব নিষ্পন্ন করিতে পারে। হে বন্ধু, আমাদের প্রণয়ের স্বর্গীয় সম্বন্ধে তুমি সাক্ষ্যদান কর, সে বিষয়ে সঙ্কুচিত হইও না। এই সংশয়প্রধান কাল, এই কুপথগামী বংশ, এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ বাক্য শুনিতে চায়, আমরা এ বিষয়ে কোন দ্বিধা এবং অস্পষ্ট ভাব রাখিব না। ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন আমি তোমাকে ভালবাসিতাম না। ঈশ্বর যদি আমাকে তোমাকে ভালবাসিতে ক্ষমতা না দিতেন, আমি তোমাকে ভালবাসিতে পারিতাম না। দাম্পত্যপ্রণয়ের সম্বন্ধ, ভাব, বল, কর্ত্তব্য, আনন্দ সকলই স্বর্গীয়। যখন তুমি প্রথমে আমার নিকটে আসিয়া বিবাহের পিঁড়িতে বসিলে, তখন আমি তোমার গলায় মালা পরাইয়া দি নাই, কিন্তু তোমার আত্মার গলায় মালা পরাইয়া দিয়াছিলাম। হে নারী, আমি তোমায় বিবাহ করি নাই, কিন্তু তোমার আত্মাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমি আমোদ-প্রমোদের জন্য বিবাহ করি নাই, কিন্তু এই জন্য করিয়াছিলাম যে, তুমি আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত এবং আমার পরকালের পথে সহযাত্রী হইবার জন্য, স্বর্গ হইতে নিয়োগপত্র লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিলে। সংসারের ব্যবসায়বাণিজ্য এবং প্রলোভনের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ ফকীর এবং বৈরাগী লইয়া একটি স্বর্গের বাড়ী, একটী প্রেমের পরিবার গঠন করিবার

জন্য, আমরা পরমেশ্বরের নিকট হইতে সুগম্ভীর সাক্ষাৎ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার প্রার্থনার প্রিয় সঙ্গিনীরূপে, আধ্যাত্মিক জগতে আমার বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে, স্বর্গের অদৃশ্য মণিমাণিক্যে বিভূষিত একটি আত্মা এই ভাবে, তুমি আমার নিকটে দণ্ডায়মানা। সেই জন্য তোমার স্বামী তোমাকে আধ্যাত্মিক প্রেমে ভালবাসিতে এবং তোমার সঙ্গে ধর্ম্মের সখ্যভাবে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছেন। যখন আমরা নিত্য গৃহধর্ম্ম পালন করি, তখন আমরা ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সহকর্ম্মিরূপে অবস্থান করি। আমাদের ধর্ম্মের প্রেম বলিয়া কি ইহা কম উদ্দীপ্ত? প্রার্থনার সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া কি ইহা কম প্রোৎসাহিত? না। সত্য সত্য এমন লোক আছেন, যাঁহারা বৈরাগীর ভাবে ঈশ্বরের পূজা করিবেন মনে করিয়া, আপনাদের স্ত্রীকে ঘৃণা করেন। আবার এ প্রকার লোকও আছে, যাহারা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট এবং সেবা করিবে বলিয়া, ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি উপেক্ষা করে। কিন্তু হে প্রিয় অর্দ্ধাঙ্গ, আমি এ সকল মত পোষণ করি না। এ প্রকার বাতুলতার সহিত আমার যোগ নাই। আমার মত উচ্চতর। যখন তুমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছ, তখন আর আমি তোমাকে ঘৃণা করিতে পারি না; তোমাকে ঘৃণা করা পাপ। তোমাকে মান্য করা, তোমাকে ভালবাসা পুণ্য। ঈশ্বরের সমক্ষে তোমার সঙ্গে আমি প্রার্থনা করিব, ঈশ্বরের সমক্ষে তোমার সঙ্গে আমি বসিব। তুমি তোমার সুমধুরস্বরে তাঁহার নামে সঙ্গীত করিবে এবং আমার হৃদয়কে মোহিত করিয়া দিবে। তুমি সমুদায় সাংসারিক ভাবনা, অপবিত্র চিন্তা, ক্রোধ, দ্বেষ, সমস্ত মন্দ প্রবৃত্তি, লঘুতা, স্বর্ণের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং বৈরাগীর ন্যায় দরিদ্রতা এবং বিনয়ের ব্রত গ্রহণ করিবে। স্বর্গীয় প্রভুর আরাধনায়, সেবাতে এবং জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য সকল পালনে তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে যোগদান করিবে। এইরূপে ইহকাল এবং অনন্তকালের জন্য আমরা ঈশ্বরেতে একাত্মা, এই ভাবে সংযুক্ত হইয়া যাইব এবং নিত্য-পুণ্য-শান্তি লাভ করিব। আমাদের ভালবাসা পৃথিবীর অতীত বৈরাগীর প্রেমে এবং নিত্য আধ্যাত্মিক সখ্যভাবে পরিণত হউক। সংসার-এবং-শারীরিক-ভাবাসক্ত স্বামী যে আপনার স্ত্রীকে ভালবাসে, তাহা নহে। বৈরাগীই কেবল প্রকৃত প্রণয় এবং জীবন্ত অনুরাগে ভালবাসিতে পারে, কারণ তাঁহার ভালবাসা ঈশ্বরের নিকট হইতে আইসে। এ প্রকার

ভালবাসা আমাদের হউক! হে আত্মা, যেমন আমি লিখিতেছি, লিখিতে লিখিতে তোমার শরীর এবং শারীরিক বিষয় সকল যেন্ সমস্ত অন্তহিত হইল, এবং একটী আধ্যাত্মিক স্ত্রী ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। পরম মাতার ক্রোড়ে, প্রার্থী ও ঋষির ভাবে, একটি আত্মা স্বামী একটি আত্মা স্ত্রী বসিয়া আছে, ইহা কি মনোহর স্বর্গীয় দৃশ্য! হে প্রিয়ে, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

হিমালয়শিখরে অনন্ত ভূমা মহান্ পরমপুরুষের সহিত গভীর যোগ এবং মুষা, ঈশা, জরথস্র এবং শাক্য প্রভৃতির সহিত একাত্মতাসাধনে কেশবচন্দ্র কিরূপ নিমগ্ন ছিলেন, তাহা 'পর্ব্বতশিখরে' এই প্রবন্ধে এবং বিবিধ প্রার্থনায় তিনি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন।

হিমালয়গিরি হইতে সহভারতবাসিগণকে পত্র

হিমালয় গিরি হইতে তিনি সহভারতবাসিগণকে ১৬ই জুন (১৮৮০খৃঃ) যে পত্র লিখেন, আমরা তাহা অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

(আমাকে প্রেরিত ও দাসরূপে গ্রহণ কর)

"নিরতিশয় প্রিয় ভ্রাতৃগণ—করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের আত্মার সন্নিধানে ভাল ভাল আশীষ প্রেরণ করুন। স্বর্গ হইতে তোমাদের উপরে শান্তি ও আনন্দ অবতরণ করুক। তোমাদের প্রিয় ভ্রাতা এবং বিনত সেবক হইতে প্রিয় সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা দিতেছি এবং আমার সরল প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে সত্যেতে ও ভাবেতে সম্পন্ন হও এবং স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কর। এবিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর, স্বর্গ ও পৃথিবীতে আমাদের প্রিয়তম বন্ধু ভারতকে, ভ্রান্তি ও পাপের বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য, তাঁহার রাজ্যে স্থানদান করিবার জন্য, একটি নবতর বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিধানসম্বন্ধে আমার হৃদয় সুখকর সংবাদ এবং আনন্দকর শুভবার্ত্তাতে পূর্ণ; অনুগত দাসের ন্যায় আমি এই সকল তোমাদের নিকটে উপস্থিত করিব। জান এবং বিশ্বাস কর যে, আমিও বিনীত ভাবে আপনাকে আর সকলের মত নববিধানের প্রেরিত ও দাস এই আখ্যার অধিকারী সাব্যস্ত করি। আমি কি তাঁহাদের মধ্যে এক জন নই, যাঁহাদিগকে বিধাতা এই উচ্চ অভিপ্রায়সাধনার্থ নিয়োগ করিয়াছেন? আমার জীবনের কার্য্য অস্বীকার করাতে, অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াতে, আত্মাকে অসত্যবাদিত্ব

এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে বিদ্রোহিত্বের অপরাধে অপরাধী করা হয়। আমি কি ঈশ্বরসন্নিধানে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাসাক্ষ্যদায়ী হইব এবং নরকাগ্নিতে আত্মাকে দগ্ধ করিব ? ঈশ্বর এরূপ না করুন ! পৃথিবীতে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য পিতা কর্ত্তৃক আমি প্রেরিত হইয়াছি, এবং যে লবণ আমি খাই, তৎপ্রতি আমাকে বিশ্বস্ত থাকিতে হইবে। আমি তোমাদের মধ্যে কেন আছি ? আছি আমার সহপাপিগণকে নববিধানের শুভসংবাদ দেওয়ার জন্য। আমায় সম্মান করিও না, আমায় তোষামোদ করিও না, সাধু মহাজন বা মধ্যবর্ত্তীর নিকটে যেমন, তেমন করিয়া আমার নিকটে প্রণত হইও না ; কিন্তু তোমাদের পদতলস্থ ভৃত্যের ন্যায় আমার প্রতি তোমরা ব্যবহার কর এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সেবা গ্রহণ কর। ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগের নিকটে বিনীত প্রার্থনা করিতেছি, আমায় অস্বীকার করিও না ; যে জলে আমি তোমাদের পাদধৌত করিতেছি, সেই জল আমার পরিত্রাণার্থ আমার পক্ষে জলাভিষেক হইবে। আমার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রভু ঈশ্বর হইতে আমি অনেকগুলি সংবাদ পাইয়াছি, সে সকল আমাকে যেরূপ আনন্দিত করিয়াছে, তেমনি তোমাদিগকেও আনন্দিত করিবে। যৎকালে আমি আমার পিতার সংবাদগুলি অর্পণ করি, তৎকালে তোমাদের ভৃত্যের প্রতি অবধান কর।

(প্রভু পরমেশ্বর একই)

“হে হিন্দুস্থান, শুন, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই। তোমার কল্যাণার্থ তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশেষবিধানের ধনাগার খুলিয়া দিয়াছেন এবং তোমায় নূতন বিশ্বাস, নূতন প্রেম, নূতন আশা ও নূতন আনন্দের সম্পদ্ অর্পণ করিতেছেন। এ কথা শুনিয়া কি তুমি আহ্লাদ করিবে না ? সহভারতবাসিগণ, এই পবিত্র হিমালয়শিখর হইতে আমি তোমাদিগের নিকটে এই আনন্দকর সংবাদ ঘোষণা করিতেছি। প্রতিহৃদয় প্রতিগৃহকে আনন্দিত করিয়া, এই সংবাদ ভারতের এক দিক্ হইতে আর এক দিকে গমন করুক। এই নবীন শুভসংবাদ কি মধুর ! আমার আত্মা ব্রহ্মানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে এবং একতন্ত্রীযোগে সুখস্বরূপ ঈশ্বরের গৌরব গান করে। এই আনন্দের সময়ে কোন হৃদয় যেন বিবাদ না করে। আমরা সকলে ভারতের ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে

মিলিত হই, এবং তাঁহার এই অনুগ্রহের নিদর্শন জন্য, জাতীয়কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক আনন্দকর মিলিত একতান-সঙ্গীত উত্থাপন করি।

(জীবন্ত পরমাত্মা, 'আমি আছি' যাঁর নাম, তাঁর কথা শোন, তাঁর বিধাতৃত্ব গ্রহণ কর)

"অনন্ত পরমাত্মা, যাঁহাকে চক্ষু দেখে নাই, কর্ণ শুনে নাই, তিনি তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহাকে বিনা অন্য দেবতা তোমরা গ্রহণ করিবে না। এই মহান্ প্রভুর বিরোধে তোমরা দুইটী দেবতা স্থাপন করিয়াছ। যে মন্দিরে এই দুই দেবতা স্থাপিত রহিয়াছে, সেই মন্দিরোপরি সর্ব্বশক্তিমানের গোলা বর্ষিত হইবে। অজ্ঞগণের হস্ত যে দেবতা নির্ম্মাণ করিয়াছে, জ্ঞানগর্ব্বিগণের গর্ব্বিত কল্পনায় যে দেবতা কল্পনা করিয়াছে, এ দুইই প্রভুর বিরোধী। এ দুইকে তোমরা অস্বীকার ও পরিহার করিবে। তোমাদের অনেকে পাষাণ ও মৃন্নির্ম্মিত স্থূলচক্ষুর্গোচর দেবতা সকল পরিহার করিয়াছ, কিন্তু তৎপ্রতি যে আনুগত্য ছিল, উহা বর্ত্তমান যুগের সংশয়বাদ, চিন্তা ও কল্পনার সূক্ষ্ম সারভূতাংশ, বিবর্ত্তবাদের শূন্যায়মান প্রেতাত্মা ও কলাঘটিত চক্ষুর্গোচর জীবনশূন্য, অসৎ ও মৃত পুতুলসকলের প্রতি স্থাপন করিয়াছ। জীবন্ত পরমাত্মার আরাধনা কর, যিনি চক্ষু বিনা দেখেন, কর্ণ বিনা শোনেন, ওষ্ঠাধর বিনা বলেন, যিনি অদ্য, কল্য এবং নিত্য কালের জন্য আত্মাতে জীবনসঞ্চার করেন এবং তাহাদিগকে পরিত্রাণ দেন। যিনি মহান্ আত্মা যিহোবা, যাঁহার 'আমি আছি' নাম মেঘগর্জ্জন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে, সজ্ঞান বিশ্বাসচক্ষুতে তাঁহার জলন্ত বিদ্যমানতা দেখ, বিবেক-কর্ণেতে অন্তরে বাহিরে তাঁহার আত্মিক নিঃশব্দ শব্দ শোন এবং যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তন্মধ্যে তাঁহার বিধাতৃত্বের অঙ্গুলি আশ্বস্ততার হস্তে ধারণ কর। এইরূপে তোমরা সত্য ঈশ্বরেতে অনন্ত জীবন লাভ করিবে।

(ঈশ্বর ও স্বর্গস্থ সাধুগণের সহিত অধ্যাত্মযোগই সত্য স্বর্গ)

"ঈশ্বর এবং স্বর্গগত সাধুগণের আত্মার সহিত অধ্যাত্মযোগ তোমাদের পক্ষে সত্য স্বর্গ; তোমরা অন্য কোন স্বর্গ চাহিবে না। স্বপ্নদর্শিগণের মেঘোপরিস্থ অপ্সরালোক, মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয়পরায়ণগণকল্পিত পার্থিব সুখভোগের অতিরিক্ত মাত্রার দৃশ্যানুভব, এ সকলকে তোমরা ঘৃণা করিবে। আত্মার আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসে তোমরা স্বর্গের আনন্দ ও পবিত্রতা অন্বেষণ কর। যে সকল আত্মা স্বর্গগত হইয়াছেন, তাঁহারা কোথায় থাকেন, কোন মানুষ বলিতে পারে না,

১৯৯

অস্থিমাংসযুক্ত মানবগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে দেখিতেও পাওয়া যায় না, তাঁহাদের সহিত আলাপও করিতে পারা যায় না। সুতরাং তোমরা তোমাদের আত্মার অন্তরতম প্রদেশে বিশ্বাস, প্রেম এবং চরিত্রের একতায় তাঁহাদের সঙ্গ অন্বেষণ করিবে। এমন কি, তোমাদের প্রাত্যহিক উপাসনা ও যোগ মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র স্বর্গনিকেতনের আভাস দেখিতে পাইবে, এবং তোমাদের পিতৃনিলয়ের আনন্দের আস্বাদ লাভ করিবে।

(সকল দেশ কালের সাধু মহাজন প্রভৃতিকে সম্মান কর)

"মনুষ্যপরিবারের জ্যেষ্ঠ, সকল দেশের, সকল কালের মহাজন, সাধু, ঋষি, ধর্ম্মার্থনিহত, প্রেরিত, প্রচারক এবং হিতৈষিগণকে জাতীয়পক্ষপাতবিরহিত হইয়া, তোমরা সম্মান করিবে ও ভালবাসিবে। ভারতীয় সাধুগণ যেন তোমাদের সম্মান ও অনুরাগ একাধিকার করিয়া না লন। ভারতসন্তান বলিয়া তাঁহাদিগকে তোমাদের জাতীয় অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা দাও, মানব বলিয়া তাঁহাদিগকে মানবহৃদয়ের সার্ব্বজ্ঞানপদোচিত আনুগত্য ও অনুরাগ অর্পণ কর। প্রতি সাধু ব্যক্তি এবং মহাপুরুষ ঐশ্বরিক সত্য ও মঙ্গলভাবের বিশেষ উপাদানের বাহ্যপ্রকাশ। এজন্য স্বর্গের প্রতিসংবাদবাহকের চরণতলে বিনীত-ভাবে উপবেশন কর, এবং তাঁহার যে সংবাদ তোমাদিগকে দিবার আছে, তাহা তাঁহা হইতে গ্রহণ কর। অধিকন্তু তাঁহার দৃষ্টান্ত ও চরিত্র, তাঁহার বিশেষ শিক্ষা ও সদ্‌গুণনিচয় তোমাদের জীবনের সঙ্গে সম্যক্ প্রকারে এমনি একীভূত করিয়া লও যে, তাঁহার মাংস তোমাদের মাংস, তাঁহার রক্ত তোমাদের রক্ত, তাঁহার ভাব তোমাদের ভাব হইয়া যায়। এইরূপে ঈশ্বরের সকল সাধুগণ, যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের হউন না কেন, তোমাদের আত্মার সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন। নিত্যকালের জন্য তোমরা তাঁহাদিগেতে এবং তাঁহারাও তোমাদিগেতে বাস করিবেন।

(গোঁড়াম, ধর্ম্মান্ধতা, পরমতাসহিষ্ণুতা পরিহার কর)

"গোঁড়াম, ধর্ম্মান্ধতা, পরমতাসহিষ্ণুতা নববিধানের ভাবের একান্ত বিরোধী জানিয়া, উহাদিগকে নিয়ত পরিহার করিবে। তোমাদের বিশ্বাস অসর্ব্বান্ত-র্ভাবক না হইয়া সর্ব্বান্তর্ভাবক হউক। তোমাদের প্রেম সাম্প্রদায়িক অনুরাগ না হইয়া সার্ব্বভৌমিক ঔদার্য্য হউক। যদি তোমরা কেবল আপনাদের

লোক, আপনাদের জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনগণকে ভালবাস, ইহাতে আর তোমাদের কি গৌরব? যদি তোমরা কেবল আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্তগণকে ভালবাস ও সম্মান কর, এবং অবশিষ্ট পৃথিবীকে ঘৃণা কর, প্রত্যেক ছোট সম্প্রদায় কি তাহাই করে না? যদি তোমরা কেবল একটী মণ্ডলী, একখানি গ্রন্থ, এক জন মহাজনকে ঈশ্বরের বলিয়া ভাব, তদ্ব্যতিরিক্ত আর সকলই তোমাদের নিকটে মিথ্যা ও ঘৃণার সামগ্রী হয়, তাহা হইলে তোমরা কি সংসারের সঙ্কীর্ণমনা গোঁড়ামর অনুসরণ করিয়া, অন্ধকার ও মারাত্মক বিদ্বেষে গিয়া পড় না? সকল সত্য, সকল কল্যাণকে যেখানে কেন পাওয়া যাউক না, ঐশ্বরিক বলিয়া ভালবাসা, তোমাদের গৌরব ও উচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষা হউক। তোমরা নূতন সম্প্রদায় গড়িবে না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়কে অন্তর্ভূত করিয়া লইবে। তোমরা নূতন ধর্ম্মমত সংসৃষ্ট করিবে না, কিন্তু সকল ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্যসম্পাদন করিবে। উদার ধর্ম্মবিশ্বাসের নবীন শাস্ত্রে সকল শাস্ত্র, সকল বিধান পূর্ণ হইল, সকল কালের জ্ঞান সংগৃহীত হইল, ইহাই দেখ।

(বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন কর)

"অযুক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ যেমন যাহা তাহা বিশ্বাস করিয়া লয়, তোমরা তাহা করিও না। আমাদের প্রভু ঈশ্বর বলিয়াছেন, বিজ্ঞান আমাদিগের ধর্ম্ম হইবে। তোমরা সকলের উপরে বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে, বেদাপেক্ষা জড়বিজ্ঞানকে, বাইবেলাপেক্ষা অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে সম্মান করিবে। জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র প্রকৃতির ঈশ্বরের জীবন্ত শাস্ত্র। দর্শন, ন্যায় ও নীতিবিজ্ঞান, যোগ, দেবনিশ্বসিত এবং প্রার্থনা আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের শাস্ত্র। নূতন ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রতিবিষয় বৈজ্ঞানিক, কিছুই অবৈজ্ঞানিক নয়। নিগূঢ় রহস্য দ্বারা তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিও না, স্বপ্ন বা কল্পনার প্রশ্রয় দিও না, কিন্তু পরিষ্কৃত দৃষ্টিতে এবং প্রশস্ত বিচারে সকল বিষয় প্রমাণিত কর, এবং যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ কর। তোমাদের সকল প্রত্যয় ও সকল প্রার্থনায় বিশ্বাস ও জ্ঞান সত্যবিজ্ঞানে একীভূত হইবে।

(ধর্ম্ম ও নীতি অবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হোক)

"তোমাদের ধর্ম্ম ও নীতি যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, কিন্তু সর্ব্বদা অভিন্নভাবে

স্থিতি করে। কারণ এ উভয়ই ঈশ্বরের এবং সত্য ও চরিত্রের কেবল ভিন্ন দিক্। নীতিকে বাদ দিয়া ভক্তি অন্বেষণ করিও না, ঈশ্বরহীন হইয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও চরিত্রবান্ হইতে যত্ন করিও না। সে প্রকারের সাধুতা, শুচিত্ব-প্রদর্শন, বৈরাগ্য ও উপাসনাশীলতার সম্মান করিও না, যাহাতে নীতি ছাড়িয়া দিতে হয়, নীতি-লঙ্ঘন হয়; যাহা নীতিবিরুদ্ধ, তাহা ধর্ম্মসিদ্ধ নহে, এবং ইহাও নিশ্চয় জান, কিছুই যথার্থ নীতিসিদ্ধ নয়, যাহা ধর্ম্মসঙ্গত নয়। ভক্তি ও নৈতিক পবিত্রতার পূর্ণতাই নববিধান। ঈশ্বরের ন্যায়সম্পর্কে সাবধান হও; তোমার ভক্তি দৃশ্যতঃ যতই কেন গভীর হউক না, নৈতিক বিধি ও কর্ত্তব্যের উল্লঙ্ঘন হইলে, উহা ইহকাল ও পরকালে নিশ্চয় তোমায় উপযুক্ত দণ্ড দান করিবে। ভ্রাতৃগণ, সকল বিষয়ে পূর্ণতার দিকে প্রযত্নসহকারে যত্ন কর, এবং অনন্ত উন্নতি তোমাদের মূলমন্ত্র হউক। কোন প্রকার সদ্‌গুণের প্রতি অবহেলা করিও না। মাধ্যমিকাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিও না। কতক দিন অগ্রসর হইয়া থামিয়া পড়িও না। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে সকল বৃত্তি ও ভাব দিয়াছেন, তাহাদের প্রতিটির পূর্ণতা সাধন করিতে করিতে নিত্যোন্নতির পথে চলিতে থাক। দীনতা ও আত্মার্পণে, প্রার্থনা ও যোগে, হিতৈষণা ও ন্যায়ে, সত্যানুসরণ ও সত্যতায়, বিনম্রতা ও ক্ষমায়, জ্ঞানোৎকর্ষসাধন ও কায়িক স্বাস্থ্যে, সকল গার্হস্থ্য এবং সামাজিক ধর্ম্মে পূর্ণতার উচ্চতম আদর্শ অধিকার করিতে যত্ন কর। এইরূপে ক্রমোন্মেষে চরিত্রের সামঞ্জস্য তোমাদের প্রত্যক্ষবিষয় হইবে।

(প্রার্থনাশীল হও)

"সর্ব্বোপরি, বন্ধুগণ, প্রার্থনাকে তোমাদের জীবনের উচ্চতম ব্যাপার কর। তোমাদের আপনার উপরে আস্থা স্থাপন করিও না, কিন্তু প্রভু পরমেশ্বরের উপরে আস্থা স্থাপন কর। সরলতা ও ব্যগ্রতা-সহকারে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর। দৈনিক প্রার্থনা তোমাতে স্বর্গ হইতে বল ও জ্ঞান, পবিত্রতা ও আনন্দ উপস্থিত করুক। একা, সকলের সঙ্গে, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া, দৈনিক জীবনের বিষয়কর্ম্মমধ্যে প্রার্থনা কর। তোমার সর্ব্বপ্রকার শোভনীয় এবং লভনীয় অনুসর্ত্তব্য বিষয়গুলিকে প্রার্থনার অধীন কর। প্রার্থনা তোমার জীবনের আভ্যন্তবর্ণ হউক। ভারতবর্ষ ব্যগ্র প্রার্থনা এবং আনন্দকর যোগের ভূমি হউক।

(সেণ্ট পলের ভাবে সকল মহাজনগণের নামে এই পত্র)

"প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আমার সম্মানিত গুরু সেণ্ট পলের যতই কেন আমি অনুপযুক্ত না হই, আমি তাঁহারই ভাবে এই পত্র লিখিতেছি। যে খৃষ্টকে তিনি অত প্রদীপ্তভাবে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন এবং যাঁহাতে তিনি নিয়ত বাস করিতেন, সেই খৃষ্টে পূর্ণবিশ্বাস হইতেই তিনি পত্র লিখিয়াছেন। এরূপ পত্র অতি অল্প লোকেই লিখিয়াছেন। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আমি আমার এই সামান্য পত্র এক জন মহাজনের নামে বা তাঁহার প্রেরণায় লিখিতেছি না; কিন্তু জীবিত ও মৃত, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল মহাজনগণের নামে লিখিতেছি। আমি হিন্দু বা খ্রীষ্টান হইয়া লিখিতেছি না, ব্রাহ্ম হইয়া লিখিতেছি, এবং আমি অতি সুগম্ভীরভাবে স্বর্গস্থ সকল সাধুগণের পবিত্র ও মধুর সঙ্গে প্রবিষ্ট হইতে তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। তোমাদিগের নিকট স্বর্গের পরিবারের সুখকর ভ্রাতৃত্বনিবন্ধনের শান্তি ও গৌরবের প্রশংসা করিতেছি।

"ভক্তিভাজন আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র তপোনিলয় হিমালয়ে আমি আছি। এই পর্ব্বতের নিভৃত প্রদেশ সকল ভারতের প্রাচীন মহত্ত্বের স্মৃতি জাগ্রৎ করিয়া তুলে। কি সুগম্ভীর, কি পবিত্র সেই ভূমি, যেখানে বহু হিন্দু ঋষি ভগবদারাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

"হে হিমালয়, আমায় অনুপ্রাণিত কর, এবং তোমার সঙ্গে ভারতের ঈশ্বরের গৌরব কীর্ত্তন করিতে দাও। পার্ব্বত্য বায়ু এবং পার্ব্বত্য নিশ্বসিতে আমায় সবল কর, এবং পর্ব্বতাধিষ্ঠিত দেবতার সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে আমায় উপযুক্ত কর যে, আমি আমার জীবনের কার্য্যের উপযোগী উচ্চচিন্তা ও ভাবনিচয় লাভ করিতে পারি। হে শ্রদ্ধেয় হিমালয়, আমার পিতৃপুরুষগণ তোমার গৌরবকীর্ত্তনে আনন্দিত হইতেন, আমি তোমার নিকটে বিদায় গ্রহণ করি। আমার হৃদয়ে যেন আমি নিয়ত তোমায় প্রত্যক্ষ করি।"

প্রচারকগণের 'প্রেরিতত্ব' বিষয়ে প্রবন্ধ

এই সময়ে প্রচারকবর্গের নাম 'প্রেরিত' নামে পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের জীবনের কার্য্যের ব্যাখ্যান করিয়া যে প্রবন্ধ লিখেন, আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—"আমাদের সমাজ প্রচারকবর্গকে 'প্রেরিত'

নামে কেন ডাকিবেন না? আমরা ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হই। তাঁহারা কি এ নামের উপযুক্ত নন? এ নাম কি বৃথা গৌরবদ্যোতক শব্দাড়ম্বরমাত্র? এ নাম প্রয়োগ করিলে অভিমান প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে কি অসত্য প্রকাশ পায়? আমাদের প্রচারকগণের সম্বন্ধে এ নাম কি অর্থযুক্ত নহে? কোন মানুষ তাঁহাদিগকে নিয়োগ করে নাই। কোন দলবদ্ধ সমাজ বা মণ্ডলী তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কার্য্যে আহ্বান করে নাই, অথবা তাঁহাদিগকে উপাধি দেয় নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছায় আসিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করেন যে, তাঁহারা ভগবান্ কর্ত্তৃক আহূত। বেতন, পদ বা সম্মানের আশা না করিয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন; ঠিক বলিতে গেলে, ব্রাহ্মসমাজের সেবাকার্য্যে তাঁহারা আনীত হইয়াছিলেন। ঠিক শব্দে শব্দিত করিতে হইলে বলিতে হয়, তাঁহারা প্রকৃতির মনোনীত ব্যক্তি। কোন কারণ নাই যে, সেই ভাবে তাঁহাদের সহিত লোকে ব্যবহার করিবে না। আমরা তাঁহাদিগকে বেতন দি না, তাঁহাদের পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিক দি না। আমরা তাঁহাদিগকে অনিশ্চিত ভিক্ষা দি, যে কোন মুহূর্ত্তে উহা নাও দিতে পারি। এই সামান্য দান যদি আর না দেওয়া হয়, এই সকল ঈশ্বরের লোক ঝটিকাসঙ্কুল জীবনসমুদ্রে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইবেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কর্ত্তৃক তাঁহার সত্যপ্রচারের জন্য ইহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, জীবিকা ও পরিচালনা উভয়ের জন্যই তাঁহারা ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি স্থাপন করেন, নিম্নে নহে। তবে সুস্পষ্ট তাঁহারা সকলেই নববিধানের প্রেরিত। প্রেরিত বলিয়া তাঁহারা উপাসনা ও নীতি-সম্পর্কীয় জীবনের অতি উচ্চভাব রক্ষা করিতে বাধ্য, যে ভাবে তাঁহারা তাঁহাদের উপাধির উপযুক্ত হইতে পারেন। তাঁহাদের কার্য্য ও চরিত্র সম্পূর্ণরূপে প্রেরিতত্বের সমুচিত এবং প্রচারকজীবনের সাধারণ আদর্শ হইতে অনেক উচ্চ হওয়া সমুচিত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে হউক, বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক, তাঁহারা অতি সামান্য বেতনও গ্রহণ করিবেন না। পারিশ্রমিকের আকারে কোন নিয়মিত মুদ্রা অধিকার বলিয়া তাঁহারা দাওয়া করিবেন না, বা অভিলাষ করিবেন না। ঈদৃশ ইচ্ছাই দূষণীয় এবং হৃদয়কে মলিন করে। ঈদৃশ দাওয়া চিত্তোদ্বেগকর, এবং ঈশ্বর ও মনুষ্যের সহিত যে নিবন্ধনপত্র ছিল, সেই নিবন্ধনপত্রের অতি নিন্দনীয় ভঙ্গ দেখায়। আমাদের প্রচারকগণ সর্ব্বপ্রথমে মণ্ডলীকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে দিয়াছিলেন যে, বেতনের অপেক্ষা না

করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহারা প্রচারকার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বার্থশূন্য হইয়া কার্য্য করিবেন। তাঁহারা যে সুগম্ভীর অলজ্ঘ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা স্মরণ করুন। যদি দরিদ্রতার অবিচার, মন্দব্যবহার, বা অর্থাভাবের বিষয়ে তাঁহারা অভিযোগ করেন, তাঁহাদের ইহা মনে করা উচিত যে, তাঁহারা আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এ সকল তাহারই ফল, এবং এ জন্য তাঁহারা অপর কাহাকেও দোষ দিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, প্রেরিতভাবাপন্ন প্রচারকগণের অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করা সমুচিত, এবং আলস্য ও অল্প পরিশ্রম তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্যের স্খলন। এক সপ্তাহ গুরুতর পরিশ্রম করিলে এক মাস অলসভাবে কাটান যাইতে পারে, এই ভাবে যাদৃচ্ছিক কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত নহে। তাঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় স্থিরতর ভাবের হওয়া উচিত। বেতনভোগী ভৃত্যগণের ন্যায় ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে নিয়মপূর্ব্বক পূর্ণমাত্রায় তাঁহারা কার্য্য করিবেন। পূর্ণ পরিমাণ পরিশ্রম দ্বারা দেশের নিষ্পেষক অভাবগুলির তাঁহারা পরিপূরণ করিবেন। তাঁহাদের আলস্য অপরের বিনাশের হেতু। তাঁহাদের স্বার্থপরতায় দেশের মৃত্যু। তৃতীয়তঃ, তাঁহাদের দায়িত্বের কার্য্য গ্রহণ ও সম্পাদন করা সমুচিত। কতক দিনের জন্য কার্য্য করিয়া, তৎপর অপরে উহা করিতে পারে, এই ছলে তাহা পরিত্যাগ করা প্রেরিতপদের অনুপযুক্ত। স্বয়ং প্রভু তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, সে কার্য্য মূলতঃ তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য্য হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট। এ কার্য্যের জন্য তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ দায়ী জানিবেন। তিনি তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না, তিনি সুবিধা ভাবিয়া অন্যের স্কন্ধে তাহা চাপাইয়া দিতে পারেন না। ব্রাহ্ম-প্রেরিতগণের প্রতিজ্ঞাত পূর্ণ দায়িত্ব বুঝিয়া, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট-কার্য্য নিষ্পন্ন করুন; তাহা হইলে আমাদের মণ্ডলী এদেশে তাঁহার সর্ব্বতোমুখ ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিবেন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইবে। সর্ব্বোপরি আমাদের ভ্রাতৃগণের নৈতিক চরিত্র এবং দৈনিক উপাসনাবন্দনা এরূপ উচ্চভাবের হওয়া চাই যে, তাঁহাদের জীবন, সাধন, কর্ত্তব্যপালন, বিশ্বাস ও প্রেমবিষয়ে অপরের নিকটে দৃষ্টান্ত হইবে। এ বিষয়ে পুনরায় আরও লেখা হইবে।”

'কথোপকথন'

নৈনীতাল হইতে কেশবচন্দ্র 'কথোপকথন' শীর্ষক যে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার অনুবাদ আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা শ্রাবণের) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"আপনি কি সম্প্রতি হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন ?

"হাঁ।

"আপনি কি সে স্থানে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ?

"অত্যন্ত।

"আপনি কি সেখানে মহাদেবকে দেখিয়াছিলেন ?

"হাঁ। কেবল দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলাম।

"তিনি কি আপনাকে কোন কথা বলিয়াছিলেন ?

"হাঁ।

"সেখানে পুরাতন আর্য্য ঋষিদের মধ্যে কি কাহাকেও দেখিয়াছিলেন?

"হাঁ, তাঁহারা আত্মার বেশে সকলেই সেখানে জীবিত আছেন।

"আপনি কি তাঁহাদের সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন ?

"হাঁ। আমি তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের সঙ্গে ভাবযোগে বদ্ধ হইয়াছিলাম।

"আপনি কি তাঁহাদিগকে সশরীরে বর্ত্তমান দেখিয়াছিলেন ?

"না, আমি আধ্যাত্মিক চক্ষে তাঁহাদিগকে কেবল অশরীরী আত্মা এইরূপে দর্শন করিয়াছিলাম।

"বৃদ্ধ হিমালয় কি আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন ?

"নিশ্চয়। শুভ্রকেশ এবং সম্ভ্রান্ত হিমালয় আমার গুরু হইয়াছিলেন, এবং আমাকে মহান্ মহাদেবকে দেখিতে সহায়তা করিয়াছিলেন।

"বৃদ্ধ হিমালয় কি শত শত বৎসর কেবল নিদ্রা যান নাই ?

"এমনই বোধ হয় বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি জাগ্রৎ। স্বর্গ হইতে না কি তাঁহার প্রতি আদেশ হইয়াছে এবং তাহা না কি তাঁহাকে পালন করিতে হইবে।

"কি আদেশ?

"শুনিলাম, ভারতের পুরাতন গিরিদেবকে পুনঃপ্রকাশ এবং গৌরবান্বিত করিবার নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"পুরাতন বৈদিক রীতি অনুসারে কি উহা প্রতিপালিত হইবে?

"সম্পূর্ণরূপে নহে। অধুনাতন সভ্যতা এবং পুরাকালের বৈরাগ্য দুইই নির্ব্বিবাদে মিশ্রিত হইবে।

"কে আপনাকে এ সমস্ত সংবাদ দিলেন?

"হিমালয় এবং তাহার চারিদিক্‌স্থ সমস্ত বস্তু। হিমালয়ের প্রতি এই গৌরবের আদেশ এবং শুভদিনের আগমনবার্ত্তা যেন সেখানকার প্রত্যেক পদার্থই কহিতে লাগিল।

"আপনার কথার তাৎপর্য্য কি? কোন নদী প্রবাহিত হইবে না কি?

"হাঁ, হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে নূতন যোগ এবং নূতন প্রত্যাদেশের নদী নিম্ন ভূমিতে আসিয়া প্রবাহিত হইবে এবং অবিশ্বাস, সংসারাসক্তি, পাপ এবং দুঃখ সমস্ত ধৌত করিয়া চলিয়া যাইবে।

"হে ভ্রাতঃ, এই সুসংবাদের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ করি।

"কেবল ধন্যবাদে মিটিতেছে না। তুমি সকলের মন প্রস্তুত কর। এই সমাচার দূর দূরান্তরে প্রচার কর এবং আমাদের সকলের জন্য এই পার্ব্বতীয় প্রত্যাদেশ আসিতেছে, সে কথা প্রতিজনকে বল। ভারতের সমস্ত নরনারী পর্ব্বত হইতে সমাগত এই নূতন প্রত্যাদেশগ্রহণানন্তর গৃহস্থ যোগী হইবার নিমিত্ত আহূত হইবেন। ইহা কি সুসংবাদ নহে?

"অতি হর্ষজনক। আমি আশা করি, সুশিক্ষিত ভারতবাসিগণ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

"এদেশে যত ধর্ম্মার্থী লোক আছেন, প্রকৃত যোগবারি পান করাইবার জন্য বৃদ্ধ হিমালয় তাঁহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

"প্রকাণ্ড ব্যাপার! যথার্থই প্রকাণ্ড ব্যাপার যে, জীবনপ্রদ বারিগ্রহণার্থ পিতা হিমালয়ের নিকটে সমস্ত নরনারী যাত্রিরূপে গমন করিবে। এই চিন্তা কি প্রফুল্লকর এবং স্ফূর্ত্তিজনক! এক্ষণে বিদায়। আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানগণকে এই আনন্দের সংবাদ প্রদান করিব।"

৭

ব্রহ্মবিদ্যালয়

আলবার্ট হলে বক্তৃতা

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য যথোপযুক্তরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এজন্য মাঘোৎসবে বিশেষ প্রস্তাব হয়, তদনুসারে ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খৃঃ (৩রা ফাল্গুন, ১৮০১ শক), শনিবার, আলবার্ট হলে কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার প্রথমাংশে তিনি বলেন, "বিগত বর্ষাপেক্ষা অনুকূলাবস্থায় এ বর্ষের আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজের আকাশে যে ঘন মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল, সে মেঘ প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। পরীক্ষা চলিয়া গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে যেরূপ, সেইরূপ ধর্ম্মের ইতিহাসেও বিপদ ও পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ সময় দীর্ঘকাল থাকে না। এই ব্রাহ্মসমাজ আর একটী পরীক্ষা অতিক্রম করিল, এবং ঈশ্বরের কৃপায় ও তাঁহার বিধাতৃত্বে জয়ী হইয়া, পরীক্ষা হইতে বিনিঃসৃত হইল। এখন আমরা নববিধানের জয়পতাকার নিম্নে থাকিয়া বলিতেছি, ঈশ্বরের মণ্ডলী নূতন যুগ ও নূতন জীবনে প্রবেশ করিল। সময় ছিল, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মূলতত্ত্বগুলি স্থির হয় নাই, যে সময়ে এক শত জনের মধ্যে নিরানব্বই জন ব্রাহ্ম ঐ সকল মূলতত্ত্বসম্বন্ধে 'হইতে পারে' এইরূপ ক্রিয়া যোগ করিয়া কথা কহিতেন। আমাদের মণ্ডলীর সেটি শৈশবাবস্থা। কিন্তু এখন উহা পক্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন ইহার মূলতত্ত্ব ও মূল মতগুলি স্থির, দৃঢ় ও নিশ্চিত হইয়াছে। আমাদের মণ্ডলী এখন জীবন্ত ও সারতর সত্য। নববিধান-স্থাপনের সঙ্গে এবৎসরের আরম্ভ হইল। এই বিধান ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সকল বিভক্তভাব অন্তরিত করিয়া দিল। এখন আর আমাদের সম্মুখে বহু বিশ্বাস, বহু মত, বহু ধর্ম্ম নাই ; কিন্তু কেবল একটি ভাব, যে ভাব নববিধান। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই বিধানের আরম্ভ নহে। নববিধানের মূলে আমরা যে তত্ত্ব এখন দেখিতে পাই, ইহা সকল ধর্ম্মের আগে ছিল। পৃথিবীতে অন্যান্য যে সকল ধর্ম্ম

প্রচলিত আছে, তাহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের তুলনা করা একটা রীতি পড়িয়া গিয়াছে। আমরা এ রীতির প্রতিবাদ করি। আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর যেমন এক, তেমনি তাঁহার ধর্ম্মও, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী এবং ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিয়া সংসারে সমাগত হইলেও, এক। আমাদিগের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবজাতির অতি প্রাচীন আদিম ধর্ম্ম। খ্রীষ্ট এবং কনফিউসস্, মুষা এবং নানক, মোহম্মদ এবং চৈতন্য এবং পৃথিবীর সকল মহাজন ও শাস্ত্রমধ্যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মূলতত্ত্বের উপরে স্থাপিত, উহা মনোনয়নবাদ। এইটিই তোমাদের প্রথম শিক্ষণীয়। আমাদের ধর্ম্ম যে পরিমাণে মনোনায়নিক, উদার এবং সার্ব্বভৌমিক নয়, সেই পরিমাণে উহা তোমাদের ঘৃণার্হ। যে কোন স্থান হইতে আসুক, সত্য সংগ্রহ কর এবং তোমাদের মণ্ডলীতে উহাদিগকে সঞ্চিত কর। মনোনায়নিক হইবার অগ্রে সৎ, অপ্রবণ ও উদারভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, এবং অন্যান্য ধর্ম্ম, যাহার যে সত্য আছে, সেই সত্য তাহারা তোমাদিগকে অর্পণ করিবে এবং তোমরা তাহাদিগের সত্য তোমাদের মণ্ডলীতে সংগ্রহ করিবে। হিন্দুধর্ম্মের নিকটে তোমরা বিদায় লইতে পার না এবং নির্ব্বোধের মত বলিতে পার না যে, উহাতে দিদিমার গল্প বিনা আর কিছুই নাই। না, আমাদের ধর্ম্ম জাতীয় হইবে। যে বংশ হইতে বেদ ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত উদ্ভূত হইয়াছে, আমরা সেই হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহা আমাদের অভিমানের বিষয় হউক। হিন্দুশাস্ত্রমধ্যে যে সকল অমূল্য সম্পৎ নিহিত আছে, সেগুলি আমরা হারাইতে পারি না। আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মকেও ঘৃণা করিতে পারি না। খ্রীষ্টধর্ম্ম একেবারে পৃথিবীর সকল দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা সে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারের প্রতি কি প্রকারে অন্ধ হইতে পারি? খ্রীষ্টের জীবন—কে উহার গভীরতার পরিমাণ করিতে পারে? পর্ব্বতোপরি হইতে প্রদত্ত উপদেশের অপেক্ষা সুগম্ভীর আর কি আছে? খ্রীষ্টধর্ম্মের নীতিসমূহকে কে হৃদয়ে আনন্দের সহিত গ্রহণ ও ধারণ করিবে না? হিন্দুধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম একটুও বিরোধী নহে, উহাদের উভয়ের সত্য একই। যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে ভিন্ন হয়, বেদের সম্বন্ধেও পুরাণ সেইরূপ, ইহা কি বলা যাইতে পারে না? তা বলিয়া কি আমরা উহার একটিকে ছাড়িয়া আর একটি গ্রহণ করিতে পারি? আমরা পারি না। অতএব খ্রীষ্টধর্ম্ম

ও হিন্দুধর্ম্ম এ দুয়ের মধ্যে কোনটিকে মনোনীত করিতে পারি না, এ উভয়-কেই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা হিন্দু, আমরা সেই দিগ্‌দিগন্তর-গত আর্য্যবংশসম্ভূত, যে বংশ হইতে অন্যান্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দু এবং ইউরোপীয়গণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা একই সমগ্র জাতির অংশমাত্র। তবে এ ভিন্নতা কেন? সত্যধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও মানবের প্রতি প্রীতি উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত। এই বিস্তৃত ভূমিতে আমরা সকলে মিলিত হইয়া লাভবান্ হইতে পারি। আমরা সেই ভূমি হইতে সকল ধর্ম্মের উত্তরাধিকারিত্ববশতঃ তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং তাহাদের কোন-টিকে ঘৃণা করিব না। আমাদের হৃদয়ে সকল দেশের সকল ধর্ম্মের মহাজন, সাধু ও ঋষিগণকে সম্মান করিতে আমরা শিখিব। কোন ভেদ বা বিরুদ্ধ সংস্কার না রাখিয়া, সকলের চরণতলে বিনীতহৃদয়ে সত্য শিক্ষা ও অর্জ্জন করিব। স্বর্গে আমরা সকল সজ্জনকে মিলিত দেখিতে পাই! স্বর্গে কোন ভেদ নাই। সেখানে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিরাজ করে। অতএব আমরা অন্তর্ভাবক হইব, বহির্নিঃসারক হইব না। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ঠিক দার্শনিক ভাবে নিষ্পন্ন হইবে। তোমরা পরের মুখের কথার উপর নির্ভর করিবে না, কোন বিষয় বিশ্বাসের উপরে গ্রহণ করিবে না, তোমাদের মধ্যে পোপের আধিপত্য বা পৌরোহিত্য সহ্য করিবে না। 'তাবৎ বিষয় বিচার কর, যাহা সত্য, তাহাই দৃঢ়রূপে ধারণ কর,'—এই আমাদের মূলমত। দর্শনশাস্ত্ররূপ শিলোচ্চয়োপরি আমাদের মণ্ডলী স্থাপিত। কোন প্রকার মিথ্যা গর্ব্বিত বিতর্ক উহার পত্তনভূমিকে কম্পিত করিতে পারিবে না। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক। সকল বিষয়ের উপরে আমরা বিজ্ঞানের সম্ভ্রম করি; ইহাকে মূল্যবান্ মনে করি। যেমন বাহ্য জগতে, তেমনি অধ্যাত্ম জগতে বিজ্ঞান সর্ব্বপ্রধান। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান বা অন্যান্য বিজ্ঞান যেমন, তেমনি ধর্ম্মেও বিজ্ঞান আছে। যাহা কিছু বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, সত্যের শত্রু বলিয়া তাহা পরিহার্য্য। দর্শন ও বিশ্বাস এক, এক বই হইতে পারে না। ঈশ্বরের সত্য শাস্ত্রে যেমন, দর্শনেও তেমনি। ঈশ্বরের সত্য-সমূহের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। ঈশ্বর কখন আপনার বিরুদ্ধে আপনি সংগ্রাম করিতে পারেন না।" অন্তে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার

সংক্ষিপ্ত ভাব এইরূপ সংগ্রহ করা যাহতে পারে :—কেবল দার্শনিক হইলে চলিবে না, অভ্যাস চাই। জন বলিয়াছিলেন, 'অনুতাপ কর, কেন না স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী।' এ কথার মধ্যে অভ্যাস ও দর্শন উভয়ই আছে। এই কথা এখনও ধ্বনিত করিতে হইবে, কেন না সকল মহাজনগণের রাজা স্বয়ং ঈশ্বর আসিতেছেন। ঈশ্বরপ্রত্যক্ষীকরণ, প্রত্যাদেশ ও দর্শনশ্রবণের যুগ আবার আসিয়াছে। এখন যুবকগণকে সকল প্রকারের অভিমান লঘুতা দূরে পরিহার করিয়া, অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। চিন্তা ও অধ্যয়নে প্রবৃত্ত না হইলে, তাহাদিগের নিকটে আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাইবেন। চিন্তাশীলতায় আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। 'আপনাকে জান' মহামতি সক্রেটীসের এইটি মূল মন্ত্র এবং ইহাই তাঁহার চরিত্রের মূল। আমরা যে কিছুই জানি না, এই মূলমন্ত্র তাহাই দেখাইয়া দেয়। সক্রেটিস যেমন ইহারই জন্য নিরভিমান হইয়াছিলেন, নিউটনও সেইরূপ নিরভিমানিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জ্ঞান-ও-দর্শন-জগতে সক্রেটিস যেমন বলিলেন, 'আপনাকে জান', তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে জন বলিলেন, 'অনুতাপ কর, কেননা স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী।' বিনয়েতে—যথার্থ বিনয়েতে জ্ঞানলাভ হয়, উহাই সত্য ও স্বর্গ অধিকার করিবার পন্থা।

যুবকগণকে শিক্ষাদান এবং শিক্ষান্তে উত্তর দেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বুধবারে কেশবচন্দ্রের গৃহে একত্র হইয়া, ধর্ম্মালোচনা নিয়মিতরূপে করিতে থাকেন। এই যুবকগণকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষান্তে ঈশ্বরের স্বরূপ, বিবেক, প্রার্থনা, ভবিষ্যদ্দর্শী মহাজন, আত্মার অমরত্ব ও যোগ এই সকল বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি (১৮০২ শকের ১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হয় :—

ঈশ্বরের স্বরূপ

১। ঈশ্বরের অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন কর।
২। ঈশ্বর জ্ঞাতব্য, কি জ্ঞানাতীত?
৩। তাঁহার স্বরূপ কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যায়?
৪। সঙ্কীর্ণ জীব কিরূপে অসীমকে জানিতে পারে?

৫। ঈশ্বরের কি কি স্বরূপ নির্ণয় করা যায় ?

৬। তাঁহাকে কি এক জন ব্যক্তিরূপে নির্দ্ধারণ করা যায় ?

৭। তাঁহাকে মাতৃসম্ভাষণ কর কেন ?

৮। (ক) তিনি কি আমাদের কার্য্যসমূহের কারণ ?

(খ) অসত্যের স্রষ্টা কে ?

৯। তাঁহার প্রেম ও ন্যায়ের সামঞ্জস্য কর।

বিবেক

১। বিবেক কি পদার্থ ?

২। ইহা কি বিশ্বজনীন ?

৩। ইহা কি মনুষ্যের, না, ঈশ্বরের বাণী ?

৪। যদি ঈশ্বরের বাণী, তবে মনুষ্য ইহার সঙ্গে ভিন্নমত হয় কেন ?

৫। বিবেকের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য কি ?

৬। ইহা কি সাধারণ ভাবে উপদেশ দেয়, না, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়েরও নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ?

৭। বিবেক কি বৃদ্ধিশীল ?

৮। সকল মনুষ্যের কি সমান দায়িত্ব আছে ?

৯। ঈশ্বর কি আমাদিগকে প্রতিদিন বিচার করেন, না, কোন নির্দ্দিষ্ট বিচারের দিনে এক কালে সমুদায় মানবজাতির পাপ পুণ্য বিচার করিবেন ?

১০। চরিত্রে কি বিবেকের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে ?

১১। শিশুগণের জীবনের দায়িত্ব নাই কেন ?

১২। পাপ কাহাকে বলে এবং তাহার মূল কোথায় ?

১৩। আত্মার অমরত্ববিষয়ে কি বিবেক কিছু প্রমাণ দিতে পারে ?

প্রার্থনা

১। প্রার্থনার আভিধানিক অর্থ কি ?

২। বিস্তীর্ণ ভাবেই বা ইহার কি অর্থ বুঝায় ?

৩। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর যখন আমাদের হৃদয় জানেন, তখন তাঁহার নিকট অভাব জানান কি অন্যায় নহে ?

৪। যখন তিনি ধ্রুব অটল, তখন তাঁহার নিয়মপরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করা কি অন্যায় নহে ?

৫। শারীরিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা কত দূর ন্যায়ানুগত ?

৬। ঈশ্বর কি প্রত্যেকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন ?

৭। প্রাত্যহিক উপাসনার আবশ্যকতা কি ?

৮। সমবেত উপাসনার প্রয়োজন কি ?

৯। অন্যের জন্য প্রার্থনা কি সঙ্গত ?

১০। ঈশ্বর কিরূপে এবং কি অবস্থায় আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন ?

ভবিষ্যদ্দর্শী মহাজনগণ

১। সংসারে কাহারা মহাজন বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করেন ? মহত্ত্বের লক্ষণ কি ?

২। আমরা কি মহত্ত্ব উপার্জ্জন করিতে পারি না ?

৩। যদি কতকগুলি লোক জন্ম-মহৎ হন এবং আর কেহ না হয়, তাহা হইলে আমরা কিরূপে ঈশ্বরের ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতা সমর্থন করিব ?

৪। অসাধারণ লোকেরা কি নিয়মের অধীন নহেন, তাঁহাদিগকে কি আমরা বিশ্বের বিধিবিহীন রাজ্যের লোক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিব ?

৫। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে ধূমকেতুর সঙ্গে তুলনা করেন ; সে উপমা কি ঠিক ?

৬। সাধারণ লোকদিগের সঙ্গে মহাজনদিগের কি কেবল পরিমাণের তারতম্য, না, তাঁহারা ভিন্নজাতীয় লোক ?

৭। তবে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিতে দেবভাব আরোপিত হইয়াছে কেন ?

৮। 'আমি এবং আমার পিতা এক' ঈশা কি অর্থে এ কথা বলিয়াছিলেন ?

৯। মহাজনেরা কি অভ্রান্ত ?

১০। তাঁহারা কি নিষ্পাপ ও পূর্ণস্বভাব ?

১১। আমরা তাঁহাদের সম্মান করিব কেন ?

আত্মার অমরত্ব

১। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে, পরলোকে বিশ্বাস করিতে হয় কেন ?
২। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব, এই উভয় মত কিরূপে এক মত হইতে সমুদ্ভূত ?
৩। কিরূপে শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ ভাবে অনুভব করা যাইতে পারে?
৫। স্বর্গ ও নরক কাহাকে বলে ?
৫। মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মা পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যানুযায়ী ফলভোগ করে, এ কি সত্য ?
৬। আত্মার সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ কি প্রকার ?
৭। স্বর্গে কি আত্মা সকল পুনরায় একত্র হইবে ?
৮। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া কি পরলোকগত মহাত্মাদের সঙ্গে যোগ-সাধন করিতে পারি ?

যোগ

১। যোগের অর্থ কি ?
২। যোগ ও উপাসনার ভিন্নতা কি ?
৩। যোগ কয় প্রকার ?
৪। মনুষ্য কি ঈশ্বরদর্শন করিতে পারে ? যদি পারে, কিরূপে ?
৫। মনুষ্য কি ঈশ্বরবাণী শুনিতে পারে ? যদি পারে. কিরূপে ?
৬। মনুষ্য কি ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে ? যদি পারে, কিরূপে ?
৭। নির্ব্বাণ কাহাকে বলে ?
৮। ঈশ্বরে লীন হওয়া কি যোগের পরিণাম ?
৯। আত্মা যখন তাঁহাতে বিলীন হয়, তখন তাহার কিরূপ অবস্থা হয় ?
১০। অদ্বৈত-ও-দ্বৈতবাদানুযায়ী যোগের ভিন্নতা কি ?
১১। যোগী হইবার জন্য কি সংসারত্যাগ প্রয়োজন নহে ?
১২। যোগ শারীরিক, না, আধ্যাত্মিক সাধনের বিষয় ?

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষাদান হইত, ছাত্রগণ ধর্ম্মবিষয়ে কত দূর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শনজন্য কেশবচন্দ্রপ্রদত্ত এই প্রশ্নগুলি যথাযথ আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। এ সকল প্রশ্নব্যতীত অপর শ্রেণীসমূহে যে

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়, তাহা পাঠ করিয়া শিক্ষার কত দূর পূর্ণতা-সাধনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল, তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিষয়—চরিত্রের শুদ্ধতা, সামাজিক কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, নববিধান, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

চরিত্রের শুদ্ধতা (ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা পৌষ, ১৮০২ শক)

১। পবিত্রতা কাহাকে বলে ?

২। পাপের কি বাস্তবিক সত্তা আছে ? না, ইহা কেবল বাস্তবিকতার অভাবমাত্র ?

৩। আত্মার শত্রু ষড়রিপু যে স্বভাবতঃ অমঙ্গলজনক নহে, তাহা বুঝাইয়া দাও।

৪। চরিত্রকে নিয়মিত করিবার পক্ষে যত্ন কিরূপ কার্য্য করিয়া থাকে ?

৫। ভাবযোগের নিয়ম কি কি বল, এবং তাহা বুঝাইয়া দাও ; এবং উহাই যে কু-অভ্যাসের প্রধান উপাদান, তাহা দেখাইয়া দাও।

৬। তোমার নিকট প্রলোভনের বিষয় প্রথম উপস্থিত হইলে, তুমি কি করিবে ?

৭। চিরাভ্যস্ত মদ্যপায়ীকে উদ্ধার করিবার জন্য, কি উপায় অবলম্বন করিবে ?

৮। ভাবের উচ্ছ্বাস কি আপনা হইতে উদিত হয় না ? যদি হয়, কিরূপে তাহাকে আয়ত্তাধীন করা যায় ?

৯। কেহ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া কোন স্ত্রীলোকের প্রতি চাহিলে, তাহার মানসিক ব্যভিচারের অপরাধ হয়। কাহারও প্রাণবধ করিবার ইচ্ছা করিলে, বধের ফলভাগী হয় এবং মিথ্যা কহিবার সঙ্কল্পমাত্রেই মিথ্যা-কথনরূপে উহা গৃহীত হয়। এ যুক্তির মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া দাও।

১০। দূষিতেচ্ছা কি দুষ্কর্ম্মের সঙ্গে সমান অপরাধ ও সমান দণ্ডার্হ ?

১১। মনুষ্য কি কেবল কার্য্যের জন্য, না, অপরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া দৃষ্টান্তের জন্যও দায়ী ?

১২। ধর্ম্মবিহীন হইয়া নীতিপরায়ণ হওয়া কি সম্ভব ?

১৩। কোন কুরিপুকে জয় করিতে হইলে, তাহার বিপরীত সদ্ভাব অবলম্বন করিতে হয়। এ যুক্তির মর্ম্ম উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

সামাজিক কর্ত্তব্য

১। কর্ত্তব্যশব্দের অর্থ কি ?

২। মানুষের সামাজিক কর্ত্তব্য কি কি, তাহাদের শ্রেণীনিবন্ধন কি, বল।

৩। 'অপরের প্রতি তেমনি কর, যেমন তোমরা ইচ্ছা কর, তাহারা তোমাদের প্রতি করে' এইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাও।

৪। ন্যায় ও উপচিকীর্ষা এ দুয়ের প্রভেদ কর, এবং তাহাদের প্রভেদক লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা কর।

৫। অপরের প্রতি ন্যায় ও উপচিকীর্ষা কত আকারে প্রকাশ পায়?

৬। 'উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ হইও না' এই নৈতিক মূলতত্ত্বের সমর্থনজন্য সেক্সপিয়র কি হেতু প্রদর্শন করেন ?

৭। পথে যে সকল ভিক্ষুক থাকে, তাহাদিগকে দান করা উচিত, না, অনুচিত ?

৮। পরাপবাদ নীতিতে অন্যায় কেন ?

৯। ব্যবহারসমূহেতে কি নীতি আছে ?

১০। পুরুষ ও নারীকে কত দূর সমাজে মেশামেশি করিতে দেওয়া যাইতে পারে?

১১। এ দেশের কোন্ সকল আচার ব্যবহার আছে, যাহার অনুমোদন না করিতে আমরা নীতিতে বাধ্য ?

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত

১। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ কখন কেন স্থাপন করিলেন?

২। ট্রষ্টডীডের কথায় ব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রায় বর্ণনা কর।

৩। তত্ত্ববোধিনী সভা কি? ব্রাহ্মসমাজের সহিত উহার কি সম্বন্ধ ছিল? ব্রাহ্মসমাজের গঠন-ও-স্থায়িত্ব-বিষয়ে উহা কিরূপে সাহায্য করিয়াছিল?

৪। এই সভা দীক্ষার কোন্ প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিল?

৫। বেদান্ত হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখাইয়া দাও।

৬। রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এ দুইয়ের তুলনা কর।

৭। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেন বিচ্ছিন্ন হইল, তাহার কারণগুলি

দেখাও। দেখাও যে, কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই, কেবল মণ্ডলীর মূলভূমি প্রাশস্ত্য লাভ করিয়াছে।

৮। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কি কি সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছে?

৯। এই ঘটনাগুলির তারিখ দাও:—(১) রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডে উপস্থিতি; (২) প্রথমসংখ্যক তত্ত্ববোধিনী প্রকাশ; (৩) বিচ্ছিন্ন হওয়া; (৪) বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হওয়া; (৫) নববিধানঘোষণা; (৬) প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ; (৭) প্রথম ব্রাহ্ম সঙ্করবিবাহ; (৮) ব্রহ্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠা; (৯) ব্রাহ্মিকাসমাজ এবং ভারতাশ্রম-প্রতিষ্ঠা।

১০। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যের উৎপত্তি ও বিস্তার সংক্ষেপে বর্ণন কর।

১১। ব্রাহ্ম প্রচারক এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের অভাব কিরূপে পূরণ হয়?

নববিধান

১। ব্রাহ্মসমাজকে নববিধান কি নূতন আকার দিয়াছে?

২। বিধান কি, নির্দ্দেশ কর।

৩। 'নূতন' এই নাম দিয়া এ বিধানকে প্রাচীন বিধান সকল হইতে কেন ভিন্ন করা হইল? ওল্ডটেষ্টমেণ্ট, নিউটেষ্টমেণ্ট এ দুইয়ের সঙ্গে কোন তুল্যযোগিতা আছে কি?

৪। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মুসলমান ধর্ম্মের যে সকল প্রধান ভাব নববিধানেতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেইগুলির নাম কর।

৫। ভবিষ্যতে আরও বিধান আসিবে, ইহা কি বিশ্বাস কর? তোমরা কি মনে কর, বর্ত্তমান বিধানাপেক্ষা সে গুলি শ্রেষ্ঠ হইবে?

৬। বিধানভারতে নববিধান জন্মের যে রূপক আছে, তাহার ব্যাখ্যা কর।

৭। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মকে নূতন ধর্ম্ম বলা হয়, এবং ইহাকে বিধান না বলা হয়, তাহা হইলে কি কোন প্রভেদ হয়?

৮। নববিধান কি কোন এক জন অভ্রান্ত নেতা স্বীকার করে?

৯। অবতারবাদের দার্শনিক মূল ব্যাখ্যা কর।

১০। সাধুসমাগমের অর্থ কি?

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

১। বিজ্ঞানশব্দে কি বুঝায়? অবৈজ্ঞানিকতার বিরোধে যখন বৈজ্ঞানিক এই শব্দের প্রয়োগ হয়, তখন কি বুঝায়?

২। কোন্ কোন্ হেতুতে ধর্ম্মবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানমধ্যে গণ্য করা হয়?

৩। ইহা কি সত্য যে, ধর্ম্ম প্রমাণের বিষয় নহে? দেখাও যে, গণিতের প্রমাণও যেমন প্রামাণিক, নৈতিক প্রমাণও তেমনি।

৪। তুমি কি ক্রমবিকাশে বিশ্বাস কর? কোন্ অর্থে উহাকে তুমি সত্য মনে কর?

৫। জড় হইতে মনের উৎপত্তি; 'মনুষ্য বানরের সন্তানসন্ততি;' এ দুই মত খণ্ডন কর।

৬। ফলবাদের বিরোধে তোমার কি যুক্তি? 'অধিকসংখ্যকের অধিকতম কল্যাণ' স্থির করা কি সম্ভব?

৭। ভারতবর্ষে যে সকল ব্যক্তি সংশয়ী হয়, তাহাদের সংশয়ের মূল কি?

৮। বিশ্বাস কি? উহা কি জ্ঞানের বিরোধী?

৮

আর্য্যনারীসমাজ

মাতৃভাব

প্রচারযাত্রার পর, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক (১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ), শনিবার, আর্য্যনারীসমাজে কেশবচন্দ্র মাতৃভাবব্যাখ্যা করেন; এই কথা-গুলিতে উপদেশের (১লা মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) আরম্ভ হয় :—"সম্প্রতি যে প্রচারযাত্রারূপ বৃহৎ ঘটনা হইল, তাহার গূঢ় অর্থ তোমাদিগের জানা উচিত। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বজ্রধ্বনি অপেক্ষা দৃঢ়রূপে তাঁহার সত্য সকল ঘোষণা করিতেছেন। তিনি নরনারীদিগকে পাপ অসত্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন্তভাবে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার কীর্ত্তি শুনিয়া, তোমা-দিগের পুলকিত ও উৎসাহিত হওয়া উচিত। যে শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে, সেই শ্রীমদ্ভাগবত এখনও লেখা হইতেছে। উল্লিখিত ঘটনায় সেই গ্রন্থের এক পরিচ্ছদ লেখা হইল। যাঁহারা এই প্রচারযাত্রিদলে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরকে জননী বলিয়া সম্বোধন করেন। ঈশ্বরকে জননী বলিয়া স্বীকার করা, আমাদিগের মধ্যে নূতন ব্যাপার নহে। 'জননী সমান করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।' আমাদিগের অতি প্রাচীন সঙ্গীতে এই কথা আছে। কিন্তু এখন যে ভাবে আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, সেই ভাব সম্পূর্ণ নূতন। আমাদিগের বিশেষ বিশেষ অভাবানুসারে ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ হইতে সময়ে সময়ে এক একটি নূতন ভাব প্রেরণ করেন। এক এক সময় তাঁহার এক একটি নাম বিশেষ ভাবের সহিত আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর দেখিলেন, এখন ব্রাহ্মদিগের যেরূপ অবস্থা, ইহাতে তাহারা কেবল তাঁহাকে দয়াময় গুণনিধি বলিলে, তাহাদিগের পরিত্রাণ হইবে না; এজন্য তিনি আমাদিগের নিকট তাঁহার মিষ্টতর 'মা' নাম প্রেরণ করিলেন।······শিশু সন্তানের কাছে মা যেমন, আমাদিগের সম্পর্কে তিনি সেইরূপ। এই সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য, ঈশ্বর আমাদিগকে মিষ্টবচনে

ডাকিতেছেন। মার স্বভাব অতি কোমল, মার ভাব অতি মধুর। মা কখনও সন্তানকে কোলছাড়া হইতে দেন না, মা নামের সঙ্গে অনেকগুলি মধুর ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে মাতৃক্রোড় ও মাতৃস্তন এই দুইটি প্রধান ভাব।” উপদেশের শেষ পর্য্যন্ত এই দুইটি ভাব বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বারা সকলের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। ব্যাখ্যার কিঞ্চিদংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—
“যথার্থ ভক্ত সর্ব্বদাই ঈশ্বরের স্তনে আপনার মুখ সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সেই স্তনের দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই পান করেন না। তিনি উপাসনা করিবার ছলে, কেবল সেই স্বর্গের জননীর দুগ্ধপান করেন। বাহিরের লোকে বলে, ভক্ত ধ্যান করিতেছেন; কিন্তু ভক্ত কেবল দুগ্ধপান করিতেছেন। দুগ্ধ ভিন্ন ভক্তের প্রাণ বাঁচে না। মার দুগ্ধ ভক্তের আত্মার মধ্যে না আসিলে, ভক্তের জীবন থাকে না। মার দুগ্ধে ভক্তের বল হয়, পুষ্টি হয়, কান্তি হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা পা দিয়া দূরে ফেলে, শিশু মার দুগ্ধ খায়। এমন যে মা, এবার বিশেষরূপে জগতে তাঁহারই নাম প্রচার হইতেছে; সেই মার রাজ্য বিস্তার হইতেছে। তোমরা এই মাতৃরাজ্যের আশ্রয়গ্রহণ কর। কিন্তু ঈশ্বরকে কেবল মুখে মা মা বলে ডাকিলে হইবে না, তাঁহার ক্রোড়ে বসিতে হইবে এবং তাঁহার স্তনের দুগ্ধ পান করিতে হইবে।

“শিশুর আশ্রয় এবং আহার এই দুইই আবশ্যক। এই জন্য দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার এমন একটি নাম প্রেরণ করিলেন, যাহার ভিতর বাড়ী এবং দুগ্ধ উভয়ই আছে। মা বলিলেই এই দুইটি ভাব মনে হয়। জননীকে লাভ করিলেই, বাড়ী আর দুগ্ধ পাইব, এই আশায় কত আহ্লাদ হয়। মার দুগ্ধ পান করিলেই মন খুব সুস্থ, সবল এবং পবিত্র হয়। কেবল মিছামিছি উপাসনার ভাণ করিয়া, চাকরচাকরাণীকে ফাঁকি দিলে মনে ধর্ম্মবল হয় না। মার কোলে বসিয়া, মার দুগ্ধপান করিতে না পারিলে, উপাসনা কেবল কপটতা। প্রত্যেক আর্য্যনারী এই বিশ্বাস করিবে, যত ক্ষণ মাকে না দেখিবে, তত ক্ষণ উপাসনা হইল না, তত ক্ষণ জীবন বৃথা। বেশ বুঝ্‌তে হবে যে, নিরাকারা জননী তোমার কাছে আছেন। ঈশ্বরের যে প্রকাণ্ড একটি স্তন কিংবা ক্রোড় আছে, তাহা নহে। তাঁহার শরীর নাই, তিনি চিৎস্বরূপ। মনে বিশ্বাস এবং ভক্তি হইলে, তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিবে। যেমন মার স্তন হইতে চুলের মত সরু

সরু ছিদ্র দিয়া শিশুর মুখে আসিয়া দুগ্ধ পড়ে, সেইরূপ উপাসনার সময় স্বর্গের জননীর প্রাণ হইতে স্নেহরস আসিয়া, খুব ঠাণ্ডা জিনিষ শান্তি আসিয়া, ভক্তের প্রাণকে ঠাণ্ডা করে। উপাসনার সময় সেই সরস জিনিষটি আদায় করিতে হইবে!……ঈশ্বরের স্নেহই তাঁহার স্তন, যতই সেই স্তনে মুখ দেওয়া যায়, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেম ভাবা যায়, ততই ভক্তির বেগবৃদ্ধি হয়। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা মা হইয়াছেন, তাঁহাদের শিশু সন্তানেরাই তাঁহাদিগের পক্ষে মাতৃভাব শিক্ষা করিবার উপায়। শিশুরা যেমন নিরাশ্রয় হইয়া কেবল মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লয় এবং মাতার স্তন্য পান করে, তোমরাও সেইরূপ ঈশ্বরকে জননী বলিয়া স্বীকার কর।"

বয়ঃপ্রাপ্তি

১৩ই পৌষ, ১৮০১ শকে (শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ) বয়ঃপ্রাপ্তি-বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশের সার এই;—"আমাদের দেশে রাজবিধি অর্থাৎ আইনের মধ্যে এই বিধি সন্নিবিষ্ট আছে যে, প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী এক নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালক বালিকা বলিয়া পরিগণিত হয়, অর্থাৎ বিষয়াধিকারে বঞ্চিত থাকে। কতকগুলি অধিকার আছে, যাহা নির্দ্ধারিত বয়স উত্তীর্ণ না হইলে তাহারা প্রাপ্ত হয় না। সেই বয়সে উপনীত হইবামাত্র, তাহাদের বিষয়াধিকার তাহাদিগকে প্রদত্ত হয়। সেইরূপ এত কাল হিন্দু-নারীসমাজ বালিকা অবস্থায় ছিল। আমাদের রাজনিয়মমধ্যে যেমন বয়ঃ-প্রাপ্তিসম্বন্ধে ব্যক্তিগত আইন আছে, সেইরূপ এত দিন হিন্দুনারীসমাজ সমাজগত কতকগুলি বিধিতে বদ্ধ ছিলেন। আর্য্যনারীসমাজের বয়ঃপ্রাপ্তি এত দিন হয় নাই। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা এত কাল যে সকল অধিকারের অনুপযুক্ত বলিয়া বঞ্চিত ছিলেন, এখন সেই সমুদায় অধিকার-লাভের উপযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এখন জ্ঞানেতে উন্নত হইতেছেন, আপনাদের বুদ্ধি সুমার্জ্জিত করিতেছেন, আপনাদের বিষয় চিন্তা করিতে ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে শিখিয়াছেন। এখন আমরা বলিতে পারি যে, নারীসমাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রাপ্য বিষয়ে অধিকার তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হওয়া উচিত। তোমরা এখন নিজেদের ভার নিজেরা গ্রহণ কর, আবশ্যক হইলে আমরা সাহায্য করিব। আপনাদের মধ্যে সুনিয়ম

সকল সংস্থাপন কর। কি প্রকার লোকের সহিত মিশিবে, কি প্রকার লোকের সহিত মিশিবে না, তাহা স্থির কর। পুরুষের সহিত কিরূপে কথা কহিবে, কিরূপে ব্যবহার করিবে; মন্দ স্ত্রীলোকদিগের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিবে, যাহারা ঐ প্রকার স্ত্রীলোকদিগকে প্রশ্রয় দিবে, তাহাদের সহিত কিরূপে চলিবে; সন্তানাদির শিক্ষা ও পালন কিরূপে হইবে, তাহাদিগকে কিরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করাইবে; গৃহ সকল কিরূপে পরিষ্কার ও সজ্জিত রাখিবে; কি প্রকার পুস্তকাদি পাঠ করিবে, কি প্রকার পুস্তক পাঠ করিবে না; পুষ্পের সম্মান ও আদর রক্ষা কি প্রকারে করিবে; এই প্রকার সমুদয় বিষয়ের সুনিয়ম প্রস্তুত কর। তোমাদের গৃহসজ্জা, বস্ত্র, তোমাদের সন্তানগণের বেশভূষা, তোমাদের আচার ব্যবহার, কথা, এই সকল দেখিয়া লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, তোমরা আর্য্যনারীসমাজের অন্তর্গত এবং যথার্থই আর্য্যনারী। আজ হইতে তোমাদের উপর ভার হইল, তোমরা সুনিয়ম সকল প্রস্তুত করিয়া সেই অনুযায়ী কার্য্য কর। আজ কয়েকটি নিয়ম হউক, যাহার অনুযায়ী কার্য্য আজ হইতেই সকলে করিবে। পরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়মাদি প্রস্তুত করিবে।"

ধার্ম্মিকা নারী

২৮শে পৌষ, ১৮০১ শকে (১১ই জানুয়ারী, ১৮৮০ খৃঃ, রবিবার প্রাতঃকালে) ধার্ম্মিকা নারীর বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশের সার এই:—"স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? সকল দেশেই এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। ক্ষমতায় কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট, সকলেই এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ে কাহার শ্রেষ্ঠতা, আজ আমরা তাহাই আলোচনা করিব। ধর্ম্মেতে যে কেবল পুরুষেরাই প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকেন, এমন নহে। সকল দেশে, সকল ধর্ম্মসমাজেই এমন স্ত্রীলোক সকল সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা আজিও ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। আমরা প্রতি ধর্ম্মসমাজ হইতে দুই এক জন ভাল স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করিব। খৃষ্টধর্ম্মে মহাত্মা ঈশার মাতা মেরী অতি ধার্ম্মিকা ছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মসমাজে তাঁহার এত দূর প্রাধান্য যে, উক্ত ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় ঈশা অপেক্ষা তাঁহাকে উচ্চ আসন দান করিয়াছেন। পাপের

নিমিত্ত ক্ষমা, রোগ বা বিপদ্-শান্তি ইত্যাদির নিমিত্ত প্রার্থনা 'মাতা মেরীর' নিকটেই প্রেরিত হইয়া থাকে। ল্যাটিন ভাষায় একটি খুব ভাল প্রার্থনা আছে, তাহার প্রথম শব্দ 'আমাদের মাতা মেরী'। রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সকল প্রকার উচ্চ কোমল পবিত্র সদ্গুণে মেরীকে ভূষিত করিয়াছেন। বাইবেলে আরো অনেক ধার্ম্মিকা নারীর নাম পাওয়া গিয়া থাকে। মোহম্মদের স্ত্রী খাদিজা ও তাঁহার কন্যা ফাতেমা এবং তাঁহার ধর্ম্মমাতা হালিমা মুসলমান ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তকে অনেক ভাল স্ত্রীলোকের উল্লেখ আছে। শাক্য বা বুদ্ধদেব যখন অনাহারে বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক সমাধিমগ্ন থাকিতেন, তখন এক জন ভদ্র নারী স্বহস্তে পরমান্ন প্রস্তুতপূর্ব্বক তাঁহার আহারার্থ প্রেরণ করিতেন। ইনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। আমাদিগের দেশেও ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের অভাব নাই। পুরাতন কালে অনেক স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়া, এ দেশে ধর্ম্মের কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, গার্গী ইত্যাদি মুনি-পত্নীগণ যোগতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মের অতি উচ্চ কঠিন ও গূঢ় বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। মৈত্রেয়ীর সহিত তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তরাদি সকলেই অবগত আছেন। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী ইঁহারা পতিভক্তি, দয়া ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, সংসারে ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায়, স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মোন্নতির অতিশয় উচ্চতা লাভ করিয়া গিয়াছেন।"

উপদেশের পর কিয়ৎক্ষণ ঐ বিষয় লইয়া সকলে আলোচনা করিলেন। উক্ত সময়ে সভাপতি মহাশয় সেণ্ট মণিকা নাম্নী আর এক জন ইউরোপীয় পুণ্যবতী স্ত্রীর উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইনি আপনার ধর্ম্মবলে পাপাসক্ত পুত্রকে ধর্ম্মপথে আনিয়াছিলেন এবং অবশেষে ঐ পুত্র এত ধার্ম্মিক হইলেন যে, "সেণ্ট অগষ্টাইন" অর্থাৎ পুণ্যাত্মা নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছেন।

আদর্শ চরিত্র

১০ই মাঘ, ১৮০১ শকে (২৩শে জানুয়ারী, ১৮৮০ খৃঃ, শুক্রবার, সায়ংকালে) আদর্শচরিত্রবিষয়ে উপদেশ হয়। তাহার সার এই :—

"আর্য্যনারীসমাজের সভ্যগণ, তোমাদের জীবন এরূপ হওয়া চাই যে,

দেখিলেই যেন তোমাদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার উদয় হয়। তোমাদিগের চরিত্র নারীচরিত্রের আদর্শ হইবে, তোমরা ধর্ম্মালঙ্কারে ভূষিত হইবে, প্রেম পুণ্য বিনয়ের জীবন ধারণ করিবে। সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ভারতের পুণ্যবতী নারীগণের উচ্চ দৃষ্টান্ত তোমাদের অনুসরণীয়। তোমরা সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তির সাধনা কর, পরম জননীকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া ধন্য হও, সংসারে ও জীবনের সমুদায় ঘটনায় তাঁহার প্রেম দর্শন কর। ইহপরলোকবাসী সাধুদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে এবং দুঃখীদিগের প্রতি দয়া করিতে শিক্ষা কর। এখন হইতে তোমরা জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া লও, আপনাদিগের ভার আপনারা লও। নির্জ্জনসাধনার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট কর, নির্জ্জনে সজনে ব্রহ্মপূজা কর, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ করিয়া সুখী ও শুদ্ধ-চরিত্র হও।"

বংশমর্য্যাদা

১০ই ফাল্গুন, ১৮০১ শকে (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খৃঃ, শনিবার) বংশ-মর্য্যাদাবিষয়ে উপদেশ হয়। তাহার সার এই :—"হিন্দুদিগের একটি প্রচলিত নিয়ম আছে; তাহা এই যে, বিবাহসময়ে বর-কন্যার পিতা, পিতামহ ও বংশের পরিচয় প্রদান করিতে হয়। পিতা বা পিতামহের পরিচয়দানের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি; কারণ বিবাহকালে কে কাহার সন্তান, ইহা জানা আবশ্যক। কিন্তু গোত্র বা বংশের পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? ইহার অর্থ এই যে, হিন্দু বা আর্য্যজাতির নিকট বংশমর্য্যাদা একটি গৌরবের কারণ। সকলেই বংশমর্য্যাদায় আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া, সেই বংশের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। সেইরূপ তোমাদিগকে মনে রাখিতে ও জানিতে হইবে যে, আর্য্যজাতির মধ্যে পুরাতন কালে সীতা, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি উচ্চ প্রকৃতির নারীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, নারীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন; তোমরাও সেই আর্য্যবংশোদ্ভূত। তাহা হইলে তোমাদের বংশগৌরব মনে হইয়া, সেই বংশের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা ও চেষ্টা হইবে। আপনাকে উচ্চ-বংশজাত বলিয়া জানিতে পারিলে, যে অত্যন্ত নীচ, তাহারও মনে স্বভাবতঃ একটু গৌরব ও তেজের সঞ্চার হয়। অতএব তোমরা আপনাদিগকে, সীতা, মৈত্রেয়ী যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই উচ্চ আর্য্যবংশজাত

জানিয়া, আপনাদিগকে সেই বংশের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং ঐ সকল নারীর চরিত্র পাঠ করিয়া, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া, যাহাতে তাঁহাদের তুল্য হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে, এবং তোমাদের বংশের মর্য্যাদা ও উচ্চতা রক্ষা করিবে।”

দেহমধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল

৮ই চৈত্র, ১৮০১ শকে (২০শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ, শনিবার প্রাতঃকালে) দেহমধ্যে সৃষ্টির কৌশলবিষয়ে উপদেশ হয়, তাহার সার এই :—“শরীরমধ্যে ঈশ্বরের কত নির্ম্মাণকৌশল প্রকাশ পায়, তাহা সকলের জ্ঞাত হইতে চেষ্টা করা উচিত। শরীরের মধ্যে কত প্রকার নিয়ম, কত আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা স্থাপিত আছে। যন্ত্রের ন্যায় দিবানিশি দেহযন্ত্র কার্য্য করিতেছে। আমরা চেষ্টা করিয়া নিশ্বাস ফেলি না, চেষ্টা করিয়া দেখিতে বা শুনিতে পাই না, স্বাভাবিক নিয়মে এ সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে, এ শরীর মনের অধীন, আত্মাই শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ মনুষ্য; কিন্তু দেহ তাহার আবাস-মন্দির মাত্র। এই দেহমধ্যে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল, সুচারু নিয়ম সকল জানিতে পারিলে, কত আশ্চর্য্য হইতে হয়। আজ শরীরস্থ স্নায়ুপ্রণালীর বিষয় বলা হইবে। স্নায়ুপ্রণালী মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া, ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকারে মেরুদণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং তথা হইতে সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মাকারে তাহার শাখা প্রশাখা শরীরের সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্নায়ু দ্বারা আমাদের স্পর্শ বা সুখ-দুঃখ-বোধশক্তি জন্মে। ইহা দ্বারা হস্তপদ যথেচ্ছ সঞ্চালন করা যায়। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গ্রহণ, এ সমুদায় স্নায়ুর সাহায্যে হইয়া থাকে। হাস্য ক্রন্দন ইত্যাদির মূল স্নায়ু। স্নায়ুর সহিত মস্তিষ্কের যোগ আছে বলিয়া, এই সমুদায় তাহার প্রভাবে সংঘটিত হয়।”

নববিধান-গ্রহণ

২৫শে চৈত্র, ১৮০১ শকে (৬ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃঃ, মঙ্গলবার) নববিধান-গ্রহণবিষয়ে উপদেশ হয়, তাহার সার এই :—“ইতিপূর্ব্বে এক বার এই সভায় তোমাদিগের আপনাপন ভার ও দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তোমাদের হস্তে প্রদান করা হইয়াছিল। তোমরা যে কেবল পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া চলিবে, তাহা উচিত নহে; কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া লইয়া,

জীবনকে যথার্থরূপে পরিচালিত করিবে। তোমরা শুনিয়াছ, নববিধাননামক এক সামগ্রী বর্ত্তমান সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে। বক্তৃতাতে, উপাসনাতে, সংবাদপত্রপাঠে তোমরা ইহার বিষয় জ্ঞাত হইতেছ। আমরা মনে করি, সমুদায় পৃথিবীর নিমিত্ত এই একটি বিশেষ সময়। পৃথিবীর নিকট না হউক, আমাদের ভারতের জন্যত বটেই। পৃথিবীতে যেমন সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ বিধান প্রকাশ হইয়াছিল, তেমনি এই বিধানের প্রকাশ একটী বিশেষ সুসময়। মহাত্মা রামমোহন রায় এই ধর্ম্মের সংস্থাপক। কিন্তু তিনি কেবল এই নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মবিধানের বিকাশের সময়। এ সময় যে বিশ্বাস করিয়া ইহার জীবন্ত সত্যের ভিতর প্রবেশ করিবে, তাহার পরিত্রাণ হইবে, তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইবে। এখন যাঁহারা নববিধানে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই ধন্য। ভবিষ্যতে লোকে এই নববিধানব্যাপার নূতন মহাভারতে অবগত হইয়া ইহাতে প্রত্যয় করিবে বটে, কিন্তু এখন ইহার ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাঁহারা পারেন, তাঁহারা ধন্য। ভবিষ্যতে হয়ত অন্যান্য ধর্ম্মবিধানের তুল্য ইহার ভাব হ্রাস হইয়া, ইটি একটি নিয়ম ও বাহ্যিক আকারে পরিণত হইবে। এ সময় যাঁহারা ইহাতে বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা ইহার জীবন্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তোমাদের পক্ষে এখন সুসময়; তোমরা নববিধানের আশ্রিত বলিয়া যাহাতে পরিচিত হইতে পার, জীবনকে সমগ্রভাবে তাহার উপযুক্ত কর। তোমাদের সমস্ত দিবসের কার্য্য, ব্যবহার, ভাব এরূপ হউক, যাহাতে লোকে দেখিবামাত্র, তোমরা যে এই বিশেষ বিধির আশ্রিত ও অন্তর্গত, তাহা বুঝিতে পারিবে। যেমন বৈষ্ণবকে দেখিলেই, লোকে তাহার বাহ্যিক কোন লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারে, এ ব্যক্তি বৈষ্ণব, সেইরূপ তোমাদের এরূপ কোন লক্ষণ থাকুক, যাহাতে তোমরা নূতন বিধানের অন্তর্গত লোক বলিয়া সকলে বুঝিতে পারে। বাহ্যিক লক্ষণের কথা বলিতেছি না, জীবনকে নূতন করিয়া লও, নববিধানের উপযুক্ত করিয়া লও।"

লক্ষ্মীশ্রী

১৯শে আষাঢ়, ১৮০২ শকে (২রা জুলাই, ১৮৮০ খৃঃ, শুক্রবার) লক্ষ্মীশ্রী বিষয়ে উপদেশ হয়। তাহার সার এই:—"ঈশ্বরের কোটী স্বরূপমধ্যে

লক্ষ্মীস্বরূপ একটী। তিনি লক্ষ্মীরূপে আমাদের সকলের সংসারমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। আমাদের গৃহের সমুদয় ধন রত্ন সামগ্রী তাঁহার প্রদত্ত। সংসারের সমুদয় কার্য্য সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত করা উচিত। নতুবা সেই লক্ষ্মীর অবমাননা করা হয়। সামান্য দ্রব্যকে অবহেলা বা অপচয় করা হইবে না। গৃহকর্ম্মে অলস হইয়া সংসারে অনিয়ম আনয়ন করিলে পাপ হয়, ইহা মনে করিতে হইবে। প্রত্যেক সামান্য দ্রব্যও যখন লক্ষ্মীর প্রদত্ত, তখন কোন দ্রব্য অপচয় করিতে আমাদের অধিকার নাই। গৃহে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম সাবধান হইয়া যত্নের সহিত করিবে। মনে করিবে, সমুদায় কার্য্য লক্ষ্মীর আদেশে লক্ষ্মীর নিমিত্ত করিতেছ। অর্থব্যয়সম্বন্ধে, বস্ত্রপরিধান-সম্বন্ধে, আহারসম্বন্ধে ঠিক যাহা সেই লক্ষ্মীর অভিমত হইবে, তাহাই করিবে। দুই পয়সার স্থানে তিন পয়সা ব্যয় বা তিন পয়সার স্থানে দুই পয়সা ব্যয়, এরূপ সামান্য অপরাধও লক্ষ্মীর নিকটে অগ্রাহ্য হইবে না। অসাবধানতা বা অগোচাল হওয়াকে পাপ মনে করিবে। সাংসারিক সমুদায় কর্ম্ম লক্ষ্মীর আদেশে সম্পন্ন করিয়া, গৃহ পরিবারে লক্ষ্মীশ্রী যাহাতে আনয়ন করিতে পার, তাহারই চেষ্টা করিবে।"

স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ বিশেষ দোষ

২রা শ্রাবণ, ১৮০২ শকে (১৬ই জুলাই, ১৮৮০ খৃঃ, শুক্রবার) স্ত্রীলোকের বিশেষ বিশেষ দোষ উল্লিখিত হয়। তাহার সার এই:—"আমরা অনেক সময় স্ত্রীলোকের গুণালোচনা করিয়া থাকি। এবার তাঁহাদিগের স্বাভাবিক বিশেষ দোষগুলি আলোচনা করা যাউক। আৰ্য্যনারীসমাজের সভ্যগণ যাহাতে আপনাদিগকে সেই সকল দোষমুক্ত করিতে পারেন, যেন তাহার চেষ্টা করেন। স্ত্রীলোকের একটি দোষ যে, তাঁহারা স্বজাতির অর্থাৎ অন্য স্ত্রীলোকের গুণ লক্ষ্য করিতে অক্ষম। সহজেই এক জন নারী অন্য নারীর দোষ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন, কিন্তু গুণ শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহাদের দ্বিতীয় দোষ পরশ্রীকাতরতা। তবে ইহাতে পুরুষ স্ত্রী উভয়েই তুল্য অপরাধী। অনেক পুরুষেরও এ দোষ বিলক্ষণ আছে। আর একটি দোষ অপমানবহনে অসমর্থ হওয়া অর্থাৎ অভিমান। এই অভিমান যদিও প্রথম অবস্থায় বিশেষ অনিষ্টকর হয় না, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অবশেষে ক্রোধে পরিণত হয় ও প্রতিহিংসাবৃত্তি

প্রবল করিয়া দেয়; তাহাতে পরিণামে বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করে। স্ত্রীজাতির আর একটি বিশেষ দোষ 'স্বার্থপরতা।' এই বৃত্তি স্ত্রীলোকের মনে সকল দোষ অপেক্ষা প্রবল। ইহার আর একটি নাম মায়া। কারণ মায়ার প্রভাবেই স্বভাবতঃ আপনার সম্পর্কীয় যাহা কিছু, তাহার উপর মনের অধিক টান হয়, তজ্জন্য স্বার্থপরতারও বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অনেক কম স্বার্থপর; কারণ মায়াবৃত্তি পুরুষের মনে কম। নারীগণের আর একটি দোষ এই যে, তাঁহারা খোসামোদ বুঝিতে পারেন না, শীঘ্রই খোসামোদ শুনিয়া ভুলিয়া যান। তোষামোদের অর্থ কেবল গুণবর্ণনা বা প্রশংসা করা নহে, যথার্থ চতুর তোষামোদকারীরা কখনই সম্মুখে সুখ্যাতি করিবে না; কিন্তু এমনি কৌশল করিয়া নানা উপায়ে তোষামোদকে রূপান্তর করিয়া প্রকাশ করিবে, এবং তাহাকে প্রকৃত ভাবের তুল্য করিয়া দিবে যে, কখনই স্ত্রীলোকে তাহা বুঝিতে পারিবেন না, এবং সহজেই তাঁহার মন তোষামোদকারীর প্রতি অতি অনুকূল হইয়া যাইবে। অন্য সকলেই সেই তোষামোদ বুঝিতে পারিবে, কিন্তু কেবল যাহাকে খোসামোদ করা যায়, সে বুঝিতে পারিবে না। এই তোষামোদ বুঝিতে না পারিয়া, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া, অনেক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। বিশেষরূপে এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

"স্ত্রীপ্রকৃতির আর একটি দোষ এই যে, তাঁহারা অনেক সময় নীতি-সম্বন্ধে যাহা ভাল লাগে, তাহাই করেন এবং যাহা ভাল লাগে না, তাহা করেন না। অনেক সময় এমন হইতে পারে যে, যাহা ভাল লাগে না, তাহা হয়তো ভাল অর্থাৎ করা উচিত, এবং যাহা ভাল লাগে, তাহা হয়তো করা উচিত নয়। লোকের প্রকৃতি এই যে, কোন সময় ভাল কাজও ভাল লাগে, আবার কোন কোন সময় যাহা ভাল নয়, তাহাও ভাল লাগে। এ সময়ে মনের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিলে বিষম অনিষ্ট হয়। কিন্তু এমন স্ত্রীলোক অল্প দেখা যায়, যাঁহার মনে এত দূর বল আছে, যাহাতে ভাল লাগিলেও সে কার্য্য করিবার ইচ্ছাকে দমন করিতে পারেন, এবং যাহা ভাল লাগে না, তাহাও উচিত হইলে সকল সময় করিতে পারেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মন্দপুস্তকপাঠের কথা উল্লেখ করিব। নাটক নভেল ইত্যাদি পাঠে স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ ব্যগ্র হয়। কিন্তু মন্দ নভেল দ্বারা ঠিক মন্দ সঙ্গের তুল্য অনিষ্ট ঘটে। নভেলের বিশেষত্ব

এই যে, তাহার ভিতর মন্দকে সুন্দররূপে সাজান থাকে। দুঃখের বিষয় এই, উক্তরূপ উপন্যাস পড়া কর্ত্তব্য নয় জানিয়াও, নারীগণ তাহা পাঠে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। লিখিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা যদি কুরুচির বশবর্ত্তী হন, অনায়াসে পাপ মন্দকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া পাঠক পাঠিকার সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারেন। যে কার্য্য, যে ভাব, যে ব্যবহারের উপর অত্যন্ত ঘৃণা হওয়া উচিত, হয়তো লেখক এমন করিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে ঘৃণার পরিবর্ত্তে দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়। এই সকল পুস্তকপাঠে অজ্ঞাতসারে মর্ম্মে মর্ম্মে বিষপ্রবেশ করে, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। মনে কর, এক খানি উপন্যাসস্থ ঘটনা তোমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে, তুমি যদি জীবনের কোন সময় উক্তরূপ অবস্থায় নীত হও, তোমার স্বভাবতই তাহার ন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইবে, ইহাতে হয়তো সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। অতএব পুস্তকপাঠসম্বন্ধে নারীগণের অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলা কর্ত্তব্য। আর নীতিসম্বন্ধে এই নিয়মে চলিতে হইবে, যাহা ভাল লাগে না, তাহা যদি কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করিবে; আর যাহা ভাল লাগে, তাহা যদি অনুচিত হয়, কখন করিবে না।"

উপাসনায় আনন্দলাভ

১৬ই শ্রাবণের (১৮০২ শক) ধর্ম্মতত্ত্বে উল্লিখিত আছে, "বিগত আর্য্যনারী-সমাজের অধিবেশনে (১৫ই শ্রাবণ, ১৮০২ শক ; ২৯শে জুলাই, ১৮৮০ খৃঃ) এই স্থির হয় যে, স্ত্রীলোকের ব্রতাচরণ আবশ্যক কি না ? আবশ্যক হইলে, কিরূপ নিয়ম ও প্রণালীতে ব্রতাচরণ করিলে, জীবনে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে, এ বিষয়ে প্রমাণ ও যুক্তিসহকারে আর্য্যনারীসমাজের কয়েকজন সভ্য একটি প্রবন্ধ লিখিবেন। প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য কোচবিহারের মহারাণী দশটাকা করিয়া বিশ টাকা দান করিবেন। যাঁহার প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইবে, তিনিই এই টাকা পাইবেন। এই অধিবেশনে আচার্য্য মহাশয় যে উপদেশদান করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ এই :—"ঈশ্বরের সঙ্গে যাহাতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাঁহার সঙ্গে কোনরূপ দূরতা না থাকে, কয়েক বৎসর হইতে উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশাদিতে সেই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। এইক্ষণ ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ যাহাতে উজ্জ্বলরূপে অন্তরে উপলব্ধি হয়, ব্রহ্মদর্শন উজ্জ্বল হয়, উপদেশ

বক্তৃতাদিতে তাহারই গূঢ় আলোচনা হইতেছে। ব্রাহ্মের জীবনে তাহা কত দূর সফল হইতেছে ও ব্রাহ্মিকারা কিরূপ বুঝিতে পারিতেছেন, তাহা জানি না। সত্যের সাধন না করিলে, শুদ্ধ শ্রবণ দ্বারা কিছুই ফল হয় না। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের মন বড় চঞ্চল, তাঁহারা উপাসনা করিতে বসিয়া সংসার ভাবেন, দুই মিনিটও অনেকের মন স্থির হয় না। উপাসনা করিতে বসিয়া অনেকে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করেন, উপাসনা ছাড়িয়া যাইতে পারিলে আরাম বোধ করিয়া থাকেন। উপাসনা করিয়া যাহার মুখে বিশেষ স্ফূর্ত্তি ও নির্ম্মল আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পায় না, তাহার:উপাসনা উপাসনাই নহে। সে যে আনন্দস্বরূপ হৃদয়বন্ধু ঈশ্বরের সহবাস কিছুমাত্র লাভ করে নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরদর্শনে হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, মুখমণ্ডল প্রফুল্লতার শ্রী ধারণ করে। উপাসনা করিয়া নারীদিগের কাহারও সেরূপ আনন্দ হয়, আমি ইহা বুঝিতে পারি না। কিঞ্চিৎ অধিক ক্ষণ উপাসনা করিতে অনেকের মুখে বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পায়। ঈশ্বর কি দানব, দৈত্য, না, স্নেহময়ী জননী? মার নিকটে থাকিতে সন্তানের কষ্ট বোধ হইবে কেন? প্রকৃত সাধনের অভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে। অতএব অদ্য এই বিশেষ প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, এক্ষণ হইতে সকলে নিয়মিতরূপে সাধন অবলম্বন করিবেন। এক এক দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, তাহাতে সকলে ছাদের উপর বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নির্জ্জনসাধন করিবেন। আমি উপস্থিত থাকিব, যখন যাঁহার মন বিচলিত হয়, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবেন. আমি মন স্থির করিবার উপায় বলিয়া দিব। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' এই মন্ত্রকে বার বার উচ্চারণ করিতে হইবে; একটি বিশেষ মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধন না করিলে, কিছুই ধরিতে না পাইয়া মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হইয়া থাকে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তরে এই স্বরূপগুলি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে। ক্রমে ক্রমে মন তাহাতে মগ্ন ও সমাহিত হইবে।" ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, এই কথার পর কেশবচন্দ্র আপনি:উপস্থিত থাকিয়া, আর্য্যনারীসমাজের মহিলাগণের যোগসাধনে সহায়তা করিতেন। কমলকুটীরের দ্বিতলের বারাণ্ডায় সাধন হইত। সে সাধনসময়ে সে স্থানের যে গাম্ভীর্য্য উপস্থিত হইত, আজও আমাদের মনে তাহা মুদ্রিত রহিয়াছে।

যোগধর্ম্মসাধন

৩০শে শ্রাবণ, ১৮০২ শকে (১৩ই আগষ্ট, ১৮৮০ খৃঃ) যোগধর্ম্মসাধনবিষয়ে যে উপদেশ দেন, তাহার সার এই :—"এত দিন তোমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিলে, আরাধনা প্রার্থনাদি করিলে, এক্ষণ তোমাদিগকে ছাদের উপরে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে তিনি ডাকিতেছেন। তাঁহার নিমন্ত্রণানুসারে তথায় যাইয়া দর্শন কর। দুইটি বস্তুর মধ্যে যখন কোন ব্যবধান না থাকে, তখন উভয় বস্তুতে যোগ হইয়াছে, বলা যায়। যখন সাধক নিজের আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান অনুভব করেন না, তখন জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ বলা হয়। এই যোগধর্ম্মসাধনে পুরুষের যেরূপ অধিকার, নারীরও সেই প্রকার অধিকার। তোমরা কেবল সংসারের নীচ কর্ম্ম করিয়া, জীবনকর্ত্তন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই; তোমরাও ঈশ্বরদর্শন করিয়া ও তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া জীবন সার্থক করিবে। পুরুষেরা যেমন যোগী হইবেন, স্ত্রীলোকেরাও তদ্রূপ যোগিনী হইবেন। পুরুষের যোগসাধনে ও নারীর যোগসাধনে অল্পমাত্র প্রভেদ। নারীর যোগে কোমল ভক্তিভাবের প্রাধান্য থাকিবে। তোমরা জান, ভোজনে অগ্রে তিক্ত, পরে মিষ্ট। তিক্ত শুক্তানি ইত্যাদি খাইয়া শেষ ভাগে মিষ্টান্নাদি খাইতে হয়। ভজনেরও এই রীতি, প্রথম তিক্ত, পরে মিষ্ট। প্রথম সাধনায় কষ্টস্বীকার করিতে হয়, বিষয়চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া ঈশ্বরে সমাহিত করিতে প্রথমে আয়াসবোধ হয়, দৃঢ়তার সহিত সেই ক্লেশ টুকু বহন করিলে পরে বড় আনন্দ। যাঁহারা প্রথমে ক্লেশ ভোগ করিয়া সাধন ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা তিক্ত শুক্তানি খাইয়া ভোজনে নিবৃত্ত হন, বলিতে হইবে; তাঁহারা জীবনে সেই ক্লেশবহনব্যতীত অন্য কিছু ফল লাভ করেন না। তোমরা কয়েক জন আজ হইতে দৃঢ়তার সহিত যোগধর্ম্মব্রতসাধন আরম্ভ কর। তোমরা ঈশ্বরের লক্ষ্মী ইত্যাদি স্বরূপের বিষয় এই কয় দিন শুনিলে, তাঁহার নিরাকারা লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হও। পৌত্তলিকেরা তাঁহাদের দেবতাকে সম্মুখে দর্শন করেন, সেইরূপ বরং তদপেক্ষা স্পষ্টরূপে তোমাদের উপাস্যদেবকে অন্তরে দর্শন করিবে। তাঁহাদের লক্ষ্মী সরস্বতী অসত্য কল্পিত, তোমাদের লক্ষ্মী সরস্বতী জ্বলন্ত জীবন্ত। আলোকব্যতীত তাঁহাদের দেবতা দেখা যায়

না, গভীর অন্ধকারের মধ্যে আমাদের অনন্ত নিরাকার লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মনোহর রূপ সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। তোমরা লক্ষ্মীর ভুবনমোহন রূপসাগরে নিমগ্ন হও, সমগ্র জীবন, সমুদায় সংসারকে লক্ষ্মীর শ্রীতে সমুজ্জ্বল দেখ। অনন্ত সরস্বতী অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ সাধন করিয়া নির্ম্মল জ্ঞানলাভ কর, সকল কার্য্যে তাঁহার মধুর বাণী ও প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিতে থাক। স্বীয় জীবন দ্বারা পৌত্তলিকদিগকে বুঝাইয়া দেও যে, তোমাদের দেবতা কেমন সত্য ও জীবন্ত। তোমরা কি তাঁহাদের দ্বারা পরাস্ত হইবে? না, তোমরা জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত ও ভক্তি বিশ্বাস দ্বারা তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিবে। সাধন দ্বারা ঈশ্বর ক্রমে নিকটবর্ত্তী হন। প্রথম দূরে বোধ হয়, যেন শত হস্ত দূরে রহিয়াছেন; তৎপর ক্রমে ক্রমে যত সাধন ঘনীভূত হয়, তাঁহাকে এত নিকটে দেখা যায় যে, এরূপ নিকট আর কিছুই নহে। তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনা যায়। এ সমুদায়ই অন্তরে হয়, বাহিরে কিছুই নয়। অনন্ত আকাশের ঈশ্বর বাস্তবিক দূরে নহেন; তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তবে আমরা সংসারকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁহা হইতে দূরে থাকি। ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে আত্মাতে ধারণ করিতে হইবে। এই যোগধর্ম্ম তোমরা সাধন কর। যাঁহারা এই ব্রত অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে এক এক খানা স্বতন্ত্র আসন রাখিতে হইবে। তাঁহারা সেই আসনে বসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধ্যান ধারণা করিবেন।"

নিরাকারের রূপ

১৯শে ভাদ্র, ১৮০২শক (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ), শুক্রবার, আর্য্যনারী-সমাজে প্রার্থনানন্তর কেশবচন্দ্র যে উপদেশ (১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) দেন, তাহার সারাংশ এই:—"ব্রহ্ম অজড় নিরাকার, তাঁহার কোন বাহ্য আকার নাই, তিনি মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদ চক্ষুঃ কর্ণাদিবিশিষ্ট নহেন; অথচ তাঁহার রূপ আছে। তাঁহার গুণই রূপ, তাঁহার স্বরূপই আকার। ব্রহ্মের জ্ঞান-স্বরূপ সরস্বতী। সকল দেশেই পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব। বহুসংখ্যক লোক সাকার দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? এই পৌত্তলিকতার সৃষ্টি কিরূপে হইল? ব্রহ্মের এক এক স্বরূপ হইতে, এক এক সাকার দেবদেবী কল্পিত হইয়াছে। সাধারণ লোক ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপ ধারণ করিতে

অক্ষম হইয়া, সুবিধার জন্য বা ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে একটি সাকার দেব বা দেবী কল্পনা করিয়াছে। ব্রহ্ম কখন জড় নহেন, তিনি এক ভিন্ন বহু নহেন; কিন্তু তিনি এক হইলেও, তাঁহার তেত্রিশ কোটি রূপ অর্থাৎ অসংখ্য রূপ। তাঁহার একটি রূপ জ্ঞান, তিনি জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানকে আলোক বলা হইয়া থাকে, অজ্ঞানকে অন্ধকার। আলোক শুভ্র, আলোককে ঘন কর, আরও ঘন কর, খুব ঘন কর, তাহাতে ঘন শুভ্রবর্ণ উৎপন্ন হইল। কল্পনাবলে সেই ঘন জ্ঞানালোকে হস্ত-পদাদি যোগ করিয়া মূর্ত্তিতে পরিণত করিলেই সরস্বতী হয়। পৌত্তলিকেরা এইরূপে কল্পনাবলে ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ হইতে শুভ্র সরস্বতীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, আমরা এই সাকার সরস্বতী স্বীকার করি না। আমাদের সরস্বতী পরিমিত ও ক্ষুদ্র নহেন, অনন্ত নিরাকার ঈশ্বরের শুভ্র জ্ঞানস্বরূপ। যে গৃহে সুশৃঙ্খলা সুনিয়ম আছে, ধনধান্যাদির অপ্রতুলতা নাই, কুশল কল্যাণ শান্তি বিরাজমান, সেই গৃহে লক্ষ্মীশ্রী আছে, সকলে বলিয়া থাকে। লক্ষ্মী পরমাসুন্দরী, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপই লক্ষ্মী, মঙ্গলই সুন্দর। লক্ষ্মী শব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য কল্যাণ। ঈশ্বরের যে স্বরূপ জগতে শান্তি কুশল শ্রী সৌন্দর্য্য বিস্তার করে, নরনারীকে সুখ সৌভাগ্য দান করে, আমরা তাহাকে লক্ষ্মী বলিয়া থাকি। আমাদের লক্ষ্মী নিরাকার, অনন্ত কল্যাণস্বরূপ আমাদের লক্ষ্মী। গভীর সমুদ্রের জল কৃষ্ণবর্ণ। যত ঘনত্বের বিরলতা, তত শ্বেতবর্ণ; যত জল গভীর, তত কৃষ্ণবর্ণ। অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্রের জলরাশি ঘোর কাল। এইরূপ নিরাকার ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিসমুদ্রকে ঘন কর, আরও ঘন কর, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে। ব্রহ্মের শক্তির ঘনত্বেই কালীমূর্ত্তির সৃষ্টি। ঘন শক্তিস্বরূপ কল্পনাবলে হস্তপদাদির প্রয়োগ করিয়াই, হিন্দুরা কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা এই কালী জানি না, নিরাকার অনন্ত শক্তিস্বরূপ কালীকে বিশ্বাস করি। এইরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অসংখ্যস্বরূপে ও গুণে অসংখ্যরূপ ধারণ করিয়া সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন।

"ধ্যান শব্দের অর্থ, ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করা; এক একটি স্বরূপকে ধরাই ধ্যান। তিনি নিরাকার, অতএব তাঁহাকে ধরা যায় না, এরূপ ফাঁকি দিলে চলিবে না। তাঁহার গুণই রূপ, তাঁহার দয়া রূপ, পুণ্য রূপ, আনন্দ রূপ ইত্যাদি অসংখ্য রূপ। ধ্যানে এই এক একটি রূপকে ধারণ করিতে হইবে।

ধ্যানে কোনরূপ জড় নাক কাণ চোখ ভাবিতে হইবে না, কেবল গুণ ভাবিতে হইবে। কোনরূপ জড় ভাবিবে না। লক্ষ্মী ভাবিতে কোন মূর্ত্তি মনে করিবে না, লক্ষ্মীর ভাব শান্তি কুশল সুব্যবস্থা। ধ্যানে প্রথমতঃ গুণ পাতলা দেখাইবে, ক্রমে ক্রমে ধ্যানের গাঢ়তায় তাহা ঘোর ঘনতররূপে প্রকাশিত হইবে। সেই গুণ ধ্যানের স্ক্রু ও শিকল দ্বারা অন্তরে শক্ত করিয়া বন্ধ করিবে। এক একটি রূপের অনেক বিভাগ আছে। যেমন মূল গুণ ভালবাসা, তাহা হইতে বিপদ্ভঞ্জন দীনবৎসল মাতা পিতা প্রভৃতি হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে আকাশের ন্যায় অনন্ত ভালবাসার প্রকাণ্ড রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মের ভালবাসার সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে, হৃদয়ে আনন্দ ধারণ করিতে পারিবে না। তাঁহার প্রেমস্বরূপ যখন ধ্যান করিবে, ভাবিবে যে, একটি প্রকাণ্ড অনন্ত ভালবাসা তোমার সম্মুখে এবং চরিদিকে ভিতর এবং বাহির পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাকে মাতা পিতা বন্ধু নানারূপ স্নেহের সম্বন্ধে আহ্বান করিবে। কেবল চিন্তা করিলে হইবে না, মনে ধারণা করিতে হইবে, অর্থাৎ সকল সময় তাঁহার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিবে। সাধনা দ্বারা অবশেষে এমন অভ্যাস হইবে যে, আর তাঁহার স্থিতি চেষ্টা করিয়া অনুভব করিতে হইবে না, সকল সময় তাঁহার প্রকাশ বুঝিতে পারিবে। এমন কি, চেষ্টা করিলেও তাঁহার সত্তাকে তোমার নিকট হইতে অন্তর করিতে সক্ষম হইবে না। ইহাকেই ধারণা বলে। এক যোগে অনেকগুলি গুণ ভাবিবে না, তাহাতে গোল হইবে। এক এক বারে এক একটি স্বরূপের ধ্যান করিবে। প্রেমস্বরূপ আয়ত্ত হইলে পুণ্যস্বরূপ ভাবিবে। সে স্বরূপের সহিত যত ঘনিষ্ঠতা হইবে, তদনুরূপ জীবন উন্নত হইবে। ধ্যানেতেই প্রকৃতরূপে ধর্ম্মজীবন সংগঠিত হয়, ধ্যানেতেই ধর্ম্মের সার ও গভীরতা উপলব্ধ হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হয়।" এই প্রকার উপদেশানন্তর সকলে যোগশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেলেন।

ঈশ্বরবাণী-শ্রবণ

১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে (৮ই কার্ত্তিক মুদ্রিত) লিখিত হইয়াছে :—"গত আর্য্যনারীসমাজে (৭ই কার্ত্তিক, ১৮০২ শক; ২২শে অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ) আচার্য্যমহাশয় যে উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহার সার এই :—"কেহ

আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলে, তাহাকে দর্শন করিয়া বা তাহার কোনরূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া আমরা তাহাকে জ্ঞাত হই। যাহার চক্ষু কর্ণ উভয় আছে, সে সৌভাগ্যশালী। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্ধ, সেও শব্দ শুনিয়া জ্ঞানলাভ করে। মনুষ্যের পরিচয় যেমন চক্ষুঃকর্ণযোগে করি, ঈশ্বরকেও সেইরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু এই বাহ্য চক্ষু কর্ণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয় না। তাঁহার দর্শনশ্রবণের জন্য অন্তরে চক্ষু কর্ণ আছে। যিনি যোগ তপস্যা করিয়াছেন, সেই ভাগ্যবান্ লোক জ্ঞানালোকে তাঁহাকে দর্শন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই জ্ঞাননেত্র অন্ধ হইলেও, লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া নৈকট্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। মনে কর, তোমাদের টাকার প্রয়োজন। এক ব্যক্তি বাক্সে এক শত টাকা পূরিয়া রাখিয়াছে, দেখিতে পাইলে। সেই টাকাগুলি প্রাপ্ত হইলে তোমাদের কষ্ট দূর হয়, সহজে তোমরা তাহা অপহরণও করিতে পার। তখন টাকাগুলি চুরি করিতে ইচ্ছা করিলে, কিন্তু অমনি অন্তরে 'না' শব্দ শুনিতে পাইলে। সেই 'না'টি তোমাদের নয়, উহা স্বতন্ত্র। উহা তোমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত; কেন না, টাকা চুরি করিতে গিয়া নিষেধ প্রাপ্ত হইলে। আবার দেখ, এক জন অন্নবস্ত্রহীন নিরাশ্রয় অন্ধকে অর্থদানে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে, তখন অন্তরে ধ্বনিত হইল 'হাঁ উত্তম', ইহা শুনিয়া উৎসাহ পাইলে। নিশ্চয় এ সকল ধ্বনি, এ সকল কথা তোমার নয়, তোমা ছাড়া একজন অন্তরে থাকিয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে নিষেধ করেন, বিধি দেন, কল্যাণ অকল্যাণের পথপ্রদর্শন করেন। তিনিই ঈশ্বর। যদি তুমি কেবল লোকের কোলাহল ও গাড়ী ঘোড়ার শব্দের প্রতি মনোযোগ দিয়া থাক, তাহা হইলে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতে পারিবে না; ঈশ্বর যে তোমার নিকটে থাকিয়া কথা বলিতেছেন, অনুভব করিতে পারিবে না। যত তাঁহার বাণীশ্রবণে অধিক মনোযোগ করিবে, তত অধিক শুনিতে পাইবে। যোগসাধনে ঈশ্বরবাণীশ্রবণ নিতান্ত আবশ্যক। নির্জ্জনে বসিয়া তুমি তাঁহার নিকটে প্রশ্ন কর, তিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এইরূপ দুই দণ্ড কাল কথোপকথন করিলে, তাঁহার নিকটে অভাব সকল জানাইয়া সদুত্তর লাভ করিলে, কেমন সুখের ব্যাপার হয়। যত এ বিষয়ে সাধন করিবে, তত তাঁহার নিকটে গূঢ় কথা শুনিতে পাইবে।"

ব্রহ্মের সহিত সখ্যভাব

১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে উপদেশের সার এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—(২২শে কার্ত্তিক ১৮০২ শক ; ৬ই নবেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)। "নারী-স্বভাব প্রস্ফুটিত হইলে, আপনা আপনি ব্রহ্মচরণে সমর্পিত হয়। সংসারে শৈশবাবস্থায় কন্যা পিতা মাতাকে ভক্তি করে, পরে কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইল, তাহার বিবাহ হইল। তখন স্বামী তাহার সর্ব্বস্ব হইল। সেইরূপ যদি তোমার আত্মার শৈশবাবস্থা থাকে, ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া ভক্তি কর, পূজা কর। আর যদি তোমার ধর্ম্ম পরিপক্ক হইয়া থাকে, ব্রহ্মের সহিত সখ্যভাব স্থাপন কর। তাঁহাকে পতি জ্ঞান করিয়া, সকল অনুরাগ, প্রেম, বাধ্যতা অর্পণ কর ; তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে যত্নবতী হও। তোমার আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিবে না, ব্রহ্মের ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা হইবে। তোমার সর্ব্বস্ব ধন তিনি হইবেন। তোমার বন্ধু বান্ধব, পিতা মাতা, সহায় সম্বল, সব কেবল তিনি হইবেন। মন প্রাণ সমুদায় তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া, তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত হইবে এবং তাঁহার অনুগত দাসী হইয়া থাকিবে।"

আধ্যাত্মিক উদ্বাহ

১১ই অগ্রহায়ণ ১৮০২ শকে (২৫শে নবেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ) আধ্যাত্মিক উদ্বাহবিষয়ে উপদেশ হয় ; তাহার সার এই :—"পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে ধার্ম্মিকও করিতে পারেন, অধার্ম্মিকও করিতে পারেন। ব্রহ্মহীন স্বামী স্ত্রীকে ব্রহ্মহীন করিতে পারেন, সংসারী স্ত্রী চেষ্টা করিলে স্বামীকে সংসারী করিতে পারেন ; এ ক্ষমতা দম্পতীর যে আছে, তাহা কে না স্বীকার করিবে ? ইতিহাস দ্বারা এ বিষয়ের প্রমাণ হইয়াছে। তথাপি পৃথিবীতে বিবাহ হয় এবং ধার্ম্মিকেরাও বিবাহ করেন। স্ত্রী এবং পুরুষের কি স্বভাব ? কিরূপে উভয়ের মিলন হয়, একথা ভূত কিংবা বর্ত্তমানে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে নিহিত আছে। বিবাহ কেন হয় ? স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের মধ্যে এ সম্বন্ধ কেন ? আমরা ইতিহাসে এ প্রশ্নের মীমাংসা যদিও দেখিতে না পাই, আশা আছে, সহস্র বৎসর পরে ইহার মীমাংসা হইবে। ঈশ্বর যখন দুই প্রকৃতি সৃজন করিলেন, এবং তাহাদের মধ্যে উদ্বাহের নিয়ম করিলেন, তখন

তিনিই জানেন, ইহার মর্ম্ম কি। এক প্রকার বিবাহ হয় পশুর মধ্যে। স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করে, সন্তানাদি হয়, ইহা বুঝা যায়। পুরুষ পশু এবং স্ত্রী পশু, দুই জনে মিলিত হইল কেন? সন্তান-রক্ষার জন্য, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। বিবাহের আর একটি উদ্দেশ্য এই বুঝিতে পারা যায় যে, অশরীরী সন্তান আত্মার পালনের জন্য দেব স্বামী, দেবী স্ত্রী পৃথিবীতে ধর্ম্মের পরিবার রাখিয়া যান। আর্য্যনারীসমাজ বিশ্বাস করেন, পুরুষ এবং স্ত্রী দুই জন দুই জনকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত। আর দুই জনের সংসারে বাস করিবার অভিপ্রায় এই যে, সন্তানদিগকে পালন এবং চালনা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন। আর্য্যসমাজে ইহা কত দূর হইতেছে? যে স্ত্রী স্বামীর এবং যে স্বামী স্ত্রীর হিংসা, বিলাস, সাংসারিকতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করে এবং হরিনাম করিতে পরস্পরকে প্রস্তুত না করে, তাহারা স্বামী স্ত্রী নামের উপযুক্ত নহে। যে পরিবারে স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বদা স্বর্গের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে পরিবারের কল্যাণ হইবে। স্ত্রীর উচিত, এ প্রকার চেষ্টা করা। তাঁহাদের মনে করা উচিত, স্বামীর শরীর নাই। যাহা আছে, দুদিনের। যদি অশরীরী স্বামী ও স্ত্রীর মিলন হয়, নিরাকার হইয়া যদি দুজনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া সংসারে লক্ষ্মীস্থাপন করিতে পারেন, সন্তানপালন করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহারা ঐ নামের উপযুক্ত। আর্য্যনারীসমাজ কি এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? ইনি এমন করিয়া স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে চান যে, যথাসময়ে নিরাকার স্বামীকে যাহা কিছু আশা ভরসা সব সমর্পণ করিয়া, তাঁহারা সেই স্বামী দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা করেন। আর্য্যনারী ঘরে থাক, ঘরে বসিয়া আমোদ কর, ঘরের লক্ষ্মী হও, ঘরের ধন সম্ভোগ কর, ঘরে জ্ঞান শিক্ষা কর, এবং ঘরে বসিয়া স্বামীর সাহায্যে ব্রহ্মধন সঞ্চয় কর। কত অল্প লোকে এ প্রকার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সঙ্কুচিত হইও না। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এরূপ উদ্বাহই প্রচলিত হইবে। স্ত্রী স্বামীর কাছে বসিতে ভীত হও, স্বামী স্ত্রীর কাছে বসিতে ভীত হও। এখনও তোমরা পরস্পরকে চেন নাই। দুজনে ব্রহ্মকে ডাক, তিনি বুঝাইয়া দিবেন, কে যথার্থ স্বামী, এবং কে যথার্থ স্ত্রী। ডাকিতে ডাকিতে দুজনে ব্রহ্মচরণে মিলিত হইয়া যাইবে; সংসারে পুণ্য শান্তি বাড়িবে।"

প্রকৃত বৈরাগ্য

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৮০২ শকে (১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ) প্রকৃত বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ হয়, তাহার সার এই :—"বৈরাগ্য বলিলে ভয় হয়। আর্য্যনারী, বৈরাগ্য বলিলে তোমার ভয় হওয়া উচিত নয়। কেন না, তোমাদের দেশে আর্য্যকুলে অনেক প্রকার বৈরাগ্য দেখা গিয়াছে। তোমার দেশে বৈরাগ্য নূতন জিনিষ নয়। তোমার কাছে বৈরাগ্য নূতন নাম কখন হইতে পারে না। হিন্দুস্থানে বেদ বেদান্তে বৈরাগ্য বিচিত্র রূপ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; তোমার দেশে পুরুষ বৈরাগী, স্ত্রী বৈরাগী, যুবা বৈরাগী, বৃদ্ধ বৈরাগী অনেক হইয়াছে। পৃথিবীতে অন্য কোন স্থানে কি এত পাওয়া যায়, যেমন তোমার কুলে পাওয়া যায়? তবে আজ তুমি বৈরাগ্য শব্দ উচ্চারণে ভীত হইতে পার না। তোমার দেশের আদরের ধনকে তোমার কাছে আনিলাম, তোমার ভারতমাতার চির আদৃত ধনকে তোমার হাতে দিলাম। ইহা আমি মানি, কোন কোন বৈরাগ্যের আকার ভয়ানক। তাহাতে চিত্তাকর্ষণ হওয়া দূরে থাকুক, ভয় হয়। ভাল খাইবে না, ভাল পরিবে না, ভাল স্থানে বসিবে না, এ সব দুর্গম অন্ধকারাচ্ছন্ন বৈরাগ্যের পথ তোমাদিগকে লইতে বলিতেছি না। উদাসিনী সন্ন্যাসিনী হইবেন আর্য্যনারী? ঈশ্বর নিবারণ করুন। গৃহস্থ হইয়া বৈরাগিণী হও। আমি কি কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম দিয়া নারীহৃদয়ের মধুরতাকে কাড়িয়া লইব? আমি কি বলিব, ছিন্ন কাপড় পরিয়া বনে যাও? না। কিন্তু বৈরাগ্যের অর্থ লইতে হইবে। এমন বৈরাগ্য ভাব, যাহা সুখের; যাহাতে মন উদাস হয় না, কিন্তু সুপ্রসন্ন হয়। এরূপ বৈরাগ্য লোভের বস্তু, ঈশ্বর করুন, তাহা তোমাদের যেন হয়। এক রকম বৈরাগ্য আছে, যাহা কেবল ক্রন্দন, উপবাস, রাত্রিজাগরণ, রোগ শোকে পূর্ণ। সাবধান, আর্য্যনারী, এ পথ তুমি লইবে না। কিন্তু সেই পথ লইবে, যাহাতে হরিতে অনুরাগ জন্মিবে। এ বৈরাগ্যে তোমার প্রেমবৃদ্ধি হইবে। আপনার চেয়ে অন্যকে অধিক ভালবাসিবে। আবার সকলের চেয়ে হরিকে অধিক ভালবাসিবে। তুমি প্রেমের সন্তান, তাহা কি জান না? তোমার জাতীয় ধর্ম্ম প্রেম ভক্তি, তুমি সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসিবে, ইহাই তোমার বৈরাগ্য। তোমার কাছে আত্মপর থাকিবে না। প্রাণের প্রেম উথলিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে,

আপনাতে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে, ইহাকে বলি বৈরাগ্য। বৈরাগ্য ইহা নয় যে, আপনাকে উৎপীড়ন করি, ভস্ম মাখি; কিন্তু খুব প্রেমই বৈরাগ্য। আপনার সুখ বিস্মৃত হইয়া অন্যকে ভালবাসিবে, ঈশ্বরকে খুব ভালবাসিবে; নির্জ্জনে তাঁকে ডেকে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইবে। ইহা কি দুঃখের বৈরাগ্য, না সুখের? যাকে ভজনা করিতে অসুখী হইবে? না, সুখী হইবে? বৈরাগ্যের মুখ ম্লান নহে। সে দুঃখী সন্ন্যাসীর মুখ। বৈরাগীর কেবল প্রেম উৎসারিত হইতেছে। অন্যের দুঃখে মন কাতর হইবে, নিজের কি হইল, তাহা দেখিবার সময় পাইবে না। কেবল অন্যের কথা ভাবিবে, পরকে এত ভালবাসিবে যে, ঠিক যেন আপনার। আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে লইয়া থাকিবে, পরের মুখ দেখিয়া মনে আহ্লাদ আর ধরিবে না। আহা, কি সুখের বৈরাগ্য! আর্য্যনারী, তুমি মার কাছে ভিক্ষা চাও, যেন এ বৈরাগ্য মা তোমাকে দিয়া সুখী করেন। আবার বলি, বৈরাগ্য না লইলে চলিবে না। আপনার সুখ, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা এ সকলের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে চলিবে না। পরকে ভালবাসার কত সুখ, জান না বলিয়া এই বৈরাগ্য লইতে ভয় হয়। ভালবাসার প্রাণ মত্ত হউক, জগতের সকলকে প্রাণ দিয়া ভালবাস; আর হরিকে সকল প্রাণ দিয়া পূজা কর, করিয়া সুখী হও। ধন্য বৈরাগিণী আর্য্যনারী, কারণ যথার্থ বিমলানন্দ তাঁহারই।"

যথার্থ স্বাধীনতা

১০ই পৌষ, ১৮০২ শকে (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ) যথার্থ স্বাধীনতা বিষয়ে উপদেশ হয়; তাহার সার এই:—"হে আর্য্যনারী, কারাবদ্ধ হইয়া ম্লানবদনে তুমি কেন কাঁদিতেছ? তুমি স্বাধীন হও। অধীনতার শৃঙ্খল তোমার পায়ে, হাতে। তোমার চক্ষু অধীন, রসনা অধীন। তোমার দেহ মন সকলই অধীন। তুমি সকল বিষয়ে দাসী, দাসত্বশৃঙ্খলে তুমি বদ্ধ রয়েছ। ভগবানের ইচ্ছা ইহা নয়। কারামুক্ত জীবের ন্যায় স্বাধীনভাবে ভগবানের উদ্যানে বেড়াও। তোমার ভাল ইচ্ছা চরিতার্থ হয় না, সুরুচি চরিতার্থ হয় না। হে ভগ্নহৃদয় আর্য্যনারী, কেন এ ভাবে কারাগারে বসিয়া আছ? ঘরের প্রাচীরের মধ্যে কে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে? শয়তানের গর্ত্তের ভিতর কে তোমায় টানিয়া লইয়া বাঁধিয়াছে? তোমার দেহ গৃহে কেন এরূপ বদ্ধভাবে

প্রকৃত বৈরাগ্য

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৮০২ শকে (১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ) প্রকৃত বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ হয়, তাহার সার এই ঃ—"বৈরাগ্য বলিলে ভয় হয়। আর্য্যনারী, বৈরাগ্য বলিলে তোমার ভয় হওয়া উচিত নয়। কেন না, তোমাদের দেশে আর্য্যকুলে অনেক প্রকার বৈরাগ্য দেখা গিয়াছে। তোমার দেশে বৈরাগ্য নূতন জিনিষ নয়। তোমার কাছে বৈরাগ্য নূতন নাম কখন হইতে পারে না। হিন্দুস্থানে বেদ বেদান্তে বৈরাগ্য বিচিত্র রূপ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; তোমার দেশে পুরুষ বৈরাগী, স্ত্রী বৈরাগী, যুবা বৈরাগী, বৃদ্ধ বৈরাগী অনেক হইয়াছে। পৃথিবীতে অন্য কোন স্থানে কি এত পাওয়া যায়, যেমন তোমার কুলে পাওয়া যায়? তবে আজ তুমি বৈরাগ্য শব্দ উচ্চারণে ভীত হইতে পার না। তোমার দেশের আদরের ধনকে তোমার কাছে আনিলাম, তোমার ভারতমাতার চির আদৃত ধনকে তোমার হাতে দিলাম। ইহা আমি মানি, কোন কোন বৈরাগ্যের আকার ভয়ানক। তাহাতে চিত্তাকর্ষণ হওয়া দূরে থাকুক, ভয় হয়। ভাল খাইবে না, ভাল পরিবে না, ভাল স্থানে বসিবে না, এ সব দুর্গম অন্ধকারাচ্ছন্ন বৈরাগ্যের পথ তোমাদিগকে লইতে বলিতেছি না। উদাসিনী সন্ন্যাসিনী হইবেন আর্য্যনারী? ঈশ্বর নিবারণ করুন। গৃহস্থ হইয়া বৈরাগিণী হও। আমি কি কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম দিয়া নারীহৃদয়ের মধুরতাকে কাড়িয়া লইব? আমি কি বলিব, ছিন্ন কাপড় পরিয়া বনে যাও? না। কিন্তু বৈরাগ্যের অর্থ লইতে হইবে। এমন বৈরাগ্য ভাব, যাহা সুখের; যাহাতে মন উদাস হয় না, কিন্তু সুপ্রসন্ন হয়। এরূপ বৈরাগ্য লোভের বস্তু, ঈশ্বর করুন, তাহা তোমাদের যেন হয়। এক রকম বৈরাগ্য আছে, যাহা কেবল ক্রন্দন, উপবাস, রাত্রিজাগরণ, রোগ শোকে পূর্ণ। সাবধান, আর্য্যনারী, এ পথ তুমি লইবে না। কিন্তু সেই পথ লইবে, যাহাতে হরিতে অনুরাগ জন্মিবে। এ বৈরাগ্যে তোমার প্রেমবৃদ্ধি হইবে। আপনার চেয়ে অন্যকে অধিক ভালবাসিবে। আবার সকলের চেয়ে হরিকে অধিক ভালবাসিবে। তুমি প্রেমের সন্তান, তাহা কি জান না? তোমার জাতীয় ধর্ম্ম প্রেম ভক্তি, তুমি সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসিবে, ইহাই তোমার বৈরাগ্য। তোমার কাছে আত্মপর থাকিবে না। প্রাণের প্রেম উথলিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে,

আপনাতে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে, ইহাকে বলি বৈরাগ্য। বৈরাগ্য ইহা নয় যে, আপনাকে উৎপীড়ন করি, ভস্ম মাখি; কিন্তু খুব প্রেমই বৈরাগ্য। আপনার সুখ বিস্মৃত হইয়া অন্যকে ভালবাসিবে, ঈশ্বরকে খুব ভালবাসিবে; নির্জ্জনে তাঁকে ডেকে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইবে। ইহা কি দুঃখের বৈরাগ্য, না সুখের? যাকে ভজনা করিতে অসুখী হইবে? না, সুখী হইবে? বৈরাগ্যের মুখ ম্লান নহে। সে দুঃখী সন্ন্যাসীর মুখ। বৈরাগীর কেবল প্রেম উৎসারিত হইতেছে। অন্যের দুঃখে মন কাতর হইবে, নিজের কি হইল, তাহা দেখিবার সময় পাইবে না। কেবল অন্যের কথা ভাবিবে, পরকে এত ভালবাসিবে যে, ঠিক যেন আপনার। আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে লইয়া থাকিবে, পরের মুখ দেখিয়া মনে আহ্লাদ আর ধরিবে না। আহা, কি সুখের বৈরাগ্য! আর্য্যনারী, তুমি মার কাছে ভিক্ষা চাও, যেন এ বৈরাগ্য মা তোমাকে দিয়া সুখী করেন। আবার বলি, বৈরাগ্য না লইলে চলিবে না। আপনার সুখ, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা এ সকলের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে চলিবে না। পরকে ভালবাসার কত সুখ, জান না বলিয়া এই বৈরাগ্য লইতে ভয় হয়। ভালবাসার প্রাণ মত্ত হউক, জগতের সকলকে প্রাণ দিয়া ভালবাস; আর হরিকে সকল প্রাণ দিয়া পূজা কর, করিয়া সুখী হও। ধন্য বৈরাগিণী আর্য্যনারী, কারণ যথার্থ বিমলানন্দ তাঁহারই।"

যথার্থ স্বাধীনতা

১০ই পৌষ, ১৮০২ শকে (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ) যথার্থ স্বাধীনতা বিষয়ে উপদেশ হয়; তাহার সার এইঃ—"হে আর্য্যনারী, কারাবদ্ধ হইয়া ম্লানবদনে তুমি কেন কাঁদিতেছ? তুমি স্বাধীন হও। অধীনতার শৃঙ্খল তোমার পায়ে, হাতে। তোমার চক্ষু অধীন, রসনা অধীন। তোমার দেহ মন সকলই অধীন। তুমি সকল বিষয়ে দাসী, দাসত্বশৃঙ্খলে তুমি বদ্ধ রয়েছ। ভগবানের ইচ্ছা ইহা নয়। কারামুক্ত জীবের ন্যায় স্বাধীনভাবে ভগবানের উদ্যানে বেড়াও। তোমার ভাল ইচ্ছা চরিতার্থ হয় না, সুরুচি চরিতার্থ হয় না। হে ভগ্নহৃদয় আর্য্যনারী, কেন এ ভাবে কারাগারে বসিয়া আছ? ঘরের প্রাচীরের মধ্যে কে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে? শয়তানের গর্ত্তের ভিতর কে তোমায় টানিয়া লইয়া বাঁধিয়াছে? তোমার দেহ গৃহে কেন এরূপ বদ্ধভাবে

দিন কাটাইতেছে? দেহরূপ অন্তঃপুর হইতে তুমি বাহির হও। তুমি কেন পুরুষের অধীন থাকিবে? এ দেশে স্ত্রীর অধীনতা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। ঐ দেখ, তোমার ঈশ্বর দেহপিঞ্জর হইতে তোমার জীবনপক্ষীকে স্বাধীন করিয়া দিবেন, তোমার মোহপাপশৃঙ্খল খুলিতেছেন। ঐ দেখ, তোমার স্বাধীনতার রাজ্যের আরম্ভ হইতেছে। বুঝি, এই বার তুমি প্রমুক্তভাবে মার নাম গাবে। এবার বুঝি, তোমার কপাল ফিরিল। তোমার মা তোমাকে লইয়া স্বর্গের উদ্যানে বেড়াবেন, তোমার সঙ্গে কথা বলিবেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবে। তিনি কখনও বাগান হইতে প্রেমের গোলাপ লইয়া বলিবেন, 'বৎসে, ফুল পাড়িয়া আমাকে দাও।' কখনও শত শত কোমলকণ্ঠ পক্ষীকে মা ডাকিবেন, মার আহ্বানে প্রেমপক্ষিগণ তোমার মাথার উপর বসিবে, কত সুমিষ্টগানে তোমার পরিতোষ সাধন করিবে, তোমার মুখে জননী আনন্দ-সুধা ঢালিয়া দিবেন। মার কাছে যাইতে পারাই কন্যার স্বাধীনতা। সংসারের দাসী, পাপের মোহের দাসী সেখানে যাইতে পারে না। শৃঙ্খল কাটা হোক্, তবেত তুমি মাকে দেখিবে, মার কাছে যাইবে। তোমার মা তোমাকে হাত ধরিয়া আনন্দধামে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তুমি বলিতেছ, কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা, যাবার সামর্থ্য নাই। ইচ্ছা হয়, যাই, শুনি, দেখি, বলি; কিন্তু সব বদ্ধ, কেমন করিয়া যাইব? আর্য্যনারী চলিতে পারে না। আগে স্বাধীন হও, তবেত যাইবে। আর্য্যনারী, প্রার্থনা কর, মা সব গ্রন্থি কাটিয়া দিবেন। যোগী বিনয়ী পরোপকারী সত্যবাদী হওয়া, এ সব আমোদের কারণ হইবে কিসে? 'আমরা আর্য্যনারী, আমরা কি পাঁচ জনে স্বাধীনভাবে মার উদ্যানে বেড়াইতে পারি না? পাঁচ জন পুরুষ সহায়তা না করিলে, আমরা কি অন্ধের মত পড়িয়া থাকিব? বাহির হইব; কোথায় ঈশ্বরের রাজ্য দেখিব। ইন্দ্রিয়নগর, বাসনার আলয়, এ সব আর্য্যনারীর কারাগার; বাহিরে যোগ, প্রেম, ভক্তির বাগান রহিয়াছে, যাইবার যো নাই। জননী কেমন মনোহর আনন্দ এবং শান্তির বাগান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। নিষ্ঠুর প্রাচীর আমাকে বাহিরে যাইতে দেয় না। যোগের বাগানে সাধু যোগিগণ ধ্যান করেন; যোগানন্দেয় উৎস আছে, তাহা হইতে পান করেন। আমার স্বাধীনতা কে নষ্ট করিল? আমি নিজ হস্তে চক্ষু বাঁধিয়াছি, কর্ণে পাপ পূরিয়া দিয়াছি,

স্বর্গের কথা শুনিতে পাই না। আমার সর্ব্বনাশ আমি করিয়াছি; আমাকে শয়তানের বাড়িতে বদ্ধ করিল কে? স্বামী, পিতা, ভাই, বন্ধু, পরিবার? না। কে আমাকে কয়েদি করিয়া রাখিল? ভগবানের কন্যা আমি; কার শক্তি আমাকে বন্দী করে? আমি নিজে হাত পা শৃঙ্খলে বাঁধিয়া আমাকে কারাগারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি।' কি দুঃখ, কি দুঃখ! এখন যদি ভগবান্ আসেন, তবে যদি বল, গৃহরুদ্ধা আর্য্যনারী, তাঁর কোন অধিকার নাই, তবে অন্যায় হইবে। ঐ যে তুমি যাবে বলিয়া, ঈশ্বর সুন্দর রথ লইয়া আসিয়াছেন। তুমি 'ইডেন' নামক উদ্যানে যেতে পার না বলিতেছ, আর তার চেয়ে কত সুন্দর ঐ যে স্বর্গের বাগান, তাতে যাবে না কেন? যেখানে যোগী ঋষি সাধু সাধ্বীগণ সন্ধ্যার সময় বেড়ান, তুমি সেখানে কেন বেড়াইতে যাও না? ওখানে যাইবার তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি বল, পাঁচজনের সহিত তোমাকে কথা কহিতে দেয় না; তোমার প্রাণের ভিতর পাঁচ শত সাধু আত্মা রহিয়াছেন, কেন তাঁহাদের সহিত কথা কও না? আপনার স্বাধীনতা আপনি নষ্ট করিলে। পৃথিবীর অধীনতা অধীনতা নহে, মোহের অধীন হওয়াই যথার্থ অধীন। কিন্তু এখন উঠ। মার আজ্ঞা আসিয়াছে, নববিধানের রথ আসিয়াছে। সাধুনগরে যাইবার জন্য তোমার নূতন অলঙ্কার আসিয়াছে, যা যা পরিবে, তাহা পরিয়া চল; যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। মার সঙ্গে মার হাত ধরিয়া সকল জায়গায় বেড়াও। সব দেখে শুনে লও। তিনি তোমাদের অধিকার, তোমাদের ভার তোমাদের হস্তে দিবেন, দিয়া তোমাদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী করিবেন।"

৯

একাদশ ভাদ্রোৎসব

যোগোপদেশ

এবার ভাদ্রোৎসবের ছয় দিন পূর্ব্বে (১৮০২ শকের ১লা হইতে ৬ই ভাদ্র পর্য্যন্ত) ও উৎসবের দিন (৭ই ভাদ্র, ১৮০২ শক) হইতে ষষ্ঠ দিনে * কেশবচন্দ্র যোগ-শিক্ষার্থীকে যোগোপদেশ দেন। প্রথম পাঁচ দিনের উপদেশ ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী এবং ষষ্ঠ উপদেশ ভ্রাতা দুর্গানাথ রায় উপদেশকালে লিপিবদ্ধ করেন; পরে পাঁচটি উপদেশ সংস্কৃতে অনুবাদিত হয়, ষষ্ঠ উপদেশ হারাইয়া যায়। ষষ্ঠ দিবসে কি বিষয়ে উপদেশ হয়, ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই ভাদ্র) তাহা এইরূপে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "ষষ্ঠ দিবসে চতুর্ব্বিধ যোগ নির্দ্ধারিত হয়। যথা জ্ঞানযোগ, শক্তি ইচ্ছা বা পুণ্যযোগ, প্রেমযোগ, এবং আনন্দযোগ।" শেষ ছয় দিনের উপদেশ উপদেশান্তে উপাধ্যায় প্রথমেই সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করেন, পরে উহার অনুবাদ তৎসহ সংযুক্ত করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত করেন। যোগে অধিকারী, যোগের স্থান, যোগের সময়, নির্ব্বাণ, প্রবৃত্তিযোগ, সত্য শিব সুন্দর সহ যোগ †, এই ছয়টি প্রথম ছয় দিনের এবং নিবৃত্তি, শক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, সৌন্দর্য্য, এই ছয়টি শেষ ছয় দিনের উপদেশ। প্রথম ছয় দিনের উপদেশের 'ব্রহ্মযোগোপনিষৎ', শেষ ছয় দিনের উপদেশের 'সাধ্যসাধনোপনিষৎ' নাম প্রদত্ত হয়। আমরা এই উপদেশগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপে লিপিবদ্ধ করিতে পারি।

---

* ধর্ম্মতত্ত্ব—১লা আশ্বিনের (১৮০২ শক) ২০২ ও ২০৪ পৃঃ, ১৬ই আশ্বিনের ২১৪পৃঃ, ১লা কার্ত্তিকের ২২৪—২২৬পৃঃ সহিত "Sunday Mirror"—September, 12, 1880, page 3, col. 2 পাঠ করিলে দেখা যায়, এই শেষোক্ত ছয় দিনের উপদেশ ২২শে ভাদ্র হইতে ২৭শে ভাদ্র পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। (সং)

† 'সত্য, শিব, সুন্দর সহ যোগ' এইটি হারাইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মযোগোপনিষৎ

যোগে অধিকারী (১লা ভাদ্র, ১৮০২ শক ; ১৬ই আগষ্ট, ১৮৮০ খৃঃ).

আত্মা পরমাত্মার স্বষ্ট, পরমাত্মার সন্তান। আত্মা ও পরমাত্মার যোগ আছে, সাধন দ্বারা কেবল উহা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। বুদ্ধির আলোক নির্ব্বাণ করিলে যে ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়। 'এই ক্ষুদ্রাকৃতি অত্যন্ত ছোট লৌহের ন্যায় নিরেট পদার্থ পার্থিব বলিয়', পাপে দূষিত বলিয়া কাল। এই ক্ষুদ্র পদার্থ জীবকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার উপরিভাগে স্বর্ণ। পদার্থ এক, দুই নয়। উহারই উপরিভাগে স্বর্ণ, নীচে লৌহ। স্বষ্ট আশ্রিত শক্তি কাল, যিনি স্রষ্টা, যিনি আশ্রয়, তিনি স্বর্ণ। এই লোহা ও সোণা যেখানে মিশিয়াছে, সেখানে যোগ ; কিন্তু যোগের স্থান—জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন-স্থান জীবের বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বরের শেষ কোথায়, জীবের আরম্ভ কোথায় ? জীবের নিকটে উহা 'সঙ্গোপন'। সঙ্গোপন বলিয়াই জীবাত্মা পরমাত্মাকে পৃথক্ করা যায় না ; অথচ উপরের দিকে গেলে সোণা, নীচের দিকে নামিলে লোহা, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। উপরিভাগে সোণার রং দেখিলে, উহা ব্রহ্মশক্তি ; এই শক্তির নিয়ে চলিয়া যাও, দেখিবে, পার্থিবশক্তি মানবশক্তি। উপরে ও নিম্নে শক্তিদ্বয় প্রত্যক্ষ হইল বটে, কিন্তু যোগস্থলে কাহারও সাধ্য নাই যে, এ দুই পৃথক্ করে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই যোগ কথঞ্চিৎ বুদ্ধিগম্য করিতে পারা যায়। দিবা রাত্রি পরস্পর এমনি এক অপরেতে গূঢ়ভাবে প্রবিষ্ট যে, রাত্রি শেষ হইয়া দিবারম্ভ হইল, ইহা বুঝা যায় ; কিন্তু অন্ধকার তরল হইতে হইতে আলোকের প্রবেশে কোথায় রজনীর শেষ, কোথায় দিবার আরম্ভ, সে স্থল বলিতে পারা যায় না। ইন্দ্রধনুর অনেক বর্ণ, কিন্তু বর্ণের সন্ধি কেহ জানে না। এইরূপে সকল বিষয়ের যোগ গভীর, গভীর বুদ্ধিও উহার নিকটে পরাস্ত হয়। এইরূপ পিতা ও পুত্র, জীব ও ব্রহ্ম, এ দুইকে পৃথক্ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু উভয়ের মিলনস্থল বুদ্ধির অতীত। যোগানন্দে ডুবিয়া গিয়া এই যে অভিন্ন যোগ হয়, ইহাতে অদ্বৈতবাদের ভ্রান্তি হয় ; কিন্তু এই অদ্বৈততত্ত্ব উপরে ও নিম্নে নহে, যোগস্থলে। *

---

* ৭ই ভাদ্র, ভাদ্রোৎসবে উপাধ্যায় ব্রহ্মযোগোপনিষদের 'পাত্রনিরূপণ' নামে এই প্রথম অধ্যায় সংস্কৃতে নিবদ্ধ করিয়া বঙ্গানুবাদ সহ পাঠ করেন। ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য। (সং)

যোগের স্থান

(২রা ভাদ্র, ১৮০২ শক ; ১৭ই আগষ্ট, ১৮৮০ খৃঃ)

যার নিম্নভাগে লৌহ, উপরিভাগে স্বর্ণ, যার বিচিত্র প্রকৃতি বুদ্ধির অগম্য, সেই যোগ করিবে। কে যোগ করিবে নির্ণীত হইল ; এখন কোথায় যোগ করিবে, নির্ণীত হওয়া চাই। নিম্নস্থানে যোগ হয় না, যোগের জন্য উচ্চ স্থান আবশ্যক। পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ সঙ্গে গেলে, উচ্চ স্থানে গিয়াও কোন ফল নাই। সুতরাং উচ্চ স্থানও উচ্চ নয়, নিম্ন স্থানও নিম্ন নয়। যোগের জন্য সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলেও যাইতে হয় না, উচ্চস্থানেও আরোহণ করিতে হয় না। করিতে হয় কি ? না, সংসারকে দূরে এবং ছোট মনে করিতে হয়। সমস্ত পৃথিবীকে যোগী একটী সর্ষপকণার ন্যায় দেখিবেন। যেখান হইতে পৃথিবী ধূলিকণার ন্যায় দেখায়, সেখানে যোগের আসন পাতিতে হইবে, অর্থাৎ যেখানে গেলে পৃথিবী ও তাহার বস্তুসমূহ এত হীন ও অসার হয় যে, প্রাণকে টানিতে পারে না, সেইখানে। ক্রমে পৃথিবী ও তাহার বস্তুসমূহ মন হইতে অন্তর্হিত হইল, এখন কেবল মহাকাশ, চিদাকাশ, ঘনাকাশ; চারিদিকে সাধুমণ্ডলী। এই আকাশে বসিয়া যোগসাধন করিতে হইবে। 'মহাকাশে যখন বসিলাম, সংসার খসিয়া পড়িল, বিষয়লালসা বিলুপ্ত হইল। আকাশ যেমন অসীম, আমাদিগের শক্তি বল অসীমের সঙ্গে মিশিল।'

যোগের সময়

(৩রা ভাদ্র, ১৮০২ শক ; ১৮ই আগষ্ট, ১৮৮০ খৃঃ)

যখন দিবস, তখন যোগীর রাত্রি। পৃথিবী ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ ; ঘণ্টা বাজিতেছে, বিষয়ী তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে। যোগী সে দিকে কর্ণপাত করিলেন না। যখন সূর্য্য অস্তমিত হইল, নিশীথ অন্ধকার আসিল, তখন যোগীর জাগিবার সময় হইল। যখন চক্ষু খুলিলে বিনশ্বর বস্তু দেখা যায়, তখন তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত ছিল। অন্ধকারে যখন সকল ঢাকিল, দেখিবার কিছু নাই, তখন তাঁহার আনন্দ। সংসার, পরিবার, ধন, মান, এমন কি ধর্ম্মের কীর্ত্তি দেখিলে, কি স্মরণে পড়িলে যোগ হয় না। কোন জড় বিষয় চক্ষুকে আকর্ষণ করিলে, যোগেশ্বর সে চক্ষুকে আকর্ষণ করেন না, সুতরাং ফুঁদিয়া সব নিবাইয়া দিতে হইবে। অনন্ত ঘন আকাশ, আর অন্ধকার, এই দুই আসিয়া

সমস্ত বস্তু ফেলিয়া দিল। কালোতে কাল মিশিল; লৌহ কাল, আকাশ কাল, অন্ধকার কাল। সুপ্তোত্থিত যোগী আস্তে আস্তে উঠিয়া আকাশকাননের দিকে চলিলেন। 'রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিলে, লোকে তাই দেখিল; কখন যোগ করিলে, দেখিতে পাইল না। এইরূপ কপটভাবে যোগ সাধন কর, তোমার যোগ বাড়িবে, অন্যে জানিবে কি?' 'ভগবান্ চন্দ্র অন্ধকারের ভিতর প্রকাশিত।'

নির্ব্বাণ (৪ঠা ভাদ্র, ১৮০২ শক ; ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃঃ)

উদ্দেশ্য যোগ, নির্ব্বাণ উপায়। আসক্তি, কাম, ক্রোধ, কর্ম্ম, চিন্তা, সুখ দুঃখ, মান অপমান সমুদায় নিবৃত্ত করিয়া, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সাধুতা, অসাধুতা যোগী কিছুই ভাবিতে পারিবেন না। মনের যন্ত্রগুলি নিষ্ক্রিয়, অহংপর্য্যন্ত বিলুপ্ত, ঘর একেবারে শূন্য। জলবিহীন ঘট ভাব, চিন্তাবিহীন জীব ভাব। ভাবনার ঔষধ— ভেবো না। যে আমি মনে করে, আমি যোগ সাধন করি, আমি ভাবি, অথবা ভাবি না, সে আমিকে সমূলে নিপাত করিতে হইবে। যত ক্ষণ আমি থাকে, তত ক্ষণ দেহমধ্যে নানাপ্রকার দীপমালা জ্বলে। আমির মৃত্যু হইলে, সমুদায় দীপ নিবিয়া যায়। নিশ্বাস বন্ধ করিলে যোগ হয়, ইহা ভ্রান্তি। প্রাণ নাই, নিশ্বাস ফেলে কে? যোগীর পক্ষে আত্মহত্যা পাপ নয়। যেখানে অহং বা অহঙ্কারবিনাশ, সেখানে আত্মহত্যা পুণ্য। সমুদায় সামগ্রী, সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ করিলে, বিবস্ত্র শূন্য অহং রহিল। এইটিকে এক কোপে কাটিলে, মূল অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। এক্ষণ মন সর্ব্বত্যাগী হইল, এখন সকলই পাইবে। এখন মহাদেবের সঙ্গে যোগ হইবে, কেন না যোগী যত কেন সাধু হউক না, তাঁহার সঙ্গে যোগ করিতে চাহিলে আমিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। 'পর পারে যোগ, এপারে সংসার, মধ্যে নির্ব্বাণ-সমুদ্র। ঐ যোগের আশ্চর্য্য মনোহর অট্টালিকা; এখান হইতে যাত্রার আরম্ভ। নিবৃত্তির বিস্তীর্ণ মাঠ মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে, এই নিবৃত্তির মাঠ অতিক্রম না করিলে, যোগধামে উপস্থিত হইতে পারিবে না।' আমির বিসর্জ্জন হইল, এখন যোগী যোগে কৃতকৃত্য হইবেন।

প্রবৃত্তিযোগ (৫ই ভাদ্র, ১৮০২ শক ; ২০শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃঃ)

শরীরের প্রবৃত্তি হইতে আত্মার প্রবৃত্তিতে যাওয়ার মধ্যপথ নিবৃত্তি। নিবৃত্তি পরিমিত, প্রবৃত্তি অপরিমিত। বাসনার নিবৃত্তিতে মরণ, আবার মরণ

হইতে নবজীবন। বাসনাই বন্ধন ছিল, তাহা ছিন্ন হইল, এখন আবার নূতন বন্ধন। এ বন্ধন যোগের বন্ধন। যোগের অর্থ একীভূত হওয়া। নিবৃত্তির পর প্রবৃত্তির সময় উপস্থিত। এখন ব্রহ্মের আকর্ষণ কেশাকর্ষণ করিবে। এখন সাধন নাই, যোগভোগ। তোমার ঘট খালি, ব্রহ্মস্রোত আসিয়া উহাকে পূর্ণ করিল। এখন কেবল ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মপুণ্য, ব্রহ্মানন্দ। 'তুমি এখন নূতন মানুষ। নরহরির প্রকাণ্ড যোগ। সেই যে লৌহস্বর্ণের যোগ দেখিয়াছি, এখন লৌহ কোথায়? উপরটি কেবল লৌহ, ভিতরে সোণা।' এখন সকলই ব্রহ্মের। 'আকার তোমার, নিরাকার জ্ঞানপদার্থ ঈশ্বরের।' এক্ষণে 'সমুদায় ব্রহ্মের খেলা। এ প্রবৃত্তি, এ বলবতী ইচ্ছা, ব্রহ্মেরই কামনা, ব্রহ্মেরই শক্তি। সমুদায় ব্রহ্মের দিকে তোমাকে টানিতেছে।' 'নিবৃত্তির শেষ আছে, নিবৃত্তি প্রবৃত্তির ন্যায় নহে।' 'পাপ পরিমিত, অনন্ত হয় না। অসাধু চিন্তা অসাধু রুচি, এক শত কুপ্রবৃত্তি নিবাইলে, আর কি নিবাইবে।' 'ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অপরিমিত, কেন না ইহার ঈশ্বর অপরিমিত। যোগপথে অনন্তকাল চলা যায়; দৃঢ়তর নির্ম্মলতর যোগ হয়। লক্ষগুণে নিকটতর যোগ? হাঁ। কেন না অনন্তজ্ঞান যিনি, আমার ভিতরে যত যান, আরও ভিতরে যান। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে যাই, তাঁহার গভীরতর হৃদয় আছে।' 'ব্রহ্ম কল চালাইতে লাগিলেন, পরমাত্মা বন্ধু হইলেন। দুই বন্ধু পরস্পরে সংযুক্ত হইলেন। যোগ খেলার স্থান। পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, জীবাত্মা খেলা করে পরমাত্মার ভিতরে। লৌহ সোণা এক।' 'নির্ব্বাণে শান্তি হইল, শান্তির পর আনন্দ আছে। স্বয়ং ভগবান্ অপরিমিত আনন্দ।' 'এমন অবস্থা আসে, যখন দুর্ব্বল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, পাপ করা অসম্ভব, ব্রহ্মকে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব; সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ, নারীশ্রেষ্ঠ, ভুবনমোহিনী জননীকে না দেখা অসম্ভব।'

সাধ্যসাধনোপনিষৎ

২২শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) হইতে ২৭শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর) পর্য্যন্ত যে সকল যোগের উপদেশ হয়, তাহাতে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি, অশক্তি হইতে নিবৃত্তি শক্তিতে প্রবৃত্তি, অজ্ঞান হইতে নিবৃত্তি জ্ঞানে প্রবৃত্তি, সংসার হইতে নিবৃত্তি বৈরাগ্যে প্রবৃত্তি, পাপ হইতে নিবৃত্তি পুণ্যে প্রবৃত্তি, এবং এই সকলের সৌন্দর্য্যে সম্মিলনে যোগের পূর্ণতা উপদিষ্ট

হয়। প্রতিদিনের উপদেশের যে সার উপদেশের অন্তে শ্লোকাকারে* নিবদ্ধ হইয়াছিল, আমরা তাহা (তাহার বঙ্গানুবাদ) উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ২২শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর), সোমবার—"সমুদায়কে শূন্যায়মান করিয়া যোগী নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন। এখন পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিত্য কাল ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হউন।" ২৩শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর), মঙ্গলবার—"অশক্তি ও দৌর্ব্বল্য-নিপীড়িত আমি, তুমি শক্তিস্বরূপ। পাপযুক্ত আমাতে শক্তি সংক্রামিত

---

* উপাধ্যায়কৃত সংস্কৃতে নিবদ্ধ এই শ্লোকগুলি ১৮০২ শকের ১লা ও ১৬ই আশ্বিনের এবং ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। ১৬২৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট অনুসারে উপদেশগুলির তারিখ শুদ্ধ করিয়া দেওয়া গেল; অর্থাৎ ১১ই ভাদ্র হইতে ১৬ই ভাদ্র স্থলে, ২২শে ভাদ্র হইতে ২৭শে ভাদ্র করা হইল। ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৯৭—২০২তেও এই উপদেশগুলির তারিখে ভুল রহিয়া গিয়াছে। এতদনুসারে তাহাও সংশোধন করা আবশ্যক। (সম্পাদক)

২২শে ভাদ্রের প্রার্থনার সার—

"শূন্যায়মানানি বিধায় সর্ব্বাণ্যহো নিবৃত্তিং গতবান্ স যোগী।
পরাত্মনঃ প্রেরণয়া ক্রিয়াসু ভবত্বয়ং নিত্যপ্রবর্ত্তমানঃ॥"

২৩শে ভাদ্রের প্রার্থনার সার—

"অশক্তিদৌর্ব্বল্যনিপীড়িতোঽহং ত্বং শক্তিরূপো ময়ি পাপযুক্তে।
সংক্রাময়ংস্তাং ননু শক্তিমত্তাং দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং বিধেহি॥"

২৪শে ভাদ্রের প্রার্থনার সার—

"জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানমনৌ বিবেকঃ প্রজ্ঞা সুচিন্তা চ সুবুদ্ধিরেষা।
সদ্যুক্তিরীশস্য ন মে তদৈক্যাচ্চিত্তাব এষোঽস্য মম শ্রুতস্য॥"

২৫শে ভাদ্রের প্রার্থনার সার—

"শবায়মানত্তমিমং হি দেহমধ্যাস্য ভো পাপপিশাচজুষ্টম্।
ত্যাগী বিরাগী স্বরূপে পরস্য হেতোঃ স্বযত্নো নিয়তং চরামি॥"

২৬শে ভাদ্রের প্রার্থনার সার—

"পরো বিবেকঃ প্রভবঃ প্রভাবো ন ভিন্নরূপো মনুজে বিকাশম্।
লব্ধা পরস্তেন কৃতাবতারস্তেনাহমেকত্বমুপৈমি তস্মিন্॥"

২৭শে ভাদ্রের প্রার্থনার সার—

"আনন্দনৃত্যং বিতনোতি সৈষা সৌন্দর্য্যমুগ্ধান্ স্বজনান্ সমেত্য।
তদঙ্গমধ্যাস্য নিপীয় নিত্যং স্তন্যং কৃতার্থোঽস্মি বিমুক্তবন্ধঃ॥"

করিয়া, দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ ও বুদ্ধির শক্তিমত্তা সম্পাদন কর।" ২৪শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর), বুধবার—"জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা, সুচিন্তা, সুবুদ্ধি, সদ্যুক্তি ঈশ্বরের, আমার নহে। তাঁহার সঙ্গে একতাবশতঃ আমার এই চিদ্ভাব, আমার এই শাস্ত্রত্ব *।" ২৫শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর), বৃহস্পতিবার—"পাপপিশাচসেবিত শবায়মান এই দেহোপরি উপবেশন করিয়া, আত্মসুখে ত্যাগী বিরাগী. পরের সুখের জন্য নিয়ত যত্নশীল হইয়া বিচরণ করি।" ২৬শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর), শুক্রবার—"পরমেশ্বর প্রভব (উৎপত্তিস্থান), বিবেক প্রভাব, ভিন্নরূপ নহেন। পরমেশ্বর মনুষ্যে বিবেক দ্বারা বিকাশলাভ করিয়া তাহাতে অবতীর্ণ। আমি সেই বিবেকযোগে ঈশ্বরে একত্ব লাভ করি।" ২৭শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর), শনিবার—"সৌন্দর্য্যমুগ্ধ স্বজনগণ লইয়া আনন্দময়ী আনন্দনৃত্য বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া, নিত্য স্তন্যপান করিয়া কৃতার্থ হইলাম, বন্ধনবিমুক্ত হইলাম।"

উৎসববৃত্তান্ত

উৎসবের প্রাতঃকালের (৭ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্টের) বিবরণ আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮০২ শকের ১৬ই ভাদ্রের) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:— "উৎসবে প্রাতঃকালে সকলেই আশাপূর্ণহৃদয়ে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষ, চিরহরিৎ ক্ষুদ্রতরু ও শাখাতে পরিশোভিত বেদী ও মন্দির প্রকৃতির দেবতাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল। মন্দিরের সকল দিক্ যোগোচিত গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ; সকলে যোগেশ্বরের অধিষ্ঠানের প্রতীক্ষায় উপবিষ্ট। প্রাতঃকালের উপাসনা ৮টার সময় আরম্ভ হইয়া ১টার সময় ভঙ্গ হয়। এই পাঁচ ঘণ্টার উপাসনা কাহার নিকট সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয় নাই।

আমার মা সত্য কি, না?

"উপদেশ ঈশ্বরের মাতৃত্ব লইয়া আরম্ভ হয়। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে গ্রহণ করিতে গিয়া, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ, যাহা প্রতিসপ্তাহে মন্দিরে বিবৃত

---

* "সেই বিদ্যা দ্বারা বিদ্যাসম্পন্ন হইয়া, আমি বেদ, আমি শ্রুতি, আমি দেশীয় বিদেশীয় শাস্ত্র; আমি লৌকিক বেদ, শ্রুতি বা শাস্ত্র নহি। সরস্বতীর মুখবিনিঃসৃত নিত্যকাল বহমান বেদ আমি, শ্রুতি আমি, শাস্ত্র আমি।" এই কথার সাররূপে "তাঁহার সঙ্গে একতাবশতঃ...... আমার এই শাস্ত্রত্ব" উক্ত হইয়াছে।

হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে অনেকে মনে করিয়া থাকিবেন, আচার্য্য তাঁহার মনঃকল্পিত ভাবদ্বারা উপাসকমণ্ডলীকে কল্পনাজালে কেবলই আচ্ছন্ন করিয়াছেন, এই আশঙ্কায় আচার্য্য বলিলেন, তিনি যাঁহাকে মাতা বলিয়া অর্চ্চনা করেন, যদি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাকে মাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হন, তিনি তাঁহাকে শুদ্ধ আপনার মাতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন; তথাপি যাঁহাকে তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি স্বকীয় মনঃকল্পিত বলিয়া বিদায় করিয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। যত দিন সকলে তাঁহাকে নিঃসংশয়হৃদয়ে মাতা বলিয়া গ্রহণ না করিতেছেন, তত দিন আচার্য্য তাঁহাকে নিজের মাতা বলিয়া প্রচার করিবেন। মাতা অনেক বার পরীক্ষিত হইয়াছেন, আজ পরীক্ষিত হইবার জন্য উৎসবস্থলে উপস্থিত। সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইনি যথার্থ মাতা কি না। আমাদিগের মাতা মৃত নহেন, জীবন্ত; সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে সাধকের নিকট নূতন ভাবে প্রকাশিত হয়। এই নিত্য নূতন ভাবে প্রকাশ তাঁহার এক একটি রূপ; সুতরাং তিনি এক হইয়াও অসংখ্যরূপে প্রকাশিত। তাঁহার সন্তানগণও বিভিন্ন বর্ণের। কাহার যোগের বর্ণ, কাহার ভক্তির বর্ণ, এক এক সন্তান মাতার এক এক বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। মাতা এত দিন আমাদিগের মধ্যে নিত্য নূতন রূপ প্রকাশিত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন; কিন্তু কেবল আমাদিগের পুরাতন জীর্ণ রূপ দেখিবার প্রতিজ্ঞাজন্য তাহা হইতে পারিল না। আমরা এক কল্পিত মৃত মাকে প্রতিদিন অর্চ্চনা করিয়া থাকি। আজ মৃত মাতা নহেন, জীবন্ত মাতা উৎসবে তাঁহার সন্তানগণকে লইয়া উপস্থিত। এ উৎসব যে আমরা করিতেছি, তাহা নহে, কিন্তু স্বর্গের সাধুমণ্ডলী উৎসব করিতেছেন; আমরা সৌভাগ্যক্রমে তাহাতে যোগ দিতেছি। পূর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বহু ব্যবধান ছিল, এখন সেই ব্যবধানকে মাতা স্বয়ং অপনীত করিয়াছেন। এখন আমরা যোগবলে পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে উত্থান করিয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গে বসিয়া নিত্য উৎসব করিব, তাহার পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা মাতার পাপিষ্ঠ সন্তান, পাপে কৃষ্ণবর্ণ; তাঁহারা নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং শুভ্রকায় হইলে কি হয়। মাতা উভয়বিধ সন্তান নিজ ক্রোড়ের উভয় পার্শ্বে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে কখন উপেক্ষা করিতে পারেন না। আজ মা যখন

স্বয়ং উপস্থিত, তখন তিনি আপনি প্রতিসন্তানের নিকটে দাঁড়াইয়া বলুন, 'বৎস,ধ্রুব প্রহ্লাদ ঈশা মুষা আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছে ; তোমার মা কেমন সৌন্দর্য্য ও প্রতাপে পূর্ণ, দেখ। তোমার মাতা বিদ্যাতে সরস্বতী, ধনধান্যে লক্ষ্মী। যেরূপ দেখিয়া ত্রিভুবন মোহিত হইয়াছে, সেরূপ দেখিয়া তুমি কেন মোহিত হইবে না?' মার অনুরোধে আমরা সকলে তাঁহার হাতে ধরা দি, তাঁহার সহাস্য মুখ দেখিয়া আমরা সুখী হই। যদি এক বার সেই সহাস্য মুখের মাধুর্য্য আমরা অনুভব করি, জন্মে আর তাঁহাকে আমরা ভুলিতে পারিব না; আমাদের প্রমত্ততা কোন দিন ঘুচিবে না। কোটিরূপের সাররূপ এই হাস্যমূর্ত্তি। সকলে সহাস্যবদনা মাকে দেখিয়া, বালকের মত খেলা কর। আর আমাদের মাকে বিচার ও পরীক্ষা করা হইবে না, কিন্তু চিরকাল বিশ্বস্তমনে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বিচরণ করিব।"

ধ্যানের উদ্বোধন

মাধ্যাহ্নিক উপাসনা ও ব্রহ্মযোগোপনিষদাদিপাঠের পর, কেশবচন্দ্র ধ্যানের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনে বিশেষ ভাব বিন্যস্ত আছে, এজন্য আমরা উহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—"পক্ষীর বাসা বৃক্ষের উপরে, তেমনি জীবাত্মার বাসা দেহতরুতে। পক্ষী যেমন বাসা ছাড়িল, পক্ষবিস্তার করিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল, আত্মা তেমনি এই দেহতরুকে সামান্য মনে করিয়া, আপনার যোগপক্ষ বিস্তার করিয়া, চিদাকাশে উড়িতে লাগিল। দুই পক্ষ দুই দিকে সংযুক্ত। চিদাকাশে উড়িল, পক্ষী ক্রমে ছোট হইল। যখন অনেক উপরে উঠিল, অতি সামান্য সর্ষপকণার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সেই পাখী আরো দেখিল, পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছোট হইতেছে। যে পাখীর কাছে মানুষ, রাজধানী কত বড় ছিল, পাখী যখন পৃথিবীতে ছিল, ভয়ে মরিত। ঐ এক জন প্রকাণ্ড ব্যাধ বধ করিতে আসিল, মনে করিত। যখন উপরে উঠিল, সেই মানুষকে, মহানগরীকে ক্ষুদ্র দেখিল। যখন মেঘের কাছে গেল, পৃথিবী তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর হইল। মানসপাখী যখন চিদাকাশে গেল, তাহার পক্ষেও সংসার এইরূপ। শত্রু আজ মারিবে, শত্রু আজ কটূক্তি করিবে, আজ পাপরূপ মৃত্যু আসিয়া অধিকার করিবে, ক্ষুদ্র মানসপক্ষী এ সকল ভয়ে কম্পিত। অন্ধকারে কোন ব্যাধ আসিয়া মারিবে, নিরাশ্রয় পাখীর সর্ব্বদা

এই ভয়। সংসারে বাস করিয়া সে সদা ভীত, কিন্তু যখন এক বার যোগপক্ষ অবলম্বন করিয়া উড়িল, এক এক বার ডানা উল্টাইয়া খেলা করিতে লাগিল, কত প্রকার গতি, কত প্রকার ক্রীড়া, পিঞ্জরমুক্ত পাখী কত সুখী! আর কি সংসারব্যাধ তাহাকে তাহার জালে বদ্ধ করিতে পারে? ব্রাহ্ম, যখন দেহপিঞ্জর হইতে ক্ষুদ্র বিহঙ্গ উপরে উড়িতে লাগিল, চিদাকাশে, ব্রহ্মাকাশে, আনন্দাকাশে পাখী উড়িতে লাগিল, তখন আবার খাইবার জন্য, রাত্রি কাটাইবার জন্য বাসায় আসিবে। পরে যখন বাসা ভাঙ্গিবে, মৃত্যুর পর অনন্তাকাশে উড়িবে। আজ ব্রহ্মাকাশে উড়িব, আজ ব্রহ্মাকাশে খেলা করিব। আজ এই ব্রহ্মমন্দির হইতে সমুদায় কপোতদল ছাড়িয়া দিব। সংসার, তুমি থাক, তুমি আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না। ধনবাসনা, পুত্রকামনা, সন্তানবাৎসল্য, পড়িয়া থাক। আত্মা পাখী উড়িতে লাগিল। তার পর যখন আরও উড়িবে, তখন পৃথিবী দেখা যাইবে না। তখন পাখী মহাকাশে পড়িয়া স্থির হইয়া সেই আকাশে থাকিবে। একেবারে নিবৃত্তি, প্রশান্ত নিবৃত্তি। পাখী সেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়া, গভীর নিবৃত্তি সাধন করে। ছোট পাখী উড়িতে উড়িতে ব্রহ্মহস্ত লাভ করে, ছোট ঘর ছাড়িয়া আপনার পিতার ঘরে গিয়া বসে; সেই সপ্তম স্বর্গে গিয়া, ব্রহ্মের আশ্রয় লইয়া, ব্রহ্মের সঙ্গে ক্রীড়া করে। আর সে সংসার দেখে না, সংসার চায় না, ব্রহ্মকে চায়, ব্রহ্মমুখ দর্শন করে। চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে, পাখী আনন্দে গান করে, সেই গানে ব্রহ্ম আকৃষ্ট হইয়া পাখীকে ধরেন।

"মন আমার, তুই পাখী হইয়া একবার উড় দেখি। এখন ধ্যানের সময়, পিঞ্জরমুক্ত পাখীর মত তেজে উড়িয়া যাও। ঘোর আকাশের ভিতরে গিয়া পড়। আছ, মন, এখানে? কোথায় চলিয়া গেলে, মানসপক্ষী? আর চক্ষু তোমাকে দেখিতে পায় না। গভীর ধ্যান আমাদিগকে আচ্ছন্ন করুক। যেখানে পদার্থ নাই, সেই আকাশে বসিয়া সমুদায় বাসনানিবৃত্তি করি, ঈশ্বরকে ধ্যান করি, দর্শন করি। কৃপাসিন্ধু একটিবার দর্শন দিয়া, আমাদিগের প্রতিজনের শরীর মনকে শুদ্ধ করুন।

"ক্রমে ধ্যান ঘনতর হইয়া যোগে পরিণত হইল। জীব আর ব্রহ্ম এক হওয়া যোগ। লৌহ স্বর্ণ হইতে লাগিল, দেবত্বলাভ করিতে লাগিল। মিশিল

আত্মা পরমাত্মার ভিতরে গিয়া। কত খানি আমি, কত খানি ব্রহ্ম, আর আমরা অনুভব করিতে পারি না। শক্তি, রক্ত, জ্ঞান, বুদ্ধি কত খানি আমার, কত খানি ব্রহ্মের, কিছুই নির্দ্ধারণ হয় না। সন্দেহের বিরাম হইল, যখন এক হইল। জলে তেলে প্রথমে মেশে না, পরে এক হয়। ব্রহ্মভাব আমাদের ভাব হইল। শরীর মন ব্রহ্মময়, ক্রমে গা কাঁটা দিয়া উঠিল। মন প্রাণ হরিয়া লইলেন হরি। পিতা লইলেন আপনার সন্তানকে বুকের ভিতরে। ব্রহ্মশক্তিতে জীবশক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানে জীবজ্ঞান মিশিয়া গেল। চিদ্‌ঘন আর চিত্তরত্ন এক হইল। মন, তুমি আর ব্রহ্ম কোন্ খানে? আগাগোড়া সোণা দেখিতেছি। সোণা দিয়া কে তোমাকে মুড়িল? সর্ষপকণার মত লবণ পড়িল মহাসমুদ্রে। কোথায় আমাদের লবণ, কোথায় সমুদ্রের লবণ? আর কি প্রভেদ বুঝা যায়? যাহা কিছু আমাদের, তাঁহার হইয়া গেল। জীব ব্রহ্মে মিশিতে লাগিল। এ গেল ওঁর ভিতরে। আমার ভিতরে তিনি, তাঁহার ভিতরে আমি। এই ভাবিতে ভাবিতে যোগ ঘন হইতে লাগিল। মন, এই ভাবে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ যোগানন্দ সম্ভোগ কর।"

যোগ ও তৎপরের বৃত্তান্ত ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই ভাদ্রের) এইরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন:—"সমুদায় মন্দির নিস্তব্ধ গম্ভীর। ক্রমে সায়ং সমাগত, যোগ ঘনীভূত। এই সময়ে যোগ হইতে অবতরণসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইল। যোগানুরক্ত চিত্ত কষ্টে অবতরণ করিল, সুতরাং ঘণ্টাধ্বনি ও অবতরণ যুগপৎ হইল না। যোগধ্যানে লব্ধবল হইয়া ভক্তগণ সায়ং সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনের গভীর নিনাদে, সঙ্কীর্ত্তয়িতৃগণের প্রমত্তোৎসাহে মন্দির টলমল করিতে লাগিল। ভক্তিপ্রবাহের কেমন অপ্রতিহত আবেগ এই দৃশ্যে সকলের হৃদয়ে বিলক্ষণ মুদ্রিত হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনে উচ্ছ্বসিতহৃদয় হইয়া, আচার্য্যের হৃদয় হইতে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি বিনিঃসৃত হয়।

ধ্যানান্তে সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রার্থনা

"মা, তুমি চিরকালের জন্য আমাদের হইলে; আমরা কি চিরকালের জন্য তোমার হইলাম? তোমার নামরসপান করিয়া লোকে পাগল হয়, আগে জানিতাম না। উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, উহার শিখা স্বর্গের দিকে ধাবিত হইল। অল্পবিশ্বাসীরা বুঝিতে পারিল না। এস, ভাই, দেশ দেশান্তর হইতে

এস, দেখিয়া যাও, মার প্রেমে ভক্তগণ কেমন মগ্ন হইয়াছে! এখন আর বক্তৃতার সময় নাই। এখন মার রূপ নিজে দেখিব, আর দেখাইব। শুভ সূর্য্য উদিত হইল। তোমরা নিরাকার জানিয়াও, কেন মা বলিয়া পাগল? জননী, তুমি রূপবিহীন হইয়াও রূপধারিণী। তুমি মা হইয়া প্রাণকে অধিক পাগল কর। যদি পৃথিবীতে নিরাকারের মত প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি সাকার-পূজা উঠিয়া যায়, সকলে যদি নিরাকারকে মা বলে—আমরা, মা, তোমার অঞ্চল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, অনুরোধ করি, উত্তর দিয়া এই ভগবদ্ভক্তদিগের মনোরঞ্জন কর—সে দিন কি প্রাণকুসুম শুষ্ক হইবে? আমরা এই আকাশকে মা বলিয়া ডাকিতেছি। তোমার অঙ্গ নাই জানিয়াও, তোমাকে প্রেমময়ী বলিয়া ডাকিতেছি, প্রেমে মূর্চ্ছিত হইতেছি। সাকার ভাবিব কেন? নিরাকারের বেগ যে আমরা সামলাইতে পারিতেছি না। হরি, দিন দিন বড় জোর হইতেছে। হরি, তুমি নিজে আস্ফালন কর, বলিতে পারি। দেখ্‌রে, নগর টলমল করিল। যদি নিরাকারের প্রবল বল না হয়, তবে কেন বঙ্গদেশে এমন প্রবল দৃষ্টান্ত! মা, এই সভ্যতার মধ্যে নববিধানের কি খেলা, দেখাও। এখনও কি কল্পনা স্বপ্ন লইয়া আমোদ করিতেছি? একি হরিসভা নহে? ঈশা মুষা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কেন এত শতাব্দীর পর আসিলেন? স্বর্গের দেবতার পৃথিবীতে আসিবার কথা নহে। নিরাকার হরির সঙ্গে কথা কহিতেছি। হরি, তোমাকে সাকার ভাবিব না। তোমার সুন্দর হস্ত ধরে যে, তার কপালে অপার আনন্দ, না, দুঃখ? এই আমার হরি, এই হরিসভা, বৈকুণ্ঠ, পরকাল, কল্পতরু, ভক্তিসরোবর, শান্তিসরোবর। ভক্ত সকল ইহাতে মীনরূপে খেলা করিতেছেন। এইতো সেই স্বর্গ। তোমার পাদপদ্ম আমাদের স্বর্গ, তোমার পদপ্রান্তে আমরা স্বর্গের শোভা দেখিতেছি। সমস্ত প্রাণের ভাই আজ কাছে আসিয়াছেন। এখন চক্ষু সাক্ষী—মার রূপ আছে, কি না? নয়নাঞ্জন, চক্ষুকে ভুলাইয়াছ। স্বর্গের রাণী, ভূমণ্ডলে আসিয়া যে রূপ দেখাইলে, দেখিয়া প্রাণ পড়িয়া রহিল। চিত্তচোর, তোমার সন্তানদিগের চিত্ত হরণ করিয়া লইয়া যাও। তুমি কত মোহিত কর, তাহা কি আর জানিতে বাকি আছে? দীন হইয়া মার সুন্দর মুখ দেখিলাম এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হইলাম। আর যেন কোন ভক্ত রূপের কথা বলিতে কুণ্ঠিত না হন। 'আমরা দেখেছি গোপনে,

বলিব বাজায়ে ভেরী।' সুদিন আনিয়া দেও, দেখি, পৃথিবী বড়, না, হরি বড়; যম বড়, না, হরি বড়। হরিকে পাইলে রাজার মত সুখী হয়, না, ধন পাইলে? প্রাণের বন্ধুগণ, হরি তোমাদিগকে রূপ দেখাইলেন, তোমাদিগের সঙ্গে কথা কহিলেন। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এখন মার কাছে দাঁড়াইয়াছি। মা আপনার নাম আপনি করিবেন, উন্মত্তকারিণী জননী শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে পথে যাইবেন। পৃথিবীতে হরিনামের বায়ু উড়িবে। বড় বড় সাধুগণ সংবাদ দিবার জন্য পৃথিবীতে আসিবেন, মার রাজ্য কত দূর বিস্তৃত হইল। আহা, হরি, কি আনন্দের সমাচার! নূতন যন্ত্রে নূতন আকারে মুদ্রিত। মা, স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ কর, না, এখান হইতে? মা, লক্ষ্মীশ্রী তোমার নাম। মা, তোমার অনুরাগপূর্ণ নাম দেখিলে আমাদের লজ্জা হয়। মা অত্যন্ত স্নেহময়ী, তাই আমাদিগকে তাঁহার মুখ দেখান। ঈশা মুষা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির জননী, তোমাকে প্রণাম করি।"

'জগজ্জননী ও তাঁহার সাধু সন্তানগণ'

"ঘোর বাত্যা ও ঝটিকার অন্তে যে প্রকার স্থিরতার সমাগম হয়, ব্রহ্মমন্দির পুনরায় তাদৃশ অবস্থা ধারণ করিলে, পুনরায় সায়ঙ্কালের উপাসনা আরম্ভ হয়। উপদেশ প্রাতঃকালের গভীর বাণীর তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিল। যোগ ভক্তি বৈরাগ্যের দৃষ্টান্তপ্রদর্শন জন্য, মহাত্মা সাধুগণ সময়ে সময়ে প্রেরিত হন। তাঁহারা কোথায় মাতা ও সন্তানের মিলন দেখাইলেন, আর দুর্ব্বোধ মনুষ্য মাতা ও সন্তানগণমধ্যে ঘোর অসম্মিলন উপস্থিত করিল। ঈশ্বর নিজে ঈশ্বরভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন না, তাই সন্তানের প্রয়োজন হইল; মনুষ্য তাহা না বুঝিয়া, তাঁহাদিগকে প্রেরয়িতার সিংহাসনে বসাইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে এ অসম্মিলনের অবসর নাই। ব্রাহ্মগণ মাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিয়াছেন, সন্তানের ভিতর দিয়া মাকে দেখেন নাই। তাঁহারা কোন সন্তানকে বিশেষরূপে চিনিতেন না। 'তুমি যাহা করাইবে, তাহা করিব, তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেখানে যাইব, তুমি যাঁহাদিগকে দেখাইবে, তাঁহাদিগকে দেখিব, তুমি যাঁহাদিগকে প্রীতি ও সমাদর করিতে বলিবে, তাঁহাদিগকে প্রীতি ও সমাদর করিব', এই কথা বলাতে, তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগের নিকট লইয়া গেলেন, পরিচিত করিয়া দিলেন। আপনার কোন্ কোন্ গুণ লইয়া কোন্ কোন্ সন্তানকে তিনি গঠন করিয়াছেন, তাহা

তিনি আপনি বুঝাইয়া দিলেন। তিনি এক এক সাধুকে এক এক স্বরূপের অবতাররূপে দেখাইলেন। একের গুণ অপরে নাই, সকলে স্বতন্ত্র। যাঁহারা একাধারে সমুদায় সমাবেশ করিতে চান, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহার এক এক শক্তি হইতে এক এক সাধু উৎপন্ন। যিনি যে শক্তি হইতে উৎপন্ন, তিনি সেই শক্তির পূজা করেন, এবং সেই শক্তির মহিমা মহীয়ান্ করেন। মা আপনি অনুগত সন্তানকে সেই সকল মহাত্মার ভবনে লইয়া যান, ইহাতেই সময়ে সময়ে ব্রাহ্মগণের তীর্থযাত্রা হয়। যাঁহারা যেরূপ প্রদর্শন করেন, আমরা তাঁহাদিগকে তাহারই জন্য সমাদর করিব। মার ইচ্ছা নয় যে, আমরা কোন সাধুর বিরোধী হই, এজন্য তিনি নববিধান প্রেরণ করিলেন। এখানে সকলের মিলন, সমাদর এবং সামঞ্জস্য। আমরা সাধুবিশেষের পক্ষপাতী হইতে পারি না, কাহারও অগৌরব করিতে পারি না। এক জন পথের ভিখারীও আমাদের অনাদরের পাত্র নহেন, কেন না তাহাতে মার বৈরাগ্য অনাদৃত হয়। সর্ব্ব-সম্মিলন মার ইচ্ছা, তাহাই আমাদিগের মধ্যে পূর্ণ হউক।”

১০

শারদীয়োৎসব, বিবাহের পরিণামানুষ্ঠান, ভট্ট মোক্ষমূলরের পত্র, অক্সফোর্ড মিশনের প্রতি অভ্যর্থনা

শারদীয়োৎসব

ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা ও ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৮০২ শক, সংবাদস্তম্ভে) বলিতেছেন :— "বিগত ৩রা কার্ত্তিক (১৮ই অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ), পূর্ণিমা উপলক্ষে শারদীয় উৎসব হইয়াছে। প্রাতঃকালে কমলকুটীরে বিশেষভাবে উপাসনা হয়, দুই প্রহরে চাঁদপালের ঘাটে বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া, সকল ব্রাহ্ম উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করত শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত গমন করেন। সন্ধ্যার সময় প্রত্যাগত হইয়া, পোলের নিকটস্থ বান্ধা ঘাটে প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি হয়। জাহাজ পুষ্প-পল্লব ও নানা বর্ণের পতাকামালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। স্ত্রী, পুরুষ ও বালক-বালিকায় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় একশত লোক বাষ্পীয়পোতে যাত্রা করিয়াছিলেন।" গঙ্গাতটে আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে প্রার্থনা করেন, উহা আমরা (১৮০২ শকের ১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) উদ্ধৃত করিতেছি :—"দেবি, তোমার প্রকৃতি আজ তোমার শ্রী, তোমার সৌন্দর্য্যের পূজা করিতেছে। হে সর্ব্বরাজ্যেশ্বরি দেবি, তোমার প্রকৃতির এই সহাস্য ভাব দেখিয়া, তোমার কবি ভক্তগণ ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, আজ এই প্রকৃতির শোভাযুক্ত স্থানে আসিয়া বসিলেন। যদি তোমার প্রকৃতি আপনার রূপগুণ প্রকাশ না করিত, আমরা সংসারে সংসারী হইয়া থাকিতাম। শরৎকালের শশী গঙ্গাবক্ষে আপনার রূপের ছটা প্রতিফলিত করিতেছে। আজ কি ভদ্রসন্তানেরা ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে? আজ, মা লক্ষ্মী, তোমার পাদপদ্ম প্রস্ফুটিত। যে হৃদয় প্রেমভক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, সে আজ বিষয়ের কীট হইয়া থাকিতে পারে না। কোথায় এই উৎসব হইতেছে, দেখিবার জন্য ব্রহ্মভক্তগণ আজ জাহ্নবীতীরে শারদীয় শশীর

জ্যোৎস্না ভোগ করিতেছেন। আজ চারি দিকে কেবল লক্ষ্মীর মধুর স্বর। সর্ব্বমঙ্গলে, পতিতপাবনি, চন্দ্র তোমার মুখের প্রভা প্রকাশ করিতেছে। হে চন্দ্র, তুমি গগনে থাক, কিন্তু তুমি এই পৃথিবীতে জ্যোৎস্না ঢাল। হে চন্দ্র, তোমার মা বুঝি পরমা সুন্দরী. তোমার মা বুঝি অমৃতের সাগর। তোমার মার দিকে ভক্তদিগকে টান। তোমার মা আমাদেরও মা। চাঁদের মা তোমরা দেখিলে। শরৎকালের উৎসবে যেন শরতের শশী তোমাদের মার কোমল নাম অনুরাগের সহিত গান করে। গঙ্গা, তুমি অমৃতের নদী; গঙ্গা, তুমি কত শস্য উৎপাদন কর। তোমার জল খাই, স্নান করি, তোমার দ্বারা যে ধান্য ও শস্য উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা করি। তোমার যিনি জননী, তিনি আমাদেরও জননী। ভগ্নী গঙ্গা, তোমার মা যিনি, তিনি আমাদিগের কত উপকার করেন। তুমি হিমালয় হইতে কেন আসিলে, জান? তুমি কেবল আমাদিগের শরীর রক্ষা করিতে এস নাই, তুমি গুন্ গুন্ স্বরে মার নাম করিতেছ। তোমার কোমলতা, তোমার প্রশান্ত বক্ষ দেখিয়া ব্রহ্মভক্তদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত। মনোহারিণী নদী, তুমি আজ তোমার মাকে গিয়া বল, আজ কতকগুলি হরিভক্ত গৃহ অট্টালিকা ছাড়িয়া, গরীবের মত মা মা বলিয়া ডাকিতেছে। তোমার মা বড় ভাল। চাঁদের মা মিষ্ট, গঙ্গে, তোমার মা মনোহর। গঙ্গে, বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধিকারিণি, তোমার দুই পার্শ্বে তোমার মা যেন তাঁহার ভক্তদিগকে বসাইয়া এইরূপ তাঁহার নামকীর্ত্তন করান। আমরা কি তোমার কাছে বসিবার উপযুক্ত? মহর্ষি যোগর্ষিগণ তোমার স্বরের সঙ্গে স্বর মিশাইয়া, তোমার তীরে বসিয়া ব্রহ্মনাম সাধন করিতেছেন। আমরা আজ সবান্ধবে সপরিবারে সেই অধিকার পাইলাম, ইহাই লক্ষ টাকা। তোমার বুঝি বড় সাধ, আজ আমাদের মুখে মার নাম শুনিবে? ঐ যে বলিতেছ, 'ভাই তোমাদের মধ্যে কবিত্বরস আছে, আমি মার নাম গান করি, তোমরা শুন, তোমরা মার নাম গান কর, আমি শুনি।' তাই বুঝি, আমাদিগকে আটক করিয়া রাখিলে। শান্তস্বভাব গঙ্গে, তুমি বড় প্রাণকে টান। তুমিও মহাদেবের প্রকৃতি, ঈশ্বর ভগবানের প্রকৃতি। হে করুণাময়ি, আজ সাধ মিটাও। আজ আকাশে চন্দ্র, স্থলে গঙ্গা ও সমীরণ, এই শীতল স্থানে প্রাণটা যেন জুড়াইয়া যায়। মার নামে মধু ফলে, অমৃতবর্ষণ

হয়। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া, এস, সকলে প্রাণের ভিতরে একতান এক-হৃদয় হইয়া, প্রকৃতির সঙ্গে পূজা করি। সুন্দর প্রকৃতির ভিতরে মা তুমি। কোটি কোটি প্রেমপুষ্প ফুটিল। হে মোক্ষদায়িনি, আমরা তোমার স্তব করিতেছি, গঙ্গা ও চন্দ্র তাহার সাক্ষী। লক্ষ্মীর সৌভাগ্য কৃপা করিয়া প্রকাশ কর; তোমার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিস্তার কর, ঘাটের ভিখারিগুলিকে ভিক্ষা দেও। আজ অট্টালিকার মধ্যে বসিয়া তোমাকে ডাকিতে ভাল লাগে না। আজ এই প্রকৃতির প্রশান্ত স্থানে, মা, তোমায় ডাকিতেছি। বঙ্গদেশ, এমনি করিয়া শিক্ষিত দল আসিয়া যদি মা বলিয়া ডাকে, তোমার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। মা যেন আশীর্ব্বাদ করেন, দেশস্থ ভাই ভগ্নীগণ মাতৃপূজায় যোগ দেন। মা, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের সকলের শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা, সংসার, পরিবার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী বর্ষণ কর। আজ যেমন জ্যোৎস্না নয়ন মন হরণ করিতেছে, তেমনি মা লক্ষ্মীর শ্রী যেন দেখিতে পারি, মা, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।"

বিবাহের পরিণামানুষ্ঠান

ধর্ম্মতত্ত্বে (১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০২ শক) লিখিত হইয়াছে :—"আমাদিগের আচার্য্যের কন্যার পরিণয় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহা লইয়া যে আন্দোলন হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক অসত্য, অন্যায়, বৃথা ঘৃণা নিন্দা লোকের মনকে ক্লিষ্ট ও কলুষিত করিয়াছে; কিন্তু উহার পরিণাম ঈদৃশ কল্যাণ ফল বহন করিয়াছে যে, কোন রূপেই কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। যদি এই গুরুতর আন্দোলন না হইত, তবে ব্রাহ্মসমাজ আজ যেখানে আসিয়াছে, বিংশতি বর্ষে সেখানে আসা অসম্ভব ছিল। বিনা আন্দোলনে ধর্ম্মবিধি দৃঢ়মূল হয় না, ইহা আমরা অনেক বর্ষ হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; এবার আমাদিগের পূর্ব্ব পরীক্ষিত সত্য আরো উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

"গত ৫ই কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ), বুধবার, এই পরিণয়ের পরিণামানুষ্ঠান ব্রহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটী বন্ধুবর্গসমক্ষে সম্পাদিত হয়। আত্মীয় মহিলাগণ ব্যতীত কয়েক জন হিতাকাঙ্ক্ষিণী ইউরোপিয়া মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ একটী সঙ্গীত হইলে, আচার্য্য মহাশয় বলিলেন :—'প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ উপস্থিত নরনারীর

বিবাহের সূত্রপাত হয়। সেই বিবাহ এবং তদনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তির জন্য আমরা এই মন্দিরে সমবেত হইয়াছি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং পরিচালিত করুন।'

"আচার্য্যের সম্মুখে উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, উভয়ের দক্ষিণ হস্ত শ্বেত ও রক্তবর্ণের পুষ্পমালা দ্বারা বদ্ধ হইল। উভয়ে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন :—

'আমি তোমাকে বিবাহিত পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছি। অদ্য হইতে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অসুস্থতায় মিলিত থাকিয়া তোমাকে ভালবাসিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিদেশানুসারে রক্ষা করিব ; এতদ্দ্বারা আমি অঙ্গীকার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

'আমি তোমাকে বিবাহিত স্বামিরূপে গ্রহণ করিতেছি। অদ্য হইতে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অসুস্থতায় মিলিত থাকিয়া তোমাকে ভালবাসিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র নিদেশানুসারে রক্ষা করিব ; এতদ্দ্বারা আমি অঙ্গীকার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।'

"হীরকাঙ্গুরীয়গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজা মহারাণীর অঙ্গুলীতে পরিধান করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন :—'আমার প্রতিজ্ঞার অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয় তোমাকে অর্পণ করিতেছি, এবং এতৎসহকারে আমার পার্থিব সমুদায় সম্পত্তির তোমাকে অধিকারিণী করিতেছি। পবিত্র করুণাময় ঈশ্বর ধন্য হউন।'

"আচার্য্য তখন নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিলেন :—

'করুণাময় ঈশ্বর, এই দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ কর, এবং এমন করুণা বিধান কর যে, ইঁহারা সুখে এবং বিশ্বস্ততাসহকারে পতিপত্নীরূপে তোমার সেবায় একত্র বাস করিতে পারেন। দয়াময় ঈশ্বর, বিশ্বাস, প্রেম এবং ধর্ম্ম ইঁহাদিগকে অর্পণ কর এবং ইঁহাদিগের গৃহ শান্তি ও কুশলের নিকেতন কর।'

"অনন্তর এই বিশেষ প্রার্থনা হয় :—'যে মনুষ্যকুলের জননি, শুভ বিবাহ তুমি কৃপা করিয়া সম্পূর্ণ কর। তুমি এই দুই জনকে পবিত্রতার পথে, কল্যাণের পথে নিয়ত রক্ষা কর। দুই জন ছেলেমানুষ, ইঁহারা সংসার কি, জানেন না। কিরূপে সংসার চালাইতে হয়, তুমি শিক্ষা দাও। ইঁহারা

পরস্পরকে ভালবাসিবেন বলিয়া একত্রিত হইবেন। পরস্পর মিলিত হইয়া ইঁহারা প্রজাপালন করুন। রাজার বুদ্ধি, রাণীর বুদ্ধি তোমার নিকট হইতে আসিবে। তুমি যদি বন্ধু হইয়া, পিতা হইয়া ইঁহাদের কাছে থাক, অতি বিস্তীর্ণ কুচবিহার রাজ্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে। হে প্রেমময়ি, একটী কথা শ্রবণ কর। আমার কন্যাকে তোমার প্রসাদে এত দিন লালন পালন করিলাম, তোমার প্রসাদে এই উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইঁহাদিগের যখন বিবাহের সূত্রপাত হয়, আমরা ইঁহাকে পিতৃভবনে রক্ষা করি; আজ ইনি এখানে উপস্থিত হইয়া আপন স্বামীর নিকটে যাইতেছেন। জামাতাকে বুঝাইয়া দাও, রাজাকে বুঝাইয়া দাও, আমার হাত হইতে এই কন্যাকে গ্রহণ করিলেন, ইঁহাকে ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, ইহা দ্বারা তিনি উপকৃত হইবেন। মহারাজ মহারাণীর উপকার করিবেন, মহারাণী মহারাজের উপকার করিবেন, এইরূপে উভয়ে উভয়ের কল্যাণবর্দ্ধন করিবেন। পুরুষের সাহস, দৃঢ়তা, সত্য, বিশ্বাস পতি পত্নীকে শিখাইবেন; স্ত্রীর বিনয়, লজ্জা, ভক্তি, ক্ষমা পত্নী স্বামীকে শিখাইবেন। স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়া সুখে বাস করুন, তাহা হইলে আমার মন আহ্লাদিত হইবে; আমার বন্ধুদিগের আহ্লাদ হইবে। অতএব, হে মা, এই দুইটিকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও। মঙ্গলময়ি, স্নেহময়ি, মা লক্ষ্মী, এখানে দাঁড়াও। আপন আপন সংসারমধ্যে তোমাকে দেখিব, তোমাকে মাতা বলিব, এই আশার সহিত, ভক্তি বিশ্বাসের সহিত, সকলে বার বার তোমাকে প্রণাম করি।'

"সঙ্গীতানন্তর আচার্য্য এরূপ আশীর্ব্বচন পাঠ করিলেন:—'ঈশ্বর আমাদিগকে বর্দ্ধিতবিশ্বাস এবং হৃদয়ে পূর্ণ আনন্দসহকারে বিদায় দিন।' (সকলে মিলিত হইয়া)—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

"বিবাহের সূত্রপাত হইয়া আড়াই বৎসরের অধিক কাল পরে, তৎপরিণামানুষ্ঠান হইল। এই বিবাহে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে, সূত্রপাতে আমরা আভাসে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। ঘটনা না দেখিয়া, আমরা কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হই না। পরিণয় অতি গুরুতর ব্যাপার, সমুদায় জীবনের শুভাশুভ ইহার উপরে নির্ভর করে। চরিত্রের বিশেষ পরীক্ষা ভিন্ন নরনারীর মিলিত হওয়া কল্যাণকর নহে। মিলিত হইতে গেলে এমন নিবন্ধন

প্রয়োজন, যে নিবন্ধন আর ভঙ্গ হইবে না। মিলনানন্তর 'ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ'—অতিমাত্র সত্বর ব্যক্তি ধর্ম্মেতে অবসাদগ্রস্ত হয়, এই নিয়মে বিশুদ্ধ প্রণয়-নিবন্ধনজন্য সময়াতিপাত আবশ্যক। ফলতঃ এই ঘটনাতে পূর্ব্ব পশ্চিমের পরিণয়প্রণালী সম্মিলিত হইয়া, বিবাহবিধি কিরূপে পূর্ণাবস্থায় উপস্থিত হয়, অথচ উভয়েতে যে দোষ অবস্থিতি করিতেছে, তাহা অপনীত হইতে পারে, দেখা গেল। সময়ে আমরা এই ঘটনার বিশেষ অর্থ আরো বুঝিতে সক্ষম হইব।"

মোক্ষমূলরের পত্র

ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই পৌষ, ১৮০২ শক) লিখিতেছেন :—"ব্রাহ্মগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, চারল্‌স্ বয়সীর এ নির্দ্ধারণ খণ্ডন করিয়া ভট্ট মহাশয় লিখিয়াছেন, 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, অথবা সাধারণতঃ যেমন বলা হয়, "ব্রাহ্মসমাজ অব ইণ্ডিয়া" প্রথমতঃ একেশ্বরবাদের সার্ব্বভৌমিকতার উপরে সংস্থাপিত হয় এবং সমুদায় জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সত্য সংগ্রহ করা হয়; কিন্তু ইহা স্বাভাবিক যে, বৎসর বৎসর নূতন নূতন ভাব সমুৎপন্ন হইবে, এবং অল্পবিস্তর প্রাধান্য লাভ করিবে। এই সকল ভাবের মধ্যে খ্রীষ্টকে এক জন ভবিষ্যদ্দর্শী মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করা একটি; কিন্তু ইহা কখন অভিপ্রেত হয় নাই যে, ইহাতে অন্যান্য ধর্ম্মের উপদেষ্টা ও সংস্থাপকগণকে সম্মাননা প্রদর্শন করা আর কর্ত্তব্য রহিল না। ব্রাহ্মসমাজের বাহ্যিক জীবনে উৎসব এবং সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করাতে কিছু পরিবর্ত্তন এবং আন্দোলন হয়। কিন্তু যে সকল লোক তাহাতে যোগ দিতে সম্মত নহেন, তাঁহাদিগকে উহাতে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বলপ্রকাশ হয় নাই। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষিগণের সঙ্গে সম্মিলন প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু উহা জীবিত ও মৃতগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার প্রত্যাদেশের মতও, ঈশ্বরের ইচ্ছা ভক্তিভাবে অনুসরণ করিলে আত্মাতে যে ঈশ্বরের প্রেরণা হয়, তৎস্বীকারের অতিরিক্ত নহে। হিন্দুধর্ম্মের উদার সংস্কারক কর্ত্তৃক আদেশের মত যে প্রচারিত হইয়াছে, নিঃসন্দেহ উহা অতীব বিবাদাস্পদ। কারণ ইটি অন্তর্ব্বর্ত্তী বাণী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবার অধিকারগ্রহণ, যাহার আর কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না। বিশেষতঃ উহা যখন সাংসারিক অভিজ্ঞতার বিষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হইল, তখন সমাজের প্রত্যেক সভ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে উহা অসমঞ্জস

হইয়া পড়িল, এবং অপর বিষয়াপেক্ষা উহাই তাঁহার কতকগুলি বন্ধু এবং অনুবর্ত্তীর স্বতন্ত্র হইবার কারণ হইল। ইহা আর কিছু নহে, প্রাচীন আখ্যায়িকার পুনরাবৃত্তি। একজন সংস্কারক, বিশেষতঃ ধর্ম্মসংস্কারকসম্বন্ধে আর কিছু তত কঠিন নয়, যত তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের প্রশংসাধূপে মানসিক দৃষ্টিকে অন্ধকারাবৃত হইতে না দেওয়া, এবং মেঘান্তরাল হইতে সমুত্থিত ধ্বনিকে ঈশ্বরের সত্যবাণী বলিয়া ভ্রম না করা। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, কেশবচন্দ্র সেন প্রাচীন ভবিষ্যদ্দর্শী মহাত্মাদিগের দুর্ব্বলতার সমভাগী হইয়াছেন; কিন্তু এ কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, তিনি তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও গুণেরও অধিকাংশের অধিকারী।

"রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও উন্নতি নির্দ্দেশ করা ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে যেমন শিক্ষাপ্রদ, এমন আর কিছুই নহে। প্রাচীন রক্ষণশীল আদি ব্রাহ্মসমাজ, সংস্কৃত শাখা কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, নূতন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, এমন কি বেদের অতীব অযথা অর্থকারী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্যসমাজ হইতে সমধিক শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবিতে আমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তাহাতে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক যে ধর্ম্মের আরম্ভ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক নীত হইতেছে, অসম্পূর্ণ হউক, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে যত্ন করিয়াছি। তখন কেশবচন্দ্র সেনের বিষয় যাহা বলিয়াছি, তাহার কিছুই সঙ্কোচ করিবার দেখিতেছি না। দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হয়, পরবর্ত্তী সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মস্তিষ্কের অতিরিক্ত ক্রিয়া এবং হৃদয়ের অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে। কখন কখন প্রতীত হয়, তিনি যেন বিশ্বাসের উন্মত্ততার সমীপবর্ত্তী। কিন্তু আমি তাঁহার হৃদয়াপেক্ষা স্বাস্থ্য ও মস্তকের জন্য সমধিক আশঙ্কা করি এবং আমি অতীব দুঃখিত হইব, যদি সেই সকল ব্যক্তি তাঁহার নানা ক্লেশপূর্ণ মহৎ জীবনকে আরো ক্লিষ্ট করেন, যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারকের আপদ্ বিপদ্ কঠিনতার বিষয় অভিজ্ঞ।"

ভট্ট মোক্ষমূলর আদেশবাদ সম্বন্ধে যা লিখিয়াছেন, মিরারে তাহার প্রতিবাদ

ভট্টমোক্ষমূলর আদেশবাদসম্বন্ধে যে লিখিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্মের উদার

সংস্কারক কর্ত্তৃক আদেশের মত যে প্রচারিত হইয়াছে, নিঃসন্দেহ উহা অতীব বিবাদাস্পদ। কারণ ইটি অন্তর্ব্বর্ত্তী বাণীকর্ত্তৃক পরিচালিত হইবার অধিকার-গ্রহণ, যাহার আর কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না। বিশেষতঃ উহা যখন সাংসারিক অভিজ্ঞতার বিষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত হইল, তখন সমাজের প্রত্যেক সভ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে উহা অসমঞ্জস হইয়া পড়িল এবং অপর বিষয় অপেক্ষা উহাই তাঁহার কতকগুলি বন্ধু এবং অনুবর্ত্তীর স্বতন্ত্র হইবার কারণ হইল।...... এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ, কেশবচন্দ্র সেন প্রাচীন ভবিষ্যদ্দর্শী মহাত্মাদিগের দুর্ব্বলতার সমভাগী হইয়াছেন।" এই অংশের প্রতিবাদ করিয়া মিরার লেখেন :—"সুবিজ্ঞ অধ্যাপক ইহাকে 'প্রাচীন ভবিষ্যদ্দর্শী মহাত্মাদিগের দুর্ব্বলতার সমভাগী' হওয়া মনে করেন। বাস্তবিক কথা এই যে, আদেশ বা ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিবার অধিকার এক জন ব্যক্তির অধিকার বা আজন্মস্বত্ব, ব্রাহ্মসমাজ এরূপ মত পোষণ করেন না। কেবল এক ব্রাহ্মসমাজের নেতাই স্বর্গীয় পিতার আদেশগ্রহীতা, তাহা নহে। প্রত্যেক ভক্তিমান্ আত্মা সেই বাণী শ্রবণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকের অধিকার অপর কোন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যের স্বাধীনতার সঙ্কোচ বা অবরোধ করে না। বাস্তবিক কথা এই, প্রত্যেক ভক্তিমান্ ব্যক্তি ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করেন বলিয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাবিষয়ে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া, আমাদের মনের শান্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত করে না। ব্যক্তিগত পরিত্রাণ লইয়া আদেশ উপস্থিত হয়, সুতরাং উহা সেই সেই ব্যক্তিঘটিত। যেখানে সাধারণব্যক্তিগণসম্পর্কীয় বিষয়ে আদেশ আইসে, সেখানে উহা কখন কোন দলের স্বাধীনতার বাধা জন্মায় না। নিজের পরিচালনা ও পরিত্রাণের জন্য যিনি স্বর্গ হইতে কোন সংবাদ পাইলেন, তাহা অপরের উপরে চাপাইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। ব্রাহ্মসমাজ নিরতিশয় সাবহিতভাবে প্রত্যেক সভ্যের অধিকার রক্ষা করেন; কেন না ইনি জানেন, এই মঙ্গলকর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে, সমাজমধ্যে পোপের কর্ত্তৃত্ব আসিয়া উপস্থিত হইবে। অধ্যাপক মোক্ষমূলর যদি আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পাঠ করেন, তাহা হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি জানিতে পাইবেন যে, এ আদেশের মত কোন কুসংস্কার নহে, ফলতঃ ইহাতে কোন দুর্ব্বলতাও প্রকাশ পায় না। ইহাতে কেবল এই দেখায় যে, আত্মা যখন দুঃখ বিপদে অতিমাত্রায়

উদ্বিগ্ন, তখন সে মাতার ক্রোড়ে গভীর বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কোন অবস্থায় প্রোৎসাহ ও সৎপরামর্শ-লাভের জন্য আত্মা সর্ব্বদা ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে প্রস্তুত, ইহাই ইহার অর্থ। আত্মাকে যে সেইরূপ প্রোৎসাহ ও সৎপরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, ইহাও ইহাতে বুঝায়। দুঃখ-বিপদের অবস্থায় আমাদের ঈশ্বর যদি সান্ত্বনাকর বাক্যে পথপ্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে আমরা বলি, আমাদের ঈশ্বর থাকা, না থাকা সমান হইত। দূরস্থ ঈশ্বর নিয়ম দ্বারা আমাদিগকে শাসন করিতেছেন, ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, আমরা তাঁহাদের দলস্থ নহি। আমাদের পিতা তিনি, যিনি আমাদিগকে পালন করেন; মাতা তিনি, যিনি অকল্যাণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। যদি দেখা ও শুনা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কোন একটী প্রণালী বলিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি এমন এক ব্যক্তি, যাঁহাকে দেখা ও শুনা প্রতি-জনের পক্ষে সম্ভবপর। আদেশের মত যাহা নয়, সেইভাবে উহার যথেষ্ট বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু আমরা বিবেচনা করি, সময় আসিয়াছে, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ জীবনের ঘটনা হইতে প্রমাণ করা উচিত যে, এই স্বর্গীয় দান এক ব্যক্তির আজন্মস্বত্ব নয়, কিন্তু অনেকে উহা হইতে আধ্যাত্মিক বল ও পোষণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মূল্যবান্ আজন্মস্বত্বটিকে, যার যেমন মনের মত, যেমন তেমনি করিয়া লওয়া হইতেছে; এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মের সতর্ক হওয়া উচিত। তাঁহাদের আচার্য্য যেমন দৃঢ়তা ও স্পষ্টবাক্যে আদেশপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তেমনি যদি তাঁহারাও করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের আচার্য্যের সঙ্কোচকর অবস্থা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মেরও মত কি, তাহাও এতদ্দ্বারা অনল্প পরিমাণে ব্যক্ত করিতেন। যে বিষয়ের সম্ভ্রমে তাঁহাদেরও অধিকার, সে বিষয়ের সম্ভ্রম একা আচার্য্যকে কেন তাঁহারা গ্রহণ করিতে দেন।" মিরার যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, ভট্ট মহোদয় আদেশবাদসম্বন্ধে কি প্রকার অবিচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে কেহ কোন দিন আদেশকে 'মেঘান্তরাল হইতে সমুত্থিত ধ্বনি' বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; হৃদয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরের সত্য বাণী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত আদেশ ব্রাহ্মসমাজে কোন কালে কাহারও স্বাধীনতার

যখন সঙ্কোচ করে নাই, তখন সে বিষয় তুলিয়া তুমুল আন্দোলন নিতান্ত বিধিবহির্ভূত।

অক্সফোর্ডমিশন

ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০২ শক, সংবাদস্তম্ভে) লিখিয়াছেন—"সম্প্রতি এদেশে দেশীয় ভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে নবপ্রতিষ্ঠিত অক্সফোর্ড মিশনের সভ্য কয়েক জন উৎসাহী যুবা ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। এক জন বঙ্গভাষায় প্রচার করিবার জন্য বাঙ্গলা শিক্ষা করিতে-ছেন। অপর একজন হিন্দি শিক্ষা করিতেছেন। রবিবাসরীয় মিরার ইঁহা-দিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইঁহারা আহ্লাদ-ও-কৃতজ্ঞতা-সহকারে বিনম্রভাবে সেই অভ্যর্থনার সুন্দর উত্তর দান করিয়াছেন। এক দিন তুইজন সভ্য আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কমলকুটীরে আসিয়াছিলেন। আর এক দিন তাঁহাদের এক জন আমাদের প্রচারকার্য্যালয়ে উপনীত হইয়া বাঙ্গলা ও ইংরেজী পুস্তক পত্রিকাদি ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন।" ইঁহাদিগকে যে অভ্যর্থনা করা হয়, আমরা নিম্নে তাহা অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

অক্সফোর্ড মিশনের সভ্যগণকে অভ্যর্থনা

"নবাগত অক্সফোর্ড মিশনের সভ্যগণ,

"মাননীয় শ্রদ্ধেয় খ্রীষ্টের সংবাদবাহকগণ,

"এদেশে আপনাদের প্রথমাগমনে আমরা হৃদয়ের সহিত আপনাদিগকে স্বাগত করিতেছি। আমাদিগের সুহৃৎসমুচিত অভিবাদন এবং হৃদয়ের শুভ অভিলাষ আপনারা গ্রহণ করুন। প্রভুর আবির্ভাব আপনাদের সঙ্গে থাকুক এবং আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুক। আপনাদের আগমন ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাসে একটি নূতন যুগের আরম্ভ প্রদর্শন করে। একটি নূতন প্রচারব্যাপার, নূতন প্রচারকার্য্যের পন্থা, হইতে পারে, যে দেশে কার্য্য করিবার জন্য আপনারা আহূত হইয়াছেন, সে দেশের উপযোগী নূতন চিন্তার মূল ও নূতন ভাবের আপনারা প্রতিনিধি। স্বদেশ এবং আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের দেশকে আপনাদের গৃহ এবং খ্রীষ্টের দিকে আত্মাগুলিকে উন্মুখ করিবার জন্য আপনারা আসিয়াছেন। প্রাচীন পথে চলা আমাদের অভিপ্রেত নয়, আপনাদের অভিপ্রায় ও কার্য্যমূল প্রাচীন রেখাপাতের মধ্যে

বদ্ধ থাকিবে না। যে চিন্তা ও কার্য্যের ক্ষেত্রে আপনারা প্রবেশ করিতেছেন, উহা সম্পূর্ণ নূতন। নব দৃশ্য ও নব ক্ষেত্রমধ্যে নব যুদ্ধাস্ত্র লইয়া আপনারা খ্রীষ্টের অধীনে সংগ্রাম করিবেন এবং তাঁহার জন্য নব জয়চিহ্ন অর্জ্জন করিবেন, যে জয়চিহ্নের অভিমান কেরি, মার্সমান এবং ডফ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না। এদেশে অর্দ্ধশতাব্দী প্রচারকার্য্যে পরিশ্রমানন্তর ইংলণ্ড এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসমাজকে ঘৃণা করিয়া, তাহার প্রাচীন শ্রুতিপরম্পরাকে তুচ্ছ ও অস্বীকার করিয়া, ইহার লোকসকলকে একেবারে পতিত ও ভ্রষ্টজ্ঞানে অধঃকরণ করিয়া, তাহাদের প্রকৃত চিত্তপরিবর্ত্তনকার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ড যদি কেবল কতকগুলি ধর্ম্মান্তরগ্রাহী লোক সংগ্রহ করিতে না চাহিয়া, ভারতের হৃদয়কে খ্রীষ্টের ভাবে ভাবুক করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে এই বৃহৎ প্রাচীন দেশ, ইহার ভাষা ও সাহিত্য, ইহার সহজ জ্ঞান ও শ্রুতিপরম্পরা, ইহার জাতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞান ও নীতিকে সম্মান করিতে হইবে। আমরা আর এক দিনের লোক নহি। আমাদিগের দেশে এমন সকল অতি উচ্চ শ্রেণীর সত্য ও দৃষ্টান্ত আছে, যাহার জন্য যে কোন জাতি অভিমান করিতে পারে। আমাদের ধমনীতে যে মহত্তর আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সেই আর্য্যশোণিত আমাদিগকে সম্যক্ প্রকারে বিজাতীয় করিয়া ফেলিবার যত্ন প্রতিরুদ্ধ করিবে। এজন্য আশা করা যাইতে পারে যে, আপনারা হিন্দুধর্ম্ম ও চরিত্রের জাতীয় মূল বিপরিবর্ত্তিত করিবার যত্ন হইতে অতি সাবধানে নিবৃত্ত থাকিবেন এবং কেবল খ্রীষ্টের স্বর্গীয় জীবন হিন্দুসমাজে সংক্রামিত করিবার জন্য যত্ন করিবেন। আমাদের জাতির যাহা কিছু ভাল ও শুদ্ধ, তাহা রক্ষা করুন, যাহা কিছু মন্দ ও অপবিত্র, তাহা বিনাশ করুন, এবং খ্রীষ্টের শুভ সংবাদের সম্পদ্ আমাদিগকে দিন। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ, ভারত আপনাদিগকে এই সদুপদেশ দিতেছেন যে, আপনারা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম নহে, কিন্তু কেবল ক্রুশে নিহত খ্রীষ্টকে প্রচার করুন। আপনাদিগের প্রাচীন ধর্ম্মমত, মৃত ধর্ম্মসূত্র, সাম্প্রদায়িক বিরোধরূপ অস্থিখণ্ড না দিয়া, আমাদিগকে পবিত্র, নিত্য নব শুদ্ধিকর, জগতের পরিত্রাণার্থ প্রদত্ত, রক্তাক্তকলেবর খ্রীষ্টের শোণিত দিন। পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্ম্মের বিবিধ বিরোধী মণ্ডলী এবং অশেষ বিভাগ ও সম্প্রদায় যেন আমাদিগের মধ্যে পুনরুৎপাদন করা না হয়। কিন্তু

খ্রীষ্ট আপনার জীবনে যে বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও প্রেমের একতা প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই আমাদিগকে আপনারা দিন। আমরা বহুবিধ খ্রীষ্ট চাই না, আমরা তাঁহাকে চাই, যিনি ঈশ্বরের এবং যাঁহাতে দেবনন্দনত্ব অভিব্যক্ত। আমরা খ্রীষ্টের শত্রু নই। আপনাদের চরণতলে বসিয়া তাঁহার বিষয়ে আমরা আরও অধিক জানিতে ব্যাকুল এবং তিনি যেমন তাঁহার পিতা এবং আমাদের পিতার সহিত এক, তেমনি তাঁহার সহিত আমরা এক হইতে অভিলাষী। অল্প দিন হইল, ভারতের চিত্ত খ্রীষ্টের দিকে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে এবং এটি সময়ের আহ্লাদকর চিহ্ন। ঈশার ভৃত্যগণ, আর বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যদি আপনারা আসিতেন, তাহা হইলে পরোক্ষ ঈশ্বরবাদী এবং আপনাদের মহত্তম প্রভুর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত বহুবিধ খ্রীষ্টবিরোধিগণকে আপনারা দেখিতে পাইতেন। সহস্র সহস্র শিক্ষিত যুবার নিকটে তাঁহার নাম নিরতিশয় ঘৃণার্হ ছিল। এখন সে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন এখানে কয় জন, সেখানে কয় জন ভারতের পুত্র ও কন্যাগণকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা তাঁহার মধুর নাম ভালবাসেন ও সম্ভ্রম করেন। আমাদের ব্রহ্মবিজ্ঞানঘটিত প্রভেদ যত কেন অধিক না হউক, আপনারা যাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে আনন্দিত, আমরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, ইহা আমরা অবশ্য বলিব। আমরা আপনাদের মণ্ডলীর লোক নই। অনেক মত আছে, হইতে পারে, যাহাতে আপনাদের সঙ্গে মিল নাই। এজন্য আপনাদের মণ্ডলী বা প্রচারকার্য্যের সহিত আমাদিগকে যেন এক করা না হয়। এরূপ হইলেও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মতে না হউক, খ্রীষ্টজীবনের একতায় সহযোগিত্ব সম্ভব। আপনাদের মত আপনারা প্রচার করুন, কিন্তু যিনি বলিয়াছিলেন, 'যাহারা আমাদের প্রতিকূল নয়, তাহারা আমাদের পক্ষে' তাঁহার প্রেম ও সহানুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। আমাদের প্রীতি গ্রহণ করুন এবং আপনাদের প্রীতি দান করুন এবং আমাদের উভয়ের সমান শত্রু অবিশ্বাস, কুসংস্কার, জড়বাদ, সাংসারিকতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দুর্গ বিনাশ করিবার জন্য, যত দূর সম্ভব, আমরা একত্র কার্য্য করি। প্রায় পঁচিশ বৎসর আমরা অনাড়ম্বরে বিনীতভাবে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের মনে খ্রীষ্টের প্রতি প্রীতি উদ্দীপনবিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়াছি এবং ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের যত্ন অধিক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছে। আপনারা

দেখিতে পাইবেন এবং দেখিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, হিন্দুহৃদয়ের গভীরতমদেশে খ্রীষ্টের ভাব কার্য্য করিতেছে এবং অল্পে অল্পে সমুদায় হিন্দুসমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। আমরা আপনাদিগকে শিক্ষা দিব, এ অভিমান রাখি না। এ কথাগুলি সৎপরামর্শের কথা বলিয়া অহঙ্কারের সহিত আপনাদিগকে বলিতেছি না। এ সকল কথা খ্রীষ্টের প্রতি প্রীতিবশতঃ, আপনাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের ভ্রাতৃপ্রণয় ও প্রোৎসাহদানের কথা। আপনারা খ্রীষ্টান, আমরা খ্রীষ্টান নহি; তথাপি খ্রীষ্টেতে আমরা সকলে আমাদের সকলের পিতা সত্য ঈশ্বরের সন্তান। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ, প্রার্থনা করুন, কার্য্য করুন, সংগ্রাম করুন, পরিশ্রম করুন, যে পূর্ণ সময়ে ভারতে আমাদিগের পিতার রাজ্য সংস্থাপিত হইতে পারে।

আপনাদের

নববিধানের ব্রাহ্মগণ।"

এই পত্রে ও পত্রোত্তরে খ্রীষ্টানগণের অসন্তুষ্টিসত্ত্বেও অক্সফোর্ড সভ্যগণের কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব

অক্সফোর্ড মিশনের সভ্যগণ ইহার যে উত্তর দেন, তাহাতে এবং এই পত্রে এদেশের খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হন। এক জন পত্রিকা-সম্পাদক এই পত্রিকার এইরূপ মর্ম্মাবধারণ করেন—"পত্রিকার আগাগোড়া এই দেখায় যে, ব্রাহ্মেরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করার অর্থ এই বুঝেন যে, চৈতন্য, মোহম্মদ ও মুষার সঙ্গে এক হইয়া, বাবু কেশবচন্দ্র সেনের গর্ব্ববর্দ্ধনে খ্রী[illegible] ইচ্ছুক; অন্য কথায়—এই সকল প্রসিদ্ধ উপদেষ্টৃগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, অগ্রসর ব্রাহ্মগণের তিনি পুষ্টিপোষক হইবেন।" আর এক জন সম্পাদক অক্সফোর্ড মিশনকে এইরূপ পত্র লিখেন :—"আমি আপনাদিগকে সর্ব্বশেষে এই পরামর্শ দিতেছি— ব্রাহ্মগণের সঙ্গে আপনারা ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ হইবেন না। আপনারা কোন কোন লোকের মুখে শুনিবেন, হিন্দুসমাজের অন্যান্য লোকের অপেক্ষা ব্রাহ্মগণ স্বর্গরাজ্যের নিকটবর্ত্তী। আপনারা শীঘ্রই দেখিবেন যে, এ কথা ঠিক নয়। ঘোর পৌত্তলিকাপেক্ষাও তাহারা স্বর্গরাজ্য হইতে দূরে।······তাহারা আপনাদিগকে বলিবে যে, তাহারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে এবং সম্ভ্রম করে; তাহাদের একথায় আপনারা বিশ্বাস করিবেন না। তাহারা

খ্রীষ্টানগণের শব্দ ব্যবহার করে, কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করেন, সে ভাবে নহে।…… তাহারা 'খ্রীষ্টের দেবজীবন' 'খ্রীষ্টের শুভসংবাদের সম্পদ্' 'পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য শোণিতসিক্ত খ্রীষ্টের পবিত্র শোণিত' 'খ্রীষ্ট, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট' এই সকল বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ করিবে। এ সকল কথা তাহাদের মুখের কথামাত্র। এ সকল কথার সঙ্গে কোন ভাবের যোগ নাই, অন্ততঃ খ্রীষ্টানেরা যে ভাব যোগ করেন, সে ভাব নাই। আপনাদের সঙ্গে ইহারা সহযোগী হইতে অভিলাষ জানাইবে, এবং আপনাদিগকে বলিবে, যদিও মতে একতা না হউক, খ্রীষ্টের জীবনের একতায় সহযোগিত্ব সম্ভব, যেন যাহারা খ্রীষ্টকে কেবল মানুষ মনে করে, তাহারা খ্রীষ্টজীবন লাভ করে।" সুখের বিষয় এই যে, অজস্র খ্রীষ্টানগণের ঈদৃশ বিরুদ্ধ-ভাবসত্ত্বেও অক্সফোর্ড মিশনের সভ্যগণ বন্ধুভাবে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া খ্রীষ্টবিষয়ে আলোচনা করিতেন, এবং বিমুগ্ধ হইতেন। কখন কখন প্রায় দ্বিপ্রহর রজনী এই আলোচনায় অতিবাহিত হইত। কোন কোন বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইলেও, উহা এমনি সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইত যে, সহসা কোন উত্তর দিতে তাঁহারা সহস করিতেন না; তদ্বিষয়ে পুনরায় আলাপ হইবে, এই বলিয়া তাঁহারা গাত্রোত্থান করিতেন।

১১

একপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক

গত বর্ষে সাংবৎসরিক উৎসবে নববিধানের জন্ম ঘোষিত হইয়াছে। সমগ্র বর্ষ যে প্রভূত বলের সহিত নববিধানের কার্য্য চলিয়াছে, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। উৎসবের পর মহাজনগণের সহিত সমাগম প্রবর্ত্তিত হয়। সংবৎসর কাল তাঁহাদিগের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিয়া, এবার ১৮০২ শকের ১৮ই পৌষ (১৮৮১ খৃঃ, ১লা জানুয়ারী) হইতে দ্বাদশদিন ব্যাপিয়া বিশেষ সাধন হয়। এই দ্বাদশ দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১লা মাঘ, ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) আমরা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

প্রাস্তুতিক সাধন

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ

প্রথম দিনে (১৮ই পৌষ, ১৮০২ শক; ১লা জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ; ব্রহ্মমন্দির) মহাত্মা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চিন্তানুধ্যানাদির বিষয় ছিলেন। আরম্ভেই কেশবচন্দ্র বলেন, নববিধানের ঈশ্বরের আদেশ এই, আমরা কোন মহাত্মাকে বিচার করিব না, বিচারের ভার তাঁহার হস্তে। আমরা কেবল তাঁহা-দিগের নিকট যাহা গ্রহণীয়, গ্রহণ করিব, গ্রহণ করিয়া তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইব। যেখানে তাঁহাদিগের মতের সহিত আমাদিগের ঐক্য হয় না, সেখানে আমরা তাহা লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইব না; কিন্তু যে ভূমিতে একতা আছে, সেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত একত্ব সাধন করিব। মহাত্মা রাজা রামমোহন আমাদের ধর্ম্মপিতামহ, তাঁহার নিকট হইতে আমরা ব্রাহ্মসমাজরূপ একটী বিস্তীর্ণ জমীদারী পাইয়াছি। 'তাঁহার স্তবস্তুতিতে বিদ্যাবুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এই জন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি।' তাঁহার পরে আমাদের ধর্ম্মপিতা 'বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ঋষি আত্মা' দেবেন্দ্রনাথের আগমন হইল। তাঁহার 'ঋষিভাব, যোগভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবে' আমরা তাঁহার সঙ্গে নূতন ভাবে সংযুক্ত। পিতামহ হইতে যে রাজ্য আমরা

পাইলাম, তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন, একটি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসকমণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। ইনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে অমৃতময় সত্যের উত্থাপন করিলেন, হিন্দু আচার ব্যবহার হইতে উদ্ধার করিয়া একটি সংস্কৃত হিন্দুসমাজ গঠিত হইল। পিতা ও পিতামহ কেবলই বলিতেছেন, 'লও প্রাচীন শাস্ত্র, আর্য্যোচিত কার্য্য তোমরা সর্ব্বদা কর, আমরা তোমাদিগের সহায়তা করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত।' ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া আমরা ইহাদিগের দুই জনের চরণে মস্তক নত করিব। 'নববিধান আমাদিগকে সমুদায় উপকারী বন্ধুদিগের নিকটে প্রণত করিয়াছেন। নববিধানের আজ্ঞাতে সাধুনিন্দা হইতে বিরত থাকিব। আর্য্যপুত্র এই দুই ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মোপাসককে কৃতজ্ঞতাফুলের মালাতে হৃদয়ে জড়াইয়া রাখিয়া দিব। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে ইহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দিন।'

নববিধান

১৯শে পৌষ (২রা জানুয়ারী, রবিবার, ব্রহ্মমন্দির), নববিধানের প্রতি সম্মাননা প্রকাশ করা হয়। পিতামহ ব্রহ্মজ্ঞান, পিতা ব্রহ্মানুরাগের পথ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনায় জীবন নিয়োগ করেন। ইহাদের সাহায্যে হিন্দুসমাজ হিন্দু থাকিয়া, যত দূর উন্নত হইতে পারে, তাহা হইয়াছে। ইহারা হিন্দুসমাজকে এমন উন্নত স্থানে আনয়ন করিলেন যে, ইহা আর সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারিল না, সমুদায় পৃথিবীর সঙ্গে উহার একতা উপস্থিত হইল। 'গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান; হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরিবর্ত্তে এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল!' হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন, বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ ললিতবিস্তর প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র মিশিল। নববিধানের বেদের অন্ত নাই, কেন না সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন, সমুদায় বিধানের সঙ্গে ইনি সংযুক্ত। ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম্ম একীভূত। সকল বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। যোগাদি ধর্ম্মের সমুদায় অঙ্গকে ইনি আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল প্রকার সাধনের প্রতি ইনি অনুরাগী। জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য, সমুদায় ইহার রাজ্যের অন্তর্গত। 'নববিধান বিজ্ঞানের

একপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক

গত বর্ষে সাংবৎসরিক উৎসবে নববিধানের জন্ম ঘোষিত হইয়াছে। সমগ্র বর্ষ যে প্রভূত বলের সহিত নববিধানের কার্য্য চলিয়াছে, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। উৎসবের পর মহাজনগণের সহিত সমাগম প্রবর্ত্তিত হয়। সংবৎসর কাল তাঁহাদিগের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিয়া, এবার ১৮০২ শকের ১৮ই পৌষ (১৮৮১ খৃঃ, ১লা জানুয়ারী) হইতে দ্বাদশদিন ব্যাপিয়া বিশেষ সাধন হয়। এই দ্বাদশ দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১লা মাঘ, ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) আমরা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

প্রাস্তুতিক সাধন

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ

প্রথম দিনে (১৮ই পৌষ, ১৮০২ শক; ১লা জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ; ব্রহ্মমন্দির) মহাত্মা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চিন্তানুধ্যানাদির বিষয় ছিলেন। আরম্ভেই কেশবচন্দ্র বলেন, নববিধানের ঈশ্বরের আদেশ এই, আমরা কোন মহাত্মাকে বিচার করিব না, বিচারের ভার তাঁহার হস্তে। আমরা কেবল তাঁহা-দিগের নিকট যাহা গ্রহণীয়, গ্রহণ করিব, গ্রহণ করিয়া তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইব। যেখানে তাঁহাদিগের মতের সহিত আমাদিগের ঐক্য হয় না, সেখানে আমরা তাহা লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইব না; কিন্তু যে ভূমিতে একতা আছে, সেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত একত্ব সাধন করিব। মহাত্মা রাজা রামমোহন আমাদের ধর্ম্মপিতামহ, তাঁহার নিকট হইতে আমরা ব্রাহ্মসমাজরূপ একটী বিস্তীর্ণ জমীদারী পাইয়াছি। 'তাঁহার স্তবস্তুতিতে বিদ্যাবুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এই জন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি।' তাঁহার পরে আমাদের ধর্ম্মপিতা 'বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ঋষি আত্মা' দেবেন্দ্রনাথের আগমন হইল। তাঁহার 'ঋষিভাব, যোগভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবে' আমরা তাঁহার সঙ্গে নূতন ভাবে সংযুক্ত। পিতামহ হইতে যে রাজ্য আমরা

পাইলাম, তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন, একটি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসকমণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। ইনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে অমৃতময় সত্যের উত্থাপন করিলেন, হিন্দু আচার ব্যবহার হইতে উদ্ধার করিয়া একটি সংস্কৃত হিন্দুসমাজ গঠিত হইল। পিতা ও পিতামহ কেবলই বলিতেছেন, 'লও প্রাচীন শাস্ত্র, আর্য্যোচিত কার্য্য তোমরা সর্ব্বদা কর, আমরা তোমাদিগের সহায়তা করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত।' ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া আমরা ইহাদিগের দুই জনের চরণে মস্তক নত করিব। 'নববিধান আমাদিগকে সমুদায় উপকারী বন্ধুদিগের নিকটে প্রণত করিয়াছেন। নব-বিধানের আজ্ঞাতে সাধুনিন্দা হইতে বিরত থাকিব। আর্য্যপুত্র এই দুই ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মোপাসককে কৃতজ্ঞতাফুলের মালাতে হৃদয়ে জড়াইয়া রাখিয়া দিব। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে ইহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দিন।'

নববিধান

১৯শে পৌষ (২রা জানুয়ারী, রবিবার, ব্রহ্মমন্দির), নববিধানের প্রতি সম্মাননা প্রকাশ করা হয়। পিতামহ ব্রহ্মজ্ঞান, পিতা ব্রহ্মানুরাগের পথ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনায় জীবন নিয়োগ করেন। ইহাদের সাহায্যে হিন্দুসমাজ হিন্দু থাকিয়া, যত দূর উন্নত হইতে পারে, তাহা হইয়াছে। ইহারা হিন্দুসমাজকে এমন উন্নত স্থানে আনয়ন করিলেন যে, ইহা আর সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারিল না, সমুদায় পৃথিবীর সঙ্গে উহার একতা উপস্থিত হইল। 'গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান; হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরিবর্ত্তে এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল!' হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন, বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ ললিতবিস্তর প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র মিশিল। নববিধানের বেদের অন্ত নাই, কেন না সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন, সমুদায় বিধানের সঙ্গে ইনি সংযুক্ত। ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমস্ত ধর্ম্ম একীভূত। সকল বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। যোগাদি ধর্ম্মের সমুদায় অঙ্গকে ইনি আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল প্রকার সাধনের প্রতি ইনি অনুরাগী। জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য, সমুদায় ইহার রাজ্যের অন্তর্গত। 'নববিধান বিজ্ঞানের

ধর্ম্ম, ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসার শাস্ত্রে পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিবেন। ইনি যথাসময়ে আসিয়াছেন, ইঁহার আগমনে পৃথিবীর আশা ও আনন্দ হইয়াছে। জয় নববিধানের জয়।' (উপদেশটী বিস্তৃতভাবে 'সেবকের নিবেদন' ৩য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।)

মাতৃভূমি

২০শে পৌষ (৩রা জানুয়ারী, কমলকুটীর), মাতৃভূমির প্রতি সম্ভ্রম-প্রকাশ। ভারত সহজে সুন্দর; তাহার সঙ্গে আবার বিধানের যোগ হইল, ইহাতে উহা আরও সুন্দর হইয়াছে। ভারতের নদ নদী পর্ব্বত পাহাড়ের সঙ্গে অন্য দেশের নদ নদী পর্ব্বত পাহাড়ের তুলনা হয় না। এদেশ প্রকাণ্ড দেশ, ইহার তিন দিকে সমুদ্র, ইহাতে কত জাতি, কত লোক, কত ভাষা, কত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার, কত প্রভেদ, কত অগণ্য বিচিত্রতা। এখানে নীচে গরম, পাহাড়ে উঠিলে ঠাণ্ডা। ইহার এক দিকে সমুদ্রের বাতাস, অন্য দিকে মরুভূমির প্রচণ্ড বায়ু। এদেশে কত প্রাচীন গ্রন্থ, কত প্রাচীন ঋষি মহর্ষিগণ। সেকালে এদেশে উচ্চ সাধন ছিল, সভ্যতা ছিল, গভীর ধর্ম্ম ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, গৃহধর্ম্ম-পরিবারের নিয়ম ব্যবস্থা ছিল। যত সাহিত্য, যত বিদ্যা, যত মহাজন সমুদায় এদেশের গৌরবস্বরূপ। এদেশ হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য অপর দেশে বিস্তৃত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব ভাবিলে মন মহৎ হয়, জীবন সমৃদ্ধ হয়। আমরা ঋষি যোগী বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, সংসারকে গভীর, নির্ম্মল ও শান্তির আলয় করিব। আমাদের মাতৃভূমিকে ঈশ্বর বিশেষ করুণায় ভূষিত করিয়াছেন, ইহাতে ভারতের কত গৌরব, কত মহিমা, পৃথিবী বুঝিতে পারিল না। আমরা মাতৃভূমির নিকটে ঋণী, সে ঋণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে যেন আমরা পরিশোধ করিতে পারি। 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষিগণকে নমস্কার করি, পিতা পিতামহাদির ধর্ম্মশাস্ত্র মস্তকে গ্রহণ করি।' ভারতের গ্রন্থ, ভারতের জীবন, ভারতের ধর্ম্মভাব, ভারতের হিন্দুজাতি, কাহারও প্রতি আমরা অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না। ভারতের উপযুক্ত হইয়া, ভারতের কল্যাণবর্দ্ধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া, যেন আমরা কৃতার্থ হই।

গৃহ

২১শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী, কমলকুটীর), গৃহের প্রতি সম্ভ্রমপ্রকাশ। ঈশ্বর পর্ব্বতে যোগেশ্বর, ভবসমুদ্রে কাণ্ডারী, ইতিহাসে বিধাতা, সংসারে মা লক্ষ্মী। সংসারের ছবি মানুষ আঁকিতে পারে না। মা লক্ষ্মী নিজের সংসার দেখাইবেন বলিয়া, সংসার গঠন করিয়াছেন। এখানে বিশুদ্ধ স্নেহ, বিশুদ্ধ প্রেম। দড়ী নাই, অথচ সকলে বাঁধা। এখানে সকলই মধুর। পুত্রকন্যাগুলি যেন দেবপুত্র দেবকন্যা, যেন আকাশের শশধর। বাড়ী নয়, এক এক খানি ছোট বৈকুণ্ঠ। ঈশা মুষা যেমন প্রেরিত, এখানে তেমনি পিতামাতা স্ত্রী সন্তানাদি প্রেরিত। যখন ইহারা প্রেরিত জানিতে পাই, তখন সংসারে থাকিতে সাহস হয়। মা বাবা বলিয়া ডাকিতে গিয়া ভাবুকের নিকট লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা হয়। বাড়ীর চৌকাঠের ভিতর মাকে দেখা যায়। বাড়ীর ভূমি, বাড়ীর ছেলে, বাড়ীর মেয়ে, ইহাদিগকে ছোঁবামাত্র স্বর্গ স্পর্শ করিলাম, মনে হয়। যদি ঘর না থাকে, বাড়ী না থাকে, স্ত্রীপুত্র পরিবার না থাকে, রাত্রিতে মাথা রাখিবার স্থান থাকে না, জরা-শোক-বার্দ্ধক্যে মুখপানে তাকাই-বার কেহ থাকে না। এমন সুখের বাড়ী, সুখের সংসার যেন পুণ্যের কারণ হয়, সংসারাসক্তিদৈত্যকে বিদায় করিয়া দেয়। প্রতিজন নিজ নিজ বাড়ী স্পর্শ করিয়া যেন পবিত্র হন, এই অভিলাষ।

শিশু

২২শে পৌষ (৫ই জানুয়ারী, কমলকুটীর), শিশুগণের প্রতি গুরুজ্ঞানে সম্ভ্রমপ্রকাশ। শিশু যোগতনয়, ভক্তিতনয়, বিবেকতনয়, বৈরাগ্যতনয়। শিশুর মত এমন ভক্ত, এমন যোগী, এমন বৈরাগী কে আছে ? সে জন্মিয়াছে সন্ন্যাসী হইয়া, না পরে সে কাপড়, না পরে আর কিছু। শিশুর বৈরাগ্য কঠোর নয়, উহার কিছুরই প্রতি আসক্তি নাই। ও খেলাইতেছে ; অথচ কেমন প্রশান্ত. কেমন প্রফুল্ল, কেমন সদানন্দ। ক্ষুদ্র শিশু রিপু কি, তা জানে না ; সহস্র প্রলোভনের মধ্যে বসিয়া আছে, কোন কামনা নাই। তার পুতুল ভাল লেগেছে, কিন্তু তাতে আসক্তি নাই। সে মার পানে তাকায়, আর হাসে, কি মনোহর দৃশ্য ! ঈশা বলিয়াছিলেন, ইহাদেরই মত স্বর্গ। প্রার্থনা এই, আমরা যেন বালকের মত হই। কে কি রকমে ঠকাইতেছে. ছেলে বুঝিতে

পারে না। যেন আমরা কপট পুরোহিতের মত না হই। বৃদ্ধের কুটিল ভাব গিয়া, বালক বালিকার সরলভাব পাইয়া, আমরা যেন শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি।

ভৃত্য

২৩শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী, কমলকুটীর), ভৃত্যগণের প্রতি সম্ভ্রমপ্রকাশ। ধন্য দাস দাসী, কেন না দাস দাসী হইতে গিয়া তাহাদিগকে গরিব হইতে হয়, সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়, সকল অভিমান ছাড়িয়া দিয়া মাটীর মত হইতে হয়। আমরা বাড়ীর সকলকে ভালবাসি, আর চাকর চাকরাণীকে হীন নীচ মনে করি। আমরা যেন রাজা, চাকর যেন নীচ শ্রেণীর জীব। আমরা তবে চাকর নই? আমরা যদি সমস্ত মনুষ্যসন্তানের চাকরী না করি, তবে চাকর নই। যে সেবা করে, সেই তো চাকর। মেথরদের সঙ্গে কেন আপনাদিগকে সমান করি না? কে ভিন্নশ্রেণীভুক্ত করিল? এ সকল তো সামাজিক ব্যাপার। ঈশ্বর-ভক্তেরাই তো দাস দাসী। তবে মনে মনে বিনীত হইয়া, বাড়ীর চাকর চাকরাণীর সেবা করিব। চাকর চাকরাণীর আদর কেহ জানে না। কেহ যদি কাপড় না কাচে, কেহ যদি ময়লা পরিষ্কার না করে, কেহ যদি না রাঁধে, কত কষ্ট উপস্থিত হয়। যেমন বাপ মা উপকার করে, চাকর চাকরাণী তেমনি উপকার করে। বরং মা বাপ বসিয়া থাকিলে দিন চলে, চাকর চাকরাণী বসিয়া থাকিলে কখন দিন চলে না। এমন উপকারী বন্ধু যারা, তাদের বিষয় কেহ ভাবে না, তাদের রোগ হইলে কেহ দেখে না, তাদেরে যে ঘরে শুইতে দেওয়া হয়, সে ঘরে হিম আসে; তারা পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার পায় না। তারা খাইতে পাইল, কি না পাইল, আমরা তার সংবাদ লই না। চাকর মরুক, ধার করুক, আমরা গ্রাহ্য করি না; ইহাই তো নীলকর চা-করের ব্যবসায়। অভিলাষ এই, আমরা সংসারে নীলকরের ব্যবসায় না চালাই। যারা আমাদের সেবা করিতে আসিয়াছে, আমরাও যেন তাদের সেবা করি।

দীন

২৪শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী, কমলকুটীর), দীনসেবার জন্য প্রার্থনা। পৃথিবীতে কত রোগ শোক, কত মনের বেদনা, জীবনে কত কষ্ট। এ সকল দূর করিবার জন্য নানা উপায়, তন্মধ্যে একটি উপায় উপাসনা। দৈনিক

উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর মনে দয়া কোমলতা উদ্দীপন করেন। সেই দয়া কোমলতার উত্তেজনায় লোকে দুঃখীর দুঃখ মোচন করে। পরের অবস্থা ভাবা অনধিকার চর্চ্চা, এরূপ মনে করিয়া আমরা নিবৃত্ত থাকি, স্বার্থপর হইয়া থাকি। ঈশ্বরের পূজা করিয়াও যদি মন স্বার্থপর থাকিল, তবে কি হইল? রোগে শোকে অজ্ঞান অধর্ম্মে কত লোক মরিতেছে, তাদের দুঃখমোচনের জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে প্রেরণ করুন। দুঃখীকে কিছু দিলে স্বয়ং ঈশ্বর তাহা হাত পাতিয়া লন, ইহা তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিন। তাঁহার গৌরব যদি দয়াতে হইল, তবে তাঁহার সন্তানগণ নির্দ্দয় হইবেন, কি প্রকারে? দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য আমরা চাকর হইয়া পৃথিবীতে আসিলাম, সে অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়, এই অভিলাষ।

আর্য্যনারীসভা

অদ্য (২৪শে পৌষ, ৭ই জানুয়ারী) অপরাহ্ণে আর্য্যনারীসভার অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে উৎসবে প্রস্তুত হইবার জন্য কেশবচন্দ্র এইরূপ উপদেশ দেন:—"উৎসবের পূর্ব্বে এ সভা প্রস্তুত হইবার সভা। যেমন প্রস্তুত হইবে, লাভ তদ্রূপ হইবে। প্রস্তুত না হইলে, নিশ্চয় ক্ষতি হইবে। যদি সেই স্নেহময়ী জননীর নাম এখন হৃদয়ে ভাল করিয়া সাধন কর, সমুদয় হৃদয়ের তারগুলি যদি ভালরূপে বাঁধিয়া 'মা' নামের তারের সঙ্গে মিলাইয়া রাখ, উৎসবের স্বর ভাল হইবে। এখন যদি হৃদয় স্বরবিহীন হইয়া রহিল, মা যখন আসিবেন, কিরূপে বাজাইতে পারিবে? হরি যিনি উৎসব প্রেরণ করিতেছেন, তাঁর রাজ্যে কত আয়োজন হইতেছে, কত ব্যাপার হইতেছে! উৎসবের রথ টানিয়া আনিবে বলিয়া কত ঘটনা-অশ্ব প্রস্তুত হইতেছে। উৎসবের জন্য প্রেমবারিবর্ষণ হইবে বলিয়া, কত ঘটনাজাল আকাশে ঘনীভূত হইতেছে। উৎসবের সময় আলোক দিবার জন্য কত সূর্য্য প্রস্তুত হইতেছে। সংসারকে স্নিগ্ধ করিবার জন্য কত চন্দ্র গগনে উঠিতেছে, কত ফুল ফুটিতেছে, গান করিবার জন্য কত পাখী বাসা করিতেছে। ধন্য জননী, তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে সুখী করিবেন বলিয়া, কত আয়োজন করিতেছেন। দুর্ভাগিনী নারী জানে না, তাহাদের জন্য তিনি কত আয়োজন করিতেছেন। ভগবান্ জানেন না কি, কত দুঃখী তৃষিত হৃদয় রহিয়াছে? জানেন, তাই এত আয়োজন হইতেছে। হৃদয়ে প্রবেশ

কর, দেখিতে পাইবে, মার অঙ্গুলি কত ব্যস্ত। আর্য্যনারীর কপালে কত সুখ শান্তি আছে। এবার খুব উৎসাহ কর; মা নিজে কন্যাদের কাছে এসে, নববিধানের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন, কত সুধা দিবেন। তাঁর সুধানদী হইতে মেয়েরা কলস পূর্ণ করিয়া ঘরে আনিবে বলিয়া কত আয়োজন করিতেছেন; এ সময়ে যেন আমাদের মন নিরাশ হইয়া সংসারে পড়িয়া না থাকে। প্রেমময়ী নিস্তব্ধভাবে কত করিতেছেন; কাহাকে জানিতে দেন নাই, গোপনে বিরলে বসিয়া সব প্রস্তুত করিতেছেন। কার মনের কি রকম রং, কি রকম বস্ত্র পরিলে ভাল দেখায়, তিনি তাহাই দিবেন; যাহার হৃদয়ে যে ভূষণ পরিলে ভাল দেখায়, তাহাই দিবেন। তাঁর রাজ্যের বস্ত্র অলঙ্কারে নারীহৃদয়ের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়। সকলের মনে প্রেম পুণ্য দিবেন বলিয়া, তিনি কত আয়োজন করিতেছেন। মন, প্রস্তুত হও, মোক্ষদায়িনী আসিতেছেন, আনন্দময়ী আসিতেছেন। প্রস্তুত হও। মা যখন আসিবেন, আদর করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবে, আর উৎসবের সময় পবিত্র প্রেমে উন্মত্ত হইবে। মার মত কেউ ভালবাসিতে পারে না। কেহ এত যত্ন করিয়া, যার যা চাই, তাহা দিতে পারে না। অতএব 'মা আসিতেছেন, মা আসিতেছেন' এই কথা ভাব। হৃদয়ঘর পরিষ্কার কর, উজ্জ্বল কর; তাঁর বসিবার স্থান প্রস্তুত কর। আর্য্যনারী, তোমার সুখের জন্য ভগবতী আসিতেছেন; দ্বারে গিয়া দাঁড়াও, কখন তিনি আসিবেন, প্রতীক্ষা কর, আসিবামাত্র করযোড়ে প্রণাম করিয়া বরণ করিয়া ঘরে ডাকিয়া লও। যেন আসিয়া না দেখেন, তাঁর কোন কন্যা নিদ্রা যাইতেছে; কিন্তু যখন তিনি আসিবেন, যেন দেখেন, সকল মেয়ে নূতন কাপড় পরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যেমন মা আসিলেন, শঙ্খধ্বনি হইল, ঘরে কল্যাণ-শান্তি-বিস্তার হইল।"

যোগ

২৫শে পৌষ, যোগ (কমলকুটীর)। অদ্য ৮ই জানুয়ারী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন বৎসর পর যে দিনে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ হইবে, সেই দিনে এই বৎসরে এই যোগের প্রার্থনা তিনি করেন। প্রার্থনাটী কিরূপ তাদৃশ ঘটনার উপযোগী, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা সমগ্র প্রার্থনাটী এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"হে প্রেমের আকর, হে চিন্ময় অরূপ, আমি কে, চিনাইয়া দিবে না?

যে উৎসব ভোগ করিবে, সে কে ? সে কেমন ? হে মন, পিতার বাড়ী ছাড়িয়া বাসাতে আসিয়াছ কেন ? এই ভগ্ন গৃহে মাকে ছাড়িয়া বাসা করিয়া আছ কেন ? ওরে আমার মন, ১১ই মাঘের সময় ঘুম ? উঠ, বাড়ী ছাড়িয়া আসিলে কেন ? সেখানে আদর হইত না ? এখানে কেন ? শরীরের পচা গন্ধের ভিতরে তোর বাসা, দেবগৃহ ছাড়িয়া হাড়িপাড়ায় বাসা করিয়া রহিলে ? কার পুত্র ? তোর বাপের নাম কি ? ছিলে কোথায় ? ধাম কোথায় ? তোর ভাইদের নাম বল্। এমন লোকের পুত্র, এমন সকল সোণার চাঁদ ভাই, তুই এসেছিস্ ইন্দ্রিয়গ্রামে ? কি খাচ্ছিস্ সেখানে ? চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্র, অন্ধকারে আসিলে কেন ? ৫০। ৬০ বৎসরেব জন্য দুষ্ট স্বেচ্ছাচারী সন্তানের মত ইন্দ্রিয়-গ্রামে থাকিবে ? মন, তোমার অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। এখানে সামান্য বিষয়-ভোগে ধীরে ধীরে ডুবলে। পৈতৃক গৌরব, পৈতৃক মহিমা স্মরণ কর। বাড়ী চল, আর বসিয়া থাকিতে দিব না। স্বদেশ থাকিতে বিদেশে, মাতৃভূমি থাকিতে পরের জায়গায় ? হায়রে ভ্রান্ত যুবা, ইন্দ্রিয়গ্রামে যে আসে, তার দুর্দ্দশা হয়। তোমার তনু—ভাগবতী তনু—দেবতনু—পশুতনুতে কাজ কি ? তোমার মার বাড়ী চল। ভাব, আত্মা, এখন কোথায় চলিলে। তোমার মার চিঠি আসিয়াছে, উৎসব আসিতেছে। তিনি বলিয়াছেন, আমার ছেলে এল না ? চল রে আমার মন। বাপ মা ছাড়িয়া উৎসবের সময় বিদেশে থাকৃতে আছে? জয়, জয় জগদীশ বলিয়া জাগ। ঐ তোমার ভিতর থেকে তেজ বাহির হইতেছে। তুমি হরিসন্তান, ব্রহ্মপুত্র তুমি। এই ঘরের পাখী উড়িয়া গেল। আত্মন্, চলিয়া গেলে ? আর ভাল লাগিল না। মার নাম শুনেছে, আর দৌড়েছে। অশরীরী আত্মা দৌড়েছে। মা, তোমার বিপথগামী সন্তানকে লয়ে যেতে এগিয়ে এসেছ ? মা, তোমার সন্তান তোমার ভিতর এক হইয়া গেল, আর দেখিতে পাই না। ব্রহ্মে ব্রহ্মপুত্রের যোগ। আয়, কে দেখবি আয়, মজার জিনিষ। আমার তবে পঞ্চভূত ছায়া, সে বেরিয়ে গিয়েছে, আমার প্রেত দেহ পড়িয়া আছে। আমার সোণার চিন্ময় কোথায় গেল? রাঙ্গা পাখী, আজ কোথায় উড়িয়া গেলে ? পাখী, আমার প্রিয় ছিলে, আমার খাঁচার দাম তোমার জন্য, আর কেহ এই খাঁচার আদর করে না। হরি বুঝে হরে নিলেন। আত্মা তাঁর কাছে চলে গেল ; আর, জননি, খাঁচা কি কথা কহিবে ? যে আমার কথা

কহিবে, সে মানুষ ভিতরে গিয়াছে। আর প্রেতের মুখে ব্রহ্মোপাসনা কি সম্ভব? মনের মানুষ বেরিয়ে গেল। উপাসক ভাই, আমার ভাঙ্গা খাঁচার ভিতরে ছিলে যে তুমি, তোমার কণ্ঠের স্বর আর আমরা শুনিতে পাই না, তোমায় আর বাঁধিতে পারি না। দড়া দড়ী ছিঁড়ে গিয়েছে, শিরাগুলি পড়িয়া আছে। মাকে ভালবাস বলে চলে গেলে। আমাকে ছল্‌তে এসেছিলে তুমি। সংসারের কত সুখ তোমাকে দিলাম। মাকে এত ভালবাস! তোমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে তুমি গোপনে কি বল্‌ছ? ভগবান্‌ ও ভগবান্‌-পুত্রের কি কথোপকথন হয়, খাঁচা কি শুনিতে পায়? তোমার সঙ্গে উড়িতাম, যদি ক্ষমতা থাকিত। দয়াল, তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়া গেলে? আমাদের হাতে আর তোমার পুত্রকে রাখিবে কেন? রাখ সুখে, তব পাদ-পদ্মে স্থান দেও। তোমার ধনকে তুমি নেবে; খাঁচার অধিকার কি, তাকে রাখে? যারে, মন, যা। হে ঈশ্বরি, নেও; ভগবতি, তব পুত্রকে নিয়ে সুখে রেখ। প্রেমময়ি, তোমার ছেলেকে যোগ-অন্ন, ভক্তি-ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইয়া, একখানি বৈরাগ্য-কাপড় দিও। তোমার স্তনের প্রেমানন্দরস তৃষ্ণার সময় দিও। খেলা করিতে চাহিলে, তাহার বড় ভাইদের ডেকে দিও। আমার আত্মাকে আমি প্রণাম করি; আত্মা পরমাত্মার পুত্র, আমার চেয়ে বড়। ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ, তুমি এখন প্রসন্ন ভগবানের নিকটে। তোমার গৃহাশ্রম সেখানে নির্ম্মিত হইবে।"

মহাজন

২৬শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী, রবিবার, ব্রহ্মমন্দির), মহাজনগণের নিকট ঋণস্মরণ। সামান্য ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক এবং ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টিসাধক মহোদয়দ্বয়ের নিকটে ঋণ স্বীকার করেন; আর কাহারও নিকটে যে তিনি ঋণী, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম কেবল এ দুজনের নিকটে নহে, অনেক মহাজনগণের নিকটে আপনাকে ঋণী বলিয়া জানেন। সর্ব্বপ্রথমে আমরা আমাদের জীবনদাতা ঈশ্বরের নিকটে, তার পর সাধুমহাত্মাদিগের নিকটে ঋণী। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত সাধু জগতের কল্যাণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের নিকটে আমরা ঋণে বদ্ধ। মহাত্মা সক্রেটিস্‌ ভারতবাসী না হইয়াও, মনোবিজ্ঞানের জন্য আমাদিগকে তাঁহার নিকটে ঋণী করিয়াছেন।

মুষা ঈশা বিদেশীয় মহাজন, অথচ তাঁহাদিগের নিকটে আমরা সামান্য ঋণে ঋণী নহি। বিদেশীয় মহাজনগণকে কৃতজ্ঞতা দিয়া, ঘরে আসিয়া দেখি, যোগপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুভক্ত নারদ, প্রজাবৎসল রাম, সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং ভারতের অন্যান্য সাধু মহাত্মা আমাদিগকে রাশি রাশি সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিতেছেন। ভারতের ধর্ম্মবীর বুদ্ধ, নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, ইহাদিগের নিকটে ব্রাহ্মগণ অশেষ ঋণে ঋণী। পৃথিবীর সমুদায় জ্ঞানী পণ্ডিত ধার্ম্মিক সাধুদিগের ঋণজাল আসিয়া তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে। কাহারও নিকটে ব্রহ্মস্তবস্তুতি ব্রহ্মারাধনা, কাহারও নিকটে যোগধ্যান, কাহারও নিকটে সংসারে বৈরাগ্যসাধন তাঁহারা শিখিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলিতেছে, আমার গুরু অমুক অমুক। 'মিসর দেশ, আরব দেশ, চিন দেশ, পৃথিবীর সমস্ত দেশ বলিতেছে, বাঙ্গালীর মস্তকের মুকুটে যত রত্ন আছে, আমাদের হইতে। অসরল হওয়া পাপ, ঋণ অস্বীকার করা ও অসত্য বলা পাপ।' পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে ভারত কত ঋণ করিয়াছেন। রাজ্যসম্পর্কে, সাহিত্যবিজ্ঞানসম্পর্কে ভারত ইংলণ্ডের নিকটে কত ঋণী। আজ বুদ্ধের নিকটে নির্ব্বাণের, ঈশার নিকটে পিতার ইচ্ছাপালনের, মোহম্মদের নিকটে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের, গৌরাঙ্গের নিকটে প্রেমোন্মত্ততার নিশানের প্রার্থী সকলে হউন। আজ সাধুজীবনের শোণিত উপাসকদিগের শোণিতে প্রবিষ্ট হউক। কেবল হিন্দুস্থানে নহে, বিশ্বেশ্বরের সমুদায় বিশ্বমধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত আছি। হৃদয় আজ পৃথিবীর সমুদায় সাধুদিগকে প্রণাম করুক, তাঁহারা সকলে আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। (বিস্তৃত উপদেশটী 'সেবকের নিবেদন' ৩য় ভাগে দ্রষ্টব্য)

মানবহিতৈষী

২৭শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী, কমলকুটীর), মানবহিতৈষিগণের প্রতি সম্ভ্রমপ্রকাশ। গত কল্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে নমস্কার করিয়া, অদ্য সাধকগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন, যাঁহারা পরদুঃখমোচনজন্য স্বাস্থ্য ও জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া পৃথিবীর সুখবৃদ্ধি করিলেন, সেই সকল উদারস্বভাব প্রেমিক মহাত্মাদের শোণিত সাধকগণের রক্তের ভিতরে প্রবেশ করুক। 'হাওয়ার্ড শ্রেণীর লোকেরা পরের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। আমরা স্বার্থপর জীব, বড় নীচ, কেবল আপনার পরিবার

লইয়া ব্যস্ত, প্রাণ কিছুতেই পরদুঃখে দয়ার্দ্র হয় না।' 'তাঁহারাই এ উৎসবের অধিকারী, যাঁহারা অন্যের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন।' তাঁহারা এ বিধানের উপযুক্ত নন, যাঁহাদের মন স্বার্থপর। আমাদের কেবল দেশহিতৈষী হইলে চলিবে না, আমাদিগকে মানবকুলহিতৈষী হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে কতকগুলি ভগ্নী প্রস্তুত হউন, যাঁহারা দয়ার ভগ্নী হইবেন। 'যদি প্রাণের ভিতর দয়ার মিষ্টতা না থকে, যোগ বিফল।' যে মার উপাসক হইবে, সে জনহিতৈষী হইবে। অভিলাষ এই, পরের হিতাকাঙ্ক্ষারূপ সুধা আমাদের কঠোর প্রাণে ঈশ্বর ঢালিয়া দিন। দুঃখীদের সেবা করি, জনহিতৈষী, বিশ্ব-হিতৈষী হই, সকলকে ভাই ভগ্নী জানিয়া ভালবাসি ও সেবা করি। যে কয়টীর সেবা করিতে পারি, যেন তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হই। পরসেবা করিতে করিতে যেন ঈশ্বরের চরণ লাভ করি।

উপকারী

২৮শে পৌষ (১১ই জানুয়ারী, কমলকুটীর), উপকারিগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। কৃতজ্ঞতা প্রধান ধর্ম্ম; অকৃতজ্ঞতা বিধানবিরোধী। যাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নাই, সে কখন মানুষ নয়। পুরাতন দানের প্রতি, যে দান প্রতিক্ষণ পাইতেছি, তৎপ্রতি মন উদাসীন হইয়া পড়ে। এরূপ ঔদাসীন্য মনের ক্ষুদ্রতার চিহ্ন। বন্ধুগণের অনুগ্রহ বিনা আমাদের দেহ রক্ষা পায় না; যাঁহারা অন্ন দেন, তাঁহারা প্রাণের বন্ধু। রোজ হয় বলিয়া আমরা এ কার্য্যের মূল্য বুঝি না; অধিকার সাব্যস্ত করি। দান পাইয়া বিনয়ী হই না, ৩৬৫ দিনের মধ্যে এক দিন না পাইলে ৩৬৪ দিনের দয়া বিস্মৃত হইয়া যাই। কত দিন বন্ধু খাওয়াইলেন, আমরা তার হিসাব নেব'; যে দিন খাওয়াইলেন না, তার হিসাব কেন লইব? তার হিসাব ঈশ্বর লইবেন। যাঁরা সাধকগণকে অন্ন দেন, চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের পায়ের তলায় বসিয়া থাকা উচিত। রোগের সময়ে চিকিৎসকের একটু আসিতে দেরি হইলে, তাঁহার প্রতি গরম হইয়া বসিয়া থাকি, কি অকৃতজ্ঞতা!! ঈশ্বর দয়া করিয়া যে লোকটিকে প্রেরণ করিলেন, চৌদ্দশত বার তাঁহাকে নমস্কার করা উচিত।

বিরোধী

২৯শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী, কমলকুটীর), বিরোধিগণের প্রতি

ক্ষমাপ্রকাশ। ঈশ্বরের ক্ষমাতে আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, ইহা আমাদের স্মরণে থাকে না। ধনহানি, স্বাস্থ্যহানি, মানহানি, এ সকল উত্তেজনায় আমাদের মন গরম হয়। আমরা বিচারকের আসনে বসি, ভুলিয়া যাই যে, ক্ষমা বিনা পাপীর গতি নাই। আমাদের নিজের পাপ ক্ষুদ্র, আর ভাইয়ের পাপ বড়, আমরা মনে করি। দোষের প্রতি উত্ত্যক্ত হইয়া দণ্ড দি। আমরা বলি, ক্ষমা করা উচিত নয়। যেখানে ক্ষমা নাই, সেখানে নববিধান নাই। যখন ঈশ্বর নববিধান প্রেরণ করেন, তখন তিনি সকল সম্প্রদায়কে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিতে বলেন। 'ক্ষমা নববিধানরূপ ময়ূর-পাখীর সুন্দর পুচ্ছ; যাহারা ক্ষমা করে না, তাহারা ধর্ম্মকাক।' যদি শত্রু না থাকিত, আমাদের দোষের কথা কে বলিত? আমরা যে সুখ্যাতির বাতাসে স্ফীত হইতাম। শত্রুতাতে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর বাড়িতেছে, এই কয়েক বৎসরে নববিধানের নিশান উড়িয়াছে। আক্রান্ত জীব যেন ক্ষমাদ্বারা শত্রুতা জয় করে। বৈরনির্য্যাতনের জন্য যাহাদের রাত্রে নিদ্রা হয় না, তাহারা যে ক্ষমার পাত্র। নববিধানের লোক শত্রুনির্য্যাতন করে না, তাহারা ক্ষমা করে, আর শত্রুর জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে। প্রেম নববিধানীর ব্রহ্মাস্ত্র, যে অস্ত্রে শত্রুগণ ঈশ্বরের পথে আসিবে। ঈশার মাথায় শত্রুরা কাঁটার মুকুট দিল, যে কাঠে তাঁহাকে বিদ্ধ করিবে, সেই কাঠ তাঁহাকে দিয়া বহাইয়া লইল। তিনি যে কেবলই ক্ষমা করিলেন, আর বলিলেন, 'আমি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি'। ঈশা ক্ষমা শিখাইয়াছেন; যদি শত্রুর জন্য প্রাণ দি, আমরা শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারিব। বন্ধুদিগকে প্রণাম করিয়াছি, আজ শত্রুদিগকে প্রণাম করি; কেন না তাঁহাদের ভিতর ব্রহ্মাণ্ডপতি আছেন, এবং তাঁহাদের জন্যই নববিধানের আগমন। 'জয় বৈরনির্য্যাতনের জয়, জয় গালা-গালি দ্বারা সংবাদপত্র পূর্ণ করার জয়, কেন না তদ্দ্বারা নববিধান আসিল।' রাগ ছাড়িয়া, মেষের মতন বিনীত হইয়া, আমরা যেন শত্রুদলের কল্যাণসাধন করি, এই অভিলাষ।

নিশাজাগরণ

অদ্য (২৯শে পৌষ, ১২ই জানুয়ারী) নিশাজাগরণ। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "অদ্য সমুদায় রাত্রি জাগরণে অতিবাহিত হয়। কমলকুটীরে সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলী

প্রথম রাত্রি হইতে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া, দুপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কথোপকথনে নিযুক্ত থাকেন। এই কথোপকথনে প্রত্যাদেশ প্রেরণা প্রভৃতির গূঢ় মর্ম্ম সমালোচিত হয়। অনেকে স্ব স্ব জীবনে অল্পবিস্তর প্রত্যাদেশ ও প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করেন। কথোপকথনান্তে চন্দ্রকিরণশোভিত নিশীথ-সময়ে সমবেত ভ্রাতৃগণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া, সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কমলসরোবর প্রদক্ষিণ করতঃ, উপাসনাগৃহে প্রবিষ্ট হন। সমুদায় দিক্ নিস্তব্ধ। গৃহ গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ, উপাসকমণ্ডলী সমবেত। স্থান ঈশ্বরের আবির্ভাবে পূর্ণ। আচার্য্য গম্ভীরস্বরে বলিলেন :—'গুরু কাছে বস, প্রশ্ন করি, উত্তর দাও, জ্ঞানদানে পরিত্রাণ কর। হে প্রেমসিন্ধু, আবার তোমাকে ভাবি, এই গম্ভীর সময়ে উপাসনা-স্থানে তোমার নববিধানের লোকদিগের মধ্যে তোমাকে ভাবি, দয়া কর। আমাদিগের মধ্যে তোমার নববিধানের প্রত্যাদেশ-স্তম্ভ স্থাপন কর।' 'অঘোর, অমৃত, গৌরগোবিন্দ, তিন জন সমক্ষে বস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর, তিন ভাই একমন, একহৃদয় হও, দেবদেব মহাদেবের প্রতি দৃষ্টি কর। ছয় চক্ষু এক চক্ষু, তিন হৃদয়কে এক হৃদয় কর, তিন বুদ্ধিকে এক বুদ্ধি কর। আর কোন চিন্তা করিও না। নির্ব্বাণে সমুদায় আগুন নিবাইয়া দিয়া, এক লক্ষ্যের প্রতি তিন জনের দৃষ্টি স্থির রাখ।' "

অনন্তর তিন জন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এক হইয়া চারি জন একজন হইলেন। তখন এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। যে বৈরাগ্য আমাদের মধ্যে আছে, তদপেক্ষা আরও দুঃখ বৈরাগ্য বাড়িবে? আরও বৈরাগ্য, আরও কষ্ট সাধন, আরও গরিব না হইলে চলিবে না? কি উপায়ে নববিধানের ভক্তদিগের মধ্যে চিরদিনের অনৈক্য নিবারণ হয়, সাম্প্রদায়িক ভাব নষ্ট হয়, একহৃদয় কিসে হয়? কিসে নববিধানের আশ্রয়ে সকলকে আনিতে পারা যায়, সকলের প্রাণ মোহিত করিতে পারা যায়? কি কি প্রধান উপায়ে আগামী বর্ষে নববিধান মহিমান্বিত, জয়ী, শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন? এই সকল প্রশ্নের সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বলিলেন, 'এক কাণে শুনিলাম, এক বুদ্ধিতে ধরিলাম, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম, এক সিদ্ধান্ত করিলাম।' 'হইল বিচার-নিষ্পত্তি, প্রশ্নের উত্তর আসিল।' তিন জনকে স্ব স্ব স্থানে বসিতে বলিয়া কেশবচন্দ্র বলিলেন :—'ত্রৈলোক্য এবং দীন সমক্ষে বস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর। মা সরস্বতী, অবতীর্ণ হও,

বীণা ধারণ করিয়া তোমার প্রিয় কমলকুটীরের পবিত্র উপাসনাস্থানে এস। এই দুইজনের প্রাণ এক কর, হৃদয় এক কর, আকার দুই, ভাব এক। সরস্বতী এক, বাহন ছিল দুই, হইল এক।' এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইল :—'এই দরবার সঙ্গীতে যদি সম্বদ্ধদল না হয়, সঙ্গীতের উৎসাহে যদি মত্ত না হয়, তাহা হইলে কি সঙ্গীতের দ্বারা জনসমাজের পরিত্রাণ হয়? এক খানি প্রকাণ্ড সঙ্গীত যদি না হয়, তবে কি এত বড় ভারত উদ্ধার হইতে পারে? দলেতে যে সঙ্গীত জমাট হয়, তদ্দ্বারা কি নববিধানের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে?' 'এমন কোন সুর আছে, কি না, যাহা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা শুনিলে নব-বিধানের দল খেপিতে পারে? সমস্ত দল শুদ্ধ খেপিতে পারে কি না? রামপ্রসাদের রামপ্রসাদী সুর, নববিধানের কি সুর?' পরিশেষে, 'আমাদের সকলের জীবন গদ্য, না পদ্যপ্রধান হইবে? নববিধান—পদ্য কবিত্বের সময়, না গদ্য?' এই প্রশ্নে পরিসমাপ্ত করিয়া কেশবচন্দ্র বলিলেন, 'তোমরা পরস্পরের হস্ত ত্যাগ কর; ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থান গ্রহণ কর।'

এই ব্যাপারের পর যথানিয়ম উপাসনা হয়। অদ্যকার উপাসনায় বিশেষ প্রার্থনা হয় :—"হে প্রেমময়, সমক্ষে নূতন উৎসব, পশ্চাতে পুরাতন জীবন। নব উদ্যমের সহিত যেন উৎসবে যোগ দি। নববিধান আমাদিগের জীবন, এই আমাদিগের জীবনের কর্ম্ম। বিশ্বব্যাপী এক নূতন ধর্ম্ম জগতে আসিয়াছে, আমরা কয়জন তাঁহার দূত। ঠাকুর, কেবল নববিধান কিসে পূর্ণ হইবে, ইহাই আমাদের জীবনের কার্য্য। হে পরমপিতা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের পুরাতন জীবন কাড়িয়া লও। যাও, পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ জীবন, যাও। হে নূতন মানুষ, তুমি অণ্ডভেদ করিয়া এস। তোমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, পথের কড়ী নববিধান। এই জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া একটি প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির হইবে। একেবারে নবীন। এই দিকে ছেলেমীর চূড়ান্ত, ঐ দিকে বুড়োমির চূড়ান্ত। ব্রহ্মাণ্ডপতি, তুমি এবার কি না দিলে? তাহাতেও তৃপ্তি হয় না। খুব ক্ষমা, দীনতা, বৈরাগ্য শিখিতে হইবে। পুরাতন মানুষ মরিয়া গিয়া, আমাদের প্রত্যাদেশের নূতন মানুষ বাহির হইবে। যত কিছু বিবাদের কারণ চলিয়া যাইবে। হে বিধাতঃ, এই মানুষকে বাহির করিয়া তোমার বিধান পূর্ণ কর, এই প্রার্থনা।"

উৎসব

আরতি

১লা মাঘ, ১৮০২ শক (১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ), বৃহস্পতিবার। অদ্য ব্রহ্মস্তব ও আরতির দিবস। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "সায়ঙ্কালে ৭ ঘটিকার সময়ে ব্রহ্মমন্দির প্রায় পাঁচ শত লোকে পূর্ণ হয়। ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে আচার্য্য নববিধানের নিশান এবং ভ্রাতৃমণ্ডলী নিম্নস্থান হইতে সোপানপরম্পরায় ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বে আলোক হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইলে, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর, গং, নহবত, একতারা, খোল, করতাল ঘড়ী ইত্যাদি সমুদায় জাতির বাদ্যব্যঞ্জক বাদ্যযন্ত্র হইতে তুমুল ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া আরতির কার্য্যারম্ভ হয়। সঙ্গীত-প্রচারক একতারা হস্তে নিম্নলিখিত সঙ্গীত * আরম্ভ করিলে, সকলে তাহাতে যোগ দেন। যাঁহারা এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন না, নির্জীব লেখনী দ্বারা তৎকালের সজীব দৃশ্য চিত্রিত করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়গোচর করা বিচিত্র কবিকল্পনার প্রয়োজন। সমগ্র আকাশ সে সময়ে কিপ্রকার জীবন্ত আবির্ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, যাঁহারা তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার অসাধারণ নূতনাঙ্গ আরতির মর্ম্ম কি প্রকারে অবধারণ করিবেন? অনন্ত ঈশ্বরের আরতি, ইহা শুনিতে অসম্ভব; কিন্তু "তাঁহারি আরতি করে নিখিল ভুবন," এ কথার মর্ম্ম সেই দিন আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

"কে বলে, ধূপগন্ধ, আলোক, বাদ্যধ্বনি, মধুর সঙ্গীত, ঈশ্বর নামে উচ্চ জয়ঘোষণা, বিজয়পতাকা, বিজয়চিহ্ন ধারণ, এ সকল অনন্ত ঈশ্বরসম্বন্ধে নিয়োগ না করিয়া, মনুষ্যের ক্ষুদ্রহস্তনির্ম্মিত ক্ষুদ্র পুত্তলিকার আরতিতে নিয়োগ করা সমুচিত? অনন্ত ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, তাঁহার মহত্ত্ব ও মহিমা ঘোষণা করিতে মনুষ্যের মন ব্যগ্র হয়, না, অতি সামান্য মৃদ্বিকার, ক্ষণধ্বংসী পুত্তলিকাদর্শনে? পৌত্তলিক তুচ্ছ পুত্তলিকা লইয়া যদি হৃদয়ের আনন্দ, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস উপযুক্ত উপকরণে প্রকাশ করিতে পারে, তবে ধিক্ আমাদিগকে, যে আমরা আমা-দিগের প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস অনুপযুক্ত ভাবেও প্রকাশ করিতে পারিব না।

---

* "জয় মাতঃ জয় মাতঃ, নিখিলজগতপ্রসবিনী" ইত্যাদি। (ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন, ১২শ সংস্করণ, ৬৮৮পৃঃ দেখ।) (উৎসবের বিবরণ ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন এবং ১৩ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।)

মহতোমহীয়ান্ পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া প্রাণ যে প্রকার উচ্ছ্বসিত হয়, দুঃখের বিষয় এই যে, মনুষ্যের আয়ত্তাধীন এমন কোন উপযুক্ত উপকরণ নাই, যে তদ্দ্বারা সে তাহা বাহ্যে কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে পারে। মনুষ্যের হৃদয় এমনি ভাবে গঠিত যে, সে উপযুক্ততার বিচারে হৃদয়ের ভাবকুসুমকে শুষ্ক হইতে দেয় না; যত দূর পারে, আন্তরিক ভাবোচ্ছ্বাসের অনুরূপ বাহিরে কোন না কোন অনুষ্ঠান করে।

"আরতি অন্তে আচার্য্য (কেশবচন্দ্র) বেদী হইতে পরমমাতার স্তুতিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সম্মুখে পঞ্চ প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল। তিনি বলিলেন, 'বাহিরের পঞ্চপ্রদীপ কিছুই নয়, ইহা আন্তরিক পাঁচটি দীপের নিদর্শনমাত্র। এই আন্তরিক পঞ্চপ্রদীপ ভিন্ন কেহ ঈশ্বরের মুখ অবলোকন করিতে সক্ষম নহে। পবিত্রতা, প্রেম, বিশ্বাস, ভক্তি ও বিবেক এই পাঁচটি প্রদীপ গ্রহণ করিয়া, ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে হয়। যাহাদিগের এ সকল নাই, তাহারা ঈশ্বরদর্শন করিবে কি প্রকারে ?" স্তুতির কিঞ্চিৎ অংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম (বিস্তৃতভাবে ধর্ম্মতত্ত্বে ও 'মাঘোৎসব' পুস্তকে দ্রষ্টব্য) :—"……সামান্য জীবের কাছে বৃহৎ তুমি, ক্ষুদ্রের কাছে বড় তুমি, গগনথালে সূর্য্য চন্দ্র দীপস্বরূপ হইয়া তোমার আরতি করে। আজ ব্রহ্মমন্দির ছোট হইল। প্রকাণ্ড আকাশ তোমার সিংহাসন, প্রকাণ্ড মহাদেব, ক্ষুদ্র নরনারী তোমার আরতি করে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র পাপীরা তোমার আরতি করিতে আসিয়াছে। বিভু, আরও সমুজ্জ্বলিত হও, শত সহস্র দীপ হাতে করি; সমাগত নরনারী তোমার মুখ দর্শন করিবে। ঐ আকাশ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত তোমায় দর্শন করি, বিরাট্‌রূপে। জয় বিশ্বপতি মহিমান্বিত বিশ্বপতির জয়, জয় ভূমা মহান্ পরাৎপর ঈশ্বরের জয়। সমস্ত আকাশ ব্রহ্মমূর্ত্তিতে পূর্ণ হইল, সেই ব্রহ্মতেজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। আমরা সহস্র স্বর একত্র মিলাইয়া তোমার আরতি করি। আমরা ঐ মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইব। অচল, হব না চঞ্চল; জ্যোতির্ম্ময়, হইব না অন্ধকার; পবিত্র, হইব না অশুদ্ধ; মহান্, হইব না ক্ষুদ্র। মহান্ তুমি, ঠাকুর তুমি, অত্যন্ত সুন্দর তুমি। আমাদের প্রেম-প্রদীপ, ভক্তি-প্রদীপ বলিয়া দিল, তুমি লাবণ্যময়ী সুন্দরী সর্ব্বারাধ্যা দেবী। ….."

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিমূর্ত্তি আলবার্টহলে রক্ষা

২রা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী), শুক্রবার। অদ্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি আলবার্ট হলে রক্ষা করিবার দিন। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন :—"প্রায় তিন শত ব্যক্তি এই উপলক্ষে আলবার্ট হলে সমাগত হন। শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেনের প্রস্তাবে, শ্রীমৎ লালা কাশীরামের পোষকতায়, শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অর্থসংগ্রহণী সভার সম্পাদক, কি প্রকারে অর্থসংগ্রহ হইয়াছে, কি প্রকার সহানুভূতিলাভ হইয়াছে, সংক্ষেপে সভাতে জ্ঞাপন করিলে, সভাপতি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষের প্রকাশ্য স্থানে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এই একমাত্র চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি; মৃত মহাত্মার পুত্র বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে যে চিত্রিত মূর্ত্তি আছে, তাহা দেখিয়া এটি চিত্রিত। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার স্বদেশীয় কর্ত্তৃক চিত্রিত হয়, এই অভিপ্রায়ে, বিদেশীয় কাহাকেও নিযুক্ত না করিয়া, দেশীয় চিত্রবিদ্যানিপুণ ব্যক্তির হস্তে এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল। বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাতে চিত্রনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু বর্ত্তমানের অভিপ্রায় যে সুন্দররূপে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এই চরম প্রতিমূর্ত্তি-সংস্থাপন, সংস্থাপকদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ইহা কেবল, ভবিষ্যতে আরো উপযুক্তরূপে তাঁহার স্মরণার্থ উদ্যোগ হইবে, তাহারই সূত্রপাত। পরিশেষে সভাপতি বলিলেন, এই বিশেষ সময়ে আবরণ উন্মোচনকার্য্য তিনি প্রার্থনা করিয়া সম্পাদন করিবেন। প্রার্থনান্তে আবরণ উন্মোচিত হইলে, সকলের সমক্ষে অতি মনোহর চিত্র প্রকাশ পাইল। স্মরণীয়কীর্ত্তি মহাত্মার বাহ্য আকার যে আন্তরিক মহত্ত্বের সদৃশ ছিল, চিত্র দর্শন করিয়া ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সভাপতি চিত্রখানি ধারণ করিয়া, উপস্থিত যুবকবৃন্দের নিকটে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিলেন। তিনি যে ষোড়শ বর্ষ বয়সে সে সময়ের দুর্গম পথ অগ্রাহ্য করিয়া তিব্বতপর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করত, সকলকে তাদৃশ সংসাহসসম্পন্ন হইতে অনুরোধ করিলেন। ইনি কি

প্রকার স্বদেশের ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কি প্রকার নির্ভীকতার সহিত ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের সম্মুখে কোম্পানীর রাজ্যশাসনপ্রণালীর দোষ সকল উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিলেন। পরিশেষে চিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, উদ্দীপ্তহৃদয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে সম্বোধন করিয়া, উৎসাহ ও ভাবোদ্দীপক এমন সকল কথা বলিতে লাগিলেন যে, তাহাতে সকলেরই মনে চিত্রখানি জীবিত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। যুবকবৃন্দ সময়ে সময়ে এই স্থানে আসিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চিত্রদর্শনপূর্ব্বক মৃত মহাত্মার ন্যায় সম্পন্ন হন, এজন্য তিনি অনুরোধ করিলেন। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ বৎসরে বৎসরে ধর্ম্মবিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট ছাত্রকে মেডল দেওয়া হয়, সভাপতি প্রস্তাব করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে অনেকে ঐ স্থানেই চাঁদা অর্পণ করেন।"

মল্লিকের ঘাটে বক্তৃতা—'পায়রা উড়ান'

৩রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী), শনিবার। অদ্য মল্লিকের ঘাটে অপরাহ্ণে হিন্দী বাঙ্গলা উড়িষ্যা ভাষায় বক্তৃতা হয়। সহস্রাধিক ব্যক্তি উপস্থিত। ভাই অমৃতলাল বসু ও শ্রীযুক্ত লালা কাশীরাম হিন্দী ভাষায়, বালেশ্বরবাসী শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাস উড়িষ্যাভাষায় এবং ভাই দীননাথ মজুমদার বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে কেশবচন্দ্র যাহা বলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে (বিস্তৃতভাবে ধর্ম্মতত্ত্বে ও "মাঘোৎসব" পুস্তকে দ্রষ্টব্য):—

"এদেশের বড়মানুষ ও নবাবদের মধ্যে আমোদ প্রমোদ করিবার অনেক উপায় আছে। পায়রা উড়ান তার মধ্যে একটা।......পায়রা উড়ান একটা অসার সামান্য ব্যাপার হইলেও, ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে। পায়রা দলবদ্ধ হইয়া উড়ে কেন? আমার মনে হয়, এই উপস্থিত ভদ্রলোকগুলি পায়রার খাঁচা। চিন্ময় জীবাত্মা পাখী এক খাঁচার ভিতরে থাকে, পাখী স্ত্রীপুত্র লইয়া গৃহে থাকে না। সে যখন প্রথমে ভাল ছোট খাঁচার মধ্যে সতেজ হইল, তখন উড়িল। ভাই বন্ধু, এখন কি সবল হইয়াছ? জীবাত্মা পক্ষী, বিবেক বৈরাগ্য তার দুইটি পক্ষ। পাখী ঐ দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িয়া যায়।......যোগী ঋষিদিগের আত্মা-পক্ষী উড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমাদের পাখী উড়ে না। তাঁহারা যোগমন্ত্রে সব উড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা সেই মাটীতেই আছি।

আমরা যদি বলি, ওরে বাড়ী, ছোট হ, ছোট হয় না ; ওরে সোণা, তুই ধূলি হইয়া যা, সে ধূলি হয় না। ওরে পাখী, শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িয়া যা, সে মায়াবন্ধন ছেঁড়ে না, পাখী উড়ে না। তবে কি আকাশের বিহঙ্গ উড়িবে না ? আমি বলি, ইহার একটি উপায় আছে। খুব উচ্চ স্থানে যাও, দেখিবে, পৃথিবীর বস্তু সব ছোট হইয়া গিয়াছে।······পৃথিবীতেই জাতিভেদ, কিন্তু আকাশে এক।··· তুমি বাঙ্গালী কাল, তুমি কাফ্রি আরও কাল, তুমি ইংরেজ শাদা, কিন্তু আকাশে সব এক। চিদাকাশে আত্মা পায়রা উড়িল, জ্ঞানসূর্য্যের আলোক পক্ষীর পক্ষের উপর পড়িল, সত্যসূর্য্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ভ করিল। যোগী হইয়া বিহঙ্গ সকল উড়িতেছে। হিংসা নিন্দা নীচে, চিন্তা দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম ক্রোধ স্বার্থপরতা মাটীতে বাস করিলেই হয়। আকাশে এসব কিছুই নাই।······পৃথিবীতে কেবল গণ্ডগোল। ধার্ম্মিকগুলো ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ করে, হিন্দু মুসলমানের বক্ষে অস্ত্র চালায়, আর মুসলমান হিন্দুর মস্তক কাটে, শাক্ত বৈষ্ণবকে ঘৃণা করে, বৈষ্ণব শাক্তকে দেখিতে পারে না। ছেলের দেবতা এক, আর বুড়োর দেবতা কি আর এক ? পৃথিবীতে মারামারি, ভিন্নতা, আকাশে সব এক জাতি। আমরা যে মূলে এক জাতি, সকলে যে এক আর্য্যসন্তান।······এস, আমরা সকলে শাখা, মূলে এক হইয়া যাই। দেখ, বিষয়কর্ম্ম লইয়া কেবল দলাদলি, আমাদের ও সব এখানেই পড়ে থাকে। আত্মাতো ঈশ্বরের দাস, সেতো এ সব ভোগ করে না।······আত্মা-পাখী আসেন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী হইয়া। আত্মা আকাশে চলে যায়, আকাশের পাখী আকাশে উড়িয়া যায়। আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। অপবিত্র দৃষ্টিতে দেখে দেখে দুই চক্ষু মলিন হইল। এখন যোগানন্দে বিমলানন্দে প্রাণ মোহিত না হইলে আমার সুখ কোথায় ? বৈরাগ্যের শিক্ষাদাতা পাখী, তুমি আমায় বৈরাগ্য শিক্ষা দাও। গুরু পাখী, বাড়ী তোমার আকাশে, গম্য স্থান তোমার চিদানন্দ। দুটি চক্ষু বন্ধ করে আকাশে উড়। আর আমায় তোমার সুমিষ্ট কথা বল। চিদানন্দের পাখী, তুমি আর এখানে কেন ? আর তোমার স্ত্রী কৈ, স্বামী কৈ, বালক বালিকা, পিতা মাতা কৈ ? এখানে স্বামীও নাই, পিতাও নাই, সব চিদানন্দের পাখী। তুমি যদি হরিতে মগ্ন না হও, খাঁচায় বদ্ধ থাকিবে। এই আকাশে যোগযানে গমন কর। হরি যখন শিকারী হয়ে

এই পাখীকে আকাশে লইয়া যান, তখন আর সে ফেরে না। পাখী, সেই সচ্চিদানন্দের আকাশে যাও, সেই পিত্রালয়ে গিয়া নিত্যসুখ ভোগ কর।”

৪ঠা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী), রবিবার, প্রাতে ও সায়ঙ্কালে (ব্রহ্মমন্দিরে) উপাসনা; ৫ই মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরাজী বক্তৃতা।

‘আশালতার’ নির্বাণ

৬ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী), মঙ্গলবার, আলবার্ট স্কুলের ছাত্রবৃন্দের ‘আশালতার’ নির্বাণ। এই উপলক্ষে কমলকুটীরে প্রায় চারি শত লোকের সমাগম হয়। রেবারেণ্ড ডল, অক্সফোর্ড মিশনের ব্রাউন এবং মেক্‌ডোলান সাহেব, শ্রীযুক্ত নেবাল রাও, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে সুরারাক্ষসের প্রতিমূর্ত্তি দগ্ধ করা হয়।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক

“৭ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী), বুধবার অপরাহ্ণে, আল্‌বার্ট হলে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক। কার্য্যবিবরণ পাঠানন্তর ছাত্রগণকে যে প্রশ্ন দেওয়া হয়, তাহা এবং তত্তৎপ্রশ্নের উত্তর এক এক ছাত্রকর্ত্তৃক পঠিত হয়। অক্সফোর্ড মিশনের উইলিস সাহেব জন ষ্টুয়ার্টমিলের অনুসরণ করিয়া, মনুষ্য ধর্ম্মগ্রন্থের সাহায্য ভিন্ন ঈশ্বরের অক্ষুণ্ণ প্রেম বুঝিতে পারে না, বলিলেন। ইহাতে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মনুষ্যহৃদয়ের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ দ্বারা যে এ অভাবপূরণ হয়, তাহা প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর সভাপতি (কেশবচন্দ্র) উপযুক্ত মীমাংসা সহকারে, উপাসনা প্রার্থনার প্রধানোপায়ত্ব দেখাইয়া দিলে সভাভঙ্গ হইল।”

মঙ্গলবাড়ীর উৎসব এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন

৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী), বৃহস্পতিবার (প্রাতে) মঙ্গলবাড়ীর উৎসব, ব্রাহ্মভোজন ; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন (সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে) হয়। গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠ ও পরিগ্রহানন্তর ভোলানাথ সারাভাই, গোপাল রাও প্রভৃতি বম্বে প্রার্থনাসমাজের প্রধান ১৮জন সভ্য কর্ত্তৃক সভাপতির নামে লিখিত পত্রিকা তিনি সভায় উপস্থিত করেন। তাঁহাদের অভিলাষ এই, ব্রাহ্মসমাজ নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া হীনবল না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা হয়। পত্রিকা সভায় গৃহীত হইয়া, শীঘ্র উত্তর লেখা হইবে, স্থির হইল।

এতদ্বিষয়ের আলোচনার পর নির্দ্ধারণ হইল—"নববিধানের প্রধান মত সকল ইংরাজী, বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ্দু, সিন্ধী, মহারাষ্ট্রী, সংস্কৃত, উড়িয়া, তামিল এবং তেলেগু ভাষায় নিপিবদ্ধ হইয়া বিতরিত হয়।" সভায় ক্রমে এই সকল প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হয় :—

"সভ্যতর দেশের বিভিন্নাংশে বিজ্ঞান এবং উদার জ্ঞানের যে উন্নতি হইতেছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মন্দির দৃঢ়তর হইবে, বিশ্বাস করিয়া, এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।"

"কলিকাতা এবং মফঃস্বলে যাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং তাঁহাদিগের পরিবারের সাহায্যার্থ প্রচারবিভাগে দান অথবা অন্য প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি:সভা সরল ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন।"

"ব্রাহ্মসমাজে যে অনেক বিভাগ ও বিভাগের বিভাগ হইতেছে, তজ্জন্য এই সভা দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন এবং বিশ্বাস করেন ও প্রার্থনা করেন যে, যথাসময়ে নববিধানে সমুদায় মিলিত হইবে।"

(এই প্রস্তাবের প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত নেবাল রাও বলেন, "যদিও নানা বিভাগে বিভক্ত হওয়া দুঃখকর বটে, তথাপি তাঁহার এক বিষয়ে এই আহ্লাদ যে, এই দুঃখের ব্যাপারের মধ্যে আনন্দের বিষয় আছে। কেন না বিভাগ ও স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন পরিশেষে সমুদায়ের একতা সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কোথায় এই একতা হইবে, জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি অনায়াসে নববিধানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে পারেন। যদি কেহ তাঁহাকে নববিধানী বলিয়া সম্বোধন করে, তবে তাহাতে তিনি লজ্জিত না হইয়া, আহ্লাদিত হইবেন। কারণ নববিধান স্বীয় প্রাশস্ত্যে সমুদায়কে এক করিবে।")

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরোধিগণ, যাঁহারা বিবিধ উপায়ে ইহার কার্য্য প্রতিরুদ্ধ করিতে যত্ন করিয়াছেন, ইহার সভ্যগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, ইহার কার্য্যকারকগণকে নিন্দিত ও অন্য প্রকারে প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন, এই সভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন; কেন না তদ্দ্বারা তাঁহারা পাকতঃ যথার্থ বিশ্বাসিগণের ভক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়াছেন।"

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ইংলণ্ডের কি প্রকার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তৎপ্রতি সভাপতি সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, প্রোফেসর

মনিয়র উইলিয়ম এবং ভট্ট মোক্ষমূলর টাইম্‌সে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রচারকসভা হইতে সেই দুই পত্রেরই উত্তর লিখিত হইয়াছে। এ পত্র যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, প্রোফেসর মনিয়র উইলিয়ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে তিনি যে পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে এ সংশয় তিরোহিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :—'আমি অক্সফোর্ড এবং অন্যত্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে যে দুই বক্তৃতা করিয়াছি, তাহা অবশ্য আপনি এত দিন শুনিতে পাইয়াছেন। যদি সে বক্তৃতা পত্রিকায় দেখা হইয়া থাকে, তবে যেন বুঝা হয় যে, এখনও উহা পরিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয় নাই। অবশ্য আমি আপনাদের মণ্ডলীতে যে বিভাগ হইয়াছে, তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছি; কিন্তু যত ক্ষণ না আমি উভয় দিকের বিবরণ লাভ করিতেছি, তত দিন বক্তৃতা প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত থাকিব। এ বিষয় নিশ্চয় জানিবেন, আমার অভিলাষ কেবল সত্য বলা।' "

অন্যতর দুইটি প্রস্তাব এই :—"ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমুদায় অযথা লিপি খণ্ডন করিয়া সাধারণের মনের অযথাসংস্কার দূর করেন।" "শ্রীশ্রীমতী সম্রাট্ ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার শাসনে যে প্রভূত কল্যাণসম্ভোগ হইতেছে, তজ্জন্য সমুদায় রাজভক্ত ব্রাহ্মগণের হৃদয়ের যথোচিত ধন্যবাদ অর্পিত হয়।"

প্রচারকগণের নামের পূর্ব্বে 'শ্রদ্ধেয় ভাই' উপাধি

সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি বলিলেন, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের নামের অগ্রে কোন একটি উপাধি সংযুক্ত করা হয়। অনেক দিন হইল, 'ভাই' নাম প্রচলিত হইয়াছে। এ নাম ব্যতীত অন্য নাম, যেমন বাবা প্রভৃতি, সংযুক্ত হওয়া সমুচিত নহে। কেন না তাহাতে দোষ আসিবে। ব্রাহ্মসমাজ 'ভাই' ভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারেন না। কারণ 'ভাই' নাম সাধারণের সঙ্গে সমতা, ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং যথার্থ বিনয় প্রকাশ করে। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন, তাঁহাদিগের নামের অগ্রে 'শ্রদ্ধেয় ভাই' এই উপাধি সংযুক্ত করা হয়।"

আর্য্যনারীসভায় উপাসনা

৯ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী), শুক্রবার, আর্য্যনারীসভায় (কমলকুটীরে) উপাসন হয়। "আর্য্যনারীগণ মাতার মাতৃভাব আপনাদিগের মধ্যে লুকাইয়া

রাখিয়াছেন, তাঁহারা চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী, এই বিষয়টী উপদেশে এমন সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছিল যে, উপস্থিত নারীমণ্ডলী একেবারে অশ্রুনীরে ভাসিয়াছিলেন। সে সময়ে কাহারও কাহারও উচ্ছ্বাস প্রার্থনাতে পরিণত হইয়াছিল। ইহারই আবেগে অপরাহ্নে সাধনমধ্যে সঙ্কীর্ত্তন প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।" সায়ঙ্কালে কমলকুটীরে খ্রীষ্টের ক্রুশে নিহত হইবার বিষয়ে কথকতা ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়।

'আমরা নববিধানের প্রেরিত' বিষয়ে টাউনহলে ইংরেজী বক্তৃতা

১০ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী), শনিবার, টাউনহলে কেশবচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় 'আমরা নববিধানের প্রেরিত' (We Apostles of the New Dispensation)। অন্যান্য বর্ষাপেক্ষা এবৎসর শ্রোতৃসংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়ে যে, বসিবার আসন যোগানতো কঠিন হয়ই, আসনাভাবে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অতিকষ্টে গায়ে গায়ে লাগিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। টাউনহলের পূর্ব্বপশ্চিম উভয় দিক্ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, লোক সকলের স্থান করিয়া দিতে গিয়া বক্তৃতারম্ভ যথাসময়ে হইতে পারে নাই। অন্য অন্যবারের অপেক্ষা ইউরোপীয় শ্রোতার সংখ্যাও অধিক। এই শ্রোতৃবর্গমধ্যে ইউরোপীয় মহিলাও ছিলেন। শ্রোতৃসংখ্যা তিন সহস্রের অধিক হইবে। গবর্ণর জেনেরেলের মিলিটারি সেক্রেটরি, মেজর হোওয়াইট, কর্ণেল চেস্‌নে, মেস্তর ক্রুক্‌স, অক্সফোর্ড মিশনের রেবারেণ্ড উইলিস্, ব্রাউন এবং হরন্‌বি, কর্ণেল পার্কার, মেস্তর রইচ, মেস্তর হার্ব্বি, মেস্তর কমিন্‌স্, মেস্তর ডল, মেস্তর মে, মহারাজা কুচবিহার, বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এবং অন্যান্য অনেকে শ্রোতৃমধ্যে ছিলেন। 'সত্য জ্ঞানমনন্তং' উচ্চারণ করিয়া কার্য্যারম্ভ হয়, সঙ্গীত-প্রচারক "কি অপরূপ দেখিনু নববিধানে" এই সঙ্গীতটি গান করেন। বক্তৃতার সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে:—চারি দিক্ ঘোর অন্ধকারে আবৃত। মধ্যে কেবল মৃতধর্ম্মমতাদির কঙ্কাল নিপতিত। উহারা বলিতেছে, আমাদিগের অস্থি শুকাইয়া গিয়াছে, আমাদের সকল আশা তিরোহিত হইয়াছে। না, তাহাদের আশা তিরোহিত হয় নাই। প্রাতঃকালের প্রাণদ বায়ু প্রবিষ্ট হইল। অস্থি সকল একত্রিত হইল, অস্থিতে অস্থিতে সংযুক্ত হইল, জীবনলাভ করিল, একটি সুবৃহৎ সৈন্যদল দণ্ডায়মান

হইল। সমুদায় দেশের, সমুদায় কালের শাস্ত্র ও ধর্ম্মবিধান, ভবিষ্যদ্দর্শী মহাজন, ঋষি ও ধর্ম্মার্থনিহতগণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিধানের জন্মস্থান আসিয়ায় আবার একটি নূতন বিধান জন্মগ্রহণ করিল। চারি দিক্ আনন্দ-ধ্বনিতে পূর্ণ হইল। সেই বিধানের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতে আমি উপস্থিত। "কিন্তু আমিই বা কেন সকলে থাকিতে নববিধানের প্রবক্তা মনোনীত হইব? অথচ আমি বলিতেছি, তাহা নহে, কিন্তু আমরা। দৃশ্যমান 'আমির' পশ্চাতে অদৃশ্যমান 'আমরা' রহিয়াছি। আমার মধ্য দিয়া আমার মণ্ডলী বলিতেছে। ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে অপর সকলে আছেন, যাঁহারা আমার সঙ্গে কাজ করিতেছেন। আমার পশ্চাতে, আমার চারিদিকে সহযোগী প্রেরিতগণ আছেন, যাঁহারা, আমি যেমন, তেমনি ভাবেন, অনুভব করেন, এবং জীবনধারণ করেন, আমার সঙ্গে ভাবেতে মিলিত, পৃথিবীতে নব-বিধান প্রচার করাই যাঁহাদিগের কার্য্য। হাঁ, একটি মণ্ডলী আছে, একটি শরীর আছে, আমি যাহার কেবল একটি অঙ্গমাত্র। আমি কি একাকী সে মণ্ডলীর প্রতিনিধি হইতে পারি? আমি কেবল উহার একটি অংশমাত্র। একটী সেনাতে কখন সৈন্যদল হইতে পারে না, আমি একা কখন মণ্ডলী হইতে পারি না। অতএব অনেকের মধ্যে এক জন বলিয়া আমাকে গ্রহণ করুন। আপনাদের সম্মুখে আপনারা কি এক জন ব্যক্তি দেখিতেছেন? আপনাদের শোচনীয় ভ্রম হইয়াছে। নববিধানের ভারপ্রাপ্ত এক দল প্রেরিত অবলোকন করুন। যখন আমি বলি, তাঁহাদের স্বর আমার মধ্য দিয়া কথা বলে। কারণ আমরা অবিভক্ত একাবয়বসম্পন্ন মণ্ডলী।" "আমার বন্ধুগণ এ বিষয় নিশ্চয় জানুন, যখন আমরা মরিব এবং চলিয়া যাইব, এ সকল দিনে আমাদের চারিদিকে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, সে সকল লিখিত এবং ইতিহাসে নিবদ্ধ হইবে এবং ভবিষ্যবংশের নিকটে ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ করুণার নূতন শুভসংবাদ হইবে।" এই মণ্ডলীমধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিয়া ইহার পরিচালনা করিতেছেন। ভারতের নানা দিক্ হইতে তিনি লোকসংগ্রহ করিয়া একটি বৃহৎ বিশ্বাসী সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যের উপযুক্ত এক দল প্রেরিত তিনি নিযুক্ত করিয়াছেন, যাঁহাদিগের আহার পরিচ্ছদ তিনি আপনি যোগান। ইহারা এই বিধানের ঘোষণাজন্য নিযুক্ত। যিহুদী

খ্রীষ্ট বিধান প্রভৃতি বিধানের ন্যায় এ বিধান। যখন এ বিধানকে সে সকল বিধানের সমান করিতেছি, তখন ঈশা প্রভৃতির গৌরব হরণ করিবার জন্য আমরা উদ্যত। কেবল তাহা নহে, সে সকল বিধানের যেমন এক জন মধ্য-বিন্দু ছিলেন, আমি সেই স্থান অধিকার করিতেছি। আমি তাঁহাদের গৌরব হরণ করিতে আসি নাই, একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, অথচ দোষদর্শিগণ এ কথায় বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের এরূপ করা নিশ্চয় ন্যায় ও দয়াসঙ্গত নয়। আমি অবশ্য বলিব, "আমি ঈশার শুভসংবাদের সহিত সংযুক্ত এবং উহার মধ্যে আমার প্রধান স্থান। খ্রীষ্ট যে অমিতাচারী পুত্রের কথা বলিয়াছেন, আমি সেই, এবং আমি অনুতপ্তহৃদয়ে পিতার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যত্ন করিতেছি। আমার বিরোধিগণের শিক্ষা ও আনন্দবর্দ্ধনের জন্য আমি আরও বলিতেছি,আমি ঈশা নই, কিন্তু আমি জুডাস, সেই ঘৃণিত ব্যক্তি, যে তাঁহার ক্রোধান্ধ নিগ্রহকারী শত্রুগণের হস্তে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল।" "সেই পরিমাণে আমি জুডাসের ন্যায়, যে পরিমাণে আমি পাপ ভালবাসি।" "সম্ভবতঃ এরূপ বলা হইবে, প্রত্যেক বিধানের এক জন মধ্যবিন্দু আছেন; সুতরাং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মুষা বা চৈতন্যের ন্যায় পরিগৃহীত হইতে আমাকে দিতে হইবে। আপনাদিগকে আমায় বলিতে দিন, ইহা অসম্ভব। কারণ আমরা নূতন বিধানের প্রতিনিধি হইয়াছি। ইহার বিভেদক লক্ষণ অপরোক্ষতা, মধ্যবর্ত্তী অস্বীকার। অন্যান্য বিধানে ঈশ্বর এবং পাপী জগতের মধ্যে মধ্যবর্ত্তিত্বসাধক বিশেষ ব্যক্তি আছে; ইহাতে না আছে মধ্যবর্ত্তী, না আছে অপরের হইয়া প্রার্থী, না আছে এমন আর কিছু। আমার সমবিশ্বাসীর এক জনও পরের হাতে ঈশ্বরকে গ্রহণ করেন না। প্রার্থনার জন্য আমার বা অপর ব্যক্তির উপরে নির্ভর করা অধর্ম্ম এবং অন্যায় বিবেচনা করিয়া, আলোক ও পরিত্রাণের জন্য তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বয়ং ঈশ্বরের নিকটে গমন করেন।" "নূতন শুভসংবাদ প্রত্যেক ব্রাহ্মকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ঈশ্বর পূজা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। বর্ত্তমান বিধানের এই বিশেষ ভাব, এবং হইতে পারে, আর সমুদায় বিষয়াপেক্ষা এ বিষয়ে অন্যান্য বিধান হইতে ইহার ভিন্নতা।" এ বিধানে যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তেমনি ইহাতে সর্ব্বান্তর্ভাব-কত্ব। একত্ব ইহার জীবন। ঈশ্বর সমুদায় সত্য, সমুদায় কল্যাণের ঐক্যস্থল। একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের বিজ্ঞান, ঈশ্বরানুভূতির দর্শনশাস্ত্র; বহুদেববাদে বিজ্ঞান নাই,

ন্যায় বা দর্শন নাই ; ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণ ভিন্ন করিয়া লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন বিজ্ঞানবিরোধী। ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও স্বরূপ যেমন ইহাতে একত্বলাভ করিয়াছে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বিধান ইহাতে এক হইয়াছে। একতাই বিজ্ঞান, একতাতেই পরিত্রাণ। বিধানে বিধানে যে যোগ আছে, সাধারণ লোকে তাহা দেখিতে পায় না ; তাহারা কেবলই বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখে। নববিধান বিধানে বিধানে একতার সূত্র বাহির করিয়াছেন। তিনি আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন—"আমি অবশেষে বিধানবিজ্ঞান পাইয়াছি ঃ—বহুত্বের ভিতরে একত্ব। এখানে হিন্দুধর্ম্ম, সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম ; আমার নিকটে তাহারা একসূত্রে বদ্ধ। এখানে যিহুদিধর্ম্ম, সেখানে খ্রীষ্টধর্ম্ম ; আমি এই দ্বিত্বের ভিতরে একত্ব দেখি।" অবৈজ্ঞানিকগণ মুষা ও ঈশাকে ভিন্ন করে, প্রকৃত বিজ্ঞান মুষার ভিতরে ভবিষ্যৎ ঈশাকে দর্শন করে। মুষার পূর্ণতা ঈশাতে। ভয়েতে জ্ঞানের আরম্ভ, প্রেমে উহার পূর্ণতা। মুষা ও ঈশা যখন এক হইলেন, তখন পল আসিলেন। যখন ঈশা বলিলেন, তাহারা ধন্য, যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করে, তখনই ঈশার চক্ষুর সন্নিধানে পল ছিলেন। 'আমার পক্ষে জীবন ধারণ করাও যা, খ্রীষ্টও তা' এ কথা বলিবার জন্য পলের প্রয়োজন ছিল। পল যেমন দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য, তেমনি খ্রীষ্টের জীবনের সুকোমল দিক্ দেখাইবার জন্য জনের প্রয়োজন। 'আমি তাহাদিগেতে, তুমি আমাতে' 'আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা প্রশাখা' ঈদৃশ গুরুশিষ্যের একত্বমূলক হৃদয়স্পর্শী বাক্য চরম শুভসংবাদে বহুল। জন ভাবে, পল ধর্ম্মমতে খ্রীষ্টের সহিত এক। না দেখিয়াও চিন্তাতে কেমন এক হওয়া যায়, পল তাহা দেখাইলেন। এখানেই কি শেষ হইল ? না, 'প্রাচীন ধর্ম্মনিবন্ধনের' পর যেমন 'নবীন ধর্ম্মনিবন্ধন', তেমনি পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় প্রাচীন বিধানের পর নবীন ধর্ম্মবিধান। আমরা কি পল এবং ঈশার প্রেরিতবর্গের দাস নই ? মুষা বিবেকের অবতরণভূমি ছিলেন ; বিবেকের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান মিলিত হউক, নববিধান হইবে। নববিধান ঈশার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা। তিনি কি বলেন নাই, পবিত্রাত্মা পৃথিবীকে 'সমগ্র সত্যে' লইয়া যাইবেন ? পূর্ণ সময়ে বিধান আসিবে, যাহাতে স্বর্গ ও পৃথিবীর সমুদায় বিষয় খ্রীষ্টেতে এক হইবে, পল কি ইহা বলেন নাই ? আমাদের প্রাচীন ভারতার্য্যপূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মে আমাদের জীবন গঠিত,

২১১

একথা যেমন সত্য, তেমনি খ্রীষ্টও আমাদের জীবনকে পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাও তেমনি সত্য। পল যিহুদী ও বিধর্ম্মীদিগকে এক করিয়াছেন, বর্ত্তমান বিধানের পলগণ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, হিন্দু ও যবন, আসিয়ায়িক ও ইউরোপীয়গণের প্রভেদ নবীন প্রেমের শুভবার্ত্তাতে তিরোহিত করিয়া দিবেন। কেবল বর্ত্তমান সময়ের কথা কেন বলিতেছি, এই বিধান অতি প্রাচীন কালের আখ্যায়িকাস্থ আদিমানব ও খ্রীষ্টের ভিতরে যোগপ্রদর্শন করেন। আদিমানব স্বভাবতঃ যখন বিশুদ্ধ ছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা সহজভাবে পালন করিতেন, তখন খ্রীষ্ট কি তাঁহার ভিতরে ছিলেন না ? যাই তাঁহার পতন হইল, অমনি খ্রীষ্ট অন্তর্হিত হইলেন। আবারতো মিলন চাই, তাই খ্রীষ্ট আসিলেন, দেব ও মানবের অনৈক্য তাঁহাতে ঘুচিয়া গেল। আদিমানব হইতে খ্রীষ্ট, খ্রীষ্ট হইতে আজ পর্য্যন্ত কেমন একতা। জাতীয় অভাবানুসারে কত মহাজন, কত দেশসংস্কারক, কত শাস্ত্র, কত বিধান এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া আসিলেন। কত বিধান ভগবান্ মানবজাতির নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও কত প্রেরণ করিবেন। কিন্তু সে সকলের বহুত্বের ভিতরে কি আশ্চর্য্য একত্ব। খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে বহুত্ব, অখণ্ডভাবে দেখিলে মানবজাতির পরিত্রাণের একই অভিপ্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সমুদায় বিধানকে একীভূত করিলে, ঈশ্বরেতে এবং সত্যেতে একত্ববশতঃ উহারা বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্যে পরিণত হয়। নববিধানের আর একটি বিশেষ লক্ষণ, আত্মিক করিয়া লওয়া। ঈশ্বর কেবল ব্যক্তি নন, তিনি চরিত্রও। ব্যক্তি বলিয়া আমরা যেমন তাঁহার পূজা করি, চরিত্র বলিয়া আমরা তেমনি তাঁহার চরিত্রে চরিত্রবান্ হই। পূজা বৃথা, যদি তাঁহার চরিত্র আমাদের চরিত্র না হয়। 'তুমি আছ' ইটি বিশ্বাসের প্রথম কথা, 'তুমি আমার জীবন ও আলোক' ইহা শেষ কথা। মহাজনগণ-সম্বন্ধেও এইরূপ। ও ঈশা, ও মুষা, এরূপ করিয়া সম্বোধন করা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। ঈশা যদি আন্তরিক শক্তি, জীবন্ত ভাব, আত্মচৈতন্যগত বাস্তবিক বস্তু না হইলেন, তাহা হইলে কি হইল ? আমরা যে সাধুসমাগমে প্রবৃত্ত হই, তাহা এই আত্মিক করিয়া লওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। দেশকালের ব্যবধান ঘুচাইয়া, আমরা ভাবেতে সাধুগণ সহ এক হই ; তাঁহারা আমাদিগেতে প্রবেশ করেন, আমরা তাঁহাদিগেতে প্রবিষ্ট হই। তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী নন, তথাপি আধ্যাত্মিক ভাবে

আমাদের জীবনে ও চরিত্রে আকৃষ্ট হন। আত্মার অন্যান্য সামর্থ্যমধ্যে সংক্রমণ-সামর্থ্য আছে। এই সামর্থ্য আছে বলিয়াই, দেশবিদ্বেষী দেশহিতৈষীর সঙ্গে বসিয়া পরিবর্ত্তিতহৃদয় হয়। উচ্চমনা ব্যক্তিগণের সঙ্গে বসিলে, পাপীরও মন মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, অজ্ঞাতসারে সহজে তাঁহাদিগের মধ্যে যাহা ভাল আছে, সত্য আছে, আত্মার ভিতরে তাহা মিশিয়া যায়। আমাদিগের যে সহানুভূতি আছে, সেই সহানুভূতিতে স্বার্থের বন্ধন খসিয়া পড়ে, অপরের দুঃখে দুঃখী করে; আমাদিগকে অপরের সহিত এক করিয়া দেয়, এক জন আর এক জনেতে বাস করে। নির্দ্দোষ ঈশা অপরের পাপভারে ভারাক্রান্ত, পাপীর দুঃখে তিনি দুঃখী। সহানুভূতিতে তিনি মানব-জাতির সহিত এক হইয়াছিলেন। ঈশা যে সাধুশোণিতমাংসপানভোজনের ব্যবস্থা করিলেন, তন্মধ্যে বাহিরের দৃষ্টান্তকে আত্মিক করিয়া লওয়া সহানুভূতির কার্য্য। যদি আমি ঈশার শোণিতমাংস পানভোজন করি, তাহা হইলে এ হাত আমার হাত নয়। আমি যখন এই হাত চুম্বন করি, ঈশার হাত চুম্বন করি। ঈশার সম্বন্ধে যেমন হয়, তেমনি অন্যান্য সাধু মহাজনগণসম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তাহা যখন আত্মস্থ হয়, তখন ঈশ্বরেতে ঈশ্বর-পুত্রগণের সঙ্গে একতা উপস্থিত হয়। এইরূপে তাঁহাদের ভাব, তাঁহাদের চরিত্র আমাদের ভাব, আমাদের চরিত্র হইয়া যায়। এই প্রণালীতে এক জাতি অন্য জাতির সহিত একীভূত হয়। এক জাতির অভাব অন্য জাতির সম্মিলনে পূর্ণ হয়; জাতীয় স্বভাব পূর্ণতা লাভ করে। আমরা হিন্দু, আমাদের মধ্যে যোগ-সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্যে দেশকালের ব্যবধান ঘুচাইয়া, বাহিরের ঈশ্বর ও বাহিরের মানবজাতিকে আমরা আত্মস্থ করি। জ্ঞান ও বিশ্বাস, বিজ্ঞান ও যোগ, মতনিষ্ঠা ও ভক্তি, সাংসারিক বুদ্ধি ও বৈরাগ্য, দর্শন ও কার্য্য, এইরূপে ইহাদের যোগ ঘটিবে; হিন্দু যবন ইত্যাদি ভেদ-বুদ্ধি চলিয়া যাইবে; শাস্ত্রে শাস্ত্রে বিরোধ থাকিবে না, সমগ্র পৃথিবীর সাম্প্রদায়িকতা অন্তর্হিত হইবে। সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র খ্রীষ্ট অপসারিত করিয়া, সকল কাল, সকল মতের বৃহত্তম খ্রীষ্টে সকলে এক হইবেন। এইরূপে নববিধানেতে সমুদায় শাস্ত্র, সমুদায় মহাজন, সমুদায় বিধানের একতা। নববিধানের পতাকার সম্মুখে সকল জাতি এক হইয়া, ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করুন।

সাধুশোণিতমাংসপানভোজন দ্বারা পৃথিবীর সমুদায় সাধু মহাজনগণকে আত্মস্থ করিয়া সকলে বলুন, "ঈশা আমার ইচ্ছা, সক্রেটিস্ আমার মস্তক, চৈতন্য আমার হৃদয়, হিন্দুঋষি আমার আত্মা, দেশহিতৈষী হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।" এইরূপে একীভূত হইয়া আমরা নব শুভসংবাদের সাক্ষ্যদান করিব। সাধু মহাজনগণেতে যে বিবিধ সত্য অবতরণ করিয়াছিল, সেই সকল সত্য স্বর্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক আমাদের চরিত্রের সামঞ্জস্য সম্পাদন করুক, যে সামঞ্জস্যে নিত্য জীবন ও পরিত্রাণ।

দিনব্যাপী উৎসব

১১ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী), রবিবার। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "অদ্য উৎসবের দিন। সুদীর্ঘ প্রাস্তুতিক ব্যাপারের পর উৎসবের জন্য কি প্রকার উৎসুকতা জন্মিতে পারে, সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারেন। নবোদিত সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মমন্দির ব্রাহ্মমণ্ডলীতে পরিশোভিত হয়। স্বভাবের মনোহর শোভা ক্রোড়স্থ করিয়া পুষ্পবৃক্ষকাদিতে মন্দিরের সৌন্দর্য্যের পরিসীমা ছিল না। প্রাতঃকাল মধুর সঙ্গীত-যোগে সকলের হৃদয়কে উপাসনার জন্য প্রস্তুত করিলে, আচার্য্য শান্ত গম্ভীর মনোহর মূর্ত্তিতে বেদীকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন করিলেন। তাঁহার উদ্বোধন অনুদ্বুদ্ধ হৃদয়সকলকেও উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম। যাঁহারা উপাসনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয় যে তদ্দ্বারা অতি বেগে ব্রহ্মাভিমুখে ধাবমান হইল, ইহা কি আর বলিতে হয়? আরাধনা, ধ্যান প্রভৃতি উপাসনার প্রথমাঙ্গ দীর্ঘতম হইলেও, ব্রাহ্মমণ্ডলী প্রশান্তমনে তাহাতে এমন যোগ দিয়াছিলেন, যেন দীর্ঘতর উপাসনা করা তাঁহাদিগের প্রতিদিনের অভ্যস্ত ব্যাপার। বিষয়কর্ম্ম যাঁহাদিগকে উপাসনার জন্য উপযুক্ত অবকাশ দেয় না, যে টুকু সময় প্রাপ্ত হন, তাহাও আবার চিত্তবিক্ষেপের বাহুল্যবশতঃ অর্দ্ধ ঘণ্টাকেও মিনিটে পরিণত করে, তাঁহারা অদ্য উপাসনার বেগে নীত হইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, সংসার প্রতিদিন তাঁহাদিগকে কি প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমরা আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমরা আশা করি, সময়ে অনেকে মুদ্রিত 'সেবকের নিবেদনে' বিস্তৃতাকারে উহা দর্শন করিবেন। ('সেবকের নিবেদন' ৩য় খণ্ডে "ঈশ্বরের সখ্যভাব" উপদেশটী দ্রষ্টব্য।) উপদেশের বিষয় সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বলিতে হয়, 'একত্ব' (সখ্যভাব)

উহার মূল বিষয় ছিল। গত উৎসবে সাধুমণ্ডলী সহ জননী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, এবার প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে লইয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহারা জননীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইয়া গেলেন। নববিধানাশ্রিত সাধক এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের মর্ম্মাবধারণ করিতে গিয়া জানিলেন, যে পথে সাধুগণ গেলেন, সেই পথে আমাদিগকেও যাইতে হইবে। সাধুগণ যে প্রকার মার সঙ্গে এক হইয়া গেলেন, আমাদিগকেও সেই প্রকার এক হইতে হইবে। তাঁহারা আমাদিগকে সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইতে সঙ্কেত করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা আমাদিগেতে, আমরা তাঁহাদিগেতে, উভয়ে ঈশ্বরে, ইহাই সার।

"সায়ঙ্কালে আরতির সময়ে একটি নূতনবিধ ব্যাপার সমুপস্থিত হয়। সম্মুখে নববিধানাঙ্কিত পতাকা উত্তোলিত হয়, এবং তাহার নিম্নে বেদ, ললিতবিস্তর, বাইবেল, কোরাণ রক্ষিত হয়। প্রেরিতমণ্ডলী এই পতাকার চারিদিকে দণ্ডায়মান হন এবং হস্তে আলোক লইয়া আরতি এবং চামর ব্যজন করেন। দৃশ্যটি অতি চমৎকার এবং গভীর হইয়াছিল। এ সময়ে আচার্য্য প্রেরিতগণকে স্বীকার করেন এবং কি প্রকারে সমুদায়ের সমন্বয়রক্ষা করিতে হইবে, সংক্ষেপে তাহা বলেন *। পরিশেষে একে একে সকলে পতাকাস্পর্শ করেন এবং সেই স্থলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করেন। সায়ঙ্কালের উপাসনার প্রথমাংশের পর, দীক্ষার্থী উপস্থিত পাঁচ ব্যক্তি দীক্ষিত হন। ইহাদের মধ্যে দুই জন উড়িষ্যাবাসী এবং উড়িষ্যাবাসীদের এক জন প্রাচীন সন্ন্যাসী ছিলেন। উপদেশান্তে আচার্য্য মহাশয় বলেন, নববিধানে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা পতাকাস্পর্শ করিয়া, সহজে তাঁহাদিগের বিশ্বাস ব্যক্ত করুন।

* 'কতকগুলি নূতন অনুষ্ঠান' এই শিরোনামে পরে যে অধ্যায় লিখিত হইতেছে, তাহাতে স্বয়ং কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ পতাকাবরণানুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হইবে। এখানে প্রেরিতগণের প্রতি কেশবচন্দ্রের উক্তি মিররে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ভাব এই যে, এই নববিধানপতাকার নিম্নে যে সমুদায় জাতি, সমুদায় দেশ, সমুদায় শাস্ত্র, সমুদায় ধর্ম্ম, সমুদায় মহাজন এবং মানব মানবী বাল বৃদ্ধ যুবার একতা সম্পাদিত হইয়াছে, সেই একতা তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রচার এবং তাঁহাদের জীবনের আলোকে এই একতা সকলের নিকটে প্রমাণিত করিবেন। (সায়ংকালে 'নববিধানের বিজয়নিশান' সম্বন্ধে উপদেশ 'সেবকের নিবেদন' ৩য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।)

সেই স্থলে সেই সময়ে নরনারীতে ৭৪ ব্যক্তি পতাকা স্পর্শ করিয়া আপনাদের বিশ্বাস প্রকাশ করেন। অব্যবহিত পূর্ব্ব এবং পরের সংখ্যা লইয়া গণনা করিলে, শতসংখ্যা পূর্ণ হয়। পতাকাস্পর্শকারিগণ কেবল পতাকা স্পর্শ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, স্পর্শ, প্রণাম, কেহ কেহ আলিঙ্গন চুম্বন করেন। এই ব্যাপারে অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, হয় তো সকলে পতাকাকেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছেন। পতাকা স্পর্শ করিয়া, ব্রতরক্ষার সহায়তার জন্য, ব্যাকুলতাবশতঃ ঈশ্বরকে প্রণাম করিবার ব্যাপারকে, যদি কেহ পতাকাকে প্রণাম করা সংশয় করেন, তবে উপায়ান্তর নাই। যাঁহাদের ধর্ম্মে ঈশ্বরের কোন প্রকারে আকার স্বীকৃত হয় না, তাঁহাদের প্রতি ঈদৃশ সংশয়চিত্ত হইলে, কে তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে?

নগরসংকীর্ত্তন

১২ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী), সোমবার। অদ্য নগরে মহাসঙ্কীর্ত্তন। ৩টার সময় যুবক ব্রাহ্মদল আচার্য্যমহাশয়ের কলুটোলাস্থ পুরাতন বাটী হইতে উৎসাহের সহিত গাইতে গাইতে কমলকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখান হইতে গভীর প্রার্থনানন্তর চারটার পর ভক্তগণ সিংহের ন্যায় মত্ত হইয়া, সংকীর্ত্তনের জয়রবে আকাশভেদ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে রাজপথে বাহির হন। অশ্বপৃষ্ঠে নববিধানাঙ্কিত জয়পতাকা বাহির হইয়াছিল।* গায়কদিগের গলে পুষ্পমালা, গাত্রে গেরুয়া উত্তরীয়, তাঁহারা প্রমত্ত নৃত্যে মেদিনী কাঁপাইয়া, নিম্নলিখিত সংকীর্ত্তনটি করতঃ দুই দলে বিভক্ত হইয়া, অপার সার্কুলার রোড ও বিডন ষ্ট্রীট দিয়া, সন্ধ্যার সময় বীডনপার্কে উপস্থিত হন।

* "নগরসঙ্কীর্ত্তনে চৌদ্দখানা খোল, প্রায় চৌদ্দ জোড়া করতাল, অনেকগুলির রামশিঙ্গা ও ভিগল বাজিয়াছিল। ঘণ্টা ও গং ইত্যাদি বাদ্যও ছিল। নানা বর্ণের উনত্রিশটি বিজয়নিশান বায়ুভরে কীর্ত্তনকারীদিগের মস্তকের উপর আন্দোলিত হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি অশ্বপৃষ্ঠে নববিধানাঙ্কিত সুদৃশ্য সুবৃহৎ পতাকা শোভা পাইয়াছিল। ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ সেনের প্রেরিত 'লা এলা ইল্লিল্লা' অর্থাৎ 'ঈশ্বর একমাত্র উপাস্য' অঙ্কিত সুদৃশ্য পতাকা এক জন পঞ্জাবী ভ্রাতা ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে নূতন নূতন পতাকা প্রেরিত হইয়াছিল। এবার নগরকীর্ত্তন যেরূপ জমাট হইয়াছিল, এ প্রকার আর কখন হয় নাই। মহানগরীর বক্ষ দিয়া যেন একটি ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। বীডনপার্কে এত লোক অন্যবার হয় নাই।"—ধর্ম্মতত্ত্ব—সংবাদ (১৬ই ফাল্গুন, ১৮০২ শক)।

"এবার গাওরে ভাই, আনন্দে আনন্দময়ী জননীর জয়। ইত্যাদি। *

"ছয় সাত শত লোক সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। বীডনপার্ক লোকে লোকারণ্য হয়। প্রায় সাত হাজার লোক বক্তৃতাশ্রবণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে আচার্য্য মহাশয় যে বক্তৃতা † করেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"সীতা-উদ্ধার"

"বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ, চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, ঐ পশ্চিমে সূর্য্য অস্তগিত হইল। পূর্ব্বে যে সূর্য্য গৌরবের সহিত আর্য্য ঋষিদিগকে আনন্দ দিত, এখন আর কি সে সূর্য্য নাই? তবে কি দেশেরও সূর্য্য অস্তমিত হইল? তবে কি সত্যসূর্য্য, প্রেমসূর্য্য অস্তমিত হইল? অসত্য, অপ্রেম, অধর্ম্ম, অন্ধকার কি ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? ভারতে এখন চুরি ডাকাতি হইতেছে। এমন সুখের দিন কোথায় গেল! আর্য্যকুলতিলক যোগী ঋষিগণ চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সেই সূর্য্য কোথায় গেল! হায়! ভারত, তোর ললাটে এত দুঃখ লেখা ছিল। তোমার সে সুখ কোথায় গেল, তোমার সে সুখসূর্য্য কোথায় পলায়ন করিল। ওগো, তোমাদের সামনে যে চুরি হইয়া গেল, সোণার সীতাকে কে লইয়া গেল। সেই সোণার সীতা আজ যে রামের রাজ্ঞী হইবার কথা! হায়, কে লইল? কোথায় রাম রাজা হইবেন, না, একেবারে বনে গেলেন! আর তাঁর প্রিয়তমা সীতা শ্রীরামের অনুগামিনী হইলেন। অযোধ্যা রামবিহনে কাণা হইল।...... ভারতের ধর্ম্মসীতা শত্রুর হাতে পড়িলেন, ব্যভিচার ও নাস্তিকতারূপ দশানন আমাদের মা জননীকে লইয়া গেল।......ধর্ম্মসীতার অদর্শনে ভারতমাতা রোদন করিতে লাগিলেন।......কান্না শুনিয়া ভগবান্ কি বলিলেন? এখনো ভারতে আর্য্যরক্ত আছে। আমার সীতা উদ্ধার কর। পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার কর। জানকীহারা অযোধ্যাকে আবার প্রাণ দেও। দেখ, জানকীকে হারাইয়া রাম বলিলেন, আমার আর আছে কে? সামান্য কাঠবিড়ালী সীতা উদ্ধারের উপায়

* ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, দ্বাদশ সং, ৯৭৮ পৃঃ দেখ।

† আমরা উহার মধ্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। (বিস্তৃতভাবে 'মাঘোৎসব' পুস্তকে এবং ১৬ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।)

করিয়া দিল, সেতুবন্ধন করিল।......সঙ্গে ইংরাজ গোরাও নাই, সুপণ্ডিত ইঞ্জিনিয়ারও নাই ; তবে সীতা উদ্ধারের কে সহায়তা করে ? কে রামের প্রধান সহায় হইল ? সেই হনূমান্। শুনিলে হাসি পায়। মানুষ আকৃতিতে হনূমান্ সহায় !

"রাম, তুমি এত বড় বড় ক্ষমতাশালী পুরুষ থাকিতে হনূমান্‌কে বন্ধু করিয়া লইয়া গেলে! রাম হাসিয়া এই বিডনপার্কের ভক্তদিগকে বলিলেন, হাসিও না, ভক্ত হনূ অভক্ত মানুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।......জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্ত বড়। ভক্তের ন্যায় বীর আর কেহই নাই। হরিনাম তাঁর রক্তের ভিতরে রহিয়াছে। ......বিশ্বাসের আগুন এমন জ্বলন্ত, ভক্ত বিশ্বাসের আগুনে সব ছারখার করিয়া দেন ; শত্রুপুরী এক মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ করেন। বিশ্বাস-আগুনে সমস্ত পুড়িল। হনূমানের প্রতাপ কি সামান্য ? সীতা উদ্ধার করা আর কাহারো কার্য্য নয়। ভক্তই কেবল এই অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন, অসম্ভব সম্ভব দেখাইতে পারেন। হরিনামের বলে দশানন কেন, সহস্রাননও পরাস্ত হইয়া যায়।......ভক্তের মধ্যে হনূ শ্রেষ্ঠ, ভক্তের রক্ত হরিভক্তিতে আচ্ছাদিত। হনূ বলিলেন, আমি কেবল ঐ চরণ জানি, আর কিছুই জানি না। যখন সোণার হার বানরের হাতে দেওয়া হইল, সে হারে রামনাম নাই বলিয়া তৃণের মত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।......হনূ বুক চিরিয়া দেখাইলেন, এই আমার প্রাণপতি।..... তোমার বুক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, হরিভক্তি নাই। হরিভিন্ন নাকি হনূ আর কিছু দেখিতেন না, তাই তিনি বুকের ভিতর হরি দেখিতেন ; কিন্তু তুমি বুক চিরিয়া দেও, তোমার বুকের ভিতর হরি নাই। যে ভক্ত হয়, সে যদি চণ্ডাল হয়, যদি জন্তু হয়, তাহাকেও ঈশ্বর আদর করিবেন, কোলে বসাইবেন। ভারতের সীতা রাবণ-ব্যভিচার লইয়া গেল, নাস্তিকতা হরণ করিল। ঐ রাবণ-নাস্তিকতাই প্রতি ঘরের সীতা লইয়া যায়। ভারতের আর্য্যসন্তানেরা কাঁদিতে লাগিল, হায়! কত যুবা ব্যভিচারে ডুবিল, কত অধার্ম্মিকদের উপদ্রবে সতীত্বরত্ন গেল। কি ভয়ঙ্কর নাস্তিকতা এল। সে দুরাত্মা বিলাত হইতে আসিয়া, আমাদের সতীত্বরত্নকে আক্রমণ করিল। সীতার কলঙ্ক! আর যে ভারতের নাম কেহ লইবে না। এখন রাবণবধ কে করিবে ? হনূ ভিন্ন কেহ পারিবে না। হনূর ন্যায় সরলা ভক্তি চাই ; অহঙ্কারীর কর্ম্ম নহে। স্বয়ং

রাম উপস্থিত হইলেও হইবে না, ভাই লক্ষ্মণ চাই। তাঁর মত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ভিন্ন কে রাবণবধে সহায় হইবে? ভাই লক্ষ্মণ ১৪ বৎসর নারীর মুখ দেখেন নাই, সীতার পদতলে দৃষ্টি রাখিতেন; নারীর প্রতি অপবিত্র চক্ষে দর্শন করিলেন না। হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা লক্ষ্মণের কঠোর ব্রত পালন কর, যদি সীতা উদ্ধার করিতে চাও।......যদি ভক্তসন্তান কেহ থাকেন, তবে সীতা উদ্ধার করুন। বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হবে কে? ঐশ্বর্য্যশালী প্রতাপশালী বীর? তারা যদি বলে, ওরে সাগর, তুই জানিস্ না, আমরা তোর রাজা? তুই বক্ষ স্ফীত করিস্ না; সে শুনিবে না। কিন্তু ভক্ত বলিলে, তাহা শুনিতেই হইবে। সে যেমন বক্ষ স্ফীত করিবে, অমনি কাঠবিড়ালীর পায়ের ধূলি পড়িবে। তোমার আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ভক্তিতে এত বড় সাগরবন্ধন হইবে। কার্য্য বড়, উপায় ছোট। তারা যখন স্থড় স্থড় করিয়া ধূলি ফেলিয়া দেয়, তখন প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হয়। এত গুলি লোকের ভক্তি একত্র জড় হইলে, কি সীতা উদ্ধারের উপায় হইবে না? আর কি ভয়! গৌরাঙ্গ ঈশা বুদ্ধের প্রকাশ হইল নববিধানে। নববিধানের নিশান উড়িল, আর ভয় কি, সীতা উদ্ধার হইবে। ফের রামায়ণ, ফের রাম-ভক্তি। রাম ছাড়া সীতা থাকেন না, বিষ্ণু ছাড়া লক্ষ্মী থাকেন না, বিশ্বাস ছাড়া ভক্তি থাকে না। ঐ দশানন প্রকাণ্ড বীর পারিবে না। সাধ্য কি যে, সে মা জানকীর গায়ে হাত তোলে? এখনো ভগবান্ বেঁচে আছেন। এ দেশে যে এত অধর্ম্ম, তবু আমাদের ভগবান্ বেঁচে আছেন। তাই বলি, এস, ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্মরত্ন-সীতাকে উদ্ধার করি। রাবণ সীতাকে হরণ করিল, তাইত ভারত ডুবিল। জানকী ভারতের সতীত্ব অর্থাৎ স্ত্রীভাব। শ্রীরাম যেমন ব্রহ্মতেজ, সীতা তেমনি ব্রহ্মপ্রেম। এক দিকে যেমন রামের বৈরাগ্য, বনবাস, সত্যপালন, আর এক দিকে তেমনি প্রেম, কোমলতা। রাম যেমন সত্যপালনজন্য বনে গেলেন, ধর্ম্ম তেমনি তাঁর সতী লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মপ্রেম সঙ্গে সঙ্গে নাচে ও দোলে। এক হরি, তাঁর এক দিকে পুরুষ ও এক দিকে স্ত্রীভাব; একদিকে রাম ও এক দিকে সীতা, যুগলমূর্ত্তি। রোজ দুইটীকে ভক্তি করিতে হইবে। এখন ভগবান্‌কে ডাক।......ভাই, তোমরা নড় না যে *? আমার

* "ভক্ত হনূমান ও রামসীতার পুনরুদ্ধার হইল। তোমরা শুনিয়া হাসিবে, আবার

আরও যে উৎসাহ বাড়িল। এস, ভাই, কোলাকোলি করি। তোমরা পাঁচ শত, সাত শত, হাজার, দুহাজার হরিপ্রেমে গড়াগড়ি যাও। টাকার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, আর কেন? অনেক ধন উপার্জ্জন করা হইয়াছে। এখন হরিপাদপদ্মধনসঞ্চয় কর। রক্তের কালিতে বিশ্বাসের কলম দিয়া লেখ, রাম সীতা, বিশ্বাস ভক্তি। ষড়রিপু ঐ সীতা হরণ করিল। আত্মার ঘরে রোজ সীতা চুরি? আজ্ঞা হইয়াছে চোর ধরিতে।......এমন সংস্কৃত কালেজ, কাশীতে কালেজ ও বড় বড় পণ্ডিত থাকিতে সীতা চুরি হইয়া গেল!! হবেইত, বিবেক যে ঘুমাইয়া পড়ে।......এবার কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য, এস, দেখি, ব্রহ্মনামের বলে, ব্রহ্মতেজের বলে তোমাদিগকে নিপাত করা যায় কি না!...... মা জানকি, মা লক্ষ্মি, লক্ষ্মী ছাড়া করিয়া গেলে ভারতকে, ভারতের সিংহাসন আজ খালি; এস, ভারতের লক্ষ্মি। লক্ষ্মীও যাহা, হরিও তাহা। হরি বলি প্রাতে, হরি বলি সায়ঙ্কালে, জলে হরি, স্থলে হরি; এইরূপে হরিনামে ও হরিভক্তিতে ভারতকে উদ্ধার কর।"

"বক্তৃতার পর ভক্তদল দশগুণ উৎসাহের সহিত নৃত্য করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট দিয়া কমলকুটীর অভিমুখে যাত্রা করেন। লোকের ভিড় ও ঠেলাঠেলিতে বড় রাস্তা দিয়া চলা ভার হইয়াছিল। সাধারণ সমাজের মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে আচার্য্য মহাশয় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন ও ভক্তদল তখন কিয়ৎক্ষণ গান করিয়া অগ্রসর হন। মূল দলটি পথে চারিটি দলে বিভক্ত হয়। যথা বড় দল, যুবকদিগের দল, উড়িষ্যানিবাসীদিগের দল, সিন্ধু ও পঞ্জাবীদিগের দল। উড়িষ্যা-নিবাসীরা উড়িয়া গান, সিন্ধু ও পঞ্জাবীরা হিন্দি গান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে আসিয়া আচার্য্য মহাশয় ও অন্য কোন ভক্ত ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কমলকুটীরের প্রাঙ্গণে ভক্তগণ উপস্থিত হইলে, অট্টালিকার উপর হইতে ব্রাহ্মিকারা পুষ্পবৃষ্টি ও গোলাপ জল বর্ষণ করিলেন। সেখানে ভক্তগণ অনেকক্ষণ গান ও নৃত্য করেন। আর্য্য-নারীসমাজের সভ্যেরা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া, দীপহস্তে আলুলায়িতকেশে

এই দেশে হরির প্রেম, বিশ্বাস, আর ভক্তি আসিল। সকলে প্রণাম করিয়া বলিব, জয় রামচন্দ্রের জয়, জয় সীতার জয়।" এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেও, লোক যেমন তেমনি ভিড় করিয়া রহিল দেখিয়া, পুনরায় কেশবচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করেন।

একটি নূতন গান গাইয়া, নববিধানের পতাকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বরণ করিয়াছিলেন। সে দৃশ্য অতিশয় স্বর্গীয় হইয়াছিল। এবার নারীগণের ভাব ভক্তি ও উৎসাহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারকে পরাজয় করিয়াছে। ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহাদিগের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, সকলকে স্থানের জন্য অতিমাত্র ক্লেশ পাইতে হইয়াছে।

"উপরের ঘরের বারাণ্ডায় সকলে গলা ধরাধরি করিয়া গান ও নৃত্য করেন। নৃত্যে এবার নূপুরের সমাদর হইয়াছে। সে দিনকার আনন্দ ও মত্ততার ব্যাপার বর্ণনা করা যায় না। রাত্রি প্রায় তিনটা পর্য্যন্ত এই স্রোত চলে, তথাপি শ্রান্তি নাই। বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে মিলিয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করেন। নৃত্যাদি সমাপ্ত হইলে পর, আচার্য্য মহাশয় আরতি ও পতাকাবরণের গূঢ় তত্ত্বসকল পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন। কাহার মনে আর কোনরূপ দ্বিধা ভাব থাকে না। প্রায় ৭০।৮০ জন লোক এইরূপে স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করে।

বেলঘরিয়ার উদ্যানে যাত্রা ও তথায় সৎপ্রসঙ্গ

"১৩ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী), মঙ্গলবার অপরাহ্ণে, রেলওয়ে যোগে বেলঘরিয়ার উদ্যানে যাত্রা করা যায়। বেলঘরিয়ার পথে ও বাজারে সঙ্কীর্ত্তন হয়। রজনীতে উদ্যানে যে সকল সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছিল, নিম্নে তাহার সারোদ্ধার করিয়া দেওয়া গেল। বেলঘরিয়ায় ৫০।৬০ জন ব্রাহ্ম গিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই তথায় রাত্রিযাপন করেন।

"(১) নববিধানের মা পালনীশক্তি, অসুরনাশিনী, সন্তানপোষণী; হিন্দু বামাচারীর জন্মদায়িনী প্রকৃতি নহেন।

"(২) ভক্ত মার বুকের ভিতরের রক্ত হইয়া যাইবেন, মার সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন। ভক্ত মার শক্তি। বিষয়কে (Object) বিষয়ী (Subject) করা একপঞ্চাশত্তম ব্রহ্মোৎসবের বিশেষ সাধন। মাকে বাহিরে রাখিব না, কিন্তু মাকে আমার বুকের রক্ত করিয়া লইব অর্থাৎ আমি মার ইচ্ছা হইয়া যাইব। পিতা হইয়া তিনি সখা, মাতা হইয়া তিনি সখী, পাপীর বন্ধু। মহাপাপীর মনেও ব্রহ্মখণ্ড আছে। ঈশা আপনি পিতার অংশ বলিতেন। ঈশা জানিতেন, মনুষ্যত্ব ঈশ্বরত্বে পরিণত হইতে পারে, ঘোর পাপীও ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যবর্গে, শিষ্যবর্গ খ্রীষ্টে.

সকলে ঈশ্বরেতে, সেণ্টপল এই সত্য ধরিয়াছিলেন। প্রাণের ভিতরে প্রাণেশ্বর ও প্রাণেশ্বরীকে স্থাপন করিলে পিতৃত্বমাতৃত্বলাভ হয়। ঈশ্বরত্ব মনুষ্যত্বে প্রবিষ্ট করিতে হইবে। আমি তাঁহার হাত ধরিয়াছি, আমি তিনি হইয়াছি, এ এক শাস্ত্র। একটি বৈষ্ণবগণের, একটি অদ্বৈতবাদীর শাস্ত্র। তিনি আমার হাত ধরিয়াছেন, তিনি আমি হইয়াছেন, এ এক শাস্ত্র। নববিধানের শাস্ত্র এই। আমরা সাধুত্ব (Goodness) অন্বেষণ না করিয়া, ঈশ্বরত্ব (Godliness) অন্বেষণ করিব, আমরা ঈশ্বরত্বে আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিব।

"(৩) 'হরি' এবং 'মা' এই যে পিতা ও মাতা, উভয়কে বুকের রক্ত করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, উপাসনা করিতে করিতে তিনি আমি হইয়া যাইতেছেন। তিনি আমাতে আরোপিত হইবেন। তিনি আমার ভিতরে তাঁহাকে দেখিবেন। ইহাই উন্মত্ততার ভাব।

"(৪) ঈশ্বর স্বয়ং দাতার ভিতরে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব দুঃখীদিগকে দিবেন, দাতার কার্য্য কেবল জগৎকে ব্রহ্মধনবিতরণ।

"(৫) বিল করিয়া টাকা আদায় করা আমরা নীচ সংসারের নিকট শিখিয়াছি। ঈশ্বরের সংসারে আপনি টাকা আসিবে, ভক্তেরা কেবল মাকে ডাকিবেন ও মার ধ্যান করিবেন।

"(৬) অদ্বৈতবাদে তিনি আমি, ব্রাহ্মধর্ম্মে তিনি আমাতে।

"(৭) জীবাত্মার উদ্দেশ্য কেবল ব্রহ্মবান্ হওয়া; সে ধার্ম্মিক, কি সুখী হইতে চাহিবে না।

"(৮) ইহাতে সকলেই অবতার হইবে, এক জন অবতার হইলে বিপদ্।

"(৯) খ্রীষ্টের স্বর্গ, চৈতন্যের স্বর্গ আমাদের স্বর্গ নহে। আমাদের স্বর্গ স্বর্গের স্বর্গ।

"(১০) এদেশে অশ্বমেধ, মোহম্মদের অশ্ব জয়দ্যোতক। এই জয়ের ভাব প্রবিষ্ট করিতে হইবে এবং সঙ্কীর্ত্তন আরো যাহাতে উৎসাহোদ্দীপক হয়, তাহা করিতে হইবে।

প্রচারযাত্রা

"১৪ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী, বুধবার, দুইখানা ট্রামওয়ে গাড়ী রিজার্ভ করিয়া, 'নববিধান' ও 'লা এলা ইল্লিল্লা' অঙ্কিত দুই বৃহৎ নিশান তুলিয়া,

৫০।৬০ জন লোক খোল করতাল সহসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, প্রচারযাত্রা উদ্দেশে শিয়ালদহ হইতে গঙ্গার ঘাটে চলিয়া যান। সেখানে সকলে জাহাজে আরোহণ করেন। জাহাজ পুষ্পপল্লবাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল। অনেক ব্রাহ্মিকাও জাহাজে যাইয়া যোগ দিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৮০।৯০ জন লোক বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়াছিলেন। বাষ্পীয় পোত সন্ধ্যার সময় শিবপুরের নিকটে চালিত হয়। শিবপুর গ্রামে সকলে প্রবেশ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিবেন, এরূপ কথা ছিল। কিন্তু জাহাজে বিশেষ বিঘ্ন হওয়াতে তাহা হইল না। অনেকে পারে উঠিয়াও পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

উৎসবসমাপ্তি

"১৫ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী), বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে, কমল সরোবরের চারি কূলে দূরে দূরে সকলে আসনে উপবিষ্ট হইয়া, ধ্যান ধারণা ও যোগসাধনা করেন। যোগের উদ্বোধন অতিশয় গভীর হইয়াছিল, সে দৃশ্যও অত্যন্ত গভীর। যোগান্তে প্রার্থনা হয়, তৎপরে উপরের ঘরে প্রমত্তভাবে রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য হয়। ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ সঙ্কীর্ত্তনান্তে সকলকে ভোজন করান। এইরূপে অপরিসমাপ্য স্বর্গীয় উৎসব সমাপ্ত হয়।"

১২

নববিধান ও কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে মতামত *

রেবারেণ্ড ডল সাহেবের অভিমত

'আমরা নববিধানের প্রেরিত' এ বিষয়ে প্রকাশ্যে যে বক্তৃতা হইল, তাহাতে যে সপক্ষে বিপক্ষে বিবিধ মত প্রকাশ পাইবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। আমাদের প্রাচীন বন্ধু রেবারেণ্ড ডল সাহেব, যদিও কোন বিরুদ্ধ মত প্রকাশ না করিয়া বক্তৃতার অনুকূলেই বলিয়াছেন, তথাপি তিনি নববিধানের ভিতরে কিছু নূতনত্ব দেখেন নাই; কেন না, পল ইহা অনেক দিন পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন।

ষ্টেট্স্‌ম্যানের অভিমত

ষ্টেট্স্‌ম্যান বক্তৃতাসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থে নিবদ্ধ করিবার যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :—"বাবু কেশবচন্দ্র সেন বৎসরে একবার করিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হন। সংবৎসর কাল তাঁহার যে মণ্ডলী মধ্যে সাধন ভজনের রেখার ভিতরে তিনি স্থিতি করিতেছিলেন, এ সময়ে তিনি যেন তাহার বাহিরে পদার্পণ করেন এবং যে ধর্ম্মের তিনি ব্যাখ্যাতা, আমরা যত দূর বিচার করিতে পারি, যাহার তিনি মন ও আত্মা, সে ধর্ম্মের অভিপ্রায় কি, ক্রিয়া কি, তাহা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন। এই সকল সময়ে তিনি সাধারণকে বিশ্বাসভূমি করিয়া লন, তাহাদিগের নিকটে হৃদয় খুলিয়া দেন; তিনি আপনাকে, আপনার মতকে, আপনার মণ্ডলীকে দোষগুণবিচারকের বিচারের অধীন করেন; তাঁহার দৌর্ব্বল্যনিচয় স্বীকার করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনীত হইয়াছে, তাহার উত্তর দেন; তাঁহার মণ্ডলীর কত

* এ সম্বন্ধে (১) Keshub as seen by his Opponents, (২) Keshub Chunder and Ramkrishna, (৩) Keshub Chunder Sen—Testimonies in Memorium (vol. I and II) by G. C. Bannerjee এবং (৪) Behold the Man by Dwijadas Dutt দ্রষ্টব্য। (সং)

দূর আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করেন; মণ্ডলীর এবং আপনার অধিকার প্রদর্শন করেন; তিনি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করেন, এবং সকলের প্রশংসাবাদ আকর্ষণ করেন। যত বার তিনি সাধারণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে গত শনিবারে (২২শে জানুয়ারী) প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ তিনি যে 'নববিধানের' কথা বলিলেন, সেইটি সম্ভবতঃ নিতান্ত গুরুতর বলিয়া প্রতীত হইবে। তৎসম্বন্ধে অন্ততঃ একটী কথা বলা যাইতে পারে, বক্তার প্রতিভাগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ হয় নাই; তিনি মানসিক বা আধ্যাত্মিক শক্তিক্ষয়ের কোন লক্ষণই দেখান নাই; কেশবচন্দ্র সেন আর কখন এরূপ অতুল প্রভাবশালী মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় প্রভাববিস্তারপূর্ব্বক, সাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ। সম্ভবতঃ যে কোন ব্যক্তি সে দিন তাঁহার কথা অবধানপূর্ব্বক শুনিয়াছেন, তিনি অন্ততঃ, যতক্ষণ তাঁহার বক্তৃতার মন্ত্রমুগ্ধতা ছিল, তত ক্ষণের জন্যও এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, তিনি লোকাতীত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। নিশ্চয়ই যাঁহারা তাঁহাকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন যে, তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা এবার সমধিক শক্তি ও ঔজ্জ্বল্য ব্যক্ত করিয়াছে। অনেক লোকের মনে একটা ধারণা উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহার সূর্য্য কিছুদিন হইল, অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছে এবং তিনি যে ধর্ম্মের পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পশ্চাদ্গমন করিয়াছে। আমরা এ কথা বলি না যে, আমাদের কখন এরূপ ধারণা হয় নাই; কিন্তু যদি আমাদের সেরূপ হইয়াও থাকে, তবু আমাদিগকে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বিগত শনিবারের বক্তৃতা দেখায় যে, এ ব্যক্তির শক্তি হ্রাস পায় নাই, বরং বাড়িয়াছে, মতে স্খলন হয় নাই, বরং অধ্যাত্ম উন্নতি হইয়াছে।

"সম্ভবতঃ বক্তৃতা যখন পূর্ণভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, তখন যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উহা গ্রহণ ও অধ্যয়ন করিতে পারেন; স্বয়ং আমরা আমাদের স্মৃতি হইতে বক্তৃতার উপরে মতামত প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত রহিলাম। যাহা হউক, আমরা একথা বলিতে পারি যে, ভবিষ্যদ্দর্শী নেতার ন্যায় আপনার সম্বন্ধে যদিও ইতঃপূর্ব্ব অল্পপরিমাণ অধিকার চান নাই, তথাপি মনে হয়, যে মণ্ডলীর তিনি প্রসিদ্ধ সভ্য, সে মণ্ডলীর জন্য তিনি আর কখন এত অধিক অধিকার চান নাই। নিঃসন্দেহ অনেকের নিকটে 'নববিধানের'

দাবী দাওয়া অদ্ভুত অতিরিক্ত পরিমাণ বলিয়া, কাহারও কাহারও নিকটে অসঙ্গত না হউক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে। কেশবচন্দ্র সেন সাহসের সহিত ঘোষণা করিলেন যে, নববিধান পূর্ব্বদিকে নবসূর্য্যের উদয়, বহুকালের অন্ধকার নিরসন করা সে সূর্য্যের নিয়তি; যিহুদী ও খ্রীষ্টীয় বিধানের সহিত ইহা তুলনার যোগ্য, ইহা সে দুইয়ের অবশ্যম্ভাবী চরম ও পূর্ণতা; তদপেক্ষা বড় নহে, কিন্তু তথাপি ইহা অগ্রসর, মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শিক্ষার প্রশস্ততর ক্রমবিকাশ। যদিও তিনি মুষা, খ্রীষ্ট বা পলের সহিত আপনাকে সমান করেন না, তাঁহাদের পদচুম্বন ও আলিঙ্গন করিতে তিনি প্রস্তুত, তথাপি তাঁহারা যে তাঁহার অধ্যাত্ম পূর্ব্বপুরুষ, ক্রমোন্মেষের অবশ্যম্ভাবিনিয়মক্রমে তাঁহার মণ্ডলী যে তাঁহাদেরই পূর্ণ চরমফল, এ অধিকার তিনি চাহেন। মুষার পর খ্রীষ্টের, খ্রীষ্টের পর পলের যেমন, তেমনি পলের পর কেশবচন্দ্রের আগমন অবশ্যম্ভাবী। আমরা জানি, এরূপ করিয়া তাঁহার পদনির্ণয় করিতে গিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার অন্যথা করিতেছি; কেন না তিনি আপনার ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিতে যত্ন করিয়াছেন, এবং নববিধানের প্রেরিতগণের মধ্যে তিনি একজনমাত্র, এইরূপে আপনাকে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের বিবেচনায় যদিও তিনি 'প্রেরিতগণের মধ্যে ক্ষুদ্রতম' হন হউন, কিন্তু আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া দিয়া আমরা তাঁহার মণ্ডলীকে চিন্তার বিষয় করিতে পারি না। আমরা অনুমোদন করি বা অননুমোদন করি, প্রশংসা করি বা নিন্দা করি, আমরা উহাকে কেশবচন্দ্রের মণ্ডলী বলিয়া মনে করিতে বাধ্য। কিন্তু যদিও তিনি পল ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ হইতে ধারাবাহিক অনন্তন পুরুষ, প্রেরিতবর্গের উত্তরাধিকারী বলিয়া—আমাদের এ শব্দ প্রয়োগ যথাযথ বা অযথাযথ হইতে পারে—নির্দ্দেশ করেন, তথাপি তাঁহার ধমনীতে অন্য শোণিতও আছে,—বুদ্ধের শোণিত, চৈতন্যের শোণিত. অন্যান্য বড়বড় ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের শোণিত আছে, যাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বর্ত্তমানকালের মানবীয় জ্ঞানের সার্ব্বভৌমিকতাবশতঃ তিনি তুলনা ও কতক পরিমাণে মিলিত করিতে পারেন। তিনি 'সর্ব্বাগ্রবর্ত্তিকালসূত্রমধ্যে বিদ্যমান কালসমূহের উত্তরাধিকারী', এবং এজন্যই 'নববিধান' সার্ব্বভৌমিকতা ও সর্ব্বান্তর্ভাবকতার জন্য সমুদায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান

হইতে ভিন্ন। 'নববিধান' সুস্পষ্ট সংযৌগিক। এক এক ধর্ম্মের ভিতর হইতে ইহা সেই সকল সত্য উদ্ধার করিয়া লয়, যে সকল অন্যান্য ধর্ম্মের সত্যের সহিত মিলিত হয় এবং দেবনিঃশ্বসিতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাদিগের সকল-গুলিকে এক অধ্যাত্ম একতায়, মানবজাতির এক সর্ব্বান্তর্ভাবক মণ্ডলীতে পরিণত করিতে প্রয়াস পায়। অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধে কেবল এই প্রশস্ত মত-সহিষ্ণুতা এবং সুব্যক্ত সজাতিত্বসম্বন্ধবশতঃ ইহা খ্রীষ্টধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, তাহা নহে, ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী কাহাকেও মানে না বলিয়া ইহা ভিন্ন। এই স্থলেই অধিকাংশ খ্রীষ্টমণ্ডলীর সহিত কেশবচন্দ্র সেনের সম্পূর্ণ অমিল। তিনি যে কেবল সাধুগণ বা প্রতিমাসমূহের মধ্যবর্ত্তিতা অস্বীকার করেন, তাহা নহে, খ্রীষ্টেরও মধ্যবর্ত্তিতা স্বীকার করেন না। তাঁহার শিক্ষানুসারে মনুষ্যাত্মা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিতা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৃশ্যতঃ খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণ অসমতুল পদ অর্পণ করেন। মনে হয়, তিনি তাঁহাকে ঈশ্বরের উচ্চতম অবতার ও অভিব্যক্তি, ধর্ম্মসম্বন্ধে মহত্তম দৃষ্টান্ত ও পথপ্রদর্শক, সমগ্র মানবজাতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, একমাত্র না হউন, উচ্চতম ঈশ্বরপুত্র যেমন, তেমনি পূর্ণ ও নিষ্পাপ মনে করেন। তাঁহার বক্তৃতার অন্তিমভাগে তিনি যে আত্মিক করিয়া লওয়াকে 'নববিধানের' একটি প্রধান মূল মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টকে 'অনন্ত জীবন' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে খ্রীষ্টকে আত্মস্থ করিতে গিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির এরূপ যত্ন করা উচিত যে, তিনি খ্রীষ্টান হইবেন না, খ্রীষ্টের মত হইবেন না, কিন্তু খ্রীষ্ট হইবেন। যাহাকে 'উচ্চতম খ্রীষ্টীয় জীবন' বলে, তাহার মৌলিক লক্ষণ তাঁহার বক্তৃতার অন্তিমভাগে যে প্রকার জীবন্ত যাথার্থিক সামর্থ্যসহকারে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ আর কদাপি বর্ণিত হয় নাই। উপস্থিত খ্রীষ্টানগণ অবশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, যদিও এব্যক্তি খ্রীষ্টান নহেন, কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগকে খ্রীষ্টান বলেন, তাঁহাদিগের উঁহার মত হইলে ভাল হইত। এ বিষয়ে বিচার করা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত। তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশ করা আমাদের অভিমত নয়, তবে কেবল বক্তৃতার সাধারণ লক্ষণ এবং বক্তা যেরূপ ধারণা উৎপাদন করিয়াছেন, তাহারই ঈষৎ ভাব জ্ঞাপন করা মাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের যে সকল পাঠক এ

২১৩

বিষয়ে আরও অধিক জানিতে চান, তাঁহারা বক্তৃতা লইয়া স্বয়ং অধ্যয়ন করুন, এবং আপনারা বিচার করুন।"

'ইণ্ডিয়ান চার্চ্চ গেজেটের' অভিমত

'ইণ্ডিয়ান চার্চ্চ গেজেট' বক্তার বক্তৃত্বের প্রশংসা করিয়া, বক্তৃতা 'প্রয়াস-সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করেন। শ্রোতৃবর্গ প্রয়াসসাধ্য বলিয়া প্রতিপদে অনুভব করিতেছেন, অথচ তাঁহাদের মনে প্রশংসা উদ্রিক্ত হইতেছে, এ দুই সর্ব্বথা সঙ্গত নয়। কেশবচন্দ্র আপনার ব্যক্তিত্বের আচ্ছাদন জন্য, আপনাকে জুডাসের সঙ্গে একীভূত করিবার জন্য, যে স্থলে প্রয়াস পাইয়াছেন, সে স্থলে প্রয়াসপ্রযত্ন প্রতীত হইতে পারে; কিন্তু এস্থলেও তাঁহার যে সারল্য প্রকাশ পাইয়াছে, সে সারল্যের প্রতি সন্দেহ করিবার কেহ কোন হেতু দেখিতে পাইবেন না। আপনার বিষয় বলিতে গিয়া, সম্ভবতঃ সঙ্কোচ আসিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা সে দিনকার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন এবং পরে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, ভূতার্থবাদের মধ্যে যে ভাবের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, তাহা তন্মধ্যে বিলক্ষণ আছে। মুষা, ঈশা, পল, ইহাদিগের পর পর আগমনের মধ্যে 'ন্যায়সিদ্ধ অবশ্যম্ভাবিত্ব' নির্দ্ধারণ ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলিয়া যে 'চার্চ্চ গেজেট' স্থির করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার 'ন্যায়শাস্ত্রের' গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য প্রকাশ পায় নাই। সমুদায় ঘটনাপরম্পরা যখন 'ন্যায়সিদ্ধ অবশ্যম্ভাবিত্বের' শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন বিধানের পর বিধানের সমাগম 'ন্যায়সিদ্ধ অবশ্যম্ভাবিত্বের' শৃঙ্খলে বদ্ধ নয়, এ কথা বলিতে 'গেজেট' কি প্রকারে সাহসিকতা প্রকাশ করিলেন, আমরা জানি না। একটী ঘটনা আর একটী ঘটনা প্রসব করে, একটীর ভিতরে আর একটী অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, এবং এরূপ অন্তর্ভূত থাকার ভিতরে অনন্তজ্ঞানের অপরিবর্ত্তসহ ক্রিয়া বিদ্যমান, ইহা যদি তিনি মানিতেন, তাহা হইলে তিনি আর 'ন্যায়সিদ্ধ অবশ্যম্ভাবিত্বকে' 'নীতিসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবিত্বে' পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিতেন না। এরূপ পরিবর্ত্তন যে ঠিক সত্যসঙ্গত নয়, তাহা তিনি আপনিও স্বীকার করিয়াছেন। 'নববিধান' মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করেন না, অথচ 'প্রেরিত' মানেন, ইহা যে 'গেজেট' অসঙ্গত মনে করিয়াছেন, ইহা কিছু তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। তিনি যখন, পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধ কাহার হয়, তাহা

মানেন না, তখন তিনি আর কেমন করিয়া মধ্যবর্ত্তিত্বমতবিহীন প্রেরিতত্বে বিশ্বাস করিবেন? যে মধ্যবর্ত্তিত্বমত ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই মধ্যবর্ত্তিত্বের মত নিরসন করিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ প্রচার করিবার জন্য, ঈশ্বরনিযুক্ত লোকের কি প্রয়োজন নাই? 'নববিধানের' প্রেরিতগণ কাহাকর্ত্তৃক প্রেরিত, এ প্রশ্ন উত্থাপন করা তাঁহার পক্ষে ভাল হয় নাই; কেন না, বাইবেলশাস্ত্র পাঠ করিয়া কি তিনি জানিতে পান নাই যে, স্বয়ং ঈশ্বর প্রেরিতগণের প্রেরক? ঈশা তাঁহার শিষ্যবর্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার ভ্রম জন্মিতে পারে যে, এক ঈশাই কেবল ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, আর সকলে প্রেরিতের প্রেরিত। ইটিও তাঁহার ভ্রম, কেন না ঈশ্বর যাঁহাদিগকে তাঁহার নিকটে আনিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'নববিধানের' প্রেরিত-বর্গের সম্বন্ধে কি ঠিক সেই কথা নয়? তিনি 'নববিধানের' প্রেরিতবর্গের প্রেরিতত্বের নিদর্শন চান। এ সম্বন্ধে যাহারা নিদর্শন চায়, তাহাদিগের সম্বন্ধে স্বয়ং ঈশা কি বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ করা উচিত ছিল। যাঁহারা এখন তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না, তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিয়া থাকা সমুচিত। এরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকা অবশ্যকর্ত্তব্য, পলসম্বন্ধে গামালিয়েলের উক্তি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। "তোমাদের ধর্ম্ম যে ঈশ্বরের প্রেরিত, তাহার প্রমাণ কি?" ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র নববিধানপত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"লোকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের প্রমাণ কি? আমাদের মতসমূহে কিছু অসত্য বা অশুদ্ধ নাই। আমরা উচ্চতম নীতি এবং গভীরতম আধ্যাত্মিকতা প্রচার করিয়া থাকি। আমাদের মৌলিকবিশ্বাসসম্বন্ধে আমরা অধিকারের সহিত বলিতে পারি, ঐসকল স্বয়ং ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে; এবং সে সকল ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে কি না, প্রত্যেক প্রোৎসাহী ব্যক্তি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন। আমরা বড় বড় শিক্ষক নই, কিন্তু আমরা সরল বিশ্বাসী।" যাউক, এত বৃথাদোষদর্শন কেন, তাহার মূলকথা প্রবন্ধের অন্তে 'গেজেট' আপনি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টানগণের দলভুক্ত হন, এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয় বলিয়াই, তিনি অন্তে বলিয়াছেন, "আমরা সরলভাবে তাঁহাকে এই কথা বলিতে পারি, 'আপনি

যেমন, তেমনি ভাবে, আমরা ইচ্ছা করি যে, আমরা আপনাকে আমাদের বলিতে পারিতাম।"”

লক্ষ্ণৌ উইট্‌নেস্‌ ও রেবারেণ্ড জন ফের্ডাইসের অভিমত

লক্ষ্ণৌ উইট্‌নেস্‌ যে 'নববিধানের' বিধানত্ববিষয়ে প্রমাণ চাহিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। সিমলাস্থ রেবারেণ্ড জন ফের্ডাইস বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেখিয়াই লিখিয়াছেন :—"মনে হয়, তিনি (কেশবচন্দ্র) 'ধর্ম্মসূর্য্য' হইতে—জীবনালোক ও প্রেমের মধ্যবিন্দু হইতে দিন দিন সুদূরে গিয়া পড়িতেছেন।”

মেস্তর মনকিয়র ডি কন্‌ওয়ের অভিমত

মেস্তর মনকিয়র ডি কন্‌ওয়ে নববিধানসম্বন্ধে একটী বিস্তীর্ণ বক্তৃতায় যে মত প্রকাশ করেন, তাহাতে এই দেখা যায় যে, দেশীয় তেত্রিশ কোটি দেবগণের মধ্য হইতে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ার তিনি অনুমোদন করেন; কেন না, পাশ্চাত্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এইরূপে ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাধুসমাগমের তিনি প্রতিকূল নহেন, কিন্তু তদ্দ্বারা ব্রাহ্মগণ যে বিশেষ লাভবান্‌ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ। তবে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সমাগমপাঠে তিনি নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন; কেন না, বিজ্ঞান যে নূতন আলোক দিন দিন বিস্তার করিতেছেন, তাহাতেই মানবজাতির সবিশেষ কল্যাণ উৎপন্ন হইবে। ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দর্শন তিনি অননুমোদন করেন না; কেন না, ঈশ্বরের সুকোমল অক্লান্ত প্রেম, সত্য ও মঙ্গলের জন্য বিশুদ্ধ প্রবলানুরাগ মাতৃত্বই প্রকাশ করিয়া থাকে। তাঁহার মতে মানবজাতির পূর্ণতাই মানুষের যথার্থ ঈশ্বর, মানবজাতির ইতিহাসই তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র, মানবজাতির মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক সুখের পূর্ণতাই তাহার স্বর্গ। যাঁহার ঈদৃশ মত, তিনি 'নববিধানের' অনুকূলে যতটুকু বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট ; ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধে তিনি সকল বিষয়ের অনুমোদন করিবেন, ইহা কখন আশা করা যাইতে পারে না। তিনি বিজ্ঞানকে যে দৃষ্টিতে দেখেন, নববিধান সে দৃষ্টিতে দেখেন বটে; কিন্তু নববিধানের ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন দিন স্বীয় আবিষ্কার দ্বারা কিছু যে ব্যতিক্রম ঘটাইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

হেন্‌রি ষ্টান্‌লি নিউম্যানের অভিমত

হেন্‌রি ষ্টান্‌লি নিউম্যান কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ (১৮০৩ শকের ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিতেছি ঃ—"ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ শিক্ষিত ভারতবাসীদের মনের গতির পরিচয় দেয়, এমন আর কিছুই নহে। এই ব্রাহ্মসমাজের তিন বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন। তিনি কমলকুটীরনামক বাটীতে বাস করেন। আমরা সেই বাটীর দ্বারে উপনীত হইলেই দাসদিগের কর্ত্তৃক অবগত হইলাম যে, তাহাদের প্রভু তখন পূজায় নিযুক্ত আছেন, এই পূজার সময় তাঁহাকে ডাকিবার আদেশ নাই। এইখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের দৈনিক উপাসনা হইয়া থাকে। এই উপাসনায় প্রচারকগণ দূরদেশে যাইয়া কার্য্য করিবার বল ও আলোক প্রাপ্ত হন। প্রাতঃকালীন ঈশ্বরস্তুতিগানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেশীয় মৃদঙ্গ ও এস্‌রাজের শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং আমরা চন্দ্রসেনের উপাসনা হইতে গাত্রোত্থানপর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। তাঁহার এক জন শিষ্য উপাসনা-গৃহের পার্শ্বস্থিত বৈঠকখানা গৃহে আমাদিগকে লইয়া বসাইলেন। উপাসনা-গৃহের উপরে "উপাসনা-গৃহ" (Sanctuary) বলিয়া বড় বড় ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে. তন্মধ্যে কতকগুলি ভক্তিমান্ লোক ভূমিষ্ঠ হইয়া বসিয়া আছেন, এক ব্যক্তি ভিতরে যাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া বাহিরে বসিয়াছিলেন। সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। বৈঠকখানার টেবিলে ভারতেশ্বরীর মৃত স্বামীর উত্তম বাঁধান জীবনবৃত্তান্ত পুস্তক একখানি রহিয়াছে। এই পুস্তকখানিতে মহারাণী স্বহস্তে নাম স্বাক্ষর করিয়া চন্দ্রসেনকে ইহা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশার পার্ব্বতীয় উপদেশগুলি উত্তম পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়া ঐ টেবিলে ছিল। সোর্ডিচস্থ সুরাপাননিবারিণী সভা চন্দ্রসেনকে একখানি সুন্দর পুস্তক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উপহার দিয়াছিলেন, সেখানিও দেখিলাম। ঘরের প্রাচীরে একদিকে উক্ত খৃষ্টাব্দে মহারাণী-প্রদত্ত তাঁহার একখানি ছবি ছিল, আর এক দিকে যীশুখ্রীষ্ট রুটি লইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এই অবস্থার একখানি ছবি রহিয়াছে।

"চন্দ্রসেনের উপাসনা সাধারণতঃ এক ঘণ্টা ধরিয়া হইয়া থাকে। এই

সময়ে তিনি কোন উপদেশ দেন না। এই সকল উপাসনা ঈশ্বরের উত্তেজনায় পরিপূর্ণ, উপাসকগণ এরূপ মনে করেন এবং ইহা হইতেই তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করেন, এইরূপ সকলে বিশ্বাস করেন। অতএব এই উপাসনা-স্থানেই তাঁহারা প্রচারকার্য্যের উপযোগী উপদেশ সকল লাভ করেন। তাঁহারা এখানে বসিয়া নব নব সত্য দেখিতে পান। তাঁহাদের আচার্য্যের সহিত তাঁহারা যতই উপাসনা করেন, ততই তাঁহারা জ্ঞানলাভ করেন। উপাসনার পরে যাহা হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত অপূর্ব্ব। যখন চন্দ্রসেনের স্বর নিস্তব্ধ হইল, আমরা দেখিলাম, একটী বীণা বাজান হইল; প্রথমে আস্তে আস্তে ও সহজে, কিন্তু গায়কের যতই উৎসাহ হইতে লাগিল, ততই ইহা সজোরে ও তৎসঙ্গে মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল। প্রসিদ্ধ বীণাবাদকের নাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। 'বিশ্ববিধারকের' সন্ত্রমার্থ ঈদৃশ নামে ইনি আখ্যাত হইয়াছেন। ইনি এই ব্রহ্মসঙ্গীত সকল মৌখিক রচনা করিয়া থাকেন, চন্দ্রসেনের দীর্ঘ প্রার্থনার ভাব সকল ইহাতে সন্নিবিষ্ট থাকে। এক জন লেখক নিকটে বসিয়া ঈশ্বরভাবপূর্ণ কথা সকল লিখিয়া লন। ধ্যানে নিমগ্ন দেশীয় কবি যখন বীণা বাজাইতেছিলেন, তখন যতই তাঁহার মুখের প্রতি আমি দৃষ্টি করিতে লাগিলাম, ততই সল রাজার সময়ের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের কথা মনে পড়িতে লাগিল। এই কবিরচিত সংগীত সকল পরে তাঁহারই দ্বারা সংশুদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে প্রায় সহস্রাধিক এইরূপ সঙ্গীত প্রচলিত আছে। এই সমাজের প্রতিপালিত দ্বাবিংশতি জন প্রচারক আছে। এই সকল ব্যাপার ইহার বল ও তেজের পরিচয় দেয়।

"প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে চন্দ্রসেন বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গাত্রে একখানি গৈরিক বস্ত্র স্কন্ধের উপর দিয়া পড়িয়া শোভা পাইতেছিল। কথোপকথনস্থলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, প্রতি মনুষ্যেরই তো ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ শিক্ষার অধীন হইতে হইবে?

"তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ! আমাদের সকলকেই পরমাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে। কিন্তু এদেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রথমেই এদেশীয় খ্রীষ্টানদিগকে কোট পেনটুলেন পরাইয়া ও ইংরাজী আচার ব্যবহার শিখাইয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। আমরা পূর্ব্বদেশীয় লোক। যদি আপনারা ভারতবাসীদের খৃষ্টধর্ম্ম

গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনারা খৃষ্টধর্ম্মকে পূর্ব্বদেশীয় পরিচ্ছদ পরাইয়া আমাদিগকে প্রদান করিবেন, আপনারা খৃষ্টকে ইউরোপীয় পরিচ্ছদে আর এখানে আনিবেন না। ইতিহাসের পরিবর্ত্তনে ঈশার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বটে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি যে ভাবে পেলেষ্টাইনে পরহিতসাধন এবং অনন্তজীবনবারিবিতরণ করিয়া বেড়াইতেন, আমরা তাঁহাকে সেই ভাবে দেখিবার জন্য অন্বেষণ করিতেছি।

"ঈশ্বরের প্রতি যাঁহারা নির্ভর করেন, তাঁহাদের আত্মাকে তিনি পূর্ণ করেন, দাউদের ১০৩ সংখ্যক গীতে যেরূপ এবিষয় বর্ণিত আছে, আমি তাহা আমার বাইবেল খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম, এবং বলিলাম, ঠিক এইরূপ তৃপ্তি না হইলে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে।

"তিনি উত্তর করিলেন, আমরা হিন্দু। আমাদের মন তৃপ্তিলাভ করিয়াছে, আমরা সুখী। দাউদের গীত সকল পূর্ব্বদেশীয় রচনা। আমরা একটি সত্য লাভ করিলেই নিরস্ত হই না, আমরা দেখি, তাহার পরেও আরও সত্য আছে। পরমাত্মার সহায়তা ব্যতীত আমরা বাইবেল পুস্তক বুঝিতে পারি না।

"আমি বলিলাম, ঈশ্বর যিশুখৃষ্টকে পাঠাইয়া, তাঁহাতে আপনাকে আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত ছিলেন। পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থেও ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দুরা গঙ্গাস্নান করে এবং তাহাদের পাপ ধৌত করিবার জন্য তাহাদের দেবতার নিকটে পূজোপহার আনয়ন করে, কিন্তু পাপের একমাত্র বলি উপহার যিশুখৃষ্ট। তিনিই কেবল পাপ ধৌত করিতে পারেন এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আসিয়া তাঁহার আপনার লোকদিগকে অধিকার করিবেন।

"তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, আমরা পুত্তলিকা পূজা করি না। ঈশা পুনর্ব্বার আসিবেন, আমরাও একভাবে এ কথা বিশ্বাস করি।

"কলিকাতার ওয়েসলিয়ান মিশনের মেস্তর বগ এই কথার উপরে বলিলেন, মেস্তর সেন, আপনি যদি যিশুখৃষ্টকে আপনার পবিত্রাত্মা বলিয়া সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেন, আপনাতে কি শক্তিই প্রকাশ পাইত।

"কেশবচন্দ্র উত্তর দিলেন, আমার সম্মুখে যে কি আছে, তাহা আমি জানি না, উহা ঈশ্বরের হাতেই রাখিয়া দিতে হইবে। গত কল্য আমি যাহা ছিলাম,

আজ আমি তাহা নহি এবং আগামী কল্য যে কোথায় যাইব, তদ্বিষয় আমি অন্য কিছুই জানি না।

"মেস্তর বগ ইহার উত্তর দিলেন, আমি আশা করি, যাহা কিছু আসুক, আপনি আপনার কর্ত্তব্য করিবেন।

"চন্দ্রসেন উত্তর দিলেন:—কর্ত্তব্যসম্বন্ধে আমরা ঈশ্বরের পরাক্রম দ্বারা পরিচালিত হইব এবং ঈশা যেরূপ ঈশ্বরের অধীন ছিলেন, আমরাও ঠিক সেই রূপ হইব। তিনি একেবারে ঈশ্বরেতে বিলীন হইয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাতে এবং তিনি ঈশ্বরেতে ছিলেন। আমরাও ঈশার অনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহার ন্যায় হইব এবং তাঁহার মতন আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিব। আমাদিগের পক্ষে আমিত্বত্যাগের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা যতই আমিত্ব বিনাশ করিব, ততই ঈশ্বরত্ব লাভ করিব।

"এইরূপ কথাবার্ত্তার পর প্রেমের সহিত করস্পর্শ করিয়া, আমরা এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বিদায়গ্রহণ করিলাম যে, ইনি স্বর্গরাজ্যের কত নিকটবর্ত্তী, এরূপ ব্যক্তি যে কেন বাহিরে অবস্থিতি করেন, আমরা তাহা ভাবিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলাম। চন্দ্রসেন সম্প্রতি 'নববিধান' সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি ভাল ভাল কথা আছে, কিন্তু তাহাতে ঈশা যথোচিতরূপে প্রতিষ্ঠিত না থাকায়, তদুপরি দণ্ডায়মান হইবার স্থান নাই। আমাদের মিশন স্কুলে অনেকগুলি উপযুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষক দেখিতে পাইলাম। একটি বড় ব্রহ্মমন্দিরে একদিন প্রবেশ করিয়া, তাহাতে অত্যন্ত লোকের জনতা দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম। সেই স্থানে কোন প্রকার বাহ্য শোভা ছিল না। মধ্যস্থলে আচার্য্যের জন্য একটি উচ্চ আসন ছিল।

কলিকাতা, মার্চ্চ, ১৮৮১ খৃঃ। হেন্‌রী ষ্টান্‌লী নিউম্যান।

—ক্রিষ্টান ওয়ার্ল্ড।"

১৩

প্রেরিত-নিয়োগ ও প্রচারযাত্রা

প্রচারকগণের সভা—'প্রেরিতগণের দরবার'

১৬ই মাঘ, ১৮০২ শক (২৮শে জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ), শুক্রবার, প্রচারকগণের সভা 'প্রেরিতগণের দরবার' নাম প্রাপ্ত হয়। এই দিনের প্রচারকসভায় এই নিয়মগুলি নির্দ্ধারিত হয়ঃ—

"১। প্রচারকগণের সভা Apostles' Durbar ('প্রেরিতগণের দরবার') নাম প্রাপ্ত হইল।

"২। প্রেরিতদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, নববিধান প্রচার করা।

"৩। প্রচারের উদ্দেশ্য, বিবিধ উপায় দ্বারা দেশ বিদেশে জাতীয় বিজাতীয় নরনারী সকলকে নববিধানভুক্ত করা।

"৪। দরবারের প্রত্যেক সভ্য ধন ধান্য বস্ত্রাদি দ্বারা দরবারের পরিবারদিগকে পোষণ করিবেন, এবং প্রতিজন যে যে স্থানে নববিধান প্রচার করিতে যাইবেন, সে সকল স্থানে নববিধানের পুস্তকাদি বিক্রয় করিবেন।

"৫। সময়ে সময়ে দরবারস্থ সকলে একত্র শয়ন এবং একত্র আহার করিবেন।

(প্রেরিত)

"৬। ভাই অঘোরনাথ
 „ গৌরগোবিন্দ
 „ ত্রৈলোক্যনাথ
 „ উমানাথ
 „ অমৃতলাল
 „ প্রতাপচন্দ্র
 „ গিরিশচন্দ্র
 „ বঙ্গচন্দ্র
 „ দীননাথ
 „ প্যারীমোহন

} এই দশ জন দেশ দেশান্তরে নববিধান প্রচার করিবেন।

(প্রচারকার্য্যের সাহায্যকারী)

"৭। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র
„ প্রসন্নকুমার সেন
„ মহেন্দ্রনাথ বসু
„ রামচন্দ্র সিংহ
„ কেদারনাথ দে

এই পাঁচ জন সম্প্রতি প্রচারকার্য্যের সহায়তা করিবেন এবং অবশেষে অন্য লোকের হস্তে ইহাদিগের কার্য্যভার অর্পণ করিয়া, ইহারাও Apostles শ্রেণীভুক্ত হইবেন।

"৮। যত দূর সম্ভব, নববিধানবিরোধী ব্রাহ্মসমাজে নববিধানের Expedition যাইবে না।

(পূর্ব্ববাঙ্গলায় ভাই বঙ্গচন্দ্রের সহকারী)

"৯। ভাই বঙ্গচন্দ্র নিম্নলিখিত তাঁহার ছয় জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ববাঙ্গলায় নববিবিধান প্রচার করিবেন:—

শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায়
„ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ
„ ঈশানচন্দ্র সেন
„ দীননাথ কর্ম্মকার
„ চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার
„ কৈলাসচন্দ্র নন্দী

(গৃহস্থপ্রচারক)

"১০। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মগণকে নববিধানের গৃহস্থ-প্রচারক বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব হইল:—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন
„ রামেশ্বর দাস
„ দীননাথ চক্রবর্ত্তী
„ মহেন্দ্রনাথ নন্দন
„ রাজমোহন বসু
„ যদুনাথ ঘোষ
— কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেব—মুদিয়ালী।
„ দ্বারকানাথ বাগ্‌চী—মুঙ্গের।

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়—বাঁকিপুর।
„ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।
„ হরিসুন্দর বসু—গয়া।
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন }
„ অভিমুক্তেশ্বর সিংহ } তেজপুর।
„ কালীশঙ্কর দাস—রঙ্গপুর।
„ ভগবান্‌চন্দ্র দাস—বালেশ্বর।
Dewan Navalrai S. Advani—Hyderabad, Sind.
Lala Kashi Ram }
„ Rolla Ram } Punjab.
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপধ্যায়—সুলতানগাছা।
„ কালীকুমার বসু—মৈমনসিং।
„ দুর্গাদাস রায়—ঢাকা।
„ বিহারীলাল সেন—কিশোরগঞ্জ।
„ কাশীচন্দ্র গুপ্ত }
„ রাজেশ্বর গুপ্ত } চট্টগ্রাম।
শ্রীমদ্ গোপাল স্বামী আইয়ার—বাঙ্গালোর।

প্রেরিতগণের কার্য্যক্ষেত্রবিভাগ

১৮ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী), রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার পর প্রেরিতগণের নিম্নলিখিত কার্য্যক্ষেত্রের বিভাগ হয়ঃ—

বম্বে—ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
মান্দ্রাজ—ভাই অমৃতলাল বসু।
পাঞ্জাব—ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত, কেদারনাথ দে।
পূর্ব্ববাঙ্গলা—ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই প্যারী-মোহন চৌধুরী এবং (ভাই বঙ্গচন্দ্রের) ছয় জন সহকারী।
উত্তরপশ্চিম বাঙ্গলা—ভাই দীননাথ মজুমদার।
উড়িষ্যা, উত্তর বাঙ্গলা—ভাই গৌরগোবিন্দ রায়।

কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান—ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভাই ত্রৈলোক্য-
নাথ সান্ন্যাল.।

পরদিন (১৯শে মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী), দরবারের অধিবেশনে ক্ষেত্র-বিভাগ লিপিবদ্ধ হয় এবং তৎসহকারে এই দুইটী বিশেষ নির্দ্ধারণ হয় :—

"২। ব্রহ্মমন্দিরে প্রচারক্ষেত্র যে প্রণালীতে বিভক্ত হইয়াছে, তদনুসারে প্রত্যেক প্রচারক স্ব স্ব বিভাগে যাইবার পূর্ব্বে পত্র দ্বারা যোগস্থাপন করিবেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের তত্ত্ব লইবেন।

"৪। ইঁহাদিগের (প্রেরিতবর্গের) এবং আচার্য্যের প্রতিপালন ও পরি-চর্য্যার জন্য শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, ভাই প্রসন্নকুমার সেন নিযুক্ত হইয়াছেন। ভাই রামচন্দ্র সিংহ, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ইঁহাদিগের একজন অর্থাগমের সাহায্য করিবেন ও একজন মুদ্রাঙ্কণ দ্বারা প্রচার করিবেন।

নববিধানের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা

১১ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী), দরবারে নববিধানকে সুদৃঢ় করিবার বিষয়ে এইরূপ কথোপকথন হয় :—"বর্ত্তমান সময়ে নববিধানকে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। যাহাতে উহা প্রাচীন ব্রাহ্মমণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, তন্মধ্যে বিলীন হইয়া না যায়, তৎপক্ষে যত্ন করিতে হইবে। স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিতে গিয়া অনুদারতায় নিপতিত হইবার সম্ভাবনা, এ ভয় করিলে চলিবে না। কেন না, এক দল বিপক্ষ দণ্ডায়মান হইয়াছে, যাহাদিগের উদ্দেশ্য অতি ভয়ানক। এখনই তাহারা ব্যভিচারের স্রোত প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কালে এ দেশ এই স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, যদি আমরা সতীত্বের রক্ষক না হইয়া দাঁড়াই।"

প্রচারযাত্রার দিন ও 'New Dispensation' প্রকাশ সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ

২০শে ফাল্গুন, ১৮০২ শক (২রা মার্চ্চ, ১৮৮১ খৃঃ), নির্দ্ধারণ হয়, "আগামী বসন্তোৎসবের পর আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরিতগণের গমন হইবে।" "'New Dispensation' নামে একখানি ইংরাজী কাগজ বাহির করা হয়।"

বাসন্তীপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনে কেশবচন্দ্রের সন্ন্যাস

ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই চৈত্র, ১৮০২ শক) লিখিয়াছেন :—"৩রা চৈত্র (১৫ই মার্চ্চ), মঙ্গলবার, বসন্তপূর্ণিমা ও শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয়। তৎপূর্ব্বদিবস অপরাহ্ণে আচার্য্যমহাশয় মস্তক মুণ্ডন করেন। উৎসবের দিন

প্রাতে প্রচারক-কর্ম্মচারী ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রেরিতদিগের পাদপ্রক্ষালন ও উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় পা মুছাইয়া দেন। কমলকুটীরের উপাসনা-গৃহ পুষ্পপল্লবাদি দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। সকলে আসন গ্রহণ করিলে, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বাইবেল হইতে প্রেরিতদিগের প্রতি মহর্ষি ঈশার উপদেশ সকল পাঠ করেন। তৎপর আচার্য্য মহাশয় গৈরিক বস্ত্রের আলখাল্লা পরিয়া, বেদীর আসনগ্রহণপূর্ব্বক, প্রত্যাদেশকপোত অবতীর্ণ হউক বলিয়া, উদ্বোধন ও যথারীতি আরাধনা ধ্যান করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর পরিধেয় বসন ছিন্ন করিয়া কৌপীন আকারে পরেন এবং ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে ও দণ্ড হস্তে ধারণ করেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের প্রদত্ত তণ্ডুল হইতে তাঁহাকে ভিক্ষা দেন।

'প্রেরিত' অঙ্কিত মেডল প্রদান

"পরে উপাধ্যায় আচার্য্যমহাশয়ের গলে নববিধানের 'প্রেরিত' অঙ্কিত মেডল পরাইয়া দিলেন এবং আচার্য্য মহাশয় উপাধ্যায়ের, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের, অমৃতলাল বসুর, ভাই অঘোরনাথ গুপ্তের ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গলে মেডল দান করেন। সে দিন ইতোধিক মেডল প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। এজন্য অন্য কয়েক জন প্রেরিতের গলদেশ তাহাদ্বারা শোভিত হইতে পারে নাই। তখন তিনি তাঁহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহবাৎসল্য প্রকাশ করেন। অনন্তর জ্বলন্ত প্রত্যাদেশে উদ্দীপ্ত প্রার্থনা ও প্রেরিতদিগকে অগ্নিময় (নিম্নোক্ত) এই উপদেশ দেন।" (উপদেশটী ১৮০২ শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)।

প্রেরিতগণের প্রতি সেবকের নিবেদন

"নববিধানের প্রেরিতদল, আমি তোমাদের গুরু নহি, আমি তোমাদের সেবক, আমি তোমাদের বন্ধু। তোমরা আমার প্রভু, সুতরাং ভৃত্যের প্রতি প্রভুর যে ব্যবহার, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে ব্যবহার, আমি তোমাদের কাছে সেই ব্যবহার প্রত্যাশা করি। আমি তোমাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত সেবক। তোমাদের সেবা করিলে আমার পরিত্রাণ। ভৃত্য প্রভুর সেবা না করিলে, পুণ্য শান্তি লাভ করিতে পারে না। আমার পিতা আমাকে অনেক কাল বলিয়াছেন যে, তোমাদের সেবাকার্য্য ছাড়িলে আমার পরিত্রাণের ব্যাঘাত হইবে।

অতএব তোমরা দয়া করিয়া আমাকে তোমাদের সেবকপদ হইতে কখন বিচ্যুত করিও না। আমার স্বর্গের প্রভু আমাকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং আমার অহঙ্কারে স্ফীত হইবার কোন কারণ নাই। সেবাগ্রহণ না করিয়া, এই গরিব সেবককে কখনও ডুবাইও না। মহর্ষি ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে নানাদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাঁহার ন্যায় প্রেরণ করিতেছি না। তোমাদিগের সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নাই। আমি তোমাদের দলের এক জন। তোমরা প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রেরিত। তোমরা এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেরিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত। তাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহাদিগের ভাব প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের পদধূলি লইয়া তাঁহাদিগের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমরা আমার প্রেরিত নহ। তোমরা এবং আমি তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহারা আমাদের পিতা, পিতামহ। তাঁহাদিগের বংশে আমাদের জন্ম। তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা। শাক্য, মুষা, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে তোমাদের জন্ম। আমি তোমাদিগকে প্রেরিতপদে নিয়োগ করিতেছি না, আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি না। আমি তোমাদিগকে প্রে'রত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে, সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার অনধিকারচর্চ্চা পাপ। তোমরা তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহাদিগের কথা তাঁহাদের শিষ্যদিগকে বলিতেছি। তাঁহারা ইচ্ছা করিতেছেন, তোমরা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য প্রেরিত হও। এই ঘরে প্রেরিত মহাপুরুষেরা বর্ত্তমান থাকিয়া বলিতেছেন, 'নববিধানের প্রেরিতদল, তোমরা দুঃখী পাপীর দুঃখে কাতর হও। তোমাদের ভাই ভগ্নীরা নাস্তিকতা ও অধর্ম্মের সমুদ্রে ডুবিল, এ সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও না।' এখনও ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণ গরম রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের উত্তেজক কথা শুনিয়া তোমাদের আর নির্জীব ও শান্ত থাকা উচিত নহে। তাঁহাদিগের গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া আর তোমরা নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম থাকিও না। সাধুদিগের জননী জগন্মাতাও তোমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 'নববিধানের প্রেরিত-দল, তোমরা আমার সন্তানগুলিকে বাঁচাও। দেখ, মদ, ব্যভিচারে আমার

সন্তানগুলি মারা যাইতেছে, তোমরা প্রাণপণে তাহাদিগকে রক্ষা কর। আমি নাকি মাতৃস্বভাববিশিষ্ট, আমার এই মৃতপ্রায় সন্তানদিগের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। আমি মা হয়ে আর থাকৃতে পার্‌লাম না। ওরে সন্তানগণ, যদি মার প্রতি তোদের কিছু ভক্তি থাকে, তবে মার দুঃখী সন্তানদের দুঃখ দূর কর।' হে নববিধানের প্রেরিতদল, তোমরা তোমাদিগের এই দীনহীন সেবকের কথা শুন। তোমরা জান, আমাদিগের ঈশ্বর এক, প্রত্যাদেশ এক, এবং সাধুমণ্ডলী এক, পরিবার এক। এই এক ঈশ্বরকে ভালবাসিবে, নিত্য ইহার পূজা করিবে। দৈনিক পূজা দ্বারা জীবনকে শুদ্ধ করিবে। স্বর্গীয় সাধুদিগের সঙ্গে মনে মনে যোগ স্থাপন করিবে। তাঁহাদিগের সকলের রক্ত মাংস পান ভোজন করিয়া ভাগবতী তনু লাভ করিবে। তোমরা নিজ জীবনে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বৈরাগ্য, পূর্ণ প্রেমভক্তি, পূর্ণ বিবেক, পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ পবিত্রতার মিলন ও সামঞ্জস্য করিবে। কোন একটি গুণের ভগ্নাংশে তৃপ্ত থাকিও না।

"পৃথিবীর সুখ সম্পদ্ কামনা করিবে না। ভিক্ষার দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। পরসুখে সুখী হইবে। সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এক পরিবার জানিবে। ভিন্ন জাতি কিংবা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কাহাকেও পর মনে করিয়া ঘৃণা করিবে না। তোমরা সকলের মধ্যে থাকিবে এবং তোমাদের মধ্যে সকলে থাকিবেন। সকলে এবং তোমরা আবার এক ঈশ্বরের মধ্যে থাকিবে। এই যোগে মুক্তি, এই যোগে শান্তি। দুঃখের স্বরে, কাতরস্বরে পৃথিবী তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। যাও, এখন প্রেরিতের দল, পূর্ণ অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত, বিবেকী, বৈরাগী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ভিখারীর বেশে যাও, নিতান্ত দীনাত্মা হইয়া যাও। তোমাদিগের কুবাসনা, আসক্তি, মায়া, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা রহিয়াছে। নববিধানের অস্ত্র ধারণ করিয়া এই সমুদায় শত্রুকে খণ্ড খণ্ড কর। ধন মানের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া, তোমরা পরম ধনের জন্য ব্যাকুল হও, ঈশ্বরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নববিধানের নিশান উড়াইয়া যাও, কোন শত্রু তোমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না। প্রেরিত বন্ধুগণ, সোণা রূপা যেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন না করে। তোমরা ভিখারী হইবে, কল্যকার জন্য ভাবিবে না। যে অন্ন চিন্তা, বস্ত্র চিন্তা করে, সে

অতএব তোমরা দয়া করিয়া আমাকে তোমাদের সেবকপদ হইতে কখন বিচ্যুত করিও না। আমার স্বর্গের প্রভু আমাকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং আমার অহঙ্কারে স্ফীত হইবার কোন কারণ নাই। সেবাগ্রহণ না করিয়া, এই গরিব সেবককে কখনও ডুবাইও না। মহর্ষি ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে নানাদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাঁহার ন্যায় প্রেরণ করিতেছি না। তোমাদিগের সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নাই। আমি তোমাদের দলের এক জন। তোমরা প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রেরিত। তোমরা এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেরিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত। তাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহাদিগের ভাব প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের পদধূলি লইয়া তাঁহাদিগের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমরা আমার প্রেরিত নহ। তোমরা এবং আমি তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহারা আমাদের পিতা, পিতামহ। তাঁহাদিগের বংশে আমাদের জন্ম। তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা। শাক্য, মুষা, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে তোমাদের জন্ম। আমি তোমাদিগকে প্রেরিতপদে নিয়োগ করিতেছি না, আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি না। আমি তোমাদিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে, সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার অনধিকারচর্চ্চা পাপ। তোমরা তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহাদিগের কথা তাঁহাদের শিষ্যদিগকে বলিতেছি। তাঁহারা ইচ্ছা করিতেছেন, তোমরা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য প্রেরিত হও। এই ঘরে প্রেরিত মহাপুরুষেরা বর্ত্তমান থাকিয়া বলিতেছেন, ‘নববিধানের প্রেরিতদল, তোমরা দুঃখী পাপীর দুঃখে কাতর হও। তোমাদের ভাই ভগ্নীরা নাস্তিকতা ও অধর্ম্মের সমুদ্রে ডুবিল, এ সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও না।’ এখনও ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণ গরম রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের উত্তেজক কথা শুনিয়া তোমাদের আর নির্জ্জীব ও শান্ত থাকা উচিত নহে। তাঁহাদিগের গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া আর তোমরা নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম থাকিও না। সাধুদিগের জননী জগন্মাতাও তোমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, ‘নববিধানের প্রেরিত-দল, তোমরা আমার সন্তানগুলিকে বাঁচাও। দেখ, মদ, ব্যভিচারে আমার

সন্তানগুলি মারা যাইতেছে, তোমরা প্রাণপণে তাহাদিগকে রক্ষা কর। আমি নাকি মাতৃস্বভাববিশিষ্ট, আমার এই মৃতপ্রায় সন্তানদিগের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। আমি মা হয়ে আর থাকৃতে পার্‌লাম না। ওরে সন্তানগণ, যদি মার প্রতি তোদের কিছু ভক্তি থাকে, তবে মার দুঃখী সন্তানদের দুঃখ দূর কর।' হে নববিধানের প্রেরিতদল, তোমরা তোমাদিগের এই দীনহীন সেবকের কথা শুন। তোমরা জান, আমাদিগের ঈশ্বর এক, প্রত্যাদেশ এক, এবং সাধুমণ্ডলী এক, পরিবার এক। এই এক ঈশ্বরকে ভালবাসিবে, নিত্য ইহার পূজা করিবে। দৈনিক পূজা দ্বারা জীবনকে শুদ্ধ করিবে। স্বর্গীয় সাধুদিগের সঙ্গে মনে মনে যোগ স্থাপন করিবে। তাঁহাদিগের সকলের রক্ত মাংস পান ভোজন করিয়া ভাগবতী তনু লাভ করিবে। তোমরা নিজ জীবনে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বৈরাগ্য, পূর্ণ প্রেমভক্তি, পূর্ণ বিবেক, পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ পবিত্রতার মিলন ও সামঞ্জস্য করিবে। কোন একটি গুণের ভগ্নাংশে তৃপ্ত থাকিও না।

"পৃথিবীর সুখ সম্পদ্ কামনা করিবে না। ভিক্ষার দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। পরসুখে সুখী হইবে। সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এক পরিবার জানিবে। ভিন্ন জাতি কিংবা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কাহাকেও পর মনে করিয়া ঘৃণা করিবে না। তোমরা সকলের মধ্যে থাকিবে এবং তোমাদের মধ্যে সকলে থাকিবেন। সকলে এবং তোমরা আবার এক ঈশ্বরের মধ্যে থাকিবে। এই যোগে মুক্তি, এই যোগে শান্তি। দুঃখের স্বরে, কাতরস্বরে পৃথিবী তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। যাও, এখন প্রেরিতের দল, পূর্ণ অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত, বিবেকী, বৈরাগী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ভিখারীর বেশে যাও, নিতান্ত দীনাত্মা হইয়া যাও। তোমাদিগের কুবাসনা, আসক্তি, মায়া, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা রহিয়াছে। নববিধানের অস্ত্র ধারণ করিয়া এই সমুদায় শত্রুকে খণ্ড খণ্ড কর। ধন মানের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া, তোমরা পরম ধনের জন্য ব্যাকুল হও, ঈশ্বরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নববিধানের নিশান উড়াইয়া যাও, কোন শত্রু তোমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না। প্রেরিত বন্ধুগণ, সোণা রূপা যেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন না করে। তোমরা ভিখারী হইবে, কল্যকার জন্য ভাবিবে না। যে অন্ন চিন্তা, বস্ত্র চিন্তা করে, সে

অল্পবিশ্বাসী। ঈশ্বর তোমাদিগের সর্ব্বস্ব। তাঁহার চরণ ভিন্ন তোমরা আর কিছুই কামনা করিবে না। তিনি যে দিকে চালাইবেন, সেই দিকে চলিবে। একান্তমনে দয়াল প্রভুর উপর নির্ভর করিবে। তিনি যে অন্ন দিবেন, তাহাই খাইবে। পৃথিবীর মলিন অন্ন খাইবে না, তাহাতে শরীরে ব্যাধি ও মনে পাপ জন্মে। মনুষ্যের দেওয়া অন্নে মন মলিন হয়। ঈশ্বরপ্রদত্ত শয্যায় শয়ন করিবে। তোমরা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে চলিয়া যাও। সর্ব্বত্র নববিধানের পূর্ণতা রক্ষা করিবে। কাহারও খাতিরে কিংবা ভয়ে নববিধানকে অপূর্ণ করিবে না, ইহাতে অন্য ভাব মিশ্রিত হইতে দিবে না। সমস্ত পৃথিবী যদি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেয়, তথাপি তোমরা নববিধানকে ছাড়িবে না। যদি কোন দেশ তোমাদের কথা শুনিতে না চায়, তোমরা সেই দেশে নববিধানের কথা বলিবে না; কেন না, ঈশ্বরের আজ্ঞা নহে। সে দেশের অন্ন বায়ু শরীর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, তোমরা অন্যত্র চলিয়া যাইবে। রাগ প্রতিহিংসা করিবে না। যাহারা তোমাদের প্রতি শত্রুতা করিবে, তাহাদিগের মস্তকে তোমরা প্রার্থনারূপ শান্তিবারি বর্ষণ করিবে। শত্রুর প্রতি রাগিও না; কিন্তু দয়া ও ক্ষমা করিও। যাহারা নববিধানের সত্য বুঝিতে পারিবে না, তাহারা কেন মার সত্য বুঝিতে পারিল না, এই বলিয়া কাঁদিও; দীনাত্মা ও সহিষ্ণু হইয়া সত্যরাজ্য বিস্তার করিবে। অনেক বিরোধী যদি দেখ, তথাপি তোমাদের মনে যেন ক্রোধ ও অক্ষমা স্থান না পায়। শান্তি দ্বারা অশান্তি জয় করিবে। ভ্রান্ত ব্যক্তির অভিমান অহঙ্কার দেখিয়া, দয়ার্দ্র হইয়া সংশোধন চেষ্টা করিবে। তোমরা যে দেশ দিয়া চলিয়া যাইবে, সে দেশে যেন পুণ্যসমীরণ ও শান্তিনদী প্রবাহিত হইতে থাকে। তোমরা যে গ্রাম দিয়া যাইবে, সেই গ্রামের লোকেরা জানিবে, যেন একটি তেজ চলিয়া যাইতেছে। অহঙ্কারের তেজ নহে, বিবেকের তেজ। ভাল খাইব, ভাল পরিব, এরূপ নীচ সুখের লালসা মনে পোষণ করিও না। কদাচ মনের মধ্যে বিষয়সুখের ইচ্ছাকে :স্থান দিবে না; কিন্তু কৃতজ্ঞহৃদয়ে ও বিনীতমস্তকে ঈশ্বরপ্রদত্ত সুখ গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর যে সুখ দেন, তাহা যদি গ্রহণ না কর, তবে তুমি স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার দানসম্পর্কে কোন কথা বলিও না। ঈশ্বরকে আদেশ করিও না, তাঁহাকে কখনও বলিও না যে, 'তুমি আমাকে দুঃখ দেও, কিংবা

বিষয়সুখ দেও।” ব্রহ্মরাজ্যে ব্রহ্মের আদেশে ঘটনাগুলি ঘটে। অতএব ঈশ্বরের রাজ্যের ঘটনাকে গুরু বলিয়া মানিবে। তাঁহার ইচ্ছাতে হয়ত আজ এখানে, কাল ওখানে, আজ মানের মধ্যে, কাল অপমানের মধ্যে; কিন্তু ভয় নাই, তোমরা চঞ্চল হইও না, কেন না ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায়ে তাঁহার প্রেমিকের সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় মঙ্গল হয়। স্বর্গের প্রেমবায়ু যাহা আনে, তাহাই গ্রহণ করিবে। লোককে বিরক্ত করিয়া টাকা লইও না, সময়ে আপনি টাকা আসিবে; পূর্ণ ব্রহ্ম তোমাদের ভার লইয়াছেন, তোমরা কেবল নিশ্চিন্তহৃদয়ে তাঁহার কার্য্য করিবে। যে কার্য্য করে না, সে পুরস্কার পায় না। তোমরা কেবল ঈশ্বরের কার্য্য করিবে এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিবে; পরে দেখিবে, ভগবান্ তোমাদিগকে স্বর্গরাজ্য এবং যাহা কিছু এই পৃথিবীতে আবশ্যক, সকলই দিবেন। তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে। গণিত-শাস্ত্রের সত্যের ন্যায় তোমাদের সত্য বিশ্বাসে পরীক্ষিত হইবার বস্তু। এমন কোন কার্য্য করিবে না, যাহাতে ভবিষ্যতে শত শত নর নারী উপধর্ম্মে পড়িতে পারে। তোমাদের পাপে, কি আলস্যে যদি কোন নরনারী পাপ করে, তোমরা দায়ী হইবে। যেখানে অধর্ম্ম ধর্ম্মকে মারিতে আসিতেছে, যেখানে ব্যভিচার সতীত্বকে মারিতে আসিতেছে, সেখানে তোমরা বজ্রদেহী ধর্ম্মবীরের ন্যায় সাহসী ও বিক্রমশালী হইয়া, ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিবে। তোমরা বিশ্ববিজয়ী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রেরিতদল, তোমরা নির্ভয়ে তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। যাহাদিগকে হরি রক্ষা করেন, তাহাদিগকে বধ করে, কাহার সাধ্য? তোমরা যেমন আপনারা মোহজাল কাটিবে, তেমনি তোমাদের স্ত্রী পুত্রদিগকেও মোহ-জাল কাটিতে শিখাইবে। হে প্রেরিতদল, যাহা তোমরা ঈশ্বরের নিকটে গোপনে শিখিয়াছ, নববিধানের ভেরী তূরী বাজাইয়া প্রকাশ্যে তাহা বল। নববিধানের ভিতরে সমুদয় পবিত্র চরিত্রকে টানিয়া লও। নব ভাব, নব অনুরাগ, নবভক্তি প্রদর্শন করিয়া, জগতের নরনারীকে নববিধানের দিকে আকর্ষণ কর।”

কেশবচন্দ্রের ভিক্ষাব্রত

উপদেশান্তে উপাসনা শেষ করিয়া, কেশবচন্দ্র শুভ্র ছিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, গৈরিক বসন পরিলেন এবং সবান্ধবে কমলসরোবরের তটে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন। তদবধি তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনের প্রতি সংসারের

সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া ভিক্ষাব্রতে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে এক এক জন বন্ধু তাঁহাকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রেরিতগণের একত্বপ্রদর্শন জন্য মিলিত উপাসনা

এ দিন (৩রা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ) সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বসন্তপূর্ণিমার উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। মন্দির সময়োচিত ভাবে পুষ্প পল্লবাদিতে সজ্জিত হয়। রেলের অভ্যন্তরস্থ বেদীর উভয় পার্শ্বের দুই দিকে তিন জন করিয়া, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত, ভাই কেদারনাথ দে, ভাই গৌর-গোবিন্দ রায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই অমৃতলাল বসু উপবিষ্ট হন। কেশবচন্দ্র বেদী হইতে সত্যস্বরূপের ব্যাখ্যা করিলে, প্রেরিতবর্গের একত্বপ্রদর্শনজন্য, ভাই প্রতাপচন্দ্র জ্ঞানস্বরূপ, ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত অনন্তস্বরূপ এইরূপ এক এক জন এক এক স্বরূপের ব্যাখ্যা করেন। আকাশের চন্দ্র বড়, না, নবদ্বীপের চন্দ্র চৈতন্য বড়, উপদেশে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া, চৈতন্য বড়, এই সিদ্ধান্তে উপদেশ পরিসমাপ্ত হয়।

প্রেরিতনিয়োগবিষয়ে কেশবচন্দ্রের ইংরাজী উক্তির অনুবাদ

প্রেরিতনিয়োগবিষয়ে কেশবচন্দ্র ইংরাজিতে যে উক্তি নিবদ্ধ করেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"যখন পরমগুরুর চারিদিকে শিষ্যগণ সমবেত হইলেন, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাদের মধ্য হইতে কতকগুলি লোককে মনোনীত করিব, যাহাদিগের প্রেরিত ও প্রচারক আখ্যা হইবে, এবং যাহাদিগের হস্তে পৃথিবীতে আমার রাজ্যবিস্তারের কার্য্য অর্পিত হইবে।' অনেকে মনে করিলেন যে, তাঁহারাই আহূত হইবেন, এবং ভাবী নির্ব্বাচনের ব্যাপার তাঁহারা উচ্চ আশার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদিগের উচ্চ পদ আছে, ধর্ম্ম ও সমধিক বিদ্যার জ্ঞান জন্য যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহারা অতীব বিশ্রব্ধমনে সর্ব্বসম্মুখভাগে আসিলেন। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর তাঁহাদিগের কোন সংবাদ লইলেন না, এবং অতি সামান্য শ্রেণীর লোক হইতে তিনি তাঁহার লোক নির্ব্বাচন করিলেন। যাহাদিগকে পৃথিবী জানে না, মানে না, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার কাজের জন্য মনোনীত করিলেন। সমবেত জনসমূহ আশ্চর্য্য হইল, এবং বলিল, প্রভু পরমেশ্বর জ্ঞানী পবিত্র সবল লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই সকলকে

কেন গ্রহণ করিলেন, যাহারা দুর্ব্বল দরিদ্র অপবিত্র ? উপযুক্ত লোকদিগকে তিনি কেন মনোনীত করিলেন না ? কিন্তু প্রভু পরমেশ্বরের নিয়োগপত্রী স্মরণে ছিল, এবং তিনি তাহাদিগকেই মনোনীত করিলেন, যাহারা মাতৃগর্ভে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা স্বভাবতঃ উপযুক্ত, তৎকার্য্যোপযোগী স্বভাব রুচি প্রবৃত্তি ভাব যাহাদিগের প্রকৃতিতে নিহিত, তাহারাই নিযুক্ত হইল। সমবেত জনসমূহ ইহাতে গোলমাল করিতে লাগিল, কারণ তাহারা এই মনোনয়নে অনুমোদন করে নাই। তাহারা মহাশক্তি পরমেশ্বরের ভয়ঙ্কর বাণী-শ্রবণে নিস্তব্ধ হইলে, সেই বাণী এইরূপ বজ্রধ্বনিতে বিনিঃসৃত হইল :—

"'রে অল্পবিশ্বাসী মনুষ্যগণ, শ্রবণ কর্, এই সকল লোককে আমি আমার বাক্যের প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছি। তাহারা দুর্ব্বল ও দরিদ্র, তবু আমি তাহাদিগকে মনোনীত করিলাম, কেন না ইহাদিগের বিশ্বাস আছে। যদি তাহারা বিদ্বান্ না হয়, যদি তাহাদের পৃথিবীর সম্মান না থাকে, যদি তাহারা ধনের অনুগৃহীত পাত্র না হয়, তাহাতে কি ? একটি যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহা তাহাদের আছে। তাহাদের বিশ্বাস আছে, সুতরাং আমি যাহা চাই, সকলই আছে। তাহারা আমার দাস, এজন্য তাহাদিগকে সম্মান কর্।' সমবেত জনসমূহ কম্পিতকলেবর হইল, এবং আর কোন কথা না বলিয়া বিধাতার নিষ্পত্তির বশতাপন্ন হইল।

"তদনন্তর প্রভু পরমেশ্বর যাহাদিগকে প্রেরিতাখ্যা দান করিলেন, তাহা-দিগকে একত্র করিলেন এবং অপর সকল হইতে প্রভেদক নিদর্শন তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন। এই নিদর্শনোপরি এই কয়েকটী কথা লিখিত ছিল, 'বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা।' তাহাদিগের অভিষিক্ত মস্তকোপরি তিনি স্বীয় পবিত্র হস্ত রাখিলেন, এবং তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অপিচ যাই তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, অমনি তাঁহার মুখ হইতে পবিত্র জ্যোতি তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল, উহা তাহাদিগের সমুদায় আত্মাকে উদ্দীপ্ত করিল, এবং তাহাদিগের হৃদয়কে দেবনিঃশ্বসিতযুক্ত করিল।

"পবিত্র পিতার চরণতলে মনোনীত ব্যক্তিগণ উপবেশন করিল, এবং করযোড়ে আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে বলিল, প্রভো, তুমি তোমার নিদেশ এবং তোমার আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে অর্পণ কর।

"এই তোমাদিগের নিয়োগের স্বর্গীয় নিয়মাবলি। প্রিয় সন্ততিগণ, ইহা গ্রহণ কর, এবং আমার ভালবাসা নিয়ত তোমাদের সঙ্গে বসতি করুক।

"শিষ্যেরা বলিল, তথাস্তু।

"তদনন্তর প্রভু পরমেশ্বর নবনির্ব্বাচিত প্রেরিতগণকে অনুশাসন করিলেন।

"তোমরা স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিবে না।

"তোমরা বেতনভোগীর ন্যায় সেবা করিবে না, অথবা টাকার জন্য স্বাধীন ব্যবসায় চালাইবে না।

"আমার প্রেরিত হইয়া তোমরা যে সকল সেবার কার্য্য সম্পাদন কর, তাহার জন্য বিনিময়স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া, তোমরা তোমাদের অঙ্গুলী অপবিত্র করিবে না।

"অবিশ্বাসীরা যে প্রকার আহার বা পরিচ্ছদের জন্য উদ্বিগ্ন, তোমরা সেরূপ উদ্বিগ্ন হইবে না। যদি সংসার তোমাদিগকে আহার দেয়, তোমরা সে আহার আহার করিবে না। কারণ আমি তোমাদিগের প্রভু, আমি তোমাদিগের আহার যোগাইব। যাহা তোমরা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে না, তাহা তোমরা স্পর্শ করিতে পার না।

"তোমাদিগের আহার ও পরিচ্ছদ সামান্য হউক, যেন সকলে তোমাদিগকে আমার লোক বলিয়া জানিতে পারে। তোমরা তদ্রূপ প্রলোভনের অতীত হও।

"মদ্য ও প্রমদা হইতে তোমরা বিমুক্ত থাক। গাম্ভীর্য্য সহকারে তোমাদিগকে প্রকৃতিস্থতা এবং অব্যভিচারিত্বের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে!

"তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত প্রভুকে সমর্পণ কর, এবং এই হইতে বিশ্বাস কর যে, তাহারা আমার, তোমাদের নয়। একটী পারিবারিক বেদী স্থাপন কর যে, আমি তোমাদিগের গৃহ এবং তন্নিবাসিগণকে আশীর্যুক্ত এবং পবিত্র করিতে পারি।

"ক্রোধী হইও না, কিন্তু যত বার তোমাদের বিরোধী তোমাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, তুমি সহিষ্ণু হও এবং ক্ষমা কর।

"বন্ধু ও বিরোধী সমুদায় লোককে ভালবাস। ন্যায় ব্যবহার কর। যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা অর্পণ কর।

"তোমার জ্যেষ্ঠগণকে সম্মান কর। ধনী, পরাক্রান্ত, জ্ঞানী ও বৃদ্ধের সমাদর

কর। তোমাদিগকে শাসন করিবার জন্য যে সম্রাট্‌কে প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহাকে সম্মান কর, এবং তৎপ্রতি হৃদয়ের প্রভুভক্তি এবং তাঁহার সিংহাসনোপযোগী কর অর্পণ কর।

"সত্যবাদী হও এবং বিশ্বাস কর, মিথ্যাকথন অতীব জঘন্য পাপ। রসনাকে সংযত কর, এবং নির্ভয়ে সত্য বল।

"বিনয়ী হও, কোন বিষয়ে আপনার উপরে গৌরব লইও না। আমি, আমায়, আমার, এ ভাব চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দাও। নীচ আমির স্বার্থপরতা ও অভিমান পরিহার কর, এবং আপনাকে ঈশ্বরে ও সুবিস্তীর্ণ মনুষ্যত্বে নিমগ্ন করিয়া ফেল। তোমরা তোমাদের আপনার নও, কিন্তু আমার এবং পৃথিবীর।

"সমগ্র হৃদয়ে, সমগ্র আত্মাতে, উৎসাহ, উদ্যম ও প্রেম-সহকারে নিত্য উপাসনা কর।

"সর্ব্বাপেক্ষা উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান এবং বিশ্বাস কর যে, উপাসনায় অনিয়ম, অধৈর্য্য, চাঞ্চল্য, অপারল্য, বা শুষ্কতা মহাপাপ। এই পাপ আমার নিকটে অতীব ঘৃণ্য।

"উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল প্রেম এবং মনের একতানতাসহকারে উপাসনা কর যে, শীঘ্রই যোগ ও সহবাস সম্ভোগ করিতে পারিবে।

"আমাতে, অমরত্বে, এবং বিবেকে বিশ্বাস স্থাপন কর। প্রথম দুটিতে তোমাদের পিতা এবং তোমাদের গৃহ দর্শন করিবে, শেষটিতে গুরুর স্বর শুনিবে।

"সমুদায় ঋষি-শাস্ত্রের সম্মান কর।

"উপাসনা, ধ্যান, অধ্যয়ন, ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রসঙ্গ, দেবভাবসম্পন্ন অনুষ্ঠান, প্রচার, এই সকল তোমার দৈনিক কার্য্য হইবে। এ সকলেতে সমুদায় বর্ষ আমায় অর্পণ করিবে।

"যাও, গিয়া সকল দিকে, সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে, স্বর্গরাজ্যের উৎকৃষ্ট বীজ বপনপূর্ব্বক, আমার সত্য প্রচার কর। অহঙ্কারবশতঃ হাতে হাতে ফল অন্বেষণ করিও না, কিন্তু বিনীতভাবে প্রভুর কার্য্য করিয়া যাও।"

প্রেরিতগণের প্রচারযাত্রা

১২ই চৈত্র, ১৮০২ শক (২৪শে মার্চ, ১৮৮১ খৃঃ), বৃহস্পতিবার, প্রেরিতবর্গ

ভারতবর্ষের নানা বিভাগে নববিধানপ্রচারার্থ যাত্রা করেন। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই চৈত্র) লিখিয়াছেন:—"গত বৃহস্পতিবার (১২ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ) প্রেরিতদল ভারতবর্ষের নানা বিভাগে নববিধান প্রচার করিবার জন্য শুভ যাত্রা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সপরিবারে গাজিপুরে গিয়াছেন। তিনি তথা হইতে শিমলা পাহাড়ে, তৎপর বম্বে গমন করিবার ইচ্ছা রাখেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু সপরিবারে বম্বে যাত্রা করিয়াছেন, অল্পদিন পরেই বম্বে হইতে মান্দ্রাজে যাইবেন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিকে প্রচারক্ষেত্র করিয়া তথায় অবস্থিতি করিবেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত এবং কেদারনাথ দে পঞ্জাবে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া, পঞ্জাবে উপস্থিত হইবেন। সেই স্থানকে বিশেষরূপে আপনাদের প্রচারক্ষেত্র করিবেন। শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সপরিবারে রঙ্গপুরে গিয়াছেন। সকলেই উপাসনাগৃহে নববিধানাঙ্কিত পতাকা, ভিক্ষার ঝুলি ও দণ্ড এবং অন্যান্য বৈরাগ্য ও সাধনার সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন। সে দিন আচার্য্য মহাশয় প্রার্থনায় এই ভাব ব্যক্ত করেন,—'সকল প্রেরিতের এক আত্মা, এক শরীর, এক মত, এক ভাব, এই পাঁচ জন এক, একজন ভারতবর্ষের নানাবিভাগে চলিলেন। আমি বন্ধুভাবে ইঁহাদিগকে এই সদুপদেশ দিতেছি, ইঁহারা নির্জ্জনে যোগসাধন করিবেন, প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন করিবেন এবং ধার্ম্মিকদিগের জীবন আলোচনা করিবেন। আমি ইঁহাদিগকে ভিক্ষার ঝুলি ও ভিক্ষার দণ্ড উপহার দিয়া বিদায় করিতেছি।' শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র নববিধানাঙ্কিত নিশানে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, ভিক্ষার ঝুলি হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক, একটী হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভাই অমৃতলাল বসু ও ভাই কেদারনাথ দে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পুষ্পমালা, চন্দন এবং মিষ্টান্ন পাঠাইয়া স্নেহ আদর প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র যাত্রিকদিগের গলায় সেই পুষ্পমালা পরাইয়া, কপালে চন্দন লেপন করিয়া, মিষ্টান্ন হস্তে প্রদান করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় একটার পর, অপর সকল যাত্রিক অপরাহ্ণ চারিটার ট্রেণে যাত্রা করিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয় সবান্ধবে হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন। প্রেরিতগণ নানাস্থানে নববিধানে বিশ্বাসী লোকদিগের নাম সংগ্রহ করিবেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু যাত্রার

দিন প্রাতঃকালেও জানিতেন না যে, তাঁহাকে সপরিবারে মান্দ্রাজে যাইতে হইবে। যাত্রার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে, এক সদাশয় ব্যক্তি গুপ্তভাবে, তাঁহার পরিবারের পাথেয় দেড় শত টাকা দান করিয়াছেন। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য লীলা।"

প্রেরিতগণের প্রচারযাত্রা সম্বন্ধে প্রেরিতদরবারে নির্দ্ধারণ

প্রেরিতগণের প্রচারযাত্রা সম্বন্ধে প্রেরিতদরবারে যে দুইটি নির্দ্ধারণ হয়, তাহা এই :—(৯ই চৈত্র, ১৮০২ শক, সোমবার, ২১শে মার্চ্চ, ১৮৮১ খৃঃ) "১। প্রস্তাব হইল যে, আগামী বৃহস্পতিবার (১২ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ) ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত, ভাই কেদারনাথ দে পঞ্জাবে, ভাই অমৃতলাল বসু মান্দ্রাজে, ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উত্তর বাঙ্গলায়, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্প্রতি গাজিপুরে গমন করিবেন। ২। একটি নিশান, আসন, একতারা, মুখধৌতসামগ্রী, একখানি ছুরী, গামছা, গৈরিক, দেশলাই, বাতী, ছাতা, দণ্ড, ঝুলী, পুস্তকাধার, মেডাল, বালিস, ঘটী, বিছানা, বিধানবাদ পুস্তক—ইহাদিগের সঙ্গে যাইবে।"

একজন নববিধাননিন্দাকারীর কল্যাণার্থ প্রার্থনাদি

প্রেরিতবর্গ নানা বিভাগে নববিধানপ্রচারার্থ গমন করিলে, কলিকাতায় এক নূতন প্রণালীতে প্রচারের ব্যবস্থা হইল। এক জন যূথভ্রষ্ট নববিধানের নিন্দাকারীর কল্যাণের জন্য দুই তিন দিন পর্য্যন্ত দেবালয়ে বিশেষ প্রার্থনা হয়, এবং তাঁহার সমুচিত শাসনের জন্য, কয়েক দিন তাঁহার গৃহে গিয়া, বন্ধুগণ ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা করেন।

নববর্ষের উপাসনা—নামকীর্ত্তনে প্রচারবিষয়ে উপদেশ

বৈশাখের (১৮০৩ শক) প্রথম দিনে (১২ই এপ্রিল, ১৮৮১ খৃঃ), প্রাতে ৫টা হইতে ৯॥টা পর্য্যন্ত নববর্ষোপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে কেশবচন্দ্র উপাসকগণকে এই ভাবে বলেন :—"সংসারিগণের কল্যাণার্থে দ্বারে দ্বারে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করা, এ দেশের ভক্ত সাধকগণের একটী চিরন্তন প্রথা। এ প্রথা আজ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যক্তিগণের নিকট দীন বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক নামকীর্ত্তনে আবদ্ধ রহিয়াছে। উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা ঈদৃশ মহত্তম কার্য্যে কেন নিযুক্ত হইবেন না, ইহার কারণ আমি কিছুই দেখিতে পাই না। আলস্য, স্বার্থজনিত উপেক্ষা, অহঙ্কার এবং বৃথাগৌরবাভিমান পরিত্যাগ করিয়া, যদি তোমরা সায়ঙ্কালে ধনীর গৃহে, দরিদ্রের কুটীরে গিয়া,

তাঁহাদের সম্মুখে ঈশ্বরের দয়াসম্পদের বিষয় গান কর, তোমাদের একটু কষ্ট ও ত্যাগস্বীকারে তোমাদের দেশের পক্ষে পরম কল্যাণ হইবে। তোমরা পথে পথে হরিনাম গান করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের দেশের লোকের যেমন ভাল করিয়া সেবা করিতে পার, এমন আর কিছুতেই পারিবে না। তোমরা সকলে একটি ক্ষুদ্র নববিধানের গায়কদল প্রস্তুত কর এবং নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঈশ্বরের মধুর নাম কীর্ত্তন কর। আজই আরম্ভ কর এবং বৎসরের প্রথম দিন এইরূপে প্রখ্যাত কর। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

নূতন প্রণালীতে প্রচার

ইহার পর কি ভাবে কিরূপে নূতন প্রণালীতে প্রচার হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক) এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"কয়েকদিন প্রাতে বৈরাগ্য ও অন্যের পাপ দুঃখের ভার গ্রহণ করা সম্বন্ধে প্রার্থনার পর, ঈশ্বরের আদেশানুসারে, নববিধানাশ্রিত দল সহরের স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ত্তন করিতে বাহির হইতেছেন। আচার্য্য মহাশয় গৈরিক রঙ্গের আলখেল্লা পরিধান ও একতারা হস্তে লইয়া গমন করেন। সংগীতপ্রচারক মহাশয় ও আর আর কয়েক জন ভক্ত গৈরিক উত্তরীয় বস্ত্র গলে পরিধান করিয়া থাকেন। এই দলে আচার্য্য মহাশয়ের এবং অন্যান্য প্রেরিতগণের পুত্রেরা মৃদঙ্গ করতাল ও শঙ্খ বাজাইয়া ও গান করিয়া, দলের মধ্যে খুব উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া থাকে। পটলডাঙ্গার ইউনিভার্সিটির নিকট, পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীর নিকট ও আর আর দশটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই দল গমন করিয়াছিলেন। যেখানে যাইয়া থাকেন, সেইখানকারই আবাল বৃদ্ধ বনিতারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করেন। যখন ঈশ্বরের বিধান পৃথিবীতে সমাগত হয়, তখন প্রেম, ভক্তি ও বৈরাগ্য মনুষ্যাকার ধরিয়া পৃথিবীতে আলোকস্বরূপ হইয়া থাকে; পৃথিবীর লোকেরা সেই স্বর্গের শোভা দর্শন করে এবং শতসহস্র লোক একটি গুপ্ত অনিবার্য্য বলে নীত হইয়া দলে দলে বিধানভুক্ত হয়। আমরা বিশ্বাস করি, এই ক্ষুদ্র দলটি সেইরূপ স্বর্গের আলোক-রূপে অভিষিক্ত। খুব উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংগীত সংসারে সকলেই শুনিয়াছেন, তাহাতে ততোধিক আকর্ষণ নাই, তাহা নিতান্ত পার্থিব পদার্থ। এই ক্ষুদ্র দলটি যেন প্রেম ভক্তির জমাট হয়, লোকেরা ইহাকে দেখিয়া যেন ইহাতে

স্বর্গের শোভা দর্শন করে এবং নববিধানে আকৃষ্ট হয়। দয়াময় ঈশ্বর! আশ্চর্য্য কার্য্য সকল না দেখিলে কেহই কোন কালে বিধানভুক্ত হয় নাই। বহির্জ্জগতীয় কোন আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, তোমার এইরূপ ইচ্ছা। আমাদিগের জীবনে আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া দেও। অপ্রেমিক অভক্ত অবিশ্বাসী সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ যেন যথার্থ বৈরাগিগণের প্রেম ভক্তিতে গলিয়া যায়, যেন সকলেই তাহাদিগকে দেখিয়া তোমার নববিধানে আকৃষ্ট হয়।"

সঙ্কীর্ত্তনের দল কোন্ কোন্ দিন কোন্ কোন্ স্থানে প্রচার করেন

সঙ্কীর্ত্তনের দল কোন্ কোন্ স্থানে প্রচার করেন, তাহা 'নববিধান' পত্রিকায় এইরূপে প্রদত্ত হয়ঃ—

১২ই এপ্রেল, ১৮৮১ খৃঃ; ১লা বৈশাখ, ১৮০৩ শক; মঙ্গলবার—ক্যারিস্‌চার্চ্চ লেন, বেণিয়াটোলা লেন, কলেজ স্কোয়ার উত্তরে।

১৩ই এপ্রেল, বুধবার—কালীসিংহের গলি।
১৪ই " বৃহস্পতিবার—বিদ্যারত্নের গলি।
১৫ই " শুক্রবার—খ্রীষ্টান ব্যারাক, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
১৬ই " শনিবার—হাড়কাটাগলি, কলেজষ্ট্রীট।
১৮ই " সোমবার—চাঁপাতলা।
২০শে " বুধবার—ঝামাপুকুর।
২২শে " শুক্রবার—সিনেটহাউসের সোপানে, কলুটোলা বাজারে।
২৫শে " সোমবার—পাথুরিয়াঘাটা।
২৭শে " বুধবার—বাদুড়বাগান।
২৯শে " শুক্রবার—কলুটোলা।
৩০শে " শনিবার—নারিকেলডাঙ্গা।
২রা মে সোমবার—কলুটোলা উত্তরে।
৩রা " মঙ্গলবার—কলুটোলা ষ্ট্রীট।
৫ই " বৃহস্পতিবার—অক্সফোর্ডমিশন গৃহ।
৭ই " শনিবার—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, চাঁপাতলা লেন।
৯ই " সোমবার—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, চোরবাগান।

১৪

কতকগুলি নূতন অনুষ্ঠান

নববিধানের পতাকাবরণে সংশয়-নিরসন

নববিধানের পতাকাবরণে অনেকের মনে যে সংশয় উপস্থিত হয়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্বয়ং তাহার নিরসন করেন। কতকদিন পরে 'নববিধান' পত্রিকায় স্বয়ং তৎসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহার অনুবাদ ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা বৈশাখ, ১৮০৩ শক) হইতে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"ধর্ম্মের বাহ্যনিদর্শনসকলের গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিয়া, তৎপ্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। সর্ব্বকালে মহল্লোকেরা ধর্ম্মের গভীর ভাব সকল বাহ্য নিদর্শন দ্বারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের বাক্য সকল পদ্যের ন্যায়। চিত্তহারী ভাবসকলকে তাঁহারা বাহ্যনিদর্শন দ্বারা সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মনের গভীর ভাব সকল আখ্যায়িকা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। অন্নজলে ঈশার রক্ত-মাংসপানভোজনসম্বন্ধে গূঢ় কথা সকল গতবারে আমরা বিবৃত করিয়াছি। অন্ন জলের সহিত ঈশার ভাব সকল আমাদিগের ভাবের সহিত একীভূত হওনের গূঢ়তত্ত্ব সকল আমরা স্বীকার করি এবং সাধন দ্বারা সেই ভাব সকল জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। এই সহজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ঈশার ভাব মানবপ্রকৃতির মধ্যে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সঞ্চারিত হয়, আমরা তাহা দেখিয়াছি। এই অনুষ্ঠান বাহ্যাবরণের ন্যায় কালেতে চলিয়া যাইবে, কিন্তু আভ্যন্তরিক সত্য চিরকালই দীপ্তিমান্ থাকিবে। এক্ষণে নববিধান আর একটি বাহ্যানুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা ঐ নিশান। উহা সেই সাংগ্রামিক মণ্ডলী, যাহা জয়যুক্ত মণ্ডলীতে পরিণত হইবে। পতাকাবিহীন ধর্ম্মসমাজ ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মসাধন, ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সমাধির আদর্শস্থান হইতে পারে; কিন্তু যত দিন ইহা পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া ভেরীর শব্দে চতুর্দ্দিককে কম্পিত না করে, তত দিন তাহা দেশবিদেশকে পরাজয় করিয়া সত্যের পদতলে আনিবার ভার গ্রহণ করে না। আকাশে নিশান উড্ডীয়মান হইলেই

জয়বিস্তারের ভাব বুঝায়। যখন নববিধান উপাসকমণ্ডলীর সম্মুখে পতাকা উড্ডীয়মান করিল, তখনই প্রতিজনের বুঝিতে হইবে যে, জয়বিস্তারের জন্য নববিধানকে চতুর্দ্দিকে বহির্গত হইতে হইবে। পতাকা উড্ডীয়মানের অর্থ, অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া স্বর্গরাজ্যকে নিকটবর্ত্তী করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। গৃহে বা ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া আমাদিগের পরম পিতা ও পরম মাতার পূজা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় এখন আর নাই। আমাদিগের দেশের সকল প্রকার পাপ, অবিশ্বাস এবং ইন্দ্রিয়াসক্তিকে সংগ্রাম দ্বারা পরাস্ত করিয়া, স্বদেশে দানবদলন ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে, সাম্প্রদায়িকতার আধিপত্য তিরোহিত করিতেই হইবে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, পবিত্র সাধুপরিবার এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। সেই সমস্ত কথা ও ভাব এই উড্ডীয়মান পতাকা প্রকাশ করিতেছে। এই জন্যই আমরা পতাকাকে সম্ভ্রম করিব। যে জীবনহীন ধর্ম্ম, কথায় কথায় সামান্য শত্রুর পদানত হয়, এবং প্রচলিত পাপের সম্মুখে ভীত হইয়া পড়ে, সে ধর্ম্মকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। হয় আমরা পাষণ্ডদলন সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে মানিব, নতুবা আমরা কোন ঈশ্বরকে স্বীকার করিব না। হয় বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্ম গ্রহণ করিব, না হয়, আমরা কোন ধর্ম্মই মানিব না, আমাদিগের এই প্রকার বিশ্বাস। আমাদিগের প্রতিজনের এবং দেশের নিকট নববিধান অর্থ, অসত্যের উপর সত্যের জয়, অন্ধকারের উপর জ্যোতির আধিপত্য, মিথ্যা দেব দেবীর স্থলে প্রকৃত ঈশ্বরের রাজ্যসংস্থাপন এবং সাম্প্রদায়িকতার স্থানে একতাপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সমস্ত আমাদিগের আশা। বিগত সাংবৎসরিক উৎসবে এই ভাবেই আচার্য্য পতাকা উড্ডীয়মানানুষ্ঠান সম্পাদন করিয়াছেন। একখানি রক্তবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত টেবিলের উপর পৃথিবীর চারিখানি প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র—ঋগ্বেদ, ললিতবিস্তর, বাইবেল ও কোরাণ সংরক্ষিত হইয়াছিল। তাহার সম্মুখে নববিধানের নিশান সংস্থাপিত ছিল। প্রচারযাত্রার ভেরী রৌপ্যময় দণ্ডের সহিত বদ্ধ ছিল। আচার্য্য নিশানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে :—

"নববিধানের নিশান সন্দর্শন কর। ঐ রেশমের পতাকা ধর্ম্মের জন্য

নিহতদিগের রক্তে লাল হইয়াছে। ইহা স্বর্গ মর্ত্যের রাজাধিরাজ একমাত্র মহেশ্বরের বিজয়নিশান। এই পবিত্র নিশানের চারিদিকে জয় ঘোষিত হইবে। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান্ বাহু সকল প্রকার অমঙ্গলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে, সকল প্রকার পাপ ও ইন্দ্রিয়াসক্তিকে বিনাশ করিবে। মস্তকোপরি মহাজন ও স্বর্গের দেবতামণ্ডলী দর্শন কর, তাঁহারা একটি পবিত্র পরিবারে কেমন সম্বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের সম্মিলনে বিশ্বাস, আশা ও আনন্দ সম্মিলিত হইয়াছে। ঐ পবিত্র নিদর্শনের নিম্নে সর্ব্বকালের নির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞানের আকর, দেবতাদিগের প্রত্যাদেশ এবং আমাদিগের পথের নেতা ও আলোকস্বরূপ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি রহিয়াছে। এই নিশানের ছায়ায় চারিখানি ধর্ম্মশাস্ত্র পবিত্র সামঞ্জস্যে একত্রীভূত হইয়াছে। ইয়োরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা চারিটি মহাদেশ ঐ স্থানে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দে পরস্পরে সংযুক্ত হইয়াছে। দেখ, ঐ স্থান উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, যুবাবৃদ্ধ, নরনারী, ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, সকলের কেমন সম্মিলনের স্থল হইয়াছে। এখানে কেমন মন হৃদয়, আত্মা বিবেক, জ্ঞান প্রেম, সমাধি এবং কর্ত্তব্য-পালন সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি পরমেশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হউক। সকল মহাপুরুষকে ও স্বর্গের দেবতাদিগকে এবং পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকে সম্মান প্রদর্শন কর। নববিধানের জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক। এই গম্ভীর দৃশ্যের মধ্যে আমাদিগের আধ্যাত্মিক চক্ষু ঈশার স্বর্গরাজ্যের নিদর্শন দেখিতেছে। গুরু নানকের বিজয়নিশান, গ্রন্থসাহেব এবং শিখ খালাশা এখানে দৃষ্ট হইতেছে। চৈতন্যের যে সকল বিজয়নিশান নগরকীর্ত্তনে দেশজয় করিতে বহির্গত হইত, তাহাও এ অনুষ্ঠানে একত্রীভূত হইয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপারই ধর্ম্মের রাজভাবের মহন্নিদর্শনস্বরূপ। স্বর্গের রাজা এখানে সিংহাসনারূঢ় রহিয়াছেন এবং পৃথিবীতে তাঁহার ভাবী স্বর্গরাজ্যের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ পাইতেছে।" ঈশ্বরবিশ্বাসিগণ একে একে পবিত্র রাজ্যের নিশানের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহা স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, ভক্তির সহিত তথায় ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা অন্তরের রাজভক্তি এবং সম্ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক "তোমার রাজ্য সমাগত হউক" বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

'পবিত্রভোজন'

২৪শে ফাল্গুন, ১৮০২ শক (৬ই মার্চ্চ, ১৮৮১ খৃঃ), রবিবার 'পবিত্র ভোজনের' অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে 'নববিধান পত্রিকা' লিখিয়াছেন :—"ঈশা! যে সকল জাতির রুটী ও মদ্য পানভোজন অভ্যস্ত, তাহাদিগের জন্যই কি 'সাধু শোণিতমাংসপানভোজনের' অনুষ্ঠান অভিপ্রেত? হিন্দুগণ কি সেই পবিত্র অনুষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত? আমরা অন্ন ভোজন করি, মদ্য স্পর্শ করি না, এজন্য তুমি কি আমাদিগকে বাদ দিবে? ইহা হইতে পারে না। ঈশার আত্মা! তাহা হইতে পারে না। ইউরোপ এবং আসিয়া উভয়কেই তুমি বলিয়াছ—আমার মাংস ভোজন, আমার শোণিত পান কর। এজন্যই হিন্দুগণ অন্নেতে তোমার মাংসভোজন করিবে, নির্ম্মল জলে তোমার শোণিতপান করিবে, যে এদেশে শাস্ত্র পূর্ণ হইতে পারে।

"রবিবার, ৬ই মার্চ্চ, উপরে যে মূলতত্ত্ব বলা হইল, তদনুসারে হিন্দুজীবনের উপযোগী করিয়া, উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যসহকারে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টের হিন্দুশিষ্যগণ উপাসনান্তে ভোজনগৃহে একত্র হইলেন এবং খালি মেঝের উপর উপবেশন করিলেন। একখানি রৌপ্য থালায় 'অন্ন', একটি ক্ষুদ্র পাত্রে 'জল' এবং এ দুইই পুষ্প ও পত্রে পরিবেষ্টিত ছিল। লুকের ১২শ অধ্যায় হইতে আচার্য্য নিম্নলিখিত পদ্যগুলি পাঠ করিয়াছিলেন :—

"অপিচ তিনি রুটী লইলেন, এবং ধন্যবাদ দিলেন এবং উহাকে ভাঙ্গিলেন, এবং এই বলিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন :—এই আমার শরীর, যাহা তোমাদের জন্য প্রদত্ত হইতেছে। আমার স্মরণার্থ তোমরা এই কর।

"এইরূপ ভোজনান্তে পানপাত্র লইয়াও বলিলেন :—যে শোণিত তোমাদের জন্য পাত হইল, আমার সেই শোণিতে এই পানপাত্র নবনিবন্ধনপাত্র হইল।

"অনন্তর পবিত্রপানভোজনার্থ অন্ন ও জলকে আশীর্যুক্ত করিবার জন্য এইরূপ প্রার্থনা হয় :—'হে পবিত্রাত্মন্, এই অন্ন ও জলকে স্পর্শ কর এবং ইহাদিগের স্থূল জড়পদার্থকে বিশুদ্ধিকর অধ্যাত্মশক্তিতে পরিণত কর, যে তাহারা আমাদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, খ্রীষ্ট ঈশাতে সমুদায় সাধুর শোণিত-মাংস আমাদের দেহের শোণিতমাংস হইয়া যায়। এই যে আমাদের সম্মুখে পুষ্টি-কর পানভোজনের সামগ্রী তুমি স্থাপন করিয়াছ, এতদ্দ্বারা আমাদের আত্মার

ক্ষুধাতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত কর। খ্রীষ্টশক্তিতে আমাদিগকে সবল কর এবং সাধুজীবনে আমাদিগকে পরিপুষ্ট কর।' প্রভু অন্নকে এবং জলকে আশীর্যুক্ত করিলেন।

"তৎপর এই সকল অন্ন অল্প পরিমাণে চারিদিকে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। পুরুষেরা এবং নারী ও বালক বালিকারাও ভক্তির সহিত পানভোজন করিলেন এবং ঈশ্বরকে— সাধুমহাজনগণের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।"

নবীন অনুষ্ঠান প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির ব্যবহারিক উপদেশস্বরূপ

এই দুই অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া 'নববিধান' পত্রিকায় কেশবচন্দ্র লেখেন:— "পবিত্রান্নভোজন এবং পতাকাবরণ কি আমরা আমাদের মণ্ডলীর স্থায়ী অন্তর্ব্যবস্থান করিতে চাই? না। প্রাচীন মণ্ডলীতে যে সকল তৎসদৃশ অনুষ্ঠান আছে, তাহাদিগের ব্যাখ্যা এবং আধ্যাত্মিকতা ও পূর্ণতাসম্পাদন তাহাদের অভিপ্রায়। নববিধানের বেদী যেমন প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবচনগুলির ব্যাখ্যা করেন, তেমনি পূর্ব্ববিধান সকলেতে যে সকল এতৎসদৃশ অনুষ্ঠান হইত, এই সকল নবীন অনুষ্ঠান ব্যাবহারিক উপদেশস্বরূপ হইয়া তাহাদিগের গভীর তত্ত্ব দেখায়। আমরা জীবনহীন অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করি না। 'অন্নের' স্থলে 'আত্মস্থকরণ' এবং 'পতাকার' স্থলে 'ঈশ্বরের রাজ্য' পাঠ করুন, রূপকের অর্থ পরিষ্কার হইবে।"

"সাধুশোণিতমাংসপানভোজন" বিষয়ে কেশবচন্দ্রের উক্তি

'নববিধানের পতাকাবরণ' সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র কি বলিয়াছেন, তাহা উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। 'সাধুশোণিতমাংসপানভোজন' বিষয়ে তিনি কি বলিয়াছেন, 'নববিধান' পত্রিকা হইতে আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি:—"খ্রীষ্ট যখন তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, 'এই আমার দেহ', 'এই আমার শোণিত', তখন যে রুটিকাখণ্ড এবং মদ্যপাত্র তিনি তৎকালে নিজহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, স্পষ্টতঃ তৎসম্বন্ধেই ঐ কথা বলিয়াছিলেন। কেহ যেন এ কথা মনে না করেন যে, 'খ্রীষ্টশোণিতমাংসপানভোজন' বা অন্য কোন অভিপ্রায়ে 'গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল' হইতে যে কোন মদ্য বা রুটী আমরা ক্রয় করিতে পারি, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু বলিয়াছেন। খ্রীষ্ট যাহা আপনি সত্যসত্যই স্পর্শ, আশীর্যুক্ত, পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন, উহাই তৎক্ষণাৎ তাঁহার দৈহিক পদার্থে—তাঁহার রক্তমাংসে পরিণত হইয়াছিল এবং সেই ভাবে তাঁহার শিষ্যগণের দেহে উহা

একীভূত হইয়া যাইবার উপযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বাজার হইতে আমরা যে সাধারণ রুটী ক্রয় করিয়া থাকি, তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমরা সে কথা বলিতে পারি না। ইহা খ্রীষ্টের মাংস নয়; যতই কেন কল্পনা ও বাগ্‌জাল আশ্রয় করি না, উহাকে তাহারা খ্রীষ্টের শরীর করিতে পারে না। এস্থলে 'বস্ত্বন্তরে পরিণতি' (Transubstantiation) ঘটে নাই, তবে খ্রীষ্ট যেরূপ বলিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপে 'তৎস্মরণব্যাপার' (Commemoration) হইবার পক্ষে ইহা সহায় হইতে পারে। অন্যেরা যেমন পানভোজন করে, আমরা তেমনি তাঁহার স্মরণার্থ পানভোজন করিতে পারি এবং 'খ্রীষ্টশোণিতমাংসপানভোজনের' একটি অভিপ্রায় এইরূপে পূর্ণ করিতে পারি। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের ভিতরে আর একটি যে বিষয় আছে, তাহা আরও মহৎ এবং অতীব সত্য। স্মরণব্যাপারে আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাব চরিতার্থ হয়। 'বস্ত্বন্তরে পরিণতিতে' খ্রীষ্টেতে জীবনের পত্তন দেওয়া হয়। কিন্তু 'এই আমার শরীর, এই আমার শোণিত' বলিয়া খ্রীষ্ট যে রুটী এবং মদ্য স্পর্শ করিয়াছিলেন, সে রুটী ও মদ্য ছাড়া অন্য রুটী ও মদ্যে এই চিরস্মরণীয় কথা যেন আমরা প্রয়োগ না করি, এবিষয়ে আমাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে। এরূপ করা কল্পনা বিনা আর কিছু নহে, খ্রীষ্টেতে ইহার কিছু প্রমাণ নাই। যে রুটী তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে দিয়াছিলেন, তাহা যদি আমাদের সঙ্গে না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্ম, প্রোটেষ্টাণ্ট এবং কাথলিক আমরা সকলেই এক ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াই এবং আমাদের যাহা আছে, তাহারই ভাল ব্যবহার করিতে হইতেছে। খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে যে পবিত্রীকৃত রুটী ও মদ্য দিয়াছিলেন, তাহা আর তিনি আমাদিগকে দিতেছেন না। যে রুটী পবিত্রীকৃত হয় নাই, সেই রুটী আমরা বাজার হইতে কিনিয়া আনি। 'তুমি কি খ্রীষ্টের শরীর?' একথা সেই রুটীকে জিজ্ঞাসা করিলে, উহা উত্তর দেয়—'না'। তখন আমরা তাহাকে পরিবর্ত্তিত, প্রচলিত কথায় বস্ত্বন্তরে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হই। কিরূপে? বিশ্বাস ও প্রার্থনায়। সত্যই বিশ্বাস ও প্রার্থনার প্রকৃতির উপরে ক্ষমতা আছে এবং জড়ীয় পদার্থকে উহারা আধ্যাত্মিক বলে পরিণত করিতে পারে। অতএব এই উপায়ে আমরা বাজারের সাধারণ রুটীকে খ্রীষ্টের শরীরে পরিবর্ত্তিত করি। রুটির মধ্যে খ্রীষ্টের ভাব অর্থাৎ তাঁহার বিনম্রতা, তাঁহার আত্মত্যাগ, তাঁহার যোগ এবং তাঁহার সাধুতা প্রেরণ করিবার জন্য আমরা

ঈশ্বরের নিকটে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে, যখন আমরা উহা খাই, তখন যেন খ্রীষ্টশক্তিসমূহ আমরা আহার করিতে পারি। যখন ঈশ্বর উহাকে আশীর্যুক্ত করেন, উহা আর সাধারণ রুটী থাকে না; কিন্তু যে কোন ব্যক্তি উহার স্বাদ গ্রহণ করে, সে যথার্থতঃ খ্রীষ্টকেই আহার করে। 'বস্ত্বন্তরে পরিণতির' পূর্ব্বে ইহা কেবল রুটী ছিল, 'বস্ত্বন্তরে পরিণতির' পরে উহা 'জীবনদ রুটিকা', পবিত্রীকরণের সামর্থ্য, আধ্যাত্মিক বল হইল। ঈশ্বর আমাদিগের নিকটে যে পবিত্র পান ভোজনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার ইহাই কেবল সদ্ব্যাখ্যা। ইহাতে রুটী হউক, চপাটী হউক বা আর কোন বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন জীবনধারণের উপকরণ হউক, যদি ঈশ্বরের সংস্পর্শে রূপান্তরিত ও পবিত্রীকৃত হয়, তাহা হইলে উহার ব্যবহার ন্যায়সিদ্ধ। আমরা কে কি দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহা লইয়া বিবাদ নিষ্প্রয়োজন, কেন না আমরা চরমে উহার 'বস্ত্বন্তরে পরিণতিতে' বিশ্বাস করি। রুটী হউক বা অন্ন হউক, খ্রীষ্টের শরীরে যদি উহা পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছু আসে যায় না।"

হোমানুষ্ঠান

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক (৭ই জুন, ১৮৮১ খৃঃ), মঙ্গলবার, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হোমানুষ্ঠান হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা আষাঢ়, ১৮০৩ শক) হইতে উহার বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিঃ—"আচার্য্যের উপাসনাগৃহে বেদীর সম্মুখে একটী লৌহের অগ্নিকটাহ সংস্থাপিত হইল, একটী মৃন্ময় পাত্রে ঘৃত এবং একটী শিশিতে সুগন্ধ চুয়া সমাহৃত হইল, এক স্থানে হোমের কাষ্ঠ সকল সংগৃহীত হইল, ছয় রিপুর প্রতিনিধিস্বরূপ ছয় খানি কাষ্ঠখণ্ড রজ্জুতে একত্র সম্বদ্ধ হইল, এবং ঘৃত আহুতি দিবার জন্য এক নূতন প্রকার তৈজস হস্ত উপস্থিত হইল। পত্র-পুষ্পে হোমস্থান সংবেষ্টিত হইল। সাধারণ উপাসনান্তে আচার্য্য উপস্থিত অনুষ্ঠানসম্বন্ধে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া, তখন সম্মুখস্থিত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিলেন। আচার্য্য এই উপলক্ষে যে সকল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"হে প্রজ্বলিত অগ্নি, তোমার ভিতরে সেই ব্রহ্মাগ্নি, সেই অগ্নিস্বরূপ তেজোময় ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন। হে অগ্নি, তুমি প্রাচীন ঋষিদিগের আদৃত।

আমরা তোমার আদর করি। তুমি ব্রহ্ম নহ; কিন্তু তোমার মধ্যে ব্রহ্মতেজ নিহিত। তুমি উদ্গিরণ করিতেছ জ্বলন্ত ব্রহ্মের মহিমা। মহাগ্নি, তুমি বড়, তোমাকে বড় বলিব। তুমি আকাশে তেজ হইয়া, মেঘে বিদ্যুৎ হইয়া এবং গৃহস্থগৃহে অগ্নি হইয়া স্থিতি করিতেছ। তুমি গৃহস্থের উপকারী বন্ধু, তুমি দুর্গন্ধ বায়ুকে পরিষ্কার করা। তুমি জনসমাজে সন্তোষ ও স্বাস্থ্য বিস্তার কর। হে অগ্নি, ব্রহ্মঘরে সর্ব্বদা তুমি প্রজ্বলিত রহিয়াছ। জীবের জীবনরক্ষাজন্য গৃহস্থের মিত্র হইয়া তুমি অন্নকে সিদ্ধ কর। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের সহায়। তুমি সন্ধ্যার সময় আলোক বিস্তার কর। অগ্নি, পথে তোমাকে হস্তে লইয়া গেলে পথের বিপদ হইতে রক্ষা পাই। হে ব্রহ্মতেজের আধার অগ্নি, যখন তুমি তোমার প্রকাণ্ড তেজ ধারণ কর, তখন শত সহস্র গৃহ জ্বালাইয়া দিতে পার। সেইরূপ যখন ঈশ্বরের তেজ ও প্রতাপ বিস্তৃত হয়, তাহার নিকট ক্ষুদ্র মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। তুমি সত্যের সাক্ষী, ব্রহ্মের সাক্ষী হও। জয় জ্যোতির্ম্ময়! হে অগ্নি, তুমি পার্থিব বিষয়ে বন্ধু হইলে, ব্রহ্মাগ্নির সাক্ষী হইলে, আজ তোমাকে সাক্ষী করিয়া রিপুসংহারব্রত গ্রহণ করিতেছি। প্রাচীন অগ্নিহোত্রিগণ এই দেশে, হে অগ্নি, তোমার দ্বারা আশ্রমভূমি পবিত্র করিতেন। তুমি নানা প্রকার রোগ ও পূতিগন্ধ দূর করিতে। তুমি ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হইতে তপস্বীদিগকে রক্ষা করিতে।

"হে অগ্নি, তুমি প্রজ্বলিত হও। আকাশ এবং বায়ুর অপবিত্রতা নষ্ট কর। নববিধানের ভক্তদিগের বাহ্যিক এবং আন্তরিক অমঙ্গল দূর কর। এই ঘরের বিবিধ ব্যাধি ও সঞ্চিত অপবিত্রতা দূর কর। তুমি ব্রহ্মতেজের বাহ্যিক আধার, তুমি ব্রহ্মতেজোব্যঞ্জক, আমরা তোমার ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। হে অগ্নির দেবতা, জীবন্ত জ্বলন্ত দেবতা, অগ্নিমধ্যে জাজ্বল্যমান হইয়া আমাদের দেহ মন হইতে সয়তানকে দূর কর, মিথ্যা মায়া দূর কর। আমরা গরিব সাধক। এই ষড়রিপুর প্রতিনিধিস্বরূপ ছয় খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে নিঃক্ষেপ করিতেছি। এই পার্থিব অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড সকল এখনই ভস্ম করিয়া ফেলিবে, সেইরূপ ব্রহ্মের পুণ্যাগ্নি আমাদের মনের রিপুস্বরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ সকল একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলুক।

"প্রাচীন মহর্ষি অগ্নিহোত্রিগণ, শাক্য, ঈশা ও যোগী ভক্তগণ আমাদিগের

সাহায্য করুন। হে অগ্নি, আর একবার প্রজ্বলিত হও। সকলে আপন আপন পাপ স্মরণ করুন। এই ব্রত দ্বারা শরীর মন পবিত্র হউক।

"পবিত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা রিপু দহন করিব।

"হে অগ্নির দেবতা, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দহন করে, তোমার ধর্ম্ম পুণ্যরূপ অগ্নি সেইরূপ ষড়রিপুকাষ্ঠখণ্ডকে দগ্ধ করে। অগ্নি রিপুদহনের আদর্শ হইল। সমস্ত পাপ এইরূপে বৈরাগ্যরূপ অনলগ্রাসে পতিত হইয়া ভস্ম হইল। রিপুগণ, তোমরা ভস্মাকারে পরিণত হইবে। ব্রহ্মাগ্নিতে, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ, তোমাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। তোমরা ভস্ম হইবে! যেমন এই অগ্নি সমস্ত কাষ্ঠ দহন করিল, তেমনি ব্রহ্মাগ্নি ষড়রিপু-কাষ্ঠ দহন করিবে। সেই শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ সকল ধন্য, যাঁহারা পাপ, প্রলোভন, মায়া, সয়তানকে জয় করিয়াছিলেন। পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার সাধকদিগের মনে ব্রহ্মতেজ প্রবেশ করুক।

"জয় ব্রহ্মের জয়, জয় ব্রহ্মের জয়!

"পরে একতারা সহযোগে আচার্য্য মহাশয় অগ্নির দেবতাকে সম্বোধন করিয়া এই সকল উক্তি করিলেন :—

"হে অগ্নির দেবতা, তোমার আজ্ঞায় ইন্দ্রিয়াসক্তি সকলকে বিনাশ করিবার জন্য অগ্নিহোত্রী হইয়া প্রকৃত হোম করিতে আমি নিযুক্ত হই। কেন পাপ যাবে না, হে হরি? কেন মনের রাগ যাবে না? কেন লোভ যাবে না? তুমি অগ্নিতে বসিয়া আছ; পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় তেজোময় ব্রহ্ম। আমি কেন পাপহীন হইব না? আমার মত সহস্র সহস্র পাপীর পাপ যাবে না কেন? দেখিয়া বড় হিংসা হয়, কেমন শীঘ্র কাষ্ঠ খণ্ড সকল দগ্ধ হইয়া গেল! যদি এমনই জীবের পাপের কাঠ, রাগের কাঠ, লোভের কাঠ হু হু করিয়া পুড়িয়া যায়! হে প্রাণেশ্বর, পাপ সমস্ত পুড়িয়া যাইবে কি না, বল। আগুন ব্রহ্ম নয়, কিন্তু আগুনের মধ্যে ব্রহ্মতেজ নিহিত রহিয়াছে। হে অগ্নি, তুমি সৃষ্টির দিনে অন্ধকারকে বিনাশ করিয়াছিলে; সেই দিনের দুর্ভেদ্য অন্ধকার তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। অগ্নি দ্বারা যেমন আদি অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল, তেমনই ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা মনের অন্ধকার বিনষ্ট হইবে। মা জগজ্জননি! অগ্নিমধ্যবাসিনি! ভুবনমোহিনি! হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর। আহা ঈশ্বরি! কি তব ক্ষমতা!

কাষ্ঠের বক্ষে বসিয়া কাষ্ঠখণ্ড সকলকে বিদারণ করিতেছ। ঝক্ ঝক্ করিয়া তোমার তেজ প্রকাশিত হইতেছে। গরিব কাষ্ঠ খণ্ড সকল পলকের মধ্যে পুড়িয়া গেল। কবে জীবের দশা এইরূপ হইবে? মনের মধ্যে কবে আমরা বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বালিব? কবে তাহাতে এইরূপ আহুতি অর্পণ করিব? প্রেমের চন্দন দিব? মনের ষড়রিপু একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে! হে শক্তিধারিণি, অনন্তরূপিণি! তেজোময়ি! আমাদিগের পাপ দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে পরিশুদ্ধ কর। সয়তান আসুক, আর যেই আসুক, তোমার পায়ে ধরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করি, তুমি তাহাকে বিনাশ কর। আমাদিগের ষড়রিপুকে বৈরাগ্যের আগুনে দগ্ধ করিয়া দাও। তব তেজে আমাদিগকে তেজোময় কর। আজ যেমন ষড়রিপুর ছয় খণ্ড কাষ্ঠের উপর আগুন দিয়া দগ্ধ করিলে, এমনই ক'রে আমাদিগের সুখসম্পদের উপরে আগুন ছড়াইয়া দাও; পৃথিবীময় আগুন ছড়াইয়া দাও। ওরে সয়তান! ওরে মায়া! আর তোর উপর দয়া করিতে পারিব না; আর দয়া করা হইবে না। এবার তোদের দগ্ধ করিয়া ফেলিব। এবার ষড়রিপু পুড়িয়া পুড়িয়া নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ব্রহ্মানলে একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে। ওরে পাপ! তুই দেশ হইতে দূর হইয়া যা। ওরে ষড়রিপু! তোরা দেশ হইতে দূর হইয়া যা। গৃহস্থের ঘরে তোরা ঢের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্; দেশের বালক বৃদ্ধ যুবাদের তোরা ঢের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। এবার তোরা পুড়িয়া মর্। এই আগুনে পুড়িয়া যা। ব্রহ্ম যখন স্বর্গ হইতে এই অগ্নি পাঠাইলেন, তখন তোদের পুড়িতে হইবে। একেবারে পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া যা; একেবারে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যা।

"অনন্তর ঈশ্বরের নিকট শেষ প্রার্থনান্তে হোমাগ্নি নির্ব্বাণ হইল।

"আমাদের আর্য্য যোগী ঋষিগণ যে অগ্নির মহিমা এত ঘোষণা করিয়াছিলেন, নববিধানও সেই অগ্নিকে সমাদর করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি অগ্নিকে আদর করিয়া অগ্নির অগ্নিকে বরণ করিলেন। তিনি কাষ্ঠখণ্ড সকলকে ষড়রিপু, স্বার্থপরতা, অহঙ্কারস্বরূপে ব্রহ্মাগ্নিতে সমর্পণ করিয়া ভস্মসাৎ করিলেন। তিনি ঘৃত চুয়াকে ঈশ্বরের করুণাস্বরূপে আহুতি দিয়া, সেই অগ্নির ভীষণতা বৃদ্ধি করিলেন। এইরূপে হোমের অন্তর্গত সমস্ত পৌত্তলিক ব্যাপারকে

বিশদরূপে খণ্ডন করিলেন। যোগী ঋষিদিগের হোমকে পুনরুদ্ধৃত করিয়া, তাহাতে নবীন তেজ ও ভাবের যোগ করিয়া, তাহার মহিমা আরও বৃদ্ধি করিলেন। ইনি পূর্ব্বতন বিধি সকলকে বিনষ্ট করিতে জানেন না, কিন্তু তাহাদিগকে সংপূর্ণ করেন। নববিধান তাঁহার আশ্রিতের মধ্যে পাপকে আর এক মুহূর্ত্ত থাকিতে দিতে পারেন না। ঈশা যেমন সয়তানকে বলিয়াছেন, তুই আমার সম্মুখ হইতে এখনই চলিয়া যা, মার যে সময় শাক্যকে তপস্যা দ্বারা শরীরশোষণনিবারণ করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় শাক্য যেমন তাঁহাকে ধমক দিয়া চিরদিনের মত বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, নববিধান সেইরূপ হোম দ্বারা এককালে পাপকে দগ্ধ ও বিনাশ করিলেন। যোগী ঋষিগণও হোম দ্বারা আধিব্যাধি সমস্ত ধ্বংস করিতেন। এইরূপে এক হোম দ্বারা নববিধান ঈশার সয়তানকে নিরাস, শাক্যের মারকে নিরাস এবং যোগী ঋষিগণের আধিব্যাধি নিরাস, এই তিনের সম্মিলন ও পূর্ণতা সাধন করিলেন। এইরূপে তৎকর্ত্তৃক অগ্নি, অগ্নির দেবতা এবং হোমের মহিমা গৌরবান্বিত হইল। এই হোমব্রত গত রবিবারে (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২ই জুন) উদ্‌যাপিত হইয়াছে।”

হোমানুষ্ঠান বিষয়ে নববিধান পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের লিপি

হোমানুষ্ঠানের অভিপ্রায় কেশবচন্দ্র নববিধানপত্রিকায় এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—“আর এক দিন যে আমরা হোমানুষ্ঠানের কথা লিখিয়াছি, উহাতে অনেকগুলি আদর্শ, উপমা, ভাব ও মূলতত্ত্ব রাসায়নিক যোগে একত্রিত করা হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেগুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া গ্রহণ করত, তৎপর বিবিধজাতীয় উপকরণ একত্র মিশ্রিত করা হয় নাই। এ সমুদায় ব্যাপারটি একটী অখণ্ড সামগ্রীরূপে গৃহীত, গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দ্যোতক—অর্থতঃ শারীরিক প্রবৃত্তিসমূহের বিনাশ। যাঁহাদের অধ্যাত্মদৃষ্টি আছে, তাঁহারা ইহার ভিতরে ‘খ্রীষ্টের প্রলোভন’, ‘বুদ্ধের প্রলোভন’, হিন্দু ঋষির হোম, পার্শির মন্দিরে প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শন করিবেন। উহার প্রধান ভাব—‘রে সয়তান্, আমার সম্মুখ হইতে এখনই চলিয়া যা।’ এই ভাবটি সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে সিদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দুর নিকটে অগ্নি স্বভাবতঃ ধ্বংসকারী পবিত্রতা-সাধক পদার্থ ; বৈদিক সময়ে যে হোমদ্বারা শারীরিক ও মানসিক অকল্যাণ

বিনাশ, বায়ুমণ্ডলী শোধন, ভীষণ জন্তু ও বিশাল সর্প দূরে অপসারণ করত তপোবনের কুশলশান্তিবর্দ্ধন এবং বিবিধ প্রকারে যোগীর অধ্যাত্মসাধনের সহায়তা হইত, সে হোমের কথা হিন্দুর মনে উপস্থিত হয়ই হয়। এজন্যই বর্ত্তমান সময়ের হিন্দু সাধককে তাঁহার দৈহিক প্রকৃতির ছয়টি সয়তানকে ভস্মীভূত করিবার জন্য বৈদিক হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে দেখিতে পাই। ইহারাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অভিমান, দ্বেষ এই ছয়টি রিপু। নববিধানে হোম তবে ঈশ্বরের প্রজ্বলিত পবিত্রতাগ্নিতে ইন্দ্রিয়াসক্তি দগ্ধ করা বাহ্যাকারে দেখায়; এবং প্রত্যেক খ্রীষ্টশিষ্যের জীবনের পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ সূচনা করে। আত্মা এতদবস্থায় ঈশ্বরের শক্তিতে স্থিরতাসহকারে প্রলোভনকে পরাজয় করে এবং অকল্যাণকে বলে, 'দুর হ।' এইরূপ জলাভিষেক দ্বারা নূতন জীবনলাভরূপ ভাবপক্ষের সিদ্ধিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, পবিত্রতাসাধনার্থ অভাবপক্ষের বৈনাশিক কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।"

জলাভিষেক

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন) রবিবারে, হোমব্রত উদ্‌যাপিত করিয়া, জলাভিষেকব্রত অনুষ্ঠিত হয়। কমলকুটীরে দেবালয়ে নিয়মিত উপাসনার অন্তে, অনুষ্ঠানটি এইরূপ প্রার্থনায় আরম্ভ হয়। (১৮০৩ শকের ১৬ই আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)

"হে অনন্তকালের ভগবান্, দেশ কাল তোমার কাছে কিছুই নহে। আঠার শত বৎসরের ব্যবধান দূর কর। জেরুশিলাম এবং ভারতবর্ষকে এক কর। ব্রহ্মতনয় ঈশার সঙ্গে ব্রাহ্মদিগকে এক কর। আমরা যিহুদীদিগের দেশে যাইব। ঈশা যে নদীতে অবগাহন করিয়াছিলেন, আমরা সেই নদীতে অবগাহন করিব। আজ কলিকাতাকে যিহুদী দেশ কর। আমাদিগকে এখানে দেখিতে দাও যে, তোমার তনয় ঈশা খেলা করিতেছেন, দ্বিজ হইয়া তোমার তনয়ত্ব পাইয়া উপদেশ দিতেছেন। এ সকল দয়ার ব্যাপার দেখিয়া কৃতার্থ হই। কিরূপে মানুষ দেবস্বভাবপ্রাপ্ত হইলেন, সেই তত্ত্ব শুনাও, তাহা সাধন করাও। পরম পিতা, আজ তোমার নিকটে আসিয়াছি, আমরা জর্ডান নদীর নিকটে যাইব, সেখানে সন্তপ্ত অস্থিকে শীতল করিব। তুমি যাত্রিদলের অধিপতি হও। তোমার আজ্ঞায় কত সাধুর কাছে যাত্রা করিয়াছি, হিন্দুস্থান ছাড়িয়া

ঐ প্রান্তে গিয়া পড়িব, যেখানে মহাপুরুষ জন অভিষেকের পুরোহিত হইয়া জর্ডান নদীতে মহর্ষি ঈশার জলাভিষেক সম্পন্ন করিলেন। অগ্নিহোত্র অথবা রিপুদমনব্রত এই স্নান শুভব্রতে পরিণত। অগ্নিতে হইল রিপুদহন, আমরা জলে পাইব নবজীবন। হায় জর্ডান নদী, আজ তুমি আমাদের কাছে এস, তোমার প্রভুকে দেখিতে দেও। হরি, যাত্রা করি, সচ্চিদানন্দ নাম করিতে করিতে কমলসরোবরকে প্রদক্ষিণ করি; সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হই, যেখানে ঈশার সঙ্গে জনের মিলন হয়, যেখানে পবিত্রাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মতনয় ঈশার মিলন হয়। এই মোহ মায়ার বাজার ছাড়িয়া সেই শান্তিধামে যাই। প্রভু, তুমি আমাদের হাত ধরিয়া সেখানে লইয়া যাও।

"এই প্রার্থনার পরে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে কমলসরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া ঘাটে গিয়া উপনীত হইলেন। ঘাট ফুলে ও পত্রে সুশোভিত হইয়াছিল এবং অনেকলি কলস তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। নববিধানের নিশান উড়িতে লাগিল। জলের উপর কাষ্ঠাসনে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তারিত, তদুপরি আচার্য্য উপবেশন করিলেন। পরে তিনি এই প্রকার উক্তি করিলেন :—

"এই সেই জর্ডান নদীর জল। য়িহুদি রাজ্যে আসিয়াছি, এখানে ঈশার অগ্রবর্ত্তী জন্ ঈশাকে অভিষেক করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। এই জন চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতেন 'অনুতাপ কর', 'অনুতাপ কর', ইনি অনেক জীবকে অনুতপ্ত করাইয়া, এখন ব্রহ্মতনয় ঈশাকে অভিষিক্ত করিতে প্রস্তত; কিন্তু ঈশাকে অভিষিক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। ঈশা বলিলেন—'কুণ্ঠিত হইও না, এইরূপ হইতে দেও।' ব্রাহ্মগণ তোমরা চিন্তা কর, ঈশা দাঁড়াইয়া আছেন, পার্শ্বে জন্, ঈশার অভিষেক হইবে। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিনের মিলন এইস্থানে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পিতা জলে, ব্রহ্ম এই জলের মধ্যে, সেই পুরাতন হরি এই জর্ডান নদীর জলের মধ্যে। জলের মধ্যে আবির্ভূত ব্রহ্ম ব্রহ্মতনয় ঈশা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন। সকলে মনে মনে এই কথা বল, 'এই জলে হরি, এই জলে হরি, আমাদের এই সম্মুখের জলে হরি।' যে জলে ব্রহ্মতনয় ঈশা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এই জল সামান্য নহে। পাপী সে, যে বলে, সামান্য জলে ব্রহ্মতনয় স্নান করেন। যে জলে ব্রহ্ম ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন, যে জলে ব্রহ্ম প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন, সেইজলে ভক্ত ক্রীড়া করেন,

সে জলে হরিসন্তান স্নান করেন। এই জলে, আমার প্রাণের হরি, তুমি নিশ্চয় আছ। হে ব্রহ্ম, শীতল জল হইয়া তুমি তোমার তাপিত সন্তানকে শীতল করিয়াছিলে। জল, তোমার ভিতরে ব্রহ্মকিরণ, ব্রহ্মময় এই জল। জল, তুমি শুদ্ধ, তুমি পবিত্র। তোমাকে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা আদর করিতেন। তুমি হিতকর বন্ধু, তুমি জীবের উপকারী। মেঘের ভিতর হইতে তুমি পড়, উত্তপ্ত ভূমিকে শীতল কর, তুমি জীবের তৃষ্ণা দূর কর। তুমি বৃষ্টি হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরা কর। হে ধান্যক্ষেত্রের পরম বন্ধু, হে সর্ব্বপ্রকার শস্যের বন্ধু, তোমার দ্বারা পুষ্ট না হইলে শস্য ক্ষীণ হয়। হে জল, পৃথিবীতে যদি তুমি না আসিতে, রোগে, শোকে মানুষ প্রাণ হারাইত। নদী হইয়াছ তুমি, এক দেশের বাণিজ্য অন্য দেশে লইয়া যাইতেছ। হে দীনবন্ধুর সৃষ্ট জল, হে জল, আমার ঈশ্বরহস্তে সৃষ্ট হইয়া তুমি আমাকে প্রাতে স্নান করাও, তুমি আমার উত্তপ্ত দেহ শীতল কর, আমার শরীরের মালিন্য দূর কর, স্বাস্থ্য সম্পাদন কর। তৃষ্ণার সময় আমার মুখের ভিতর গিয়া কত আরাম দেও। তোমার পিতাকে কত ধন্যবাদ দিব। তুমি না থাকিলে, হে জল, আমাদের শরীরে কত মলা জমিত। হে জল, আমাদের বাগানের সকল ফুলকে তুমি ফুটাইতেছ। তুমি সৌন্দর্য্যের আদি কারণ। তোমার গুণের কথা কত বলিব। ঋষি মুনিরা বীণা বাজাইয়া শতবর্ষেও তোমার গুণ গাইয়া শেষ করিতে পারেন না। আমি মূর্খ, আমি কি বলিব। অগ্নিতে হরি, এই জন্য হোমসৃষ্টি; জলে হরি, এই জন্য জলাভিষেক। ইচ্ছা হয়, জল, তোমাকে মাথায় দি; দ্বিপ্রহর হইল, এখন তোমাকে মাথায় রাখিলে মস্তক শীতল হইবে। হে জল, পূর্ব্বকালে কেহ কেহ তোমাকে বৃষ্টির দেবতা বরুণ বলিয়া পূজা করিত। তুমি দেহশুদ্ধির কারণ, আজ তোমাকে চিত্তশুদ্ধির কারণ করিব। গোদাবরী, কাবেরী, গঙ্গা, যমুনা, পঞ্চনদী প্রভৃতিতে যুগে যুগে সহস্র সহস্র লোক স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে ভগ্নী জর্ডানের মিলন হইল। যাহা ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে, ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বেও তাহাই হইয়াছে। আগুন জ্বালাইয়াছি, আজ নির্ব্বাণ হইবে। বুদ্ধদেব, তুমি কি জলের ভাব ভাবিয়াছিলে? তুমি নির্ব্বাণ-বিধি প্রচার করিয়া জলের মহত্ব স্বীকার করিয়াছ। ঋষিগণ অন্তরে শান্তিস্থাপন করিবার জন্য শান্তিজলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন।

ঈশার সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া এই ব্রহ্মময় জলে স্নান করি। জন, তুমি কাছে দাঁড়াইয়া বল, 'অনুতাপ কর'; মহর্ষি ঈশার পদধূলি লইয়া জর্ডান নদীতে অবগাহন করি। আকাশ হইতে সেই পবিত্রাত্মা নামিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। এই ব্রহ্মবাণী শুনি, 'আমি আমার পুত্রেতে সন্তুষ্ট হইলাম।'

"অনন্তর বাইবেল হইতে জনকর্ত্তৃক ঈশার অভিষেক-বৃত্তান্ত পাঠ হইল।

"পরে আচার্য্য বলিলেন, হে সচ্চিদানন্দ, মা আনন্দময়ি, তোমার পা ধৌত হইয়াছে যে জলে, সেই জলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হই, অনুমতি দেও। ধন্য! ধন্য! ধন্য! তিনে এক, একে তিন।

"পিতা, পুত্র, প্রত্যাদেশ,
সূর্য্য, জ্যোতি, অগ্নি,
মেঘ, জল, শস্য,
স্বয়ম্ভু, জাতসন্তান, সাধুবাণী,
সৎ, সৎপুত্র, সদালোক হৃদয়ে,
ব্রহ্ম, ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মাগ্নি,
ঈশ্বর, অবতীর্ণ ঈশ্বর, প্রত্যাদেশদাতা ঈশ্বর,
অনন্তব্রহ্ম, ইতিহাসে ব্রহ্ম, হৃদয়ে ব্রহ্ম,
প্রভু, ভৃত্য, আদেশ,
ভক্তবৎসল, ভক্ত, ভক্তি,
আনন্দময়ী, আনন্দগ্রাহী, আনন্দদায়িনী মা,
সৎ, চিৎ, আনন্দ, সচ্চিদানন্দ,

"এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মময় জল মস্তকে, বক্ষে, চক্ষে, এবং কর্ণে দিতে লাগিলেন। পরে এই প্রার্থনা করিলেন, 'মা ভক্তবৎসলা, পদ্মের উপরে মা লক্ষ্মী তোমাকে দেখিব। এই নববিধান, এই বুদ্ধধাম, খ্রীষ্টধাম, গৌরাঙ্গধাম। হে আনন্দময়ি, কমণ্ডলুধারী বৈরাগী তোমাকে ডাকিতেছে। এবার, মা, আকাশে পবিত্রাত্মা হইয়া অবতীর্ণ হও। প্রাণপ্রিয় ঈশা, কাছে দাঁড়াও। জন, তুমি কাছে দাঁড়াও, আর স্বর্গ হইতে প্রত্যাদেশ আসুক।' অনন্তর 'জয় সচ্চিদানন্দের জয়' বলিয়া আচার্য্য সমস্ত অঙ্গ জলে মগ্ন করিলেন।

"ব্রহ্ম মহীয়ান্ হউন, এবং আমাদের মধ্যে তাঁহার সমস্ত সাধু পবিত্রাত্মাদিগের রাজ্য হউক।"

"ভাই ত্রৈলোক্যনাথ প্রেরিতদিগের প্রতিনিধি হইয়া আচার্য্য মহাশয়ের মস্তক জল দ্বারা অভিষেক করিলেন। পরে শূন্য কলস সকল জলে পরিপূর্ণ করা হইল। শেষে আচার্য্য কমণ্ডলু মধ্যে জল লইয়া প্রেরিতগণ এবং অন্যান্য সাধকদিগের মস্তকে শান্তিবারি সেচন করিলেন, এবং তৎপরে কয়েক জন প্রেরিত ও সাধক জলে অবগাহন করিলেন। অভিষেকক্রিয়া সমাপনান্তে পুরুষেরা চলিয়া গেলে, আর্য্যনারীগণ কমলসরোবরে আসিয়া স্নান করিলেন এবং শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে জলপূর্ণ কলস সকল লইয়া গৃহমধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।"

জলাভিষেক সম্বন্ধে 'নববিধান' পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের লিপি

জলাভিষেকসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র 'নববিধান' পত্রিকায় লেখেন :—"ঋষি খৃষ্টের হিন্দু প্রেরিতগণ ১২ই জুন নূতন প্রকারের অভিষেকানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাসের একটি নূতন যুগ খুলিয়া দিলেন। আমরা নিয়ত এই মত পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, খৃষ্টের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিতে গিয়া, ভারত ভৃত্যবৎ পাশ্চাত্য চার্চ্চ সকলের ব্যবহার অনুবর্ত্তন করিবে না; কিন্তু আপনার জাতীয় প্রথাতে ঈশ্বরপুত্রের প্রতি সম্মান ও রাজভক্তি প্রদর্শন করিবে। আর এক দিন অভিষেকানুষ্ঠানকালে যেরূপ স্বাধীনতা ও নবোদ্ভাবনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, এরূপ আর কখন প্রকাশ পায় নাই। ইহাতে ইউরোপীয় ভাব বা বিজাতীয় খৃষ্টধর্ম্মের নীচ প্রকারের ভাবশূন্য অনুকরণ ছিল না। ইটি আগাগোড়া হিন্দুভাবের উৎসব হইয়াছিল। স্নানযাত্রা ভিন্ন ইহা আর কিছুই ছিল না। কোন ইউরোপীয় পাদরী অভিষেকের কার্য্য করেন নাই। কোন চার্চ্চ বা চ্যাপেলে জলসেক করা হয় নাই। 'আমি তোমাকে অভিষেক করি' ইত্যাদি প্রাচীন মন্ত্রও উচ্চারিত হয় নাই। এরূপ করিয়াও অনুষ্ঠানটি শাস্ত্রসম্মত হিন্দু অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মার নামে সাধকগণ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং বাপ্তিষ্ট জন ভাবে উপস্থিত থাকিয়া জলাভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। চার্চ্চের ভিতরে বা বাহিরে তদপেক্ষা এবিষয়ে সমধিক অধিকারবান্ আর কে আছেন? সামান্য

জলে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই ; আঠারশত বর্ষ পূর্ব্বে যিশুখৃষ্ট যে জর্ডান নদীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই জর্ডানে অবগাহন হইয়াছে। সত্যই বিশ্বাস এবং প্রার্থনায় সে সময়ের জন্য কলিকাতাকে 'পবিত্রভূমি' (Holy Land) এবং পুষ্করিণীর জল জর্ডানের জলে পরিণত হইয়াছিল। পরমরহস্য-ত্রিতয়ের সম্বন্ধে ত্রিবিধ প্রকাশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া, নববিধানের পুরোহিত অভিষেকের নব মন্ত্র উচ্চারণ করেন ঃ—

"ধন্য, ধন্য, ধন্য,
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
সূর্য্য, জ্যোতি, অগ্নি,
মেঘ, জল, শস্য,
স্বয়ম্ভু, অবতীর্ণ, পাবন,
অজ, জাত, সান্ত্বয়িতা,
আমি আছি, বাক্, নিশ্বসিত,
প্রকৃতির ঈশ্বর, ইতিহাসের ঈশ্বর, আত্মার ঈশ্বর,
ব্রহ্ম, ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মাগ্নি,
সত্য ঈশ্বর, সত্য মানব, সত্য,
স্বয়ং আনন্দ, আনন্দাবিষ্ট সাধক, আনন্দদাতা,
প্রভু, ভৃত্য, আদেশ,
দেবত্ব, দেবত্বসম্পন্ন মানবত্ব, দেবত্বসম্পন্ন আত্মা,
অনাদি ঈশ্বর, ভবিষ্যদ্দর্শিস্থ ঈশ্বর, পরিত্রাণের ঈশ্বর,
সৎ, চিৎ, আনন্দ।"

'পবিত্রপানভোজন' সম্বন্ধে 'বম্বে গার্ডিয়ান' এবং 'ইণ্ডো ইউরোপিয়ান্ করেস্পণ্ডেণ্টের' অভিমত

এই সকল অনুষ্ঠান যে অনেকে নিন্দার চক্ষে দেখিবেন, তাহা আর বলিতে হয় না। পবিত্রপানভোজনানুষ্ঠানসম্বন্ধে খৃষ্টের অভিলাষ প্রতিপালন করিতে গিয়া অন্নজল ব্যবহার করাতে, 'বম্বে গার্ডিয়ান' খ্রীষ্টের নিরতিশয় অবমাননা করা হইয়াছে, মনে করিয়াছেন। খৃষ্ট যেরূপ রুটী ভোজন করিতেন, হিন্দুগণ যখন সেইরূপ রুটী ভোজন করিয়া থাকেন, তখন রুটীর পরিবর্ত্তে অন্ন ব্যবহার করিবার তিনি কোন কারণ দেখিতে পান না। খৃষ্টের কথার ভিতরে মন্ত্রের

কোন উল্লেখ নাই। শিষ্যগণ দ্রাক্ষারস ব্যবহার করিতেন। দ্রাক্ষা যেরূপ নির্দ্দোষ, দ্রাক্ষারসও সেইরূপ নির্দ্দোষ। কাথলিক সম্প্রদায়ের পত্রিকা 'ইণ্ডো ইউরোপিয়ান্ করেস্পণ্ডেন্ট' এরূপ অনুষ্ঠানের কখন অনুমোদন করিবেন, ইহাতো কখনই সম্ভবপর নহে। তবে প্রোটেষ্টাণ্টগণ 'পবিত্রপানভোজনানুষ্ঠানকে' যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাহাতে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সেই অনুষ্ঠানকে অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যত্ন করা যে যুক্তিযুক্ত হয় নাই, ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টকে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকটে অন্নপান খৃষ্টের শোণিতমাংস কখন হইতে পারে না, কাথলিক পত্রিকা এই যুক্তির উপরে বিলক্ষণ ভর দিয়াছেন, এবং খৃষ্ট যে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন। মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে যিহুদী প্রধানধর্ম্মযাজক, খৃষ্ট আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, এই অপরাধ যখন তাঁহার উপরে আরোপ করিলেন, তখন তিনি তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই; অতএব তিনি আপনাকে ঈশ্বর করিয়াছেন, কাথলিক পত্রিকার এ যুক্তি, যাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইতে পারে না। প্রকাশ্যে যিহুদী সমাজে 'আমি এবং আমার পিতা এক' একথা বলিয়া খৃষ্ট যখন 'আপনাকে ঈশ্বর করার' অপবাদগ্রস্ত হইলেন, তখন তিনি আপনি, কি ভাবে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যা করিলেন; অথচ যিহুদিগণ সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া, যখন সেই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইল, তখন তাঁহার পুনরায় সে কথা তুলিয়া কি ফল হইত, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তিনি ঈশ্বরের সমতুল্য নহেন, ঈশ্বরের মত সকল বিষয় জানেন না ইত্যাদি বহু কথা বলিয়া, তিনি আপনাকে ঈশ্বরের পদস্পর্দ্ধী নন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; অথচ সেকালের যিহুদিগণের মত একালের শিষ্যগণ তাঁহার উপরে সে অপরাধ আরোপ করেন, ইহা নিরতিশয় দুঃখেরই হেতু। যাউক, এ সব কথা আর না বলিয়া 'ষ্টেটস্‌ম্যান' তৎকালে কি বলিয়াছিলেন, তাহা দেখা যাউক।

'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার অভিমত

'ষ্টেটস্‌ম্যান' লিখিয়াছেন :—"খৃষ্টসম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পত্রিকামধ্যে পুনঃ পুনঃ যে সকল নিষ্ঠুর কথাকাটাকাটি চলে, তাহা ভাল

লোকদের কখন ভাল লাগিতে পারে না, (ভাল লোকদের কিন্তু এ বিষয় ভাবা উচিত) কেবল মন্দ লোকদের উহা আমোদের কারণ হয়। নববিধানমণ্ডলীতে যে নূতন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে উহাই এই কথাকাটাকাটির মূল। কেশবচন্দ্রের মণ্ডলী দিন দিন খৃষ্টানমণ্ডলী হইয়া আসিতেছে। আমরা তাঁহাদের কার্য্যতঃ ব্যবহারের কথা কেবল এই জন্য বলিতেছি না যে, আমরা তাঁহাদের পত্রিকা হইতে মত ও অনুষ্ঠানের কথাই কেবল জানিতে পাই, তাহাদের জীবন এবং অনুষ্ঠান আমাদের দৃষ্টিপথে কখন পড়ে নাই। এ বড় আশ্চর্য্য যে, মেস্তর ডল যাঁহাদিগের 'কেশবাইত' নামকরণ করিয়াছেন, তাঁহারা যত খৃষ্টধর্ম্মের সত্যের শক্তিমত্তা, খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ স্বীকার করিতেছেন এবং যতই তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পত্রিকাগুলি অতি কঠোরভাবে—এমন কঠোর যে, বলা যাইতে পারে, অসভ্যোচিত ভাবে—সে সকলের দোষদর্শন করেন। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা খ্রীষ্টীয়প্রচারকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতে চান না। মনে হয়, তাঁহারা নিউটেষ্টমেণ্ট আপনারা পড়েন, খৃষ্টধর্ম্মবিশ্বাসিগণের ব্যাখ্যানের উপরে তাঁহাদের বড় একটা আস্থা নাই। আশ্চর্য্য যে, এই অপরাধের জন্য কাথলিকেরা যেমন, প্রোটেষ্টাণ্টেরাও তেমনি তাঁহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করেন। স্বয়ং বিচার করিয়া দেখার স্বাধীনতা, মনে হয়, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মপ্রচারকেরা যত দূর বিস্তার করেন, তদপেক্ষা কেশবচন্দ্র সেন আরও অধিক দূর লইয়া গিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিগণ যাহাকে বিশুদ্ধ খৃষ্টধর্ম্ম মনে করেন, এদেশে তাহা বিস্তার করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহারা যেখানে মনে করেন যে, ব্রাহ্মেরা ভুল করিতেছেন, সেখানে ব্রাহ্মগণকে তাহা সরলভাবে বলাই সমুচিত। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের যে প্রকার দয়া ও সহিষ্ণুতাব্যঞ্জক বাক্যে ভৎ‌র্সনা করা সমুচিত, তাহার সম্পূর্ণ অভাব দেখায়। আমাদের দুঃখ এই যে, যে সকল আমেরিকার প্রচারকমধ্যে উৎসাহী সাধনপ্রিয় স্বধর্ম্মে আনয়নকারী আছেন, তাঁহারাও কঠোর কথায় আক্রমণে সকলের অগ্রগামী। তাঁহারা ব্রাহ্মদের ভ্রমসকল (যদি সে গুলি ভ্রম হয়) ঘৃণার চক্ষে দেখেন। তাঁহাদের অসদ্ভাব (মন্দলোকের নিকটে) ইহাতেই অতি আমোদের হয় যে, ব্রাহ্মপত্রিকার এই এক

কৌতূহলকর রীতি যে, খৃষ্টান পত্রিকা সকল যতগুলি অতি নিন্দনীয় প্রবন্ধ লেখেন, সে গুলি সম্পাদকীয় স্তম্ভে যেন এই ভাবে উদ্ধৃত হয় যে, ঐ সকল প্রবন্ধের উপহাসাস্পদতা এবং নিজের মহত্ত্বপ্রকাশের ইহাই অতি প্রকৃষ্ট প্রণালী। এরূপ আচরণের মধ্যে একটু আত্মপ্রসাদেরও দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে। কিন্তু যাই হউক, এটা অতি সুস্পষ্ট যে, ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের দোষ দেখাইলে তাহাতে ভয় পান না এবং ইহা আরও তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসনীয় যে, যদিও তাঁহারা অনেক সময়ে সার্থক প্রতিবাদ করেন, তথাপি তাঁহাদের দোষ-দর্শীরা যত কঠোর কথায় বিরুদ্ধে লেখেন, তত কঠোর কথা না লেখাই তাঁহাদের নিয়ম। মনে হয়, যে পরমতাসহিষ্ণুতা এবং কুসংস্কার নিয়ত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, তৎপ্রতি বরং তাঁহারা করুণার্দ্র।

"বঙ্গদেশের লোকদিগের অভ্যাসের উপযোগী করিয়া নববিধানমণ্ডলীতে সম্প্রতি যে পানভোজনের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উহাই বর্ত্তমান বিরোধের কারণ। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে পানভোজনের সামগ্রীরূপে রুটী ও মদ্য ব্যবহৃত হয় না, তাই ব্রাহ্মগণ (পবিত্রপানভোজনে) এই দুই ব্যবহার না করিয়া, অন্ন ও জল ব্যবহার করেন। যদি তাঁহারা কোন খৃষ্টীয়ান চার্চ্চের সভ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গমের রুটী এবং একটী রাসায়নিক মিশ্রিত সামগ্রী—যাহাকে মিথ্যা মিথ্যা পোর্ট মদ্য বলা হইয়া থাকে—খৃষ্টের শোণিত ও শরীরের প্রতিরূপ বলিয়া পানভোজন করিতে হইবে। তাঁহারা চান যে. ইহা হইতে তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, কারণ এ দুই সামগ্রী বিদেশীয়,—একটীতো তাঁহারা নিরতিশয় ঘৃণিত মনে করেন। এ দুই তাঁহাদের মতে কদাপি প্রভু যিশুর শরীর ও শোণিত হইতে পারে না। যদি তাঁহারা আধ্যাত্মিকভাবে তাঁহার মাংসভোজন এবং শোণিতপান করেন, এবং বাহ্যভাবে তাহার প্রতিরূপ কিছু করিয়া লন, তাহা হইলে এদেশের লোকে যে অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, এবং যে জল তাঁহাদের অভ্যস্ত পানীয়, সেই দুইটিকে, তাঁহারা মনে করেন, আরও ভালরূপ, আরও রুচির অনুরূপ করিয়া লইতে পারেন; এই অনুষ্ঠানের যে দিক্‌টা স্মরণার্থক, সে দিক্‌টা অক্ষরে অক্ষরে না করিয়া, ভাবতঃ করিলেই তৎসম্বন্ধে পবিত্র নিদেশ রক্ষা পায়। আর তাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে, খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যগণ যিহুদী না হইয়া যদি বাঙ্গালী হইতেন, তাহা হইলে রুটী ও মদ্য ব্যবস্থা

করিতেন, নিশ্চয়ই অন্ন ও জলের ব্যবস্থা করিতেন না। কাথলিক সম্প্রদায়, মদ্য-পানে যে তাঁহাদের বাধা আছে, সেটি অপসারণ করিতে পারিতেন, কেন না সে সম্প্রদায়ের প্রথা আছে, অন্য লোকে রুটী খায় এবং ধর্ম্মযাজকেরা মদ্যপান করিয়া থাকেন। মেথডিষ্টগণ হিন্দুগণের মত মাদকদ্রব্য পান করেন না। তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহারা চাপাটীর এবং মদ্যের পরিবর্ত্তে দ্রাক্ষারসব্যবস্থা করিতে পারিতেন। যদি মদ্যের পরিবর্ত্তে দ্রাক্ষারস এবং রুটীর পরিবর্ত্তে চাপাটী ব্যবস্থা করা বিধিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মেরা যদি এ দুইয়ের কোনটি না লইয়া সমানন্যায়ে অন্ন ও জল পরিবর্ত্তন করিয়া লন, তাহা হইলে কি দোষ হয়, বুঝিয়া উঠা যায় না। যাহাতে তাঁহাদের কোন বাধা থাকে না, সে পথ তাঁহারা আপনি বাহির করিয়া লইয়াছেন। যদি আমরা এইরূপ মনে করি যে, ব্রাহ্মেরা যদি সম্ভ্রম ও ভক্তিসহকারে অন্ন ও জল দিয়া 'প্রভুর ভোজ' সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই অনুষ্ঠান স্বয়ং অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক কঠোর কথায় দোষগ্রস্ত করিতেন না, তথাপি আমরা এ তর্ক ও বিতর্কের কোন পক্ষেই মতামত প্রকাশ করিতেছি না। অনেক চার্চ্চে মিথ্যা মিথ্যা পোর্ট নাম দিয়া যে স্বল্পমূল্যের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়, তাহা দ্রাক্ষার মত কিছুই নয়, তদপেক্ষা নিশ্চয়ই জলব্যবহার করা ভাল। তর্ক বিতর্কের বিষয় ছাড়িয়া দিয়া কি মনে হয় না যে, ব্রাহ্মেরা যদি একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া পানভোজনানুষ্ঠান করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে যত দিন না কিছু তন্মধ্যে অসম্ভ্রমের ভাব থাকে, তত দিন ব্রাহ্মেরা খৃঃধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা মনে করিয়া খৃঃধর্ম্মের প্রচারকগণের কি আহ্লাদ করা উচিত নয়? খৃষ্ট যে কতকগুলি ভাল লোকের বাধ্যতা এবং স্মরণে থাকার অধিকার চাহিয়াছিলেন, এ অনুষ্ঠান সেই বাধ্যতা এবং স্মরণে রাখার অধিকারস্বীকার, ইহা ভাবিয়া নিন্দা না করিয়া আহ্লাদ করাই উচিত। ধূমায়মান বহ্নিকে নির্ব্বাণ করিবার জন্য খৃষ্টান প্রচারকগণের এত ব্যস্ততা কেন? পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে কতকগুলি অপরিচিত লোককে স্বর্গরাজ্যে প্রবিষ্ট করিয়া লওয়া হইতে পারে এবং যাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের তথায় প্রবেশ করিবার বিশেষ অধিকার আছে, তাহাদের মুখের সম্মুখে দ্বার বন্ধ হইয়া গেল, কতকগুলি লোককে যে এই বলিয়া সাবধান

করা হইয়াছিল এবং তাদের মত ইঁহারাও কতকটা, সে কথা ইঁহাদের বিলক্ষণ স্মরণে রাখা উচিত।"

এ সকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভট্ট মোক্ষমূলরের বিমত বিষয়ে 'নববিধান' পত্রিকায় লিপি

ভট্ট মোক্ষমূলর এই সকল অনুষ্ঠানসম্বন্ধে যে বিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষ করিয়া নববিধান পত্রিকায় লিখিত হয় (১৮০৩ শকের ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ দ্রষ্টব্য) :—"ভট্ট মোক্ষমূলর, যাঁহাকে আমরা সত্য সত্যই সম্মান করি, বলিয়াছেন, তিনি বাহ্য অনুষ্ঠান সকলেতে অনুরক্ত নহেন। আমরাও নহি। তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তিনি উচ্চতর বিষয় সকল কামনা করেন। আমরাও তাই করি। তবে তাঁহার ও আমাদিগের মধ্যে প্রভেদ কি? আমরা কতকগুলি বাহ্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া গিয়াছি, তিনি যান নাই। কিন্তু আমাদিগের এই সকল অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের প্রারম্ভের কারণ আছে। আমাদিগের সাধকেরা বাহ্যানুষ্ঠানানুরক্ত নহেন। ব্যবহার বা অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান বলিয়া তাঁহারা অন্ধের ন্যায় অনুষ্ঠান করেন নাই। তাঁহারা এক প্রকার নূতন অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক এবং ইন্দ্রিয়াতীত বাহ্যানুষ্ঠানবিরোধী, তাঁহাতে বাহ্য প্রণালী এবং অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন ছিল না, তাই কোন প্রয়োজন নাই, সপ্রমাণ করিবার জন্য একটি গভীর প্রয়োজন ছিল। কতকগুলি অনুষ্ঠান যাহা আছে, কেবল তাহাদিগের আধ্যাত্মিকতা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক অর্থ আমরা অর্পণ করিয়াছিলাম। আনুষ্ঠানিক কেন? যেহেতুক উহা নিরতিশয় হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। প্রাচীন জীবনবিহীন অনুষ্ঠানসকলকে বুঝাইবার জন্য নূতন জীবন্ত দার্ষ্টান্তিক অনুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই তেমন বুঝাইতে পারে না বা দার্ষ্টান্তিক হইতে পারে না। হোম, অভিষেক, অগ্নে সাধুশোণিতমাংসসঞ্চারণ, দণ্ডধারণ, পতাকাস্থাপন, এ সকল বিষয়ে বক্তৃতা বা উপদেশদানাপেক্ষা যদি জীবন্ত অভিনেতৃগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হয়, তবে হৃদয় উহা ভাল বুঝিতে পারে। তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা ঐ সকল অনুষ্ঠান দেখিয়াছিলেন এবং করিয়াছিলেন; কারণ সে সময়ে পূর্ব্বতন ইতিহাস বিদ্যমানের ব্যাপার হইয়াছিল এবং যেন নূতনজীবন লাভ করিয়াছিল। আকাশ দ্বিধা হইয়াছিল এবং গূঢ়ার্থ স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া আলোকমালা মৃতানুষ্ঠানের গভীর

রহস্যোপরি অবতীর্ণ হইয়াছিল। কে তাঁহারা, যাঁহারা এই সকল অনুষ্ঠান সম্পাদন করিলেন? সকলে? না। অল্প কয়েক জন। কতবার উহারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? কেবল একবার প্রয়োজনীয় অর্থ বুঝান হইল। ইহাই যথেষ্ট।"

নববিধানের অবিমিশ্র শুদ্ধতা

নববিধানের অবিমিশ্র শুদ্ধতাবিষয়ে ঐ পত্রিকায় এইরূপ লিখিত আছে (১৮০৩ শকের ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ দ্রষ্টব্য):—"পৌত্তলিকতা বা কুসংস্কারের সঙ্গে যথাকথঞ্চিৎ সংস্পর্শ হইলেও নববিধান বিনষ্ট হয়। ইহা এত বিশুদ্ধ হয় যে, ইহা ভ্রমের অণুমাত্রসংস্রবও সহ করিতে পারে না। ইহা সম্মিলনপ্রিয়, মতসহিষ্ণু, উদার, ক্ষমাশীল, ভ্রান্তমতবিশ্বাসীর প্রতিও বন্ধু-ভাবাপন্ন। তথাপি ইহাতে স্থিরতর সত্যবত্তার নিরপেক্ষ দার্ঢ্য আছে, যে দার্ঢ্য কুসংস্কার এবং ভ্রান্তির অত্যল্প সমাগম হইতেও আপনাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করে। খ্রীষ্ট যেমন কুষ্ঠী, শ্বিত্রী, বারাঙ্গনা, অধমতম পাপিগণের সংস্রব করিতেন, অথচ নিজের চরিত্রের অকলঙ্কিত বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন, ঈশ্বরের নূতন বিধানের স্বর্গীয় দূতও তেমনি সমুদায় শ্রেণী, সমুদায় সম্প্রদায়, পৌত্তলিক, অদ্বৈতবাদী, জড়বাদী, সংশয়ী এবং বিবিধ প্রকারের ভ্রান্তি, ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং পাপের প্রতিপোষক লোকদিগের মধ্যে গমন করে, অথচ তাহাদিগের সংসর্গে অণুমাত্র স্বর্গীয় পবিত্রতা হারায় না। গভীর কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের বাহুপরিশোভিত হীরকের ন্যায় চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী অন্ধকারের মধ্যে সত্য সমধিক ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান্ হয়; এবং যেমন মধুমক্ষিকা কণ্টকবন, বিষবল্লী এবং বিষপুষ্পসমাকীর্ণ অরণ্যানী হইতেও কিরূপে মধু সংগ্রহ করিতে হয় জানে, তেমনি নববিধানের অদৃশ্য মধুমক্ষিকা দূষণীয় ধর্ম্মমত, কলঙ্কিত মতবিশ্বাস হইতেও সত্য এবং প্রেমের মধু সংগ্রহ করে। ঈশ্বরের মধুমক্ষিকা বলে, মধু, সমুদায় মধু, মধু ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি আমাদিগের মধ্যে কেহ পতাকা বা কড়ঙ্গ, অগ্নি বা জল, অতীন্দ্রিয়দর্শী বা ধর্ম্মার্থে নিহত, বেদ বা কোরাণের পূজা করে, সে একেবারে যথার্থ বিশ্বাসী বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়। যদি কেহ কোন গৃহ এই বলিয়া ক্রয় করিতে যায় যে, গত রাত্রে সে সেই বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়াছে, তবে আর কিছু না বলিয়া, তাহাকে স্বপ্নদর্শিগণের কারাগৃহে নিঃক্ষেপ করা হইবে। এমন ব্রাহ্ম কি কেহ আছেন, যিনি এই অভিমান করেন যে, তিনি কোন কার্য্য

করিবার জন্য আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছেন? তাঁহাকে বঞ্চক এবং ঈশ্বরের সত্যের শত্রু বল। যেমন কেন ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী হউন না, কোন প্রকার নিসর্গাতীতত্বের অত্যল্প অভিমানও আমাদিগের মধ্যে স্থান পায় না। ঈশার প্রশংসাবাদ গান কর, এবং তাঁহার দেবপ্রকৃতি গৌরবান্বিত কর, কিন্তু কেবল ঈশ্বরতনয় বলিয়া, আর কিছু বলিয়া নহে। ইহা ছাড়িয়া এক বিন্দু অগ্রসর হও, তুমি পৌত্তলিকতা এবং কুসংস্কারে নিমগ্ন হইবে। নববিধানে বিশ্বাসী অত্যল্প পরিমাণেও কুসংস্কারের সংস্রব অনুমোদন করিতে পারেন না। হে সত্য, হে অবিমিশ্র সত্য, হে স্বর্গীয় গৌরবান্বিত নূতন আলোক, সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃ-সম্মিলন রক্ষা করিয়াও অথচ সমুদায় অবিশুদ্ধতা হইতে বিমুক্ত। গৌরব গৌরব তোমারই গৌরব।”

১৫

নবভাবের উন্মেষ

প্রেরিত দরবারে 'নববিধান' (New Dispensation) পত্রিকা বাহির হইবার যে নির্দ্ধারণ (২০শে ফাল্গুন, ১৮০২ শক ; ২রা মার্চ্চ, ১৮৮১ খৃঃ) হয়, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে দিন দিন যে নব নব ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, তাহা এই পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এসময়ে তাঁহার হৃদয় কোন গভীর ভাবে অধিকৃত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ প্রথমে 'পাগল' ও 'যোগী' এই শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধসকলের বঙ্গানুবাদ আমরা নিম্নে দিলাম।

১। পাগল—(১৮০৩ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)

"আমি পাগল হইয়াছি, কিন্তু আমার পাগলামীতে শৃঙ্খলা আছে। অন্য পাগলের মতন আমি নহি। অপরের পাগলামী স্বতন্ত্ররূপ। আমি অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইয়াছি এবং এই পাগলামীতেই আমার সংসারের সকল আশা ভরসা বিনষ্ট হইয়াছে; অথচ আমি অসুখী নই। যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ সকলেই আমাকে দেখিলে নানারূপ বিদ্রূপ করে। আমার রীতি-বহির্ভূত কার্য্য ও পাগলামী অনেক আছে, সেই সমস্ত ব্যাপার অন্যের যথেষ্ট আমোদ ও কৌতুকের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেহই আমার প্রতি দয়া করে না। কেন যে সকলে আমার প্রতি দয়া না করিয়া, কেবলই আমাকে দেখিয়া হাস্য করে, তাহা আমি জানি না। তাহারা সকলেই জানে যে, পাগলদিগের আপনার উপর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; এই জন্য হতভাগ্য পাগলের প্রতি তাহাদের সদয় হওয়া উচিত। হায়! আমার নিরাশ্রয়তায় কেহই আমার প্রতি সহানুভূতি দেখান না, আমার জন্য দুঃখাশ্রু বর্ষণ করেন না। কিন্তু মনুষ্য যদি আমাকে ভাল না বাসে, তাহাতে ক্ষতি কি? আমি আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি। অপরের সহিত কথাবার্ত্তা কহা অপেক্ষা আমি আপনার সহিত আপনি কথা কহিতে ভালবাসি। কখন কখন আমি আপনার চক্ষুর

নিকট কেবল সুন্দর নহি, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বলিয়া প্রতীয়মান হই। আমার বোধ হয়, সকল পাগলই আপনাকে ভালবাসে, আমিও সে নিয়মের বহির্ভূত নহিঁ। আমার পাগলামীর কারণ এই,. আমি একের মধ্যে দুই দেখি; আমি বেড়াই, আমি একাকী বেড়াই না, আমি এবং 'তুমি' এই দুই জনে বেড়াই। শরীরের মধ্যে আমি থাকি, কিন্তু আমি একাকী থাকি না, আর এক জন আমার সঙ্গে থাকে, আমি এবং 'তুমি' একত্র বাস করি। আমার প্রতি-কার্য্য ও চিন্তায়, প্রতি বল ও উদ্যমে, আমার অধিকৃত প্রত্যেক পয়সা ও সম্পত্তিতে 'মানুষ আমি' ও 'ঈশ্বর আমি' দুই আমিই একত্র সংযুক্ত দেখি। আমার নিকট নির্জ্জনতা অসম্ভব; কারণ সর্ব্বদাই আমরা দুই জন একত্র থাকি। এই অঙ্কশাস্ত্রে আমি নিতান্ত হায়রান্ হইয়া যাই। এই অনির্ব্বচনীয় দ্বিতীয় ব্যক্তি আমি প্রথম ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদাই দুর্ভেদ্য ভাবে একত্রিত হইয়া রহিয়াছেন। এই ব্যক্তি কে? ইনিই সর্ব্বদা আমার জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছেন। ইনি আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি— এই দ্বৈত পুরুষ আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়া রহিয়াছেন। আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি, দুই জন দেখি; ভোজন করিতে যাই, তথায়ও দুই জন। সর্ব্বদাই দুই জন, কখনই একাকী নহি। সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের মতন আমি একাকী হইয়াও সর্ব্বদা 'আমি' স্থলে 'আমাদের' বলিয়া থাকি। দেখিতে এক জন, বাস্তবিক আমরা দুই জন একত্র থাকি। আমার পাগলামী কে আরোগ্য করিতে পারে? অদ্য এই পর্য্যন্ত। ক্রমে আরও বলিব।"

২। পাগল—(১৮০৩ শকের ১লা আষাঢ়ের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)

"উন্মাদনগরে ভূতপ্রেতগ্রস্ত একটি ভবনে আমার বাস। আমিও ভূত-প্রেতগ্রস্ত।- আমার প্রতিবাসিগণ বলেন, উহারা আমার মনের বিভ্রম এবং কল্পনামাত্র; কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে একমত নহি। চারিটি বিষয় অনুধাবন কর। আমি পাগল, পাগলদিগের নগরে আমার বাস, যে গৃহে আমি থাকি, তাহা ভূতপ্রেতগ্রস্ত, এবং কতসংখ্যক ভূত প্রেতে আমি আক্রান্ত, তাহা নির্ণয় করিতে আমি অক্ষম। কি বিষম বিকার! উন্মত্ততার চূড়ান্ত অবস্থা। আমার রোগে আর আশা ভরসা নাই। কিন্তু, হে বাতুল, নিরস্ত

হও, কেন তুমি এ ভাবে কথা কহিতেছ? একাধারে ভূত এবং পাগল হওয়া অত্যন্ত আনন্দের কথা এবং ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। কত লোকে রাজা, নবাব, শাসনকর্ত্তা, সম্রাট্ হইতেছে; কিন্তু, হে পাগল, তুমি সংসারাতীত যে আলোকসম্ভোগে অধিকারী হইয়াছ, তাহা কয় জনে সম্ভোগ করিতেছে? সম্পূর্ণ ঠিক কথা! ইহা বিজ্ঞের কথা এবং সান্ত্বনাদায়ক। যে সকল ভূত এবং প্রেত আমাকে অধিকার করিয়াছে, এবং যাহারা এই গৃহে আমার চতুষ্পার্শ্বে প্রতিনিয়ত সঞ্চরণ করিতেছে, তাহারা সাহসী, উন্নতকায়, সুশ্রী এবং সুসৌষ্ঠব বীর প্রেতযোনি সকল, তাহাদিগকে আমি যথার্থই আমার মনের মত জ্ঞান করি। পৃথিবীতে যে সকল খর্ব্বাকৃতি নীচ ব্যক্তি বাস করে, ইহারা কখনই তাহাদের সদৃশ নহে। আমি ইহাদিগকে দেখিয়া ভয় করি না, কিন্তু ইহাদিগকে ভালবাসি। লোকে বলে, অন্ধকারমধ্যে ভূতেরা নরনারীগণকে ভয়-প্রদর্শন করে, এবং তাহারা সমস্ত মন্দযোনি। কিন্তু আহা, তাহারা অতি সজ্জন, প্রিয় ভূত সকল, মনোহর আত্মা সমস্ত, অতি উপাদেয়। এই সকল ভূতের সেনাপতির নাম ভূতনাথ (Holy Ghost)। তিনি আমাকে কখন পরিত্যাগ করেন না, বলেন যে, তিনি আমাতে অনুরক্ত। তিনি আরও বলেন যে, অনন্ত প্রেম তাঁহাকে প্রতীকারের আশাতীতরূপে এবং চিরকালের নিমিত্ত উন্মাদ করিয়াছে। উন্মাদ এই মধুর কথাটীর প্রতি লক্ষ্য কর। সেই পরমেশ্বর, বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ যিনি, তিনি উন্মাদ; অতি সুন্দর ভাব! ভূতরাজকে আমি ভালবাসি। তিনি আমাকে বশীভূত এবং বিমুগ্ধ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, গৃহ, অর্থ রাখিবার বাক্স, অন্ন, এই সকল কথায় সম্বোধন করি। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় আমি তাঁহাকে মুক্তার হার বলিয়াও ডাকিয়া থাকি। তিনি আমাকে পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছেন, এবং আমার বুদ্ধি, ভাবসকল, আমার শরীর মন, আমার হৃদয় আত্মা সমস্তই তিনি হস্তগত করিয়াছেন। আমার বাসনা যে, তিনি আমাকে ক্রমে ক্রমে আরও অধিকার করিবেন, আরও বেষ্টন করিয়া থাকিবেন এবং আরও আত্মসাৎ করিবেন। তিনি কতই প্রিয় এবং মনোহর। এই ভূতনাথ আমার শরীর এবং গৃহকে প্রেতসৈন্যে সমাবেষ্টিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রিয় মধুর ভূত সকল, কেমন ক্রীড়ারত এবং প্রফুল্ল! তাঁহাদিগকে কি তোমরা

দেখিতে পাইতেছ না? তাঁহারা এখানে ওখানে, সর্ব্বত্র, আমার উপাসনা-ঘরে, বৈঠকখানায়, ভোজনগৃহে, সমস্ত উদ্যানমধ্যে, বৃক্ষচ্ছায়ায়, গোলাপ-কুসুমসকলের মধ্যে লুক্কায়িত, এবং গুল্মসকলের ভিতর হইতে দর্শন দিতেছেন। ভূত, ভূত, সর্ব্বত্র ভূত। এব্রাহিম, মুষা, ঈশা, কন্‌ফিউসস, আর্য্য ঋষিগণ, বৌদ্ধ পুরোহিতগণ সকলে আমার ভিতরে। ইহারা আমার আত্মার বন্ধু এবং সঙ্গী। লক্ষ টাকা, লক্ষ কেন, কোটি টাকার বিনিময়েও আমি এই সকল প্রিয় আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। না, কখনই পারিব না।"

৩। পাগল—(১৮০৩ শকের ১লা শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)

"উঃ! কি কোলাহলময় এই পৃথিবী! এখন রজনী দ্বিপ্রহর, বাজার বন্ধ, নরনারী শিশু সকলেই নিদ্রাগত। তথাপি কোলাহল কর্ণকে বধির করিতেছে। বিদ্যালয়ের প্রাচীন শিক্ষকের ন্যায় সকলকেই 'চুপ চুপ' করিতেছি, কিন্তু কেহই অবধান করে না। দিবারাত্রি তাহারা ডাকিতেছে, উচ্চধ্বনি করিতেছে, কলরব করিতেছে, সঙ্গীত ও গাথা উচ্চারণ করিতেছে। সর্ব্বদিকে গোলমাল, কলকল ধ্বনি, এবং চীৎকার। আমি আশ্চর্য্য হই, এই শব্দময় পৃথিবীতে অপরাপর লোকে কিরূপে জীবিত থাকে। এমন কি হইতে পারে যে, এই ভীষণ উচ্চরব তাহারা শুনিতে পায় না? হয়তো তাহারা শুনিতে পায় না। যদি শুনিত, তাহারা বাঁচিত না। আমার স্মরণ হইতেছে, আমি কাহাকে কাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'এ স্থান কি নিস্তব্ধ, একটি মূষিকও গতিবিধি করিতেছে না।' তাঁহাদের কথার তাৎপর্য্য কি, আমি বুঝিতে সক্ষম নহি। আমি অতি প্রশান্ত নির্জ্জন স্থানে গিয়াছি, কিন্তু তাহা ঘোর কোলাহলময় বাজারতুল্য। আমি পর্ব্বত এবং উপত্যকা মধ্যে গিয়াছি, সেখানে পর্য্যন্ত কলকলধ্বনি আমার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে। এই বৃক্ষ সকল কি অনেক কথা কহিতেছে না? আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ কি বহুভাষী নহে? হে পৃথিবীর ভদ্রলোক সকল, যদি তাহারা তোমা-দিগের নিকট কথা না কহে, তোমরা সৌভাগ্যবান্। তোমরা মনে কর, রাত্রিতে সকলই নিস্তব্ধ! বেশ সুখের ভ্রান্তি! আমার ইচ্ছা হয়, আমিও তোমাদের মত কল্পনা করি; কিন্তু আমি সেরূপ করিতে অক্ষম। আমার কর্ণদ্বয় পাগলের কর্ণ। মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি আমি গ্রাহ্য করি না, কারণ তাহা সহজেই নিস্তব্ধ করা যায়। রাত্রি তাহা এককালেই শান্ত করিয়া দিবে, অথবা যেখানে

তাহা নাই, আমি সেই স্থানে আপনাকে লুক্কায়িত করিতে পারি। কিন্তু যে সকল পদার্থের রসনা নাই, তাহাদিগের নিরন্তর ধ্বনি আমাকে আমোদিত করে, হতবুদ্ধি করে, এবং সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে আমার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এই জড় জগৎ একটি বাক্যকথনের যন্ত্রস্বরূপ, আমি দিবারাত্রি ইহার অনুকম্পার অধীন। ইহা বকিতেছে, বকিতেছে, ইহার বকুনীর বিরাম নাই। মস্তকোপরি আকাশ হিব্রু ভাষা কহে, পর্ব্বত সকল সংস্কৃত ভাষা কহে, সমুদ্র এবং মহাসাগর ইংরাজী ভাষা কহে, পবন ফরাসী ভাষা কহে, পক্ষিগণ পারস্য ভাষা কহে, প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল জার্ম্মাণ ভাষা কহে, তৃণ এবং পুষ্প সকল বাঙ্গালা ভাষা কহে। কত প্রকারই মূল ভাষা ও প্রাকৃত ভাষা। কত রকমেরই শব্দ। কেহ উচ্চ, কেহ অনুচ্চ স্বর, কেহ প্রভুর আদেশের ন্যায় গভীর স্বর, কেহ মিষ্ট এবং স্থললিত স্বর। বিশ্ব সত্য সত্যই একটী ভাষার বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহা সংগীতের একটি বৃহৎ আর্গিণযন্ত্র, তন্মধ্যে পার্থিব এবং স্বর্গীয় সকল প্রকার সুর নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমাকে কি বলিতেছে? এই অনন্ত কথা কি বিষয়ে হইতেছে? অবধান কর। উপরে দৃষ্টি করিবা মাত্র কোটী কোটী নক্ষত্র আমার নেত্রগোচর হইতেছে। তাহারা নিরন্তর অনন্তস্বরূপের মহিমা ও গুণগান করিতেছে। এদিকে একটি পক্ষী, অপর দিকে আর একটি পক্ষী উড়িয়া যাইতেছে, আর বলিতেছে, হে দেহধারী জীব সকল, ধরাতল পরিত্যাগ কর এবং স্বর্গে উড্ডীয়মান হও। মহাসাগর বলিতেছে, ঈশ্বরের কার্য্যপ্রণালীর তত্ত্ব অতি গভীর এবং দুরবগাহ্য। সরীসৃপেরা বলিতেছে, হে মনুষ্য, পৃথিবীতে বক্ষ দিয়া আমরা ভ্রমণ করিয়া থাকি, তুমি কখনই আমাদের ন্যায় নীচ হইও না। যদি আমি হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ ধারণ করি, সকল ফুলগুলি সমস্বরে নারীর কোমলকণ্ঠে বলে, হে পৃথিবীর মনুষ্যগণ, আমাদের মতন কোমল হও, তোমাদের কঠিন হৃদয়কে সুকোমল কর। বায়ু প্রবলবেগে প্রবহমাণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমার পাপসকলকে তিরস্কার করিয়া বলে, রে নাস্তিক, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের প্রবল বায়ু তোর অবিশ্বাসকে দূর করুক। বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রত্যেক বারিবিন্দু কথা কহিতেছে এবং উপদেশ দিতেছে, রে পাপিষ্ঠ, ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে তোর পাপ ধৌত কর্। আমার সমস্ত শরীর কথা কহিতেছে মাংস, অস্থি, মস্তকের সহস্র কেশ, সকলেই বলিতেছে, জীবনের জীবনকে

স্মরণ কর্। এইরূপে আমি অগণ্য স্বর এবং ধ্বনির মধ্যে বাস করিতেছি; কেহ আমাকে তিরস্কার করিতেছে, কেহ ভর্ৎসনা করিতেছে, কেহ আদেশ করিতেছে, কেহ উপদেশ দিতেছে। অযুত অগণ্য স্বরের কোলাহল আমার পক্ষে অসহনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা চৈতন্যদায়ক এবং পুণ্যপ্রদ ; আরো ইহা আমার আত্মাকে একবারে নিমগ্ন করিয়াছে। আমি এই স্বরপূর্ণ জগতে বাস করি, এই সকল ধ্বনি এবং শব্দেতে আমি অভ্যস্ত হইয়াছি ; আমি কখন কখন আনন্দও অনুভব করি। প্রত্যেক স্থানে শব্দ শুনিতে কি আনন্দ! সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের শব্দ, তুমি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছ। হে বহুভাষী পরমাত্মা, তুমি কথার উপরে কথা কও। হে বজ্রতুল্য স্বর, তুমি উপদেশের উপর উপদেশ প্রদান কর। আমি আমার সমস্ত দেহকে কর্ণস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছি। আমার পুস্তকের প্রয়োজন নাই। প্রকৃতিমধ্যে আমি যথেষ্ট উপদেশ পাই। পুস্তকের জ্ঞান! তাহাতে কি উপকার হইবে?"

৪। পাগল—(১৮০৩ শকের ১লা ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)

"আমার বোধ হয়, আমি প্রচণ্ড রকমের পাগলশ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর পাগল আছে, তাহারা ধীর, শান্ত ও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিরোধী। তাহাদিগকে রাগাইলে ও মারিলে তাহারা মেষের ন্যায় ধীর থাকে, তাহারা কেবল আপনাপনি বিড় বিড় করে এবং অপরের কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর পাগল আছে, তাহারা প্রচণ্ডস্বভাবের ও পরের অনিষ্টকারী। যে কেহ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহারা তাহাদিগকে নিশ্চয়ই বিরক্ত করিবে, গালি দিবে এবং তাহাদের অনিষ্ট করিবে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই তাহারা প্রহার করে, তাহার প্রতি লোষ্ট্রনিক্ষেপ করে, মুষ্ট্যাঘাত করে অথবা কঠিন রকমে প্রহার করে। যদি কেহ তাহাদিগকে একটু অধিক বিরক্ত করে, সে তাহার প্রাণপর্য্যন্ত সংহার করে। অনেক পাগল ভ্রাতাকে আমি জানি, তাহারা দুর্জ্জয় ক্রোধ-পরবশ হইয়া নরহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আমি এক জন এই শ্রেণীর পাগল। আমার বাসগৃহ অনুসন্ধান করিলে, তথায় অনেকগুলি তীক্ষ্ণ অস্ত্র, শক্ত ও ভারি ভারি প্রস্তর এবং আমার বিরাগ-ভাজনদিগকে মারিবার তীক্ষ্ণ তীর, এই সকল দেখিতে পাইবে। যে সমস্ত লোক আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে, তাহারা আমার পাগলামী দেখিয়া

অত্যন্ত বিরক্ত হয়, এবং আমি সর্ব্বদাই বাক্যের দ্বারা, ভাব ভঙ্গির দ্বারা এবং কার্য্যের দ্বারা লোকদিগকে বিরক্ত করিতে চেষ্টা করি। আমি এমন পরের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকি যে, আমি তাহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদাই নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করি। তাহারা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া প্রত্যক্ষ ভাবে আমার নিকটবর্ত্তী হয় এবং আমার প্রতিবাদ করিয়া আমার অশেষ ভর্ৎসনা করে। আমি তাহাদের মূর্খতা দেখিয়া হাস্য করি, তাহারা আমার প্রতি মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হয় এবং আমার বিরক্তিজনক ও রীতিবহির্ভূত অনিষ্টকর কাজের জন্য আমাকে অশ্লীলরূপে গালাগালী দিয়া আমাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। এখন আমার পালা পড়িয়াছে। আমি কি এরূপ অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিতে পারি? আমি ঐ সমস্ত মনুষ্যের নিকট এক পয়সার জন্যও ঋণী নহি, তবে কেন তাহারা আমাকে বিরক্ত করিবে? আমার রীতিবহির্ভূত কার্য্য ও ক্রীড়া সকল যদি তাহাদের ভাল বোধ না হয়, তাহারা চলিয়া যাক্; আমার কার্য্যসকল তাহাদের কোন ক্ষতি করে না। কেন তাহারা আমাকে গালি দেয় এবং আমার প্রতি অত্যাচার করে? যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, কেন আমি পাগলামীর দ্বারা তাহাদিগকে বিরক্ত করি? আমি এই উত্তর করি, 'আমার স্বভাব এইরূপ, ইহা আমার পাগলামী'; কিন্তু তাহারা তো পাগল নহে, তবে কেন তাহারা আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবে? এখন আমি প্রতিহিংসা করিব। আমার শত্রু এক জন বা দুই জন নহে, আমার সহস্র জন শত্রুকে শিক্ষা দান করিব। আমি এখন প্রস্তুত। সহিষ্ণুতারূপ পর্ব্বত হইতে একখানি প্রায় দশ সের ওজনের প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া আমি আমার শত্রুর মস্তকে এই প্রহার করি, ঐ দেখ, সে ভূমিশায়ী হইয়াছে, কেহ কেহ দৌড়িয়া পলাইতেছে, অন্যান্য ব্যক্তিরা আমার জয়লাভ দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আমি ঐ লোক সাধারণের প্রতি সস্নেহবাক্যরূপ তীক্ষ্ণ শরসকল উচ্ছ্বসিত অন্তরে বর্ষণ করি এবং তুষের ন্যায় তাহাদিগকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দি। অন্যান্য যে ব্যক্তিরা অগ্রসর হয়, ক্ষমারূপ জলপূর্ণ প্রকাণ্ড পাত্র সেই হতভাগ্যদের মস্তকের উপর ঢালিয়া দি। যত আমার উৎসাহবৃদ্ধি হয়, প্রার্থনারূপ জলন্ত অঙ্গার লইয়া রাজপথে দৌড়িয়া বেড়াই এবং যাহাকে দেখিতে পাই, তাহারই অঙ্গে

তাহা সংলগ্ন করিয়া দি। তথাপি তাহারা আমাকে যদি গালি দিতেছে ও গোল করিতেছে দেখিতে পাই, আমি তৎক্ষণাৎ সুদীর্ঘ নিস্তব্ধতারূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহাদিগকে বিদ্ধ করি। এইরূপ আঘাতে তাহাদের অঙ্গে মারাত্মক ও কষ্টকর ক্ষত হয়। এইরূপে আমি আমার সংখ্যাতীত শত্রুদিগকে একে একে পরাস্ত করি, আবার উচ্ছ্বসিত অন্তরে আনন্দচিত্তে সজোরে নৃত্য করিয়া তাহাদের দুঃখের উপর অপমান আনিয়া দি। আমি এখন মরিয়া হই। আমার ক্রোধ এই সময়ে চরম সীমায় উপনীত হয়। আমি ক্ষমারূপ তরবারি লইয়া চারি দিকে চালনা করি এবং আমার শত্রুদের বক্ষঃস্থলে নিমগ্ন করিয়া দি। অমনি রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া উঠে। দুষ্ট শত্রুরা, কেমন উপযুক্ত প্রতিফল পাইলে! সত্য, ক্ষমা, উদারতা এবং প্রার্থনাই প্রহার করিবার উৎকৃষ্ট অস্ত্র। আমি নিশ্চয় জানি, তাহারা না হইলে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ পৃথিবীতে বাঁচিতে পারি না।”

৫। পাগল—(১৮০৩ শকের ১লা ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)

“নীচের দিক্ উপরে এবং উপরের দিক্ নীচে করা, লোকে যাহাকে উল্‌টা পাল্‌টা করা বলে, তাহাই আমার নিজ সম্বন্ধে ও সাধারণসম্বন্ধে সকল কার্য্যের রীতি। প্রচলিত রীতি ও সকল দেশের ব্যবহারের উল্টা কার্য্য করা পাগলের লক্ষণ। আমার বক্তব্য সকল কথা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। আমার পাগলামী সকল লোকের বোধগম্য হয় কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। আমি নিজেই আমার অভিসন্ধি, যুক্তি, তত্ত্ব এবং তর্ক বুঝিয়া উঠিতে পারি না; অন্যেরা কি প্রকারে সে সমস্ত বুঝিতে পারিবে? আমি আমারই নিকট একটী বিষম সমস্যা, অন্যের নিকট তো দুর্ভেদ্য সমস্যা। আমি যখন কোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাই, আমার কার্য্য ঠিক—জানিতে পারিলেই তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু তাহার উপায় ও প্রণালীসম্বন্ধে কে ভাবনা করে? অন্যেরা তদ্বিষয় চিন্তা করুক, গণনা করুক, আমি তাহা করিতে পারি না, করিবও না। যাহা ঠিক, আমি তাহাকেই কর্ত্তব্যকার্য্য বলি, তাহা করিতেই হইবে। তাহার উপায় কোথা হইতে আসিবে, একথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি কেন ঈশ্বরাবমাননা করিব? অমুক বস্তু ক্রয় করিতে হইবে, এ

প্রশ্নের এক বার মীমাংসা হইলেই, আমি তাহা ক্রয় করিবই করিব। আমার পিতার কি অভিপ্রায় যে, আমি ঐ বস্তু গ্রহণ করিব ? এই প্রশ্নে এক বার তাঁহার সায় পাইলে, আমি তাহা ক্রয় করিবই করিব, আমার নিকট এক পয়সা না থাকিলেও ক্ষতি নাই। আমার জন্য একটি বাসগৃহ, অথবা ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দির ক্রয় করা কর্ত্তব্য হইলে, তাহার জন্য অর্থ না থাকিলেও, তাহা ক্রয় করিতেই হইবে। সংসারের লোকদের মতন যদি আমি ইতস্ততঃ করিয়া হিসাব করি, তাহা হইলে আমি পাগল নহি। আমি সংসারে কিরূপে চলিব ? আমার ধন নাই, আমার সামান্য গৃহস্থদের মতনও আয় নাই। আমার যে অতি অল্প আয় আছে, তাহা অপেক্ষা আমার ব্যয় অনেক অধিক। এখন আমার কি কর্ত্তব্য ? এখন হয় ব্যয়বৃদ্ধি, নতুবা আয় কমাইতে হইবে। কিন্তু যদি আমি এ সমস্ত বিষয় লইয়া অনেক চিন্তা করি, আমার যাহা কিছু আয় আছে, প্রভু তাহাও কাড়িয়া লইবেন। পাগলামীর গূঢ় মর্ম্ম স্বর্গীয়, স্বয়ং ঈশ্বরই এই মর্ম্মে কার্য্য করিয়া থাকেন। যখনই অন্নবস্ত্রের জন্য অতি অল্পমাত্র ভাবনা হয়, অমনি পাগলচূড়ামণি ঈশ্বর, আমার যাহা কিছু আছে, তাহাও কাড়িয়া লন। প্রভু যেরূপ, দাসও ঠিক সেইরূপ; যেমন রাজা, তেমনি প্রজা। যদি আমায় নিতান্তই চিন্তিত হইতে হয়, আমি অতি সামান্য সামান্য বিষয়েরই জন্য চিন্তা করিয়া থাকি। বড় বড় বিষয়ের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা এবং উদ্যমের আবশ্যক করে না। সন্তানদের বিবাহ দিতে হইলে, প্রথমেই দিন স্থির কর এবং খরচের ফর্দ্দ করিয়া ফেল; টাকা, বরপাত্র এবং বিবাহের স্থান এ সমস্ত বিষয় অনিশ্চিত থাকিল, তাহাতেই বা কি ? তৎসম্বন্ধে সকল ছোট ছোট বিষয় স্থির করিয়া ফেল, আসল আসল বিষয় অস্থির রহিল, তাহাতে ক্ষতি নাই। অনিশ্চয়তারূপ ভিত্তিভূমির উপর সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেল, তাহা হইলেই প্রকৃত বিজ্ঞতার ফল সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে। যদি তোমাদের কোন গুরুতর এবং প্রকাণ্ড সভায় বক্তৃতা করিতে হয়, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার জন্য প্রস্তুত হইও না। যেমন বক্তৃতা করিবে, অমনি চিন্তা করিতে থাক,-অথবা বক্তৃতা শেষ করিয়া চিন্তা করিতে বসিও। দেবোত্তেজনাই প্রকৃত জ্ঞান, বক্তৃতা করিবার সময় যেরূপ মনের ভাব হইবে, ঠিক তাহাই বলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাক্‌পটুতা।"

১। যোগী—(১৮০৩ শকের ১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)

"নববিধানের পাঠকগণকে আমি সাদর সম্ভাষণ করি। পাগল যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তদনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি, এবং আমি আমার জীবনে যে সকল সত্য অবগত হইয়াছি, তাহাও পৃথিবীকে বিদিত করি, এই আমার প্রস্তাব। আমি ঋষি নহি, মুনি নহি, পরিব্রাজক নহি, সন্ন্যাসীও নহি, আমি গৃহত্যাগীও নহি। বহুলোকাকীর্ণ নগরমধ্যে আমার নিবাস। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবে আমি পরিবেষ্টিত। তথাপি তন্মধ্যে থাকিয়াও নিজের ভাবানুসারে আমি যোগীর ব্যবসায় সম্পাদন করি। নিঃশ্বাস, মূর্চ্ছা, আলোকদর্শন, দীর্ঘ নিদ্রায় আমার বিশ্বাস নাই ; গুপ্ত মন্ত্র তন্ত্র আমি সাধন করি না। আমার যোগ সামান্য এবং তাহাতে আড়ম্বর নাই। তথাপি তাহাতে আমি উপকৃত হই এবং আনন্দলাভও করি। আমার নিকটে যোগীর জীবন যেমন ভয়ানক সত্য, তেমনি অতীব মধুর। আমি ঈশ্বরের সম্মুখে বসি এবং অনন্তকে প্রত্যক্ষ করি, আর মৃদু হাস্য করি ও মহাসুখে সুখী হই। এই আমার যোগ ; আমি এতদপেক্ষা অধিক প্রয়াস করি না। আমি কোন চেষ্টা করি না। চিত্তসংযমের জন্য বাহ্যিক কষ্টসাধ্য কৃত্রিম প্রক্রিয়া সকল আমি অবলম্বন করি না। আমার উপবেশন অতি সহজ, এবং আমি মনকেও সহজ ভাবে রক্ষা করি। কোন কল্পনা নাই, মিথ্যা রচনা নাই, কোন উপদেবতা কিংবা অদ্ভুত স্বর্গের উদ্ভাবনে আমার চেষ্টা নাই। ধ্যান করিতে বসিবার পূর্ব্বে আমি মন হইতে দূষিত ও প্রবঞ্চনাপরায়ণ কল্পনাকে বিদূরিত করিতে যত্ন করি। আমি কোন পার্থিব গুরু কিংবা কোন পুস্তকের উপদেশের অনুবর্ত্তন করি না। আমি আপনাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় নিক্ষেপ করি, এবং অতি সহজ ও সরল ভাবে যোগারম্ভ করি। অন্তরে ঈশ্বরধারণা, ইহাই আমার সমুদায় যোগশাস্ত্র, এবং ইহাতেই আমি প্রচুর আনন্দ উপলব্ধি করি। আমি উপবেশন করি, আমি ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা হৃদয়ঙ্গম করি, আর আমি মৃদু হাস্য করি। সমস্ত ব্যাপার শেষ হইতে দুই মিনিট লাগে, সুতরাং ইহা অপেক্ষা সহজ এবং লঘুতর আর কিছু হইতে পারে না। সমুদায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব ঈশ্বর-দর্শন অথবা ঈশ্বরের বর্ত্তমানতার এ প্রকার উজ্জ্বল এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যে, বোধ হইবে, আমি ঈশ্বরমুখ যথার্থই দর্শন করিতেছি। যখন যোগ এইরূপে

সম্পন্ন হয়, তখন ইহা নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ ও সরল হয়। এই প্রকার যোগ লোকে পথভ্রমণকালীন অথবা কার্য্যের মহাব্যস্ততামধ্যে সাধন করিতে পারে। যদি আমি ঈশ্বরের বর্ত্তমানতাকে ডাকিয়া আনিতে যাই, যদি আমি আমার চক্ষু ঘর্ষণ, সংকোচ অথবা বক্রভাবে রক্ষা করিতে যাই, অথবা যদি আমি বারংবার স্থানপরিবর্ত্তন করি, তাহা হইলে আমি যেন লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হই, এবং যেন অন্ধের ন্যায় হস্ত বাড়াইতে ও বৃথা চেষ্টা করিতে থাকি। আমি আমার প্রিয় ঈশ্বরকে সহজে, যুগপৎ, পরিষ্কাররূপে, উজ্জ্বলরূপে, এবং সানন্দে দর্শন করিব। দর্শন করিবার জন্য আবার চেষ্টা? ইহা হইতে পারে না, ইহা অস্বাভাবিক। কেহ দর্শন করিতে চাহিলে, একেবারে এককালে দর্শন করিবে, নতুবা সে কল্পনা করিবে মাত্র। প্রকৃত যোগ এইরূপ—'হে আমার ঈশ্বর, তুমি এইখানে, আমি তোমার অনন্ত আনন্দে নিমজ্জমান হই।' এমন সত্য, এমন সুমধুর, এমন সহজ আমার যোগ। যদ্যপি তোমার ইচ্ছা হয়, তুমিও ইহার অধিকারী হইতে পার।"

২। যোগী

"আমার যোগের প্রণালীতে সূক্ষ্ম ন্যায়ের প্রণালী বা শারীরিক কৃচ্ছ্র-তপশ্চরণ ও কঠোর অনুতাপপ্রণোদিত শরীরশোষণাদিব্যাপার স্থান পায় না। আমি বসি, আর যোগ করি। যদি না পারি, তবে তখনি সিদ্ধান্ত করি, প্রকৃতিস্থ অবস্থা হারাইয়াছি; সুতরাং যে দিন আমি সমধিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকিব, আপনাতে আপনি আছি বুঝিতে পারিব, সেই দিন ঈশ্বরের সহিত যোগান্বেষণ করিব। আমাদের চক্ষু মুদ্রিত রাখিয়া, সূর্য্যের আলোক দেখিবার জন্য, বহু পরিশ্রমে দূর দেশে গমনও যেমন বিফল, নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া বা বহু চিন্তা ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর দর্শন করিবার যত্নও তেমনি বিফল। চক্ষু খোল এবং তখন তখনি দেখ। যদি না পার, চক্ষু রোগগ্রস্ত, অন্ধকারাবৃত হইয়াছে। প্রকৃতিস্থ চক্ষু সুস্পষ্ট, তখন তখনি ঈশ্বরদর্শন করে। যদি সংশয়ে চক্ষুকে সমধিক মলিন করিয়া থাক, চক্ষু দেখিতে পাইবে না। মালিন্য অপসারিত কর, তুমি পরিষ্কার দেখিতে পাইবে। আমি কি দেখি? আলোকও নয়, অন্ধকারও নয়, ক্ষুদ্রও নয়, বৃহৎও নয়, বাহ্য পদার্থও নয়, মানুষও নয়; কিন্তু এক ব্যক্তি, অধ্যাত্ম বিদ্যমানতা, এমন কিছু, যা কথায় ব্যক্ত করা যায়

না। এ বস্তু অতি সুকুমার, রুক্ষ হাতের স্পর্শ সহিতে পারে না। অভিমানমলিন হস্তে স্পর্শ কর, তখনই ইহা আকাশে মিলিয়া যাইবে। বল, 'এই তো এখানে, আমি জ্ঞানী, তাই তো দেখিতেছি'; বলিতে বলিতে দেখ, বস্তু অন্তর্হিত হইল। বিদ্যাসম্পন্ন দার্শনিকের দৃষ্টিতে কতক ক্ষণ ধরিয়া দেখ, দৃষ্টিবিভ্রান্তির ন্যায় ইহা সূক্ষ্ম আকাশে মিলাইয়া যাইবে এবং বহু সপ্তাহ, এমন কি বহু বৎসরের জন্য অদৃশ্য থাকিবে। অভিমানে স্পর্শ করিও না, তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিও না। বিনা প্রযত্নে, বিনম্র ও নৈসর্গিক ভাবে উহাকে দেখ, তোমার সম্মুখে যত ক্ষণ ইচ্ছা, পরম প্রভুকে দেখিতে পাইবে। কখন মনে করিও না, তোমার ধ্যানের বলে সর্ব্বশক্তিমান্‌কে সম্মুখে আনিয়াছ। বরং এই মনে কর যে, তুমি কেবল তোমার ক্ষীণ স্মৃতিকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া লইয়াছ, তোমার মলিন চক্ষুকে নির্ম্মল করিয়াছ, এবং মূর্খতাবশতঃ যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলে, তাই আবার স্মৃতি-পথে আনিয়াছ। আমার যোগেতে এই মাত্র আমায় করিতে হয়। আমার আত্মাকে আমি কেবল বলি, ভুলিও না, অন্ধ হইও না, উপেক্ষা করিও না। কারণ ঈশ্বর পরম সত্য, তিনি আমাদিগকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা আমার সম্মুখে, আমি কেবল মোহ ও অনবধানবশতঃ তাঁহাকে দেখিব না। অবিদ্যমান ঈশ্বরকে আমি যোগ দ্বারা বিদ্যমান করিয়া লই না। এইতো অহঙ্কারবিনাশের পথ। 'বিস্মৃত না হওয়া' 'চক্ষু অন্য বস্তুর দিকে না ফেরান' কেবল এই করিলেই যোগী নিত্যবিদ্যমান ঈশ্বরকে দেখেন। অবিদ্যমান দেবতাকে ভাবিও না, কিন্তু যে বিদ্যমানতাকে না দেখিয়া থাকা যাইতে পারে না, সহজভাবে তাঁহাকেই অবলোকন কর।"

খ্রীষ্টশিষ্যগণের প্রতি প্রীতি

'নববিধান' পত্রিকায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মের যেরূপ নব নব ব্যাখ্যা প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহাতে খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের নববিধানের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। নববিধানবিশ্বাসিগণের সহিত তাঁহাদের দিন দিন কি প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ (১৮০৩ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের) ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে আমরা নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"গত ২৩শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক (৪ঠা মে, ১৮৮১ খৃঃ), বুধবার রাত্রিতে, অক্সফোর্ড মিশনের সাহেবগণ এবং ফাদার ওনীল নামে ইন্দোরের এক পাদরী

সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তিনি সে দিবস স্থানান্তরে থাকাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সে দিনকার ভোজনটী সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর মত হইয়াছিল। এক খানি লম্বা কার্পেট বিস্তারিত হয়। সম্মুখে অখণ্ড কদলীপত্র, তদুপরি অন্ন ব্যঞ্জন এবং পার্শ্বে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ খুরিতে ব্যঞ্জন, নানা প্রকার ফল মূলাদি ও মিষ্টান্ন। সাহেবেরা জুতা পরিত্যাগ করিয়া কার্পেটের উপর বসিলেন। এ প্রকার আসন-গ্রহণে তাঁহাদের অভ্যাস না থাকাতে, কাহাকেও কাহাকেও শিক্ষা নিতে একটু বিলম্ব হইল। কাঁটা চামচ ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া হস্ত দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মুখে হস্ত দিয়া অন্ন তুলিতে জানেন না, সুতরাং অনেক অন্নই স্খলিত হইয়া মুখের ভিতর প্রতিবার অতি অল্প অন্নই যাইতে লাগিল। আচার্য্য মহাশয় ইঁহাদের সঙ্গে খাইতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা কিছু কিছু শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কেমন করিয়া সহজে হাত দিয়া মুখে অন্ন তুলিতে হয়, সে বিষয়ে কতক শিক্ষা দেওয়াও হইল। এইরূপে ইঁহারা সাহেব হইয়াও, অন্ন, পরেটা, পোলাও, দধি, মালাই প্রভৃতি উৎসাহপূর্ব্বক আনন্দিতমনে আহার করিলেন। আমিষ অথবা মাংস কিছুই পরিবেশন হয় নাই। পানীয়ের মধ্যে গ্ল্যাসে বরফমিশ্রিত শীতল জল ছিল। আহারান্তে সাহেবদের গলদেশে ফুলের মালা পরান হইল। শেষে সঙ্গীতপ্রচারক এবং কতিপয় বালক তাঁহাদের মধুর বাদ্য ও সঙ্গীতে সকলের চিত্তহরণ করিলেন। দুঃখের বিষয়, অধুনা আমাদের দেশের অনেক বাবু সাহেবগণের বেশ ভূষা ও আচার ব্যবহার গ্রহণেই ব্যস্ত; আমাদের সরল, সহজ, স্বাভাবিক এবং এদেশের উপযোগী পরিচ্ছদ ও আচারব্যবহারে যে বড় বড় বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক সাহেব সকল অনেক সময়ে সন্তুষ্ট, তাহা তাঁহারা জানেন না। অপিচ যেখানে প্রেম ও ধর্ম্মের রাজত্ব, সেখানে জাতিবিচার চিরকালই ভঙ্গ হইয়াছে। ঈশ্বরের নামে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল জাতি যখন একত্র প্রেমভোজনে প্রবৃত্ত হইবে, তখন অত্যন্ত সুখের দিন উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। আর প্রেমের অনুরোধে এক জন আর এক জনকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারে এবং দুই জনের তাহাতে মহানন্দই বৃদ্ধি হয়। সাহেবেরা যে বিষম কষ্ট অনুভব করিয়াও

বাঙ্গালীর ন্যায় আসনগ্রহণে এবং তাঁহাদের হস্ত দ্বারা মুখে অন্ন তুলিতে আনন্দ প্রকাশ করেন, ইহা কেবল প্রেমের অনুরোধে। যদি প্রকৃত প্রেমবন্ধন হয়, তবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই যে আপন আপন জাতির বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া, অনায়াসে এক হইয়া যাইতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঈশ্বর সকল জাতিকে প্রেমে ও ধর্ম্মে এক করুন!"

অপরিজ্ঞেয়বাদের তত্ত্ব

অপরিজ্ঞেয়বাদের সারতত্ত্ব কেশবচন্দ্র কি প্রকার ভক্তিপথে নিয়োগ করিয়াছেন, 'নববিধান' পত্রিকায় নিবদ্ধ এই প্রার্থনাটী (১৮০৩ শকের ১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ দ্রষ্টব্য) তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ করে:—"হে চিদ্রূপী রহস্য, আমি অনেক সময়ে এই বলিয়া আমাকে প্রশংসা করি যে, আমি তোমাকে জানি, এবং তোমার প্রকৃতি বুঝি। কিন্তু আমি তোমায় জানি না। তুমি বোধাতীত। এইমাত্র জানি যে, তুমি অদ্ভুত, অতীব অদ্ভুত। তুমি অদ্ভুত কোন কিছু। কোথায়, কিরূপে, কি হেতু, এসকল আমি তোমাতে নিয়োগ করিতে সাহস করি না। দেশবৎ অনন্ত, তোমার সিংহাসনসন্নিধানে আমি কম্পিতকলেবর হই। তোমার প্রতাপ ও মহিমার সম্মুখে আমার মস্তক অবনত। অহো ভীষণ মহান্, আমি কে যে তোমার নিকটে কথা বলিব, তোমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপে প্রবৃত্ত হইব? নীচ আমি, ভূমিতে অবলুণ্ঠিত ক্ষুদ্র কীট বৈ আমি আর কি? তোমার নিকটে প্রার্থনা, তোমার আরাধনা, তোমার উরুবিক্রমনাম ওষ্ঠাধরে গ্রহণ করিতে আমি কিরূপে সাহস করিতে পারি। আমার মূর্খতা অনেক, আমার পাপ তদপেক্ষা অধিক। এজন্য আমি ধূলিতে অবনত হইয়াছি। যত আমি তোমার বিষয়ে চিন্তা করি, তত আমার আত্মা তোমার সম্মুখে কম্পিত হয়, শিহরিয়া উঠে। তোমায় যাই চিন্তা করি, তোমার ভূমত্বে আত্মহারা হইয়া যাই। লোকে তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, তোমার করুণা ও তোমার পবিত্রতার কথা বলে। এ সকল গুণের অর্থ কি? এগুলি কেবল কথা। এ সকল কথার অর্থ কে জানে? অনন্ত ভিন্ন অনন্তকে কে জানে? তাঁহার প্রকৃতি কেবল তিনিই জানেন। আমি তোমায় কি প্রকারে জানিব? আমার মতন ক্ষুদ্র জীব তোমার উচ্চতা গভীরতার কি প্রকারে পরিমাণ করিবে? আমার ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে কি

অনন্তকে পূরিতে পারি ? শোচনীয় ভ্রান্তি! অথচ, অহো অদ্ভুত বিদ্যমানতা, যাই কেন তুমি হও না, আমি তোমাকে ভালবাসি। সৌন্দর্য্যের মত কিছু দিয়া আমাদিগের অনুরাগ লাভ করিবার, আমাদিগের হৃদয়কে আসক্ত করিবার তোমার ক্ষমতা আছে। কিন্তু চৈতন্য, সৌন্দর্য্য কি, আমি বুঝি না। দেব-সৌন্দর্য্য বলিয়া আমি তোমার কি প্রকারে বর্ণনা করিব ? বর্ণনা করিলে এই বুঝাইবে যে, আমি শুদ্ধ তোমার সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছি, তাহা নহে, ইহার মাধুর্য্যও আমি আস্বাদন করিয়াছি। অহো মহান্ সর্ব্বোচ্চ, বিনা প্রমাণে আমায় কিছু নির্দ্ধারণ করিতে দিও না, জ্ঞান বা ঐশ্বরিক প্রেমের বিষয়ে আমায় অভিমান করিতে দিও না। যদি আমি তোমায় নাই জানিলাম, তোমায় আমি কেমন করিয়া ভালবাসিতে পারি ? মহান্ চৈতন্য, আমি তোমার সৌন্দর্য্যের কথা বলিতে যদি অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকি, তবে আমায় ক্ষমা কর। হে অদৃশ্য, যা হউক, একথা কিন্তু আমি অবশ্য বলিব যে, আমার হৃদয় তোমার দিকে টানে এবং তোমার বক্ষে আরাম লাভ করিতে অভিলাষ করে। 'বক্ষ' এ কথাটী ক্ষমা কর। তবু উহা ঐরূপই। তুমি মহান্, কিন্তু তুমি প্রেমাস্পদ। আমি তোমার প্রেমে, তোমার শান্তিতে, তোমার আনন্দে, তোমার সুখে আত্মহারা হই। কিন্তু এ সকলও আবার কথা। আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। আমায় কথা ব্যবহার করিতেই হয়, যে কথা, যাহা তাত্ত্বিক, তাহার নিকটেও যাইতে পারে না। আমি আবার বলি, আমি তোমাকে ভালবাসি এবং তোমাতে এত অনুরক্ত যে, আমার ইচ্ছা হয় যে, সর্ব্বদা তোমার চিত্তহর সংসর্গে বাস করি। মহান্ আরাধ্য অপরিজ্ঞেয়, আমি তোমাকে মহীয়ান্ করি। কিন্তু কে তোমায় মহীয়ান্ করিতে পারে ?"

ক্ষমার শাস্ত্র

শত্রুতা ও ক্ষমার কথোপকথনচ্ছলে নববিধানের ক্ষমার শাস্ত্র 'নববিধান' পত্রিকায় এইরূপে প্রচারিত হয় (১৮০৩ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ দ্রষ্টব্য) :—

"শত্রুতা। যদি কেহ আমার দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করে ?

ক্ষমা। তাহাকে অপর গণ্ড ফিরাইয়া দেও।

শ। যদি কেহ আমার বিরুদ্ধে বলে এবং লেখে ?

ক্ষ। ঘোর নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিবে।

শ। আমার মানহানিকর কুৎসা লিখিয়া কেহ যদি আবার তজ্জন্য অহঙ্কারে স্ফীত হয়?

ক্ষ। সেইটী আর ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে তুমি একান্ত যত্ন করিবে।

শ। যদি আমার শত্রু আমার কোন ভূমিখণ্ড হরণ করে?

ক্ষ। তাহাকে অপর একখণ্ড প্রদান করিবে।

শ। যদি তিনি আমাকে পদাঘাত করেন?

ক্ষ। সেই অপরাধীকে বৎসরের তৎকালের উৎকৃষ্ট ফল প্রেরণ করিবে।

শ। যদি সেই দানে তাঁহার ক্রোধকে আর প্রজ্বলিত করে, এবং তিনি আবার আমার স্ত্রীপুত্রের নামে কুৎসা প্রচার করেন?

ক্ষ। তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তানগণকে বস্ত্র, মিষ্টান্ন এবং খেলানা পাঠাইয়া দিবে।

শ। যদি কোন বক্তা আমাকে প্রকাশ্যরূপে আক্রমণ করে?

ক্ষ। তাঁহার নামে ধন্যবাদের প্রস্তাব করিবে।

শ। যদি কোন বিষম শত্রু অত্যন্ত দুঃখের অবস্থায় পতিত হন?

ক্ষ। তাঁহাকে গোপনে একখানি চেক অথবা নোট প্রেরণ করিবে।

শ। যদি সমস্ত সহর আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে অকারণ বিষম গ্লানিতে আন্দোলিত হইতে থাকে?

ক্ষ। মনে মনে আহ্লাদের সহিত হাস্য করিবে।

শ। যদি আমার শত্রুগণ আমাকে ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, পরধনাপহারী বলিয়া অপবাদ করে?

ক্ষ। তাঁহারা যে ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিয়া যান, তাহা চুম্বন করিবে।

শ। যখন আমার শত্রু আমার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হন?

ক্ষ। ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন করিবে এবং তাঁহার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে, যেন ক্রোধ তাঁহার আত্মাকে নরকাগ্নিতে আর এ প্রকার দগ্ধ না করে।

শ। যদি দশ বৎসর কাল প্রতিনিয়ত প্রকাশ্য পত্রে আমার গ্লানিপ্রচার

দ্বারা আমাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদ ও আনন্দ করেন ?

ক্ষ। বলিবে, তিনি যে এত কষ্টস্বীকার করিয়াছেন, এজন্য তুমি দুঃখিত হইয়াছ এবং তিনি যে সকল কাগজে তোমার গ্লানিপ্রচার করাইয়াছেন, তাহার একখানিও তুমি পাঠ কর নাই।

শ। আমার শত্রু যদি বারংবার আমার যশের প্রতি আঘাত করিয়া, আমাকে সকলের নিকট অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন ?

ক্ষ। তাহা হইলে তোমার যে সহস্র সহস্র বন্ধু আছে, তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া তোমার অভিপ্রেত কার্য্যের উন্নতির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিবে।

শ। যদি আমার শত্রু তথাপি আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত না হন ?

ক্ষ। তাঁহার জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা করিবে।

শ। যদি তিনি নববিধানকে ঘৃণা করেন ?

ক্ষ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবে যে, তিনি ইহা অবলম্বন করেন এবং বিশ্বাসিমণ্ডলীভুক্ত হন।

শ। যদি সমস্ত শত্রুদল আমাকে ক্রমাগত উৎপীড়ন করিতে থাকে ?

ক্ষ। ঈশ্বরকে বলিবে, ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, কেন না ইহারা জানে না, ইহারা কি করিতেছে।

শ। যদি সমস্ত দেশ আমার বিরোধী হয় ?

ক্ষ। চতুর্দ্দিকে অনবরত হরিনামকীর্ত্তন কর যে, শেষে সকলে তাঁহার আশ্রয় অবলম্বন করিবে।”

নববিধান শিক্ষা

কুসংস্কার, অবিশ্বাস এবং নববিধানের কথোপকথনচ্ছলে যে নববিধান শিক্ষা দেওয়া হয়, আমরা তাহার অনুবাদ (১৮০৩ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

কুসংস্কার। ঈশ্বর আমায় বলিয়াছিলেন।

অবিশ্বাস। ঈশ্বর মানুষকে কিছু বলেন না।

বিধান। ঈশ্বর পূর্ব্বে অনেক সময়ে বলিয়াছেন, এবং এখনও মানবগণকে বলিতেছেন।

কু। দেখ, ঐ অগ্নি বনমধ্যে।

অ। ঈশ্বর কোথাও নাই।

বি। ঈশ্বরের বর্ত্তমানতাগ্নি সর্ব্বত্র।

কু। বেদই কেবল ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র।

অ। ঈশ্বর কোন শাস্ত্রপ্রণয়ন করেন নাই।

বি। সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্য ঈশ্বরপ্রণীত।

কু। ঈশ্বরকে আমি দেখিয়াছি।

অ। অপরিজ্ঞেয়কে কেহ দেখিতে বা জানিতে পারে না।

বি। যদিও তিনি বোধাতীত, তাঁহাকে প্রত্যেক সাধক অধ্যাত্ম চক্ষুতে দর্শন করিতে পারে।

কু। কেবল আমার ধর্ম্ম সত্য, অন্য সমুদায় মিথ্যা।

অ। সত্য ধর্ম্ম নাই।

বি। প্রতিধর্ম্মই পরিত্রাণপ্রদ, যে পরিমাণে উহা সত্য এবং পবিত্রতা শিক্ষা দেয়।

কু। মনুষ্যজাতিকে পরিত্রাণ করিবার জন্য কেবল এক মোহম্মদই ঈশ্বর-নিযুক্ত প্রেরিত।

অ। প্রেরিত বা ভবিষ্যদ্দর্শী নাই।

বি। সমুদায় ঋষি, দেশসংস্কারক এবং ধর্ম্মার্থনিহত, সমুদায় মহৎ মহৎ ধর্ম্মের নেতা ঈশ্বরপ্রেরিত।

কু। খ্রীষ্টই পথ।

অ। খ্রীষ্ট এক জন বঞ্চক।

বি। প্রকৃত পুত্রভাব, যাহা খ্রীষ্ট শিখাইয়াছেন এবং জীবনে দেখাইয়াছেন, তাহাই পথ।

কু। কেবল এই নদী পবিত্র।

অ। কোন জলই পবিত্র নয়।

বি। সকল জলই পবিত্র, যখন উহা ঈশ্বরকে প্রকাশ করে।

কু। আমাকে গ্রহণ কর, আর সকলকে পরিহার কর।

অ। সকলকে পরিহার কর।

বি। সকলকে অন্তর্ভূত কর।

নববিধানে নূতন

নববিধানে নূতন কি, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, 'নববিধান' পত্রিকা তাহার এই উত্তর দিয়াছেন :—"পরমাত্মদর্শন কি নূতন নয়? তাঁহার আত্মিকবাণী-শ্রবণ কি নূতন নয়? পরমাত্মাকে মা বলিয়া পূজা করা কি নূতন নয়? মূষা এবং সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কি নূতন নয়? ফারাডে এবং কারলাইলের সমাগম কি নূতন নয়? উনবিংশশতাব্দীর সভ্যতার মধ্যে কল্যকার জন্য চিন্তা না করার ব্রত কি নূতন নয়? যে যোগে নিয়ত দ্বৈতজ্ঞান থাকে, সে যোগ কি নূতন নয়? 'আমি এবং আমার ভাই এক', এমত কি নূতন নয়? 'তোমার প্রতি অন্যের যাহা করা তুমি ইচ্ছা কর, তদপেক্ষা অন্যের প্রতি তুমি অধিক কর', এই সুন্দর মত কি নূতন নয়? সাধুমহাজনগণকে আত্মার উপাদান করিয়া লওয়া কি নূতন নয়? সমুদায় বিধানকে একত্র বদ্ধ করে ঈদৃশ ন্যায়-সিদ্ধ পরম্পরাক্রমশৃঙ্খল কি নূতন নয়? নববিধানের হিন্দুসাধকগণকে খ্রীষ্ট এবং পলের প্রেরিত ও অধ্যাত্মবংশসম্ভূত বলিয়া মানা কি নূতন নয়? যে সমন্বয়বাদ গভীর যোগ, অত্যুন্নত দর্শন, মহোৎসাহপূর্ণ দেশহিতৈষিতা, অতি মধুর প্রেম, সুদৃঢ় বৈরাগ্য, এ সকলকে পূর্ণ সামঞ্জস্যে একীভূত করে, সে সমন্বয়বাদ কি নূতন নয়? যে ধর্ম্মবিজ্ঞান সমুদায় ধর্ম্মের উপাসনা ও ভবিষ্যদ্দর্শন, বৈরাগ্য ও দেব-নিঃশ্বসিতলাভ এক সাধারণ নিয়ম এবং সার্ব্বভৌমিক মূলসূত্রে সংযুক্ত করে, সে ধর্ম্মবিজ্ঞান কি নূতন নয়? কাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, বাপ্তিষ্ট এবং মেথডিষ্টকে খ্রীষ্টে এবং খ্রীষ্ট, মূষা ও সক্রেটিস্‌কে ঈশ্বরেতে মিলিত করা কি নূতন নয়? গৃহস্থ বৈরাগী, রহস্যমগ্ন বিজ্ঞানী, জ্ঞানী উৎসাহপ্রমত্ত, প্রত্যাদিষ্ট কর্ম্মী হওয়া কি নূতন নয়?" (১৮০২ শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে 'নূতন বিধানে কি কি নূতন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

চৈতন্যের দ্বিবিধ স্বভাব

চৈতন্যের দ্বিবিধ স্বভাবের বিষয় 'নববিধান' পত্রিকা লিখিয়াছেন (১৮০৩ শকের ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ দ্রষ্টব্য) :—"মহাপুরুষের মধ্যে এমন

কেহ কি আছেন, যিনি একাধারে পুরুষ এবং নারীর সাধুতা প্রকাশ করিয়াছিলেন? যাঁহার মধ্যে পুরুষের গুণ এবং নারীর ভাব একত্রীভূত হইয়াছিল? সে মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যেন তাহা প্রস্তরের ন্যায় কঠিন। তাঁহার স্বার্থবিসর্জ্জন, তাঁহার কঠোর ব্রত সকল, তাঁহার চিরসন্ন্যাসাবলম্বন, তাঁহার গৃহপরিজনের প্রতি মায়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ, তাঁহার নির্দ্দোষ সাধুতা এবং অপ্রলুব্ধ পুণ্য, এসকল তাঁহাকে গর্জ্জনশীল সিংহের ন্যায় প্রদর্শন করে; তিনি একজন ধর্ম্মবীর, তাঁহার নিকটে পাপ এবং রিপু সকল ত্রস্ত এবং কম্পিত হইয়াছিল। তিনি গৌর সিংহ। তিনি পাপ স্পর্শ করিতেন না, তিনি পাপকে প্রশ্রয় দিতেন না। পুণ্য তাঁহাকে বীর্য্যবান্ এবং সাহসী করিয়াছিল। তাঁহার জীবনে পবিত্রতা যেন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ছিল। সত্যের পরাক্রম তাঁহার মধ্যে এ প্রকার ভাবে অবস্থিতি করিত, তাঁহার এ প্রকার পুরুষোচিত উৎসাহ ছিল যে, তিনি নগর হইতে নগরান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে মত্ত হস্তীর ন্যায় গমন করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে নারীর ন্যায় কোমল ভাবও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। আকার প্রকার এবং স্বভাব দুয়েতেই তিনি নারীসদৃশ ছিলেন। বোধ হয়, যেন প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়কে নারীর ছাচে ফেলিয়া গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে ঈশ্বর এবং মনুষ্যের প্রেম মিষ্ট, অতীব মিষ্ট ছিল। তাঁহার প্রেম নারীর প্রেমের ন্যায় সুকোমল ভাবে গদগদ ললিত, এবং কবিত্বে পূর্ণ ছিল; তাহা পুরুষের প্রেমের ন্যায় কঠোর এবং কর্ম্মঠ নহে। তিনি পূর্ণানন্দ ছিলেন। স্বর্গীয় প্রেমের মধুরতাতে তিনি পূর্ণ ছিলেন। তিনি প্রেমের আধিক্য-প্রযুক্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন করিতেন এবং যখনই ঈশ্বরের নিকট গমন করিতেন, তখনই তিনি অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেন। নারী যেমন আপন পতিকে ভালবাসে, চৈতন্য তাঁহার হৃদয়ের প্রিয় হরিকে সেই প্রকার ভালবাসিতেন। সত্য সত্যই চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ রাধা দুই ছিলেন। পুরুষের বিশ্বাস এবং নারীর প্রেম, পুরুষের আত্মা ও নারীর হৃদয় একাধারে এ দুয়েরই মিলন ছিল। পবিত্র ঈশ্বরের পুরুষ এবং নারীভাব দুই তিনি আপনার মধ্যে সম্মিলিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক পুরুষ এবং মধুরস্বভাবা নারী ছিলেন। তিনি কঠোর যোগী এবং প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। আমরাও যেন তদ্রূপ

হইতে পারে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসী পূর্ণ পুরুষ এবং নারীভাব উপার্জ্জনে অভিলাষী হউন এবং পুরুষ এবং নারীর পাপের অতীত হউন, পুরুষ এবং নারীর সাধুতার এই প্রকার একতাই পরিত্রাণ এবং আনন্দ।"

উপন্যাসপাঠ

উপন্যাসপাঠসম্বন্ধে 'নববিধান' পত্রিকা এইরূপ মত প্রকাশ করেন (১৮০৩ শকের ১লা শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ দ্রষ্টব্য) :—"উপন্যাসপাঠ পৃথিবী চায়। এ বিলাসটি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। উপকথাতে পৃথিবীর আমোদ এবং আনন্দ; আমরা যদি একান্ত উৎসাহপূর্ব্বক ইহার প্রতিবাদ করি, তথাপি অল্প লোকেই ইহা ছাড়িতে প্রস্তুত। একখানি ভাল উপন্যাসের বহি, একটি প্রীতিকর গল্প, একখানি উপকথার মনোহর পুস্তকের নামে লোকের মুখ দিয়া জল পড়ে। যাঁহারা উপন্যাসপাঠনিবারণের চেষ্টা করেন, তাঁহারা অভিশপ্ত হউন! কিন্তু যদি ইন্দ্রিয়সুখার্থী লোকেরা মুগ্ধকর সাঙ্ঘাতিক প্রেমরসঘটিত গল্প সকল পাঠ করিবে, তবে অধ্যাত্মভাবার্থী লোকদিগের পক্ষে উচ্চ প্রকার পাঠ নিতান্ত আবশ্যক বলিতে হইবে। যাহারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাহাদের আত্মার পক্ষে অধিকতর পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যজনক আহার উপযুক্ত। আচার্য্য, উপাচার্য্য, প্রচারক, সাধক এবং অপরাপর যাঁহারা আত্মার মঙ্গল অধিকতর প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের উপন্যাসপাঠ হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। আমরা এতৎপাঠকে একেবারে পাপ বলি না। ইহা স্বতঃ গরলপূর্ণ এবং নীতিহন্তারক নহে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে অনেক সদ্‌গ্রন্থ আছে, এমন পুস্তক অনেক আছে, যাহাদের ভাব এবং গতি নিশ্চয়ই নীতির অনুকূল। কিন্তু এই বিশিষ্ট পুস্তকগুলি ব্যতীত উপন্যাস সকল সাধারণতঃ যুবকদিগকে কলুষিত এবং দূষিত করে। অতএব ধার্ম্মিক লোকদিগের প্রতি আমাদের উপদেশ এই যে, যে মূলসূত্রে বলে, 'যাহাতে তোমার ভ্রাতার পদকে স্খলিত করিতে পারে, এমন বিষয় সকল পরিহার করিবে,' সেই মূলসূত্রানুসারে তাঁহারা উপন্যাসপাঠ এককালে পরিত্যাগ করিবেন। আমাদিগের দুর্ব্বল ভ্রাতাদিগের জন্য যদি আমরা মদ মাংস ত্যাগ করি, তাহা হইলে বিলাসপ্রিয় চিন্তাবিহীন যুবকদিগের নীচ প্রবৃত্তি এবং কুৎসিত কল্পনাসকলকে, যাহা এত অধিক পরাক্রমের সহিত পোষণ এবং পরিবর্দ্ধন করিতেছে, সেই অনিষ্টের বিরোধী

আমরা কেন না হইব? যদি তুমি ছ'খানি উপন্যাসের পুস্তক পাঠ করিয়া থাক, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। উপন্যাসপাঠের অভ্যাসটি এমন অনিষ্টকর যে, তাহাতে কোন মতে প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না। অপিচ ইহার আমোদ এত দূষিত যে, তাহা আমাদের বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমরা উহাকে ত্যাগস্বীকারের ভাবে দেখিব। যে সুখে আপত্তি আছে, তাহা পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য আমরা বিসর্জ্জন দিব।"

সঙ্কোচ নয়, মেলান

মিলাইয়া লইতে হইবে, কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্কোচ করা হইবে না, এ বিষয়ে 'নব-বিধান' পত্রি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি:—"আমাদের প্রিয় শ্রদ্ধেয় প্রেরিতদল যেখানে যাউন, নববিধানপ্রচারে তাঁহারা উহার শুদ্ধতা ও অখণ্ডত্ব অকলঙ্কিত রাখিতে যত্ন করিবেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে খর্ব্ব করিবেন না। পূর্ণ সময়ে প্রভু পরমেশ্বর ভারতকে যে নবীন শুভসংবাদ অর্পণ করিয়াছেন, উহা বিশ্বাস ও সাধনার পূর্ণ ব্যবস্থা। তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা উহাকে পূর্ণভাবে প্রচার করেন। উহার সঙ্গে আমাদের আপনার বা অপরের কল্পনা জল্পনা যেন আমরা না মিশাই। ইহার উচ্চ মূলতত্ত্বগুলি যাহারা লাগাইল পায় না, তাহাদের মনেব মত সুবিধানুরূপ করিয়া দেওয়ার জন্য যেন সেগুলির পরিবর্ত্তন বা অঙ্গভঙ্গ আমরা না করি। আমরা এরূপ কিছুই করিব না, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের সত্য পূর্ণতায় ও অখণ্ডত্বে মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করিব। সাংসারিকবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, কতকগুলি লোকের মধ্যে কতক দিনের জন্য ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া গেল, দেখা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বিধান কলঙ্কিত হয়, দুর্ব্বল হয় এবং তাঁহার পবিত্র মণ্ডলী অসাড় হইয়া পড়ে। আমরা জানি, আজ কাল বিধানকে আর একটু জ্ঞানপ্রধান এবং আর একটু অল্পবিতৃষ্ণাকর করিবার জন্য প্রবল প্রলোভন উপস্থিত। কিন্তু তাহাদিগকে ধিক্, যাহারা প্রলোভয়িতার নিকট প্রণত হয়! আমাদের মতসকল অসঙ্গত, উপহাসকর, এমন কি বিতৃষ্ণোৎপাদক, কেহ কেহ একথা বলিয়াছে বলিয়া, বিশ্বাসীদিগের অবসাদ উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। ঈশ্বরের প্রেরিতগণ সত্য ভিন্ন আর কিছু, বিধান ভিন্ন আর কিছু প্রচার করিবেন না, প্রচারের ফল বিধাতার হাতে রাখিয়া দিবেন। তাঁহারা

মতের বিষয় বিচার করিতে পারেন না। কেন না উহারা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে। তাঁহারা সত্য প্রচার করুন, ব্যাখ্যা করুন, দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন করুন, প্রমাণিত করুন। তবুও যদি বিকৃতমনা ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের সত্যসকলকে উপহাস করে, তাঁহার নিয়োজিত ভৃত্যগণের নিন্দা করে, তাঁহারা এই করিতে পারেন যে, খ্রীষ্টের আদেশানুসরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পায়ের ধূলা ধৌত করিয়া তথা হইতে চলিয়া যান। এ সকল সত্ত্বেও আমাদের প্রেরিত ভ্রাতৃবৃন্দ মতসহিষ্ণু হইবেন। যখন বন্ধুভাবে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং সাবধান করা হয়, তখন তাহা সাবহিতচিত্তে শুনিবেন। খ্রীষ্টান, হিন্দু, ব্রাহ্ম যত দিন পর্য্যন্ত বন্ধু এবং ভাইয়ের মত কিছু বলেন, ভুল দেখাইবার জন্য, অকল্যাণনিবারণের জন্য উদ্বিগ্ন হন, তত দিন ধীরতাসহকারে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিতে হইবে। নববিধানের ব্রাহ্মগণ শিখিতেও ক্লান্ত হন না, ভালবাসিতেও ক্লান্ত হন না। অভিপ্রায় ভাল, এরূপ ব্যক্তিগণ যদি বলেন, আমাদের অবিবেচনায় কুসংস্কার, পৌরোহিত্য, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, অনীতি এবং পাপ পুনরায় জাগিয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে আমরা যেন তাঁহাদিগের কথাগুলি, তাঁহাদের যুক্তিগুলি বিচার করিয়া দেখি, এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে যত্ন করি। যদি যথার্থই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, আমাদের জীবনতরণী যে দিকে যাইতেছে, নির্ব্বিঘ্ন নয়, কারণ ঐ দিকে অদ্বৈত-বাদ, প্রেতাত্মবাদ, রহস্যবাদের চোরা বালি আছে, যাহাতে লাগিয়া উহার ভাঙ্গিবার বিপদ্ আছে, এবং সাবধান না হইয়া অবিবেচনাপূর্ব্বক যদি আরও অগ্রসর হই, নূতন কুসংস্কারের সাগরে আমরা ডুবিয়া যাইব, আর উঠিতে পারিব না, অতীব ধীরতাসহকারে এই সাবধান বাক্য যেন আমরা চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখি, কেন না দার্শনিকসমুচিত চিন্তনে আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না। অপিচ যদি প্রয়োজন হয়, আমরা যেন জ্যেষ্ঠগণের প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ একটু বিবেচনাশীল হই এবং অবিবেকিতা ও বিচারশূন্য উষ্ণমস্তিষ্কতা পরিহার করি। আমরা যেন দেখাই যে, তাঁহারা যেমন, আমরাও তেমনি কুসংস্কার এবং অপবিত্রতা হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি, এবং তাঁহারা যেমন, তেমনি আমরাও বিজ্ঞান ও নীতির উপরে অত্যাচারের প্রতিরোধ ও শাসন করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের প্রেরিত ও প্রচারকগণ

এ সকল এইরূপই করিবেন। তাঁহারা যেন নানাপ্রকার বিরুদ্ধ মতের মধ্যে পড়িয়াও সর্ব্বদাই বিনম্র, ভদ্র, বিনীত এবং হ্রীমান্ হয়েন, এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের ক্ষুদ্রতম শত্রুর নিকটেও শিক্ষা করিতে প্রস্তুত, ইহা যেন তাঁহারা প্রমাণিত করিতে পারেন। তবু যেন মিলাইয়া লওয়া থাকিলেও, ধর্ম্মকে খর্ব্ব করা না থাকে ; প্রেম, সম্ভ্রম, মতসহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতি সত্ত্বেও, সত্য বা ঈশ্বরের মতের কিছুমাত্র সঙ্কোচ করা না হয়।”

দ্বাদশ ভাদ্রোৎসব।

দ্বিতীয় কন্যার শুভপরিণয়

৬ই ভাদ্র রবিবার (১৮০৩ শক ; ইং ১৮৮১, ২১শে আগষ্ট) ভাদ্রোৎসব হয়। তৎপূর্ব্বে ৩০শে শ্রাবণ (১৩ই আগষ্ট), শনিবার, কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা সাবিত্রী দেবীর শুভ পরিণয়ব্যাপার সম্পন্ন হয়। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা ভাদ্র, ১৮০৩ শক, লিখিয়াছেন :—"বিগত ৩০শে শ্রাবণ (১৩ই আগষ্ট), শনিবার, কুচবিহারের কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের সহিত আচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সহরের বড় বড় উচ্চপদস্থ প্রায় সকল ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সহরের প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, সাহেব ও বিবি সভাস্থলে বর্ত্তমান ছিলেন। কলিকাতার প্রায় আড়াই শত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারাও উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, দীননাথ মজুমদার ও কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়া বিদেশ হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে এবং তাঁহার ভক্তদিগের সম্মুখে এই পবিত্র উদ্বাহকার্য্য গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপস্থিত সকলেই বিবাহ অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্র ভাব দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিবাহান্তে কার্পেটের আসন পাতিয়া কলার পাতে হাত দিয়া লুচি তরকারী মিষ্টান্ন দধি ক্ষীর প্রভৃতি প্রায় বিশজন সাহেব ও বিবি, এ দেশীয় কয়েক জন সম্ভ্রান্ত খৃষ্টীয়ানও, ব্রাহ্মদের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিয়া, সকলেরই আনন্দ ও সদ্ভাব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইংরাজ বাঙ্গালী হিন্দু খৃষ্টীয়ান সকলে সকল প্রকার ভিন্নতা ভুলিয়া গিয়া, প্রেম ও আত্মীয়তার নামে এক হইয়াছিলেন, ইহা অত্যন্ত মঙ্গলের লক্ষণ বলিতে হইবে। * এ বিবাহসম্বন্ধে একটি বিষয় দেখিয়া বিধাতার প্রতি

---

* এই সদ্ভাব যে ক্ষণস্থায়ী নয়, (১৬ই ভাদ্রের) ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে গৃহীত এই সংবাদটি তাহা বিলক্ষণ দেখায় :—"আচার্য্যমহাশয়ের কন্যা ও জ্যেষ্ঠপুত্রের পরিণয়োপলক্ষে কুমারী পিগট ব্রাহ্ম,

আমাদের বিশ্বাস ও প্রেম বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। সকলেই বলিয়া থাকেন, বিবাহ ঈশ্বরাধীন; কিন্তু যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিধাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। বিধানাশ্রিতদিগের নিকট বিধাতা যে এত আত্মীয় হইয়া তাঁহাদের সকল ভার গ্রহণ করেন, সে সত্য আমরা এই বিবাহে যেমন শিক্ষা করিয়াছি, এমন আর কিছুতেই নহে। প্রথমে কিছুরই উদ্যোগ ছিল না, সকল বিষয়ে এমনি গোলযোগ হইতে লাগিল যে, পাত্রেরও স্থিরতা হয় নাই, অন্যান্য উপায়ের তো কথাই নাই। কন্যাকর্ত্তা কেবল বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অগ্রেই বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং অন্যান্য সামান্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঈশ্বর স্বহস্তে এক একটী বাধা দূর করিয়া দিলেন। কোথা হইতে আপনাপনি পাত্র স্থির হইয়া গেল, অন্যান্য সকল প্রকার উপায় যথানিয়মে স্থিরীকৃত হইয়া গেল এবং যথাসময়ে শুভ উদ্বাহ সুনিয়মে সম্পন্ন হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিল।"

বিবাহোৎসবের সঙ্গে 'বেদপুরাণের বিবাহ' উপদেশে উৎসবের পরিসমাপ্তি

উৎসবের বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া সৰ্ব্বাগ্রে বিবাহব্যাপার নিবদ্ধ করিবার বিশেষ হেতু আছে। শনিবারে (১৩ই আগষ্ট) আচার্য্যের দ্বিতীয়া কন্যার, সোমবারে (১৫ই আগষ্ট) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। এ সম্বন্ধে নববিধান পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "সম্প্রতি ১৩ই আগষ্ট (১৮৮১ খৃঃ) শনিবার বিবাহোৎসবের আরম্ভ হইয়া, বিগত ২১শে আগষ্ট, রবিবার, মন্দিরে বেদ ও পুরাণের বিবাহসম্বন্ধে উপদেশ হইয়া, উহার উপযুক্ত পরিসমাপ্তি হইয়াছে। সাংবৎসরিক উৎসবোপলক্ষে আচার্য্য যোগ ও ভক্তির সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া, আখ্যায়িকাচ্ছলে উপদেশ দেন এবং নববিধানে এক দিকে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও যোগ, অন্য দিকে প্রেম, বিশ্বাস এবং আনন্দ কি প্রকারে একীভূত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করেন।" আখ্যায়িকা এই :—"সম্ভ্রান্ত মহর্ষি বেদ যখন বৃন্দাবনে সুন্দর পুরাণকে বিবাহ করিবার জন্য হিমালয় হইতে অবতরণ

খৃষ্টান ও হিন্দু স্ত্রীপুরুষগণকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যেমন আয়োজন হইয়াছিল এবং যে প্রকার সদ্ভাবে ভিন্ন জাতি, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একত্র আহার ব্যবহার করিলেন, তাহাতে নূতন সময়ে নূতন ব্যাপার উপস্থিত, কে না স্বীকার করিবে? ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে এই ভাব দিন দিন বৰ্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, এই আমাদের কামনা।"

করিলেন, তখন সকল হিন্দুবিবাহের যেরূপ পদ্ধতি আছে, তদনুসারে নিমন্ত্রিত-গণের মধ্যে মহাবিচার উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষের পণ্ডিতগণ এই জটিল প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন, প্রসিদ্ধ নিমন্ত্রিতগণ মধ্যে ঈশা সম্মানিত স্থান পাইবার যোগ্য কি না? কেহ কেহ তাঁহাকে সভামধ্যে উচ্চতম স্থান দেওয়ার পক্ষে ছিলেন, এবং যোগী ব্রাহ্মণগণমধ্যে তাঁহাকে যথার্থ কুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; অপর পক্ষ—যাঁহারা সংখ্যায় এত অধিক যে, অনুকূল পক্ষকে অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারেন—তাঁহারা বলিতেছিলেন, ঈশা যখন ম্লেচ্ছ-বংশসম্ভূত, তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা এই পবিত্র সভাকে মলিন করিতে দেওয়া হইবে না। এই সমস্যা অতি কঠিন মনে হইতে লাগিল, শাস্ত্র ও আচার হইতে বহুল প্রমাণ, এবং যুগপরম্পরা ও জাতিগত পার্থক্যের নিদর্শন উপস্থিত করা হইল, সুতরাং বিরোধ বিসংবাদ ও তর্ক বিতর্কের আর অন্ত ছিল না। এই বিচারের মধ্যে কোন কোন গুরুতর যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছিল, যাহাতে অবশেষে বিচারের নিষ্পত্তি হইল। ঈশার সম্ভ্রান্ত ঋষিতুল্য বাহ্যাকৃতি, প্রশান্ত প্রকৃতি, উচ্চতম অদ্বৈত যোগ, আরাধনার্থ পর্ব্বতে গমন, নির্জ্জনে সাধিত জীবন, এইগুলি, খৃষ্ট যে যবন নন, কিন্তু দেবর্ষি, ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ। সমুদায় সভা 'সাধু সাধু' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, সকল পক্ষ ঐকমত্যে দ্বিজগণ-মধ্যে উচ্চতম স্থান দিলেন, এবং এইরূপে একটি মহাবিবাদাস্পদ বিষয় চূড়ান্ত প্রামাণিকতায় নির্দ্ধারিত হইয়া গেল এবং সমুদায় হিন্দুস্থান ব্রহ্মপুত্র ঈশ্বরতনয় ঋষি খৃষ্টের সম্মুখে প্রণত হইল।"

উৎসববৃত্তান্ত

সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন, প্রাতর্মধ্যাহ্ন উপাসনা, শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রের সামঞ্জস্য-প্রদর্শন, অপরাধস্বীকার, যোগ ধ্যানের উদ্বোধন, সাধুসমাগম, সঙ্গীত ও প্রার্থনা, বালসঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, সায়ংকালীন উপাসনা উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল। উৎসবের বিবরণ এস্থলে (১৬ই ভাদ্রের) ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে:—

"এবার ভাদ্রোৎসব আনন্দব্যাপারের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার আরম্ভ শেষ কেবলই আনন্দ। উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে সাধকগণ কঠোর যোগের পথ অবলম্বন করেন নাই। উৎসবের পূর্ব্ব রাত্র পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের

লোকের একত্র সম্মিলন, মিষ্টালাপ, সঙ্গীত প্রভৃতি আমোদে অতিবাহিত হইয়াছে। অনেক বন্ধু মনে করিয়াছিলেন, এবারকার উৎসব আধ্যাত্মিক বিষয়ে কি প্রকারে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিবে, যখন তাহার আরম্ভ প্রগাঢ় সাধন ভজনের গুরুত্ব অনুভব করিল না। কিন্তু বিধাতার গূঢ় কৌশল কে জানে? পূর্ব্ববর্ত্তী পরিণয়োৎসব উচ্চতর ভাদ্রোৎসবে পরিণত হইল। প্রাতঃকালের সঙ্গীতানন্তর যখন আচার্য্য বেদী হইতে উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলের মন অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল; আজ কি আনন্দের ব্যাপার ঘটিবে, তাহার পূর্ব্বাভাস সকলের চিত্তে প্রতিভাত হইল। আরাধনা ধ্যান সেই ভাবের স্রোতে নির্ব্বাহ হইলে, আচার্য্য বেদী হইতে যে উপদেশ দান করিলেন, তাহা শুভ ক্ষণের চিহ্ন; যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, কেমন উপযুক্ত সময়োচিত। এ বৎসর কেবল সম্মিলন, কেবল পরস্পরের যোগ। এই যোগ উচ্চতর পরিণয়-ব্যাপারে পরিণত হইল। উপদেশের বিষয় 'পরিণয়'।"

বেদ পুরাণের পরিণয়

"কোন্ দুই ব্যক্তির মধ্যে পরিণয়? বর কে, কন্যা কে? বর বেদ বা জ্ঞান, কন্যা পুরাণ বা ভক্তি। বর বড়, না, কন্যা বড়? একথা লইয়া মহা বিবাদ সমুপস্থিত। বেদ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, পুরাণ সে দিন জন্মিয়াছেন। বর আসিলেন মহোচ্চ হিমালয়শিখর হইতে, পুরাণ নিম্ন ভূমিতে সামান্য লোকমণ্ডলীর মধ্যে বাস করেন। বেদের শির পলিত, কন্যা নবযৌবনা। আর এক পক্ষ বলিলেন, না, বেদ নবযৌবনসম্পন্ন, পুরাণ গলিত-বয়স্ক। বেদ—বিজ্ঞান, প্রকৃতিকে লইয়া ব্যস্ত, কেবল প্রকৃতির পূজা, কেবলই প্রকৃতিতে ঈশ্বরের কৌশল দর্শন। এখনও এই বিজ্ঞানরূপী বেদ নবযৌবনবিশিষ্ট। দেখ, চারি দিকে সকল লোক বেদানুরক্ত, বিজ্ঞানানুরক্ত, ভক্তি অনাদৃত। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি নবযৌবনা ছিলেন, এখন ইনি জীর্ণ শীর্ণ, কেহ ইহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। বরপক্ষীয়কন্যাপক্ষীয়গণের মধ্যে এই প্রকার বিবাদ চলিল বটে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিলে ইহাদের উভয়ের বয়োবৈষম্য নাই। এই বিবাহ উপলক্ষে আবার আর এক ঘোর কলহের কারণ উপস্থিত হইল। বরপক্ষে মহর্ষি ঈশা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া মহোচ্চ আসনে উপবিষ্ট

হইলেন। দেখিয়া মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কি! বিবাহ-সভাতে ম্লেচ্ছ যবন, এ সভাতে বিবাহ-কার্য্য কখন সম্পন্ন হইতে পারে না। আর্য্য মহর্ষিগণের দেশে পরিণয়, সেখানে ম্লেচ্ছের সংস্পর্শ হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। কন্যাপক্ষে উচ্চাসনে উপবিষ্ট গৌরাঙ্গদেব হাসিতে লাগিলেন। আহ্লাদে তাঁহার গৌরদেহ ডগমগ করিতে লাগিল। কেন, তাঁহার এত আহ্লাদ কেন? এই জন্য আহ্লাদ যে, তিনি যাহা সম্পন্ন করিতে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা আজ সম্পন্ন হইল। যেখানে হরিভক্তি, যেখানে যোগ, সেখানে ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নাই, আত্মা একজাতি, ইহা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। আজ তাহা সিদ্ধ হইল। কেন না, বরপক্ষে ঈশা মহর্ষি নাম লাভ করিয়া সভাস্থ হইলেন। ঘটকচূড়ামণি বিবাদের মীমাংসক নববিধান আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, কি তোমরা মহর্ষি ঈশাকে লইয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়াছ? তাঁহার সম্বন্ধে জাতির বিচার? স্থূলদর্শিগণ, বাহিরে যজ্ঞোপবীত নাই, এই বুঝি তোমাদের বিবাদের কারণ? যাও, একবার মহর্ষি ঈশার আত্মার ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে, সেখানে সমুদায় ব্রাহ্মণচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি যে মহাযোগী, তিনি যোগসাধনের জন্য পর্ব্বত ও অরণ্যানী আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ-মন্ত্র কি? 'আমি পিতাতে, পিতা আমাতে', 'আমি তোমাদিগেতে, তোমরা আমাতে।' এ কি সামান্য যোগ, এ যে মহাযোগ। ঈশ্বরেতে, মানবমণ্ডলীতে অভেদরূপে প্রবিষ্ট! বিবাদের গোল থামিল, সকলের মুখ বন্ধ হইল। এখন সভাস্থলে পরস্পরের অতি অভাবনীয় সম্মিলন উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব পশ্চিম সভাস্থলে উভয়ের হস্তস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলেন। পূর্ব্ব বলিলেন, কেন ভাই পশ্চিম, তুমি আমাকে কেন এত দিন অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিতে? এখন তুমি আমার সমাদর বুঝিতে পারিয়াছ। পশ্চিম বলিল, হাঁ ভাই, তুমিও তো আমাকে যবন বলিয়া সামান্য ঘৃণা কর নাই। আমার ধূমযান, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছ, আমাতেও যে উচ্চতর ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, তাহা তো, ভাই, স্বীকার কর নাই। যাহা হউক, অদ্য আমরা শুভ দিনে একত্র মিলিত হইলাম, এখন আমাদের পরস্পরের সখ্যভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। এইরূপে সভাস্থলে বৈরাগ্য, প্রীতি, বিবেক,

অনুরক্তি প্রভৃতি সকলের মিলন ও পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হইল। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর উপস্থিত থাকিয়া, পরস্পরের হস্ত সম্মিলিত করিয়া দিলেন, এবং নববিধানের ঘটকতায় এই মহাব্যাপার সংঘটিত হইল বলিয়া, তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন।"

সঙ্কীর্ত্তন, মাধ্যাহ্নিক উপাসনা, শাস্ত্রপাঠ

"উপদেশপ্রার্থনান্তে আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত মহাসংকীর্ত্তন উপস্থিত হইল। প্রাতঃকালের উপাসনা মধ্যাহ্নকালের উপাসনার সময়কে চুম্বন করাতে, তখনই মধ্যাহ্ন উপাসনাসম্পাদন জন্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় আহূত হইলেন। তিনি উপাসনার কার্য্য শেষ করিলে. ধর্ম্মশাস্ত্রসমুদায়ের একতা আছে, এই অবতারণানন্তর খ্রীষ্ট, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবচন পঠিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের যে ব্যাখ্যা হয়, তাহার মর্ম্ম নিয়ে লিপিবদ্ধ করা গেল।

"'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥'

"ব্যাখ্যা—(বিষয়ে সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধবশতঃ যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হয়, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, এবং আপনাতে আপনি বিরাজমান, যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে হৃদয়যোগে সেই বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে বেদ বুঝিতে গিয়া পণ্ডিতেরাও মোহপ্রাপ্ত হন, যাঁহাতে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণজনিত সৃষ্টি মিথ্যা হইয়াও মরীচিকা প্রভৃতির ন্যায় সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই সত্য পরমেশ্বর নিয়ত স্বীয় প্রতিভাতে সমস্ত কুহক নিরসন করিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করি।) এ জগতের উৎপত্তি স্থিতি কেন? এই জন্য যে, উহা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে অন্বিত। এক বার সেই অন্বয়কে বিদূরিত কর, দেখিবে, জগৎ মিথ্যা, কিছুই নয়, অপদার্থ, সুতরাং তৎসহ বিয়োগে উহার ভঙ্গ। যে সমুদায় বিষয় আমরা দেখিতেছি, উহাদিগের বিষয়রূপে প্রতিভাত হইবার কারণ, কেবল ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ; অথচ উহারা তাঁহাকে লোকচক্ষুর নিকট হইতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যকিরণে জলভ্রান্তি, বা কাচে বারিবুদ্ধি, ইত্যাকার বিষয়সমুদায় সেই সত্যস্বরূপে অবস্তু হইয়াও বস্তুবৎ

প্রতীত, যোগসাধনে প্রবেশ জন্য সত্যসাধনে ঈদৃশ জ্ঞানের প্রয়োজন। সাধনার্থ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করাতে জগৎ অসৎ, অন্যথা সেই সত্যস্বরূপের সত্যত্বে উহা সত্য। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি স্বরূপ ভক্তিসাধনে একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রভৃতি জগতে প্রতিভাত হয়। 'অভিজ্ঞ' এই বিশেষণ অন্বয় পক্ষে এবং 'স্বরাট্' বিশেষণ ব্যতিরেক পক্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমটি ভক্তির অনুকূল, দ্বিতীয়টি যোগের অনুকূল। যোগে তিনি আপনি যেমন, তেমনি পরিগৃহীত হন; ভক্তিতে জ্ঞান প্রেমাদি যাহা বিশ্বে প্রতিভাত, তাহা লইয়া তাঁহাতে অনুরাগ অর্পিত হয়। তিনি জগতে থাকিয়াও তাহাতে বদ্ধ নহেন, তিনি 'স্বরাট্' আপনাতে আপনি বিরাজমান। তাঁহার জ্ঞানই বেদ। বেদ নিত্য, সৃষ্টি বেদানুসারে হয়, হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহার অর্থ কি? ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের জ্ঞানে মূলতত্ত্বরূপে নিত্যকাল অবস্থিত, সৃষ্টি কেবল তাহারই বিকাশমাত্র। এই বেদ বা ঈশ্বরের জ্ঞান আদিকবিতে হৃদয়যোগে প্রকাশিত হইয়াছিল। মনুষ্যহৃদয়কে যখন কবিত্বে স্পর্শ করে, তখন তাহাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান অবতীর্ণ হয়। বেদ এই জন্য কবিতা। জ্ঞান মানব অন্তরে প্রসুপ্ত ভাবে অবস্থিতি করে। যখন তাহাতে ঈশ্বরের সংস্পর্শ হয়, তখন উহা জাগ্রৎ হইয়া কবিত্বরূপে প্রকাশিত হয়। ধ্রুব শিশু স্তবে অসমর্থ, কিন্তু ঈশ্বরের স্পর্শে বাণী লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন! তিনি বলিয়াছিলেন,

" 'যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥'

" 'অখিলশক্তিধর, যিনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় প্রভাবে এই নিদ্রিত বাক্ এবং হস্ত চরণ শ্রবণ ত্বক্ ও প্রাণকেও জাগ্রৎ করিলেন, সেই ভগবান্ পরমপুরুষ তুমি, তোমাকে নমস্কার করি।' ঈশ্বরের সংস্পর্শে সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি কেমন তদনুগত হইয়া কার্য্য করে, এখানে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যত্র কথিত হইয়াছে,

" 'ঘৃতমিব পয়সি নিরূঢ়ং ঘটে ঘটে বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানদণ্ডেন।'

" 'দুগ্ধে যেমন ঘৃত প্রচ্ছন্ন থাকে, ঘটে ঘটে বিজ্ঞান তেমনি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করে, মানসরূপ মন্থনদণ্ড অর্থাৎ তত্ত্বচিন্তা দ্বারা সর্ব্বদা মন্থন করা উচিত।' যদি বেদ প্রত্যেক মনুষ্যহৃদয়ে প্রচ্ছন্ন আছে, তবে তাহা স্বভাবতঃ আপনি সময়ে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে ঈশ্বরপ্রেরণার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। সেই বেদ দুর্ব্বোধ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন তাহা বুঝিবার কাহার সামর্থ্য নাই। থাকিলেই বা তাহার সমুদায় তত্ত্ব এক জন অবগত হইবে, ইহার প্রমাণ কোথায়?"

অপরাধ-স্বীকার

"অনন্তর সঙ্গীত হইলে অপরাধস্বীকারের সময় আচার্য্য বেদীতে আসীন হইয়া বলিলেন :—

"পাপের জন্য অনুতাপ, পুণ্যের জন্য সুখ। যদি পাপের জন্য মন দুঃখিত না হয়, এবং পুণ্যের জন্য সুখী না হয়, তবে উন্নতি অসম্ভব। পাপ হৃদয়ের রোগ। যে সকল পাপ তোমায় কষ্ট দিতেছে, সে সকলের জন্য অনুতাপ হইবে। সাধু হইলে মন প্রসন্ন হয়। অহেতু বিষণ্ণ হইও না। ভক্তির অবস্থায় দুঃখের ক্রন্দন অস্বাভাবিক। আবার যখন মনের মধ্যে কুবাসনা, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা দেখিবে, তখন ক্লিষ্ট হও। ক্লেশ ক্লেশকে বিনাশ করে। অনুতাপের জল পাপের মলা প্রক্ষালন করে। সেই পরিমাণে অনুতপ্ত হইবে, যে পরিমাণে অনুতপ্ত হইলে হৃদয় বিশুদ্ধ হইবে। যে পরিমাণে ঈশ্বরের কাছে যাইতে অসমর্থ, সেই পরিমাণে কাঁদিবে। মহর্ষি গৌরাঙ্গ কাঁদিতেন। যাঁহারা এত বড়, তাঁহারা ভক্তির অভাব পাপ বোধ করেন। মহর্ষি ঈশা পলকের জন্য ব্রহ্মমুখ দেখিতে পান নাই বলিয়া, কি ভয়ানক বিলাপধ্বনি করিয়াছিলেন। ঈশ্বর সেই ঘন মেঘের মধ্যে এক বার আপনাকে ঢাকিলেন বলিয়া, তাঁহার কি দুঃসহ যন্ত্রণা হইয়াছিল। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, আপনাকে অনুতপ্ত বলিয়া নীচ মনে করিও না। অনুতাপের আগুনে জ্বলিয়া দুষ্প্রবৃত্তি দগ্ধ কর। বল, অনুতাপ, এস। মহর্ষি ঈশা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অনুতাপের শিক্ষক জন দি বাপ্‌তিস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 'অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে' এই তাঁহার চিৎকারধ্বনি ছিল। আমাদের অনুতাপ করিবার সহস্র কারণ আছে। অতএব, মহামতি যোহন, সদয় হও।

আমার মন মোহন, তুমি বল, 'অনুতাপ কর, কেন না ধর্ম্মরাজ্য আগতপ্রায়।' এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আত্মানুসন্ধান কর। কোন্ পাপে এখনও জ্বলিতেছি? কোন্ পাপে, যাহা লোকে জানিলে সমাজচ্যুত করিবে। এখন কি পরের প্রতি অন্যায় ভাব হয় না? এমন পাপ কি কিছুই নাই, যাহা বিবেক এখনও তাড়াইতে পারে না? শরীর বড়, না, আত্মা বড়? ষড়রিপু প্রবল, না, বিবেক প্রবল? এত নববিধানে প্রমত্ত হইতেছি, তথাপি এই রিপুগুলি সঙ্গ ছাড়িতেছে না। হরির নিকট প্রার্থনা কর। প্রার্থনা যখন করিলে, স্পষ্টাক্ষরে সরল মনে স্মরণ কর, অমুক স্থানে অমুক সময়ে এই এই পাপ করিয়াছ। ইহা ভিন্ন গতি নাই। লোকের কাছে অপদস্থ হইবে বলিয়া ভয় করিও না। রোগ ব্যক্ত করা মহত্ত্ব, রোগ গোপন করা নহে। মহত্ত্ব এই যে, এত মহত্ত্ব সত্ত্বেও, একটু দোষ দেখিলে, তাহা কাটিতে প্রস্তুত। এ ধর্ম্মে মানুষের কাছে পাপ স্বীকার করিয়া লজ্জিত হইতে হইল না, ঈশ্বরের কাছে লজ্জিত হও। ঈশ্বরের কাছে বল, আমি চোর, আমি মিথ্যাবাদী, আমি কুচিন্তাপরতন্ত্র, আমি সময়ে সময়ে নাস্তিকতার হাতে পড়ি, আমি সর্ব্বদাই মনের ভিতর সংসার প্রবল রাখি। এইরূপে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর। ভগবান্, যিনি অণুমাত্র পাপ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার কাছে প্রশ্রয় পাই না। উৎসবক্ষেত্রে তিনি বলিতেছেন, 'পাপ ছাড়, মলিন বস্ত্র ছাড়, পুণ্যবস্ত্র পরিধান কর।' তাঁহার কাছে পাপ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও।"

যোগ ও ধ্যানের উদ্বোধন

"অনন্তর যোগ ও ধ্যানের উদ্বোধন এইরূপ হইল :—

"যোগী পক্ষী শরীরপিঞ্জরের ভিতর বাস করে। এক বার উপরে, এক বার নীচে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে, কোন দিকে পথ আছে কি না, উড়িয়া যাইবার, পলায়ন করিবার সুযোগ আছে কি না? তাহার পা সংসাররজ্জুতে, বিষয়কামনাশৃঙ্খলে বাঁধা আছে। একটু উড়িতে চেষ্টা করিলেই, তাহা পায়ে লাগে। কিন্তু যোগী পাখী চিরকাল বদ্ধ থাকিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। যখন বয়স হইল, তখন খাঁচা ভাঙ্গিয়া, শৃঙ্খল কাটিয়া পলায়ন কর। ধ্যান আর কিছুই নহে, এই খাঁচা ছাড়িয়া চিদাকাশে উড়িয়া যাওয়া। উৎসবের সময় আমরা বিশেষরূপে উচ্চতর আকাশে উড়িয়া ব্রহ্মদর্শন করি। ধ্যানের সময়কে

আমরা অবহেলা করিতে পারি না। যেখানকার আত্মা, সেখানে প্রেরণ কর। পাখী আপনার স্থান পাইয়া আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইবে। আকাশ পাইলে পাখীর কেমন আনন্দ হয়। এস, আমরা ব্রহ্মের পাখীকে ব্রহ্মের আকাশে উড়াইয়া দি। ভগ্ন পিঞ্জর, তুমি পড়িয়া থাক। আত্মার বাসনারজ্জু জ্ঞানাস্ত্রে ছেদন কর। পিঞ্জরকে একটু পথ দিতে বল। কেহ যোগবৃক্ষ, কেহ ভক্তিবৃক্ষ-ডালে বসিয়া আছেন। আত্মা-বিহঙ্গ সেখানে গিয়া উড়িবে। আমরা এই বর্ত্তমান শতাব্দীর ঘনীভূত যোগে প্রবেশ করিব। আমরা কেবল স্থলচর কিংবা জলচর নই, আমরা খেচর। যাহাদের মন জলে স্থলে স্থির হয় না, তাহারা সময়ে আকাশে যাইবে। কেন না, তাহারা আকাশবিহারী। বনবিহারী, জলবিহারী হইয়া বনের শোভা দেখিয়াছ, ভক্তিজল পান করিয়াছ, এখন আকাশবিহারী হইবে। যখন পাখী সমর্থ হইবে, তখন পিঞ্জরের মধ্যে থাকিবে না। জড়, চৈতন্যকে তুমি বাধা দিও না। বাসগৃহ, আর নিষ্ঠুররূপে আমাকে বদ্ধ করিতে, নির্য্যাতন করিতে পার না। উড়িতে উড়িতে চলিলাম। এখানে উঠিয়া দেখি, সমুদায় কল্পনা, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যা। আমার জ্ঞান চিন্ময়, চিদাকাশে উড়িয়া আসিয়াছি। আমরা কি ইংরাজী শিখিলাম, যোগবিহীন হইবার জন্য? আমরা এমন সংসার চাহি না, যাহাতে সুখের যোগ ভঙ্গ হয়। সহজ সুমিষ্ট যোগ চাই। 'কি হবে সে জ্ঞানে, যাতে তোমাকে না পাই'; কি হবে সে যোগে, যাতে ভক্তি নাই। ভক্তির সহিত ব্রহ্মধ্যান কর। আকাশে উঠিয়া যোগের আসন পাতি। যোগীর পক্ষে আসন প্রবল সহায়। আসন যদি ঠিক না হয়, ধ্যান ভঙ্গ হইবে। আগে আসন, তার পর উপবেশন, তার পর সাধন। আকাশে আসন পাতি, ঈশ্বর, প্রহরী হইয়া বস, কেহ যেন যোগ ভঙ্গ না করে। আগেকার মহর্ষিদিগের ন্যায় যোগ ধ্যান কর। যদি ঠিক হয়, মন এখনই ব্রহ্মকে পাইবে। কৃপাসিন্ধু কৃপা করিয়া, আমাদিগকে তাঁহার সহবাসে রাখিয়া, প্রতিজনের শরীর মন শুদ্ধ করুন।"

সাধুসমাগমের উদ্বোধন

"যোগ ও ধ্যানানন্তর সাধুসমাগমের উদ্বোধন নিম্নলিখিত মত সম্পন্ন হয়ঃ—

"অন্যান্য লোকের যেমন টাকা কড়ি, আমাদিগের তেমনি সাধুসজ্জন। আমরা গৃহে সাধু কয়েকটিকে লইয়া আলোচনা করি, তাঁহাদিগকে চক্ষুর অঞ্জন

করি, সাধুসংসর্গে সাধুতা সঞ্চয় করি। কেবল সাধুসঙ্গ করিলে হইবে না। পরলোকবাসী ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের সিংহাসনের চারি দিক উজ্জ্বল করিয়া, ঈশ্বরদত্ত মুকুট পরিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। তাঁহারা আমাদিগের হিতকারী বন্ধু, তাঁহাদিগের সত্য দৃষ্টান্ত আনন্দকর, পুষ্টিকর। তাঁহাদিগের সাধুজীবন আলোচনা করিয়া বল ও শান্তি লাভ করি। ব্রহ্মমন্দিরে সাধুদিগের সম্মানের জন্য একটি বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিছু কালের জন্য সংসার ছাড়িয়া, ভগবানের নিকটস্থ যে সকল আত্মীয় সাধু যোগী ভক্তেরা ব্রহ্মনিকেতনে আছেন, তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে হইবে, নববিধান ইহা গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তিনি নব-বিধানকে অপমান করেন, যিনি বলেন, আমরা মুখে সাধুদিগকে সম্মান দিব, কিন্তু সাধন করিব না। তিনিও নববিধানের শত্রু, যিনি বিদেশীয় সাধুদিগকে গ্রহণ করেন না। নববিধান বলিতেছেন, বারংবার স্বর্গে আরোহণ করিবে। যেমন ভগবান্‌কে হৃদয়ের ভক্তি দিয়া পূজা করিবে, তেমনি ভগবানের আদরের পাত্র-দিগকে সম্মান করিবে। আমরা যোগপথে আরোহণ করিতে চলিলাম। যেমন ব্রহ্মধ্যান করিব, তেমনি যোগবলে ঈশা, মুসা, সুপণ্ডিত সক্রেটিস প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হইব। যেখানে যোগী ঋষিগণ গম্ভীর সমাধিতে মগ্ন, যেখানে জ্ঞানীরা জ্ঞানস্বর্গে, যোগীরা যোগস্বর্গে, ভক্তেরা ভক্তিস্বর্গে, সেখানে যাইব। আমরা তীর্থ মানি। পৃথিবীর তীর্থ হৃদয়ের তৃপ্তিকর হয় না। উৎসবদিনে তীর্থযাত্রা করি। চল, সহযাত্রিগণ, স্বর্গে আরোহণ করি, তাঁহাদিগের প্রেমঘরে গিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ঈশ্বর নেতা, তিনি আমাদিগকে লইয়া যাউন। শূন্যহস্তে, শূন্যমুখে ফিরিব না। স্বর্গস্থ আত্মীয় কুটুম্বেরা ধর্ম্মের অন্ন, প্রেমের অন্ন আমাদিগকে দান করিবেন, তাঁহাদের ধন রত্নের অংশ আমাদিগকে দিবেন। যোগের রথ, বিলম্ব করিও না। পলকের মধ্যে উঠিবে। হয় পলকে যাইবে, নতুবা যাইতে পারিবে না। ভক্তি যোগাদি পথের সম্বল লইয়া শীঘ্র রথে আরোহণ কর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাত্রিগণকে, পৃথিবী, বিদায় দাও। আমরা তীর্থভ্রমণ করিতে চলিলাম, মন, উঠিতে থাক। দেখ, ক্রমে ক্রমে পৃথিবী কেমন ছোট হইয়া গেল। এখন অকূল আকাশ-সাগর। কেবল ধূ ধূ করিতেছে আকাশ। চিদাকাশ অতিক্রম করিয়া

ব্রহ্মের শান্তিনিকেতন। সত্যেতে প্রেমেতে উজ্জ্বল এই ঘর। পরব্রহ্ম পরাৎপর, যোগিশ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর, আমাদিগকে তোমার প্রিয় সন্তানদিগের নিকট লইয়া যাও। তোমার প্রিয় পুত্র ঈশা ইচ্ছাযোগে তোমার সঙ্গে এক হইয়া যোগ সাধন করিয়াছিলেন। উঁহার ভবনে কি আছে, আমাদিগকে দেখিতে দেও। ঈশাকে আমার চক্ষের নিকট বসাও। ইচ্ছাযোগপ্রধান জীবন যাঁহার, তাঁহাকে দেখাও। এই ঈশার স্বর্গে বসিয়া ঈশামৃত পান করি। ঈশার ইচ্ছাবল বুকের ভিতর রাখি। ঈশার রক্ত, ঈশার তনু আমাদের রক্ত, আমাদের তনু হউক। কি সুন্দর গম্ভীর নিরাকার আধ্যাত্মিক মূর্ত্তি! ভগবান্, তোমার পুত্রকে দেখিলাম, এখন কোথায় যাইব? এখন মূষাকে দেখিব। তিনি তোমার আদেশবাহক, যিহুদী জাতির পরিচালক, তোমার সঙ্গে কথা কহিতেন। মূষা ধর্ম্মনিয়মপরতন্ত্র ছিলেন। মূষা অতি প্রাচীন গম্ভীরপ্রকৃতি। আমাদের ভিতরে তিনি কঠিন নীতিপরায়ণতা দেখাইয়া দিন।

"উপাধ্যায় মহামতি সক্রেটিস, অতি সুপণ্ডিত। গ্রীক জাতিকে তিনি জ্ঞানে উজ্জ্বল করিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যানুরাগী. অকাতরে সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানকে আমাদের মধ্যে আনিয়া দেও। জ্ঞানী হইলেও যে সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক হওয়া যায়, তিনি শিক্ষা দিন। আহা, এমন বিদ্বান্ হইয়াও বিনীত, কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই!

"বুদ্ধদেব, নির্ব্বাণ। ইহার সকলই নির্ব্বাণ। কেবল 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।' ইনি সকল মায়া মমতা জয় করিলেন, গাছের তলায় বসিয়া বৈরাগ্য সাধন করিলেন। কোথা গেল রাজসংসার সুখ বিলাস? একেবারে জীবন পর্য্যন্ত ইনি উড়াইয়া দিলেন। কেবল নির্ব্বাণজলে সকল আগুন নিবাইলেন। কে আমাদের কুবাসনা-অগ্নি নিবাইবে? স্বর্গে কত রকমেরই সাধু আছেন!

"এ দিকে মহম্মদ একেশ্বরবাদ সাধন করিবার জন্য রহিয়াছেন। পাঁচ বার প্রতি দিন এক ভগবানের আরাধনা, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইহার মূল মন্ত্র, পৌত্তলিকতার পূর্ণ বিনাশ।

"হিন্দু আর্য্যযোগিগণ স্বর্গে এক একটি কুটির বাঁধিয়া আছেন। ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ইহারা আনন্দস্বরূপে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। কেহ সূর্য্যকে হস্তে লইয়াছেন, কেহ আকাশকে সাধন করিতেছেন। ঋষিগণ সকল প্রকার চিন্তা

পরিত্যাগ করিয়া যোগ সাধন করিতেছেন। স্বর্গে উচ্চ হিমালয়ে বসিয়া যোগে নিমগ্ন। ভগবন্, তোমার ভক্তদিগের যে সকল সুন্দর আলয় আছে, সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাও। আমরা পৃথিবীর মলিন স্থানে থাকিয়া কষ্ট দুঃখে কাতর হইয়াছি, ভক্তগণের প্রেমমুখচন্দ্র দেখিব।

"দেখাও একবার, মা, তোমার সুন্দর সন্তানদিগকে দেখাও। হে করুণাময়ি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার সন্তানদিগকে লইয়া বস, আমরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া শুদ্ধ ও সুখী হই।"

ব্যক্তিগত প্রার্থনা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনান্তে সায়ং উপাসনায় 'ঈশ্বরের নবীনত্ব' বিষয়ে উপদেশ

"দুই জন সাধক মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মনিবেদন ও প্রার্থনা করিলে, বালকগণ মধুর স্বরে সঙ্গীত করে। সায়ংকাল উপস্থিত। বেদীর সম্মুখে আনন্দোন্মত্ত ভক্তগণ গভীর নিনাদে সংগীত আরম্ভ করেন। উৎসবে এ দৃশ্য যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি কোন কালে বিস্মৃত হইবেন না। সঙ্কীর্ত্তনের প্রমত্ত উৎসাহানন্দে অবোধ বালকগণ মত্ত হয়, প্রেমিকেরতো কথাই নাই। সঙ্কীর্ত্তনানন্তর সায়ংকালের উপাসনা হয়। উপদেশে আচার্য্য নববিধানের ঈশ্বরের নবীনত্ব প্রদর্শন করেন। যিনি পুরাতন ব্রহ্ম, তিনি কি প্রকারে নবীন হইবেন? এ ঈশ্বর এবং সে কালের ঈশ্বর কি এক নহেন? কালে কালে কি ঈশ্বরেরও পরিবর্ত্তন হয়? সকল সম্প্রদায় কি এক ঈশ্বরের পূজা করেন না? এ সকল প্রশ্নের উত্তর কি? উত্তর এই, ঈশ্বর অপরিবর্ত্তনশীল এক, কিন্তু সাধকের অবস্থাভেদে দর্শনের তারতম্য হয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের দর্শনের তারতম্য আছে, এবং সেই দর্শনের তারতম্যে তাঁহারা ঈশ্বরকেও ভিন্নরূপে দর্শন করেন। এক বৃহৎ বস্তুর একাংশ দর্শন করিলে দর্শন হয় বটে, কিন্তু সেই অংশই যে সেই বস্তু, কে বলিবে? আংশিক দর্শনকারিগণের মধ্যে এই প্রকারে ভিন্নতা উপস্থিত হয় এবং ঠিক বস্তু-দর্শন ঘটে না। নববিধানে নবীন আকারে আমাদিগের নিকট ঈশ্বর প্রকাশিত। তাঁহার আর সে আংশিকরূপ নাই, এখন তিনি পূর্ণভাবে প্রকাশমান।" *

---

* দ্রষ্টব্য—অধ্যায় শেষে একটা বিশেষ বক্তব্য আছে। পূর্ব্বসংস্করণে ভাদ্রোৎসবের তারিখ ৬ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) ভুল আছে। ৬ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট), ২৮শে আগষ্ট (১৩ই ভাদ্র) হয়। এখন কোন্‌টা ঠিক? 'নববিধানে' ২৮শে আগষ্ট, ১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে (১৬৮ পৃঃ)

১৭

কেশবচন্দ্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

সিমলা হইতে ভাই প্রতাপচন্দ্রের পত্রোত্তরে প্রধানাচার্য্যের কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে সমুচ্চভাব

এই সময়ে (৯ই আগষ্ট, ১৮৮১ খৃঃ) ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সিমলা হইতে প্রধানাচার্য্য মহাশয়কে একখানি পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি গত দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং যাহাতে পুনরায় পূর্ব্ববৎ মিলন সাধিত হয়, তজ্জন্য বিনীত প্রার্থনা করেন। এই পত্রের উত্তরে, ধর্ম্মপিতা যে পত্র লিখেন, তাহার এই অংশ ১৮০৩ শকের ১লা ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয় :—"………এক্ষণে ব্রহ্মানন্দের কথা কি বলিব ? তাঁহার কথা, তাঁহার প্রসঙ্গতো লোকের জল্পনা হইয়াছে। তাঁহাকে স্তুতিই করুক, আর নিন্দাই করুক, তাঁহার নাম না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করে না। কেহ বা তাঁহাকে আদর করিতেছে, কেহ বা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে। তিনি মান অপমানে, স্তুতি নিন্দাতে অটল থাকিয়া, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছেন। তিনি রাজভবনে, তিনি দরিদ্রের কুটিরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। যত ক্ষণ তিনি তাঁহার (ঈশ্বরের) ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করেন, তত ক্ষণ তাঁহার জীবন। সেই ধর্ম্মের জন্য মরণও তাঁহার আদরণীয়। মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রতাপ, অথচ প্রসন্নতা,

---

১৩ই ভাদ্র ভাদ্রোৎসবের উল্লেখ আছে। ১২ই ভাদ্র মুদ্রিত ১লা ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে (১৮০ পৃঃ) 'আগামী রবিবার ভাদ্রোৎসব' এই কথাতে, ১লা ভাদ্রের পর ৬ই এবং ১২ই ভাদ্রের পর ১৩ই দুই রবিবারই বুঝা যায়। ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে (১৯০ পৃঃ) ৭ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) সোমবার আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দৃষ্টে এবং সাবিত্রীদেবী প্রণীত কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের জীবনীর ১৩ পৃষ্ঠা দৃষ্টে, সাবিত্রী দেবীর ও আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের পরে, ১৩ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) রবিবারই ভাদ্রোৎসবের দিন মনে হয়। 'আচার্য্যের উপদেশ' (১৯২০ খৃঃ, সংস্করণ) ১০ম খণ্ডের ৩৫০ পৃষ্ঠায় ভাদ্রোৎসবের তারিখ কিন্তু ৬ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) দৃষ্ট হয়। এই সংস্করণে ভাদ্রোৎসব ৬ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) রবিবার, আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ ১৫ই আগষ্ট (৩২শে শ্রাবণ) সোমবার দেওয়া হইয়াছে। এখন সুধীগণের বিবেচ্য। (সং)

মৃদুতা, নম্রতা, ভগবদ্ভক্তি—তাঁহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাঁহারই প্রতিমা। তাঁহার আপাদমস্তক, তাঁহার পদের উজ্জ্বল নখগুলি অবধি মস্তকের কেশবিন্যাস পর্য্যন্ত, এখনি, এই পত্র লিখিতে লিখিতে, জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যদি কাহারও জন্য আমার প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন হইয়া থাকে, তবে সে তাঁহারই নিমিত্তে। এখন আর সে প্রেমাশ্রু নাই, আমার হৃদয়ের শোণিত এত অল্প হইয়া গিয়াছে যে, তাহা আর চক্ষুর অশ্রুরূপে পরিণত হইতে পারে না। আমার চক্ষুঃ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নতুবা এই পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত। ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার নাগাল পাই না, তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই তৃপ্ত হইয়াছি। তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া, এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদীদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদীদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

মহর্ষির পত্রের অর্থান্তর সম্বন্ধে আলোচনা—(১৮০৩ শকের ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)

ভাই প্রতাপচন্দ্র মিলনসাধনের জন্য যে অনুরোধ করেন, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি লিখিয়াছিলেনঃ—"ইহা অতি কষ্টকল্প; ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই, ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। আমার এমন যে নির্জ্জন পর্ব্বতবাস, এখানেও সেই কোলাহল আসিয়া পঁহুছিয়াছে। কখনো কখনো ব্রহ্মানন্দের এই অভিনব মতে বিরোধী হইয়াও, আমার কথা কহিতে হয়; তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার পক্ষ ও তাঁহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি যে কত আনন্দ লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না।" স্বর্গগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের উৎপীড়নে, এই পত্রের কথাগুলির কোন কোন স্থলে ভক্তিভাজন ধর্ম্মপিতা যে অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কেশবচন্দ্রের প্রতি গভীর স্নেহের উপরে বিন্দুমাত্র কালিমার রেখাপাত হয় নাই; বরং সে গভীর স্নেহ যে তাঁহার হৃদয়ের স্থায়ী ভাব, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। সিমলা পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর, কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার যে

সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে তাঁহার মনে কেশবচন্দ্রের "সরলতা, নম্রতা, সাধুতা ও ধর্ম্মভাবের" প্রতি যে আকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এ পত্র দ্বারা কিছু মাত্র বিচলিত হয় নাই। "কেন যে তাঁহার প্রতি আমার প্রেম অনুধাবিত হয়, তাহার হেতু পাই না", এই কথাগুলিতে কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অহেতুক প্রেমের উল্লেখ নিত্যকালের সম্বন্ধজ্ঞাপক বিনা আর কি হইতে পারে? ঘোরতর মতভেদসত্ত্বেও এ প্রেম যে চির অক্ষুণ্ণ আছে, ইহা কি সামান্য কথা? "কেন যে তাঁহার প্রতি আমার প্রেম অনুধাবিত হয়", এই অংশ লক্ষ্য করিয়া "নববিধানপত্রিকা" লিখিয়াছেন, "সত্যই, যথার্থ অধ্যাত্ম বন্ধুতার রহস্য কেহ বলিতে পারে না। এই পিতা এবং এই পুত্রকে স্বয়ং ঈশ্বর সুমিষ্ট আত্মিক যোগে বান্ধিয়াছেন, এবং যাঁহাদিগকে স্বয়ং ঈশ্বর মিলিত করিয়াছেন, মানুষ কি তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে?" বসু মহাশয়ের পত্রের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, "যখন তিনি কখন গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখন আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্য বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জের্ডোননদীতে জন দি বেপ্‌টাইস্‌টের দ্বারা বেপ্‌টাইস্‌ট হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুসা, যীসা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন—তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে?" খ্রীষ্ট ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের বিমত কিছু নূতন নয়। কেশবচন্দ্র বা তাঁহার বন্ধুগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করেন না। এরূপ স্থলে তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের নাম করিয়া পথে মাতিয়া বেড়ান কি প্রকারে? হরিনামগানকে যদি তিনি "রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান" বলিয়া অধঃকরণ করিয়া থাকেন, উহা তাঁহার আত্মবিস্মৃতিসম্ভূত বলিতে হইবে; কেন না "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওম্" যখন তাঁহার বিদ্বিষ্ট নয়, তখন হরিনাম বিদ্বিষ্ট হইবে কি প্রকারে? যিনি চন্দ্রেতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া, ভাবে বিভোর হইয়া সমস্ত-নিশা-যাপন করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে প্রশান্তসলিলা গঙ্গাতে ব্রহ্মদর্শন কি অসম্ভব? "তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর", যিনি

তরঙ্গায়মান পার্ব্বত্যনদী দর্শন করিতে করিতে অন্তর্য্যামী পুরুষের এই গম্ভীর আদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি কি হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবমানা গঙ্গাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারেন? এই "আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল", ইহা যখন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তখন প্রকৃতির সহিত তাঁহার যোগবন্ধন হয় নাই, একথা কে বলিবে? স্বপ্নে চন্দ্রলোকে মাতৃদর্শন, তাঁহার ভাবপ্রবণ উত্তেজিত মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু জাগ্রদবস্থায় ঋষিগণের উচ্চারিত বেদান্তবাক্যে তাঁহাদের সহিত যোগ কি মহর্ষিসম্বন্ধে কল্পনা? যাউক, এ সব বিচারে নিষ্প্রয়োজন। পত্রের যে অংশটিতে কষ্টকল্পনা করিয়া অর্থান্তর ঘটান হইয়াছে, মনে হইতে পারে, এখন সেইটি আলোচ্য।

"ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে, আমরা নাগাল পাই না", এ কথাগুলির পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে, "যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার আর নাগাল পাই না।" এখানকার 'অভিমান' শব্দটি অপ্রিয়, এ জন্য পূর্ব্ব পত্রে উহা স্থান পায় নাই, ইহা সত্য; কিন্তু ভক্তির আতিশয্য হইতে যে সকল ব্যাপার উপস্থিত হয়, সেগুলি যে অভিমানমূলক, উহা কোন্ বেদান্তবাদীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না? প্রধানাচার্য্য যখন একমাত্র বেদান্তের পক্ষপাতী, তখন স্পষ্ট কথায় এ শব্দ উচ্চারণ করুন, আর না করুন, "ইহা অতি কষ্টকল্প" ইত্যাদি পূর্ব্ব পত্রের বাক্যমধ্যে যে উহা লুক্কায়িত ছিল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই অভিমানশব্দসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক) লিখিয়াছেন,—"'অভিমান' শব্দের অর্থ সাধারণে যে প্রকার মন্দ অর্থে গ্রহণ করে, আমরা সেরূপ মন্দ অর্থে সকল স্থানে গ্রহণ করি না। বিদ্বিষ্ট বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দপর্য্যায় আমরা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। তাঁহারা অভিমানশব্দ দাসাভিমানাদি উৎকৃষ্ট অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ এ অভিমানশব্দ বেদান্তিগণের নিপীড়নে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অভিমানমাত্রই বেদান্তিগণের দ্বেষ্য, কিন্তু 'আমি দাস' ইত্যাদি অভিমান ভক্তগণের হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন। ব্রহ্মানন্দজীর মনে দাসাভিমান অত্যন্ত প্রবল। 'অসাধারণ উদার প্রেম' দিয়া তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সর্ব্বসমন্বয়ে

স্বয়ং নিযুক্ত করিয়াছেন, এ অভিমান তাঁহাতে অত্যন্ত প্রবল। এই অভিমান তাঁহাকে 'এত উচ্চ পদবীতে' উঠাইয়াছে যে, অনেকে তাঁহার 'নাগাল' পান না। বেদান্তানুসরণাভিমানী প্রধানাচার্য্যমহাশয়েরও 'অভিমান'শব্দের ঈদৃশ অর্থ অভিপ্রেত, অন্যথা অভিমানে উচ্চপদবী-লাভ অসম্ভব।" ধর্ম্মতত্ত্বে যখন এই কথাগুলি লিখিত হইয়াছিল, তখন "মহর্ষির আত্মজীবনী" প্রচারিত হয় নাই। মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে, ঈশ্বর উপাস্য, তিনি উপাসক, এ অভিমান আছে, এবং এই অভিমান হইতে কি কি মহাব্যাপার তাঁহার জীবন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা ঐ জীবনী বিলক্ষণ দেখাইয়া দেয়। ঈশ্বরের অনুগত ভৃত্য হইলে, উপাসকগণের আচরণে ও কথায় কি প্রকার অভিমান প্রকাশ পায়, কোন এক জন বেদান্তী যদি ঐ জীবনী পাঠ করেন, তন্ন তন্ন করিয়া তাহা দেখাইয়া দিতে পারেন। সুতরাং এক 'অভিমান' শব্দ লইয়া বিচার করত, পিতা-পুত্রের মধ্যে ঘোর বিরোধ ঘটান কিছুতেই শ্রেয়স্কর নহে। উভয়ের সদ্ভাব যে কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহার নিদর্শনস্বরূপ "মহর্ষির আত্মজীবনীর" পরিশিষ্ট হইতে নিম্নলিখিত পত্রগুলি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

কেশবচন্দ্রের পত্র

"হিমালয়, দারজিলিং,
৭ই জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ।

"ভক্তিভাজন মহর্ষি,

"হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন 'ব্রহ্মানন্দ' নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয়, তদপেক্ষা অধিক ধন মনুষ্যের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আরো অধিক শান্তি ও আনন্দ তাঁহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি আনন্দময়; হরি কি সুধাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে, আর কি দুঃখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার

মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন"।

মহর্ষির প্রত্যুত্তর

"আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ !

"৩০শে আষাঢ়ের (১৮০৪ শক) প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরোনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে, সত্য সত্য তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্যমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি, এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ্ আফশোষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "কাহাকেও এমন পাই না যে, আমার কথায় সায় দেয়।" তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মস্ত হয়ে উঠ্ত, আর খুসী হয়ে বল্‌তে থাকিত—"কি মস্তি জানি না যে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।" তোমাকে আমি কবে 'ব্রহ্মানন্দ' নাম দিয়াছি, এখনো তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগ-বন্ধন হইয়াছিল; নানাপ্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন—সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। "তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা;" সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা।

সেখানে প্রেম সমান—উচু নিচুর কোন খিরকিচ্ নাই। ইতি ২রা শ্রাবণ, ৫৩ ব্রাঃ সং (১৮০৪ শক) (১৭ই জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

তোমার অনুরাগী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।
মসূরী পর্ব্বত।"

কেশবচন্দ্রের পত্র

"তারাভিউ, শিমলা,
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ।

"পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম।

"গত বর্ষে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শুনিলাম, আপনার শরীর অসুস্থ। ইচ্ছা হয়, নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ সেবা করি। বহু দিন হইতে এই ইচ্ছা, ইহা কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই? হৃদয়ের যোগ, আত্মার যোগ তো আছেই, তথাপি মন চায় যে, শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করে। যদি প্রেমময়ের অভিপ্রায় হয় যে, মনের ভাব মনেই থাকিবে, তাহাই হউক। ভারতে সুমধুর মনোহর ব্রহ্মলীলা-দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে। যত দিন যাইতেছে, তত ব্রহ্ম-সূর্য্যের কিরণ ও ব্রহ্ম-চন্দ্রের জ্যোৎস্না অন্তরে বাহিরে দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মনে হয়, পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখন হয় নাই; আমাদের কি সৌভাগ্য, এই সকল আনন্দ-লীলা আমরা পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি, যাহা দেবতাদের লোভের বস্তু। নিরাকারের এমন খেলা, যিনি ভূমা মহান্, তাঁহার এমন সুন্দর প্রকাশ কে বা জানিত, কে বা ভাবিত? এখন তাঁহারই প্রসাদে এ সমুদায় দুঃখী কৃপাপাত্র ভারতবাসীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল। অনাদ্যনন্ত করতলন্যস্ত! হইল কি? হিমালয় আবার জাগিয়া উঠিতেছেন, গঙ্গা ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত নূতন বস্ত্র পরিয়াছেন, চারিদিকে নূতন শোভা! কোথাও গম্ভীর নিনাদে, কোথাও মধুর স্বরে ব্রহ্ম-নাম ঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে আনন্দধ্বনি না করিয়া থাকা যায় না। এ সকল যোগেশ্বরের খেলা, যোগেতেই আনন্দ, যোগেতেই মুক্তি, এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছুই চায় না। আসুন,

গভীর যোগে সেই পুরাতন প্রাণসখার প্রেমরস পান করি ও প্রেমময় নাম গান করি।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী
সেবক শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

মহর্ষির পত্র

"হিমালয় পর্ব্বত
১৪ই আশ্বিন, ব্রাঃ সং ৫৪ (১৮০৫ শক)।
(২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ)

"প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ!

"আর আমি অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছু দিন পরে কিছুই লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই শুভ সময়ে প্রেমসহকারে একটি শ্লোক উপহার দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারং অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ। সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব। ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥'

" 'নিম্নে বসুন্ধরা উর্দ্ধে দেবলোক
সর্ব্বত্র ঘোষিত মহিমা তাঁর।
আনন্দময়ের মঙ্গলস্বরূপ
সকল ভুবন করে প্রচার।'

"তাঁহার প্রসাদে তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা আশ্চর্য্য! তোমার কথা আশ্চর্য্য! তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রহ্মনাম সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক। রসনা যাও, তাঁর নাম প্রচারো—তাঁর আনন্দজনক সুন্দর আনন দেখ রে, নয়ন, সদা দেখ রে।

তোমার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

"পুনশ্চ—এই পত্রের প্রত্যুত্তরে তোমার শারীরিক কুশল-সংবাদ লিখিলে আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইব।"

কেশবচন্দ্রের প্রত্যুত্তর

এই সময়ে কেশবচন্দ্রের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এজন্য তিনি আর হিমালয়ে অবস্থিতি করিতে পারেন না। কানপুরে অবতরণ করিয়া এ-পত্রপ্রাপ্তির পর উহার এই উত্তর দেন :—

"কানপুর
১১ই অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ।

"পিতৃচরণকমলে প্রণাম ও নিবেদন।

"শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ পথে দুই তিন স্থানে থাকিতে হইয়াছিল, এজন্য এখানে আসিতে বিলম্ব হইল। আজ বৃহস্পতিবার, গত সোমবার রাত্রি ২টার সময়ে এখানে পঁহুছিয়াছি। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে আপনার আশীর্ব্বাদপত্র-পাঠে কৃতার্থ হইলাম। শরীর সম্বন্ধে আপনাকে আর কি লিখিব? আপনাকে উদ্বিগ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না। আমার আর সে শরীর নাই, সে বলও নাই। দেহ নিতান্ত রুগ্ন ও ভগ্ন এবং কঠিন রোগে ক্রমে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজ কাল হাকিমের মতে চলিতেছি। এ সকলই তাঁহার ভৌতিক খেলা, তাঁহার দিকে প্রাণকে টানিবার গূঢ় প্রেম-কৌশল। কিছু বুঝিতে পারি না, কেবল মঙ্গলময়ের সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি। যোগানন্দের উদ্যান অতি মনোহর, সেখানে আপনার সুন্দর হাফেজ-পক্ষী থাকেন। জীবনে অনেক কষ্ট ও পরীক্ষা, চির দিন এইরূপ, আপনি তো জানেন। কিন্তু এই রোগ শোকের মধ্যে আপনার সেই সত্য শিব সুন্দর! কাল ঘন অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রেমানন্দের আলোক! এ দীনের প্রতি বিশ্বনাথের যথেষ্ট কৃপা। আর কি বলিব? স্নেহ-উপহারের জন্য বার বার ধন্যবাদ করি। যদি নিতান্ত কষ্টকর না হয়, সময়ে সময়ে হস্তাক্ষর পাইলে বাধিত হইব। অন্যথা হৃদয়ে রাখিবেন।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

১৮

বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক নববিধান কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে

কেশবচন্দ্রকে আমেরিকার রেঃ, ই, এল্, রেক্সফোর্ডের সন্তোষ-ও-কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র

আমেরিকার মিসিগান হইতে, রেবারেণ্ড ই, এল্, রেক্সফোর্ড কেশবচন্দ্রকে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে যে পত্র লেখেন, নিম্নে উহার অনুবাদ দেওয়া গেল:—

"মহাসম্ভ্রান্ত মহোদয়!—ধর্ম্মের নামে আপনি পৃথিবীর নিকটে যে অত্যুচ্চ ভাব প্রেরণ করিতেছেন, তজ্জন্য স্বাগতসম্ভাষণবাক্য এবং হৃদয়ের ধন্যবাদ আমায় প্রেরণ করিতে দিন। কলিকাতাতে আপনার মহদ্ভাবাপন্ন বক্তৃতা ('আমরা নববিধানের প্রেরিত') নিউইয়র্কের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকা-যোগে আমেরিকার অনেকগুলি পাঠকের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছে, এবং উহার ভিতরে যে সকল মূলতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহার সার সত্যত্ব আমার মনে এমনই মুদ্রিত হইয়াছে যে, আমার এই আনন্দের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, পূর্ব্বে যেমন পূর্ব্বদেশ পৃথিবীসন্নিধানে বহুবার শুভ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে, এবারও তৎকর্ত্তৃক তাদৃশ সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। আমার ইহাই প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনি খ্রীষ্টধর্ম্মের সেই মূল বিধি ঘোষণা করিয়াছেন, যে বিধি হৃদয়ঙ্গম করিবার অসামর্থ্যনিবন্ধন, কতকগুলি অজ্ঞানতা-মূলক ব্যাখ্যানে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিধি, এ বলিয়া আমি কিছু বিশেষ মনে করিতেছি না। খাটি সত্যধর্ম্মের বিধি বলিয়া আমি গৌরবানুভব করিতেছি এবং আপনাকে ধন্যবাদ দান করিতেছি। আপনার ইংলণ্ডে আগমনের সময় হইতে বিশেষভাবে আপনার কার্য্যে আমার অতিমাত্র মনোভিনিবেশ হইয়াছে এবং আমি অভিলাষ করি, আপনি ঈশ্বরকৃপায় কৃতকৃত্য হউন।

"যে কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করে, সে নরকস্থ হয়, প্রাচীন রক্ষণশীল মণ্ডলীর এই মতের বিরোধে এদেশের উদারমণ্ডলী সংগ্রাম করিতেছেন।

যাহা হউক, এই বিশ্বাস দিন দিন গভীর হইতেছে যে, 'যে কোন দেশের যে কোন ব্যক্তি সাধু কার্য্য করে, সেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।' আপনি যে এই আশীর্ব্বচনযুক্ত শুভসংবাদ ঘোষণা করিতেছেন, এজন্য আমি আপনার স্বাগত-সম্ভাষণ করিতেছি। অকারণ ঈশাকে অস্বীকার এবং তৎপ্রতি কতকটা বিরোধিভাবপোষণ, মেস্তর বইসির এই দুই ভাবের বিরোধে আপনি সম্প্রতি তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমি সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ হইয়াছি। এক জন শৈশব হইতে খ্রীষ্টান না হইয়াও খ্রীষ্টধর্ম্মের আচার্য্যাভিমানী ব্যক্তিকে খ্রীষ্টের প্রতি সম্মান করিতে বলিতেছেন, এ অতি তীব্র ভর্ৎসনা। আমি এদেশে কিন্তু দেখিতে পাইয়াছি, যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের ঘোরতর বিরোধী, তাঁহারাই উহার উপদেষ্টা। তাঁহারা যখন উপদেষ্টা ছিলেন, তখনও যেমন অযৌক্তিক ছিলেন, এখন উপদেষ্টৃত্ব ত্যাগ করিয়াও তেমনি অযৌক্তিক। এ সকল বাক্যের মধ্যে আপনার 'যোজক অব্যয়ই' একটী কুঞ্চিকা। চিত্তের অভিনিবেশ উহার একটী 'এবং' সেইটী উহার অপরটী, যদ্দ্বারা পৃথিবীর রক্ষা ও পরিত্রাণ হইবে। আমি আমার উপাসকমণ্ডলীকে যে উপদেশ দিয়াছি, সেটি আপনার নিকটে প্রেরণ করিবার অধিকার গ্রহণ করিতেছি, আমায় ক্ষমা করিবেন। ইহা আপনার ব্যাখ্যা আপনিই করিবে। আমার উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ ইহার অনুমোদন করিয়াছেন, ইহা জানিতে পাইয়া আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। এই ইউনাইটেড ষ্টেটে (মিলিতরাজ্যে) ইউনিবার্সালিষ্ট (সার্ব্বজনীন-পরিত্রাণবাদী) নামে প্রসিদ্ধ প্রায় সহস্রসংখ্যক যে উপাসকমণ্ডলী আছে, আমার উপাসকমণ্ডলী তাহারই একটী। (অন্যান্য মণ্ডলী হইতে) ইহার প্রধান প্রভেদ এই যে, সকল মানুষই ভাই, সকল আত্মারই ঈশ্বর পিতা, এবং চিরদিনই তাহাদের পিতা থাকিবেন এবং অন্তে ভবিষ্যতে পবিত্রতা ও সুখ সকলকেই অর্পণ করিবেন। আপনি যাহা করিতেছেন, তন্মধ্যে একতার মহাবিধানের প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতেছি এবং এজন্যই আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

সমধিক সম্ভ্রমের সহিত
আপনার বাধ্য ভৃত্য
ই, এল্, রেক্সফোর্ড, ডিট্রয়ট্
মিসিগান, আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্।"

২৩শে মে,
১৮৮১ খৃঃ।

কেশবচন্দ্রের প্রত্যুত্তর

কেশবচন্দ্র এই পত্রের যে উত্তর দেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল :—

"সম্ভ্রান্ত বন্ধু এবং ভ্রাতা,

"সেই দূর দেশ হইতে আপনি যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, উহা যে কত আনন্দ ও অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলাম, কথায় তাহা ঠিক ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না। আপনার সস্নেহ সম্ভাষণ এবং সহৃদয় সহানুভূতি অতীব উৎসাহজনক। অধিকন্তু আপনি যেমন অনুভব করেন, তেমনি যাঁহারা অনুভব করেন, তাদৃশ সহস্র ব্যক্তির পক্ষ হইয়া আপনি যখন কথা কহিতেছেন, তখন আপনার এ সকল কথার বিশেষ মূল্য। যে ভগবানের মঙ্গল কার্য্য করিতে আমি আহূত হইয়াছি এ সকল কথা সে কার্য্যে আমার হস্তকে দৃঢ় এবং হৃদয়কে উৎফুল্ল না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই উদার উন্নত চিন্তাশীল আমেরিকা প্রদেশে যদি আপনার উপাসকমণ্ডলীর ন্যায় সহস্রসংখ্যক উপাসকমণ্ডলী থাকেন, যাঁহারা সকলেই 'ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব' স্বীকার করেন এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে যথার্থ বিশ্বাসী আছেন, তাঁহাকে সহযোগিত্বের দক্ষিণহস্তদানে প্রস্তুত, তাহা হইলে এটি একটি আশা-ও-আশ্বস্ততা-উদ্দীপক এবং পৃথিবীর ভবিষ্যদ্-ধর্ম্মসম্পর্কে অত্যুৎসাহকর বাস্তবিক ঘটনা। ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে এতগুলি আশাপূর্ণ কার্য্যনিরত লোক লইয়া যথাসময়ে প্রচুর শস্য হইবে, এ সম্বন্ধে আমরা আনন্দের সহিত অবশ্য প্রতীক্ষা করিব। প্রত্যেক নরনারী নির্ভয়ে সাধুতাসহকারে উৎসাহপূর্ব্বক অথচ বিনয়ে ও প্রার্থিভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্য করুন, পূর্ণ সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রভু তাঁহার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন। ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ অনুগ্রহ ও জীবন্ত দেবশ্বসিতসম্পৎ প্রচুর। আমাদের চারিদিকে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তন্মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বর ও বিধাতা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংশয় ও অবিশ্বাস খণ্ডন করিতেছেন। আমরা দেখি, আর বিশ্বাস করি। যে নূতন শুভসংবাদ আমাদিগকে সত্য, আনন্দ এবং পবিত্রতা দান করিতেছে, উহার প্রমাণ মৃত পুস্তক বা জীবনহীন শ্রুতিপরম্পরা নহে, কিন্তু সচেতন আত্মাগুলির সাক্ষাৎ উপলব্ধি। শত শত বর্ষ যাবৎ যে গভীর অন্ধকার এই দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, সেই

অন্ধকারমধ্যে নববিধান জলন্ত অগ্নিসদৃশ। আমেরিকাবাসী আমাদের সেই সকল ভ্রাতার সহিত সৌহার্দ্দপূর্ণ গভীর হইতে গভীরতাপ্রাপ্ত সহযোগিতায় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ঐক্যসাধন আমি কত অভিলাষ করি। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আপনার উপাসকমণ্ডলীকে আমার প্রীতি অর্পণ করিবেন, এবং তাঁহাদিগকে নিশ্চয়াত্মক বাক্য জ্ঞাপন করিবেন, আমি তাঁহাদিগের সহানুভব অতি মূল্যবান্ মনে করি? ঈশ্বর তাঁহার ভাবিমণ্ডলীগঠনের জন্য আমেরিকা এবং ভারতবর্ষকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে, সহযোগিত্বে অধিক অধিকতর মিলিত করুন।

"আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি আমার বন্ধু ও সহযোগিগণকে এত দূর উৎসুকচিত্ত করিয়াছিল যে, নববিধান-পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আপনার উপদেশও 'সণ্ডেমিরার পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছে।

"ঈশ্বর-প্রেমে চিরদিনের জন্য আপনার
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

ডবলিউ নাইটনের 'কণ্টেম্পোরারি রিবিউতে' 'ব্রাহ্মসমাজের নূতন উদ্দেশ্য' নামে প্রবন্ধ

এই সময়ে প্রখ্যাতনামা কার্লাইলের বন্ধু ডবলিউ নাইটন্ "কণ্টেম্পোরারি রিবিউতে" "ব্রাহ্মসমাজের নূতন উদ্দেশ্য" এই শিরোনামে একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বিদেশী হইয়াও প্রশস্তহৃদয়বশতঃ কি প্রকার নববিধানের ভাব পরিগ্রহ করিয়াছেন। কার্লাইলের বন্ধুর পক্ষে ইহা যে স্বাভাবিক, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উচ্চতম উন্মেষ, পবিত্রাত্মার বিধান, সমুদায় বিধানকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য উহা সমাগত, খ্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ঐশ্বরিক ভাবের অবতার, নববিধানের প্রেরিতগণ খ্রীষ্টের প্রেরিত, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের প্রেরক নহেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রেরিত, মহাজনগণের সহিত যোগ, এ যোগ কোন প্রকার কুসংস্কারমূলক নহে, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, ভারতে খণ্ডখণ্ডভাবে গৃহীত ঈশ্বরকে অখণ্ডভাবে এবং মাতৃভাবে গ্রহণ, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন বিধানের সামঞ্জস্যপ্রদর্শন, পাপ ও পুণ্যের ফল ও পুরস্কার, অনন্ত উন্নতি, ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তন, ইচ্ছানুবর্ত্তনে কন্যাদান, নববিধান স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রিয়া, বিবিধ অনুষ্ঠান, দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন, ইত্যাদি বিষয়গুলি

তিনি অতি বিশদভাবে স্বদেশীয়গণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিনা প্রমাণে তিনি একটি কথাও লিখেন নাই, সুতরাং তিনি কোন বিষয় অতিরঞ্জিত বা হীন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি এরূপ দোষারোপ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

মিস্ কলেটের 'কণ্টেম্পোরারি রিবিউতে' নাইটনের পত্রের প্রতিবাদ

এই লেখাতে স্বদেশীয়গণের মন কেশবচন্দ্র ও নববিধানের প্রতি যাহাতে অনুকূল না হয়, এজন্য মিস্ কলেট এই পত্রের প্রতিবাদ করিয়া, "কণ্টেম্পোরারি রিবিউতে" পত্র লেখেন। ঈদৃশ প্রতিবাদ যাদৃশ ভাবাপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, সেইরূপই হইয়াছিল, সুতরাং উহার বিস্তৃতবিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

মনিয়র ই নবেলির 'খৃষ্ট কে ?' বক্তৃতার ফরাসী অনুবাদ এবং 'ইবাঞ্জেলিকাল ক্রিষ্টানে' পত্র

মনিয়র ই নবেলি এই সময়ে "খ্রীষ্ট কে ?" এই বক্তৃতা ফরাসিভাষায় অনুবাদ করেন। কেশবচন্দ্রের মতাদি সম্বন্ধে স্বদেশীয়গণকে অভিজ্ঞ করিবার জন্য, 'ইবাঞ্জেলিকাল ক্রিষ্টান' নামক পত্রিকায় যে পত্র লিখেন, তাহাতে এমন অনেক কথা বলেন, যাহাতে বুঝা যায়, কেশবচন্দ্রের প্রভাব কত দূর গিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। নবেলি এবাঞ্জেলিকালভাবাপন্ন প্রোটেষ্টাট খ্রীষ্টান। তিনি যে কেশবচন্দ্রের সকল কথাতেই অনুমোদন করিবেন, ইহা কখন আশা করা যাইতে পারে না। "উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরদর্শন" এ বক্তৃতার মূল কথা যে তিনি অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সময়ের শুভ লক্ষণ বিনা আর কি হইতে পারে ? বিজ্ঞান ঈশ্বরকে দূরস্থ না করিয়া অতিসন্নিহিত করিয়াছে, এ মতের জন্য ইউরোপস্থ বিজ্ঞানবিদ্‌গণাপেক্ষা কেশবচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করা তত আশ্চর্য্য নয়, যত তাঁহার পক্ষে বিজ্ঞানের তাদৃশ সামর্থ্যস্বীকার আশ্চর্য্য। কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান ইহুদী শাস্ত্র হইতে গৃহীত, বেদ হইতে নহে, ইহা শুনিয়া আমরা তাঁহার এদেশের শাস্ত্রানভিজ্ঞতা সহজে বুঝিতে পারি ; কিন্তু এ অনভিজ্ঞতা যদি তাঁহার একার হইত, তাহা হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ ছিল। হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মিলন কোন কালে হইতে পারে না, মিলন হইতে পারে এরূপ মনে করা কেশবচন্দ্রের ভ্রান্তি, ইহা তিনি কেনই বা বলিবেন না ? খ্রীষ্টসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া, অনেক খ্রীষ্টান হইতে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান

বলিয়া গ্রহণ করা উদারতার পরিচয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, কেবল নবেলি নহেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি স্থানের বিদ্বদ্‌গণের মধ্যে কেশবচন্দ্রের মত যে এই সময়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তত্রত্য লোকের মুখে এ কথা শুনিয়া নববিধানের প্রভাবিস্তার এ সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা কথঞ্চিৎ অবধারণ করিতে পারি।

নববিধানের প্রতিকূলতা

কেশবচন্দ্র ও নববিধানের অনুকূলে কে কি বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ যেমন প্রয়োজন, উহার প্রতিকূলে কে কি বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ তেমনি প্রয়োজন। বিগত মাঘোৎসবের বৃত্তান্তমধ্যে (১৬৭৭ পৃঃ) প্রোফেসর মনিয়র উইলিয়ম এবং ভট্ট মোক্ষমূলর টাইম্‌সে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং প্রচারকগণের সভা হইতে (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ) তাহার যে উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, তাহার উল্লেখমাত্র আছে। প্রোফেসর মোক্ষমূলর পরে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে (১৬৪৭—১৬৫১ পৃঃ) যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট; কেন না প্রচারকগণের সভার পত্রে প্রধানতঃ যে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই তদুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রোফেসর মনিয়র উইলিয়মকে প্রচারকগণের সভা হইতে প্রতিবাদপত্র

প্রোফেসর মনিয়র উইলিয়মকে যে পত্র (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ) লিখিত হয়, তাহার একটি অংশের অনুবাদ লিপিবদ্ধ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন; এজন্য এখানে উহারই অনুবাদ করা যাইতেছে:—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ 'কেশবচন্দ্র সেনের অনুবর্ত্তিগণের' একটি সঙ্কীর্ণ দল। ইহারা তাঁহাকে 'মানবাপেক্ষা অধিক জ্ঞানে' শ্রদ্ধা করেন, অভ্রান্ত 'মণ্ডলীর শীর্ষস্থ পোপ' বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করেন, মনে হয়, আপনি এই ভাব পোষণ করেন। প্রচারকগণের সভা সম্পূর্ণরূপে এ ভাবের প্রতিবাদ করিতেছেন। এ কথা সত্য, আমরা তাঁহাকে উচ্চ সম্ভ্রম ও সম্মান দান করি, কারণ বাস্তবিকই আমরা কেবল আচার্য্য বলিয়া নয়, বন্ধু, অভিভাবক এবং যথার্থ উপকারী বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেখি। আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরনিযুক্ত প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত ও নেতা বলিয়া মনে করি; কিন্তু আমরা কি

আমাদিগের নিজেকেও স্ব-স্ব-যথাকথঞ্চিৎ-সাধ্যানুরূপ নববিধানের সাক্ষ্যদানার্থ প্রত্যাদিষ্ট-ঈশ্বরনিযুক্ত-প্রেরিতভাবে দেখি না। আচার্য্যের প্রতি আমাদের ভক্তি ও অনুরাগ যত গভীর হউক না কেন, আমরা যখন ব্রাহ্ম, তখন 'মানবাপেক্ষা অধিক জ্ঞানে' তাঁহাকে পুতুল করিয়া তোলার চিন্তাতেও আমরা কম্পিতমনে পশ্চাৎপদ হই। যে মণ্ডলী ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, এবং যাহার সকল কার্য্য বার্ষিক সাধারণ সভার শাসনাধীন মনোনীত সমিতি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, সে মণ্ডলীতে পোপের আধিপত্যের অপবাদ অস্থানে আরোপিত হইয়াছে। প্রতিকার্য্যকারক যে প্রকার সমাজের দ্বারা মনোনীত হন, আচার্য্যও তেমনি সাধারণের মনোনয়নে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দীর্ঘকাল নেতৃত্বের পদে তিনি যে নিযুক্ত আছেন, উহা কেবল তাঁহার শ্রেষ্ঠ গুণ ও চরিত্রের প্রভূত নৈতিক প্রভাববশতঃ।"

কেশবচন্দ্রকে লিখিত টাইসেনের পত্রের প্রচারকসভা হইতে প্রত্যুত্তর

পুরাতন বন্ধু মেস্তর এ ডি টাইসেন কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লিখেন, তন্মধ্যে প্রকাশ্য মত ও প্রমাণাদির বিরোধে কথা থাকাতে, দরবার হইতে ঐ পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। এই পত্রমধ্যে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, এজন্য আমরা নিম্নে উহার অনুবাদ দিতেছি :—

"ব্রাহ্মপ্রচারকসভা,
৩রা অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ

"এ, ডি, টাইসেন এস্কোয়ার সমীপে—

"প্রিয় মহাশয়,

"আমাদের মাননীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে দুঃখকর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আপনি যে তাঁহার নামে পত্র লিখিয়াছেন, উহার প্রাপ্তিস্বীকার করিবার জন্য ব্রাহ্মপ্রচারক-সভা হইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। এই পত্রে প্রকাশ্য বিষয়, মতঘটিত প্রশ্ন, এবং ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশ্য লিপি এবং প্রকাশ্য বক্তৃতাদির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ আছে; সুতরাং উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য-সহকারে একত্র মিলিত প্রেরিতবর্গের দরবার হইতে উহার উত্তর প্রদত্ত হয়, ইহাই অভিলষণীয় বিবেচিত হইয়াছে।

"সমুদায় মতভেদের সামঞ্জস্যসম্পাদনাভিপ্রায়ে আপনি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আচার্য্যের প্রকাশ্যে দোষস্বীকার এবং আপনার আচরণের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া দেখান সমুচিত 'যে, অহঙ্কারের স্বাভাবিক উত্তেজনায় আপনার ভ্রান্তিতে পড়িয়া থাকা অপেক্ষা, সম্ভ্রমসহকারে বন্ধুর সৎপরামর্শ অনুবর্ত্তন করিতে তিনি কেমন প্রস্তুত। দরবার অভিলাষ করিয়াছেন যে, আমি আপনাকে এই কথা অবগতি করি যে, এরূপ কিছুই করা হইবে না, কেন না ইহা ধর্ম্ম ও নীতির সর্ব্বপ্রথম মূলতত্ত্বের বিরোধী যে, যে ব্যক্তি আপনার যাথার্থিকতাবিষয়ে নিঃসংশয়, সে ব্যক্তি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যাহার দ্বারা ন্যূনতা বা নীচতা স্বীকার করিবেন। যিনি সম্যক্ পরিষ্কার বুঝিতেছেন যে, যে কার্য্য আপনি অযৌক্তিকভাবে কঠোরতাসহকারে দূষণীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন, সে কার্য্য তিনি ঈশ্বরের ভাবে পরিচালিত হইয়া করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের আলোকাপেক্ষা আপনার আদর করিবেন কেন। আচার্য্য সাংসারিক বিষয়ে আপনার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা লাভবান্ হইলে আহ্লাদিত হইবেন এবং শিষ্যের ন্যায় আপনার চরণতলে আহ্লাদের সহিত বসিবেন; কিন্তু যেখানে ঈশ্বর আদেশ করেন এবং আপনি নিষেধ করেন, সেখানে তিনি কি করিবেন, তাহা অতি পরিষ্কার। তাঁহার অন্যায় হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিলে যখন ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে খণ্ডন করা হয়, তখন তিনি উহা কিরূপে করিতে পারেন? তিনি কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করিতে পারেন যে, যে বাণী তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছিল, সে বাণী অসত্য? এক জন পূর্ণ অবিশ্বাসীই কেবল এরূপ গুরুতর আত্মবঞ্চনা করিতে পারে। নিশ্চয়ই আপনি আশা করিতে পারেন না যে, আমাদের মাননীয় আচার্য্য ও বন্ধু ঈশ্বরকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ করিয়া, যে সকল ব্যক্তি দেবনিশ্বসিতকে বঞ্চনা এবং ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব প্রথম শ্রেণীর মিথ্যা বলিয়া শিক্ষা দেয়, তাহাদের অনুবর্ত্তন করিবেন। আমি আপনাকে এ বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল ব্যক্তি যুক্তিকৌশলে তাঁহার বিবেককে নমনশীল করিয়া লইয়া, তাঁহার বিশ্বাসকে বিনাশাধীন করিবার যত্ন করেন, যতদিন হইল, বিরোধ বিতর্ক চলিতেছে, ততদিন হইতে সেই সকল প্রতিবাদকারী বিরোধী ও দোষদর্শীদিগকে প্রলোভয়িতার দলদৃষ্টিতে তিনি

দেখিয়া আসিতেছেন। মনে হয়, যেন তাঁহারা এই কথা বলিতেছেন, 'তুমি লোকপ্রিয়তা, সম্ভ্রম, এমন কি সকল লোকের ভক্তি এবং বহুল অনুগামী লোক পাইবে, এবং আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বলিয়া তোমার সন্নিধানে প্রণত হইব, যদি তুমি তোমার বিশ্বাস ও ঈশ্বরকে অস্বীকার কর এবং প্রকাশ্য-ভাবে আপনাকে মিথ্যাবাদী কর।' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁহার দাসকে এই জাল এবং শঠ প্রলোভয়িতাদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত রাখিয়াছেন। নিন্দা-ঘৃণা-বিদ্রূপের ঘোরতর কোলাহল মধ্যে আচার্য্য পুরুষকারসহকারে তাঁহার হৃদ্গত প্রত্যয়, তাঁহার ঈশ্বর এবং তাঁহার মণ্ডলীকে দোষবিমুক্ত করিয়াছেন। যদি তিনি প্রতিবাদের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণ এই যে, প্রতিবাদকারিগণ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের প্রতিঘাত এবং তাঁহার বিধাতৃত্ব ও দেবশ্বসিত ভগবদবমাননায় অস্বীকার করিবার সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া, তিনি তাঁহাদের প্রতিবাদের কোন সংবাদ লন নাই। তাঁহাদের প্রতিবাদ আর কিছু নয়, ভগবানের ব্যবস্থার প্রতিকূলে মানুষের জ্ঞানাভিমানের অশক্ত দুর্ব্বল প্রতিবাদমাত্র। বিবেকের মধ্য দিয়া পিতার যে আজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছিল, বিনীতভাবে সেইটি সম্পন্ন করিতে গিয়া আচার্য্য বিশ্বস্ত সন্তানের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, সুতরাং ঈশ্বরই তাঁহার বল ও দোষাপনয়ন ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বাসের অবমাননা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবার অধিকার হারাইয়াছিলেন। তাঁহাদের আচার্য্যকে বলা উচিত ছিল, 'আপনি যে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, আমরা তাহা স্বীকার করি, এবং উহার সম্মুখে প্রণত হই। যে জীবন্ত পরমেশ্বর বিবেকের মধ্যদিয়া এই পবিত্র বিষয় আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন, আজ্ঞা করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে উহার অনুমোদন করাইয়া-ছেন। এই গুরুতর রাজ্যসম্পর্কীণ বিবাহনিবন্ধন বিধাতৃনিয়োজিত, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। ইহা ঈশ্বরের ক্রিয়া। কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক কতকগুলি বিষয় আছে, সে গুলির আমরা প্রতিবাদ করি। সে গুলি মানুষের ক্রিয়া, সুতরাং আপনি সে গুলির প্রতিবাদ করেন, আমরাও তেমনি করি।' যদি তাঁহারা এরূপ বলিতেন, নিঃসংশয় তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা হইত। কিন্তু তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন? মনে হয়, তাঁহারা আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,

—'তুমি মিথ্যা বলিতেছ; তোমার ঈশ্বর মিথ্যা বলিতেছেন—তোমার আপনার গর্ব্ব এবং বৃথা কল্পনা সাধারণের উপরে আরোপ করিবার নিমিত্ত তুমি যত্ন করিতেছ। তুমি প্রত্যাদেশ পাইয়াছ বলিতেছ, আমরা তাহা অস্বীকার করি। এ ঘটনার ভিতরে বিধাতার কার্য্য নাই। ঈশ্বর কাহাকেও জামাতা দেন না। পারিবারিক ঘটনার মধ্যে তাঁহার কোন হাত নাই। সুতরাং তোমায় আমরা মিথ্যা কথার দোষে দোষী করিতেছি এবং আমরা তোমায় এবং তোমার ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করি।' ঈদৃশ অবিশ্বাসসূচক ভর্ৎসনাবাক্য কৃপা উদ্দীপন করে, কোন উত্তর পাইবার যোগ্য নয়।

"যদি এ কথা বলা হয় যে, বর্ত্তমান ব্যাপারে ভগবান্ তাঁহার আদেশ যে সকল লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছেন, তাঁহারা সে সকল দেখেন নাই, তাহা হইলে নিশ্চয় উহা তাঁহাদেরই ত্রুটি। বিষয়সমূহের চিরন্তন উপযোগিতা, শৈশবাবস্থ বৃহৎ দেশীয়রাজ্যের রাজ্যসম্পর্কীয় প্রয়োজন, একটি আদর্শ অল্পবয়স্ক রাজকুমারের অনুমোদনযোগ্যতা, মহারাজ্ঞীর প্রতিনিধিগণের নির্ব্বন্ধ-সহকারে প্রস্তাবনা, রাজপরিবারের বিবাহে বিশেষ নিয়মানুবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবনীয়তা, বিধির উপরে ভাবের শ্রেষ্ঠতা, সর্ব্বোপরি সর্ব্বাভিভবনীয় জীবন্ত বিধাতার বিধান, এই সকলেতে প্রত্যেক বিশ্বাসী প্রার্থনাশীল ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুমোদনের ইঙ্গিত স্বীকার করিয়াছিলেন এবং স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, উচ্চতম ব্যবহারোপযোগিতা এবং উচ্চতম আধ্যাত্মিকতা উভয়ই সমভাবে ঈদৃশ বলসহকারে এই বিবাহকে অনুমোদনীয় করিয়াছিল যে, কোন পার্থিব যুক্তি উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারে নাই। আচার্য্য যে ভূমিতে দণ্ডায়মান ছিলেন, সে ভূমিতে তাঁহার প্রতিবাদিগণ দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে সাহস করেন নাই; কিন্তু কেবল তাঁহাদের নিজ নিজ ভ্রান্তি, কল্পনা ও ব্যর্থ অনুমান তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন, এ সকল কোন উচ্চতর নিয়ন্তার নামে উপস্থিত করেন নাই। এরূপ স্থলে ঈশ্বরের ভৃত্য পার্থিবকোলাহলের প্রতি কর্ণপাত করিবেন কি প্রকারে? আপনিও আপনার পত্রে বলিয়াছেন, 'আমায় বিশ্বাস করুন, আমি ঈশ্বর হইতে সংবাদ লাভ করিয়াছি, তিনিই আমায় আপনাকে এই পত্র লিখিতে ও আপনাকে এই কথা বলিতে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনি আপনার কন্যার বিবাহে তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন নাই।'

আপনি এই প্রকার আদেশ ও প্রমাণ পান, ইহা আমাদের অভিলাষ, কারণ তাহা হইলে আপনি ঈশ্বরের নামে কথা কহিতেছেন, এই বলিয়া আপনার নিকটে আমরা প্রণত হইতাম। এই কথাগুলির অব্যবহিত পরেই সাঙ্ঘাতিক 'কিন্তু' শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়া দিতেছে, আপনি বেশ বোঝেন যে, ঈদৃশ প্রেরিত-সমুচিত প্রামাণিকতার অভিমান আপনি করিতে পারেন না। 'কিন্তু সত্যই সাধারণ তত্ত্ব ব্যতীত ঈশ্বর কোন বিশেষ কার্য্যে আদেশ করেন না।' আপনি এই কথা বলিয়া আপনাকে প্রমাণ ও শ্রবণযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার আপনি স্বয়ং অস্বীকার করিতেছেন। কোন একটি বিশেষ কার্য্যে ঈশ্বরের আদেশকে সংশয়াস্পদ করিতে সাহস করিয়া আপনিই আবার বলিতেছেন, এটি যে তাঁহার আদেশ নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর হইতে আপনি কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ পান নাই। আপনার নিজ-কল্পনা-প্রণোদিত অনিয়ত বিকার পৃথিবী কেন গ্রহণ করিবে? আপনার পত্র যদি ঈশ্বরের আজ্ঞা-বা-নিশ্বসিত সম্ভূত না হয়, উহা যদি ঈশ্বরের নয়, কিন্তু কেবল আপনারই মত ও ইচ্ছা প্রকাশ করে, মহাশয়, আপনি আশা করিতে পারেন না যে, যাঁহারা পবিত্রাত্মার পরিচালনায় লেখেন ও বলেন, তাঁহাদের শিক্ষাপেক্ষা আপনার শিক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিবেন।

"ঈশ্বর কোন বিশেষ কার্য্যে আদেশ করেন না, আপনার এ কথার সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ইটি আপনার ব্যক্তিগত মত হইতে পারে, কিন্তু ইটি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মমণ্ডলীর মত নয়। আপনি পরোক্ষব্রহ্মবাদীর এবং আমরা অপরোক্ষ-ব্রহ্মবাদীর পন্থাবলম্বী। পরোক্ষব্রহ্মবাদ বিশেষ বিধাতৃত্বে বিশ্বাস করে না, সুতরাং মানুষকে আপনার বিচারানুসারে কার্য্য করিতে দেয়, এবং সুস্পষ্ট কারণবশতঃ সেইটিকেই তাহারা ঈশ্বরের সাধারণ বিধি বলিয়া থাকে। আমরা ব্রাহ্ম বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর আমাদের উত্থানে উপবেশনে, বিশেষতঃ আমাদের জীবনের সমুদায় গুরুতর ঘটনায় আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান। প্রত্যেক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, যখন তিনি কোন ব্যবসায়াবলম্বন করেন, বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন, দেশসংস্করণকার্য্যের সমৃদ্ধিসাধন করেন, তাঁহার পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেন, দেশভ্রমণে বহির্গত হন, বিদেশীয় কার্য্যক্ষেত্র মনোনীত করেন, গ্রন্থ লিখেন, মনোনয়নব্যাপারে বক্তৃতা দেন, তাঁহার আপনার বা দেশের

কল্যাণসংস্পৃষ্ট অন্যবিধ বিবিধ কার্য্য করেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের পরামর্শে ও চালনায় সে গুলি করিয়া থাকেন। নিজের ভ্রান্ত বিচারশক্তি, নির্ভরের অযোগ্য অনুমান এবং ব্যাখ্যানকৌশল—যে গুলিকে মানুষ ঈশ্বরের সাধারণ শিক্ষা মনে করে, সেই গুলি অবলম্বন করিয়া সে জীবনের গুরুতর বিষয় সকল নির্ব্বাহ করিতে পারে, এরূপ মনে করা দুরন্ত সাহসিকতা।

"আমাদের মতের মধ্যে যিটি অতি প্রধান, আপনি সেইটিকে আক্রমণ করিয়াছেন। নববিধানমণ্ডলী মূলতঃ বিধাতার মণ্ডলী। জীবন্ত পিতাতে বিশ্বাস ইহার প্রাণ। বিশেষ-বিধাতৃত্বের মতের উপরে আপনি যে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। 'সাধারণ নিয়ম' পরোক্ষব্রহ্মবাদের মিথ্যা কল্পনা। দৃশ্য জগৎ এবং অদৃশ্য অধ্যাত্ম জগৎ উভয়-সম্বন্ধেই নিত্যবিদ্যমান পরম দেবতাকে পরিহার করিয়া, স্রষ্টার স্থাপিত 'স্থিরতর নিয়মের' উপরে পরোক্ষব্রহ্মবাদ বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছে। যিনি কেবল স্থিরতর নিয়মাবলম্বনে কার্য্য করেন, তাদৃশ মৃত অনুপস্থিত দেবতাকে কেবল ভক্তিশূন্যহৃদয়ে স্বীকার করা ব্রাহ্মধর্ম্মে অতি হীনতম আকারের বিশ্বাস; বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঈদৃশ হীন ভূমিতে অবতারিত করা ঘোরতর বিপদ। আমরা নববিধানের ব্রাহ্মগণ যখন আমাদের মণ্ডলীর সমগ্র ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিধাতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করি, তখন একটি বিবাহকে কেন দোষার্পণের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হইল। আমাদের প্রতিজনই বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার দৈনিক আহার ও পরিধেয় বিধাতার নিয়োগে উপস্থিত হয়, তাঁহার গৃহ বিধাতার নিয়োগে সমানীত ও নির্ম্মিত হয়, তাঁহার বিপদ ও অভাব তন্নিয়োগেই অপনীত হয়, তাঁহার পুত্র-কন্যাগণের বিবাহ তাঁহারই নিয়োগে নিষ্পন্ন হয়। আমরা বিশ্বাস করি, ব্রিটিষগণের ভারতবর্ষাধিকার বিধাতৃনিয়োজিত, ব্রাহ্মসমাজগঠন যে শিক্ষাপ্রণালীর ফলস্বরূপ, উহাও বিধাতৃ-নিয়োজিত, ভারতবর্ষমধ্যে যে প্রদেশ অতি অগ্রসর, তাহার সঙ্গে একটি অনুন্নতদেশীয় রাজ্যের বিবাহনিবন্ধন বিধাতৃনিয়োজিত, ঈশ্বর পিতৃস্নেহে মানবের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, এ ভাব যে সকল অল্পবিশ্বাসী উপহাস করে, সেই সকল অবিশ্বাসী ধর্ম্মভ্রষ্টগণের সমাজত্যাগ বিধাতৃনিয়োজিত! যে কোন বিষয়ে জীবনরক্ষা পায়, বিপদ্ নিবৃত্ত হয়, আমাদের বা আমাদের দেশের

কল্যাণ বৰ্দ্ধিত হয়, তন্মধ্যে আমরা ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করি। আমাদের প্রেরিত ভাইদিগের ইতিহাস যদি আপনি পাঠ করেন, আপনার নিঃসংশয় প্রত্যয় জন্মিবে যে, দীনগণের ঈশ্বর প্রতিদিন তাঁহাদের নিকটে আসেন, তাঁহাদের দৈনিক আহার দেন, তাঁহাদের অভাব যোগান; ঈশ্বরের পুত্র যে বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এ সকল দ্রব্য তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে', তাঁহাদের জীবন তাহার সাক্ষ্যদান করে।

"আপনার একপত্নীক বিবাহের ভাব দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জাতির সম্বন্ধে খাটে না। রাজকীয় নিবন্ধনপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া কোন ব্যক্তিকে একপত্নীক করা প্রকৃষ্ট নৈতিক উপায় নয়। বলপ্রকাশে নয়, কিন্তু নৈতিকপ্রভাবে সামাজিক অনীতি দমন করা সমুচিত। আচার্য্য এবং আমরা, যাঁহারা হিন্দু-প্রণালীতে বিবাহ করিয়াছি, আমরা সকলেই রাজবিধিতে আবদ্ধ নই, সুতরাং আমরা একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে কি এই নিষ্পন্ন হয় যে, কোন উচ্চতর বিধি আমাদিগকে প্রতিরোধ করে না? আমাদের অন্তঃকরণে যে উচ্চতর নৈতিক বিধি আছে, সেই বিধি কি আমাদিগকে ঈদৃশ অসৎ পন্থা হইতে নিবৃত্ত রাখে নাই?

"আপনার সম্মিলনসাধনের ইচ্ছার সহিত প্রচারকগণের সভা হৃদয়ের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। আমরা সকলেই ঈশ্বরের নিকটে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করি যে, মিলনপথের প্রতিবন্ধক ঈর্ষা, অভিমান, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যেন তিনি অপনয়ন করেন, এবং সকল পক্ষকে ক্ষমা ও প্রেম শিক্ষা দেন। কিন্তু যেখানে শান্তি নাই, সেখানে যেন 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিয়া চিৎকার না করি। সত্য ব্যয় করিয়া যেন আমরা মিলন ক্রয় না করি। যে সকল ব্যক্তি বিধাতৃত্বে, দেবশ্বসিতে অবিশ্বাস করে, তাহারা সরলভাবে অনুতাপ করুক, এবং তাহাদের সংশয় ও মারাত্মক ভ্রম পরিহার করুক, তখন—কিন্তু তৎপূর্ব্বে নয়—সমাজ-ত্যাগী ব্যক্তিগণের স্বধর্ম্মনিরত মণ্ডলীতে প্রত্যাবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর হইবে।

"পরিসমাপ্তিতে আমি এই কথাগুলি যোগ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি যে, গভীর মতভেদসত্ত্বেও আপনি এখানে এবং ইংলণ্ডে উদার ধর্ম্মের পক্ষে যে সকল উপকার করিয়াছেন, আমাদের মণ্ডলী সে সকল বিলক্ষণ অবগত এবং তজ্জন্য উহা চিরকৃতজ্ঞ। আচার্য্যের সম্ভ্রম এবং ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কল্যাণ, সামঞ্জস্য

ও উন্নতি, এ সকল বিষয়ে আপনার যথার্থ সদয় মনোভিনিবেশ আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা উদ্দীপন করে। যাহা হউক, আমি ভিক্ষা করিতেছি যে, আপনি আমাদের মণ্ডলী এবং ইহার নেতার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে সকল প্রকার উদ্বেগ হইতে বিরত হইবেন। আমরা এবং আমাদের আচার্য্য নিন্দা ও নিপীড়ন সহ্য করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তবে আমাদের মণ্ডলী সকল পরীক্ষার ঊর্দ্ধে জয়ী হইয়া উত্থান করিবে, ইহা একান্ত নিশ্চিত কথা। ভাবী বংশ পূর্ণপ্রমুক্তভাবে কুচবিহারবিবাহে ঈশ্বরের ক্রিয়া স্বীকার করিবে এবং যখন সকল প্রকার বিদ্বেষ ও দলাদলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন এ সম্বন্ধে ঠিক সত্য উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইবে। আর একটী কথা। ইহা যেন বেশ পরিষ্কার-রূপে বোঝা হয় যে, আমাদের মণ্ডলী ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, এটী সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা এবং সেই সকল লোকই সত্বর আমাদের দল ছাড়িয়া যাইতেছে, যাহারা বিধাতা এবং পবিত্রাত্মাকে স্বীকার করে না। সমুদায় পৃথিবীও যদি আমাদের বিরুদ্ধে উত্থান করে, আমরা আমাদের মূলসূত্র দৃঢ়াবলম্বন করিয়া থাকিব, আমাদের ঈশ্বরের পার্শ্বে আমরা দণ্ডায়মান থাকিব। আমাদের মণ্ডলী গভীর-নিনাদী কেশরী, উহা কিছুতেই কম্পিত হইবে না।

"বিশ্বস্ততা সহকারে আপনার
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়
ব্রাহ্মপ্রচারকসভার সম্পাদক।"

টাইসেনের প্রচারকসভার পত্রের উত্তর

শ্রীযুক্ত টাইসেন সাহেব এ পত্রের এই উত্তর দেন :—

"৪০ চান্সারি লেন
"লণ্ডন ডবলিউ সি
"সোমবার, ২৪শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ।

"প্রিয় মহাশয়,—এই মাত্র আপনার ৩রা তারিখের অতি বৃহৎ পত্র পাইয়া আপনাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার নিমিত্ত এই পত্র লিখিতেছি। আমাদের মধ্যে অন্ততঃ মতভেদ অতি সুস্পষ্ট। আর এক জন যে কার্য্য করিলে, এক ব্যক্তি অন্যায় মনে করে, সেই ব্যক্তি সে কার্য্য করিতে গিয়া ঈশ্বরের আদেশে

সে কার্য্য করিয়াছে, তাহার পক্ষে এরূপ বিবেচনা করা অন্যায়, আমি ইহাই বলি। আপনি এই কথার প্রতিবাদ করিয়া মনে করেন যে, কেশব—কেশব কেন, যে কোন ব্যক্তি এরূপ ন্যায়তঃ বিবেচনা করিতে পারেন যে, যাদৃশ কার্য্য অপরে করিলে দোষভাজন হয়, সে কার্য্য তিনি আপনি ঈশ্বরের আদেশে করিয়াছেন।

"আমার পত্রের যে অংশ আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে অংশের দ্বিতীয় বাক্যটি অর্থসঙ্কোচ করিতেছে না, কিন্তু প্রথম বাক্যের অর্থের বিস্তৃতি-সাধন করিতেছে। আমি যে কেশবকে পত্র পাঠাইয়াছি, তাহা যে কেবল ঠিক ভাবে পাঠাইয়াছি, এরূপ বিশ্বাস করি, তাহা নয়; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, যখনই ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই আমার মত লোকের তাঁহার মত লোককে পত্রলেখা ঈশ্বরের ইচ্ছাভিমত। আমি বিশ্বাস করি যে, এটি ঈশ্বরের বাণী, কেন না, যে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করা হয়, সে গুলির সঙ্গে ইহার সঙ্গতি আছে। আমি বিশ্বাস করি যে, কেশবের হৃদয়ের যে বাণী তাঁহার কন্যার বিবাহে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিয়াছে, সে বাণী ঈশ্বরের বাণী নয়; কেন না অন্যত্র যাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহার সঙ্গে ইহার সঙ্গতি নাই। 'আমার প্রমাণ কি' এ প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যানের মূল আমি দিলাম, কেশব যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার প্রতিপাদনার্থ কোন প্রমাণ তিনি দেখান নাই। পরিসমাপ্তিতে বলি, আমি পূর্ব্ব পত্র কেশবচন্দ্রকে গোপনে লিখিয়াছিলাম, আর কাহাকেও জানাই নাই। আপনি বা তিনি পত্রাপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা না করিলে, আমি মৌন থাকিব, এবং আপনার পত্র এবং সে পত্রখানিসম্বন্ধেও সেইরূপ মৌনাশ্রয় করিব। আমার যাহা বলিবার, তাহা বলিয়াছি, উহার উত্তর কি, তাহাও শুনিলাম; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার পূর্ব্বে যে বন্ধুতা ছিল, সে বন্ধুতা ভঙ্গ করিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। অপর দিকে কেশবচন্দ্র যদি এই পত্রাপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি উহা ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিতেছি, আমিও উহা ইংলণ্ডে প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। এটি আমি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, কন্যার বিবাহে কেশব যাহা করিয়াছেন, ঈশ্বরের আদেশে তাহা করিয়াছেন, ইহা তিনি আপনি বলিতে সঙ্কুচিত;

তাঁহার পক্ষ হইয়া আর কেহ সে কথা বলে, বিষয়টি চিরদিন এই ভাবে তিনি রাখিয়া দিয়াছেন।

"সত্যতঃ আপনার
এ, ডি, টাইসেন।"

"গৌরগোবিন্দ রায়
"৭৩ অপারসার্কুলার রোড, কলিকাতা।"

টাইসেনের পত্র লক্ষ্য করিয়া 'ঈশ্বরের আদেশ' সম্বন্ধে 'মিরারের' উক্তি

এই পত্র লক্ষ্য করিয়া 'মিরার' লিখিয়াছেন:—"আমরা অল্পদিন পূর্ব্বে মেস্তর টাইসেনের সমীপে ব্রাহ্ম-প্রেরিতগণের সভার পত্র প্রকাশ করিয়াছি। আমরা এখন উহার উত্তর প্রকাশ করিতেছি, উত্তরের উত্তর অপরস্তম্ভে দৃষ্ট হইবে। মেস্তর টাইসেনের পত্র বিচারার্থ কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন ইঙ্গিতে উত্থাপিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজের সহিত বন্ধুভাব রক্ষা করিবার যে তিনি অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দান করি। মতবিরোধসত্ত্বেও ভ্রাতৃত্ব সম্ভব, এইটি, তাঁহার সহানুভূতি যে প্রশস্ত এবং তাঁহার মত যে উদার, তাহার অন্যতর প্রমাণ। মানবে ভিন্নমত হইবেই। সে ব্যক্তিকে ধিক্, যে ব্যক্তি ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে একতাকে প্রীতির সীমা করিয়াছে, মতভেদ হইবামাত্রই সহৃদয় সম্বন্ধ ভগ্ন করিয়া ফেলে। যদি আমাদের মতভেদ হয়, প্রীতির সহিত মতভেদ হউক। এ সংসারে বন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা, মতভেদ হইতে পারে জানিয়াই, একত্র মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু বন্ধুতার অনুরোধে সত্যপরিহার আমাদের পক্ষে সমুচিত নয়। মানুষের প্রতি সম্ভ্রম যেন সত্য ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির ব্যাঘাতকর না হয়। আমাদের সরলভাবে বলিতে হইতেছে যে, ঈশ্বরের আদেশসম্বন্ধে মেস্তর টাইসেনের মত অতীব যুক্তিবিরুদ্ধ, অভিজ্ঞতার বিরোধী, উহার চরম ফল বিপৎকর। বিধাতার প্রতি ভক্তিমান্ প্রার্থনাশীল কোন বিশ্বাসী উহা গ্রহণ করিতে পারেন না। অভিনিবেশসহকারে বিচারে ও সুনিপুণ বিশ্লেষণে মেস্তর টাইসেনের 'ঈশ্বরবাণী' সংসারনিবদ্ধচেতা ব্যক্তিগণের সাংসারিকবুদ্ধির কৌশল বিনা আর কিছুই প্রতীত হয় না। ইহা স্বর্গের আদেশ নয়, কিন্তু ইহা পৃথিবীর পার্থিব বণিক্‌সমুচিত চিন্তাপ্রণালী। ইহা মানুষের বুদ্ধি, ঈশ্বরের আদেশ নয়। ইহা

ঈশ্বরের অনুশাসনের স্থলে মানুষের বুদ্ধির অভিষেক। সর্ব্ববিধ বৌদ্ধ প্রণালীর বিপদ্ এই যে, কি সাংসারিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়ে উহা মানুষকেই নেতা ও গুরু করে। মেস্তর টাইসেনের অনুসারে, আমাদের পক্ষে কেবল সেইটি ঠিক, যেটি অপর দশ জনের পক্ষে ঠিক। ঈশ্বর প্রতিব্যক্তিকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কিছু বলেন না, কিন্তু সকল মানুষ, সকল জাতি, সকল কালের জন্য কতকগুলি সাধারণ নৈতিক বিধি ঘোষণা করেন। এ সকল বিধি কি, মানুষের নিজ বুদ্ধি পরিচালন করিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এইরূপে নৈতিক সাধারণ ব্যবস্থা স্থির করিয়া, যখনই যে কার্য্য উপস্থিত হইবে, তাহা ঐ ব্যবস্থার সঙ্গে মিলাইতে হইবে, এবং উহার সঙ্গে মিলিলেই ঈশ্বরের বাণী বলিয়া প্রকাশ করা হইবে। মেস্তর টাইসেন পরিষ্কার বলিয়াছেন :—'আমি বিশ্বাস করি যে, ইটি ঈশ্বরের বাণী, কেন না যে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করা হয়, সে গুলির সঙ্গে ইহার সঙ্গতি আছে।' আমরা এই দূষিত বিপৎকর যুক্তিগ্রহণে সাহসী নহি। এখানে সমগ্র যুক্তিপ্রণালী মানুষের বুদ্ধির, ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের নহে। আমাদের বন্ধু এ কথা বলেন নাই, 'আমি ইহাকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করি, কারণ আমি স্বয়ং শুনিয়াছি'; কিন্তু তিনি এই জন্য বিশ্বাস করিতেছেন যে, তাঁহার আপনার বিচারশক্তি সাধারণ নীতির সহিত উহার সঙ্গতি দেখাইয়া দিয়াছে। এ সকল শক্তি কি অভ্রান্ত ? কোন্‌টি সঙ্গত, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, কি তাঁহার ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে না ? তিনি কি প্রকারে এরূপ মানিয়া লইতে পারেন যে, তিনি আপনার বুদ্ধিতে যাহা সঙ্গত মনে করেন, তাহাই ঈশ্বরের বাণী ? এটি কি তাঁহার আপনার বাণী হইতে পারে না ? এটি বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়ার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত। তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা কি প্রকারে জানিবে ? মেস্তর টাইসেন বলেন, 'যে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করা হয়, সে গুলির সঙ্গে' মিলাইয়া। 'যে গুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার করা হয়', সে গুলি যে যথার্থ ই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহা কি প্রকারে জানিবে ? কে স্বীকার করিয়া লইয়াছে ? আমাদের প্রতিজনের বুদ্ধিতে যাহা ঠিক খাঁটি বলিয়া মনে হয়, নিশ্চয় তাহাকেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া চালাইবার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় এই মতের মধ্যে রহিয়াছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এটি আমাদের আপনার চিন্তা ও

অনুমানেতে ঈশ্বরের নাম ও মুদ্রা যোগ করা। এটি জাল ও মিথ্যা কথন। স্বর্গ ও পৃথিবীর যেমন প্রভেদ, দেবশ্বসিত ও মানুষের বিচারমধ্যে তেমনি প্রভেদ। আমাদের অন্তঃকরণের গভীর প্রদেশ উচ্ছ্বসিত, সঞ্জীবিত, তাড়িতসংযুক্ত করিয়া, মানুষ যে প্রকার কদাপি কহিতে পারে না, সেইরূপ কথা কহিয়া, ঊর্দ্ধ হইতে সমাগত শক্তির আকারে ঈশ্বরের আদেশ আমাদের নিকটে সমাগত হইয়া থাকে। মানুষের বুদ্ধি নিস্তেজ। ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি জীবনশূন্য। ঈশ্বরের বাণী কিন্তু উদ্দাম অগ্নি, উহা যে কেবল মনকে প্রভাবের অধীন করে, তাহা নহে, ভ্রান্তি ও পাপকেও দগ্ধ করিয়া ফেলে। উহা কেবল জ্ঞান নয়, কিন্তু শক্তি—মানুষের আত্মার মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের শক্তি। ইটি সেই প্রবল আলোক ও বলের প্লাবন, যাহা সংশয়, অজ্ঞানতা এবং অপবিত্রতা ভাসাইয়া লইয়া যায়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করে, সে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অব্যবহিত ভাবে বিনা বিতর্কে বিনা প্রয়াসে উহা শ্রবণ করে। সত্য তাহার নিকটে তখন তখনই আসে। সে পরসময়ে পরীক্ষা করিতে পারে, মানব-সন্নিধানে বিজ্ঞান, ন্যায়, দর্শন এবং ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রমাণিত করিতে পারে। এগুলি কেবল ঈশ্বরের সত্যের দৃঢ়তা ও প্রামাণিকতা প্রতিপাদন করে, কিন্তু উহারা সত্য প্রকাশ করে না। মানবজাতির বিচারকার্কশ্যবিমুক্ত সহজ অযত্নসম্ভূত অন্তঃকরণ স্বর্গের বাণী ধরিয়া ফেলে। যদি আমরা ইচ্ছা করি, তৎপরে উহাকে পর্য্যবেক্ষণের বিষয় করিতে পারি। উহা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে।"

কুচবিহার বিবাহে 'দেবনিঃশ্বসিত' সম্বন্ধে মন্‌কিয়র ডি কন্‌ওয়ের প্রতিবাদ

মন্‌কিয়র ডি কন্‌ওয়ে নববিধানের অনুকূলে কি বলিয়াছিলেন, আমরা পূর্ব্বে (১৭০০ পৃঃ) তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মেস্তর টাইসেনের নামে লিখিত পত্র পাঠ করিয়া, তাঁহাতে কি প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে নিবদ্ধ তাঁহার পত্রের অনুবাদে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইবে:—

" 'রবিবাসরীয় মিরার' সম্পাদক সমীপে।

"মহাশয়,—যে সকল ঘটনা লইয়া আপনাদের ব্রাহ্মসমাজের শাখার উপরে কঠোর দোষোদ্ঘাটন হইয়াছে, সাউথপ্লেস চ্যাপেলের একটী বক্তৃতায় আমি সেই সকল ঘটনার অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম; অধিক দিন হইল না, উহা

২২৭

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যেগুলি আমার নিকটে কুসংস্কার এবং ধর্ম্মোন্মত্ততা বলিয়া প্রতীত হয়, সেই গুলিতে সেই সময় হইতে আমি অতি দুঃখের সহিত নামধারী নববিধানের উন্নতি দেখিতেছি। এই নূতন ব্যাপার,—খ্রীষ্টজগতের উপরে যে কুসংস্কারগুলি অনেক দিন হইল আধিপত্য করিতেছে, সে গুলির সঙ্গে, আমার প্রতীতি হয়, প্রাচীন হিন্দুগণের কুসংস্কারের ভাব—পুনর্গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে পূর্ব্বাবস্থা হইতে পরবর্ত্তী অবস্থা আরও অতিমন্দ হইয়াছে। নববিধান হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইতেছে, তন্মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পাই না, যাহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পার্সিধর্ম্ম হইতে শক্তি ও উচ্চতায় নিরতিশয় হীন হইয়া না পড়িয়াছে। আমি আমার লোক-দিগের নিকটে যাহা বলিয়াছিলাম এবং আপনি আপনার পত্রিকায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, এখন আমি তজ্জন্য নিরতিশয় দুঃখিত, এবং আমি জানি, যাঁহারা অনেকে আশা করিয়াছিলেন, আপনার প্রচারিত ধর্ম্ম হীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর অতিক্রম করিবে, তাঁহারাও আমার মত দুঃখ করিতেছেন। এখন আর তাঁহারা—এ এক প্রকারের খ্রীষ্টসম্প্রদায়—ইহা বিনা অন্য কোন ভাবে উহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

"আপনার ৯ই অক্টোবরের পত্রে, লণ্ডনস্থ ভর্ৎসনাকারীর (মেস্তর টাইসেনের) প্রকাশ্য উত্তর যদি এইমাত্র না পড়িতাম, তাহা হইলে, আমি জানি না, হয় তো আশা, এই প্রতিবাদ আরও দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিত। বিবাহঘটিত বাদপ্রতিবাদ আমি তত গ্রাহ্য করি না, কিন্তু ঐ পত্রখানিতে যে দেবশ্বসিত এবং প্রামাণিকত্বের অধিকার গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতেই আমি ভীত হইয়াছি। আমার সম্মুখে পূর্ব্বদেশ হইতে সমাগত এই পত্রখানির পাশে, যে ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট গার্ফিল্ডকে বধ করিয়াছিল, তাহার আত্মবিবরণসংবলিত পত্রিকাখানি রহিয়াছে। ইহাতে গুইটিও বলিয়াছে :—'প্রভুর প্রতি আমার কর্ত্তব্য কি, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই।.........আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাঁহাকে (গার্ফিল্ডকে) সংসার হইতে অপসৃত করিবার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ কর্ত্তৃত্বাধীনে আমি কার্য্য করিতেছিলাম। যতক্ষণ না আমি কার্য্যতঃ তাঁহাকে গুলি করিয়াছিলাম, ততক্ষণ তাঁহাকে বধ করার প্রতিজ্ঞার সময় হইতে আমার উপরে দৈবশক্তির চাপ পড়িয়াছিল।.........এ কার্য্যে যে দেবতার আদেশ,

তৎসম্বন্ধে আমার একটুও সংশয় নাই।............আমি সকল প্রকারের ভাবুকতা ছাড়িয়া দিয়া ঈশ্বরের প্রতি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলাম। এ কার্য্যের ফল আমি সর্ব্বশক্তিমানের হাতে রাখিয়াছি।' প্রচারকগণের সভা দেবশ্বসিতে যে অধিকার স্থাপন করেন, তাহা হইতে গুইটিওর দেবশ্বসিতকে কোন্ সূত্রে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়, আমি জানিতে ইচ্ছা করি। গুইটিও বাইবেলের উপরে ভাষ্য লিখিয়াছে এবং অবিশ্বাসের বিরোধী একজন বক্তা ছিল। এব্রাহিম যখন তাঁহার পুত্রকে বধ করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারই মত সে ব্যক্তিরও, প্রেসিডেণ্টকে বধ করিবার জন্য আপনাকে আদিষ্ট বলিয়া মনে করিবার, স্পষ্টতঃ অধিকার আছে। সে ব্যক্তি পরিষ্কার তেমনি সরল, যেমন এক জন ব্রাহ্ম দেব-পরিচালনায় অধিকার স্থাপন করেন। আমি এটিকে বিপৎকর মত মনে করি, ইটি মূর্ত্তিমান্ অহংবোধ (যেমনই অজ্ঞাতসারে হউক না), আদিম মনুষ্যের উদ্দাম কল্পনা। ইহা সত্য যে, এ কল্পনা এখনও খৃষ্টধর্ম্মে সঞ্জীবিত আছে, কিন্তু এ কেবল 'সঞ্জীবন' মাত্র, প্রাচীনকালের অতিক্ষীণ উত্তরাধিকার মাত্র, খ্রীষ্টানগণের হৃদয়ের উপরে ইহার অল্পই অধিকার আছে, মস্তিষ্কের উপরে তো কিছুই নাই। আমাদিগের নিকটে ইহা অতি আশ্চর্য্য এবং দুঃখকর বলিয়া মনে হয় যে, ইউরোপ বহুকাল হইল, যে কুসংস্কার পরিহার করিয়াছেন, কেবল স্থূলবুদ্ধি মূর্খ মুক্তিফৌজ—যাহারা আমাদের পথে হো হো করিয়া বেড়ায়—তাহাদের মধ্যে বিনা যে কুসংস্কার আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই কুসংস্কার ভারতের ভাল ভাল লোক হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন।

আপনার

মন্‌কিয়র ডি কন্‌ওয়ে

ইঙ্গল উড, রেডফোর্ড পার্ক, ২রা নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ।"

'দেবনিঃশ্বসিতের' প্রামাণিকতা বিষয়ে 'মিরার' পত্রিকার উক্তি

'মিরার' এই পত্র উপলক্ষ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন :—"গুইটিও এবং ঈশ্বরের প্রেরিতবর্গ! তুলনা অতি জুগুপ্সিত এবং ঘৃণার্হ। তবুও এমন সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা এ দুইকে সমভূমিতে আনয়ন করেন,

এবং মনোবিজ্ঞান ও ব্রহ্মবিজ্ঞানসম্ভূত সমান্তরতাস্বীকারের ভাণ করেন। গুইটিও গার্ফিল্ডকে বধ করিয়া সে আপনি বলিয়াছিল যে, এ কার্য্য 'ঈশ্বরের বিশেষ অনুশাসনে' সে করিয়াছিল। নববিধানের প্রেরিতগণ অন্যান্য ঈশ্বরের প্রেরিতগণের ন্যায় ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত ও প্রামাণিকতার অধিকার গ্রহণ করেন। এ জন্যই আমাদের সম্ভ্রমের পাত্র বন্ধু মেস্তর কন্‌ওয়ে বলেন, যাহাকে দেবনিঃশ্বসিত বলা হয়, উহা ভ্রান্তি ও 'উদ্দাম কল্পনা' এবং 'অতিবিপৎকর মত' বলিয়া উহাকে পরিহার করিতে হইবে। মেস্তর কন্‌ওয়ে এ যুক্তি-প্রদর্শনকালে সুস্পষ্ট অনেকের প্রতিনিধির ভাবে বলিয়াছেন। কারণ বর্ত্তমানে এদেশে ও ইংলণ্ডে যাঁহারা ও প্রকার বা অন্য প্রকার বৌদ্ধভাব স্বীকার করেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার ভাব ও মত পোষণ করেন। বৌদ্ধভাবাপন্ন পরোক্ষব্রহ্মবাদ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু দেবশ্বসিত ঘৃণা করে ও অস্বীকার করে এবং ঈশ্বর সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচালিত করেন, এ চিন্তা উহা সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং যে স্থলেই দেবশ্বসিত স্বীকৃত হয়, সে স্থলেই উহা কুসংস্কার বলিয়া নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হয় এবং যে কোন ব্যক্তি দেবানুশাসনপ্রাপ্তির অধিকার গ্রহণ করেন, কোন প্রমাণ বা সন্ধান না লইয়াই তাঁহাকে ভ্রান্ত বিপৎকর ধর্ম্মোন্মত্ত বলিয়া স্থির করা হয়। এই পরোক্ষব্রহ্মবাদীর সম্প্রদায়ের যুক্তিপ্রণালী অত্যন্ত অপক্ক এবং ভ্রমাত্মক ; বিনা অত্যুক্তিতে ইহাকে পরিষ্কার যুক্তিহীনতা বলিয়া লক্ষণাক্রান্ত করিতে পারা যায়। কেন না ইহার অপেক্ষা সমধিক অযৌক্তিক ও উপহাসাস্পদ আর কি হইতে পারে যে, এক জন নরহন্তা গুপ্তঘাতকের দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করা যে, সমুদায় প্রাচীন ও নবীন ঈশ্বরের প্রেরিতগণের মধ্যে একটিকেও বাদ না দিয়া সকলেই নিন্দাস্পদ। ঈশ্বরের আদেশ এই ভ্রান্তজ্ঞানে গুইটিও হত্যা করিয়াছিল, অতএব তাহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জনহিতৈষিগণের মধ্যে যাঁহারা অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, ঈশ্বরের আদেশে মহত্ত্বে ও নিঃস্বার্থভাবে মানবজাতির সেবা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত? গুইটিওর দেবশ্বসিতপ্রাপ্তি পরিষ্কার মিথ্যা, অতএব তাহা হইতে কি আমাদিগকে এই অনুমান করিতে হইবে যে, ইতিহাসে যে কোন দেবশ্বসিতপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত লিখিত আছে, উহা মিথ্যা? এই সকল হত্যাকারী প্রমত্ত লোকদিগকে আমরা ঘৃণা করি, উপহাস করি,

অস্বীকার করি, এই বলিয়া কি আমরা পৃথিবীর সমগ্র সাধু মহাজন ও ধর্ম্মার্থ-নিহত ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করিব? গুইটিও ঈশ্বরের নামে প্রেসিডেণ্ট গার্ফিল্ডকে হত্যা করিল, খ্রীষ্ট নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের নামে ও তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে পৃথিবীকে আপনার জীবন দিলেন। এ দুই দৃষ্টান্ত কি সমান? আমরা গুপ্তহন্তার 'দেবশ্বসিতে' ধিক্কার দান করি, এই বলিয়া কি আমরা ঈশ্বরতনয়ের পবিত্রাত্মার প্রেরণা অস্বীকার করিব? একটি অথাটি দেবশ্বসিতের দৃষ্টান্ত আছে বলিয়া, আমরা সকল দেবশ্বসিতকেই মিথ্যা ও কুসংস্কার বলিয়া কেন উড়াইয়া দিব? এই একই যুক্তিতে আমাদিগকে সত্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, কেন না মিথ্যা অনেক ঈশ্বর পূজিত হইয়াছে। আমাদিগকে পরলোকেও অবিশ্বাস করিতে হয়, কেন না কতকগুলি লোক স্বর্গসম্বন্ধে মূর্খসমুচিত কাহিনী রচনা করিয়াছে। একটী কৃত্রিম মুদ্রা কি দেশশুদ্ধ সকল মুদ্রাগুলিকে অব্যবহার্য্য করিয়া তুলে? আমাদের নগরে প্রমত্তাগার আছে বলিয়া, কি নগরস্থ সকল লোকের মস্তিষ্কের সুস্থাবস্থার প্রতি উহা সংশয়োৎ-পাদন করে? পৃথিবীতে পৌত্তলিকতা আছে, মিথ্যা দেবদেবী আছে, তাই বলিয়া কি সত্য ঈশ্বরের পরিহার যুক্তিযুক্ত? তবে কেন একটি ভীষণ কার্য্যে গুপ্তপ্রাণহত্যার বিবরণ, পৃথিবীর আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত দেবশ্বসিতপ্রাপ্তির যে ইতিহাস আছে, তাহাকে সংশয়াস্পদ এবং বিশ্বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিবে? শুদ্ধ মানুষের কথাই কি দেবনিশ্বসিতের একমাত্র মূল ও প্রমাণ? কোন এক জন মানুষ যদি সরল ভাবে বিশ্বাস করে যে, দেবনিশ্বসিত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সারল্যই কি একমাত্র তাহার দেবনিশ্বসিতের নিকষ ও প্রমাণ? স্বয়ং দেবনিশ্বসিতের মধ্যে এমন কি কিছু নাই, যদ্দ্বারা উহা খাটি, কি অথাটি প্রমাণিত হইতে পারে? ব্যক্তিগত দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্তির অভিমান কিছুই নয়। যেখানে বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ত পরীক্ষার নিয়োগ হইতে পারে, সেখানে কোন এক ব্যক্তির ভাবুকতা, কল্পনা, বিভ্রান্ত জল্পনার কোন প্রভাবই নাই। দেবশ্বসিতপ্রাপ্তির বিজ্ঞান আছে, এবং স্বর্গের নিয়োগ কি না, ইহার বিচার ও নির্দ্ধারণবিষয়ে পরিষ্কার পর্য্যবেক্ষণপ্রণালী আছে। দেবশ্বসিতপ্রাপ্তি যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার না হয়, তবে উহা ভূমিসাৎ হউক; কেন না, যাহা কিছু মিথ্যা এবং ভ্রান্তি, শীঘ্র হউক বা গৌণে হউক, সেই দশা প্রাপ্ত হইবে।

নীতিঘটিত পর্য্যবেক্ষণপ্রণালীযোগে ছল দেখাইয়া দেওয়া যেমন সহজ, তেমন আর কিছুই নয়। গুইটিও নীতিসঙ্গত কাজ করিয়াছিল অথবা নৈতিক বিধি ভঙ্গ করিয়াছিল? অনীতির কার্য্য করিয়া সে দেবশ্বসিতপ্রাপ্ত হইতে পারে না; কারণ নীতি ও দেবশ্বসিত উভয়ই ঈশ্বর হইতে প্রসূত হয়। দেবভাব-বিরোধী বিষয়ে ঈশ্বর আদেশ করিতে পারেন না। বিশ্বের নীতির শাস্তা কখন নীতিবিরোধী আজ্ঞা করিতে পারেন না। যে কোন কার্য্য বিধিসঙ্গত, এবং ধর্ম্মসঙ্গত, দেবশ্বসিতপ্রাপ্ত প্রেরিতগণ তাহাই করিয়া থাকেন। যথার্থ দেবশ্বসিত বিবেকের ভিতর দিয়া আইসে, উহা কখন অনীতির প্রবর্ত্তক বা অনুমোদক হইতে পারে না।"

পারিবারিক 'নবীনভাণ্ডারপ্রতিষ্ঠায়' 'লক্ষ্মীর' নামে ষ্টেট্স্ম্যানের দুঃখপ্রকাশ

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক, শনিবার (১৯শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ) ভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠা হয়। এ সম্বন্ধে নববিধানপত্রিকা লিখিয়াছেন;—"বিগত মাসের (নবেম্বরের) ১৯শে শনিবার, একটি মনোনিবেশযোগ্য নবীন অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ইটি নবীন-ভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠা। সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মাতা অন্নদা বা লক্ষ্মীর সন্নিধানে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনানন্তর তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়। তদনন্তর আচার্য্য একটি মৃৎপাত্রে ধনধান্য হস্তে লইয়া নূতন ভাণ্ডারের দ্বার খুলিলেন এবং সমুদায় উপাসক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা একটি সঙ্গীত করিলেন এবং সম্মুখস্থ প্রাচীরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিতে 'অন্নদায়িন্যৈ নমঃ' এই যে বাক্যটি অঙ্কিত ছিল, সেই বাক্য উচ্চারণ করিয়া অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিলেন। তদনন্তর ভাণ্ডারের চাবি ভাণ্ডাররক্ষিকার হস্তে প্রদত্ত হয়।" এইটি উপলক্ষ করিয়া ষ্টেট্স্ম্যান নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। নববিধানের ভিতরে দিন দিন বিবিধ কুসংস্কার আসিয়া পড়িতেছে; কেশবচন্দ্র একেশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু কালে তাঁহার অনুগামিগণের হাতে পড়িয়া এই সকল অনুষ্ঠান ঘোর পৌত্তলিকতায় পরিণত হইবে। অন্নদা বা লক্ষ্মী কেশবচন্দ্র যে কোন অর্থে কেন গ্রহণ করুন না, সাধারণে ইহাকে প্রচলিত লক্ষ্মী বলিয়াই গ্রহণ করিবে। এদেশে এ সকল পূজা যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন ভাবেতেই হইয়াছিল, কিন্তু কালে যখন তাহার বিপরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এই সকল পূজা এক একটী দেবদেবীর পূজা

হইবে। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, এবার সাংবৎসরিকে কি বিষয়ে বক্তৃতা হইবে, আমরা জানি না; কিন্তু যদি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি কেশবচন্দ্রের কি ভাব, তাহা ব্যাখ্যা করিতে যান, তাহা হইলে ব্যাখ্যা হইবে না, আরও মন্দের কারণ হইবে।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের কথাগুলি লক্ষ্য করিয়া 'নববিধান' পত্রিকার উক্তি

ষ্টেটস্‌ম্যানের এই কথাগুলি লক্ষ্য করিয়া নববিধান পত্রিকা যাহা লিখেন, তাহার অনুবাদ এই :—"সত্যই আমাদিগের মত বিপৎকর মত। নববিধান বিপদের ব্যাপার। আমরা নবমণ্ডলীর লোক প্রতিমুহূর্ত্ত শত শত বিপদের মুখে অবস্থিত। স্পষ্টই আমরা ভৃগ্‌পরি দণ্ডায়মান, যে কোন মুহূর্ত্তে নিম্নে ঘোরতর আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যাইতে পারি। বিপৎসঙ্কুল আমাদের অবস্থা, পৃথিবীতে যতগুলি বড় বড় কুসংস্কার এবং ভ্রান্তি আছে, সেগুলি ও আমাদের মধ্যে কেশপ্রমাণ ব্যবধান। এরূপ অবস্থায় ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয় যে, আমাদের বন্ধুগণ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে কি হইবে, তৎসম্বন্ধে উদ্বেগানুভব করিবেন এবং আমাদিগকে নিয়ত সাবধান করিবেন। কিছু বাড়াবাড়ি না করিয়া, সহানুভূতিসহকারে বলাই আমাদের বন্ধু ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের রীতি। তিনি আমাদের বিপৎকর অবস্থা গম্ভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং আশঙ্কা করিয়াছেন যে, কিছুদিন হইল, আমাদের মণ্ডলীমধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, 'প্রায় নিশ্চয় যে, সেগুলি শুদ্ধ খাটি পৌত্তলিকতায় পরিণত হইবে।' অল্প দিন হইল 'অন্নদা বা লক্ষ্মী' নামে পারিবারিক ভাণ্ডারে ঈশ্বরের বিধাতৃত্বের যে আরাধনা হইয়াছিল, উহা পৌত্তলিক দেবীপূজা বলিয়া আমাদের সহযোগী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ দোষারোপে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই, এ দোষারোপ হইবে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বস্তুতঃ জানিতে পারিয়াছিলাম। 'লক্ষ্মী' নামই একটী বিভীষিকা। উহা মনে পৌত্তলিকতা উদিত করে। উক্ত অনুষ্ঠানে কোন পৌত্তলিক দেবীর পূজা হয় নাই, কেবল পৌত্তলিক দেবীর নামের ব্যবহার হইয়াছিল। হরি, মহেশ, জগদ্ধাত্রী, বিধাতা ইত্যাদি তাদৃশ নামও আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। এ সকলই পৌত্তলিক দেবতার নাম, এবং ইহাদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই আপত্তি উঠিতে পারে। আমরা অনেক সময়ে জিহোবানাম গ্রহণ করিয়া যেমন যিহুদী হই না, তেমনি

পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল গ্রহণ করাতে আমরা পৌত্তলিক হই না। খ্রীষ্টের পিতাকে পূজা করিয়াও আমরা খ্রীষ্টান হই না। আমরা যত দিন সম্পূর্ণ মূর্ত্তির উচ্ছেদকারী এবং পৌত্তলিকতার প্রতিজ্ঞারূঢ় শত্রু আছি অর্থাৎ আমরা যাহা তাহাই আছি, তত দিন নামে কিছু আসে যায় না। 'দেবী মাতা' ঈশ্বরের কোমল দিক্ বুঝায়। 'লক্ষ্মী' বিধাত্রী বিধাতার কোমল দিক্ প্রকাশ করে। ইহার শুদ্ধ এই অর্থ যে, মহান্ ঈশ্বর কৃপা করিয়া প্রতিদিন গৃহস্থের দৈনিক অন্ন বিতরণ করেন। নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে পৌত্তলিকতা নাই। আমাদের এরূপ শব্দ ব্যবহার করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। আমাদের স্বদেশীয়-গণের জ্ঞান, ভাব ও ভাবযোগকে পরমাত্মবস্তুতে নিয়োগ করিবার জন্য আমরা এইরূপে তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা দেহহীন লক্ষ্মী তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত করি। দৃশ্য পুতুল হইতে আমরা তাঁহাদের ভক্তিভাব অন্তরিত করিয়া লইয়া, যে বস্তুর উহারা প্রতিরূপ, সেই বস্তুতে আমরা উহাকে সংলগ্ন করিয়া দেই, এবং এইরূপে সমুদায় দেবমণ্ডলীকে আধ্যাত্মিক করিয়া তুলি। এই নামগুলি সুমিষ্ট ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাব জাগাইয়া তুলে এবং বস্তুশূন্য গুণের উপাসনা পরিহার করায়। ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, আমরা নির্ব্বিঘ্ন হইলাম, আমরা বুদ্ধিগম্য হইলাম, অথচ সম্মুখে বিপদ্। ঈশ্বর বলিতেছেন, আমাদের বিপদ্ নাই। কেন নাই, আমরা তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছি। প্রত্যেক দিকেই সমান বিপদ্। বহুদেববাদ, অদ্বৈতবাদ, ত্রিত্ববাদ, বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, বৌদ্ধভাব, রহস্যবাদ, এ সকলের দিকেই সমান বিপদ্। এ সকলগুলিই আমাদিগকে বিপরীত দিকে টানিতেছে, সুতরাং সমতৌলে রহিয়াছে। এখানেই সমন্বয়বাদের সৌন্দর্য্য, এবং এখানেই ইহার নিরাপদের অবস্থা। সময়ে এক দিকে ঝুঁকিয়া পড়া, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হওয়া, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মপ্রণালী এ বিপদ্ হইতে বিমুক্ত নয়। সামঞ্জস্যের মণ্ডলী, সমন্বয়ের দর্শনশাস্ত্র, বিপরীত বল ও বিপৎ দ্বারা এমনই সমতাপ্রাপ্ত যে, একটি আর একটির প্রভাবাধীন করিতে পারে না; সুতরাং মানুষ যত দূর বলিতে পারে, তত দূর এই বলিতে পারা যায় যে, কোন এক দলে বা সম্প্রদায়ে ডুবিয়া যাওয়ার ভয় আমাদের নাই। এই যে আমাদের জ্ঞাতসার নিরাপদের অবস্থা, ইহাতেই আমাদিগকে সেই

সকল নাম, শব্দ ও অনুষ্ঠানের ব্যবহারে সাহসী করে, যে সকলের ব্যবহারে অন্য মণ্ডলী বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, কিন্তু আমাদের উহারা সহায়ক না হইয়া থাকিতে পারে না। কেন্দ্রের কখন পরিধিতে গিয়া পড়িবার ভয় নাই।"

আমরা উপরে সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা হইতে নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিচার করিয়া লইবেন, বিপক্ষে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, উহাদের বল ও সামর্থ্য কত দূর। কোন একটি বিষয়ে একদেশদর্শী হইয়া তৎসম্বন্ধে বিচার করিলে যে অতি সামান্য বিষয়ে ভ্রমে নিপতিত হইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত এ অধ্যায়ে আমরা বিলক্ষণ দেখিতে পাই। নববিধানই কেবল একটি বিষয়কে উহার সব দিক্‌ দিয়া দেখেন, তাই তাঁহার ভ্রান্তিতে নিপতননিবারণ হয়। যেখানে নববিধানের আধিপত্য, সেইখানেই একদেশিত্বের সম্ভাবনা নাই, আমরা এ কথা নিঃসংশয় নির্দ্দেশ করিতে পারি।

১৯

দ্বাপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক

সাধু অঘোরনাথের মহাপ্রয়াণ

উৎসবসমাগমের অগ্রেই যিনি আধ্যাত্মিকজগতে প্রবেশ করিলেন, সেই জগতে যোগিবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া অধ্যাত্মভাবে আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন, আমরাও উচ্চ যোগের ভূমিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইব, ঈদৃশ ব্যবস্থা যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ ব্যবস্থাপিত করিলেন, উৎসবের বিবরণ নিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাঁহার স্বর্গারোহণের কথার উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক (৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ), বৃহস্পতিবার রাত্রি দুইটার পর, লক্ষ্ণৌ নগরে নববিধানের যোগী ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত দেহে স্থিতিকালেই অধ্যাত্মযোগে ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়া কলেবর ত্যাগ করেন। দেহে থাকিয়াও দেহে না থাকা এ যোগ, এই ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে তাঁহাতে সিদ্ধ হইয়াছিল. সুতরাং এরূপে দেহত্যাগ তাঁহার সম্বন্ধে সাধনসাধ্যব্যাপার হয় নাই। যখন তারযোগে তাঁহার তনুত্যাগের সংবাদ পঁহুছিল, সংবাদপাঠমাত্র কেশবচন্দ্র উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে এরূপ ক্রন্দন করিতে আর কখন দেখা যায় নাই। ঈদৃশ ক্রন্দনের পরক্ষণেই তিনি এমন নিত্যযোগে স্বর্গগত ভাইকে আত্মহৃদয়ে বান্ধিয়া ফেলিলেন যে, আর তাঁহার জন্য শোক করা তাঁহার সম্বন্ধে অসম্ভব হইল। "ভাই অঘোরের বালভাব, নির্দ্দোষ চরিত্র, আত্মার গূঢ়তম প্রদেশে পরমাত্মার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধতা, সংযতেন্দ্রিয়ত্ব, বিবেকিত্ব, শান্তপ্রকৃতি, চিরপ্রফুল্লাননত্ব, ধীরতা, ক্ষমাশীলত্ব, গাম্ভীর্য্য, সুমিষ্ট অনুচ্চ ভাষা, ধীরগতি, পরিশ্রমশীলত্ব, মৈত্রী, ভূতানুদ্বেগকারিতা, শ্রুতশীলত্ব, কুশলত্ব, প্রিয়তা, স্বজনবর্গের প্রতি সস্নেহ উদার ভাব, সহধর্ম্মিণী এবং সন্তানসন্ততির প্রতি সুমিষ্ট মধুর ব্যবহার, বিরুদ্ধমতবাদীর প্রতি সত্য প্রিয় ব্যবহার, সুতীক্ষ্ণ বৈরাগ্য পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য তাঁহাকে জীবিত রাখিল" ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা পৌষ, ১৮০৩ শক)

যে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে আজ পর্য্যন্তও একটি লোকও সংশয়ের কথা উত্থাপন করেন নাই। মৃত্যু নয়, নবজীবন, এ কথা তাঁহার সম্বন্ধে সত্য। তিনি কি ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কি সম্বন্ধ, এ সকল বিষয়ে স্বয়ং কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির প্রমাণ; আমরা আর অধিক কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিতে চাই না। এক্ষণে উৎসবের বৃত্তান্ত ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০৩ শক) হইতে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

উৎসববৃত্তান্ত

"মনুষ্যের অপূর্ণ ভাষায় অধ্যাত্ম রাজ্যের সুখ, সম্ভোগ, দর্শন বর্ণন করিয়া অপরের হৃদয়গোচর করিবার জন্য যত্ন যাহাদিগের মস্তকে নিপতিত, তাহাদিগের আক্ষেপ রাখিবার স্থান নাই। যেখানে সম্ভোগের বিষয়, দর্শনের বিষয় অল্প, সেখানে বর্ণনের অত্যুক্তি শোভা পায়, লোকে কবিত্ব বলিয়া তাহার অনেকাংশ পরিবর্জ্জন করিয়া সারাংশ সঙ্কলন করিতে যত্ন করিতে পারে; কিন্তু যেখানে কল্পনা ও কবিত্ব পরাস্ত হয়, সেখানে দুঃখ এই, ভাষার মধ্য দিয়া কেন অধ্যাত্ম বিষয়ের গতিবিধি হয়, আত্মাকে খুলিয়া কেন লোকের কাছে দেখান যায় না। প্রাচীন প্রণালীতে উৎসবের ব্যাপার বর্ণন করিয়া আর এখন চলে না। সেই প্রাতঃসূর্য্য, সেই প্রাতঃসমীরণ, সেই কুসুমদাম, সকলই সেই রহিয়াছে; কিন্তু এক অন্তরের রাজ্যের পরিবর্ত্তনে সে সকল সামগ্রী আর হৃদয়ের ভাব সমগ্ররূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। বর্ণনাকে তবে এবার বিদায় করিয়া দেওয়া যাউক। যাহা বর্ণনার অতীত, বৃথা তাহার বর্ণনে ফল কি? এবার আবার আক্ষেপের উপরে আক্ষেপ এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় উৎসবের বিবরণ আচার্য্যের ভাষায় পূরণ করিবার উপায় নাই। যদি থাকিত, কথঞ্চিৎ অপর হৃদয়ে সেহ সেই দিনের ভাব সংক্রামিত হইতে পারিত। অপ্রতিবিধেয় কারণে এই অক্ষমতা লইয়া আমরা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলাম; যত লজ্জা ও অসামর্থ্য আমাদিগের দুর্ব্বল লেখনীরই।

"১লা মাঘ, ১৮০৩ শক (১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮২খৃঃ) শুক্রবার, আমাদিগের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। সে দিনের সায়ংকাল আজও অনন্তদেবের আরতিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। অনন্ত ঈশ্বর, তাঁহার আরতি! আরতি কি

অনতিক্রমণীয় ? আরতি কি নিত্য ক্রিয়া ? অপরাপর উপাসনার অঙ্গের ন্যায় ইহাও কি অপরিহার্য্য ? হাঁ ! সে দিন সায়ংকালে আচার্য্য দুই হস্তে দুই আলোক ধারণ করতঃ, ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধে ও নিম্নে উত্তোলন ও অবতারণ করিয়া, যে প্রকার এক এক বিশেষণের সঙ্গে জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে যে উর্দ্ধাধঃক্রমে অনন্তের দ্বিবিধ মূর্ত্তি হৃদয়পটে স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইল। অনন্তের পরিধি এক উর্দ্ধে, আর এক অধোভাগে, এক অসীমবিস্তৃতিতে, আর এক অসীম সূক্ষ্মাংশে। আলোক যখন উর্দ্ধে উঠিল, তখন জয় শব্দের সঙ্গে অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয় অনন্ত মহান্ ভূমা ঈশ্বরের অব্যক্ত অচিন্ত্য দুর্ভেদ্য স্বরূপমালা, আবার যখন নিম্নে অবতরণ করিল, তখন প্রেম স্নেহ দয়া শান্তি প্রভৃতি অনন্ত সৌখ্যগুণসহকারে তাঁহার জনহৃদয়হারিত্ব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে সময়ে আচার্য্যের মুখমণ্ডল যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনি আর জন্মে তাহা ভুলিতে পারিবেন না। যুগপৎ বিস্ময় ও মধুর রস একাধারে উপস্থিত হইলে তাহার ছবি কি হয়, সে দিন তাঁহাকে যে দেখিয়াছে, সেই কেবল বলিতে পারে। জয় অনন্ত মহান্ ভূমা অগম্য অপার, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জয় জননী জগদ্ধাত্রী স্নেহময়ী মঙ্গলময়ী ক্ষেমঙ্করী, একঃ নিঃশ্বাসে দুই বিপরীত স্বরূপ আরোহাবরোহক্রমে হৃদয়ে পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে; চেষ্টায় নহে, যত্নে নহে, স্বাভাবিক সহজ গতিতে স্বর্গের নিঃশ্বাস-প্রভাবে, এ কি সামান্য দৃশ্য ! সে দিনকার সে জয়গীত লিপিবদ্ধ হইতে পারিল না. এ সহজ আক্ষেপ নহে; কিন্তু যে লিপিবদ্ধ করিবে, সে তটস্থ, লেখন-সামগ্রীর নিকটস্থ হইতে অসমর্থ, করে কি ? ক্ষীণা লেখনী, আরতির কথা বলিতে ক্ষান্ত হও; তোমার সামর্থ্য নহে যে, তুমি উহা পাঠকবর্গের হৃদয়গোচর করিবে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বক্তৃতা

"২রা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী), শনিবার। অদ্য প্রান্তরে বক্তৃতা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এবার বক্তৃতা হয়। প্রথমতঃ ভাই অমৃতলাল বসু হিন্দীতে এবং ভাই দীননাথ মজুমদার বাঙ্গলাতে বক্তৃতা করেন, সর্ব্বশেষে আচার্য্য মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় উপসংহার করেন। আচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতা ত্রিবিধ দৃষ্টান্তে সম্পন্ন হয়। প্রথমতঃ বীজের সহিত সত্যের তুলনা। বীজ দেখিতে অতি সামান্য এবং ক্ষুদ্র, তাহাকে দেখিয়া কেহ মনে করিতে

পারে না যে, উহা হইতে এমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে যে, উহা কালে শত শত লোককে ছায়া প্রদান করিবে। বীজকে লোকে আরম্ভে উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু যখন উহা শাখা-প্রশাখা-বিস্তৃত বৃহদ্বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন যাহারা অগ্রে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহারাই আসিয়া উহার শীতল ছায়া আশ্রয় করে। বর্ত্তমানে যে সত্য প্রচারিত হইতেছে, উহার উচ্চতা ও গভীরতা লোকে এখন অনুভব করিতে পারিতেছে না ; কিন্তু সময় আসিতেছে, যে সময়ে কোটি কোটি লোক উহার আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিবে। দ্বিতীয়তঃ বক্তার মস্তকোপরিস্থ প্রকাণ্ড আকাশ সমুদায় প্রভেদ-বিলোপক দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত হয়। মনুষ্য যখন মন্দিরে ঈশ্বরের আরাধনা করে, তখন তাহাদিগের স্বতন্ত্রতা ও প্রভেদ থাকে ; কিন্তু অনন্ত আকাশের নিম্নে দণ্ডায়মান হইলে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতির প্রভেদ থাকে না, এক অনন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে এক প্রশস্ত মন্দিরে সকলেই অর্চ্চনা বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হন। আচার্য্য মহাশয় যে ধর্ম্মের প্রবক্তা হইয়া উপস্থিত, তাহা আকাশের ন্যায় উদার, প্রশস্ত ও বিপুল, তাহার মন্দির অনন্ত আকাশ, সেখানে কোন প্রকার প্রভেদ নাই, সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান। তৃতীয়তঃ প্রস্তরীভূত অঙ্গার। অঙ্গার সহজে অতি মলিন কৃষ্ণবর্ণ, বল, কে তাহার সমাদর করিবে ? কিন্তু একখণ্ড অঙ্গারকে অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত কর, দেখিবে, উহা অগ্নিযোগে উজ্জ্বল আরক্তিম প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় প্রভা ধারণ করিবে। এই অঙ্গারের সঙ্গে শত শত অঙ্গার সংযুক্ত কর, সকলই ঐরূপ উজ্জ্বল বেশে পরিশোভিত হইবে। বিধানের সমাগমসময়ে যখন এক ব্যক্তিতে স্বর্গের অগ্নি সংক্রামিত হয়, সে ব্যক্তি অঙ্গার-সদৃশ পাপমলিন থাকিলেও, সেই অগ্নির প্রভাবে এমন মনোহর কান্তি ধারণ করে যে, অঙ্গারসদৃশ শত শত মানবকে আত্মসংস্পর্শে স্বর্গের উজ্জ্বল বর্ণে বিভূষিত করে। বর্ত্তমান সময়ে বিধান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছে এবং বিধানবাহকগণ অঙ্গারসদৃশ মলিন কৃষ্ণবর্ণ হইলেও, শত শত লোককে বিধানপ্রভাবে উজ্জ্বল মনোহর স্বর্গের ভূষাতে ভূষিত করিবে।

প্রাতঃসন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা—প্রাতে 'সংযম' ও সন্ধ্যায় 'হাস্য' বিষয়ে উপদেশ

"৩রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী), রবিবার। অদ্য প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা

হয়। উপাসনার প্রথমাংশ ভাই অমৃতলাল বসু, দ্বিতীয় অংশ ভাই দীননাথ মজুমদার সম্পন্ন করেন। "উৎসবার্থ সংযম" উপদেশের বিষয় ছিল। এ সংযম মহাব্রহ্মচর্য্য, সমুদায় পরিবারের সহিত সাংসারিক যোগের সম্বন্ধ পরিহার করিয়া, স্বর্গের সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া ইহার উদ্দেশ্য। ইক্ষু দেখিতে শুষ্ক এবং কঠোর, কিন্তু উহাকে নিষ্পেষণ কর, দেখিবে, ইহা হইতে কেমন সুমিষ্ট মধুর রস বিনিঃসৃত হইবে। সংসার ভয়ানক সংগ্রামের স্থান। উহা সাধকের চির প্রতিকূল, মিথ্যা দৃষ্টি এবং মোহ সাধককে এক পদ অগ্রসর হইতে দেয় না। ইক্ষু-নিষ্পেষণের ন্যায় সংসারকে নিষ্পেষণ কর, মোহের বিকার একেবারে ঘুচিয়া যাইবে, সংসার দর্শনের হেতু হইবে। সায়ংকালে আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং বেদীর কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপদেশের বিষয় 'হাস্য'। সাধকের মুখে যদি হাস্য বিরাজ না করে, সাধক যদি সর্ব্বদা ম্লানমুখ হন, তবে তিনি জগতের মহদনিষ্ট সাধন করেন। আমরা বিধানসূত্রে এত আনন্দ শান্তি ও সুখ লাভ করিয়াছি যে, আমরা কখনও সংসারে ম্লানমুখে অবস্থিতি করিতে পারি না। ভিতরে পাপ কলঙ্ক অপরাধ চাপিয়া রাখিয়া মুখে হাস্য, ইহা ঘোর কপটতা, ঘোর অপরাধ। কিন্তু যেখানে স্নেহময়ী জননী এত দিতেছেন, এত সম্ভোগ হইতেছে, সেখানে মনের আহ্লাদ গোপন করা, চাপিয়া রাখা ঘোর অধর্ম্ম। যদি মুখে হাস্য বিরাজ না করিল, তবে উৎসব কেন? যেখানে নববিধানের নিশান উড়াইবে, সেখানে যদি আহ্লাদের স্রোত প্রবাহিত না হয় ও সকলের মুখে হাস্য বিরাজ না করে, তাহা হইলে বিধান নিষ্ফল হইল। সকল সাধকের মুখে হাস্য চাই; কিন্তু সে হাস্য যথার্থ হাস্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কষ্টি-প্রস্তর আছে! কেহ যে মিথ্যা হাসিয়া ভুলাইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। যদি ভিতরে আহ্লাদের কারণ থাকে, হাসির হেতু থাকে, কতক্ষণ কে চাপিয়া রাখিতে পারে? মেঘ কতক্ষণ চন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিবে? বাহিরে ছিন্নবস্ত্র দুঃখ দারিদ্র্য কতক্ষণ হৃদয়ের আনন্দ আহ্লাদকে আচ্ছাদন করিবে? উৎসবে সকল হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া হাস্যে পরিণত হউক। সকল মুখ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপের আকার ধারণ করুক।

৪ঠা মাঘ 'আশালতা'র অধিবেশন, ৫ই মাঘ ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তনাদি

"৪ঠা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী), সোমবার ৪টার সময়, কমলকুটিরাভিমুখে

'আশালতার' যাত্রা, সঙ্গীত ও অধিবেশন হয়। ৫ই মাঘ (১৭ই জানুয়ারী), মঙ্গলবার, ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ইংরাজীতে উপাসনা এবং উপদেশ হইবার কথা ছিল; কিন্তু পীড়ানিবন্ধন তিনি উপস্থিত না থাকাতে, মন্দিরে কীর্ত্তনাদি হয় এবং শুক্রবার ইংরাজী উপাসনাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

থিয়লজিকেল ক্লাসের সাম্বৎসরিক

"৬ই মাঘ (১৮ই জানুয়ারী), বুধবার ৫টার সময়, এলবার্টহলে থিয়লজিকেল ক্লাসের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। তাহাতে এবার বহুসংখ্যক যুবক উপস্থিত হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুবিখ্যাতবক্তা শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ধর্ম্মজীবন' বিষয়ে কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে, প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয়। আত্মজ্ঞান এবং জগৎজ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞান-লাভের উপায় বটে, কিন্তু নিজে পতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিকেও কেবলই পতনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং আত্মা কিম্বা জগত্তত্ত্ব প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব-লাভের উপায় হইতে পারে না। তবে কি আমাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞান-লাভসম্বন্ধে নিরাশ হইতে হইবে ? তাহা কখনও নহে। কারণ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আপনার বিষয় জানাইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। যে তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রেরিত সাধু আত্মাদের নিকটও প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করা যায়। এইরূপ সুমিষ্ট ভাষাতে তিনি কয়েকটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলে পর, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় নববিধানের আলোতে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সত্যালোচনা করা যায়, তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মের বিষয়ে বিস্তারিতরূপে অনেক কথা বলেন। অবশেষে আচার্য্য মহাশয়, প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অর্থাৎ জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছার উন্নতি অত্যাবশ্যকীয়, তাহা সুন্দর মত বুঝাইয়া দেন; এবং প্রার্থনার বিদ্যালয়েই যে এই প্রকৃত উন্নতি লাভ হইয়া থাকে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। এইরূপে কার্য্য শেষ হইলে পর, ছাত্রগণ জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত নগরকীর্ত্তনে বাহির হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা

"৭ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী), বৃহস্পতিবার। অদ্য বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় আলবার্ট হল গৃহে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়; আচার্য্যমহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এম, এ, গত বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। ... ... তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইলে, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করিলেন :—

ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের বিবরণ

"আমি যখন মনে মনে চিন্তা করি, আমি কেন কায়স্থ বংশে জন্মিলাম, তখন আমার প্রতি আমার বড় সম্মান বাড়ে এবং আপনাকে আপনি সৌভাগ্য-বান্ বলিয়া সুখী হই। এক দিকে যেমন এই বিস্তীর্ণ বংশের লোকসকল দুঃখে পড়িয়া নিতান্ত নীচ ব্যবসায় করিয়া থাকে, অপর দিকে তেমনই আবার এই কায়স্থরাই দেখিতেছি, বড় উচ্চ পদ পাইতেছে। বর্ত্তমান নববিধানে কায়স্থের বড় আদর বাড়িয়াছে। নববিধান সকলকে বিনীতভাবে সেবক হইবার জন্য বার বার উপদেশ দিতেছেন; এমন কি, ইঁহার নেতা আপন ইচ্ছায় সেবকের উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। যে সেবকত্ব, যে দাসত্ব উপাধির জন্য বড় বড় মহাত্মারা এত ব্যস্ত, এই কায়স্থ জাতির প্রধান ধর্ম্ম সেই দাসত্ব করা। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ দাস ছিলেন। তাঁহারা আপন আপন নাম বলিবার সঙ্গে 'দাস অমুক' এই কথা অতি বিনয়ের সহিত বলিতেন। এখনকার সভ্যতার সময়ে আমার ন্যায় অহঙ্কারী ব্যক্তিরাই নামের সঙ্গে দাস বলিতে চায় না। ভগবদ্ভক্ত মহাত্মারা যে উপাধির জন্য প্রার্থী, দয়াময় হরি নিজে দয়া করিয়া আমাকে প্রথম হইতে সেই দাসের বংশে প্রেরণ করিয়া, আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার আর কোন গুণ জ্ঞান ক্ষমতা নাই যে, আমি নববিধানের কোন কর্ম্ম করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি; কেবল দাসত্বব্রত দিয়াছেন বলিয়াই, আমি আজও এই বিধানের অন্তর্গত হইয়া আছি। অতএব আমাকে কেহ ঠাট্টাই করুন, আর যাই করুন, আমি কিন্তু জন্মদাস, এ যেন তাঁহারা মনে রাখেন। আমার জাতির আর একটি বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাই, সে কার্য্যটি খাতা লেখা। প্রায়ই দেখিতে পাই, দোকানি

ব্যবসায়ী জমীদার সকল লোকের ঘরেই কায়স্থ খাতা লেখক আছে। নববিধান দেখিলেন, খাতা লেখা যখন কায়স্থের কার্য্য, তখন নববিধানের এই খাতা লেখা কার্য্যটি এক জন ঐ বংশের লোকের হাতে দিতে হইবে। সকলেই জানেন, খাতা লিখিতে বেশী বিদ্যার প্রয়োজন নাই। গোটাকতক কসি ও গোটাকতক অঙ্ক লিখিতে পারিলেই হইল। গোয়ালা, ধোপা, ইটওয়ালার খাতা দেখিলেই খাতালেখক মুহুরিদিগের বিদ্যা বুদ্ধি বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। যাহা হউক, আমার জাতীয় খাতা লেখকের কার্য্যভার পাইয়া আমি বড় কম সুখী হই নাই। আমার যেরূপ বিদ্যা, তাহাতে এ কার্য্যটি ঠিক আমারই জন্য বিধাতা সৃজন করিয়াছিলেন। আমার বন্ধুগণ আমাকে সর্ব্বদা খাতা লইয়া থাকিতে দেখেন বলিয়া, আমাকে মধ্যে মধ্যে ধমক দেন; কিন্তু আমি যে খাতা লইয়া থাকি কেন, তাহার ভিতরকার মানে কেহ বুঝিতে পারেন না। আমার যে ইহা বড় ভাল লাগে। উপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাকরণ লেখাতে যে সুখ হয়, আমার খাতা লেখাতে তাহা অপেক্ষা বড় কম সুখ হয় না। ১৪ বৎসরের অধিক হইল, আমি এই দাসত্বকার্য্য লাভ করিয়া খাতা লিখিয়া আসিতেছি। বিধাতার কত লীলা খেলাই দেখিলাম, কত মুক্তিপ্রদ অমূল্য আশ্চর্য্য সত্য সকল এই কার্য্যে পাইলাম, কত তাঁহার প্রত্যক্ষ হস্তই দেখিলাম, তাহা বন্ধুদিগকে প্রতি বৎসরই যথাসাধ্য বলিয়া আসিয়াছি। এবারকার বৎসরের আবার ভয়ানক ব্যাপার, এমন বৎসর আমার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। আমি আমার হরির কার্য্য দেখিয়া হাসিব, কি কাঁদিব, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। আমি কখন কখন নির্জ্জনে গালে হাত দিয়া ভাবি, নববিধান ব্যাপারটা কি, এর যে সকলই অদ্ভুতকাণ্ড। খাতালেখক চাকর ছোঁড়াকে লইয়া যখন এত রঙ্গ দেখান, তখন সাধু ভক্ত প্রেমিকের সঙ্গে তাঁহার রঙ্গের তো আর কথাই নাই। হরি হে, তোমার কার্য্য সকলই অতি অদ্ভুত। ভক্তগণ, আমার বিধাতা হরির এবারকার বৎসরের কার্য্য যৎকিঞ্চিৎ বলি, শ্রবণ করুন। জানি না, ঠিক বলিতে পারিব কি না। তিনি যেমন করেন, তাহাই হউক।

"১৪ বৎসরকাল আমি, আমার প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, একটি মহাজনের নামে খাতা খুলিয়াছি, সেই খাতায় একাল পর্য্যন্ত একটি একটি করিয়া ১৪টি মহারত্ন জমা করা হইয়াছে। কৃপাময়ী জননীর আশীর্ব্বাদে এই জমা দেখিয়া

আমি বড় সুখে ভাসিতেছিলাম, একাল পর্য্যন্ত আমার জমা খরচে জমা বই কখন খরচ লিখিতে হয় নাই। আমি মনে করিতাম যে, যে মহাজনের নামে খাতা খোলা হইয়াছে, ইনি অতিশয় ধনী। ইহার তো কোন অভাব নাই, ইনি ক্রমাগত জমাই দিবেন, এত বড় ধনীর আর খরচের দরকার কি? ১৪টী রত্ন আমার খাতায় জমা দেখিতাম, আর আমি মনে মনে হাসিতাম, আর বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতাম। আমার মহাজন দীর্ঘজীবী হউন, তিনি মনোযোগী হইয়া আমার খাতার জমা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া দিন।

"১৪ বৎসরের খাতায় যাহা হয় নাই, স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই, কি সর্ব্বনাশ!! তাহাই ঘটিল। আমি জমার দিকে দৃষ্টি করিয়া আনন্দে নিদ্রা যাইতেছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দেখি, কে আমাকে না বলিয়া, আমার মহাজনের হুকুম না লইয়া, ১৪টি রত্নের একটি রত্ন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমিতো অবাক্, একি ব্যাপার? এ যে অস্বপ্নের স্বপ্ন, এমন করিয়া কে বুকে শেল বিদ্ধ করিল, আমার সাদা খাতায় কালির দাগ কে দিয়া দিল, আমার এত সাধের অঞ্চলের নিধি কে কাড়িয়া লইল! আমি কত কাঁদিলাম, কত পায়ে ধরিলাম, কত কি বলিলাম, আমার সে হারাধনের সংবাদ তখন আর কেহ দেয় না। খাতার মুহুরীর এইবারে সাধ আহ্লাদ ঘুচিয়া গেল। হায়! এত দুঃখের মাণিক আমি অনায়াসে হারাইলাম। সেতো যেমন তেমন মাণিক নয়, সে যে মাতার মাণিক। হায়, দেখে দেখে সেই মাণিকটিই লইয়া গেল! আমি করি কি, যাহা কখন করি নাই, দুঃখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে আমার খরচের ঘরে কালি দিয়া একটি রত্ন খরচ লিখিতে হইয়াছে। এটি কি আর পাব না, এটি কি একেবারে গেল, এই বলিয়া মহাজনের নিকট যাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মহাজন আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার কান্নায় যোগ দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি আবার হাসিলেন। আমি বলিলাম, ব্যাপারটা কি, মহাশয়, হাসিলেন কেন, ধন হারাইলে কি হাসি আসে? মহাজন আমাকে স্থির হইতে বলিয়া, আমার খাতার অপর একটী পৃষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। আমি তো আর নাই। আমার খাতায় অপর হস্তের সুন্দর লেখা কেমন করিয়া আসিল, নূতন খাতা খুলিয়াই বা কে দিল? এমন সুন্দর লেখাতো কখন দেখি নাই। লেখার দিকে বার বার দেখিতেছি,

এমন সময় চক্ষের জল পুঁছিয়া দেখি, আমার খাতার সেই পৃষ্ঠায় স্বয়ং হরির নামে এক খাতা খোলা হইয়াছে। সেই খাতার বাম দিকে কেবল জমা, এই কথাটি লেখা আছে, আর খরচ এ কথাই তাহাতে নাই। খানিকক্ষণ পরে দেখি, আমি যে রত্নটি আমার খাতায় খরচ লিখিয়াছি, সেই রত্নটি এই হরিনামের খাতায় জমা রহিয়াছে। আমি আমার মহাজনকে জিজ্ঞাসা করি, এসব কি? তিনি হাসিতে হাসিতে এই রহস্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, আমাকে জন্মের মত কৃতার্থ করিলেন। আমার কান্নার চক্ষে হাসি আসিল, হারান ধনটিকে সেখানে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার শোক তাপ সব চলিয়া গেল। মনে মনে খাতা লেখার কত প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হইল। এবারকার বৎসরে সর্ব্বাগ্রে এই হিসাবটি আপনারা সকলে আমার খাতায় দেখিয়া সুখী হন, এই এ দাসের বিনীত নিবেদন। তৎপরে এবৎসরের অন্যান্য ঘটনা সকলই সুখপ্রদ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আয় ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে; আয় ব্যয় বিবরণ, বাৎসরিক হিসাব যথাস্থানে দেওয়া হইল, তাহা পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

"২য় রহস্য। শীতকালের আরম্ভে এক দিন সন্ধ্যার সময় বিদেশের কোন বন্ধুর বিধবাস্ত্রীর নিকট হইতে এক খানি শক্ত রকমের গালাগালী পূর্ণ পত্র পাইয়া ভাবিতেছিলাম। তিনি আমাদের নিকট কতকগুলিন টাকা পাইবেন, টাকা না পাইয়া বিরক্ত হইয়া যেমন করা উচিত, সেইরূপ বেশ দশ কথা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার টাকার কি হইবে, তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় তুইটি কাগজের মহাজনের তুই জন লোক শমনের পেয়াদা সঙ্গে লইয়া তুইখানি শমন আমার হাতে দিল। আমার তো চক্ষু স্থির। তুইখানি শমনে প্রায় ৮০০ টাকার দাবি দিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ আবার কি? ইহাতে কি শিক্ষা দেওয়া হইবে? দেনার জালা আসিয়া হৃদয়কে অস্থির করিল, কি করি, কোথায় যাই, কেমন করিয়া ঋণ পরিশোধ দিব, এই ভাবনা প্রবল হইল। জাগ্রতে নিদ্রা আসিল, পথে সকল অবস্থাতেই ভাবনা আসিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। চিৎকার করিয়া মা মা বলিয়া ডাকি, মনে যাহা আসে, তাই বলে যার কাছে জানাই, এইরূপে মকদ্দমার দিন উপস্থিত। প্রাতঃকাল হইল, কোন স্থানেই টাকার সুবিধা হয় নাই। একটি নিতান্ত

আত্মীয় বন্ধু আমাদের দুঃখে যিনি সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকেন, তিনি কোথা হইতে গোপনভাবে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া হাওলাত দিবেন মনে করিয়া, আপনার ইচ্ছায় পূজনীয় আচার্য্য মহাশয়কে মনের কথা জানাইলেন। আচার্য্য মহাশয় দেনা করার অত্যন্ত বিরোধী। তিনি দেখিলেন, অদ্য মকদ্দমা, টাকা তো দিতেই হইবে, আশ্রিত সেবকের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বন্ধুর প্রস্তাব শুনিবামাত্র, বন্ধুকে তাঁহার পরিবার চলিবার একটি মাত্র উপায়স্বরূপ যে ছাপাখানা, তাহাই বিক্রয় করিতে চাহিলেন। বলিলেন, যদি প্রেসটি কিনিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে টাকা নিতে পারি। বন্ধু অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে কি করেন, সেই দিন টাকা না দিলে, অনেকগুলিন টাকা অনর্থক বেশি লাগে, এই জন্য সম্মত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তাঁহার যেরূপ সঙ্কল্প, অন্য ব্যক্তিকে না দিয়া নিজে রাখাই ভাল। আচার্য্য মহাশয় বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিয়া, বন্ধুর নিকট হইতে টাকা লইয়া, আমাকে তো উদ্ধার করিয়া আনিলেন। আমার এই ঘটনাতে ভাবনা কমিল না, বরং বৃদ্ধি হইল। কি হইবে, কেমন করিয়া সব চলিবে, ইঁহার সংসারের অন্য আয় নাই, অন্য কোথা হইতেও লইবেন না। একটি ভাবনা ছিল, দশটী ভাবনা আসিয়া পড়িল। প্রেমময়ীর খেলা বুঝিতে পারে কে? দুই দিন এই অবস্থায় গেল। কি করিব, কি উপায়ে টাকা আসিবে? এই জন্য বার বার জিজ্ঞাসা আসিতে লাগিল। উপাসনার সময় কোথা হইতে অল্প অল্প আলোক আসিতে লাগিল। এক দিন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করা হইল, যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৫০০ টাকার সুবিধা করা যায়, তাহা হইলে আচার্য্য মহাশয়ের ছাপাখানাটী রক্ষা হয়, নচেৎ উহা একেবারে বাহিরের লোককে দেওয়া হইবে। আমি আর কি করি? আমার বল বুদ্ধি ভরসা সবই তিনি। আমার কাঁদিবার স্থান, হাসিবার স্থান, বলিবার স্থান সবই এক জায়গায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই তো হুকুম, এখন বল, কি করিতে হইবে? তোমার অভিপ্রায় আমাকে স্পষ্ট বুঝিতে দাও। উপাসনার পর এই ভাবিতে ভাবিতে আফিসে আসিয়াই এই পত্র খানি ছাপাইলাম।—

"প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন।

"ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকার্য্যালয়ের ঋণ পরিষ্কার জন্য, আমি অতি বিনীত ভাবে

আপনার নিকট—টাকার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই মূল্যের পুস্তক আপনাকে আমি দিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া পুস্তকের তালিকা দেখিয়া বলিয়া দিন, কি পুস্তক কতখানি দিব। আপনার আবশ্যক না থাকিলে, সেই সকল পুস্তক বন্ধুদিগের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন।

সেবকশ্রী—

"এই খানি সঙ্গে করিয়া বন্ধুদিগের নিকট গেলাম। যেখানে যাহা আশা করিয়া গেলাম, প্রায় সকল স্থান হইতে সাহায্য পাইলাম। যে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে টাকা দিবার কথা ছিল, মা দয়াময়ী কৃপা করিয়া সেই দিন সবই জুটাইয়া দিয়া, এ দাসকে একেবারে দৃঢ়তর প্রেমরজ্জুর দ্বারায় বাঁধিলেন। আমি বলিব কি, আমি যাহা চাই নাই, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাইলাম। একটি বন্ধুকে ২০৲ টাকার বই লইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। বন্ধু এককালে এক শত টাকা ঋণ শোধ জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এ সব ব্যাপারে আমি কি বলিব? আমি দেখিলাম কি, জানিলাম কি? মা আমার দয়াময়ী, আমার ভাবনা তিনি যেমন ভাবেন, এমন আর কেহ ভাবিতে জানেও না, ভাবেও না। ধন্য, মা, ধন্য! টাকাগুলির সুবিধা করিয়া দিয়া ভক্ত-পরিবারের উপজীবিকার উপায় ও আমায় রক্ষা করিয়া দিলেন। বাঁচিলাম, আর প্রাণ জুড়াইল।

"তৃতীয় রহস্য। এক জন পণ্ডিত, বাহিরের লোক, আমার সাধু অঘোর-নাথের স্বর্গারোহণ-সংবাদ শুনিয়া, আমাকে কিরূপ জব্দ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন।

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকার্য্যালয়

কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বরাবরেষু।

"প্রেমৈকনিলয়েষু

"যথোচিত সাদর সম্ভাষণ

"মহাত্মন্!

"আমি ১৬ পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথের দুঃখিনী বিধবা ও সন্তানগণের চাঁদা দ্বারা এক্ষণে আপনারা সাহায্য করিতে ব্রতী হইয়াছেন পাঠ করিয়া, বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম। পক্ষে দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণ আমি তাঁহাদের

উপযুক্ত মত সাহায্যদানে অসমর্থ। যাহা হউক, সম্প্রতি অনেক আলোচনার পর নিজ চিত্তের শান্তির জন্য একটি সহজ উপায় স্থির করিয়াছি।

"আমার কতকগুলি অবশিষ্ট পণ্ডিতমূর্খ নাটক আছে। আপনারা উহার মধ্যে ১০০ এক শত টাকা মূল্যের পরিমাণে (যথানা হয় হিসাব করিয়া) পুস্তক গ্রহণ করুন, এবং ঐ পুস্তক-সকলের কবরের ভিতরে একখানি চিরকুট ছাপাইয়া সংলগ্ন করিয়া দিউন, যাহাতে উহা পাঠ করিয়া সর্ব্বসাধারণে শীঘ্র গ্রহণ করে। তদ্‌ভিন্ন সুলভ আদিতে ও সাহায্যার্থে ঐ পুস্তকগুলি (যত সংখ্যা আপনারা লইয়া যাইবেন) গ্রহণার্থ সাধারণকে বিদিত করুন। এইরূপ করিলে যে এক শত টাকার পুস্তক লইয়া যাইবেন, তাহা অচিরাৎ বিক্রীত হইয়া টাকা সকল হস্তগত হইবে।

"মহাশয়! এইরূপ করিয়া যদি সাধু অঘোরনাথের দুঃখিনী বিধবা ও সন্তানার্থ আমার নিকট হইতে ঐ যৎসামান্য ১০০ শত টাকা সাহায্য লন, তবে আমি কত দূর যে আনন্দ লাভ করিব, তাহা অবক্তব্য। আমি দরিদ্র ও আপনাদের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নহি বলিয়া, যদি আমার এই দানকে অগ্রাহ্য বা অপবিত্র বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আপনারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন। পক্ষে আমি ঈশ্বরের নিকট আর দায়ী নহি। যেহেতু অন্তর্য্যামী তিনি দেখিতেছেন, আমার এ দান যথাসাধ্য কি না, এবং 'শ্রদ্ধয়া দেয়ং' এই বেদের অনুগামী কি না।"

"মহাশয়!

"ইতিপূর্ব্বে অনুমান (ঠিক স্মরণ হইতেছে না) ৬।৭ দিন হইল, আপনার নামে একখানি পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে মহাত্মা সাধু অঘোরনাথের বিধবা পত্নী ও অনাথ বালকগণের সাহায্যার্থ ১০০ একশত টাকার পণ্ডিতমূর্খ পুস্তক গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়।

"পণ্ডিতমূর্খ নাটকের মূল্য ।৵০ নির্দ্দিষ্ট আছে। আপনারা, বোধ হয়, সেই হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু আমি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, ঐ পুস্তকের মূল্য যদি ।০ আনা করা যায় এবং বিক্রেতার কমিশন শতকরা ২৫ টাকা দেওয়া হয়, তবে শীঘ্রই আমার অভীপ্‌সিত এক শত টাকা আপনারা হস্তগত করিতে পারিবেন। অন্যথা ।৵০ হিসাবে একশত টাকার

পুস্তক-গ্রহণে সে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া অনেকটা সন্দেহ। পক্ষে আমার হৃদয়ের বেগ এত দূর প্রবল হইয়াছে যে, 'এই মহোৎসবের মধ্যেই একশত টাকা বিধবা সাধ্বীর হস্তে দিতেই হইবে,' এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃই আমাকে তাড়না করিতেছে। অতএব ।০ আনা করিয়া বিক্রয় ও বিক্রেতা সরকার-দিগকে ২৫ টাকা কমিশন দেওয়াই স্থির করিয়া, আপনাকে হৃদয়ের সহিত অনুরোধ করি, পণ্ডিতমূর্খ নাটক ৫০০ পাঁচশত সংখ্যক আমার জ্যেষ্ঠ মহাশয়ের নিকট হইতে আনাইয়া লইবেন। ৪০০ খানি ।০ আনা হিঃ বিক্রয় করিলে ১০০ টাকা হইবে। আর ১০০ পুস্তক কমিশনের জন্য। ঐ একশত পুস্তকে ।০ আনা হিঃ ২৫ টাকা হইবে।"

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, তাঁহার পেটের অন্ন কেমন করিয়া চলে, তাহারই ঠিক নাই। তিনি কি না আমাদের দুঃখে এত কাতর হইয়া অনায়াসে একশত টাকার পুস্তক অকাতরে দান করিলেন। ইহাতেও অনেক লজ্জা পাইয়াছি।

"আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাই না বলিয়া, আমার বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে আমাকে ধমক দেন। আমি ভিক্ষুক বটি, কিন্তু ভিক্ষা করিতে জানি না। কি অবস্থায় কাহার নিকট কি বলিয়া ভিক্ষা করিব, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। ভিক্ষা চাওয়া বড় শক্ত কার্য্য। বিশেষতঃ নববিধানে পুরাতন রকম ভিক্ষা চাওয়াটা ঠিক মনের সঙ্গে মিলে না। নানা রকম ভাব করিয়া ভিক্ষা করিলে অনেক টাকা যে পাওয়া যায়, তাহা জানি। ২টী মাতৃহীন বালক, একটী অনাথা বিধবা ও তাহার তিনটি শিশু সন্তানের নামে ভিক্ষা চাহিলে আমি যে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে না পারি, এমন নয়; কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা ভিন্ন কোন কার্য্যই করিতে পারি না।"

"কার্য্য বিবরণ ও হিসাব পাঠান্তে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ধর মহাশয়ের পোষকতায়, সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গত বৎসরের হিসাব ও বিবরণ গ্রাহ্য হইল। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট রেলওয়ে প্রভৃতির অধ্যক্ষ সাহেবগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়া, প্রথম শ্রেণীর ফ্রী পাস দেওয়াতে, এবারে তিনি অনেক স্থানে অতি সহজে গমনাগমন করিয়া নববিধানের সত্য সকল প্রচার

করিয়াছেন, এজন্য রেলওয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হয়। তিনি গুইকওয়ার মহারাজার দ্বারায় নিমন্ত্রিত হইয়া বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন, এবং মহারাজা তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধেও কিছু বলিলেন। সমুদায় উপকারী সহানুভাবক বন্ধু, যাঁহারা স্বদেশে কিম্বা বিদেশে আছেন, বিশেষতঃ আমেরিকার পাদরী হেক্‌সফোর্ড, আফরিকার কেনন ডেবিস্‌, ইংলণ্ডের মোক্ষমূলার, ফ্রান্সের বিখ্যাত রিভিউয়ের সম্পাদক প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। পরিশেষে সাধু অঘোরনাথের ও সাধ্বী শ্রীমতী নিস্তারিণী রায়ের ইহলোক-পরিত্যাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়। যে সকল মহাত্মা দয়া করিয়া সাধু অঘোরনাথের বিধবা পত্নী ও সন্তানগণের সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদিগকে, বিশেষতঃ নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয়কে ও আমাদাবাদের ভোলানাথ সারাভাইকে তাঁহাদের দান ও শুভ কামনার জন্য সভা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ভাগলপুর, গাজীপুর, সীমলা, লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ ও বম্বে প্রভৃতি যে সকল স্থানের বন্ধুগণ প্রচারক মহাশয়দিগের পরিবারগণের জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তদনন্তর আচার্য্য মহাশয় একটী প্রার্থনা করিলে, একটী ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া, রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

মঙ্গলবাড়ীর উৎসব

"৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী,) শুক্রবার। অদ্য মঙ্গলবাড়ীর উৎসব। প্রাতে উপাসনা হইল। উপাসনা-গৃহের প্রাতঃকালীন উপাসনা যাঁহারা সম্ভোগ করেন নাই, তাঁহারা ইহার মধুরতা কি প্রকারে বুঝিবেন। উপাসনান্তে আচার্য্য মহাশয় এবং ব্রাহ্মমণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মঙ্গল বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হন। মঙ্গলবাড়ীর উৎসব এবার সাধু অঘোরনাথের জন্য ক্রন্দন। আচার্য্য মহাশয় সমাধি-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, মৃত সাধুকে সম্বোধন করিয়া, এমন সকল কথা বলিতে লাগিলেন যে, সকলে অধীর হইয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলেন না। সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তে সেখানে সকলে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, আচার্য্য-গৃহে সকলে একত্র ভোজন করিলেন।

"ত্রিত্ববাদ" বিষয়ে বক্তৃতা

"৯ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী,) শনিবার। অদ্য টাউন হলে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের ইংরেজী বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় "ত্রিত্ববাদ।" আমরা বৎসর বৎসর বক্তৃতার কতক অংশের অনুবাদ করিয়া দিয়া থাকি। এবার ভবিষ্যতের জন্য উহা রক্ষিত হইল। ঈশ্বর, খ্রীষ্ট এবং পবিত্রাত্মা এ তিনের সম্বন্ধ অতি বিশদরূপে বক্তৃতায় বিবৃত হয়। স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্রে ঈশ্বর, প্রতি আত্মাতে ঈশ্বর, এ তিন ভিন্ন নহে, একই ঈশ্বর। ঈশ্বরপুত্রকে নরদেব বলা যাইতে পারে, কিন্তু দেবনর অর্থাৎ দেবতা নর হইয়া অবতীর্ণ, এ কথা বলা যাইতে পারে না। নরেতে দেবভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে, দেবতাতে কখন নর ভাব প্রকাশ হয় না। ঈশ্বরকে মনুষ্য করিয়া পৌত্তলিকতার সমাগম হইয়াছে; খ্রীষ্টানগণ কর্ত্তৃক যাহাতে সে ভ্রম পুনরানীত না হয়, তৎসম্বন্ধে আচার্য্য তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করেন। বর্ত্তমান বিধান পবিত্রাত্মার বিধান, তৃতীয় বিধান। ইহাতে প্রত্যেক মনুষ্য দেবত্ব লাভ করিয়া, ঈশ্বরপুত্র হইয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইবেন। ঈশ্বর পুত্রেতে প্রকাশিত হইয়া, পবিত্রাত্মারূপে আবার আপনাতে আপনি মিলিত হইলেন। এই ব্যাপারটি ত্রিভুজসদৃশ। ঈশ্বর ত্রিভুজের প্রথম ভুজ। শেষোক্ত ভুজ ভুজদ্বয়ের পার্থক্য বিলুপ্ত করিয়া উভয়কে মিলিত করে।

দিনব্যাপী উৎসব—প্রাতে 'সতীত্ব' বিষয়ে আচার্য্যের উপদেশ

"১০ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী), রবিবার। অদ্য উৎসবের দিন। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, এবারকার উৎসব বর্ণনাযোগে পাঠকবর্গের হৃদয়গোচর হইবার নহে। প্রাতঃকালের উপাসনাতে আচার্য্য যে উপদেশ দেন, তাহার সারসংগ্রহ দ্বারা এবারকার উৎসবের মূলবিষয় পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা যত্ন করিব। আচার্য্য উপদেশের প্রারম্ভে বলেন, 'আমাদের ধর্ম্মে মানুষ কিছু বলে না, কিন্তু মানুষকে মনের মানুষ বলেন। ভক্তের রসনা হইতে যাহা কিছু বাহির হয়, তাহার এক অক্ষরও ভক্তের নয়।' এ অবস্থা কোন্ সময়ে উপস্থিত হয়? 'যখন মানুষের কথা থাকে না, তখন ঈশ্বরের কথার আরম্ভ।' 'যে নিজে কিছু বলে না, তাহারই মুখে ঈশ্বর কথা কহেন।' তবে কি এ সময়ে কেবল কথন, দর্শন নাই? না, দর্শন ও কথন একত্র

সম্মিলিত ? যেখানে দর্শন নাই, সেখানে কথন কি প্রকারে অবিমিশ্র চলিতে পারে ? আমরা পরক্ষণে আচার্য্যমুখে শুনিতে পাই, 'ওরে ভ্রান্তজীব, আকাশে সত্য দেখ, আর বল ; চারিদিকে সত্য দেখ, আর বল ; এখন আর বাতির আলোর প্রয়োজন নাই। গ্রন্থের মত বলিতে হইবে না। এ সময় নববিধানের পবিত্র সময় ; এ সময় ক্রমে মনুষ্যের বাক্য নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। এ সময় জ্বলন্ত ব্রহ্মবাণীর অধিকার। আচার্য্যের এখন প্রয়োজন নাই, আচার্য্য উপাচার্য্যের ব্যবসায় 'বন্ধ হইতেছে।' তবে বক্তাই কি কেবল ব্রহ্মবাণীর আবাসস্থল ? শ্রোতা কি ব্রহ্মদ্বারা অনুবিদ্ধ না হইয়াও, ব্রহ্মবাণী ধারণ করিতে পারেন ? কে বলিল ? 'কে বক্তা, কে শ্রোতা ? হরি বক্তা, হরি শ্রোতা। হরি যদি না বলান, কে বলে ? হরি যদি না বুঝান, কেই বা বুঝে ? তাঁর শক্তি বিনা সরলতম সত্যকেও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, কোন সত্য কাহারও শুনিবার অধিকার হয় না। হরির বলাও চাই, হরির শোনাও চাই।' তবে কি এ সময়ে মানুষের কথার মধ্যে কেবল ঈশ্বরের কথা ? 'এখনকার কথার মধ্যে মানুষের কথা যে নাই, তাহা বলিতেছি না। যদি থাকে, তাহা অসত্য, তাহা ভ্রান্তি। দিন আসিতেছে, মানুষের রসনাকে যন্ত্র করিয়া, ঈশ্বরই কেবল জীবের কর্ণে মধুবর্ষণ করিবেন। ব্রহ্মবুদ্ধি ভিতরে থাকিয়া মানুষের বুদ্ধি উদ্দীপ্ত করিবেন, ব্রহ্মভক্তি ভিতরে থাকিয়া মানুষের বোধকে কার্য্যে পরিণত করিবেন।' যদি বক্তার মুখে হরি বক্তা হইলেন, শ্রোতার কর্ণে হরি শ্রোতা হইয়া বসিলেন, তবে যখন উপাসনা করিব, তখন কি নিজে করিব ? না, 'আর আপনি উপাসনা করিও না, যদি ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়া জিহ্বাকে উত্তেজিত করেন, তবেই উপাসনা হইবে।' যদি বক্তা নিজের বক্তৃত্বের পরিচয় দিতে ব্যস্ত হন, কি করিব ? 'যেখানে বক্তা নিজে বলেন, দাঁড়াইয়া বক্তৃতাকে সেখানে কাটিবে। বলিবে, তোমার গরলপূর্ণ কথা শুনিতে আমরা আসি নাই। দুই দশ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিলাম, কি মানুষের কথা শুনিবার জন্য ? মানুষের কথার পরিত্রাণ নাই। তোমার আচার্য্যবেশ ছাড়, মানুষ-রসনা ছাড়। দেবস্থর চড়াইয়া দেবগান আরম্ভ কর; ব্রহ্মস্বরে যদি গান হয়, বক্তা বলিতে বলিতে ব্রহ্মে মোহিত হইবেন, শ্রোতা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। শব্দ যদি ব্রহ্ম হন, মুখে ব্রহ্মশব্দ

উচ্চারিত হউক, কর্ণে ব্রহ্মশব্দ প্রবিষ্ট হউক। বলিতে বলিতে স্বর্গ, শুনিতে শুনিতে স্বর্গ।'

"আচার্য্য ব্রহ্মবাণীতে উপদেশ আরম্ভ করিয়া কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিলেন? 'ভগবানের প্রেম।' মধুর বিষয়, মনোহর বিষয়। কেন, প্রেমের কথা কি আর বেদী হইতে শুনা যায় নাই? হাঁ, শুনিয়াছি, কিন্তু এমন মধুর প্রেমের কথা আর শুনি নাই। স্বয়ং আচার্য্য বলিয়াছেন, 'আমরা যাহাকে ভালবাসা বলি, তাহা অনেক প্রকার আছে। উৎকৃষ্ট ভালবাসা বাহির করিতে হইবে। ভগবান্ অনেক ফুল রাখিয়াছেন; গোলাপ, জুঁই, মল্লিকা, চাঁপা, কদম্ব, পদ্মফুলে তোমার হৃদয় সাজান রহিয়াছে। ভগবান্‌কে বল, কোন্ ফুল ভাল লাগে? কোন্ ফুল তিনি তুলিয়া লইবেন? পদ্ম, না, গোলাপ? জুঁই, না, চাঁপা? ভালবাসা কত রকম, ফুল কত রকম। চাঁপার গন্ধ গোলাপে নাই, জুঁইয়ের গন্ধ চামেলিতে নাই। কিন্তু প্রত্যেকটীই সুন্দর।' ঈশ্বরকে কখন আমরা মা বলি, পিতা বলি, বন্ধু বলি, ভাই বলি, ঘরবাড়ীও বলি; যাহার যাহা প্রিয়, তাহারা তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া সমাদর করে। ইহাতে কি ঈশ্বরাবমাননা হয়? না, 'সেই স্তবের কাছে বেদ বেদান্তের স্তব ভাল লাগে না। সেই স্তব ঈশ্বরের এত ভাল লাগে যে, তিনি বলিলেন, ঋগ্বেদের স্তব অপেক্ষা আমি এই স্তব পছন্দ করি।' কেন, এ স্তব ঈশ্বরের মনোনীত কেন? 'যাহাতে যাহার কিছু মঙ্গল হইয়াছে, উপকার হইয়াছে, তাহার তাহাই স্তবের উপকরণ হইয়াছে।' 'বড় বড় বক্তৃতা ঈশ্বরের সমক্ষে করিও না। তাঁহার সমক্ষে বক্তৃতা করার ন্যায় অন্যায় দুষ্ট কার্য্য আর নাই। প্রেমের উচ্ছ্বাস যেরূপে হয়, তাই দেখানই ভাল।' এমন কি, ভক্ত হরিতে সন্তান-বাৎসল্য পর্য্যন্ত অর্পণ করেন; তাহাতেও তাঁহার অবমাননা হয় না। 'ভক্তের কাছে হরি অঙ্গীকার করিয়াছেন, যখনই আমায় ডাকিবে, তখনই আমি আসিব।' অধিক কি, ভক্তের উপাধান নাই, ভক্ত হরিকেই উপাধান করিয়া সমুদায় রাত্রি নিদ্রা যান। 'হরি কি ভক্তের মস্তক আপনা হইতে ফেলিয়া দিয়া যাইবেন? কোথায় ফেলিয়া যাইবেন? হরি কি তা পারেন? হরি তাহা পারেন না।' হরির নিকটে আর ভক্তের প্রার্থনা নাই, আব্দার। তিনি যে আব্দার করেন, হরি তাহাই পূর্ণ করেন। এমন কি, তাঁহার আব্দার করিবার পূর্ব্বে সকলই তিনি অগ্রে আয়োজন করিয়া

রাখেন ; সুতরাং 'আগে প্রার্থনা ছিল, এখন কেবল তাঁর মুখ তাকিয়ে থাকা। যা কিছু প্রয়োজন, হরি নিজেই সমস্ত প্রদান করিবেন।' হরির সঙ্গে বৎসর বৎসর বিবিধ ক্রীড়া হইয়াছে, এবার তাঁহার সঙ্গে কোন্ ক্রীড়া, কোন্ আমোদ ? এবার ফুল দিয়া আমরা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব ? পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল ফুল দিয়াছি, এবার দেখি, হরি তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। সে সকল ফুল বাসি হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার কেন সন্তোষ হইবে ? এবার তিনি কোন্ ফুল চান ? 'সতীত্ব ফুল। ভাবের ভাবুক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, ডালিতে সতীত্বফুলের অভাব শুনিয়া। পিতৃভাবে, মাতৃভাবে, বন্ধুভাবে, পুত্রভাবে, প্রিয়বস্তুভাবে, সকল ভাবেই সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু সতীর ভাব ব্রাহ্মেরা এখনও দিতে পারেন নাই। মা কি সহজে বিষণ্ন ? সুন্দর সুন্দর ফুল আমরা আনিয়াছি, তিনি প্রেমরসে রসাভিষিক্ত হইয়া লইতেছেন না কি সহজে ? রসবিহীন ফুল কি তিনি স্পর্শ করিবেন ? পুরুষ, না, নারী তোমরা ? পুরুষ। ভগবতী চলিয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইল।' একি কথা, পুরুষ হইবেন নারী ! পুরুষ—নারীর সতীত্ব, অব্যভিচারী প্রেম না পাইলে জগৎপতি সন্তুষ্ট হইবেন না। এ ফুল কোথায় পাইব ? প্রাচীন কোন স্থানে নহে, নববিধানের নববৃন্দাবনে এই ফুল লইয়া 'ঈশ্বরের নিকটে পতিপ্রিয় সতীর ন্যায় যাইতে হইবে।' কেন, এ ফুলের এত আদর কেন ? এই এক ফুলের মধ্যে সমুদায় ভাব নিহিত আছে। 'সতীর প্রেমের ন্যায় আর প্রেম নাই ; এ শাস্ত্র অভ্রান্ত, উৎকৃষ্ট শাস্ত্র। সতীর সতীত্ব লালফুল ; কত চিত্র বিচিত্র করা তাহাতে, পিতৃভক্তি, বন্ধুর প্রণয়, ভ্রাতৃস্নেহ এ সকলও ইহার মধ্যে আছে। ইহা যেন একটি নূতন ফুল, ইহা প্রণয়পূর্ণ। স্বামীই সতীর সর্ব্বস্ব। নিরাশ্রয় অবস্থায় সতী কন্যারূপে স্বামীর সেবা করেন, কখনও ভগিনীভাবে পতিমুখপানে চাহিয়া হাস্য করেন। কোন ভাবই সতীত্ব-ভাব হইতে ছাড়া নয়। * * * ভাই ভগিনীকে খেলা করিতে দেখিলে, সতী ভাবেন, আমরা কেন এইরূপে খেলা করিব না ? স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া ভাই ভগ্নীর সুখ কেন লাভ করিব না ? আমরা কি ভাই ভগিনী নই ? সে সম্বন্ধ তো ঘোচে না। বিবাহ হইলে সে সম্বন্ধ আরও প্রগাঢ় হয়। সতী স্বামীকে ভাই ভাবে ফোঁটাও দিতে পারেন। আবার যখন স্বামী শয্যাতে শয়ান, উঠিবার সামর্থ্য নাই, রোগে জর্জ্জরিত, সে সময়ে মাতার ন্যায় গম্ভীর ভাবে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে

সতী ভিন্ন আর তো কেহই নাই; স্বামীর তখন মা বাপ ভাই বন্ধু যা বল, সবই এই একজন। টাকা স্ত্রীর হস্তগত, পাইয়াছেন স্বামীর কাছে; এবার স্বামীকে দিবার সময়। ভাল বেদানা কোথায়, মিছরি কোথায়, স্ত্রী কেবল এই বলেন। স্বামীর জন্য স্ত্রীই মাতার কার্য্য করেন।' সতীর মতন 'এমন পতি-মর্য্যাদা আর কে জানে? কে আর এমন পতির সেবা করে? সতী যে এসব কার্য্য করেন, সে কি টাকার লোভে? না, দশ জন লোকে তাঁহার নামে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করিবে বলিয়া? পাড়ার লোকের সুখ্যাতির জন্য কি সতী পতি-সেবায় ব্যস্ত হন? না। পতি যে তাঁর সর্ব্বস্ব; পতিই তাঁহার ভাল লাগে। পতির যাহা কিছু, তাহাই তাঁহার নিকট সুন্দর ও মিষ্ট।' 'সতীর যেমন দ্বিতীয় পতি থাকিতে পারে না, ব্রহ্মভক্ত তেমনি বলিতে পারেন না, যে জগৎ-পতি আর এক জন আছেন। অন্য পতি আছে, বলিলে তাঁহার গলা কাটা হয়।' 'সতী যে চেষ্টা করিয়া পতি-মর্য্যাদা শিখিয়াছেন, তাহা নয়, আপনিই আপনার সরস্বতী। আপনার মনে আপনিই কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেন। আর ব্রহ্মপতি যাঁহার পতি, তাঁহারও তেমনি। পতি ভিন্ন আর তাঁহার কিছুই ভাল লাগে না।' 'ব্রহ্মই প্রাণপতি; এ কথাতে ব্যাকরণের কিছুই ভুল নাই। কি বেদবেদান্ত, কি শিখধর্ম্ম, কি ইংরাজধর্ম্ম, সকলধর্ম্মই তাঁহাকে পতি বলিয়া থাকেন। জগৎপতি স্বর্গপতি, তিনি যদি সাধারণ ভাবে পতি হন, তবে এক এক জনের পতি না হইবেন কেন? আমি কি এমনই কুলটা যে, আমি তাঁহাকে পতি বলিব না? সকলের পতি হইবেন তিনি, কেবল আমিই বাদ পড়িব? তিনি জগতের পতি, কেবল কি আমারই পতি নন? এই পথে ব্যভিচার কণ্টক, অন্য কণ্টক নাই। জ্ঞান চাই না, পতিভক্তি থাকিলেই পতি কাছে আসিতে দিবেন। মানুষ পতির ন্যায় তিনি নন; নিরাকার পতি, ব্রহ্মপতি। আমি বালিকা পত্নীর মত তাঁহার পানে চাহিব, সতী দাসী হইয়া আমি তাঁহার কাছে থাকিব, আমি তাঁহার পদার্চ্চনা করিব। আমার ধনপতি, সংসারপতি, বন্ধুপতি ছিল; সকলে হাত ধরিয়া রাস্তায় কাঙ্গাল করিয়া বসাইল। এখন সাতপতির অর্চ্চনা না করিয়া, আসল পতি ব্রহ্মপতির শরণাগত হইব!' পতির হাস্যেই সতীর স্বর্গ, ব্রহ্মের হাস্যেই আমাদিগের স্বর্গ। অব্যভিচারী প্রেম যদি আমাদিগের পক্ষ থাকে, ঈশ্বর দেখিয়াই চিনিবেন এবং হাতে ধরিয়া আমাদিগকে কাছে বসাইবেন।

'আগে বলিতাম, বেদ থেকে উপদেশ লও, পুরাণ হইতে উপদেশ গ্রহণ কর, ঈশার বিবেক লও, অমুকের ভক্তি লও; পাঁচটি ফুল তোল, ভাল করিয়া মালা গাঁথিয়া পর। প্রেমের মত্ততায় ভালবাসার ভিতরে পাঁচ নাই, দ্বিতীয় তৃতীয় নাই। পৃথিবীতে গুরু নাই, ভাই ভগ্নী নাই, জগৎপতিই সমস্ত। পতিকুলই প্রিয়কুল। সতীর কাছে পতির বাড়ীর ভাঙ্গা জানালাটিও ভাল। পতির বাড়ীর লোক, তোমরা পতিকে না চিনিলে, তোমাদিগকে কিরূপে চিনিব?' 'পতি যাহাতে বিরক্ত না হন, তাহাই আমার কার্য্য। তাঁর যত কুটুম্ব, সব আমার কুটুম্ব। পতির জীবন আমার প্রিয়।' 'মানুষ আর মানুষ নয়, জীবে ব্রহ্ম অবতীর্ণ। নদ নদী গাছ পালা, সমস্ত পদার্থেই আমার ব্রহ্মপতি, তাই সকলের সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবার সুন্দর হইব। ছিলাম অব্যবসায়ী, এবার ব্যবসায়ী হইব। ছিলাম উদাসীন, এবার গৃহস্থ হইব। এবার সপরিবারে গৃহধর্ম্ম সাধন করিব। সকলে মিলিয়া সতীত্বধর্ম্ম পালন করিব। এবারকার উৎসব সতীদিগের উৎসব হউক। পতির মুখ দেখিয়াছি বলিয়া, সকলে পাগল হইয়া যাও। আপনার আত্মাকে সুন্দর কর, পতির পদ ধারণ করিয়া যত দুঃখ সন্তাপ নিবারণ কর।' ('সতীত্ব' বিষয়ে উপদেশটী 'সেবকের নিবেদন' ৪র্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।)

দিনব্যাপী উৎসব—অপরাহ্লে ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও ধ্যানের উদ্বোধন, সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তন

"প্রাতঃকালীন উপাসনা মধ্যাহ্ন কাল অতিক্রম করিয়া বেলা ১টা বাজিলে ভঙ্গ হয়। সুতরাং মধ্যাহ্ন কালের উপাসনা আর হইতে পারিল না। কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রামান্তে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়; বিদেশ হইতে সমাগত, যাঁহারা সেই সেই স্থানে উপাচার্য্যের কার্য্য করেন, তাঁহারাই প্রায় ব্যক্তিগত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর ধ্যানের জন্য আচার্য্য বেদীতে আসীন হন। ধ্যানের উদ্বোধনে ধ্যানের ক্রমিক অবস্থা বিবৃত হয়। প্রথমাবস্থা নির্ব্বাণ, কোন প্রকারের চিন্তা ধ্যানের মধ্যে আসিতে না দেওয়া। তৎপর ব্রহ্মসত্তাতে চিন্তার নিমগ্নভাব। পরিশেষে মাতা প্রভৃতি সম্বন্ধানুভব। এই সময় আচার্য্য একতারা যোগে সুললিত তানে নববিধানের নববিধ যোগারম্ভ করিলেন। সকলে ইহাতে মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত হইলেন। শেষাবস্থায় চিদাকাশে আত্মার বিলয় এবং আনন্দে স্তম্ভিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি। যাঁহারা ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই

পর পর অবস্থার আস্বাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাই কেবল এবারকার ধ্যানের মর্ম্ম কথঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের জন্য ধ্যান চিরজীবনের অপরিহার্য্য সামগ্রী হইয়াছে। সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তনের প্রমত্ততা সমুদায় মন্দিরকে টলমল করিয়া তুলিয়াছিল। সে নিবারণ করে কাহার সাধ্য। যদি অন্য দিকে বিপরীত ভাবের টান না থাকিত, তবে নিশ্চয় কেহ এ সঙ্কীর্ত্তন আর থামাইতে পারিত না। মহাত্মা চৈতন্যের সময়ে মহাপ্রেমের উচ্ছ্বাসে কি হইত, এবারকার সঙ্কীর্ত্তনে তাহার আভাস সকলে অবলোকন করিয়াছেন। এই সায়ংকালে এত জনতা হইয়াছিল যে, মন্দিরে তিলার্দ্ধও স্থান ছিল না। আমরা পরে জানিতে পারিয়াছি, বহু লোক স্থানাভাবে চলিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনানন্তর ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

দিনব্যাপী উৎসব—সন্ধ্যায় প্রতাপচন্দ্রের উপদেশ 'শব্দ এবং প্রতিশব্দ'

"জর্ম্মণী দেশে রাইন নদীতীরে লোর্লি নামে এক বিচিত্র স্থান আছে, এই স্থান পর্ব্বতময় নদীকূল। সেই সকল পর্ব্বতের এক বিশেষ গুণ এই, কেহ যদি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করে, সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে এত দূর পর্য্যন্ত যায়, যেন প্রতিধ্বনিরূপ সাগরে মিশিয়া পড়ে। এই ব্যাপার দেখিলে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। শব্দ এবং প্রতিশব্দ, ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি। হে ব্রাহ্ম! এ বিষয়ে কি আলোচনা করিয়াছ? আওয়াজ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, মনে কি ইহা লাগিয়াছে? সর্ব্বদা পৃথিবী নানাবিধ শব্দে পরিপূর্ণ; কয় জন লোক স্থির হইয়া শব্দতত্ত্ব আলোচনা করে? আওয়াজের বিষয় বলা এবং ভাবা কার অধিকার? সাহিত্যের? না, বিজ্ঞানের? না, ধর্ম্মের? আমি বিবেচনা করি, শব্দের গভীর তত্ত্ব বিজ্ঞানের অতীত, ধর্ম্মের অধিকৃত। শব্দকে সঙ্কোচ করা, শব্দ দ্বারা দিক্ বিদিক্ কম্পিত করা, শব্দে শাস্ত্র সংগঠন করা, বিদ্যা উৎপন্ন করা, এ সমুদায় ধর্ম্মের ব্যবসায়। শব্দ কি, শব্দ কত বড় হইতে পারে, কত ছোট হইতে পারে, এ সকল অতি অদ্ভুত আলোচনা। শব্দকে বৃদ্ধি করিতে করিতে, এমন ভয়ঙ্কর করা যায় যে, মানুষের কর্ণ তাহা সহিতে পারে না। এক বজ্রের শব্দ শুনিলে লোকে কর্ণে হস্তার্পণ করে। কে না মনে ভাবিতে পারে, এই বজ্রের শব্দ শতগুণ হইতে পারে। এক বজ্রের শব্দ শত

বজ্রের শব্দ হইতে পারে। সেই ভয়ানক শব্দ সহিতে পারে, এমন শ্রবণপুট কাহার আছে? এই শব্দকে যদি সঙ্কোচ কর, যদি ছোট হইতে এত ছোট হইয়া যায় যে, নিস্তব্ধতার সঙ্গে প্রভেদ না হয়, তাহা হইলে মানুষের শ্রবণ সূক্ষ্মতম শব্দের সঙ্গে আর নিস্তব্ধতার সঙ্গে প্রভেদ করিতে পারে না। শব্দের অর্থ কি? যদি বল 'ক', তাহার মানে কি? কিছুই না। যদি কএ আকার দেও, কি বুঝায়? কিছুই না। যদি আর একটি অক্ষর পাত কর, কি হয়? কিছুই না। কিন্তু শব্দ হইবামাত্র, একটী শব্দ বলিবামাত্র মনে একটী ভাবের উদয় হয়। শব্দের অর্থ ভাব, অর্থাৎ একটী শব্দ বলিবামাত্র স্বাভাবিক নিয়মে একটী ভাবের উদয় হয়। যদি বলি, 'আত্মা কি পরমাত্মা', তাহা হইলে ভাবযোগে হৃদয়ের মধ্যে একটী বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। যদি বল, উহা হইতে পারে, কেন না আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দের মানে আছে। তাহা হইলে বীণার আওয়াজ মনে কর। নদীর বক্ষে যখন বায়ু বহে, সেই বায়ু দ্বারা বাঁশির শব্দ যখন কর্ণকুহরে আসিয়া স্পর্শ করে, তখন কি অদ্ভুত ভাবের সমাগম হয়। যখন কোন আওয়াজ কর্ণে প্রবেশ করে, কাহারও হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিত হয়, কাহারও হৃদয়ে আহ্লাদের সমাগম হয়, কাহারও হৃদয়ে বা অপর কোন ভাব। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শব্দের কোন অর্থ নাই, অথচ শ্রুত হইবামাত্র হৃদয়ে বিচিত্র ভাব উৎপাদন করে, শুনিবামাত্র ভাবের উচ্ছ্বাস হয়। এই জন্যই বীণাবংশির আদর, এই জন্যই সংগীতের উৎপত্তি, এই জন্যই বেদ-পাঠ। ইহারই জন্য বিবিধ প্রকার শব্দশাস্ত্র আসিয়াছে। যদি মূলে অবতীর্ণ হও, দেখিবে, আদিশব্দ কি ছিল। প্রথম শব্দ কে উচ্চারণ করিল? প্রথমে যে আওয়াজ হইল, সে কি আওয়াজ? বেদে বলে, আদিশব্দ ওঁকার। এই যে ওঙ্কাররূপ বিচিত্র চিহ্ন, ইহার ভিতর সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র, সমুদায় তত্ত্ব নিহিত। কথিত আছে, ঋক্‌বেদীয় ঋষিগণ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলেন, উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহাদের শুভ্রকেশ স্বর্ণে মণ্ডিত হইয়া গেল; মুখ হইতে স্বর্ণরাশি বহির্গত হইতে লাগিল। যেমন আমাদের দেশে শব্দের মাহাত্ম্য এইরূপ কতভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, অন্যদেশে, খ্রীষ্টানদিগের দেশে, গ্রীস দেশে, আফ্রিকার মিশর দেশেও শব্দের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। শব্দের চিন্তাতে মহা মহা পণ্ডিতগণ, ধার্ম্মিক-গণ মগ্ন ছিলেন। আমাদেরও উচিত হইয়াছে, এ বিষয়টী কি, উপলব্ধি করিব।

যদি পারি, আমরা শব্দের উপর আমাদের ধর্ম্মকে স্থাপন করিব। সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নাম ঈশ্বরের শব্দ। কোরাণ কি? শব্দ। গুরু নানকও অনাহত শব্দের কথা লিখিয়া যান। বাস্তবিক শব্দ বিনা ধর্ম্ম স্থাপিত হইতে পারে না। যতক্ষণ না শব্দ ঈশ্বরের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হয়, যতক্ষণ না সেই বিস্তৃত পরমাত্মা, সেই আকাশব্যাপী ব্রহ্ম, সেই সর্ব্বঘটে বিরাজমান-লাবণ্যময়ী শক্তি, সঙ্কুচিত হইয়া, গাঢ় হইয়া শব্দায়মান হন, ততক্ষণ ঈশ্বর বোধ হয় না, ধর্ম্মের গভীরতা বোধ হয় না। সেই ধর্ম্মাকাজ্ক্ষী লোক সর্ব্বদা শব্দের অনুসরণ করেন। শিখ বলে, গ্রন্থ সাহেব প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের নাম শব্দ। ভজন নয়, শাস্ত্র নয়, সংগীত নয়, শব্দ। শব্দ কেন নাম হইল? সেই সকল ছন্দে, বন্দে, সেই সকল শব্দে, সেই সকল ভাবে, ঈশ্বরের মহিমা এমনই প্রকাশিত যে, শ্রবণ মাত্রই শ্রোতার ধর্ম্মবোধ, ব্রহ্মবোধ হয়। অতএব যাহা কিছু ধর্ম্ম ও সত্য, যাহা ঈশ্বরের গুণ ও প্রকৃতি, সমুদয়ই শব্দায়মান হয়। কেন হয়? না শুনিলেত বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাসের উৎপত্তি কোথায়? কর্ণে শ্রবণে। বিশ্বাসী সাধুরা বলিয়া গিয়াছেন, শব্দ-শ্রবণে বিশ্বাস হয়। অতএব, হে উপস্থিত ভ্রাতৃগণ! শ্রবণের উপর যে ঘৃণা করে না, যে শ্রুতিধর. যে শব্দরূপবর্ণকে ধরিয়া রাখে, তাহারই ধর্ম্মে অধিকার হয়। অগ্র শুনিয়াছ, যেমন বক্তার আবশ্যক, তেমনি শ্রোতারও আবশ্যক। আমি বলি, শ্রোতার বরং অধিক আবশ্যক। আকাশ হইতে জল পড়িয়া যদি অরণ্যে বা মরুভূমিতে যায়, তাহা হইলে কি ফল জন্মে? অতএব এই যে শব্দরূপ শ্রাবণ মাসের জলধারা, যাহা শাস্ত্রে, আচার্য্যের কথাতে, পরিব্রাজকের জিহ্বাতে, ইহাকে ধারণ করে কে? শ্রোতার শ্রবণরূপ সরোবরে যখন এই জল পড়ে, তখনই ধর্ম্মের উদ্যানে ফল হয়, ফুল হয়, ঐশ্বর্য্য হয়। বক্তৃতা করিতে অনেকেই পারে, কিন্তু শ্রবণ করিয়া কথার ভাবরস পান করা সকলের হয় না। মুনিদিগের মান অধিক, চিরকালই আছে। মুনিত কথা কহেন না? ধর্ম্ম তাঁহার কোথায়? তিনি ক্রমাগত বসিয়া শব্দসিন্ধু পান করেন, শব্দ রোমন্থন করেন, চর্ব্বণ করেন। মৃগ কি গো যেমন আহার করিয়া, চর্ব্বণ করিয়া, রক্তমাংসাদি লাভ করে, ধর্ম্মের মেষ যিনি, তিনি নানা শাস্ত্র, নানা আচার্য্য হইতে ফুল, ফল, পল্লব সংগ্রহ করিয়া, মুনি হইয়া রোমন্থন করেন। দেখিয়াছত, মৃগ কি গো যখন চর্ব্বণ করে, তখন অন্যদিকে তাকায় না; স্থির হইয়া চর্ব্বণ

করে। যিনি আহূত শ্রোতা, মনোনীত শ্রোতা, 'কেন না জানিও, শ্রোতাও প্রেরিত আছে', তিনি শব্দ লইয়া সেইরূপ মত্ত হন। বীণা বংশী বাজিতেছে, তূরী ভেরী শব্দ নিনাদিত হইতেছে, পক্ষিকণ্ঠ হইতে আওয়াজ হইতেছে, তিনি এই সমস্ত লইয়া চর্ব্বণ করিয়া রক্ত মাংস, স্বাস্থ্যে পরিণত করেন। আমিও একজন সকলের মত শ্রোতা। শুনিবার শাস্ত্রে আমার অধিক সম্মান। যখন শুনিতে হইবে, হৃদয়কে সরোবর করিয়া শব্দের জল ইহাতে ধরিতে হইবে। শব্দ আসিবে কোথা হইতে? ঈশ্বরের নিকট হইতে। ঈশ্বরের কি মুখ আছে? নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের কি মুখ কল্পনা করিতে পারি? যদি মুখ না থাকে, তাহা হইলে শব্দ হয় কিরূপে? 'ওরে রসনা! হরিনাম বল্', এইরূপে রসনার উপরে সম্বোধন সতত শুনি। কেন না, এই যে রসনা, ইহা রসকে আস্বাদন করে। ইহা হইতে যখন পুণ্যরস উদ্ভূত হয়, তখনই ইহা রসপ্রসূ রসনা। সকল রসের মূল কোথায়? মিষ্ট রস বল, সাহিত্যরস বল, নীতিরস বল, ধর্ম্মরস বল, সমুদায় রসের মূল কোথায়? শাস্ত্রে বলে, 'রসো বৈ সঃ' ঈশ্বর যিনি, তিনি রসস্বরূপ, তৃপ্তিস্বরূপ। যেমন তিনি সত্যস্বরূপ, তেমনই তিনি রসস্বরূপ। হাস্যরস, কবিত্বরস, বিজ্ঞানরস, ধর্ম্মরস, সমুদায় রসের আস্বাদন মিলিত হইয়া তাঁহার নামকে সুমিষ্ট করে। দয়াল নাম মধুর নাম। মধু হইল কোথা হইতে? গোলাপরস, পদ্মরস প্রভৃতি সমুদায় রস মধুকে রচনা করে। আমরা যদি পাঁচ সহস্র বৎসর গোলাপ চর্ব্বণ করি, মধু-বর্ষণ হয় না, কিন্তু মক্ষিকা দশটী ফুল হইতে কত মধু সঞ্চয় করে। নানা প্রকার ফুলের কথা আজ শুনিয়াছি। শান্তি-চম্পক, ভক্তিপদ্ম আছে, নানা প্রকার ভাবের দ্বারা উপাসকের হৃদয় পূর্ণ হয়। সমুদয় ভাব ঈশ্বর হইতে একত্রিত হইয়া সাধু হৃদয় চিত্রিত হয়। শান্তি-পীযূষ, কবিত্বের মধু, ভক্তের গভীর সুখ সমুদয় একত্রিত হইয়া রসস্বরূপ ঈশ্বরে সঞ্চিত আছে। রস আস্বাদিত হয় কিরূপে? বলিয়াছি, রসনা দ্বারা। তবে রসনা কি হইল? হইল যন্ত্র। পুণ্যের বাজনা তাহাতে বাজে, পুণ্যের লহরী তাহা হইতে উচ্চারিত হয়। যে ব্যক্তি রসনাকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, সময়ে চাবি খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারেন, ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করাইতে পারেন ও বাঁশির ন্যায় বিবিধ ভাবের সুর বাহির করিতে পারেন, তাঁহাকেই বলি, ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র।

যে শব্দ বিনা শাস্ত্র নাই, ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই, সেই শব্দ বিনির্গত হয় কোথা হইতে ? যিনি ভক্ত, ঈশ্বরের ভৃত্য, রসনা-সাধনে সিদ্ধ, তাঁহারই মুখ নিরাকার ব্রহ্মের শব্দ-প্রকাশের যন্ত্র। কোন কোন মহাত্মা এমনই বলেন যে, বেদ বেদান্ত পরাজিত হইয়া যায় ! কোন কোন মহাত্মার এমনই উচ্চারণ যে, কাহারও নাম হইয়াছে চতুর্ম্মুখ। এই জন্যই বলে, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ। এক মুখে অধিক বলা যায় ভাবিতে না পারিয়া, লোকে অধিক মুখের আরোপ করে। মুখবান নর নারীই দেবতা বলিয়া গণিত হইয়াছেন। এক ভাব সাধক-মুখে উচ্চারিত হয়, সংগীতে সেই ভাব গীত হয়, বাদ্যযন্ত্রে সেই ভাব বাজে। মূল কোথায় ? সাধক-বিনিঃসৃত একটি শব্দ। সাধক যাঁহারা, ঈশ্বরের দাস যাঁহারা, তাঁহাদের মুখ যন্ত্রস্বরূপ। ইহার আওয়াজে কোটী বাদ্যযন্ত্র হারিয়া যায়। একটি শব্দ ঈশা উচ্চারণ করিলেন, চার সহস্র লোক একত্রিত হইয়া তাহাই গান করিতেছে, ইহা কর্ণে শুনিয়াছি। এই যে প্রকাণ্ড বজ্রতুল্য চীৎকার, যাহা এক মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহা ঠিক লোলী নামক স্থানের শব্দের ন্যায়। এমনই নিকটে আসিবে, এমনই দূরে যাইবে, যে ভয় পাইতে হয়। সাধক-কণ্ঠের ধ্বনি বিদেশে চলিয়া গেল, ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ করিল। প্রথম মানুষ যিনি, তিনি হয়ত বলিলেন, 'পিতাকে প্রেম কর, ভ্রাতাকে ভালবাস।' এ শব্দ কোথা হইতে তিনি বলিলেন ? অন্তরের এক শব্দ হইতে। ভিতরের সেই যে এক শব্দ, তার নাম কি ? তার নাম বিবেক, তার নাম প্রত্যাদেশ, তার নাম আদেশ। তার নাম কি ? তার নাম মনুষ্যের আত্মাতে ঈশ্বরের স্থিতি। সেই স্থিতি হইতে যে ধ্বনি হইল, তাহারই প্রতিধ্বনি বরাবর হইতে চলিল। এক জন উপদেষ্টার প্রতিধ্বনি দশ জনে করে ; এক জন আচার্য্যের প্রতিধ্বনি পাঁচ শত লোক করে। এক ভগবদ্ভক্তের প্রতিধ্বনির এই রবিবারে চল্লিশ সহস্র প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। এই মুহূর্ত্তেই উঠিতেছে। উপাসনা ও প্রতিধ্বনি সকলই প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনিতে আকাশপূর্ণ। প্রথম শতাব্দী অন্য শতাব্দীকে প্রতিধ্বনি দিল। কি দিল যুগ যুগকে ? ঈশার শব্দের প্রতিধ্বনি, মুষার শব্দের প্রতিধ্বনি। আদি ইহার কি ? ঈশ্বরের শব্দ। লোলি পর্ব্বতের ন্যায় দূর হইতে নিকটে, নিকট হইতে আবার দূরে প্রতিধ্বনি হয়। প্রসান্ত মহাসাগরে যদি কেহ একটি প্রস্তর ফেলে, প্রথম

একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ হয়, তার পর একটি বড় আয়তন তরঙ্গ হয়, তার পর আর একটি হয়। শেষে হয় কি? শেষে কোটী কোটী ক্রোশব্যাপী প্রশান্ত সাগরকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। তেমনি ভক্তরূপ ক্ষুদ্র প্রস্তরাভিঘাতে পরমাত্মা-সাগরে যে তরঙ্গ হয়, তাহা প্রথম বেদীর চার দিকে বদ্ধ থাকে, ক্রমে উড়িষ্যায় যায়, পঞ্জাব দেশে যায়, গুজরাটে যায়, ইংলণ্ডে যায়। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই যে শব্দ, ইহা ব্রহ্মের প্রকাশ। ধন্যবাদ করি তাঁহাদিগকে, যাঁহারা এই শব্দকে রক্ত মাংসের আকার দিতে পারেন। তাঁহাদিগের ভিতরে অনাহত শব্দ আহত শব্দ হয়। বীণাপাণি আর কে? সেই, যার মুখ হইতে ব্রহ্ম-অভিপ্রায়, ব্রহ্ম-আজ্ঞা বিনির্গত হইয়া এমনই শব্দ করে যে, সমুদায় বাদ্যযন্ত্র হার মানে। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ! এই শব্দের প্রতি অমনোযোগ করিও না। শ্রোতার এই গৌরব যে, প্রেরিত শ্রোতা সুশব্দ কুশব্দের পার্থক্য বুঝিতে পারেন। প্রেরিত সিদ্ধ বক্তা যেমন কুশব্দ বলেন না, কেবল অন্তরে বাজে যে শব্দ, তাই বলেন, প্রেরিত শ্রোতা তেমনই সুশব্দই শ্রবণ করেন। আমাদিগের মন্দির হইতে তাই বাজুক, আমরা শ্রবণপুটে তাহাই সঞ্চয় করি। আমরা মুনি হই, ধারক হই, শব্দ-ব্রহ্মে হৃদয় পূর্ণ করি; শব্দ আহার করি। বৃক্ষ লতা আমাদের নিকট গান করুক; অচেতন সচেতন সকলে মিলিয়া অশব্দ ব্রহ্মের ভাব শব্দায়-মান করুক। ঈশ্বর আমাদিগের উপর এই সৌভাগ্য বিধান করুন।

আর্য্যনারীসমাজ

"১১ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) সোমবার। অদ্য প্রাতঃকালে আর্য্যনারী-সমাজের উপাসনা হয়। এবার মন্দিরে নারীগণের সংখ্যা পূর্ব্ববারাপেক্ষা সমধিক হইয়াছিল। মন্দিরের সমুদায় গ্যালারি তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। অদ্য প্রাতে ব্রাহ্মিকাগণ দ্বারা গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল; আচার্য্য বেদীতে আসীন হন। নিয়মিত উপাসনান্তে যে উপদেশ হয়, তাহাতে সতীত্ব-ধর্ম্ম অতি সুন্দররূপে বিবৃত হয়। মহেশ্বরের নিন্দাতে সতীর মৃত্যু এবং পুনরায় নবদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ, এই বিষয়টি এমন আশ্চর্য্যরূপ প্রতি আত্মার অবস্থার সঙ্গে মিলিত করা হয় যে, যে ব্যক্তি এই উপাসনা শ্রবণ করিয়াছে, তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। আমরা সংসারে আসিয়া অবিশ্বাস নাস্তিকতা সংসার পাপ প্রভৃতিতে মহেশ্বরের নিন্দা নিয়ত শ্রবণ করিয়াছি, এই নিন্দা-শ্রবণে

আমাদিগের সেই মন এমন কলুষিত হইয়াছে যে, যোগে এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবতনু নবজীবন লাভ না করিলে, আর দেবাদিদেব মহাদেবকে যে পতিত্বে বরণ করিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। সতী কি কখন পতির নিন্দা শুনিতে পারেন? না, শুনিয়া পাপ দেহ ধারণ করিতে পারেন? এই জন্য সংসারে মৃত হইয়া, নবতনু ধারণ করিয়া, পুনরায় তিনি পতিকে বরণ করিলেন। প্রত্যেক নারীকে এইরূপে পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া, নূতন কলেবর ধারণ করিতে হইবে, এবং ঈশ্বরকে চির পতিত্বে বরণ করিতে হইবে। অপরাহ্ণে নারীগণ কর্ত্তৃক উপাসনা, কীর্ত্তন ও বরণ হয়। রজনীতে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য করেন।

নগরসঙ্কীর্ত্তন—বীডন পার্কে 'যুগলভাব' বিষয়ে বক্তৃতা

"১২ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী), মঙ্গলবার। অদ্য নগর সঙ্কীর্ত্তন ও বিডন পার্কে বক্তৃতার দিন। এবার সঙ্কীর্ত্তন আচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্ব পৈতৃক গৃহ হইতে বাহির হয়। সর্ব্বসম্মুখে বালকগণ, তৎপর দেশীয় বিদেশীয় সঙ্কীর্ত্তনের দল মহোৎসাহে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বিডন পার্কে গিয়া উপস্থিত হয়। বিডন পার্কে সমবেত লোকের সংখ্যা বলিতে হয় না। এবার টাউন হলে লোকের স্থান হয় নাই; বিডন পার্কে আচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতার পক্ষে প্রশস্ত স্থান বটে, কিন্তু লোকের নিষ্পেষণে যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের মনে হয়, এ স্থানও এক প্রকার অনুপযুক্ত। সে যাহা হউক, আচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল :—

"আবার এক বৎসর পরে, এই আনন্দের শোভা দেখিয়া হৃদয় মন উৎসাহিত হইতেছে। প্রাণ আনন্দরসে প্লাবিত হইতেছে। সকলে ভৃত্যের প্রতি কৃপা করিয়া অন্তরের অনুরাগ কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। তোমরা আমাকে ভালবাস, জানি। তোমরা যেমন আমাকে ভালবাস, আমিও তেমনই তোমাদিগকে ভালবাসি। ভালবাসি বলিয়াই বৎসরান্তে আসিয়াছি। ধনের প্রয়াসে এখানে আসি নাই। মান মর্য্যাদার প্রয়াসও রাখি না। দাসত্ব করিতে আসিয়াছি। হরির আদেশে হরিকথা বলিয়া জীবন সফল করিব। আমাকে তিনি বলিয়াছেন, বল; আমি বলিব। আমি তাঁহারই আদেশে এক হাতে কাশী, আর এক হাতে বৃন্দাবন, এক হস্তে বেদ, অপর হস্তে পুরাণ, এক হস্তে জ্ঞান, অপর হস্তে

ভক্তি, এক হস্তে সূর্য্য, অপর হস্তে চন্দ্র এই দুই লইয়া বৎসরের শুভ দিনে উপহার দিতে আসিয়াছি। আমার বিনীত উপরোধ এই, দুই হাতে এই দুই গ্রহণ করুন। কৃতার্থ হইবে সে, যে উহা লইবে; সেও কৃতার্থ হইবে, লোকে পাইবে যাহার হস্ত হইতে। চারি হাজার বৎসর অতীত হইল, হিমালয়ের উপরে, মহোচ্চ গিরিশিখরে, সেই উচ্চগিরির উচ্চশিখরে বসিয়া আর্য্যগণ ব্রহ্মনিনাদে নিনাদিত করিতেন। বেদত তখনকার; এখন আমাদিগের কাছে সেই বেদ আসিয়াছে। সেই বেদ ছাপা হইয়াছে. আমরা তাহার স্তবস্তুতি পাঠ করিতেছি। ইন্দ্র বরুণের ভাব বুঝিতেছি; আকাশ দেখিয়া আকাশের দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বেদের সময় যখন চলিয়া গেল, পুরাণ তখন প্রস্তুত হইল; যখন চারিদিক শুক হইল, তখন জলবর্ষণ হইল। অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে ধরিতে গিয়া ব্রহ্মাংশের পূজা আরম্ভ করিল। ব্রহ্মকে কুচি কুচি করিল। এক এক অংশ লইয়া বন্দনা করিতে লাগিল। একটী সাধু, একটী সূর্য্য, একটী নদী লইয়া ব্রহ্মস্তুতি করিল। ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হাতে করিয়া ধরিতে লাগিল। ছোট দেবতাকে ধরিতে পাইল। পুরাণ তন্ত্রের অনুগত হইয়া আমি কোন্ ভাবের ভাবুক হইব? ঋষিরক্ত দেহের ভিতর রহিয়াছে, ভক্তরক্ত শরীরে বহিতেছে, দুই শোণিতই প্রবাহিত হইতেছে। যদি নরাধমের মুখ হইতে কাহারও নিন্দা বহির্গত হয়, পাপ হইবে। আর্য্য জ্ঞানীকে গৌরব দিতে হইবে, আর্য্য ভক্তকেও গৌরব দিতে হইবে। দুই ভাবকে মিলাইতে হইবে।

"এমন সময় ছিল, তখন লোকে ছয় মাসেও হয়ত কাশী যাইতে পারিত না; এখন তিনমাস, ছয়মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে! কাশী এখন হাবড়া, বালী, উত্তরপাড়ার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই কাশী, এই আমি। এই আজ হাবড়ায় টিকিট কিনিলাম, এই একেবারে কাশীতে। পৃথিবীর কাশীকে নিকটস্থ দেখিয়া, যদি আশ্চর্য্যন্বিত হই, তবে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইব, যখন দেখিব, মনের কাশী আরও নিকটবর্ত্তী। কাশী কি? যেখানে যথার্থ মহাদেবের পূজা হয়, সেই কাশী। যেখানে ওঁকারের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, সেই কাশী। যেখানে ঋষিরা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বেদের গুণ ব্যাখ্যা করেন, সেই কাশী। যেখানে তিনি পূজিত হন, আমি সেই কাশী চাই; ব্যাসকাশী চাই না। অন্য কাশীতে আমার প্রয়োজন নাই। বাষ্পীয়শকটের বল যেমন

বাহিরের কাশীকে এক মিনিটের রাস্তা করিয়া দিল, যোগবল তেমনি আসল কাশীকে নিকটে আনিল। এই বলিতেছি, এই শুনিতেছি, চক্ষু নিমীলিত কর; নিমীলিত নয়নের সম্মুখে আসিল। জড়বিজ্ঞানের তাড়িতের দ্বারা দূর দেশ নিকটের দেশ হইল, যোগ-তাড়িতের দ্বারা প্রাণের কাশী, প্রাণের মধ্যে আসিল। এবার কাশীবাসী হইব। যোগীর ধন হইবেন, মহাদেব। মহাদেব বড় দেবতা, ক্ষুদ্র নন, সাকার নন। ভুলিলাম সংসার, টাকা কড়ি সব ভুলিলাম। টিকিট কিনিয়া পলকের মধ্যে কাশীতে উপস্থিত হইলাম। কাশী ছাড়িয়া এখন আরও যাও। যেখানে গঙ্গা যমুনা একত্র হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া যাও। যাও, আরও যাও; প্রয়াগতীর্থ অতিক্রম করিয়া যাও। শ্রীবৃন্দাবন সম্মুখে দেখিতে পাইবে। তখন জ্ঞানের কাশী পশ্চাতে, ভক্তির বৃন্দাবন সম্মুখে। সূর্য্য ওখানে, চন্দ্র এখানে। এবার ভক্তির বৃন্দাবনে যাইব; এবার ভক্তিযমুনার জলে ঝাঁপ দিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিব।

"আগে কাশীতে বৈরাগী হইতে হইবে। বলিতে হইবে, টাকা কড়ি! দাও বিদাও। সন্তান স্ত্রী, বিদায় দাও; দাও বিদায় সংসার, একবার কমণ্ডলু হস্তে কাশীর অভিমুখে চলিব। সন্ন্যাসী হইয়া, পরিব্রাজক হইয়া পৃথিবী ভুলিব। ভুলিলাম, বিদায় লইলাম; ব্রহ্ম আরূঢ় হইলেন, আত্মা-অশ্বের উপর। ব্রহ্ম এবার এমনি স্তব্ধ করিতেছেন, যেন আর কিছুই নাই, বেদ বেদান্তের অবস্থা কেবল ব্রহ্মদর্শনের অবস্থা। ক্রমে মানুষ বলে, কঠোর ব্রহ্মজ্ঞানে মাথা ফাটিয়া গেল, কে শীতল করিবে? দুই প্রহরের রৌদ্র মানুষ সহিতে পারিল না; ছোট মানুষের পক্ষে এত কিরণ অনেক। ক্রমে সন্ধ্যা হইল; সুধাংশুর সুধাময় জ্যোৎস্নায় পৃথিবী মধুতে অভিষিক্ত হইল। পূর্ণিমার শশী, সকলের মুখে হাসি। এবার বৃন্দাবন সমাগত। সূর্য্য যখন অস্তমিত হইলেন, আর তিনি কখন আসিবেন না। জ্ঞান যথেষ্ট হইয়াছে; ব্রহ্মচাঁদকে চাই। প্রেমফুল দিয়া এবার তাঁহাকে পূজা করিব; চন্দ্রের দিক্ দিয়া তাঁহার কাছে যাইব। বৃন্দাবনে কি আমায় প্রবেশ করিতে দিবে? দুঃখে পড়িয়াছি, বাহিরে আর থাকিব না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রেমের প্রাসাদে আমায় যাইতে দাও; শ্রীবৃন্দাবন! পায়ে পড়ি, কলিকাতার দুঃখী আমি, আমাকে গ্রহণ কর। যা করিতে বলিবে, আমি তাই করিব, আমাকে প্রবেশ করিতে দাও। কোন্

জলে স্নান করিব, বল ; কোন্ ফুলে পূজা করিব, বল ; কি ভাবে পূজা করিব, বৃন্দাবন! যুগলভাবে। মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কাশি! তোমারও কি যুগল নয়? কাশী বৃন্দাবন কি পরস্পর কাটাকাটি করে? পরস্পরের মধ্যে কি ভয়ানক বিবাদ? হিন্দুর বৃন্দাবন কি হিন্দুর কাশীর মুখকে দগ্ধ করে? না, না। আমরা নববিধানবাদী, আমরা বিবাদের কথা জানি না ; গোলমাল শুনি নাই। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক ; আমরা জানি, এক দিক হইতে সূর্য্য, অপর দিক হইতে চন্দ্র বাহির হয়। উভয়ের বিবাহ হয়। বেদের সঙ্গে পুরাণের ভয়ানক সংগ্রাম হয় না। সংগ্রাম হয় নাই, হয় নাই। দেখ, সতীত্ব বৃন্দাবনের ধর্ম্ম। শ্রীমতী সতী বৃন্দাবনের রাণী। কাশীতেও সতী। যিনি পতিনিন্দা শুনিতে অসমর্থ হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই সতী কাশীতে। মহাদেব সতী ছাড়া নন। সতী কাশীতে, সতী বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের সতী কৃষ্ণ ছাড়া নন ; কৃষ্ণও শ্রীমতী সতী ছাড়া নন। মহাদেব সতীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দেহত্যাগ করিয়া আবার মহাদেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীও মানেন, সতীর কখন মরণ নাই। সেই সতী, যিনি মহাদেবের রাণী। মহাদেবের রাণী? যিনি উদাসীন হইয়া গিরিতে গিরিতে ভ্রমণ করিতেন, যাঁহার অন্নের সংস্থান নাই, তাঁহার স্ত্রী? সতীর চাই মহাদেবকে, সতীকে চাই মহাদেবের? বৈরাগী সন্ন্যাসীর স্ত্রীর প্রয়োজন? তিনি স্ত্রীর বশীভূত? ইহার অর্থ আছে, শ্রবণ কর। তাঁহার সতী তাঁহার ক্রোড়ে। মহাদেব যোগেতে মত্ত। দেখ্‌রে, জীব! দেখ্, যদি যোগ করিতে হয়, দেখ্। ভয়ে ভীত হইয়া মহাদেব অরণ্যে গমন করেন নাই। সতী থাকিবেন পতির কাছে, পতি যোগে মগ্ন হইবেন। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি সমস্তঃ মহাদেবকে নমস্কার করুক। এই টাকা কড়ি দূরে রাখ, যাও অরণ্যে ; কালাপেড়ে কাপড় ছাড়। ইহারা বলিল কি, মহাদেব সেই পাহাড়ের উপর সতীকে কাছে বসাইয়া যোগানন্দে মাতিলেন? কৈলাসের উপর হর গৌরী মিলিত। স্ত্রীসঙ্গে, অথচ বেহুঁস ; যোগানন্দে আছন্ন। এই যুগলভাব পুরাণে, যুগলভাব বেদে, যুগলভাব কাশীতে, যুগলভাব বৃন্দাবনে। কে বলে কৃষ্ণ, কে বলে রাধা? বৃন্দাবনের যুগল ভাব।

"শ্রীচৈতন্য সংসার ছাড়িয়াছিলেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি

চলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বলিলেন? বলিলেন, স্ত্রী আমার হৃদয়ের ভিতর, আমি চলিলাম। একবার সন্ন্যাসী হইতে হইবে; আগে শ্মশানে যাও, পরে এস। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মা কাঁদেন, স্ত্রী কাঁদে, শাঁ শাঁ করিয়া চৈতন্য চলিলেন। গম্ভীরভাবে কীর্ত্তন করিয়া পৃথিবীকে কাঁপাইলেন। সহর কাঁপিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ, করিলে কি? এহেন যৌবনে করিলে কি? যাও কোথায়? নবস্ত্রীকে অসহায় করিয়া যাইও না। তার প্রাণ যে কাঁদিতেছে। তার সুখের জন্য একবার ভাবিলে না? নিমাই! শোন শোন। ফিরে এস, সংসার কর। শ্রীচৈতন্যের সংসার করা শেষ হইল, তিনি ফিরিবেন কেন? লোকের পরিত্রাণের জন্য তিনি চলিলেন। ঘর ছাড়িয়া গাছতলায়, গাছতলা ছাড়িয়া ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইলেন। জীবের সমস্ত দুঃখভার মাথায় লইলাম বলিয়া তিনি চলিলেন। গৌরাঙ্গের শিষ্যেরা কাঁদিতে লাগিলেন; হায় গৌরাঙ্গ! হায় গৌরাঙ্গ! কোথায় ফেলে চলিলে? নদের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া কোথায় যাও? যত দিন তুমি না ফের, নদেয় সূর্য্য উঠিবে না। চৈতন্য ঐ দেখ পলাইলেন, আর নিত্যানন্দ সংসারী হইলেন। একবার পরিবর্জ্জন অত্যন্ত প্রয়োজন, অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও ছাড়িতে হইবে। একবার বৈরাগ্য লইয়া কমণ্ডলু ধরিতে হইবে। একবার ছাড়, নতুবা প্রেমভক্তি হইবে না। ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তোমার আমার ভিতরে চৈতন্য আসিলে। চৈতন্য কি? জ্ঞান, শ্রীজ্ঞান। চৈতন্যের সঞ্চারে শত সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান প্রকাশিত। চৈতন্য যিনি, তিনি আবার নিত্যানন্দ। চৈতন্যের কাজ শেষ হইল, নিত্যানন্দের কাজ আরম্ভ হইল। চৈতন্য যখন কেবল চৈতন্যে, তখন বৈরাগ্য; চৈতন্য যখন নিত্যানন্দে, তখন সংসার। চৈতন্য পাইয়া জ্ঞান পাইয়াছ, এখন নিতাই লও। জীব কি কেবল শ্মশানে মড়ার দুর্গন্ধ শুঁকিবে? চৈতন্য ফিরিলেন না, কিন্তু বলিলেন নিত্যানন্দকে, 'নিতাই, তুমি সংসার কর।' নিত্যানন্দে চৈতন্য আছেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যরূপে; চৈতন্য নিত্যানন্দরূপে। জয় চৈতন্যের জয়! জয় গৌরাঙ্গের জয়! শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা, হর এবং গৌরী, পুরুষভাব এবং স্ত্রীভাব। পুরুষ দেবতা এবং নারী দেবী। চৈতন্যে দুই ভাব পরে পরে। চৈতন্য পাগলিনীর মত। চৈতন্য উন্মাদিনী। পুরুষ অমন কাঁদে না; চৈতন্যকে কিরূপে পুরুষ বল? চৈতন্য উন্মাদিনী। প্রেমের উচ্ছ্বাসে চৈতন্য মাতোয়ারা। ওরে, সে ভাব নয়,

মহাভাব। আমরা চৈতন্যকে ডাকিয়া আনিব। কলিকাতার রাস্তায় আর আনন্দ ধরে না। অনেক দেখিলাম, কিছুতেই চলে না। ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া দেখিলাম, অনেক মন্ত্র তন্ত্র সাধন করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই চলে না। এবার প্রেমে মাতিতে হইবে।

"এক খণ্ড আমাদিগের জ্ঞান-সূর্য্য, আর এক খণ্ড আমাদিগের প্রেম-চন্দ্র। পতি সতী, সতী পতি। জ্ঞান আর প্রেম, সতী আর পতি, এ দুই দিবার জন্যই ভৃত্য আজ আপনাদিগের সমক্ষে আসিল। সতী ছাড়া পতি, পতি ছাড়া সতী কখনই নয়। শ্রীনাথ ছাড়া শ্রীমতী, শ্রীমতী ছাড়া শ্রীনাথ, হর ছাড়া গৌরী, গৌরী ছাড়া হর, কখনই হইতে পারে না। এই সত্য অতি উচ্চ সত্য। আখ্যায়িকা নয়, গল্প নয়, ইহা কল্পনার কথা নয়। নিরাকার শ্রীনাথ, নিরাকার শ্রীমতীর কথা বলিতেছি। সেই শ্রীনিবাস, সেই শ্রীমতী, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে; শ্রীমতী পার্শ্বে বসিয়া আছেন শ্রীনাথের, গৌরী পার্শ্বে বসিয়া আছেন হরের। কলিকাতায় ভক্তদল যে ডাকিতেছে, ভক্তেরা যে কাঁদিতেছে, তাহাদের যে প্রাণ গেল; 'যাও না হে, যাও শীঘ্র', এই বলিয়া শ্রীমতী অনুরোধ করেন শ্রীনাথকে। শ্রীমতীকে তাই অর্দ্ধাঙ্গ কোমলাঙ্গ বলে। য়িহুদী শাস্ত্রেও এইরূপ উপদেশ। মেরিনন্দন কি শিখাইলেন? আমি ভেদাভেদ জানি না, ভেদাভেদ মানি না। ঈশা প্রচার করিলেন, ভালবাসা। আবার কবির, নানক সবাই বলিলেন, প্রেম কর, ভালবাস, প্রেমেতে মাত। প্রিয় বঙ্গদেশ! শ্রীনাথের সঙ্গে শ্রীমতীকে গ্রহণ কর। কাশী বৃন্দাবন আজ একাকার করিতে হইবে। বেদ পুরাণে, কাশী বৃন্দাবনে আজ বিবাহ। চতুর্দ্দিক হইতে দ্বিজ আসিয়াছেন, পণ্ডিত আসিয়াছেন। শ্রীনাথ শ্রীদেবীর গৌরব বৃদ্ধি হউক। ব্রহ্ম ভজিতে গিয়া পুরাণকে অপমান করিও না; ব্রহ্মকে ধ্যান করিতেছ, স্ত্রী পুত্রকে দূর করিয়া দিও না। অভেদ আসিয়াছে, অভেদের নিশান উড়িয়াছে। জয় একমেবা-দ্বিতীয়ম্। এই রব বজ্রধ্বনির ন্যায় আকাশের এক দিক্ হইতে অপর দিকে গড়াইতে গড়াইতে চলিয়া যাউক। ব্রহ্মনাম নিনাদিত হউক। ভয় করিও না, ধর্ম্মকে কাটিও না। হরির গলা টিপিও না। দেখ শ্রীনাথ, দেখ শ্রীদেবী, দেখ ব্রহ্ম, দেখ হরি। এদিকে সৎ, ওদিকে আনন্দ। বল, লাগ্ ভেল্কি, লাগ্ ভেল্কি। একেবারে কাশী বৃন্দাবন এক হইয়া যাউক। ব্রহ্ম মালা দিবেন হরির

গলায়। বেদ মালা দিবে পুরাণের গলায়; পুরাণ মালা দিবে বেদের গলায়। ব্রহ্ম ও হরির নাম করিয়া সকলেই নৃত্য করিবে, সকলেই সুখী হইবে।"

"বক্তৃতান্তে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করা হয়। এই সময়ে ঘোর প্রমত্ততার সময়। আচার্য্যমহাশয় গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত, তথাপি তাঁহাকে আর কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি পথে সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন। গৃহের নিকটে আসিয়া এত প্রমত্ততা বাড়িল যে, সঙ্কীর্ত্তনের নৃত্য থামায় কাহার সাধ্য? গৃহে আসিয়া প্রমত্তভাবে নৃত্য করিতে করিতে, পীড়ানিবন্ধন আচার্য্যমহাশয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম হইলে, সকলে তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার প্রমত্ততার শেষ হয় নাই দেখিয়া, চিকিৎসক তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। এই ব্যাপারে অগ্রেই সঙ্কীর্ত্তন স্থগিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রমত্ততার তরঙ্গে তখনও সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য চলিতে লাগিল। গৃহে ও বাহিরে কেবল সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য। ধন্য নববিধান ভক্তিবিধান, যে তাঁহার কৃপায় শুষ্ক নীরস ঊনবিংশ শতাব্দীতে এত নৃত্য ও প্রমত্ততা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম।

প্রচারযাত্রা

"১৩ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী), বুধবার হইতে ১৬ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী), শনিবার পর্য্যন্ত কয়েক দিন কলিকাতায় পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে প্রচারযাত্রা হয়। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ত্তনের দল এই সকল দিকে গিয়া ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন। রবিবারে (১৭ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী) মন্দিরে প্রাতে ও সায়ংকালে উপাসনা ও উপদেশ হয়।

বেলঘরিয়া তপোবনে গমন ও উৎসবের সমাপ্তি

"১৮ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী), সোমবার, বাষ্পীয়শকট-যোগে বেলঘরিয়া তপোবনে গমন। ১৯শে মাঘ (৩১শে জানুয়ারী), মঙ্গলবার, অপরাহ্ণে কমল-সরোবরের চতুর্দ্দিকে নির্জ্জন যোগ ও সমাপ্তিসূচক প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তন করিবার কথা ছিল; আচার্য্যমহাশয়ের পীড়ানিবন্ধন তাহা হইতে পারে নাই।

উপসংহার

"আমরা এবার উৎসবের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এক ধর্ম্মতত্ত্বে শেষ করিলাম। উৎসবে যে সকল উপাসনা, বক্তৃতা ও কথা হইয়াছিল, যদি সেগুলি সকল

লিপিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে উৎসবের বৃত্তান্ত যে কয়েক সংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্বে শেষ হইত, তদপেক্ষা ন্যূন না হইয়া ববং সমধিক হইত। এবারকার উৎসবে অন্যান্যবার হইতে অনেক বিষয় বিশেষ। ব্রাহ্মিকাগণ কোন দিন মফঃস্বল হইতে উৎসবোপলক্ষে আগমন করেন নাই, এবার অনেকগুলি ব্রাহ্মিকাভগিনী দূরস্থান হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ইহারা সকলেই মঙ্গলবাটীতে অবস্থান ও পান ভোজনাদি করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে সমাগত ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ স্বতন্ত্র বাসায় পান ভোজন করিতেন, এবার প্রচারক-মণ্ডলীর ভজনসাধনস্থল বৃক্ষতলায় সকলে মিলিয়া আহার করিয়াছেন। কয়েক দিন যাঁহারা একত্র ভোজন করিয়াছেন, সমষ্টিতে তাঁহাদিগের সংখ্যা ধরিলে পোনের শতের ন্যূন হইবে না। এতদ্ভিন্ন বক্তৃতাদিতে সমাগত লোক-সংখ্যা গণনা করিলে, ন্যূন ষোড়শ সহস্র লোক গণনা করা যাইতে পারে। এই সকল লোকদিগের সেবার জন্য ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রচুর পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া-ছেন। এতো গেল বাহিরের কথা। ভেতরের ব্যাপার সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। গতবর্ষে মাতৃভাব-সমাগমে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এবার যে ভাব (সতীত্ব) প্রতিষ্ঠিত হইল, অতি উচ্চভাব, অতি শ্রেষ্ঠ ভাব। কিন্তু এ ভাবের নিকটবর্ত্তী হওয়া সামান্য কথা নহে। এখানে নির্ম্মলচিত্ত বিশুদ্ধাত্মা না হইতে পারিলে, অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। কুমারীর ন্যায়, বিশুদ্ধহৃদয়, চিরকৌমার্য্যের আদর্শ, পরম পরিশুদ্ধ, প্রেমময় ঈশ্বরের নিকট সমুদায় হৃদয় মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে, এ সামান্য কথা নয়। আমরা দেখিতে চাই, আগামী উৎসবের পূর্ব্বে কত জন এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।”

২০

স্বাস্থ্যভঙ্গ ও দার্জিলিঙ্গ গমন

কেশবচন্দ্রের শিরঃপীড়া ও বহুমূত্ররোগ

এই উৎসবের মধ্যে কেশবচন্দ্র শিরঃপীড়া ও বহুমূত্র-রোগে আক্রান্ত হন। ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০৩ শক) লিখিয়াছেন :—

"টাউন হলের বক্তৃতার দিবসই (৯ই মাঘ, ১৮০৩ শক ; ২১শে জানুয়ারী, ১৮৮২ খৃঃ) ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় পীড়ার জন্য শরীরে বিশেষ গ্লানি ও দুর্ব্বলতা অনুভব করেন। সেই অবস্থায়ই পরদিন (১০ই মাঘ) জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত মাঘোৎসবে, সোমবার (১১ই মাঘ) প্রাতে ৩ ঘণ্টাকাল আর্য্যনারী-সমাজে উপাসনা ও উপদেশ দেন এবং মঙ্গলবার দিন (১২ই মাঘ) বীডন উদ্যানে বক্তৃতা ও মহা সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্যাদি করেন ; তাহাতে পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, চিকিৎসকদিগের উপদেশানুসারে কিছু কালের জন্য সকল কার্য্য হইতে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি শিরঃপীড়া ও বহুমূত্র-রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, ঈশ্বরকৃপায় এইক্ষণ রোগের অনেক উপশম দেখা যায়। তাঁহার পীড়ার জন্য উৎসবের শেষ ভাগ এবার অপূর্ণ রহিয়া গেল। আর এক দিন বীডন উদ্যানে বক্তৃতা ও নৃত্য হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, সমুদায় রহিত হইল। অবিলম্বে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া, নব উৎসাহ উদ্যমের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা।"

জোসেফ কুকের কেশবের সঙ্গে আলাপ, দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং টাউন হলে বক্তৃতা

আমেরিকার জোসেফ কুক সাহেব এই সময়ে কলিকাতায় আসিয়া, কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কমলকুটীরে আগমন করেন, এবং দীর্ঘ কাল আলাপ করেন। এই আলাপে নববিধানের বিশেষ ভাব তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহার অভ্যর্থনাসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বে (১৬ই ফাল্গুন, ১৮০৩ শক) এই সংবাদটি লিপিবদ্ধ আছে :—

"১২ই ফাল্গুন, ১৮০৩ শক (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ খৃঃ), বৃহস্পতিবার, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ে বক্তা জোসেফ কুক সাহেবের সম্মানার্থ, প্রেরিত-মণ্ডলী এবং কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া, বাষ্পীয়শকটযোগে দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। এই সঙ্গে মানার্হা মিস পিগটও ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস মহাশয়কে বাষ্পীয় শকটে তুলিয়া লওয়া হয়। তাঁহার ভাবাবেশের ঘোর সমুদায় সময়ের মধ্যে একবারও প্রায় তিরোহিত হয় নাই। ভাবাবেশে প্রার্থনা, উপদেশ, সঙ্গীত, সকলই মধুর এবং জ্ঞানদ। তিনি দেবীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া যে প্রার্থনা করেন, তাহা অতি জীবন্ত। তাঁহার দেবতা তাঁহাকে কেবলই ধর্ম্মপ্রচারার্থ পীড়াপীড়ি করেন। ইনি কিছুতেই মাথা দিতে চান না। শুদ্ধসত্ত্ব দুচারিজন যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জোসেফ কুক সাহেব এবং কুমারী পিগট তাঁহার আশ্চর্য্যভাবে প্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। সায়ংকালে জোসেফ কুক সাহেব 'ভারত-বর্ষের ভাবী ধর্ম্মের' বিষয়ে টাউন হলে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় সমবেত জনমণ্ডলীর হইয়া ধন্যবাদ দেন।"

জোসেফ কুকের কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে অভিমত

২৪শে মার্চ্চ (১৮৮২ খৃঃ), শনিবার, কুকসাহেব কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। তিনি যাইবার সময় নববিধানসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। তিনি মরেমিচেল সাহেবকে যে পত্র লিখেন, সেই পত্রের সার 'বম্বে গার্ডিয়ানে' প্রকাশিত হয়। কুক সাহেব কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে অনেক কথা লেখেন এবং খ্রীষ্টানমণ্ডলীকে তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার মতে, কেশবচন্দ্র 'ইউনি-ট্রিনিটিরিয়ান' (ত্রিত্বৈকত্ববাদী) নহেন, হিন্দুভাবে প্রচ্ছন্ন 'কোএকার ইউনিটেরিয়ান'।

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যানন মরিস্ ডেবিসের কেশবচন্দ্রকে পত্র

'কন্টেম্পোরারী রিবিউতে' নাইটন সাহেব নববিধানসম্বন্ধে যাহা লিখিয়া-ছিলেন, আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৭৯৫ পৃঃ) দিয়াছি। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ক্যানন ডেবিস্ কেশবচন্দ্রকে এই সময়ে এই পত্র লিখেন :—"এখানকার ক্যাথিড্রালের আমি এখন ক্যানন। অক্টোবর মাসের 'কন্টেম্পোরারী রিবিউতে' আমি এই মাত্র নববিধানসম্বন্ধে

ডাক্তর নাইটনের প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিকদিন হইল, সমগ্র জীবন আমি ইহারই জন্য যেন আশা করিয়া আসিয়াছি, ইহাই মনে হইতেছে। এখানে আমার উপাসকমণ্ডলীকে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করিতে পারি, এজন্য আপনি কি আমায় সমর্থ করিবেন? ডাক্তর নাইটন যাহা বলিয়াছেন, তদবলম্বনে আমি কিছু বলিব; কিন্তু এ পত্র আপনার হস্তগত হইতে এত সময় অতীত হইয়া যাইবে যে, আপনার পত্র পাইবার পর পুনরায় আমি সেই বিষয়ই বলিতে পারিব, কেন না অগ্রেই আমি এবিষয়ে তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছি। আপনার মহত্তর উদার ভাবের নিকটে সকলই খর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করিবার জন্য আপনি যে যত্ন করিয়াছেন, সে যত্ন সিদ্ধ হইবার পক্ষে এইটি ভাল হইত, যদি সেই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল প্রভাবশালী খ্যাতনামা উপদেষ্টা আছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের উপাসকের নিকট এই বিষয়টি উপস্থিত করিতেন। সমুদায় আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন বিশ্বাসিগণের ঈদৃশ একতাবন্ধন বিনা জড়বাদের সম্মুখীন হইবার পক্ষে আমি অন্য কোন উপায় দেখি না। 'নববিধান' বিষয়ে বলিবার জন্য আমায় বিশেষভাবে সমর্থ করুন, এই আমি চাহিতেছি। ঈশ্বর আপনার যত্নকে সফল করুন, আপনার উদার মহত্তর উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির নিমিত্ত দীর্ঘজীবন লাভ করুন, এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়া, আমি অতি বিশ্বস্ততা-সহকারে আপনারই হইয়া থাকি।

মরিস্ ডেবিস্।"

মিস্ সুসেনা উইঙ্কওয়ার্থের পত্র

এই সময়ে 'থিয়োলজিয়া জার্ম্মেণিকার' অনুবাদিকা মিস সুসেনা উইঙ্ক-ওয়ার্থও, সমুদায় ব্রহ্মবাদিগণের প্রাণে প্রাণে একহৃদয় হইয়া, জড়বাদ অজ্ঞেয়বাদ প্রভৃতির বিরোধে সংগ্রামার্থ মিলিত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। তাঁহার মতে, এই সকল মত যে কেবলই ধর্ম্মেরই মূল উৎখাত করিতেছে, তাহা নহে, সমগ্র সভ্যজগতের নীতি ও সামাজিক সম্বন্ধও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে। এদেশে মান্যবর গিব্‌স্ সাহেব চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের প্রচারক-সমিতিতে যাহা বলেন, তাহা অতি আদরণীয়। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রচারকবর্গকে অনুরোধ করেন, তাঁহারা যেন ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিরোধীর মত ব্যবহার

না করিয়া, সর্ব্বদা মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত যে যে অংশে একতা আছে, তদবলম্বনে তৎসহিত মিলিত হইয়া উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য, এই তাঁহার মত।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাণনাশের দুশ্চেষ্টাবৈফল্যে কৃতজ্ঞতাসূচক প্রার্থনা

এক জন দুরাত্মা প্রজাবৎসলা ভক্তিভাজন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাটের প্রাণহননের দুশ্চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু ভগবৎকৃপায় তাহার দুশ্চেষ্টা সফল হয় না। ঈদৃশ ধর্ম্মপরায়ণা মহারাজ্ঞীর প্রাণবধের চেষ্টা অবশ্য সুস্থশরীরমনা ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এই ছয়বার তাঁহার প্রাণবিনাশের দুশ্চেষ্টা হইল। ইহারা প্রায় সকলেই উন্মাদরোগগ্রস্ত, অতি নীচ হীন বংশসম্ভূত। ভারতের যেখানে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ আছে, তথায় মহারাণীর জীবনরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতে নববিধান পত্রিকা (৯ই মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ) অনুরোধ করেন। ১৯শে মার্চ্চ (৭ই চৈত্র) ব্রহ্মমন্দিরে এতদুপলক্ষে কৃতজ্ঞতাসূচক বিশেষ প্রার্থনা হয়। এখনও কেশবচন্দ্রের শরীর অসুস্থ। পথ্যের দৃঢ় নিয়মাবলম্বন করাতে কথঞ্চিৎ পীড়ার সাম্যাবস্থামাত্র হইয়াছে।

নববর্ষের উপাসনায় বেদী হইতে মণ্ডলী সহ সকলের জন্য নবজীবন প্রার্থনা

এই অবস্থায় নূতন বৎসরোপলক্ষে (১লা বৈশাখ, ১৮০৪ শক) কেশবচন্দ্র উপাসনা করেন। এতৎসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা বৈশাখ, ১৮০৪ শক) লিখিয়াছেন :—

"১লা বৈশাখ তারিখে (১৩ই এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ), নূতন বৎসরোপলক্ষে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে উপাসনা ও উপদেশাদি হইয়াছিল, তাহাতে সাধারণ অসাধারণ সকল শ্রেণীর ব্রাহ্ম-জীবনের কল্যাণার্থ আচার্য্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যিনি নূতন বৎসরে নূতন জীবন লাভ করিতে চাহেন, অথচ ইতঃপূর্ব্ব আপনকৃত যত্ন সকল নিষ্ফল হওয়াতে হতাশ্বাস হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্মমন্দিরে বেদী হইতে যদি সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে বেদী মণ্ডলী সহ তাঁহাদিগের জন্য প্রার্থনা করিবেন, অঙ্গীকার করিতেছেন। যিনি জীবনের কল্যাণার্থ প্রার্থনার জন্য প্রার্থী হইবেন, তিনি গোপনে আপনার ইচ্ছা উপাধ্যায়ের নিকট পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিবেন। যদিও আত্মার ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে দুর্ব্বলতা বোধ হইলে, পবিত্রতার প্রার্থী কৃপাপাত্র ভ্রাতার জন্য যদি মণ্ডলীসহ একত্র ক্রন্দন ও প্রার্থনা

হয়, তবে অবশ্যই জীবনের কলঙ্ক অপনীত হইয়া, জীবন নূতন বল ও নূতন সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবে।"

ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও 'প্রেম' বিষয়ে উপদেশ

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক (২৮শে মে, ১৮৮২ খৃঃ), রবিবার, দ্বিতীয়বার কেশবচন্দ্র ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক) লিখিয়াছেন:—

"দীর্ঘ কালের পর গত কল্য আচার্য্যমহাশয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদীতে আসীন হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রতিদিনের পারিবারিক উপাসনায় যে উচ্ছ্বাস দিন দিন ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই উপদেশাকারে বেদী হইতে বিবৃত হইয়াছে। 'প্রেম' উপদেশের বিষয় ছিল। ('সেবকের নিবেদন' ৪র্থ খণ্ডে 'প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব' দ্রষ্টব্য) তিনি বলিলেন, প্রেমের স্বভাব পক্ষপাত; প্রেম স্বভাবতঃ অন্ধ। যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহার আমরা দোষ দেখি না, কেবলই গুণ দেখি। মনুষ্যসম্বন্ধে এই অন্ধতা ও পক্ষপাত মিথ্যাদোষে দূষিত। তবে এ প্রেমের স্বভাব এরূপ হইল কেন? এ প্রেম কি দেখায়? এই দেখায় যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর প্রেমের পাত্র নাই। প্রেমবান্ ব্যক্তি ঈশ্বরের পক্ষপাতী হইয়া, তৎপ্রতি অন্ধ হইয়া যাহা কিছু বলে, শুনিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ মিথ্যা নহে। এত বৎসর ঈশ্বরের যে প্রকার ব্যবহার আমরা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, তিনি আমাদিগকে সুখ ভিন্ন কোন দিন দুঃখ দেন নাই। লোকে বলিবে, তোমাদের এত রোগ শোক নিন্দা অবমাননা, অথচ কি প্রকারে বলিলে. ঈশ্বর সুখ ভিন্ন দুঃখ দেন নাই। কৈ, রোগ শোক নিন্দা অবমাননা আমাদিগের কিছুইতো ক্ষতি করিতে পারে নাই, বরং আমাদিগের সুখ ও কল্যাণই বর্দ্ধন করিয়াছে; সুতরাং সবলে বলিব, ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ ভিন্ন দুঃখ দেন নাই।"

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা

কেশবচন্দ্র অসুস্থ শরীরে বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা হয়। সাত জন যুবক এই পরীক্ষায় উপস্থিত হন। ৮ই

এপ্রিল, ১৮৮২ খৃঃ, শনিবার পরীক্ষা আরম্ভের দিন। ১লা এপ্রিলের মধ্যে পরীক্ষার্থিগণ উপাধ্যায়ের নিকটে আবেদন প্রেরণ করেন। পরীক্ষা এই সকল বিষয়ে হয়ঃ—(১) ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ; (২) বিবেক; (৩) স্বাধীনতা ও অদৃষ্টবাদ; (৪) প্রার্থনা; (৫) দেবশ্বসিত; (৬) পাপ ও শুদ্ধি; (৭) কর্ত্তব্য; (৮) খ্রীষ্টের জীবন ও তাঁহার শিক্ষা। প্রথমদিনে প্রশ্ন এইঃ—(১) প্রার্থনা কি, নির্দ্ধারণ কর এবং আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা হইতে উহার পার্থক্য প্রদর্শন কর। (২) খ্রীষ্টের নিজের কথায় প্রার্থনার নিয়ম লেখ, এবং দেখাও যে, ইহাতে প্রাকৃতিক বা নৈতিক কোন নিয়মভঙ্গ হয় না। (৩) ব্রহ্মমন্দিরে প্রতিসপ্তাহে অপরের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা হইয়া থাকে; এটি যে যুক্ত কেন, তাহা প্রতিপাদন কর। (৪) দেবশ্বসিতের মূল লক্ষণ বিবৃত কর। (৫) দেখাও যে, জ্ঞানজগতে যাহাকে প্রতিভা বলে, ধর্ম্মজগতে দেবশ্বসিত তাহাই। সেক্স্-পিয়রকে দেবশ্বসিতপ্রাপ্ত কবি কেন মনে করা হয়? (৬) সময়ে সময়ে প্রতি-ব্যক্তির জীবনে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কোন্ ভাবে দেবনিশ্বসিতের সার্ব্বজনীনত্ব স্বীকার কর? (৭) কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ অভিপ্রায়সাধনের জন্য বিশেষভাবে দেবনিশ্বসিত প্রাপ্ত হন। এই সত্যটি বিবৃত কর, এবং দৃষ্টান্ত দাও। (৮) নববিধানের সময় দেবনিশ্বসিতপ্রধান কেন, তাহার কারণ প্রদর্শন কর।

দার্জিলিঙ্গে গমন

জ্যৈষ্ঠমাসের অন্তিমভাগে (২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক) (৪ঠা জুন, ১৮৮২খৃঃ, রবিবার) কেশবচন্দ্র বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সপরিবারে দার্জিলিঙ্গে গমন করেন। সেখানে একমাস মধ্যেও কোন আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই আষাঢ়, ১৮০৪ শক) লিখিয়াছেনঃ—

"আমাদিগের ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় স্বাস্থ্যলাভের জন্য দার্জিলিঙ্গ পাহাড়ে গমন করিয়া, প্রায় এক মাসের অধিক কাল অবস্থিতি করিলেন; তবু আশানুরূপ ফল লাভ না করায়, আমরা দুঃখিত হইতেছি। বিগত রবিবারে (২৫শে জুন, ১৮৮২ খৃঃ) তথায় ৬০।৬৫ জন বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া, নববিধানসম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আচার্য্য মহাশয়ের নিকট তাহার যথাযথ উত্তর শুনিয়া, সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এই সমালোচনার সভাতে যোগ দিয়া, আপন বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

দেশীয়া মহিলাগণের বিদ্যালয়-স্থাপন, তাহার শিক্ষা ও পরীক্ষার প্রণালী

দার্জিলিঙ্গে গমনের পূর্ব্বে তিনি দুইটি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান, নব-বৃন্দাবন নাটকের জন্য প্রাস্তুতিক ব্যাপার, ভারতসংস্কারকসভার অন্তর্গত দেশীয়া মহিলাগণের বিদ্যালয় (Native Ladies' Institution) স্থাপন। তিনি কলিকাতা অবস্থিতিকালে দুইটী বক্তৃতা হয়। ১লা মে, ১৮৮২ খৃঃ, ফাদার লাফোঁ চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণ-বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব্বে, তিনি এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্যগণের নিকটে তিনি কেশবচন্দ্রের নারীজাতির শিক্ষাপ্রণালী উপস্থিত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি একা ইহার সপক্ষ ছিলেন, সুতরাং নারীশিক্ষাপ্রণালী অন্য আকার ধারণ করিল। তাঁহার মতে স্ত্রী ও পুরুষের একত্র সংমিশ্রণে শিক্ষা হওয়া কখন সমুচিত নয়। নারীগণ যাহাতে উৎকৃষ্ট মাতা, উৎকৃষ্ট কন্যা, উৎকৃষ্ট ভগিনী হন, এইরূপে তাঁহাদিগের শিক্ষা দেওয়া সমুচিত। যাঁহারা ইংরাজী বোঝেন না, তাঁহাদের জন্য স্বয়ং কেশবচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতার সার বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা ইতিহাসসম্বন্ধে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন বিজ্ঞানের সকল বিভাগে হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব, এক ইতিহাসসম্বন্ধে তাঁহাদের ঔদাসীন্য, দৃষ্টান্ত দ্বারা এইটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ভারতসংস্কারকসভা হইতে সিণ্ডিকেট নিযুক্ত হয়, তাহা হইতে শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয়। উহার সার এই :—উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা হইবে। কলিকাতা বা অপর স্থানে এই পরীক্ষা হইতে পারিবে। অন্য স্থানে পরীক্ষা হইলে এক মাস পূর্ব্বে সিণ্ডিকেটের সম্পাদকের নিকটে আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে। পরীক্ষাস্থলে মহিলাসমিতির সভ্যগণ পরীক্ষার ব্যবস্থাদি উপস্থিত থাকিয়া করিবেন। পরীক্ষার আবেদন প্রেরণের শেষ দিন ১লা ডিসেম্বর। জানুয়ারীর প্রথম সোমবারে পরীক্ষার আরম্ভ হইবে। যাঁহারা নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা ২৫ হইতে ৫০ টাকা, যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা ৬০ হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন। যে সকল পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রী তাঁহাদের নাম

প্রকাশিত না হয়, এরূপ ইচ্ছা করেন, পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইবে না। পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে যদি কোন একটি বিশেষ বিষয়ে কেহ পরীক্ষা দিতে চাহেন, তাহা হইলে সে বিষয়ে যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহার গুণানুসারে পুরস্কার ও অলঙ্কার প্রদত্ত হইবে। কোন এক বিশেষ শাখায় বা নারীসমুচিত শিক্ষায় কেহ গুণাপন্না হইলে, তাঁহাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা হইবে, উচ্চশ্রেণী :—(১) ইংরাজী—(ক) সেক্সপিয়ার হ্যামলেট ও মার্চেণ্ট অব বেনিস হইতে উদ্ধৃতাংশ ; (খ) আডিসন ; (গ) ব্যাকরণ ও রচনা। (২) গণিতশাস্ত্র। (৩) ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল। (৪) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। (৫) পেলিকৃত প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান। (৬) স্বাস্থ্যরক্ষা। নিম্নশ্রেণী :— ১) ইংরেজী—(ক) শ্রুতলিপি ; (খ) ব্যাকরণ। (২) বাঙ্গালা —(ক) সীতার বনবাস ; (খ) রচনা। (৩) গণিতশাস্ত্র। (৪) বিজ্ঞানের প্রথমশিক্ষা। (৫) চিত্র। (৬) নীতিশিক্ষা। (৭) গার্হস্থ্য-প্রণালী। (৮) সঙ্গীত। স্ত্রীশিক্ষার্থ অপার সার্কুলার রোডে এ সময়ে "মিট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল" ছিল। সেই স্কুলগৃহে এই সকল বক্তৃতা হইত।

আচার্য্যের উপজীবিকা সম্বন্ধে প্রশ্নে আত্মজীবন-প্রকাশে 'নববিধানে' প্রবন্ধ

কেশবচন্দ্রের দার্জিলিঙ্গে অবস্থিতিকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথায় গমন করেন। এখানে আচার্য্যের উপজীবিকা কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়, এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার জীবনের গূঢ়-তত্ত্ববিষয়ে তাঁহার আপনার নিকটস্থ প্রিয় বন্ধুগণও একান্ত অনভিজ্ঞ। তাঁহার উপজীবিকাবিষয়ে ভাই কান্তিচন্দ্র অবগত, এ বিষয়ে তিনিই কিছু বলিতে পারেন, অপরে যেন এ বিষয়ে কিছু বলিতে না যান, এরূপ ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন। কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন আপনি প্রকাশ না করিলে, তৎসম্বন্ধে বিবিধ মিথ্যা কল্পনা আসিয়া তাঁহার জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে, এখন হইতে ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। এই কর্ত্তব্যানুরোধে দার্জিলিঙ্গ হইতে যে কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি 'নববিধান পত্রিকায়' প্রকাশ করেন, আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ দিতেছি। প্রথম দুটির বিষয়—"প্রেরিতের নিয়োগ"; তৃতীয়টি—"বিশ্বাসীর অর্থাগম।"

"প্রেরিতের নিয়োগ"

"আমার শৈশবে কোন মণ্ডলী বা সমাজে যোগ দেওয়ার পূর্ব্বে সংসারকে জাগ্রৎ করিবার জন্য আমি আহূত হইয়াছিলাম। আমি লোকদিগকে জাগাইবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলাম। তখন আমার কোন উপাসকমণ্ডলীও ছিল না, কোন অনুগামীও ছিল না, সুতরাং আমি পথের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতাম। (তখন আমার খ্যাতিও হয় নাই, প্রচারের কোন প্রণালীও শিখি নাই, সুতরাং) বিনা খ্যাতি, বিনা কোন প্রণালীতে, পথ দিয়া যে সকল লোক যাইত, তাহাদিগকে বলিতাম. কিন্তু তাহারা আমার কথায় মনোযোগ দিত না। তাহার পর আমার কথা শুনিবার জন্য যখন জন কয়েক বালক পাইলাম, যত দূর আমার সামর্থ্য, আমি তাহাদিগকে জাগ্রৎ করিবার জন্য যত্ন করিলাম। ইহার পরে যখন আমি শ্রোতা পাইলাম, তখন আরও উৎসাহসহকারে বলিতে লাগিলাম। অনন্তর আমি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম! দোকানী, সামান্যলোক, জ্ঞানী, শিক্ষিত, সকলেই আমার প্রচারের পাত্র ছিলেন। এখন প্রায় সকল পৃথিবী আমার কথা শুনিয়াছে, তবু আমি নগরের চতুষ্কোণে নদীর কূলে যে সকল বহুসংখ্যক লোক একত্র হন, আমার কথা শুনিতে আসেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রমুগ্ধ করিতে যত্ন করি। যত দিন আমার কথা কহিবার শক্তি থাকিবে, তত দিন আমি লোকদিগকে আহ্বান করিব, এবং জাগাইব। মানবচরিত্রগঠনের জন্য আমি আহূত হইয়াছি। কত বর্ষ চলিয়া গেল, আজও সমান উৎসাহ, সমান যত্ন আছে। যাঁহারা আমার নিকটে আসেন, আমি তাঁহাদের ভার লই। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক চরিত্রগঠন আমার গভীর সর্ব্ববিস্মারক চিন্তাভিনিবেশের বিষয়। আমি প্রিয় হইতেও চাই না, অপ্রিয় হইতেও চাই না, যে সকল ভাইকে আমার পিতা আমায় দিয়াছেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতে চাই, যাহাতে তাঁহাদের চরিত্র পূর্ণতালাভ করিতে পারে, এবং তাঁহাদের ভিতরে যাহা কিছু ভাল, তাহা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে। যে কোন ব্যক্তি আমার নিকটে আসেন, আমি তাঁহার ভিতরে আমার ঈশ্বরকে দেখিতে পাই, সুতরাং আমি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি না, আমি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াসক্তি সহিতে পারি না, তাঁহাদের নীতিঘটিত দোষ উপেক্ষা করিতে পারি না। আমার নিয়োগ ঈদৃশভাবাপন্ন যে, যত কেন গভীর পাপ হউক না, আমায়

ক্ষমার বহির্ভূত করিতে পারে না, অথবা কাহাকেও ক্ষমার সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না। আমি এক জনকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। যখন সে আমায় পরিত্যাগ করে, তখনও আমি কখন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমার প্রভু যাঁহাদিগকে আমার চারিদিকে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রগঠন, তাঁহাদের চরিত্রের পরিপক্কতাসাধন আমার জীবনের একমাত্র উচ্চাভিলাষ। আমি লোকদিগের সেবা করিবার নিমিত্ত আহূত হইয়াছি, কেবল তাঁহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ দেখা আমার লক্ষ্য নয়, তাঁহাদের দৈহিক কল্যাণ দেখাও আমার লক্ষ্য। তাঁহাদের সব আয়োজন হইয়াছে, ইহা না দেখা পর্য্যন্ত আমার মনের বিশ্রাম নাই। আমার ভাইদের প্রতি আমার ঈদৃশ চিত্তাভিনিবেশ আমি বাহিরে দেখাইতে চাই না, কিন্তু আমি আমার বিবেক এবং অন্তঃসাক্ষী ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন করি, আমার ভাইয়ের সেবা করিতে না পারিলে আমার ভয় হয় যে, আমি পরিত্রাণ পাইব না। যদিও মনে হয় যে, আমি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ দিতেছি না, তবুও আমার ইচ্ছা যে, তাঁহাদের অভাবের কথা আমাকে তাঁহারা প্রকাশ করিয়া বলেন। আমার প্রতি তাঁহাদের আশ্বস্তভাব আমায় যেমন আহ্লাদিত করে, এমন আর কিছুতেই আহ্লাদিত করে না; আমার প্রতি আশ্বস্তভাবের অভাব যেমন আমায় ক্লেশ দেয়, এমন আর কিছুতেই ক্লেশ দেয় না। লোকদিগের সেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম, এটি দেখা অপেক্ষা আমার মৃত্যুও ভাল। আমার বিশ্বাস, কোন মানুষ এই সেবার কার্য্যে আমায় আহ্বান করে নাই, কোন মানুষের ইহা হইতে আমায় বঞ্চিত করিবারও কোন অধিকার নাই। আমার প্রভুর বাণী আমায় যেমন আদেশ করিবেন, তেমনি ভাবে আমি জীবনান্ত পর্য্যন্ত মানুষের সেবা করিতে থাকিব। ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা পৃথিবীর নিকটে ঘোষণা করিবার জন্য আমি আহূত হইয়াছি। আমায় লোকে সম্মান করুক বা উপহাস করুক, আমি সে কার্য্য করিবই। যে পরিমাণে আমার বিশ্বাস বাড়িয়াছে, শক্তি বাড়িয়াছে, অনুগ্রহলাভ হইয়াছে, সেই পরিমাণে আমি সেবার কার্য্য করিয়াছি। প্রথমে আমায় লোকে অপরিপক্ক যুবা বলিয়া উপহাস করিয়াছে, পরে আমার মত গ্রহণ করিয়াছে। আমায় তাহারা কাণ্ডাকাণ্ডশূন্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু তাহার পর আমার (প্রবর্ত্তিত)

সংস্কার তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আমায় 'পোপ' বলিয়া গালি দিয়াছে; কিন্তু তাহারাই আমার সকল ভাব ধার করিয়াছে, আমার প্রার্থনা, আমার উপাসনা-প্রণালী আপনার করিয়া লইয়াছে। এখন আমায় স্বপ্নদর্শী বলিয়া দোষ দিতেছে; আমি জানি, অল্প দিনের মধ্যে তাহারা আমার স্বপ্ন গভীর সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। জীবনের প্রতিসোপানে পিতা আমার নিকটে তাঁহার স্বরূপ ও অভিপ্রায় যেমন প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও তেমনি তাঁহার স্বরূপ ও অভিপ্রায় লোকের নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছি। আমার নিয়োগের কার্য্য আমি সম্পন্ন করিয়াছি, ইহা বলিতে পারি না। কেন না আমি যত বৃদ্ধ হইতেছি, তত আমার যে নিয়োগ পূর্ব্বে সহজ ছিল, তাহা ভাবে ও দায়িত্বে বাড়িয়া যাইতেছে। পবিত্রাত্মা যেন আমায় সেই মন দেন, যে মনে আমি সব গ্রহণ করিতে পারি, সব পূর্ণ করিতে পারি।

"আমি প্রভুত্ব করিবার জন্য আহূত হই নাই, কিন্তু মিলন সাধন করিতে আসিয়াছি। এ জন্যই আমি যখন আমার লোকদিগের মধ্যে বিরোধ, প্রতি-দ্বন্দ্বিতা এবং মন্দভাব দেখি, হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করি। আমি জানি, অগ্রে আমার সঙ্গে তাঁহাদের মিল করিয়া লইলে, তবে আমি তাঁহাদের পর-স্পরের সঙ্গে মিল করাইয়া দিতে সমর্থ হইব। এ জন্যই যদি কেহ আমায় ভাল-বাসিতে বা আমার ভালবাসা পাইতে আমার নিকটে আইসেন, আমি যেন তাঁহাকে দূর করিয়া না দি, এইটি আমার গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়। আমি জানি, আমায় অনেকে অতিরিক্ত ভক্তি দেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে এই ভয়ে বাধা দিই না যে, কি জানি বা বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শোধন করিতে গিয়া, আমি উঁহাদিগকে একেবারে আমা হইতে দূর করিয়া দি। কিন্তু আমি একথা পরিষ্কার বলি, যাঁহারা পরস্পরকে সম্মান করেন না, তাঁহারা আমায় সম্মান করিলে আমি কদাপি তুষ্ট হই না। যদি লোকে আমায় ঘৃণা করে, আমি তাহাতে কোন অভিযোগ করি না। কিন্তু আমার তখনই দুঃখ হয় এবং হৃদয়ে বাধে, যখন দেখিতে পাই যে, আমায় ঘৃণা করিতে গিয়া, ঈশ্বর যে কার্য্য আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, সে কার্য্যকে পর্য্যন্ত তাহারা ঘৃণা করে। আমার যাহা নিজের ব্যক্তিগত, ভ্রান্তি ও দোষের অধীন, তৎপ্রতি দোষারোপ করিতে বা বীতরাগ হইতে আমি প্রতিব্যক্তিকে স্বাধীনতা দি; কিন্তু আমার ভিতরে

এমন কিছু আছে, যাহা আমি নই, যিটি আমার নিয়োগ, সেইটিকে কোন লোকের ঘৃণা করা উচিত নয়। আমার নিয়োগকে যাহারা ঘৃণা করে, নিশ্চয়ই তাহারা সময়ে পরস্পরকে ঘৃণা করিবে, ঈশ্বরকে ঘৃণা করিবে, সত্য ধর্ম্মকে ঘৃণা করিবে, এবং অসত্যে গিয়া অবতরণ করিবে। যাহারা আমার নিয়োগকে ভালবাসে, নিশ্চয়ই তাহারা সময়ে পরস্পরে মিলিত হইবে, ঈশ্বর ও সত্য ধর্ম্মকে ভালবাসিবে, এবং মুক্তি ও আনন্দে অবতরণ করিবে। আমার নিয়োগ শান্তিসংস্থাপন। চারিদিক্ হইতে মত ও বিশ্বাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড লইয়া একটি পূর্ণ বিধানাবয়বে উহাদিগকে সংযুক্ত করিতে আমি যত্ন করি, যেটি ঈশ্বরের নিশ্বাসবায়ুতে ভূতকে বর্ত্তমানের সঙ্গে, প্রাচীনকে আধুনিকের সঙ্গে, বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের সঙ্গে, পূর্ব্বকে পশ্চিমের সঙ্গে সম্মিলিত করিবে। হিন্দুধর্ম্ম বা তাহার পৌরাণিক কাহিনীকেও আমি তুচ্ছ করিতে সাহস করি না। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের কোন মত বা বিশ্বাসসম্বন্ধে আমি উদাসীন হইতে সাহস করি না। বৌদ্ধধর্ম্মের যে মুগ্ধকর সামর্থ্য আছে, তাহা আমার নিকটে সত্য ও স্বর্গীয়, আমার নিকটে মোহম্মদ ঈশ্বরের দাস ও প্রেরিত। আধ্যাত্মিক-প্রয়োজনবশতই এ গুলি আমায় স্বীকার করিতে হয়, অঙ্গীভূত করিতে হয় এবং সকল গুলিকে একত্র বান্ধিতে হয়। এগুলিকে আমি বান্ধি না, আমার ঈশ্বর আমার ভিতরে থাকিয়া বান্ধেন। আমার চারিদিকে কোন ধর্ম্মভাব বা অবস্থাকে আমি তুচ্ছ করিতে পারি না। কোন ধর্ম্মের আদর্শকে আমি ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারি না; আমার চারিদিকে আমার প্রভু ও পিতা যে সকল অধ্যাত্ম পোষণসামগ্রীর কণা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, সেগুলি আমার একত্র সংগ্রহ করিতেই হইবে। আমায় সকলকে সংযুক্ত, মিলিত এবং একত্র বদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই আমার নিয়োগ।"

'বিশ্বাসীর অর্থাগম'

'বিশ্বাসীর অর্থাগম' বিষয়টি এই:—"ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান ধনান্বেষণ করেন না। দারিদ্র্য ও প্রভূতৈশ্বর্য্য, তিনি এই দুই কল্যাণের আস্পদ। ধন যখন আছে, তখনও তিনি তাহা সঞ্চয় করেন না। যত্ন করিলেই তিনি ধনার্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু অর্জ্জনবিষয়ে তাঁহার মনে চিন্তাই আইসে না। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও যাহা প্রয়োজন, তদুপযুক্ত ধনের তাঁহার অভাব হয় না।

ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা ভিন্ন আর তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। অথচ এই সকল প্রয়োজন বিবিধ প্রকারের এবং গুরুতর, কারণ তন্মধ্যে গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকল প্রকারের কর্ত্তব্য অন্তর্ভূত। তাঁহার আপনার এবং অপরের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কি তাঁহার করা সমুচিত, এইটী প্রথম চিন্তা, আজ্ঞায় বশ্যতাস্বীকার প্রধান উদ্বেগের বিষয়, ব্যয় উহার পরের চিন্তার বিষয়। তিনি বিশ্বাসসহকারে তাঁহার কর্ত্তব্যসাধন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং তিনি জানেন, অর্থ অবশ্যই আসিবে। দরিদ্রতার যত দূর ক্লেশ হইতে পারে, তাহা বহন করিতে তিনি প্রস্তুত, এবং আপনি ক্লেশ ডাকিয়া লইয়াছেন। কিন্তু দরিদ্রতা কখন তাঁহার উপরে কলঙ্কের রেখাপাত করিতে পারে না, যখন তিনি অতি দরিদ্র, তখনও তিনি রাজতনয়বৎ। তিনি কখন অর্থের বিষয় অগ্রে এবং কার্য্যের বিষয় তৎপরে চিন্তা করেন না, কারণ তাহাতে কার্য্যও হইবে না, অর্থও আসিবে না। তাঁহার বিশ্বাসই তাঁহার ধন, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া তিনি কার্য্যসাগরে সাহসের সহিত জীবনতরী ভাসাইয়া দেন। তিনি বিশ্বাসকেই অর্থাগমে পরিণত করেন, অন্য কথায় বলিতে হয়, তাঁহার বিশ্ব-পিতা সর্ব্বপ্রধান যাদুকর, তিনিই তাঁহার জন্য সকল করেন। জীবনক্ষেত্রে বিশ্বাসের সাহসিকতা উন্মত্তের সাহসিক ক্রিয়ার তুল্য মনে হয়, কিন্তু এ সাহসিক ক্রিয়া কখন অকৃতকার্য্য হয় না। যে অর্থ চায়, তাহার নিকট হইতে অর্থ পলায়ন করে। অর্থ তাঁহাকেই খোঁজে, যিনি তাহা হইতে পলায়ন করেন। যিনি অর্থের জন্য কার্য্য করেন, তিনি বেতনস্বরূপ দরিদ্রতা লাভ করেন। ঈশ্বরের জন্য যিনি কার্য্য করেন, অনন্ত তাঁহার ভাণ্ডার। ঈশ্বরের কার্য্য করিতে গিয়া, সে কার্য্যসাধনের জন্য বিশ্বাসীর কোন দিন অর্থের অভাব হয় নাই। যে পরিমাণ অর্থ প্রচুর, তাই তিনি পান, তদপেক্ষা অধিক নয়; কিন্তু তিনি অতি পরিশ্রম সহ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তবে পান, যখন পান, তখন কদাপি অকৃতজ্ঞ হন না, এবং সর্ব্বদা উহার অতি ভাল ব্যবহার করেন। তাঁহার অগণ্য অতিমাত্র ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। তৎপরিবর্ত্তে অগণ্য এবং আশাতীত লাভ হয়। তিনি কখন অসতর্ক নন, শিথিল নন, অলস নন, অপরিমিতব্যয়ী বা অন্যায়াচারী নন। ভগবানের বিধাতৃত্ব দ্বারা পবিত্রীকৃত না হইলে, তিনি একটী পয়সাও স্পর্শ করেন না; ঈশ্বরের আদেশের উত্তেজনা

বিনা, একটী পয়সাও কখন ব্যয় করেন না। যে অর্থ মানুষ প্রাণের মত, পুত্র-কন্যাগণের অন্নের মত প্রিয় মনে করে, সেই অর্থ তিনি, সেবাব্রতের জন্য প্রয়োজন হইলে, জলের মত ঢালিয়া দেন এবং ধনহানি হইল বলিয়া কখন আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া মনে করেন না; কারণ দরিদ্রতা তাঁহার পক্ষে লাভ। কল্যকার জন্য চিন্তা কোন আলোক আনে না, বরং দরিদ্রতায় অধিকতর অন্ধকার বাড়াইয়া দেয়। তিনি দিবসের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতে যান, ধার্ম্মিকের ঘুম ঘুমান, তাঁহার আগামী কল্য ঈশ্বরের বক্ষে বিঘ্নশূন্য। স্ত্রীপরিবার সহ তিনি বর্ত্তমান ও অনন্ত জীবনের জন্য ঈশ্বরেতে বাস করেন, এবং যে পরীক্ষা তিনি ভাল করিয়া বহন করেন, উহাই তাঁহার বিশ্বাসের প্রমাণ হইয়া বলিয়া দেয় যে, তাঁহার যে কোন অভাব হউক না কেন, প্রতিদিন স্বয়ং ঈশ্বরই তাহা যোগান। অনেক বৎসরের ভিতর দিয়া তাকাইয়া তিনি দুঃখদুর্দ্দিনমধ্যে অনাবৃত সুখের দিন দেখিতে পান, কেন না তিনি অর্জ্জন করেন নাই, অথচ অন্ন পাইয়াছেন, তিনি পরিশ্রম করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেতনভোগীর বেতন স্পর্শ করেন নাই; ঘোর দুঃখদারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে পিতার উদারদান-লাভে তিনি স্বচ্ছন্দে ছিলেন। তাঁহার হস্তে বহুল অর্থ আসিয়াছে, স্বর্গ হইতে স্বর্গীয়ান্নের ন্যায় বর্ষিত হইয়াছে, তিনি ব্যয় করিয়াছেন, কখন কুণ্ঠিত হন নাই, উপযুক্ত কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন, ব্যয় করিয়া যেমন দরিদ্র তেমনই আছেন। অপিচ তিনি জানেন, ভবিষ্যতে আরও অনেক অর্থ প্রয়োজন হইলেই আসিবে। যাঁহার ভয় হয় না, তাঁহার প্রায় অকৃতার্থতা হয় না। যিনি ঈশ্বরে ও মানুষে বিশ্বাস করেন, তিনিও তাহার পরিবর্ত্তে বিশ্বাসভাজন হন। পবিত্র সেবার কার্য্যে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস নিয়োগ করে, এ জীবনে এবং অনন্তজীবনে সমুদায় লভ্য বিষয় সে না চাহিয়াও পায়। যে লাভ চায়, সে লাভ পায় না, বরং যাহা লইয়া আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাও হারায়। দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ কর, ধন অন্বেষণ করিও না। ঈশ্বরের সেবা কর। বিশ্বাসে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, সকলই তোমরা পাইবে।"

চার্লস্ উড সাহেবের কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে অভিমত

বিগত মে মাসে (১৮৮২ খৃঃ) চার্লস্ উড সাহেব কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি "মাসিক আটলাণ্টিক" পত্রিকায় "নবীন হিন্দুসংস্কারক" এই আখ্যায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উহার আমরা সেই অংশের অনুবাদ

দিতেছি, যে অংশে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন আছে। "তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) স্বাগতসম্ভাষণ অতি সহৃদয় ছিল। তিনি 'নির্জ্জনাবাস' হইতে আসিলেন, অথচ সে বিষয়ে একটী কথাও কহিলেন না। অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজে যে প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যাকরণশুদ্ধ বিশুদ্ধ ইংরাজীতে এক জন পরিব্রাজক আসিলে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হয়, সেই সকল বিষয় তিনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশ্য উচ্চারণগত পার্থক্য ছিল, এদেশের লোক ইংরাজের গৃহে না জন্মিলে সেরূপ পার্থক্য তো থাকিবেই। তিনি এমন স্বাধীন ও সরল ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন যে, কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ থাকিতে পারে না। যখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্রাহ্মসমাজের কোন লোক কি খ্রীষ্টান বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারেন? তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'আঃ! না, ও শব্দ যে সঙ্কুচিতহৃদয়ত্ব বুঝায়। খ্রীষ্টান যে (আমি জানি না, কোথা হইতে তাঁহাতে এ ভাব আসিল) হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানকে ঘৃণা করে, আমরা যে সকলেরই সম্মান করি। আমাদিগের নিকটে খ্রীষ্ট অতি মহৎ, তাঁহার জীবন অতি পবিত্র, তবে তিনি কেবল রাজতনয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তনয়।' আমি যে নির্জ্জনাবাসের কথা শুনিয়াছিলাম, সেইটি স্মরণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদের মতের মধ্যে (কৃচ্ছ্র) বৈরাগ্য আছে কি? তিনি উত্তর দিলেন, 'ও শব্দ (asceticism) সাধারণতঃ যে অর্থে গৃহীত হয়, সে অর্থে নাই। আমরা জীবনের সহজ ভাব অনুমোদন করি, আমরা ভিক্ষায় জীবনধারণ করি, আমরা মাংসাহার করি না, এবং কখন কখন সাধনার্থ দিন কয়েকের জন্য অরণ্যচারী হই।' তাহার পর তিনি একখানি ছবি দেখাইলেন, যাহাতে তিনি সস্ত্রীক ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে একটি অনুর্ব্বর ক্ষুদ্র পাহাড়ে বসিয়া আছেন। তাঁহার হাতে একতারা আছে, এইটির কেবল ব্রাহ্মসমাজ ব্যবহার করিয়া থাকে। তিনি বলিলেন, অনন্তের ধ্যানে 'আমরা এইভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকি।'

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইদানীন্তন ঈশ্বর কথা কন, এ কথায় কি আপনারা বিশ্বাস করেন? আমি দেখিতে পাইলাম, কলিকাতার অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, কেশবচন্দ্রের অধিকারের উপরে ব্রাহ্মসমাজ সংশয় করিলেই, তিনি, ঈশ্বর তাঁহাকে সম্প্রতি আদেশ করিয়াছেন, তাই তিনি এরূপ কার্য্য

করিয়াছেন, এইরূপ বলিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়ই ঈশ্বর কিছু মূক হন নাই, তিনি প্রাচীন কালেও যেমন কথা কহিতেন, এখনও তেমনি কথা কন।' আমি বলিলাম, আপনার তো প্রচারকগণ আছেন? 'হাঁ, আছেন। আমরা তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানে প্রেরণ করি। তাঁহারা সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, ইহাদের মধ্যে যদি কেহ বলেন, আমি এলাহাবাদে যাইবার আদেশ পাইয়াছি, আর মণ্ডলী যদি ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ট্রিচিনোপলীতে কাজ করিতে হইবে, তখন কি হইবে? তিনি উত্তর দিলেন, 'তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বাধ্যতা স্বীকার করান হইবে। সমগ্র মণ্ডলীয় মতের বিরুদ্ধ ওরূপ আদেশে আমরা বিশ্বাস করিব না *।' আমি ইঙ্গিত করিলাম, ইহাতেতো বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে। কোন সময়ে সমাজমধ্যে কি বিচ্ছেদ ঘটিয়া দল হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ, অতি অল্প দিন হইল, এরূপ অতি গভীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কতকটা আমার কন্যার বিবাহ হইতে এরূপ ঘটিয়াছে, অবশ্য আপনি সে বিষয় কিছু শুনিয়া থাকিবেন'।"

---

* But I asked what if one of these men should say. I have had a revelation to go to Allahabad, when the church wishes him to work in Trichinopoly? "He would be forced to yield" was the reply. "We should not believe in a revelation of that sort, in opposition to the opinion of the whole church."—THE NEW DISPENSATION. JUNE 11, 1882.

আত্মজীবন-বিবৃতি

জীবনবেদ

দার্জিলিঙ্গে স্থিতিকালে কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেন, আমরা তাহা পূর্ব্বে (১৭৮৭ পৃঃ) উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। ১লা শ্রাবণের (১৮০৪ শক) ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "বিগত রবিবার (২৬শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই) আচার্য্য মহাশয় সপরিবারে দার্জিলিঙ্গ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই বর্ষাকালে সে স্থান তত স্বাস্থ্যকর নহে, সেই জন্য তিনি বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারেন নাই।" পরবর্ত্তী (১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্ব) পত্রিকায় কেশবচন্দ্র আত্মজীবন বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এই সংবাদটি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—"ইতঃপূর্ব্ব আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে কেবল একটী প্রার্থনামাত্র করিতেন। এখন স্বীয় জীবনবেদ অর্থাৎ জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা প্রতি সপ্তাহে মুদ্রিত হইবে। এই জীবনবেদ অতিমূল্যবান্, কেন না, ইহা দ্বারা শত শত জীবন গঠিত হইবে।" জীবনবেদ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। উহা এখন সকলেরই প্রাপ্য। সুতরাং এখানে বিস্তৃত ভাবে সমগ্র বিবৃতি প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আচার্য্যজীবন পাঠ করিয়া পাঠকগণ যদি কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনবিবৃতিসম্বন্ধে স্থূল জ্ঞানও লাভ না করেন, তাহা হইলে এতদ্‌গ্রন্থ-পাঠের পরিশ্রম বিফল হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা উহার প্রত্যেক অধ্যায়ের সারমাত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এখানে আমাদের সকলেরই শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সমুচিত; কেন না, তিনিই আচার্য্যমুখবিনিঃসৃত বাক্যগুলি তৎকালে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

প্রার্থনা—(৮ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক, ২৩শে জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

"আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্ম্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মগুলি বিচার করিয়া কোন

একটী ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক-শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই ঊষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল।…কে প্রার্থনা করিতে বলিল, তাহাও কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পারি, এ সন্দেহও হইল না।…'প্রার্থনা কর, বাঁচিবে, চরিত্র ভাল হইবে, যাহা কিছু অভাব পাইবে', এই কথাই জীবনের পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে, উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত।…প্রথমেই বেদ বেদান্ত, কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম। আমি বিশ্বাসী; বিচার করি, আরও বিশ্বাস করি। একবার বিশ্বাস করিলে আর টলি না।……হইয়াছে? বিচারের জন্য এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। 'হইয়াছে, আরও চল'—এই উত্তর পাইলাম। সকালে একটী, আর রাত্রিতে একটী, লিখিয়া প্রার্থনা সাধন করিতে লাগিলাম।…প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জ্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। দেখি, আর সে শরীর নাই, সে ভাব নাই;! কি কথার বল, কি প্রতিজ্ঞার বল! বলিলেই হয়, প্রতিজ্ঞা করিলেই হয়! পাপকে ঘুসি দেখাইতাম, আর প্রার্থনা করিতাম।…সকল বিষয়েই সহায় প্রার্থনা। তখন একমাত্র প্রার্থনা-ধনই ছিল; কেবল তাহারই উপরে নির্ভর করিতাম।…আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোনা যায়। আদেশের মত এইরূপে প্রথম হইতে হৃদয়ে নিহিত আছে।…বুদ্ধি এমনই পরিষ্কার হইল প্রার্থনা করিয়া, যেন দশবৎসর বিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র বিজ্ঞান-শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া আসিলাম।…যে প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য অপেক্ষা করে না, সে প্রবঞ্চক।…ধন মানের জন্য, সংসারের জন্য, কিম্বা চৌদ্দ আনা ধর্ম্ম আর দুই আনা সংসারের জন্য, অথবা সাড়ে পনের আনা পারত্রিক সদ্গতি আর আধ আনা সংসারের জন্য যে কামনা করে, প্রার্থনা সম্বন্ধে সে বঞ্চক।…পারত্রিক মঙ্গলেরই কামনা করিবে, অথচ হইবে সকলই। যখন গৃহে বিবাদ, মত লইয়া কলহ, ঠাকুরের সন্তানগণ তখন কেবল প্রার্থনাই করিবে। আসিবে প্রার্থনা করিয়া, আর শান্তিসংস্থাপন হইবে। বন্ধুরা করেন না, তাই কষ্ট পান।…"

পাপবোধ—(১৫ই শ্রাবণ, ১৮০৪ শক; ৩০শে জুলাই, ১৮৮২ খৃঃ)

"……পাপ কি, কি করিলে পাপ হয়, এ সকল বিচার করিয়া আমার

পাপবোধ হয় নাই ; পাপ-দর্শনে পাপ-বোধ হইল, পলকের মধ্যে সহজে পাপ বোধ করিলাম।......সে মত মানি না, যে মতে পাপেই মানুষের জন্ম নির্দ্দেশ করে। পাপের সম্ভাবনায় জন্ম, ইহা মানি। শারীরিক প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে। আমি পাপ করিতে পারি; কি করিতে পারি? মিথ্যা কথা বলিতে পারি ; চুরী করিতে পারি। সে কিরূপ? যদি কাহারও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লইতে ইচ্ছা হইল, কি 'আমার হয়, তাহার না থাকে' এক মিনিটের জন্যও এরূপ ভাব আসিল, তবেই চুরী হইল।......ভৃত্যকে এক দিন বেতন দিতে যদি বিলম্ব হয়, অমনই বিবেক বলে, 'ওরে পাপি! অন্যায় ব্যবহার?' যদি বলি, আজ হইল না, কাল দিব, বিবেক বলে, 'তুমি আজ খাইলে কিরূপে?'......জবাব দিতে পারি না। ছোট আদালত হৃদয়ের মধ্যে খোলাই রহিয়াছে।......ঘড়ির কাঁটা বার বার বাজে, আর বার বার কে বলে, 'তোর কিছুই হয় নাই, তোর কিছু হয় নাই, কিছুমাত্র হয় নাই।' ঘোড়াকে যেমন চাবুক মারে, তেমনই এই ভিতরের কথা আমাকে চাবুক মারিতে থাকে। আশ্চর্য্য এই, আমি কাঁদি, আবার হাসি। যত কাঁদি, তত হাসি। ঔষধ খাইলে যদি শরীর সুস্থ হয়, তবে সে ঔষধ কে না খায়? এই জন্যই আমি বন্ধুদিগকে কেবল বলি, 'ওগো, তুমি পাপী, তুমি অলস, তুমি অপরাধী।' কিন্তু আমি যেন নামতা পড়িতেছি, কেহই আমার কথা গ্রাহ্য করে না।......কেবল সত্যবাদী হইবার জন্য অনুরুদ্ধ নই, অমৃতভাষী হইবার জন্য অনুরুদ্ধ। একটু যদি কাহার উপর অসন্তোষ দৃষ্টি করিয়া থাকি, অমনি কষ্ট আরম্ভ হয়।......তুমি বল, ব্যভিচার পাপ; কিন্তু যদি কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি একটু আসক্তি দেখায়, অধিক স্ত্রীজাতির নিকট থাকিতে চায়, আমি বলি, কি ভয়ানক!......পাপের বোধ হইলে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, জালা হয়, তাহা হউক। আমাদিগের মা এমনই দয়াবতী যে, তিনি কষ্টের পর সুখ রাখিয়াছেন। ......পাপের বোধে যদি কষ্ট হয়, তাহাই সুখের কারণ হইবে।......যদি পাপ করিয়া থাক, তোমার প্রাণ ছটফট করুক; যেমন ছটফট করিবে, অমনি শান্তিদেবী নিকটে আসিয়া তোমাকে শান্তিদান করিবেন।"

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা—(২২শে শ্রাবণ, ১৮০৪ শক ; ৬ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

"...যদি জিজ্ঞাসা করি, হে আত্মন্! ধর্ম্মজীবনের বাল্যকালে কি মন্ত্রে

দীক্ষিত হইয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয়, অগ্নিমন্ত্রে।......অনেকের শীতল স্বভাব, মনের ভিতর শান্তি; তাঁহারা কার্য্যবিহীন, তাঁহাদের কার্য্যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ভাব।......শীতলতা যদি প্রধান ভাব হয়, তবে তাহা নিস্তেজ করে মনুষ্যের স্বভাবকে; শিথিল করে স্বভাবের বন্ধনকে।......কিছুমাত্র অগ্নি নাই, একটুও উত্তাপ নাই, (চিকিৎসক) দেখিলেই বলিবেন, প্রাণ-অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে। ধর্ম্মজীবনেও উত্তাপ না থাকিলে মৃত্যু।......উত্তাপহীন অবস্থাকে অপবিত্র অবস্থা মনে করিতাম। যে দিন প্রাতঃকালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম, মৃত্যু ভাবিতাম। নরক ও শীতলভাব, আমি একই মনে করিতাম। কি মনের চারিদিকে; কি সামাজিক অবস্থার চারিদিকে, সততই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম।......সর্ব্বদা উত্তাপ না থাকিলে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, এই জন্য আশাগুলিকে সতেজ করিয়া, বিশ্বাসকে সতেজ করিয়া, সতেজ উদ্যম লইয়া থাকিব। যখনই মনে হইবে, শীতল ভাব আসিতেছে, বুঝিব, কাম, ধূর্ত্ত ব্যবহার, কপটতা সব সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে।......হাত পা যেমন গরম থাকিলে শরীরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তেমনই কার্য্য, চিন্তা, আশা, বিশ্বাস, কথা, ব্রত, এ সমুদায়ে উত্তাপ থাকিলে ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে।......উৎসাহদাতা, প্রাণদাতা যিনি, তাঁহাকেই ডাকি, উৎসাহের সহিত অগ্নিস্বরূপকে ডাকি। অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি, রসনা ইহাই কেবল উচ্চারণ করুক, হৃদয় সর্ব্বদা এই মন্ত্র সাধন করুক।"

অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য—(২৯শে শ্রাবণ, ১৮০৪ শক; ১৩ই আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

"...সংসারে প্রবেশ করিবার কাল আমার পক্ষে শ্মশানে প্রবেশ করিবার কাল। ঈশ্বর স্থির করিয়াছিলেন, সুখ-উদ্যানের পথ আমার পক্ষে মৃত্যু, তাহাই ঘটিল।......শোক, সন্তাপ, বৈরাগ্য আমার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইল। ......অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার হয়, কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসরেই মৎস্য-ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলাম। কে মতি দিল? কে বলিল, আমিষ-ভক্ষণ নিষিদ্ধ? এক গুরু জানিতাম, তাঁহাকেই মানিতাম, তাঁহাকেই বিবেক বলিতাম। সেই বিবেক একটী বাণী বালককে বলিলেন, বালক (মৎস্য-ভক্ষণ) পরিত্যাগ করিল।......সংসারের বিলাসেই অনেক লোক মরিয়াছে। ভিতর হইতে এই শব্দ আসিল, 'ওরে, তুই সংসারী হোস্ না, সংসারের নিকট

মাথা বিক্রয় করিস্ না; কলঙ্ক, পাপ এ সকল ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়, আমোদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।' সংসারের প্রতি ভয় জন্মিল; যাই সংসারের কথা মনে হইত, ভাবিতাম, যেন নরকের দূত আসিল। ··· যাহাতে কষ্ট হয়, গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার দিকে মন না যায়, এমন সকল বিষয়েই নিযুক্ত হইতাম। এই সকল হইল কখন? আঠার উনিশ কুড়ি বৎসরে। ··· বাগানে গিয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা হইত না, হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতাম না, অন্ধকার স্থানে চুপ করিয়া জড়ের মত থাকিতাম। কেবল দুই একটি মনের কথা ঈশ্বরকে জানাইতাম। আর কাহাকেই বা জানাইব? এইরূপে জীবনের মূলে বৈরাগ্য হইল। বৈরাগ্য-মূলক জীবনে যাহা হওয়া আবশ্যক, তাহাই হইল। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবের জয় হইল।··· শব করিয়া না ফেলিলে দেবত্ব পাইবে না, এই বিধি ঈশ্বর আমার উপর খাটাইয়াছেন।···সুখ হইবে বলিয়া বৈরাগ্য স্বাভাবিক, মর্কট বৈরাগ্য আমি চাই না; যে বৈরাগ্য চেষ্টা করিয়া করিতে হয়, আমি তাহার প্রয়াসী নই।···ভিতরে বৈরাগ্য রাখিয়া, বাহিরে সমস্ত বজায় রাখিলে সভ্যেরা যদি বলেন, ইহাতে কপটতা হইল, জন্মসন্ন্যাসী যাহারা, আমার ন্যায় তাহারা ইহাতে প্রশ্রয় দেয়।··· অগ্রে ম্লানমুখ হইলে, শেষে হাস্য আসিয়া বৈরাগ্যকে মহিমান্বিত করিবেই করিবে।"

স্বাধীনতা—(৫ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক ; ২০শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ)

"আমার ইষ্টদেবতা যখন আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বাধীনতা মহামন্ত্র নিবিষ্ট ছিল। বৎস! কখনও কাহারও অধীন হইও না, এই প্রধান সৎপরামর্শ।···অধীনতার শৃঙ্খলে শরীর মনকে বদ্ধ হইতে দেওয়া হইবে না; দাসত্ব স্বীকার করা হইবে না; কাহারও পদতলে পড়া হইবে না; গুরুজনের নিকটে আত্মবিক্রয় করা হইবে না; পুস্তকবিশেষেরও কিঙ্কর হইয়া বন্দনা করা হইবে না; কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়িয়া দিবা রাত্রি তাহারই যশোঘোষণা করা হইবে না। এক দিকে যেমন এই সকল প্রতিজ্ঞা, অপর দিকে প্রতিজ্ঞা তেমনই, স্বেচ্ছাচারের অধীন হওয়া হইবে না, অহঙ্কারের অধীন হওয়া হইবে না; ঈশ্বরের নিকট যে ব্রত লওয়া উচিত, তাহাও পরিত্যাগ করা হইবে না।···স্বাধীনতাতে ফললাভ করিলাম। এই জন্য আমার

সঙ্গে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলি, আমাকে তাঁহাদের গুরু বলি না।...দলের সামান্য কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না।... আমার অধীন যদি কেহ হয়, তাহাও আমার অত্যন্ত অসহ্য।...কাহাকেও গুরু অথবা শাসনকর্ত্তা বলিতে পারি না; ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানি। অধীনতাপ্রিয় কেহ যদি ঠক হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকেন, সে ঠক্‌কে বাহির করিয়া দিব, দিবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়।... মহামান্য ঈশা মহীয়ান্ হউন, গৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি; কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না।...যেখানে ঈশার আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন।...ব্রাহ্মধর্ম্ম আমার প্রিয়, একতারা আমার প্রিয়। এই দুইয়ের প্রতি যদি আমি আসক্ত হই, ইহাই আমার নিকটে দেবতার স্থান প্রাপ্ত হইবে। আজিকার জন্যই ইহাদিগকে আজ লই, আবার কাল ছাড়ি।...নববিধানে প্রত্যেকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কে গুরু? কে ব্রাহ্মসমাজ? কে আমার ব্রাহ্মদল? কোন বিষয়ের উপরেই আসক্তি নাই। বস্তু যাহা, তাহা রাখিব। নাম পর্য্যন্তও, আবশ্যক হইলে, পরিত্যাগ করিতে পারি।...ঈশ্বরের আমরা অধীন, এই জন্যই সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

বিবেক—(১৯শে ভাদ্র, ১৭০৪ শক; ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

"অন্তরে যদি কেহ কথা কয়, সাধারণ লোকে তাহাকে ভূত বলিয়া মানে। যে ব্যক্তি প্রেতগ্রস্ত হইয়াছে, সেই ভিতরে এবং বাহিরে বাণী শ্রবণ করে। ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ অবধি অনেক সময় এই প্রকার বাণী, এই প্রকার কথা ভিতরে এবং বাহিরে শ্রবণ করিয়াছি, অথচ তাহাকে প্রেতবাণী বলিয়া মনে করি নাই এবং কখন করিবও না।...এই যে ভাল কথাগুলি, এ সব ঈশ্বরের; আর মন্দ কথা, কুবুদ্ধি, অসৎ পরামর্শ, অবিদ্যা সমস্তই আমার। বার বার যদি ভাবা যায়, কল্যাণ যত সব ভগবানের, অমঙ্গল সমস্ত আমার; সুখ ও সুস্থতা তাঁর, অসুখ, দৌর্ব্বল্য আমার। মনোবিজ্ঞানের প্রণালী সহকারে যদি এইরূপ ভাবি ও সাধন করি, তাহা হইলে অসৎকার্য্যের জন্য নিজে লজ্জিত হইব; আর ভাল কার্য্যের জন্য সুখ্যাতি গৌরব ঈশ্বরকে দিব। কাহারও পক্ষে ইহা উপার্জ্জিত ভাব, উপার্জ্জিত জ্ঞান; কাহারও পক্ষে এরূপ প্রকৃতি স্বাভাবিক।...যেখানে পুরুষদ্বয়ের

স্বর স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেইখানেই শুভ ফল লাভ করা যায়।...আমার রুচি বলিতেছে, তুই মদ্যপান কর, বিলাসসুখ অনুভব করিতে থাক্; আর এক বাণী বলিতেছে, আমার পথ অবলম্বন কর, ইহাতে ছিন্নবস্ত্রও পরিতে হইতে পারে, সর্ব্বত্যাগী হইয়া থাকা হইতে পারে, কিন্তু আমি বলিতেছি, ইহাতেই তোমার মঙ্গল।...দুইটী জিভ্ যখন স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, সে অবস্থায় তুমি কি বলিবে? তুমি কি বলিবে, জীবই ব্রহ্ম? দুই আদালত স্পষ্ট রহিয়াছে। এক আদালতের নিষ্পত্তি বার বার অপর আদালতে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তুমি যেখানে ছোট আদালতের কথা কহিতেছ, সেইখানেই বড় আদালতের নিষ্পত্তি তোমার কথাকে চূর্ণ করিতেছে। অতএব আমি দ্বৈতবাদী; দুই বিচারপতি দেখিতেছি। এক আত্মা আর এক জন আত্মাকে চালাইতেছেন। যখন আমি বলি, আমার কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়, তেমনই যখন তিনি বলেন, তাঁরও কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়।...আমি যেন আরও ব্রহ্মবাণীতে বিশ্বাস লাভ করি; তোমরাও যেন এই বিশ্বাসের পথ ধরিয়া আপনাপন কল্যাণ সাধন কর।”

ভক্তিসঞ্চার—(২৬শে ভাদ্র, ১৮০৪ শক; ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

“...এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না; প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না; অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য।...তিন লইয়া এই সাধক ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে আর যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, সমস্তই দেখা দিল।...ধর্ম্ম যদি ভয়ে আরম্ভ হয়, পরিণত হইবে ভক্তিতে ও আনন্দে। আজ যদি কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবন ভাল কর, কাল দেখিবে, সেখানে ভক্তিকুসুম ফুটিয়াছে।...শুষ্ক কঠোর ভাবের মধ্যে পড়িয়া যে কাঁদিতেছিল, সে হাসিতেছে, এ সংবাদ সকলের জানা উচিত। ঈশ্বরজ্ঞান অল্প ছিল, বাড়িল; হাতজোড় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, পরে দেখি, তিনিই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মা বলিতে শিখিলাম। মা নামের মধ্যেও কত রূপ দেখিলাম। কত ভাবেই মাকে ডাকিলাম। কখন শক্তির সহ আনন্দ সংযুক্ত দেখিলাম; কখনও জ্ঞানের সহিত প্রেমের যোগ নিরীক্ষণ করিলাম।... আমি ভক্তিতে ডুবিয়া বুঝিলাম, ঈশ্বরের খেলা।...হে ঈশ্বর, রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর, হে ভগবান্ বাঁচাও, এই বলিয়া বলিয়া দিন যাইতেছে; শীঘ্র

ভক্তির পথ আন, একথা তো কেহই বলিলেন না। কেবল এক জন বলিলেন; যাঁর বলিবার, তিনি বলিলেন। সাহারার মধ্যে কমল ফুটিল। পাথরের উপর প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইল। সকলই হইতে পারে, প্রার্থনার বলে। যা কিছু অভাব, সকলই মোচন হয়। এখন জল স্থল আমার উভয়ই আছে। বিশ্বাস-হিমালয় আছে, ভক্তিসরোবর আছে। যেমন বৈরাগ্য, তেমনি প্রেম।"

লজ্জা ও ভয়—(২রা আশ্বিন, ১৮০৪ শক; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃ:)

"...এ জীবনে দুইটী ভাবের বিরোধ দেখিলাম, শ্রবণ কর। সেই বিরোধের সামঞ্জস্য শান্তি যথাসময়ে জীবনে সম্ভোগ করিতেছি, জানিবে। এই জীবনে লজ্জা ও ভয়ের দাস হইয়া অনেক দিন হইতে থাকিতে হইয়াছে। যেমন অন্যান্য রিপু, তেমনিই লজ্জা ও ভয় উপদ্রব করিতেছে, এখনও সে উপদ্রব চলিয়া যায় নাই। ইচ্ছা করিয়া, আদর করিয়া, লজ্জাকে, ভয়কে প্রভু বলিয়া স্বীকার করি নাই। সাধু সজ্জনদিগের শত্রু লজ্জা ও ভয়। যেমন সকল পাশ ছিন্ন হয়, তেমনই এ পাশও ছিন্ন হয়। সাধন অভাবে হউক, অথবা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বশতই হউক, এখনও লজ্জা ও লোকভয় আছে। চেষ্টা করিলেও এ দুই ছাড়িতে পারি না।...লজ্জা ভয়ের ক্ষেত্র আছে। হরি ধর্ম্মভূমি হইতে লজ্জা ও ভয়কে বিদায় করিয়া সংসারে রাখিয়াছেন।...যে পরিমাণে বিশ্বাস বাড়িল, ধর্ম্মসম্বন্ধে লজ্জা ভয় সেই পরিমাণে কমিল।...বড় বড় বিদ্বান্ দেখিলে দলে প্রবেশ করিতে সাহস হয় না।...ধন মানের উজ্জ্বল পরিচ্ছদ দেখি যেখানে, সেখানে স্বভাব আপনাপনি সঙ্কুচিত হয়।...ধনী, মানী ও বিদ্বান্ এই তিন প্রকার লোকের কাছে মন সহজে যাইতে পারে না, সহজে যাইতে চায় না। কর্ত্তব্য বলে, যাও, তাই যাই। কর্ত্তব্য বলে, বক্তৃতা কর, করি; ধর্ম্ম আদেশ করেন, তাই করিতে পারি। সে আদেশ যেখানে শুনি না, সেখানে কত আলোচনা করি, হস্ত অবশ হয়, পা নিস্তেজ হয়, চক্ষু আপনাকে আপনি বন্ধ করে।...কোথাও যাইতে হইলে দশ জনের সঙ্গে যাইতে চাই। সংসারে একাকী যেও না, ধনী মানীদের দলে একলা যেও না। কে এই কথা বলে? কে বলে?...ব্রহ্মবাণী? না, স্বভাব বলে?...যেখানকার বিষয়ে ধর্ম্ম-কথা নাই, ধর্ম্ম-সংস্রব নাই, সেই খানেই লজ্জা, সেই খানেই ভয়।...দশজনের কাছে বিরুদ্ধ

সত্য মত প্রচার করিতে হইলে নির্লজ্জ হইব, ভয় ত্যাগ করিব। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজা, বড় লোক হইলেও সত্য প্রচার করিব।' কিন্তু অন্যত্র কেন ভয় হয়, জানি না। এক স্থানে সিংহ যে, অন্য স্থানে মেষশিশু সে। সময়বিশেষে, স্থানবিশেষে ভয়ানক লজ্জা, অত্যন্ত ভয়; সময়বিশেষে স্থানবিশেষে ভয়ানক নির্লজ্জতা, অতিশয় সাহস।"

যোগের সঞ্চার—(৯ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

"ভক্তি যেমন আমার পক্ষে উপার্জ্জিত বস্তু, যোগও তদ্রূপ। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভকালে যোগী ছিলাম না, যোগের নাম শুনিতাম না, যোগ-কথা জানিতাম না, যোগের লক্ষণ নিষ্পন্ন করিতে পারিতাম না; যোগের পথে কখনও যে চলিতে হইবে, এ চিন্তা করি নাই। খুব পুণ্যবান্ হইব, সচ্চরিত্র হইব, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করিব, ইহাই ধর্ম্ম জানিতাম, ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতাম। যোগী হইব কেন? যোগী কে? এ সকল চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইতাম না; ওদিকেই যাইতাম না।…ভক্তি যখন বাড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী প্রমত্ততা জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহা চিরকাল থাকে না। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্যক।…অনেকে কঠোর যোগের মধ্যে পড়িয়া ভয়ানক অদ্বৈতবাদসাগরে পড়িয়া গিয়াছেন; ভক্তির উচ্ছ্বাসে পড়িয়া অনেকে কুসংস্কারে পতিত হইয়াছেন। আমি দুই দিক্ বাঁধিলাম। আমার ভক্তি যোগকে অবলম্বন করিয়া থাকিত।…অধিক সাধন করি নাই, চক্ষু খুলিয়া সাধন করিলাম। তাকাইলাম চারি দিকে; দেখিলাম প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর বাস করিতেছেন।…যোগ কি? অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে, প্রতি বস্তু দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের দর্শনলাভ।…সর্ব্বত্র এক জ্ঞান ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এক শক্তি টন্ টন্ করিতেছে, এই অনুভব হইবে।..একতারা লইয়া সাধন করিলাম। যোগে মগ্ন হইয়া গান করিলাম, সেই গানের ভিতরে ভক্তি প্রবল হইয়া সুখ দিল।.. আমি নীচ হইয়া যোগভক্তির আনন্দলাভ করিব, তাহা বিচিত্র নয়। আশা দিতেছি, উৎসাহ দিতেছি, ব্রহ্মপাদপদ্ম ধরিয়া যোগী হও, ভক্ত হও।"

আশ্চর্য্য গণিত—(১৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক ; ১লা অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

"...আমাদের দেশের...অঙ্কশাস্ত্র অতীব আশ্চর্য্য ; কেন না তাহার মতে তিন হইতে পাঁচ লইলে সতের অবশিষ্ট থাকে।...যদি দেখি, কেহ বলিতেছে, কেমন করিয়া ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইবে, কিরূপে প্রাচীর উঠিবে, আগে যদি টাকা না হইল, কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, অমনই বুঝিয়া লই, ইহার জয় সম্ভব নয়। আমরা বলি, বাড়ী চাই, ঈশ্বর ? হাঁ। বুঝিলাম, তৎক্ষণাৎ আকাশের উপর চারতালা বাড়ী হইল। বাড়ী নির্ম্মাণ হইল, টাকাও আসিতে লাগিল, তখন পত্তন হইল। আগে ভাবিয়া করিবে না ; আগে করিয়া পরেও ভাবিবে না ; আগেও না, মধ্যেও না, পরেও না ; ভাবনা কখনই করিবে না। ঈশ্বরাদেশে কার্য্য করিবে ; ভাবিবে কেন ? হইবে কিরূপে, এদেশের লোক ভাবে না ; হইল কিরূপে, ইহাই ভাবে।...যেখানে দেখা গেল, সকল লোকেই এই কার্য্যের সুখ্যাতি করে, এই কার্য্য যদি করা যায়, সকল লোকেই সুখ্যাতি করিবে। সাধক অমনই বুঝিলেন, এ কার্য্য মন্দ কার্য্য, ইহাতে সর্ব্বনাশ হইবে। মন বলিল, এই কার্য্য কর ; আকাশের দিকে তাকাইয়া বোঝা গেল, এ একটু ভাল কার্য্য। ভাল ভাল লোক, ধনাঢ্য লোক, পণ্ডিত লোকে পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে ; স্থির হইল, ইহা করিতেই হইবে।...পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অনুকূল। লক্ষ লোক যে কাজে প্রয়োজন, সাধক ভক্ত গৃহস্থ বলেন, তিন জনের দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইবে।...পাঁচ জনের কার্য্যে ছয় জন লোক প্রবেশ করিলেই সকল কার্য্য বিফল হয়।...এই জন্য যিনি আমাদের দেশ হইতে আসেন, তিনিই চান, অল্প লোক থাকে।...অসংখ্য লোক, একশত লোক হইল। এখনও এত লোক, আসল পথে এত লোক ? আরও শক্ত সাধন প্রবর্ত্তিত হইল। কেহ ইহাতে বিরক্ত হইল, কেহ নিন্দা করিয়া পলায়ন করিল।...তুমি দয়া-ব্রত স্থাপন করিবে ?...কাপড় ছিঁড়িয়া একটি সূতা হাতে করিয়া, বল, আয় আয়, টাকা আয়। পর দিন সকালে সূর্য্যের মুখ হইতে, যত প্রয়োজন, ঈশ্বর দিবেন। যার টাকা আছে, তাহার দ্বারা যাহা হয় না, যার টাকা নাই, তাহারই দ্বারা তাহা হয়। এ আশ্চর্য্য ব্যাপার কে বুঝিবে ?...পৃথিবীর পাণ্ডিত্যকে ধিক্। উপাসনায় যাহা হয়, চিন্তায় পাণ্ডিত্যে তাহা হয় না। ধনাঢ্য ও পণ্ডিতে যাহা করিতে না পারে, আমাদের দেশের এক ভক্ত,

ভক্তবৎসল আদেশ করিলে, তাহা অনায়াসে করিতে পারে।…যার কিছু নাই, তারই জয়। অগ্নিমধ্যে দক্ষিণ হস্ত, প্রজ্বলিত হুতাশনে বামহস্ত রাখ; সাহসে পূর্ণ হও। মুখে তৃণ করিয়া দণ্ডায়মান সাধক, স্বর্গরাজ্যে বাস কর।"

জয়লাভ—(২৩শে আশ্বিন, ১৮০৪ শক; ৮ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

"যখন ভগবানের আনন্দবাজারে প্রথম দোকান খোলা হয়, তখনই এই নিয়ম করা হইয়াছিল যে, ঋণ করিয়া কিছু করা হইবে না, এবং ধারে কিছুই বিক্রয় করা হইবে না।…পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম না, যাহা আপনার নয়, তাহা আপনার বলিলাম না।…যখন যতটুকু পাইয়াছি, যত টুকু প্রেমরস ঘটে ছিল, যত টুকু বিদ্যা ছিল, যে টুকু মানিতাম, সেই টুকুই কার্য্যে পরিণত করিয়াছি। … পরের মুখে ঝাল খাইয়া শেষে বিপদে পড়িব, এ আশঙ্কা ছিল, এবং এখনও আছে। চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, হস্ত আছে, দেখিব, পরিষ্কার করিয়া বুঝিব। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? মা বাড়ীতে আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, গুরু ঘরে আছেন, অর্থ তাঁর কাছে বুঝিয়া লই। বন্ধু দক্ষিণ হস্তের কাছে রহিয়াছেন, তাঁহাকেই বলি, 'হরি আমাকে সাহায্য কর'। …জীবনের সুপ্রভাতে বিধাতা বলিয়া দিলেন, 'তিনি নগদ দেন, ধারে দেন না, নগদ বহুমূল্য ঐশ্বর্য্য তিনি অর্পণ করেন।' এই জন্য বিশ্বাস হইল, যাহা কিছু প্রয়োজন, যত দূর মনুষ্যের পক্ষে লাভ করা সম্ভব, সমস্ত পাইব। সাধন করিলাম, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ধন আশা না করাতে লাভ হইল।…ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইল; দুই বৎসর যাইতে না যাইতে দেখি, প্রচুর ফল, লোকে লোকারণ্য।…কি ছিল পঁচিশ বৎসর আগে, কি হইয়াছে পঁচিশ বৎসর পরে! … ধর্ম্মে ধর্ম্মে কি বিবাদ ছিল; অধর্ম্মের প্রতি লোকের কি আসক্তি ছিল; ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছিল; ভক্তি প্রেমের কি অভাব ছিল; দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে উৎসাহের কিরূপ অভাবই ছিল। দশ কুড়িবৎসরের অপ্রতিহত যত্নের পর সত্য বিস্তার ও রক্ষার সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হইল। অনেক কীর্ত্তি মাটি হয় যে দেশে, সেই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানে পরিণত হইল। … যে হিসাবের কাগজ খুলি, দেখি, পাঁচ টাকায় আরম্ভ, পাঁচ লক্ষ টাকা লাভ।…অবিশ্বাস নাস্তিকতা আসিতেছিল। বন্যার মত অবিশ্বাসের ভাব প্রবল হইতেছিল; বঙ্গদেশের যুবকগণ নিমীলিতনয়নে, কে জানিত, এমন

সময়ে, 'এই ব্রহ্ম পেয়েছি' 'এই ব্রহ্ম পেয়েছি' 'সর্ব্বেশ্বর মহেশ্বর হৃদয়েশ্বরকে এই ধরেছি' বলিবে ? এ ব্যাপার এখন চক্ষে দেখিয়াছি, অপরকে দেখাইয়াছি। এখন শাক্তে বৈষ্ণবে মিল হইয়াছে।...আমি যে হরিদাস, প্রভুর যাহা, দাসেরও যে তাহা। ব্রহ্মাণ্ড যে আমার হস্তগত হইল। আমি কি জন্মিয়াছি, কখন হারিবার জন্য ? রসনায় যদি হরিনাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে এ রসনা কখনও হারিবে না। যদিও অন্য বিষয়ে হীন হই, যদিও ধন নাই, মান নাই, অধিক সাধন ভজন নাই, কিন্তু হরিনামের বল আমার উপর, আমার দলের উপর আছে।...মাঠের মধ্যে বাড়ী প্রস্তুত হইল। বিরোধীদের প্রাণের মধ্যেও নববিধান প্রবিষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইতেছে। কৃষ্ণে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে।...একজন পাপিষ্ঠের জীবন যদি এত কীর্ত্তি স্থাপন করে, তোমরা সহস্র ভাই একত্র হইলে হরিনামের মহিমা কত বিস্তার করিতে পার, দেশে কত কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পার। এক পাপী এত দেখালে ; তোমরা সহস্র সাধু আরও অনেক দেখাও।"

বিয়োগ ও সংযোগ—(৩০শে আশ্বিন, ১৮০৪ শক ; ১৫ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ)

"...মন ধর্ম্মরাজ্যে...বসিয়া সর্ব্বদা বিয়োগ ও সংযোগ-ক্রিয়া সমাধা করিতেছে। কাহারও মনে এই বিয়োগভাব প্রবল, কাহারও মনে আবার সংযোগ-স্পৃহা বলবতী।...আমার স্বভাবের মধ্যে দুয়ের সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। এক সময়ে দুই ভাবের সামঞ্জস্য হইল, এরূপ বলা যায় না।...দুই ভাবই মনে ছিল ; কিন্তু একটী একটী করিয়া সাধন করিয়াছিলাম। কখনও বৈরাগ্য, কখনও পুণ্য, কখনও প্রেম, এক একটী করিয়া সাধন করিয়াছি। ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে প্রথমে ন্যায়ের ভাবই হৃদয়ে প্রবল হইয়া প্রকাশিত হইল। ...অনেক দিন পরে ন্যায়ের পরিবর্ত্তে দয়ার ভাব ও অনুতাপের পরিবর্ত্তে ভক্তি প্রেমের সঞ্চার হইল। যাবতীয় স্বরূপ একত্র ধরিবার জন্য আগ্রহ ছিল না ; যখন যেটি প্রয়োজন, তখন সেইটী করিবার জন্যই চেষ্টা ছিল।...যদিও প্রকৃতির ক্রিয়া গদ্যে লেখা হইতেছিল, পরে দেখি, তার মধ্যে পদ্যও অনেক। দেখিলাম, প্রকৃতির কৌশল একটীর পর একটী আনিয়া নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে সকলগুলির সংযোগ করিতেছে। জবার যখন প্রয়োজন হইল, ভক্তির সহিত লইলাম ; তুলসীর যখন আবশ্যক হইল, তুলসী লইলাম ভক্তির সহিত। পরে দেখি, কে

সমস্ত সংযোগ করিয়া পুষ্পমালা রচনা করিতেছেন। প্রথমে ইচ্ছা জন্মে নাই, নববিধানে সমস্ত একত্র গাঁথিব; পরে দেখি, প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতে-ছেন।···আপনার মনের ন্যায় অপরের মন বলিয়াই, কেবল এক খণ্ড হইতে বিপরীত খণ্ডে যাই। এইরূপে দিন গেল বটে, কিন্তু সামঞ্জস্যের দিকেই যাইতেছি, নববিধানের দিকেই যাইতেছি। ··মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও। বহু দিন হইতে স্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল। মনে হইত, খণ্ড খণ্ড ভাব লইয়া থাকিব না।···আমি এক জনকে নিমন্ত্রণ করিব, একটী লইব, মনে করি, (হৃদয়) নারদ তাহা করিতে দেন না। একটীকে আনিতে গেলেই সকলগুলিকে আনিতে হয়, ঈশা মুষা যেন পরস্পর হাতে হাতে বাঁধিয়াছেন। এই দেখিয়াই নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম, নব ব্রহ্মধর্ম্মকে। ··বাল্যকালে চলিয়াছি, যৌবনে ভ্রমণ করিয়াছি, মৃত্যুর পরও দৌড়িতে হইবে। নববিধানের পূর্ণতা হইবেই হইবে। এই পথিকের সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রস্তত হউন। এখনও ঢের অভাব আছে। ভাই বন্ধু, ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। আর অংশ লইয়া ঈশ্বরের অপমান করিও না; নব-বিধানের বক্ষ বিদারণ করিও না।"

ত্রিবিধ ভাব—(২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক ; ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

"সাধকের জীবনধাতু একজাতীয় নহে, ইহা অল্প বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা সংযুক্ত ধাতু, ত্রিবিধ ধাতুর মিলন ইহাতে।···তিন প্রকৃতি এই জীবনে বিরাজ করিতেছে।···একটী বালক, একটী উন্মাদ, আর একটী মাতাল,—এই তিনের প্রকৃতি যে বিভিন্ন, তাহা সকলেরই নিকট প্রতীয়মান।··· নিগূঢ়রূপে প্রত্যেক সাধকের ভিতরে অল্প অল্প এই তিন প্রকার মসলা মিশান হইয়াছে। ··প্রথম অবস্থায় সাধকের জীবনে অল্প পরিমাণে বালকত্ব, উন্মাদ-লক্ষণ ও মাতাল-প্রকৃতি লক্ষিত হয়। যতই সাধনে পরিপক্ক হয়, ততই এই সকল গুণ বাড়ে। · দেড় বৎসরের যে বালক, সেই বালক আমি। কোটি বৎসর কার্য্য করিব যে কার্য্যালয়ে, সেখানে আমি এখন সম্পূর্ণ বালক। ··মাকে খুব ডাক্‌তে ডাক্‌তে ছেলে মানুষের ভাব আসে। রাজাধিরাজের পূজাই যদি কেবল কর, বৃদ্ধ হইয়া যাইতে পার। মার পূজা করিয়া কখন বৃদ্ধ হইলে না; কখনও বৃদ্ধ হইবে না। মার কোলে যত দিন থাকিব, মার স্তন্যপান যত দিন করিব,

ততদিন বালকই থাকিব ; বৃদ্ধ আর হইব না। পরলোকে গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইব ; সেখানেও শিখিব। মাকে মা বলিয়া ডাকিতে হয়, এই মন্ত্র, এই শাস্ত্র। এই বালকের মসলা ভিতরে ; তার সঙ্গে উন্মাদের মসলা। উন্মাদের সঙ্গে কাহারও মেলে না।...ক্রমাগত এমন সকল কার্য্য করা চাই, যাহাতে পৃথিবী বলিবে, এ সকল বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। বিপরীত রকমের কার্য্য সকল দেখিয়া লোকে উন্মাদ ক্ষেপা বলিয়া উপহাস করিবে। · তৃতীয় ধাতু মাতালের আসক্তি। সুরাপানের মত্ততা পৃথিবীতে আছে, আমাদের লক্ষণে তার বৈপরীত্য নাই কেন ? মাতাল হইলে পরিমাণ বাড়াইতে হয়, আমরাও তাই করি। পাঁচ মিনিট উপাসনা ছিল ; এখন পাঁচ ঘণ্টা হইয়াছে।...যত দিন বালকত্ব আছে, পাগলামি আছে, তত দিনই সুখ ও পবিত্রতা। যে দিন বৃদ্ধ হইব, পাগলামি ছাড়িব, উন্মাদ অবস্থা তিরোহিত হইবে, নেশা ছুটিয়া যাইবে, সেই দিনই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। ভগবান্ করুন, যেন এ তিনের সঙ্গে বিচ্ছেদ কখন না হয়।”

জাতিনির্ণয়—(৩রা পৌষ, ১৮০৪ শক ; ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

“যদি মানবমণ্ডলীকে ধনী এবং দরিদ্র জাতিতে বিভাগ করা যায়, আমি আমাকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত মনে করিব ?...অনেক অনুসন্ধানে এবং পঁচিশ বৎসরের সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইতেছে, মনের কামনা অভিরুচি তন্ন তন্ন করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে যে, আত্মা দরিদ্র-জাতীয়। শরীরের রক্ত দুঃখীর রক্ত, মাথার মস্তিষ্ক দীন জাতির মস্তিষ্ক।..যদিও উচ্চকুলোদ্ভব, যদিও নানা প্রকার ধনসম্পদ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার অনুরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। ধন আছে, কিন্তু ধনের প্রয়াস নাই ; উপাদেয় আহার্য্য আছে, কিন্তু আহারস্পৃহা নাই ; মন সামান্য বস্তুতেই সন্তুষ্ট। মান মর্য্যাদা চারি দিকে আছে, কিন্তু মন সে সকলের খবর লয় না। দুই দলের লোক আসিলে, ধনী ছাড়িয়া মন দরিদ্রের খোঁজ লয়, দরিদ্র-সহবাসে মন পরিতৃপ্তি বোধ করে।...বাষ্পীয় শকটে যদি কোনখানে যাইতে হয়, তৃতীয় ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে ভয় হয়। মনে হয়, বুঝি, অনধিকার-চর্চ্চা করিতেছি ; ভয় হয়, বুঝি, ধনীর রাজ্যে যাইতেছি।...আমি ধনীদের জন্য নই, দরিদ্রদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। যেখানে দরিদ্রেরা, সেই খানেই আমার

আরাম ; জীবনরক্ষা সেই খানেই। আয়াস দ্বারা এ সকল দরিদ্র ভাব শিক্ষা করি নাই ; আপনাপনি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।...বড় ধনীদের সঙ্গে বসি, বড় লোকের করস্পর্শ করি, এ সকল করিলেই কি স্বভাব যাইবে ? চণ্ডাল কি ব্রাহ্মণ-স্পর্শে ব্রাহ্মণ হইবে ? শাকান্নভোজী এক দিন সম্রাট্‌গৃহে আহার করিলেই কি ধনী হইবে ? স্বভাব কিছুতেই যাইবে না।...কথিত ছিল, ধনীকে ঘৃণা করিয়া দীনকে মান্য দিবে, পরাক্রমশালীকে অগ্রাহ্য করিবে ; পরিত্রাণের পথে ধনীরা যাইতে পারে না। মান সম্পদ্ গৌরব যেখানে, সেখানে ধর্ম্ম নাই, পর্ণকুটীরেই কেবল ধর্ম্ম বাস করেন। কিন্তু এখনকার শাস্ত্রে নববিধানের মতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ধনীকে মান দিবে এবং দুঃখীকেও মান দিবে। স্বর্গের পথে ধনী দুঃখী উভয়েই চলিতেছে। বাহিরে ধন থাকিলে ক্ষতি নাই, মনে দুঃখী হইলেই হইবে।...যদিও আমি হীন স্বভাব ও দীন মন পাইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যদিও ভূমিষ্ঠ হইয়াই বুঝিলাম, আমি দীনহীন, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ধনীদের মধ্যে জন্ম, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাস, দাসী, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান।...দীনজাতীয় হইয়া যদি দীনের ঘরে থাকিতাম, হীন ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলে হয়ত দীনদিগেরই পক্ষপাতী হইতাম ; ধনীর মস্তকে হয়ত কুঠারাঘাত করিতে চাহিতাম।... বাহিরে ঐশ্বর্য্য থাকিলেও, চক্ষু বন্ধ করিয়া নির্ধনের ব্যাপার দেখিতে পাইলাম। এই দ্বিজাতীয় ভাবের মধ্যে থাকিয়া সহস্রবার ঈশ্বরকে নমস্কার করিলাম। ধনীর পক্ষপাতী হইলাম, দুঃখীরও পক্ষপাতী হইলাম।...নিজে হইলাম দীন, মান দিলাম ধনী দুঃখী উভয়কেই ; প্রেমে উভয়কেই আলিঙ্গন করিলাম। নিজে দীনদরিদ্রজাতীয় থাকিলাম, ইহাতেই সুখ, শান্তি ; দীনাত্মারই পরিত্রাণ।”

শিষ্যপ্রকৃতি—(১০ই পৌষ, ১৮০৪ শক ; ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

“এই পৃথিবী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে যত দিন থাকিতে হইবে, ধর্ম্মোপার্জ্জন ও জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিব। এই জন্যই আপনাকে কখনও শিক্ষক মনে করিতে পারি নাই ; শিক্ষক বলিয়া কখনই আপনাকে বিশ্বাস করিব না। শিষ্য হইয়া আসিলাম, শিষ্যের জীবন ধারণ করিতেছি, শিষ্যই থাকিব অনন্ত-কাল। শিখধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্ম শিক্ষা-করা আমার শোণিতের মধ্যে নিহিত আছে।...কত গুরুর নিকট হইতেই সত্য শিখিতেছি। আকাশ গুরু, পাখী

গুরু, মৎস্য গুরু ; সকল গুরুর নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি।...ঘোরান্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশ যেমন, তেমনই আমাতে সত্য প্রকাশ হয়। কোন বস্তু দেখিতেছি, কি কোন কাজ করিতেছি, গাছের পানে তাকাইয়া আছি, কে যেন আমার নিকটে সত্য আনিয়া দেয়। মনের ভিতর একটী সত্য আসিল, অমনই হৃদয় বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় জলিয়া উঠিল, সমস্ত জীবন আলোড়িত হইল। মনে ধাক্কা দিয়া এক একটী সত্য আসিয়া থাকে।...শিক্ষা আমার শেষ হইয়াছে, এখন শিক্ষা দিতে হইবে, একথা কখনও মনে আসে নাই।...যখন শিখিয়াছি, তখন আমি শিষ্য ; যখন শিখাইয়াছি, তখনও আমি শিষ্য।...কি ভক্তিসম্বন্ধে, কি ব্রহ্মদর্শনবিষয়ে শিক্ষার অন্ত হইল না। সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় কিরূপে হয়, এসম্বন্ধে ব্রহ্মপ্রমুখাৎ কত আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছি, তথাপি ফুরাইল না।...'গ্রহণমন্ত্র' আমি সাধন করিলাম, 'প্রদানমন্ত্র' আমি কখনও লই নাই। 'দান' আমার মূলমন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম। ...মুখ খুলিয়া কি বলিব, কখনই চিন্তা করিলাম না। যখনই বলিতে হইল, সত্য আপনা আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুরুগিরি অসার, তাহা কখনও অবলম্বন করি নাই ; পুরাতন কথা বলি নাই। গত বৎসর যাহা বলিয়াছি, এবৎসরও যে তাই বলিব, তাহা নহে।...ভাল কথা পাঁচজনকে শুনাইতেছি, ইহা মনে হইলেই জিহ্বা জড়াইয়া যায়, বাক্‌রোধ হয়, শরীর মন সঙ্কুচিত হয়। আমি শিখিলেই শিখান হইল ; আমি পাইলেই দশ জনের পাওয়া হইল।... সামান্য গায়ক দেখিলে, তারও পায়ে পড়িয়া শিখিতে ভালবাসি। কোন বৈরাগী আসিলে, লক্ষ টাকা ঘরে আসিল ভাবিয়া, তাহার সঙ্গীত শুনিয়া কত শিক্ষা করি। যে কোন লোক হউক, নূতন কথা বলিতে আসে; মনে করি, যে কোন প্রকারে তাহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে পারিলে হয়। এ জীবনে কেহ কাছে আসিয়া, না দিয়া চলিয়া যায় নাই। হৃদয়ের ভিতরে ভগবান্ শক্তি দিয়াছেন, সাধুসঙ্গে বসিবামাত্র গুণ আকর্ষণ করিতে পারি। বেশ বুঝিতে পারি, সাধু যখন নিকট হইতে চলিয়া যান, হৃদয়ের গুণ ঢালিয়া দিয়া গেলেন। আমি যেন তাঁর মত কতকটা হইয়া যাই। আমি জন্মশিষ্য ; জন্ম হইতে শিখিতেছি, শিক্ষা আর ফুরাইল না। সকলেরই নিকট হইতে চির দিন শিক্ষালাভ করিব ; শূকরাদি পশুর নিকট হইতেও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইব। শিখিতে শিখিতে পরলোকে যাইব।"

অনৃতখণ্ডন—(১৭ই পৌষ, ১৮০৪ শক ?)

"আমার জীবনবেদ পাঠ না করিয়া, সমুদায় পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন না করিয়া, কেহ কেহ অন্যায় কথা সকল বলিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহারা মিথ্যাকথন অপরাধে ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট অপরাধী হইয়াছেন।…মিথ্যাকথন দোষে কে কে দোষী? কে কে অপরাধী? পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্ত্তক, মুক্তির সহায় ঈশা গৌরাঙ্গের সঙ্গে এই নরকের কীটকে যাঁহারা একশ্রেণীভুক্ত করিলেন, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন।…যদিও সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত নই, যদিও নির্ম্মলচরিত্র সাধুদের সঙ্গে, পবিত্রচরিত্র মহর্ষিদিগের কাছে বসিবার উপযুক্ত নই,…তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞান এবং পুণ্য, শান্তি ও প্রেম ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার নিকট আসিতেছে। যাঁহারা বলিলেন, এ জীবন প্রত্যাদিষ্ট নয়, এ ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তাঁহারাও মিথ্যা কথা বলিলেন।…এ ব্যক্তি অযোগ্যতা সত্ত্বেও, এক বার নয়, দুই বার নয়, শত সহস্রবার স্বর্গের সুধাভিষিক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া জীবন পবিত্র ও সুখী করে; শত সহস্রবার দর্শন লাভ করিয়া, জীবন পবিত্র ও দর্শন-প্রয়াসী হয়।… আহার পরিধান প্রভৃতি ব্যাপার যেমন সহজ, এই ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণ তেমনি সহজ। ইহাতে যদি কেহ বলেন, এ ব্যক্তি অপর সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে, তাঁহারাও মিথ্যাবাদী। যাঁহারা আমার দর্শন শ্রবণ অস্বীকার করিলেন, তাঁহারা যেমন মিথ্যাবাদী, আর এই দর্শন শ্রবণের জন্য যাঁহারা আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন, তাঁহারাও তেমনি মিথ্যাবাদী। ঈশ্বর-দর্শন অসাধারণ পুরুষত্বের পরিচয় নয়, ঈশ্বরের কথা-শ্রবণ অসামান্য নয়। যেমন বাহিরের জড় বস্তু সকল দেখা, ঈশ্বরকে দেখা তেমনি। তিনি যেমন ভাবান, তেমনি ভাবি; যেমন বলান, তেমনি বলি; যেমন প্রচার করিতে বলেন, তেমনি প্রচার করি। তাঁহার সঙ্গে অতি সহজ যোগ। আর যদি কোন গূঢ় দর্শন থাকে, তাহা হয় নাই।…যাঁহারা জানেন, এ ব্যক্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক কোন কোন পদে অভিষিক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর স্বয়ং ইহার সমক্ষে সত্য প্রকাশ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং ইহাকে চালাইতেছেন, তাঁহারাই সত্য জানেন ও সত্য বলেন। তাঁহারা মিথ্যাবাদী, যাঁহারা এই বলিয়া অপবাদ করিলেন যে, এ ব্যক্তি

বুদ্ধিসহকারে ধর্ম্মসকলকে মিলিত করিতেছে, এ ব্যক্তি ভয়ানক অধ্যবসায়-সহকারে হিমালয়কে স্থানান্তরিত করিতে পারে।...এ ব্যক্তি আপনাকে চালাইবার জন্য কোন চাকরী করিল না, কোন ব্যবসায় লইল না, বরাবর ঈশ্বর স্বয়ং চালাইয়াছেন, আজও চালাইতেছেন। ইহা যাঁহারা অলৌকিক পুরুষত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা মিথ্যাবাদী। যেমন আমি আমার জীবনকে ঈশ্বরের হাতে দিয়াছি, এমনই লক্ষ লক্ষ ভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী ঈশ্বরের হাতে জীবন ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা অলৌকিক নয়।...যে ব্যক্তি আমাকে ধনী ও জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সে ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী।...যাঁহারা গূঢ়তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন, কল্য প্রাতঃকালে নিশ্চয় অন্ন আসিবে, এমন উপায় নাই; কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর উপায় আছেন।...যাঁহারা আমাকে দরিদ্রদিগের মধ্যে পরিগণিত করিতে চান, তাঁহারাও মিথ্যায় পতিত হন।.. ধন না থাকিলেও, যদি কাহাকেও ধনী বলিয়া গণনা করিতে পার, তবে সে ব্যক্তি আমি। ...এখানকার সামান্য এক জন বিদ্বান্ যাহা জানেন, আমি সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তাহা আমি জানি না।...জ্ঞানে আমার ঔদাসীন্য নাই।.. একজন জ্ঞানী আমার বাড়ীতে থাকেন, আমার দৃষ্টি তাঁহার উপর থাকে। সেই শাস্ত্রীর কথা শুনিয়া আমি বিদ্যাসম্বন্ধে যত অভাব মোচন করি। লজ্জানিবারণ যদি আমার লজ্জা নিবারণ করেন, তবেই হয়। যেগুলি থাকিলে উপদেশ দেওয়া যায়, হরি তাহার ব্যবস্থা করেন।...আমার যাহা কিছু মান হইয়াছে, তাহা হরির জন্য। আমার মান হরির মান।...ব্রহ্ম আমার ধন, ব্রহ্মই আমার বিদ্যা ও জ্ঞান, ব্রহ্মই আমার মান ও প্রতিপত্তি।...নিজের দ্বারা কিছু হয় নাই, হরির চরণ ব্যতীত আর ধন নাই, হরির চরণ ব্যতীত আর কোথাও জ্ঞান ও শান্তি পাওয়া যায় না; হরিচরণই সর্ব্বস্ব। এই জীবনবেদের ইহাই মূল তাৎপর্য্য।”

২২

ত্রয়োদশ ভাদ্রোৎসব

প্রেরিতমণ্ডলীর অপ্রণয়-দূরীকরণ, উৎসবের পূর্ব্ব তিনদিন প্রস্তুতিসাধন

সর্ব্বপ্রকার অসম্মিলনের কারণ অপনীত না করিলে, প্রেরিতগণ উৎসবে অধিকারী হইবেন না, উপাসকগণ আপনারা উৎসব করিবেন. কেশবচন্দ্র এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন। তাই ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই ভাদ্র, ১৮০৪ শক) বলিতেছেন :—

"এবারকার ভাদ্রোৎসব অন্যান্য ভাদ্রোৎসব অপেক্ষা সর্ব্বপ্রথমে এই এক বিষয়ে অতীব বিশেষ যে, প্রেরিতমণ্ডলী এই আদেশ প্রাপ্ত হন যে, তাঁহারা অপ্রণয়ের কারণসমূহ অগ্রে বিদায় করিয়া না দিয়া, উৎসব করিতে পারিবেন না। দৃঢ় নিশ্চয় ছিল যে, এই বিধি পূর্ণ না হইলে উপাসক ব্রাহ্মমণ্ডলী উৎসবের কার্য্য করিবেন, প্রেরিতগণের কেহ উৎসবে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। বিধাতাকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদিগের সম্বন্ধে মর্ম্মপীড়াকর ঘটনা সংঘটিত হইতে দেন নাই। তাঁহার করুণায় প্রেরিতমণ্ডলী উৎসবে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, দ্বিগুণতর আনন্দের সহিত উৎসব সম্ভোগ করিলেন। উৎসবের প্রারম্ভের সপ্তাহ এই বিধিবশতঃ কয়েক দিন একত্র মিলিত হইয়া উপাসনা হয় নাই, সকলে নির্জ্জনে একাকী উপাসনা করিয়াছেন। উৎসবের তিন দিন পূর্ব্বে বিধাতার বিধি পূর্ণ হইলে, ঐ তিন দিন প্রস্তুত হইবার জন্য উপাসনা হয়। প্রথম দিবসে ধ্যানযোগে স্বর্গে প্রবেশপূর্ব্বক ঈশা মুষা চৈতন্য প্রভৃতির সহিত সম্মিলন হয়। এ দিবসে স্বর্গস্থ মহাত্মাদিগের সঙ্গে ঈশ্বরেতে সাক্ষাদ্দর্শন স্পষ্ট অনুভূত হয়। ব্রহ্মেতে স্বর্গ অনুমানের বিষয় নহে, সাক্ষাদনুভবের বিষয়। ব্রহ্মই আমাদিগের পরলোক, তাঁহাতেই আমাদিগের নিত্য বাস, এ কথা মুখে বলা, আর প্রত্যক্ষ করা, দুই অতীব স্বতন্ত্র। লোকে যখন এই মত মুখে বলে, তখন যে কেহ তাহার অনুমোদন করে। এক বার যদি কেহ বলে, এই আমি স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য মহাত্মদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম, লোকে তখনই উহা অসম্ভব

বলিয়া মনে করে, লোকাতীত বলিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। সমাধি ভিন্ন কেহ এই স্বীকৃত সত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, সুতরাং সাধারণের প্রতিবাদ্য বিষয়। ব্রহ্মেতে প্রবেশ করিলে স্বর্গে প্রবেশ করা হয়, তত্রত্য অধিবাসিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ইহা স্বাভাবিকযোগগম্য। মহাত্মা-দিগের মানবীয় অংশ আমাদিগের সাক্ষাৎকারের বিষয় নহে, যে দেবাংশে তাঁহারা ঈশ্বরসহ অভিন্নভাবে স্থিতি করিতেছেন, সমাধির অবস্থায় তাহাই আমাদিগের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং এ অংশ আমাদিগের ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার আচ্ছাদন করে না, ঈশ্বরের মধ্যে এই সমুদায় অংশ প্রতিভাত হইয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করে। জননীর ক্রোড়ে তাঁহার স্বর্গীয় শিশুগণ এই সময়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হন।

"দ্বিতীয় দিনে স্বর্গস্থ গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রবিষ্ট ইমারসন্, প্রশস্তহৃদয় ডিন্‌ষ্টান্‌লি এবং মহাজনগণের সম্মানদাতা কারলাইলের সঙ্গে সম্মিলন হয়। এই দিনে বিজ্ঞানবিদ্গণের সঙ্গেও মিলনানুভব হইয়াছিল। তৃতীয় দিনে পৃথিবীস্থ মনুষ্যমণ্ডলীর অভ্যন্তরে স্বর্গাবলোকন হয়। সাধক যখন স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সে সময়ে তিনি স্বর্গ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, সমুদায় মনুষ্যের মধ্যে স্বর্গদর্শন, এই তখন তাঁহার সাক্ষাদনুভব। তিনি তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দেখিতে চান না। মানবের মানবীয় অসার অংশ তখন তিনি দেখেন না, ঘোর পাপীর অভ্যন্তরেও ব্রহ্মকে অবলোকন করিয়া তিনি প্রণত হন। এই উচ্চ অবস্থা ভিন্ন মনুষ্যসম্বন্ধে পাপ অসম্ভব হয় না। ঈশ্বর হইতে সংসারে প্রবেশ সময়ে, যে ব্যক্তি দিব্য চক্ষু লইয়া তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারিল না, তাহার সম্বন্ধে পাপ অসম্ভব হইবে, কি প্রকারে?"

প্রথম দিনের প্রার্থনাটি প্রাপ্ত হওয়া যায়:নাই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের প্রার্থনা এই :—

ইমার্সন্, ষ্ট্যান্‌লি ও কার্লাইল সমাগম বা 'তীর্থযাত্রা'

২৫শে আগষ্ট (১৮৮২ খৃঃ)—"ইমার্সন, আপনার বাড়ীতে থাকিতে ভাল-বাসিতে। তুমি কি কম? তুমি আমাদের। তুমি নববিধানের। তুমি ভাই। আর তোমার পাশে ষ্ট্যান্‌লি মহামতি, তুমি উদার। তুমি প্রশস্ত। তুমিত বাপের

বাড়ীতে এসে বসেছ। হিন্দুরা কাঁদিল, বলিল, ঈশা যে আমাদের ভাই। তুমিও কাঁদিলে। বলিলে, আস্তে দে না ওদের! ভারতকে আস্তে দে। তুমি ঈশার বাড়ীর কাছে একটি বাড়ী করেছ; বলিলে, কে রে আমার বাপের বাড়ীকে ছোট করে? আমার মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ছোট করে? তোমার যেমন বিদ্যা ছিল, তেমনি উদারতা ছিল; তুমি হাত বাড়িয়ে সকলকে আলিঙ্গন করিতে। আমাদের মত অধম লোককেও ত্যাগ করিলে না। সাম্প্রদায়িকতা তুমি থাকিতে দিলে না। তুমি বলিলে, আটলাণ্টিক, পেসিফিক্ সব এক হবে। দেখ, ভাই, তুমি যা বলিলে, তা সার্থক। তুমি যথার্থ পথ দেখালে! তোমার মহাপ্রভুর উদার ধর্ম্ম প্রচার করিলে। মহাত্মা ষ্ট্যান্‌লির উদার ধর্ম্মের কে আদর্শ আছে? আহা, পৃথিবী মাণিকহারা হয়ে গেল। আর কি এমন লোক আসিবে? কে আমার বাপের বাড়ীকে এমন বড় করিবে! লোক সকল তোমারই পথ ধরিবে। সত্য যাবে না। যা দেখিয়ে গিয়েছ, তা হবে; সব খুব উদার প্রশস্ত হয়ে যাবে। সকলে এক হয়ে যাবে। চিদাকাশে সকলে থাকিবে। ভাই, তুমি চিরকাল আমাদের কাছে থাক।

"আর একটি ভাই আমাদের কোথায়? নির্জ্জনতাপ্রিয় বড়, ধর্ম্মবীরদের সম্মান-কারী। চিরকাল তুমি একলা থাকিতে ভালবাস। ঝোপের ভিতরে থাকৃতে ভালবাস। স্বর্গের ভিতরও ওঁর বাড়ী খুঁজে বার করা ভার। এত কাজ কর্ম্ম হুড়োহুড়ি চারিদিকে, বিলাতের জীবনের আদর্শ দেখাও! তা নয়, হিন্দু ঋষিদের ধর্ম্ম কোথায় পেলি, ভাই? তুই তবে পরমার্থতত্ত্ব পেয়েছিলি। তুই বড় উৎসাহী ছিলি। তোর লেখাগুলো বইগুলোতে তাই এত তেজ। তাই তোর লেখা এত গরম। তোরা তিন জনে পৃথিবী তোলপাড় করেছিলি। বড় বড় পাদ্রি বিদ্বান্ লোক সকল ইংলণ্ডে জয় জয় রব করিতেছে, তুমি গ্রাহ্যও করিলে না। মুসলমানদের দলপতি মহম্মদকে নিয়ে খাড়া করিলে বিলাতে। মজার লোক! কিছু গ্রাহ্য করিলে না। বলিলে, আমি সব সাধুকে এক করিব। কোথায় রহিলে, কারলাইল! ধন্য বীর উৎসাহী! একটি ছোট ঘরে নির্জ্জনে সাধুদের নিয়ে বসে থাকৃতে। তোমরা তিনটি পৃথিবী হইতে স্বর্গে নূতন সমাগত। তোমরা আসনে বোস, আমরা সম্মান করি। জয় জয়, তোমাদের জয়! জয় জয়, তোমাদের জয়! জয় জয়, তোমাদের জয়! তোমাদিগকে প্রেম

উপহার দি, তোমাদিগকে প্রেম উপহার দি, তোমাদিগকে প্রেম উপহার দি। এই রজ্জু দ্বারা তোমাদের সঙ্গে আমাকে বাঁধিলাম। তোমরা যেন আমাদের হও। আমাদের বাড়ীতে তোমরা থাক। আমরাও তোমাদের রক্তের ভিতর থাকি। আমরা তোমাদের নিকট করিলাম। পৃথিবীতে থাকিলে অত নিকট করিয়া লইতে পারিতাম না। তোমাদের তিনটিকে নমস্কার করি, আর সকল ভক্তদের দেখে প্রণাম করে যাই। দূরে যাব কেন? শরীরটা বাড়ী যাক। নূতন ভাই পেলি, থাক। কথা বার্ত্তা কত আছে। ভারতবর্ষ থেকে যদি চিঠি থাকে, দে; যদি চিঠি নিয়ে যাবার থাকে, নে। মহর্ষিগণ, ভক্তগণ, প্রাণের ভাইগণ, এস। তোমাদের তিনটিকে নিয়ে রহিলাম। মা আনন্দময়ী, এস। এমনি করে তোমার স্বর্গ খুব বাড়িবে। এখানে শেষটা সকলেই যাইবে। কি সুবাতাস, কি নির্ম্মলা ভক্তি নদীরূপে ঐখানে বহিতেছে! সকলের মুখেই সৌন্দর্য্য! মা, অন্তে তব পদপ্রান্তে যেন স্বর্গলাভ হয়। মা, এমন সুন্দর দেশ থাকৃতে, কেন গিয়ে বিষ খাই নরকে? এমন চাঁদ মুখ সব থাকৃতে, কেন কাফ্রিদের দেশে যাই? মা, বুকের ধন কাছে এস, তোমার ছেলে-গুলিকে নিয়ে এস, তোমার স্বর্গ নিয়ে এস। একবার সকলকে লইয়া বুকের ভিতর আলিঙ্গন করি। আয়, আমার প্রাণের স্বর্গ, আমার বুকের ভিতর আয়। আমার সুখের ঈশা, প্রেমের গৌর, বুকের ভিতর আয়। মুখে ঈশা বড়, মুষা বড় বলিলে হবে না; চরিত্র চাই। দে, তোদের মত চরিত্র দে, নির্ম্মল চরিত্র দে, তোদের সুখ দে, শান্তি দে, পুণ্য দে! কৃপাসিন্ধু, দয়াময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্বর্গ হইতে শূন্যহস্তে ফিরিয়া না যাই; কিন্তু নূতন ভাই, পুরাতন ভাইদের চরিত্র বুকের ভিতর রাখিয়া, তাঁদের খুব আলিঙ্গন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।" (কমলকুটীর—দৈনিক প্রার্থনা—৮ম খণ্ডে "তীর্থযাত্রা" দ্রষ্টব্য)।

"জীবে ব্রহ্মদর্শন"

২৬শে আগষ্ট (১৮৮২ খৃঃ)—"দয়াল হরি, স্বর্গের ঘনীভূত সৌন্দর্য্য, এখন পৃথিবীতে নামিতে পারি। স্বর্গ দেখা হইল এক প্রকার, আজ তৃতীয় দিবস, আজ আমরা জগতে নামিতে পারি। লব্ধ বস্তু না হারাইয়া, আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে স্বর্গের সোপান দিয়া, পৃথিবীতে অবতরণ করিতে পারি। যদি

স্বর্গ হইতে স্বর্গীয় হইয়া, দেবগণের পদধূলি লইয়া, পৃথিবীতে নামিতে পারি, তাহা হইলে কি দেখি? দেখি, বড় আশ্চর্য্য! যখন স্বর্গেতে, হে হরিসুন্দর, তখন ঈশার রূপান্তর হইল, এবং পার্শ্বস্থ শিষ্যেরা রূপান্তর-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল। হরি হে, অদ্ভুত কথা; ঈশা স্বর্গ হইতে নামিলেন, তাঁহার স্বর্গে রূপান্তর ভাবান্তর হইল। সকলে দেখিল, এ কে? স্বর্গীয় উজ্জ্বল শুভ্র? যিনি স্বর্গে রহিলেন, তাঁকে দেখিলে লোকে বলে, রূপান্তরিত হইয়াছেন। সেইরূপ ঠাকুর, যখন তোমার ভক্ত পৃথিবীতে স্বর্গ লইয়া নামেন, তখন পৃথিবীর দিকে তাকাইলে, পৃথিবীকেও রূপান্তর দেখেন। দশ জন শিষ্য ঈশাকে রূপান্তরিত উজ্জ্বল দেখিলেন সত্য, কিন্তু তোমার ভক্ত দশ সহস্র নরনারীকে ভাবান্তরিত রূপান্তরিত দেখেন। মহেশ্বরি, আমি যদি তোমার স্বর্গের আগুনে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীতে নামি, এই সকল মনুষ্যকে উপরে দেখি, উচ্চে দেখি। কে জানে তাদের পাপ দুর্ব্বলতা? আমি যদি দেবচক্ষু পাই, তাদের উচ্চে দেখি। মিলনের চাবি পাওয়া গেল, জীবসেবার বীজমন্ত্র লব্ধ হইল। জীবেতে ব্রহ্ম দেখা গেল, পৃথিবী স্বর্গে বেড়াইতে গেল। এই মানুষেরা দেবতা হইল। এরা এখানে এক ভাবে, ওখানে এক ভাবে। দেবত্ব মনুষত্ব মিলিয়া অদ্ভুত তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রচার করিল। অতএব, হে খণ্ড খণ্ড মহাদেবগণ, প্রসন্ন হও। যদিও মহাদেব বলিয়া তোমাদের পূজা করিব না, কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ,—রূপান্তরিত হইয়া, হে পিতৃগণ, হে মাতৃগণ, হে দেবতা, হে ঈশ্বরের ভাবান্তর, তোমরা মহীয়ান্ হও সকলে। দেবত্ব মনুষ্যত্বে মিশিয়া গেল এই উৎসবে। পৃথিবীর ঘোলা জল ব্রহ্মসমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া গেল। আমার ব্রহ্মকে ইহাদের ভিতরে আমি পূজা করিব। এই সকল আধারে, মা, তুমি বসিয়া আছ। তুমি জীবন্ত দর্শন দিলে ইহাদের ভিতর; আমি ইহাদের অগ্রাহ্য করিতে পারি না, কলহ করিতে পারি না, বিচার করিতে পারি না। ইহারা চোর ব্যভিচারী নরহত্যাকারী হইলেও, তথাপি দেবতা, তথাপি দেবতা। ইহাদের পশুর দিক্ দেখা যায় না, দেবতার দিক্ দেখা যায়। ইহাদের ভিতর ব্রহ্মজ্যোতি, আনন্দের হিল্লোল। ইহারা পাপী, তা কি জানি না? তথাপি দেবত্বের সম্মান আমি করিব। ইহাদের অর্চ্চনা বরণ করিয়া আমি সহজে স্বর্গলাভ করিব। মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া কেহ স্বর্গলাভ করিতে

পারে না। এই যে সকল দেহমন্দিরে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা দেখা যাইতেছে! আমি কি করিব? এদের আমি চটাতে পারি না। এদের বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারি না। উৎসবে স্বর্গ, আর পৃথিবীতে স্বর্গ, দুই দেখা যায়। মা, মানুষের দেবত্ব না দেখিলে মুক্তি হয় না, মানুষকে সমাদর করিতে পারি না। নির্ব্বোধ মনুষ্য নববিধানের রহস্য বুঝে না। আমি বুঝাই গূঢ় তত্ত্ব। বাদাম আন, নারিকেল আন; খোসা ছাড়াও, ভিতরে শাঁস, আর ভিতরে জল, তাই ব্রহ্ম; তাই লও। আর মানুষ ছোবড়া, তাহা ফেলে দাও। হায়, আমি কি কেবল ছোবড়া দেখিব, না, নরনারীর ভিতর কেবল দেবত্ব দেখিব? দেবত্ব ভিন্ন আর কিছু দেখিব না। হনূমানের লেজ থাক্ না, কাল মুখ হোক্ না, হনূমানের বুক চিরে সীতারাম দেখিব। এরা ব্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করেছে, এরা ব্রহ্মগোত্র, এরা ব্রহ্মের বংশে জন্মেছে। এই নীচ মনুষ্যের ভিতর ব্রহ্ম দেখিয়া প্রণত হই, নমস্কার হই। শিষ্যমধ্যে গুরু, সন্তানমধ্যে পিতা; বন্ধুরা দেবতা, এই ঘর স্বর্গ, স্বর্গেই এই ঘর। দেবতারা এই ঘরে। স্বয়ং ব্রহ্ম ভগবান্ এই সকল জীবে। এই সকল জীব ভগবানের ভিতর। আমি পশুত্ব দেখিব না; থাক্ না পশুত্ব, আমার কি? আমি ব্রহ্মছাড়া আর কিছু যেন দেখিতে না পাই। ভাইয়ের চক্ষে বক্ষে কেবল হরি নৃত্য করিতেছেন, দেখিব। মানুষকে ভালবাসা যায় না, মানুষকে মানুষ বলে ভালবাসা যায় না; কেউ পারিবে না। মানুষের ভিতর ঈশ্বর, এ ভাবিলে ভালবাসা যায়। ঈশা দেখিলেন, পিতৃত্ব মানুষের ভিতর, তাহা দেখিয়া তবে তিনি সেই পিতৃত্বকে ভালবাসিলেন। প্রাণেশ্বর, আমি মানুষের ভালবাসাতে ডুবি না, আমি সেই অনাদিব্রহ্মের খণ্ড বলিয়া ভাইকে ভালবাসি। নববিধানবাদীগুলির সঙ্গে আমার গভীর যোগ। তোমরা হরির স্বীকৃত, তোমরা হরির সন্তান, তোমরা হরির মূর্ত্তি। আদর সম্মান শ্রদ্ধা তোমাদিগকে দিব। হরি, ব্রহ্মের কলা ইহাদের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি হউক! হে দীনবন্ধু, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উৎসবের প্রারম্ভে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া, মনুষ্যত্বের ভিতর দেবত্ব দর্শন করিয়া, মনুষ্যের প্রতি সকল পাপ একে একে অসম্ভব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।" (কমলকুটীর—দৈনিক প্রার্থনা, ৮খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

দিনব্যাপী উৎসবে প্রাতের উপদেশ—"স্নান ও ভোজন"

"রবিবার (১২ই ভাদ্র ১৮০৪ শক ; ২৭শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ) প্রাতে প্রথমতঃ সঙ্কীর্ত্তন হয়। সঙ্কীর্ত্তনান্তে আচার্য্য মহাশয় সমগ্র উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উৎসবের উৎসাহে তাঁহার অসুস্থ শরীর অনায়াসে সমগ্রভার বহন করিল। আমরা বহু দিন পরে তাঁহার আরাধনায় যোগ দিলাম, সুতরাং উহা আমাদিগের কর্ণে অপূর্ব্ব সুধা ও অপূর্ব্ব সত্য বর্ষণ করিল। আরাধনান্তে যে উপদেশ হয়, তাহা অতি সহজে ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিল। তিনি বলিলেন, ধর্ম্ম সহজ এবং সুকঠিন উভয়ই ; বহু সাধনেও ধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ হয় না, আবার সহজে উহা সিদ্ধ হয়। তিনি আজ বহু বর্ষ হইল, ধর্ম্মসাধন করিতেছেন, ধর্ম্মের জন্য বহু প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন ; কিন্তু ভ্রমণ করিয়া আসিয়া দেখেন, গৃহের নিত্যকৃত্য মধ্যে পূর্ণভাবে ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে। স্নান ও ভোজন এই দুই ব্যাপারের মধ্যে সমুদায় ধর্ম্ম নিবিষ্ট রহিয়াছে। এক জন মহাত্মা স্নানে ধর্ম্মের আরম্ভ, আর এক জন মহাত্মা ভোজনে উহার পর্য্যবসান করিয়া গিয়াছেন। নববিধানে নিত্যস্নান, নিত্যভোজনে ধর্ম্ম। দেখ, যখন গ্রীষ্মের উত্তাপে আমাদিগের শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, পথের ধূলি আমাদিগের দেহ অত্যন্ত মলিন করে, সে সময়ে কিছুতেই অবগাহন না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। এই অবগাহনে আমাদিগের শরীর স্নিগ্ধ হয়, শরীরের ময়লা পরিষ্কার হয়। দৃশ্যতঃ এই ব্যাপার হয় বটে, কিন্তু ভিতরে অজ্ঞাতসারে স্বাস্থ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। আমাদিগের এ দেশে নিত্যস্নানের প্রয়োজন। এক দিন স্নান না করিলে আমাদিগের কত কষ্ট। শরীরে যখন অনেক দিন যাবৎ ময়লা সঞ্চিত হয়, প্রখর গ্রীষ্মের তাপে যখন আমাদিগের প্রাণান্ত উপস্থিত, তখন অল্প জলে আমাদিগের কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না, শরীরের মলিনতা বিনষ্ট হয় না। এ সময়ে প্রচুর জলের প্রয়োজন। এইরূপ আমরা সংসারের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে, ইহার পথের ধূলি আমাদিগের শরীরে সংলগ্ন হয়, পাপের উত্তাপে আমরা একান্ত উত্তপ্ত হই ; শরীরের যদি স্নান প্রয়োজন হয়, তবে আত্মারও স্নান তেমনি প্রয়োজন। আমাদিগকে স্নান করিতে কে শিখায় ? প্রকৃতি। যখন শরীর উত্তপ্ত ও মলিন, তখন এমনি ক্লেশ উপস্থিত হয় যে, কেহ শিখায় না, লোকে দৌড়িয়া গিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া

পড়ে; ভিতরের উত্তেজনা সকলকে স্নানে প্রবৃত্ত করে। পাপ মলিনতায় আত্মা যখন অত্যন্ত অস্থির হয়, তখন হ্রদ সরোবর নদী বা সমুদ্রের অন্বেষণ করে। আত্মার জন্য হ্রদ কি, সরোবর কি, নদী কি, সমুদ্র কি? প্রার্থনা আরাধনা ধ্যান সমাধি চিন্তা এই সকল এখানে নদ নদী সরোবর সমুদ্র। যাহার আত্মাতে বহু মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, যাহার আত্মাতে পাপজনিত উত্তাপ অত্যন্ত প্রবল, সে দুই একটী প্রার্থনা করিয়া কিছুতেই স্নিগ্ধ হইতে পারে না, তাহার মলিনতা কিছুতেই ধৌত হইয়া যায় না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যানের অগাধ সরোবরে নিমগ্ন না থাকিলে, তাহার কিছুতেই তাপ নিবারণ হইবে না, শরীরের পাপপঙ্ক ধৌত হইবে না। যখন স্নান করিলাম, স্নানান্তে স্বভাবতঃ ক্ষুধা সমুপস্থিত হয়। ক্ষুধা যত প্রবল হয়, তত আহারের জন্য প্রয়াস হয়, অত্যন্ত প্রবল হইলে এক প্রকার উন্মত্ততা উপস্থিত হয়। এখানে কেহ শিখায় না, স্বাভাবিক ক্ষুধাবোধ এখানে আহারে প্ররোচক; স্নানান্তে যখন আত্মা নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ হইল, তখন তাহার ক্ষুধা উপস্থিত, ভোজনের সামগ্রী চাই। এখানে ভোজনের সামগ্রী কি? সাধুগণের চরিত্র। স্নানে স্নিগ্ধতা, নির্ম্মলতা, ভোজনে তৃপ্তি ও পুষ্টি। ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মারাধনাসরোবরে স্নান করিয়া আত্মা স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল হইল, বিবিধ সাধুচরিত্ররূপ বিবিধ ভোজনসামগ্রীভোজনে তৃপ্তি ও পুষ্টি উপস্থিত হইল। প্রতিদিনের স্নান ও ভোজন এইরূপে উচ্চতর ধর্ম্মের উদ্বোধক। যে ব্যক্তি স্নানে ঈশ্বরসত্তাতে অবগাহন করিতে পারে, ভোজনে সাধুগণের চরিত্র অন্তরস্থ করিতে পারে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করে। এইরূপে ধর্ম্ম অতি সহজ, ইহার বিপরীত অবস্থায় ধর্ম্ম অতি কঠিন। (সেবকের নিবেদন, ৫ম খণ্ড, ১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

মাধ্যাহ্নিক উপাসনা, পাঠ, ব্যক্তিগত প্রার্থনা, কীর্ত্তন ও নবনৃত্য

"মধ্যাহ্ন কালে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনা প্রার্থনা করেন। তৎপর শাক্যমুনিচরিত হইতে শাক্যের সাধন ও সিদ্ধি এবং তত্ত্বকুসুম হইতে সাধনতত্ত্ব পঠিত হয়। অনন্তর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা হয়। পাঁচটার সময়ে নূতন প্রণালীতে যাঁহারা নৃত্য করিবেন, তাঁহারা বেদীর সম্মুখস্থ ভূমি অধিকার করেন। কতকক্ষণ কীর্ত্তনের পর কেন্দ্রস্থানে একটি বালকের হস্তে পতাকা, মধ্যে বালকগণ, তৎপর যুবাগণ, তৎপর বয়স্থ ব্যক্তিগণ গোলাকার হইয়া

কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করেন। এক এক বার প্রমত্ত ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য, এক এক বার স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কীর্ত্তন ও হৃদয়ে যোগসম্ভোগ, এই প্রণালীতে ভক্তি ও যোগের ব্যাপার একত্র সম্পন্ন হয়। নৃত্যকারীদিগকে স্থানের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ কথঞ্চিৎ ক্লেশানুভব করিতে হইয়াছিল। দুই বার মাত্র ঈদৃশ নৃত্য অনুষ্ঠিত হইল, সময়ে উহা যে সুনিয়মে নিয়মিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই নৃত্যে উৎসাহ ও প্রমত্ততা এবং তৎসহ শান্তভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল। নৃত্যেও যোগ ও ভক্তির সম্মিলন, ইহা অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য *।

সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্দ্রের উপদেশ—"আত্মার ভিতরে পবিত্রাত্মার অবতরণ"

"সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের বিষয় এই যে, প্রতি আত্মার ভিতরে পবিত্রাত্মা হইয়া পরমেশ্বর অবতীর্ণ আছেন। ইনি আমাদিগকে সমুদায় সাধু কার্য্যে, মঙ্গল কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। মনুষ্য অন্ধতা বশতঃ এই পবিত্রাত্মার কার্য্যকে আপনার কার্য্য বলিয়া মনে করে, এজন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সুমধুর যোগ কিছুতেই বুঝিতে পারে না। আমাদিগের কর্ত্তব্য এই, যাহা পবিত্রাত্মার কার্য্য, তাহা আপনাতে আরোপ করিয়া অন্ধ না হই। আমাদিগের ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ এই যে, উহা প্রত্যেক সাধককে ঈশ্বর সহ অভিন্ন যোগে নিবদ্ধ করে, এই যোগ কাটিয়া দিলে পবিত্রাত্মার ক্রিয়ানুভব কখন হইবার সম্ভাবনা নাই।"

উৎসবের পর দিন সোমবার, দেবালয়ে নিম্নলিখিত প্রার্থনা হয়:—

"মদমত্ততা"

২৮শে আগষ্ট (১৮৮২)—"দয়াসিন্ধু, তোমার এই লোকগুলি মধুকরের দৃষ্টান্তে যেন চলে। গোলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেন। ভাদ্রোৎসব, মাঘোৎসব তোমার বাগানের গোলাপ। মধুর টানে মধুকর আসে, কিন্তু আবার উড়ে যায়। যদি ডুবিয়ে রাখতে চাও সুধাতে, উড়ে যেতে যদি না দাও, তাহা

* ৮ই আগষ্ট (১৮৮২ খৃঃ), মঙ্গলবার, কেশবচন্দ্রের গৃহে নবনৃত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নৃত্যের অন্তে আচার্য্য প্রার্থনা করেন। যাহাতে নৃত্য স্বাভাবিক অথচ নিয়মানুগত হয়, তজ্জন্য যত্ন হইবে, ইহা স্থির হইয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করেন। ('নবনৃত্য' প্রার্থনা 'দৈনিক প্রার্থনা', ৮ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।)

হইলে হৃদয়েশ্বরী হও। এমন কি হয় না,—তোমার রাঙ্গা চরণের মধুপানে মন এমনি মজিবে যে, আর থামিবে না ? মুখ এমনি লাগিবে হরিপাদপদ্মে যে, আর উঠান যাবে না ? এবার গোলাপ আর ছাড়িব না। এবার যাওয়া আর হবে না। হরি, যদি শুভক্ষণ হয়, তবে তোমার পা দুটি এই অধমের বুকে রাখিব ; আর দুটো যোড়া লেগে যাবে, আর আলাদা হবে না। তোমার স্বর্গের সুধার গেলাস এই মুখে দেব। বার বার দেব, দিয়ে শেষে ভোঁ হয়ে যাব। আর গেলাস সরিয়ে নেব না, ঠোঁটেই লেগে থাকিবে। মা, উৎসবের উপলক্ষে এক বার তোমার কাছে সকলে আসে, আর একটু মধু খেয়ে পালায় ; কিন্তু ঐ গোলাপে চির গোলাপি হওয়া, ঐ রাঙ্গাচরণের মধুপানে চিরকাল মত্ত থাকা, মুখ আর না সরান, এটা আর হয় না। মা, তোমার মাদক সেবন করিতে করিতে, নেশা হলো ভাবিতে ভাবিতে, সত্যই তা হয় ; তখন আর গোলাপ থেকে মুখ সরান যায় না। পাপ করা তখন অসম্ভব হয়। হরি, সুধা পান করে যেন অচেতন হই। ব্রহ্মের কাছে বসে থাকিতে থাকিতে যখন ঠিক নেশা হয়, তখন গান বাজনা নৃত্য নাই, নিরবলম্ব নির্লিপ্ত সাধন। কাল ভ্রমর সুন্দর হয়, তার গোলাপি রং হয় ; সুন্দরীর কাছে বসে তার বর্ণ সুন্দর হয়। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরূপমাধুরীতে মন মগ্ন হয়ে যায়। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরূপে ডুবে গেলাম। আমি খালি জল, তুমি সরবৎ ; আমার জল তোমাতে ঢালিলাম, তোমার জল আমাতে ঢালিলাম, ঢালিতে ঢালিতে আমিও মিষ্ট সরবৎ হয়ে গেলাম। শ্রীহরি, বেদের বন্ধ, উপাসনা আর কি ? তোমার জলে মিশে এক হওয়া। উপাসনা আর কি ? রঙ্গ পরিবর্ত্তন। উপাসনায় আমার লোহাটা তোমাকে স্পর্শ করে সোণার রঙ্গ হয়ে গেল। মা, এই ভিক্ষা চাই, মদের কাছে এতক্ষণ বসে থাকি, যেন মদের ঘোরে প্রাণ আচ্ছন্ন হয়, নেশা হয় ; প্রাণের মত্ততায় যেন এলিয়ে পড়ি। গোলাপি নেশা যেন ক্রমে চড়ে যায় ; নেশাতে ভাব চিন্তা কার্য্য এলোমেলো হয়ে যায়। এ সময়ে পাপ অসম্ভব। মাতালের কাছে পাপ আসিলে পাপকে সে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। নেশা যত, তত যোগী। সব যোগীগুলো নেশাখোর। হবেইতো। ব্রহ্মের নেশা বড় ভয়ানক। মদের নেশা, তাড়ির নেশা, গাঁজার নেশা সব ছোটে, এ নেশা ছোটান যায় না ; এ রঙ্গিনের রঙ্গ তোলা যায় না।

আদ্যাশক্তি, মদ খাই না, কিন্তু তোর সুধা পান করিয়া নেশাখোর হইয়াছি। এ নেশায় যদি আচ্ছন্ন থাকি, পাপকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া যাই। মা, তোর নেশা কি ছোটে? তবে ছি! তোমার নেশা কেন ছুটিবে? তুমি কল্পতরুর গাছ। তোমা থেকে বদ্ তাড়িতো তৈয়ার হয় না। দেখি, তোমার নেশা, আর সংসারের নেশা তফাৎ কত। ও নেশা বদ্ নেশা। ও নেশা ছুটে যায়। ভক্তকে যদি ক্ষেপাবে, খুব ক্ষ্যাপাও। স্বর্গের ভাঁটিতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কি মদই করেছ! এক ফোঁটা খাব, আর জয় মা বলে নেশায় ভোঁ হব। পাপ করিব, ইন্দ্রিয় প্রবল থাকিবে, ভিতরে জ্ঞান থাকিবে, এ যদি হয়, তবে হবে না; সে চালাকির নেশা। নেশায় ভোঁ হয়ে যাব। এই ভোঁ হওয়াকে বুদ্ধ বলিলেন, নির্ব্বাণ। আর গোরা নাচে আর হাসে, হাসে আর কাঁদে। কি হয়েছে তোর? বলে ভক্তি। মাতাল হয়ে বল্লে কি না ভক্তি। নূতন মদ তৈয়ার করে খেয়ে, নেচে কেঁদে বলিল, এ ভক্তি। যা বল, তাই। আমাদের নববিধানে নির্ব্বাণের নেশাও থাকিবে, ভক্তির নেশাও থাকিবে। মা আদ্যাশক্তি, এবার পূরো মাত্রায় মাতাল কর! সব বাড়ীতে মদের ভাঁটি বসাবে? তবে এবার মজালে! এবার বুঝি পাকাপাকি নেশা হবে? পাঁচ রকম নেশা এক করে একটা মাদক দ্রব্য হলো, তার নাম দিলেন, নববিধান। একটা নেশায়, একটা মদে যোগীর যোগ, চৈতন্যের ভক্তি, বুদ্ধের নির্ব্বাণ, পাহাড়ে যাওয়া, বৈরাগী হওয়া, গৌরের মত নৃত্য করা, সব একেবারে। এ যে আসল মাদক বাহাদুর আস্‌চে। এবারে কে কত পান করবি, করে নে। তখন ভোঁ হয়ে পড়ে থাকৃবি। মজার দিন আস্‌চে, তখন মজা দেখ্‌বি। ঐ মদের নেশায় এক বার পড়লে, একেবারে সব সোজা করে দেবে। ঐ আদ্যাশক্তি আস্‌চেন! এবার সব মাতাবে, সব নেবে। এবার বুদ্ধি জ্ঞান, দেহ মন, টাকা কড়ি, স্ত্রী পরিবার সব নেবে? তাই নে তবে। যথার্থ নেশাখোর করে দে তবে। নেশাখোরের চেহারা দে। গরিবের ছেলেগুলোকে আর মজিও না। ব্রহ্মজ্ঞানী হতে বলিলে, তাই হলাম। আবার নীচ মাতাল হতে বল্‌চ? ওমা শক্তি, তোমার শক্তি ফলালে, আর তৃষ্ণা আসক্তি থাকবে না। একা এগিয়ে পড়িব। ঐ মা সুরেশ্বরীর পায়ের তলায় পড়ে থাকব। বৃন্দাবনের কালী কালীঘাটের নয়। যে কালীতে হরি আছে, যে হরিতে কালী আছে।

নেশা যত বাড়িবে, তত আনন্দ বাড়িবে। দে মা, দে অন্নদে, মোক্ষদে, নেশা দে ; যোগের নেশা, ভক্তির নেশা, নির্ব্বাণের নেশা, জ্ঞানের নেশা, বিজ্ঞানের নেশা দে। হে করুণাময়ী, এই কালীসন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন নেশায় বিহ্বল হইয়া, কালিদাস হইয়া, সকল প্রকার পাপকে অসম্ভব করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই"। (কমলকুটীর—দৈনিক প্রার্থনা, ৮ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য)।

অভিনয় ও ব্রতগ্রহণ

কেশবচন্দ্র অভিনয়প্রিয় ছিলেন। অভিনয়ের চরিত্রের উপর নৈতিক প্রভাব শৈশবকাল হইতে তিনি মানিয়া আসিয়াছেন। এখন উচ্চ অধ্যাত্ম জীবনের অনুরূপ করিয়া নববৃন্দাবন নাটকের তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কথা ছিল, ভাদ্রোৎসবের অঙ্গীভূতরূপে নাট্যাভিনয় হইবে। কি ভাবে নাট্যাভিনয় হইবে, তাহা তাঁহার এই প্রার্থনাতে * বিলক্ষণ প্রকাশ পায়ঃ—

"অভিনয়"—২৯শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃঃ

"হে কৃপাসিন্ধু, ভগবদ্ভক্তদিগের রত্নমালা, যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে, সেখানে এই কয়জন লোক অদৃষ্ট মানে না; যেখানে লোকে অদৃষ্ট মানে না, সেখানে এই কয়জন অদৃষ্ট মানে। নববিধানবাদী অদৃষ্ট মানেন, অথচ সে অদৃষ্ট তা নয়, যা লোকে মানে। অদৃষ্ট ক্রমে ছেলে গেল, ধন গেল, রোগ হইল—এই সকল অদৃষ্ট! যেমন সংসার ছাই, তার অদৃষ্টও ছাই। যেমন পৌত্তলিকদের অবস্থা ছাই, তেমনি তাদের অদৃষ্টও ছাই। এ অদৃষ্ট দূর হউক, বিদায় হউক। শুভাদৃষ্ট, তুমি এস; নববিধান এস, তোমায় আলিঙ্গন করি। কি অদৃষ্ট? শুভাদৃষ্ট। সকলের মঙ্গল হইবে। আমরা হরিপাদপদ্মে মতি রাখিয়া স্বর্গে যাইব। আমরা সুখী পরিবার হইব, পাপ ছাড়িয়া সাধু হইব, হরির মন্দির স্থাপন করিব। এই সকল, মা জননী, সূতিকাঘরে কপালে লিখে দিয়াছিলে। আমাদের অদৃষ্টে অনেক লেখা আছে। বাড়ী আছে, ঘর আছে, সুখ সম্পত্তি আছে। হরির যা আছে, আমরা পাব। কি ছিলাম, আর আমরা কি হলাম! আমাদের নাটক, ইটি কখন অদৃষ্টবিরুদ্ধ নয়। তুমি আমাদের কপালে লিখিলে, অভিনয়। নববিধান অভিনয়; প্রকাণ্ড সংসার আমাদের নাট্যশালা। তুমি ছেলেগুলিকে, সকলকে, ঘরে নিয়ে বলে দিলে,

---

* এই ২৯শে আগষ্টের এবং পরবর্ত্তী ১লা, ২রা, ৩রা, ৪ঠা, ১৫ই, ১৮ই ও ১৯শে সেপ্টেম্বরের প্রার্থনা "দৈনিক প্রার্থনা" (কমলকুটীর, ২য় সংস্করণ, ১৮৩১ শক) ৩য় ভাগে দ্রষ্টব্য।

'এই রকম করে সকলের কাছে নরম হোস্, এই রকম করে ভাইয়ের সেবা করিস্, এই রকম করে হুঙ্কার করিস্' ; তার পরে স্বর্গের সাজ আনিয়া সকলকে পরাইলে। ভারতের প্রকাণ্ড নাট্যশালা খুলিল। যাই অভিনয়ের নিমন্ত্রণপত্র গেল, ইউরোপ বলিল, মা জগদীশ্বরী, আমি যেন এই অভিনয় দর্শন করাতে পারি, এমন অভিনয় কখন হয় নাই। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে, ভক্ত নারদ ঋষি সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। নববিধানের অভিনয় কেহ করে নাই ; এবারে সকলের শুভ অদৃষ্ট। যারা দেখিবে তাদের, যারা সাজিবে তাদের, যারা শুনিবে তাদের শুভাদৃষ্ট। বঙ্গদেশ স্বয়ং গৃহস্থ, তারই বাড়ীতে এই প্রকাণ্ড অভিনয়। আকাশে দেবগণ দেখিতে আসিলেন ; আকাশের দেবতা আকাশেই রহিলেন, পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতেই রহিল। চারি দিক দেখিতে লাগিল। তাহার মধ্যে যথাযোগ্য সরস্বতী বন্দনা করিয়া নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ অগ্রসর হইলেন। হে বঙ্গদেশের মাতঃ, তুমি যখন পৃথিবীতে অভিনয় দেখাইবে এই কয় জনকে সাজাইয়া, তখন পৃথিবী বুঝিবে, নববিধান কি! ইহার ভিতর কি অভিনয় নিহিত! আমরা আর কিছু করিতে আদিষ্ট হই নাই, আর কিছু করিতে জন্মগ্রহণ করি নাই, কেবল নাটক করিতে ; এই কুড়ি বৎসর অভিনয় করিতেছি। নাটক অভিনয় করা আমাদের অদৃষ্ট। আমাদের ভিতর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভিনয় সর্ব্বদা হইতেছে। যার কপালে তুমি যা লিখেছ, তা তার করিতেই হইবে। যার কপালে তুমি পরীক্ষা লিখেছ, তা তার বহন করিতেই হবে। যাকে তুমি বড় মানুষ সাজিয়েছ, তার তা হতেই হইবে। যে যেখানে থাকে, তার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অভিনয় করিতেই হইবে। মা, এতো তুমি ঠিক করেছিলে পৃথিবীর সকাল বেলা যে, যাদের অদৃষ্টে ছিল, তারা একসঙ্গে এসে দাঁড়াবে ; যেমন দাঁড়াবে, ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠিবে। নাটক অভিনয়ে পাপীর উদ্ধারের সহজ উপায় হবে, সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হবে, দুঃখের রজনী শেষ হবে। তুমি এত দিন একটি দলকে বুকের ভিতরে রেখেছিলে, যাই ঊনবিংশ শতাব্দী আসিল, উপযুক্ত সময় আসিল, তুমি নিদ্রিত দলকে উত্থিত করিলে, তাহারা একটি ঘরে আসিল। বিধাননাটকের অভিনয় করিবে। মা, এই নববিধানের অভিনয় করে রেখে, আমরা যেন যেতে পারি। আমরা যেন গম্ভীর হয়ে এই কার্য্যে ব্রতী হই।

"হে মুক্তিদায়িনী, এ সমুদায় তোমার প্রেমের অপূর্ব্ব ব্যাপার। কাকে রাজা সাজাও, কাকে গরিব সাজাও, কাকে হুঙ্কার করাও, কাকে হাতে দড়ি বেঁধে ফেলে কি বল, আমি জানি না, তুমি জান ; আমি জানি এই যে, রোজ একটা একটা নাটক অভিনয় হচ্চে। মা, আনন্দের সহিত তোমার হাত ধরে নাচিব, তুমি যা সাজাবে সাজিব, তুমি যা বলাবে বলিব। আমি যে তোমাকে ভালবাসিব ; আমি যে তোমার হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি, তুমি যা বলিবে করিব। মা, পুণ্যভূমি প্রস্তুত হচ্চে, যেমন রঙ্গভূমি প্রস্তুত হচ্চে। নাটকে যে পরিত্রাণ হবে, মা ! এ যে বিশ্বনাট্যশালা, এ যে ধ্রুবলোক। মা আপনি দাঁড়িয়ে থেকে সমুদায় করিতেছেন। মা, তামাসা দেখিবার জন্য, আমোদ করিবার জন্য যারা আস্‌চে, তাদের মনে যদি ভক্তি বিশ্বাস থাকে, কোটি কোটি বক্তৃতায় যা না হবে, এক রাত্রিতে তাই হবে। তুমি বল্‌চ, তোদের যা সাজিতে বলি, তাই সাজিস্ ; আমাকে প্রণাম করে, আমার সহায়তা লইয়া, নাট্যশালায় প্রবেশ করিস্। তা হলে আবার নবদ্বীপ টলিবে, সকল পাপী 'অবিনাশের' মত স্বর্গে যাবে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সব এক হবে। মা, তুমি যদি বল, তবে অভিনয় করিতেই হইবে, এবার ঐ রঙ্গভূমিতে থাক্‌ব, ঐখানে সেজে বসে থাক্‌ব। কেন ? মা যে বলে দিয়াছেন, এতে পৃথিবীর গতি হবে। মা, তুমি যা বলিবে, তাই হবে। তোমার বিধি পালন করিতে হবে। হে করুণাময়ি, হে জননি, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যদি অদৃষ্টক্রমে তোমার নাট্যশালায় আসিয়াছি, তবে যেন অভিনয় শেষ করিয়া আপনারা তরে যাই, আর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।"

অদ্য ১লা সেপ্টেম্বর, (১৮৮২ খৃঃ) অভিনেতৃগণ সাজসজ্জা করিয়া রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিবেন। এই তাঁহাদের অর্দ্ধপ্রকাশ্য অভিনয়, সুতরাং এ দিনে বিশেষ প্রার্থনা বিনা অভিনেতৃগণকে কেশবচন্দ্র রঙ্গভূমির ভূমিস্পর্শ করিতে দিবেন কেন ? তাই তিনি দেবালয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন :—

"অভিনয়ে নববৃন্দাবন"—১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ

"হে দীনজনের গতি, হে কাঙ্গাল মনুষ্যের গতি, শুদ্ধ জীবন ধরিয়া আমোদ প্রমোদ করিলে কি হয় ? জীবন পবিত্র রহিল ; অথচ তুমি যা বলিলে করিলাম,

নানাবিধ উল্লাসের কার্য্য করিলাম, এ জীবন বড় উৎকৃষ্ট। কিন্তু মনে যদি পাপ রহিল, অপবিত্র আমোদের ইচ্ছা রহিল, তা হলে এ সকল বিষ আমাদের পক্ষে। আমরা দেবতাদের ধরে সংসারের বাগানে আনিব। সে খুব মহত্ত্ব, ভারি সুখ। এই যে আমার সাজ হয়েছে, লোহার মত শক্ত হয়েছি, কাদার ভিতরে নিয়েই যাও, আর মার আর ধর, কিছুতেই কিছু হবে না! সৎপথে থেকে তার পর আমোদ প্রমোদ অভিনয় এ ভারি ব্যাপার। তবে যদি দুষ্ট লোকেরাও এই সকল করিল, আর আমরাও তাই করিলাম, তা হলে তাদের সঙ্গে আমাদের ভেদাভেদ রহিল কি? শ্রেষ্ঠ আমরা কিসে? এতে শ্রেষ্ঠ হতে পারি, যদি আমরা মজা করে আগে খাস দরবারে শুদ্ধ হয়ে বসে আছি, তার পরে আমোদ। শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবে ভাবুক, রসে রসিক; তোমার ভাবের মর্ম্ম বুঝেছিল, তাই অভিনয় করেছিল। কিন্তু, মা, ও যে সন্ন্যাসী হয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের আর ভয় কি? তার অঙ্গ যে গৌর হয়েছিল। গৌরাঙ্গ না হলে কেহ যেন অভিনয় না করে, কাল অঙ্গ নিয়ে কেহ যেন নাট্যশালায় প্রবেশ না করে। যুবা দলের পক্ষে ইহা আরো কঠিন। গৌরাঙ্গ বলেন, এমন আমোদ কি কেবল সংসারীদের দেব? নাচ্‌তে দেখেছি যাকে, তাঁকে রঙ্গভূমিতে নাচাব, নাচিব। এই বলে তিনি তোমার কাছে নাচ্‌লেন। মা, এ অভিনয়ের ছলেও ত গৌরাঙ্গের পথাবলম্বী হওয়া যায়? গৌরের বাড়ীর অনেক পথ; সন্ন্যাসের একটা পথ, বৈরাগ্যের একটা পথ, ভক্তির একটা পথ, নাটকও ত গৌরের বাড়ীর পথ! তবেত এ গৌরের নাটক, সাদা ধপ্‌ধপে গৌর না হলে কেউত অভিনয় করিতে পারিবে না। আগে শুদ্ধ হবে, তবে অভিনয় করিবে। সকলে গৌর হয়ে যাব। গৌরের মা, সকলকে গৌর করে দাও, গৌর করে দাও। মা, এমন আশীর্ব্বাদ কর, এই রঙ্গভূমি যেন গৌরের নামে পবিত্র হয়। আমার শ্রীগৌরাঙ্গ দাদার নামে যেন এ নাটক বিকাইয়া যায়। এই অভিনয় থেকে আমার দেশের লোক যেন পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করে। মা, এই যে সব ছবি, ওসব নরকের ছবি নয়, স্বর্গের ছবি। ওখানে বাঘ ছাগল একত্র খেলা কচ্চে, পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল তৈয়ার হচ্চে। আমরাত বাহিরে পাহাড় পর্ব্বত দেখ্‌তে যাই। এতে কেন তার ছবি দেখি না! আমাদের নাটকের ছবির ভিতরও হরি। নাটক কখন মিথ্যা নয়, নাটক সত্য। ও ছবি না হয় হরি নিজে হাতে এঁকেছেন, এ ছবি না হয়

পোটোর হাত দিয়া আঁকিয়াছেন। এ যদি রঙ্গভূমি হয়, সংসারও কি রঙ্গভূমি নয়? মা, যদি তেমন মনে দেখে, এই অভিনয় থেকে লোকে কি পরিত্রাণ-রত্ন কুড়িয়ে নিতে পারবে না? পার্‌বে, পার্‌বে। আমরা মনে করি না কেন, আমরা সকলেইত 'অবিনাশ'; সংসারের মদ খেয়ে খেয়ে, পাপে দগ্ধ হয়ে হয়ে, শেষে অনুতপ্ত হয়ে 'নীলগিরিতে গিয়ে গুরু অন্বেষণ' করি, এবং গুরু লাভ করি, দৈববাণী শ্রবণ করে, শেষে ভাল হব, পাপ পুরুষের উপর জয়ী হব। মা, এ কি কম কথা, তা হলে যে নববৃন্দাবন হবে। মা জননীগো, দয়া কর; সকল অবিনাশেরই যে দ্বীপান্তর হয়েছে। তুমি দয়া করে, এখন অনুতপ্ত করে ফিরিয়ে এনে, যাতে শ্রীবৃন্দাবনে যেতে পারি, তাই কর। বাপ মা ছেলে মেয়ে সকলকে একটি সুখী পরিবার কর। আমোদ প্রমোদেও হরি এসে উপস্থিত! এ আমাদের বড় সৌভাগ্য। সকলে প্রাণভরে শুনি, প্রাণভরে দেখি। মা, এই গরিবের ভবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার কৃপাতে এখানে নববৃন্দাবন প্রতিষ্ঠিত হউক। মা সরস্বতী, তুমি অবিদ্যা নাশ করিবার জন্য একেবারে সাক্ষাৎ এসে রঙ্গভূমিতে দাঁড়িয়েছ। ঐ রঙ্গভূমির মাটি নিয়ে কপালে দিয়া শুদ্ধ হই। ওখানে নবনৃত্য করিয়া গড়াগড়ি দিয়া লই। হরিভক্তের প্রতি তুমি এমনি সদয় বটে। এখানে নববৃন্দাবন স্থাপন করিলে মা! নরনারী সকলেই যেন গৌর হয়েছেন। পাপবিহীন হয়ে, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হয়েছেন। মা, নববৃন্দাবনের দিক্‌টা এই। আহা বঙ্গদেশ কৃতার্থ হইল। মা, এত সহজে স্বর্গলাভ হইল? মা, আমি দুপয়সা খরচ করে এত পেলাম? আমার বাড়ীকে শ্রীবৃন্দাবন কর, এইখানটাতেই যেন বুড়ো বয়সে বসে থাকি; আর কোথায় যাব? এই খানেই স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সুখে বাস করি, কারণ এ যে শ্রীবৃন্দাবন। হে দীনবন্ধু, হে কাতরশরণ, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই অভিনয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে নববৃন্দাবন দর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।"

কেশবচন্দ্রের দশম সন্তান—পঞ্চম পুত্রের, ২রা সেপ্টেম্বর (১৮৮২ খৃঃ), দেবালয়ে 'সুব্রত' নাম প্রদত্ত হয়। এতদুপলক্ষে দেবালয়ে যে প্রার্থনা হয়, তাহাতে বংশবৃদ্ধি কেশবচন্দ্র কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার এই দৃষ্টির অনুরূপ্ প্রতিনববিধানবিশ্বাসীর

দৃষ্টি হওয়া সমুচিত ; এজন্য আমরা সে দিনের প্রার্থনাটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"জীবজন্ম"—(২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ)

"হে প্রসবিনী, হে দেবজননী, সংসারের বৃদ্ধি আশ্চর্য্য বস্তু। বৃদ্ধি তোমার প্রেম, তোমার করুণা, তোমার জ্ঞানকৌশল, বৃদ্ধি তোমার নাটকের উৎপত্তি। রঙ্গভূমিতে এক বার আসা, প্রথম দর্শন দেওয়া, ইহা কি সামান্য ব্যাপার? আবার এক জন আসিল, আবার এক জন বাড়িল, আবার জীবের আকাশে একটা নূতন তারা দেখা দিল, সংসারবাগানে ফুল আবার একটি বাড়িল, জীবনসমুদ্রে আবার একটা ঢেউ দেখা দিল, সংসারে তোমার আর একটি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল ; সেনাপতি, তোমার সৈন্যদলের আবার একটি সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। বৃদ্ধি তোমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রেমের বৃদ্ধি প্রকাশ করিল। মনে হয়, সৃষ্টির প্রথমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তার পরে গড়াতে গড়াতে পৃথিবীতে আসিল। সে কোথায় ছিল, কেহ জানে না। বৃদ্ধি লোকের মন সতেজ রাখে, পাছে ভগবান্‌কে লোকে ভুলে ; তাই সন্তান হয়। পাছে ভগবান্‌কে মৃত মনে করে, তাই বৃদ্ধি হয়। জগৎকে জানায় যে, সৃষ্টি চল্‌চে, ভগবান্ মৃত নয়। রঙ্গভূমিতে নূতন নূতন লোক আসে। এই যে সকল ব্যাপার তুমি ঘটাইতেছ, এই যে নূতন নূতন লোক আসিতেছে, ইহারা পরে কি করিবে, কে জানে? জননি, দয়াময়ি, তুমিই প্রসব কর। জগন্মাতা, তুমিই জীবকে প্রসব কর। আমরা সকলেই তোমার সন্তান। আর যখনি একটি একটি সন্তান পৃথিবীতে প্রেরণ কর, রত্নগর্ভা, তারা তোমার জ্ঞানগর্ভ, পুণ্যগর্ভ, প্রেমগর্ভের সন্তান। হে ভগবতি, রত্নগর্ভা, স্বর্ণগর্ভা তুমি ; তবে তোমার ভিতর হইতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তারা ত দেব অংশ! আমরা ভাবি, বংশবৃদ্ধি মানে দুঃখ অবিশ্বাস ভাবনা মায়ার রজ্জুবৃদ্ধি। এই রকম করে পৃথিবীতে বংশ যত বাড়্‌বে, কি বাড়্‌বে?—মায়া। বাস্তবিক পৃথিবীতে এই হয়—যত বংশ বাড়্‌চে, মানুষ রাগচে, সংসারে ডুব্‌চে, ভগবান্‌কে ভুলে। কিন্তু হে ভগবান্, আমি বলি যে, মানুষ জন্ম দেয় না। পৃথিবীতে পিতামাতা কেহ নাই। মনুষ্যসন্তান যে, ঈশ্বরসন্তান সে। মনুষ্যপুত্রের যে মা বাপ, শ্রীহরি, সকলি তুমি। এটা মানুষে বুঝিতে পারে না। মা সচ্চিদানন্দময়ি, গভীর অর্থ জানিলে বড় আনন্দ হয়।

এ বৃদ্ধিগুলি কি? ভগবানের খণ্ড বাড়্‌চে। ভগবানের বংশ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হচ্ছে। এইটি মনে মনে যেন বিশ্বাস করি। ভগবতীর সন্তান হয়ে জন্ম হইল শিশুর। সুসন্তান ঋষিপুত্র, নারায়ণের বংশ প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক ক্ষুদ্র শিশু তোমা হইতে সাক্ষাৎ বিনির্গত হয়। অতএব মহর্ষি ঈশার জন্মের কথা আমরা যাহা শুনেছি, সকল শিশুর জন্মে আমরা যেন তাহা সংলগ্ন রাখি। তোমাকে পূজা করি, আর সকল শিশুর ভিতর তোমাকে পূজা করি। তা না হলে, কতকগুলি পুত্র বাড়্‌ছে, আর মায়ায় ডুব্‌চি, তা হলে হবে না। বৃদ্ধি-সংবাদ পাবামাত্র যেন, ঠাকুর, এ বিশ্বাস করি যে, এ বড় সামান্য ব্যাপার নয়। ঠিক যেন তুমি ডাক্‌চ, অন্ধকার হইতে নবকুমার আয়, হরিসন্তান আয়। আর দেবপ্রসূতি হইতে দেবজন্ম হইল, সকলে প্রণাম করি। যে নারী গর্ভে শিশু ধারণ করিল, তাকে লোকে ধন্য ধন্য করে, কারণ তাহার ভিতর দেবখণ্ড সংস্থাপিত হইল। ভগবানের দেব অংশ, পুণ্য অংশ, শক্তি অংশ তাহার ভিতর অবতীর্ণ হইল। মা, এই জীবসৃষ্টি সাক্ষাৎ তোমার ব্যাপার। অতএব সহস্র শঙ্খ বাজান উচিত, যখন কোন একটি নূতন শিশুর জন্ম হয়, যখন রঙ্গভূমিতে কোন একটি নূতন লোক আসিল। ভগবৎখণ্ড যিনি, তিনি আরো পুণ্যবান্ হইবেন, হরি যথাসময়ে তাঁকে উপযুক্ত করিবেন। হরিময় সব, হরি গৃহে, হরি সূতিকাঘরে, হরি সংসারে। নরনারীকে শিখিয়ে দাও, যেখানে ছেলে দেখিবেন, মাথা অবনত করিয়া প্রণাম করিবেন। ছেলেকে দেখে মনে হবে, কে নাকটি টিকল করিল, কে চোকটি সুন্দর করিল, সে জ্ঞানী শিল্পী কে? অভিনয়ের পর অভিনয়, গর্ভাঙ্ক আর ফুরাবে না। গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্ক, ছেলের পর ছেলে, বংশবৃদ্ধির পর বংশবৃদ্ধি, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই রকম চলিবে। মা চিদানন্দময়ী, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই জীবজন্মে অদ্ভুত পুণ্য ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া চিরানন্দে মগ্ন হই।"

নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয় করিবার কি অভিপ্রায়, তৎপ্রকাশের জন্য দেবালয়ে প্রতিদিন প্রার্থনা হয়; সেই প্রার্থনা হইতে আমরা দুটী প্রার্থনা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মুহূর্ত্তে পাপজয়"—৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ

"হে দীনবন্ধু, হে নূতন বৃন্দাবনের রাজাধিরাজ, তোমার যে ধর্ম্মের অভিনয়,

তাহাতে শিখিবার অনেক আছে। হে পিতা, এক রাত্রিতে এত হয় কেন? এই মরিল, এই বাঁচিল, এই বিচ্ছেদ, এই মিলন; এই গুরূপদেশে ভাল হইল, এই রোগ-প্রতীকার। মানুষে বলে, এত শীঘ্র শীঘ্র হয় কেন? এই পাপ করিল, এই দ্বীপান্তর হইল, এই অনুতাপ করিল, ভাল হয়ে গেল; সকলের মিলন হয়ে, সুখী পরিবার হয়ে স্বর্গ লাভ হইল। এত শীঘ্র কি হয়? শ্রীহরি, জবাব দাও। এই এত পাপী ছিল, এই এত ভাল হয়ে গেল! সেই লোক, যার হাড়ের ভিতর দুর্গন্ধ, সে একেবারে এত ভাল হয়ে সস্ত্রীক নববৃন্দাবনে গেল কি করে? মা, এক দিকে পাপ ভারি কাল, আবার পুণ্য ভারি জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু এই মদ খাচ্চে, ব্যভিচার কচ্চে, যা খুসি তাই কচ্চে, যত দূর মানুষের পশুত্ব হবার হইল, আবার সেই রাত্রির মধ্যে কোথা থেকে অনুতাপ এলো। এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু লোকে বলে, বড় শীঘ্র হলো। ক্রমে ক্রমে যদি একটু ভাল হতো, তা হলে আমরা ভাব্‌তাম, ইহা স্বাভাবিক। মা, লোকে যে এই দোষ দেখাবে, ইহা কি খণ্ডন করা যায় না? রাতারাতি ধার্ম্মিক হওয়া লোকে গল্প মনে করে, এই জন্য যে, আমরা রাতারাতি ধার্ম্মিক হতে পারি না। মা, রাতারাতি যে পাপ দূর করিব, সুখী পরিবার হইব, ইহা বড় আশ্চর্য্য। মা, পাপের বড় যন্ত্রণা, পাপী যখন সেই সমুদ্রতীরে একাকী বসে অনুতাপ কচ্চে, তখন আর কি বলিব, কোথায় বা তার পিতা মাতা, কোথায় তার প্রিয়দর্শন বালক বালিকা। এই নাটকের দুঃখ দেখ্‌চি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখি, অবিনাশ এসে গেলেন, সঙ্গে মিলিত হইলেন। এতে সকলের কত আশা হয়, আমরা যদি রঙ্গভূমির মত জীবনে এ রকম করি, তাহা হলে চিন্তা কি। আমরা যদি ৮টার সময় পাপ আরম্ভ করে, ১২টার সময় পাপ ছাড়ি, তা হলে বাঁচি। শ্রীহরি, আমরা ঠিক অবিনাশের মত পাপী। অবিনাশ যেমন পাপী ছিল, তেমনি সে শীঘ্র ভাল হলো। আশ্চর্য্য তোমার খেলা। যাকে ভালবাস, তাকে শীঘ্র ভাল করিবে বলে এমনি একটু নাকাল কর যে, একেবারে ভাল হয়ে যায়। মা, এ পুরাতন অবিনাশগুলোর গতি কর। আমাদের কাছে পাপপুরুষ যে বার বার আস্‌চে, মা, কেন? এক বার নয়, বার বার এসে ভয় দেখায়। মা, আমরা পাপপুরুষকে যেন জয় করি। সে যে প্রলোভনে ফেলিবার জন্য কতবার আসে। মা, আমাদের নির্লিপ্ত কর। অবিনাশ অত পাপী লোক, একেবারে বেঁচে গেল।

নিরাশার মহাসমুদ্রতটে আমরা কি, পাপের জন্য অত ব্যাকুল হয়ে অনুতাপ করি ? মা কমলা, দয়া করে এ দুর্জনকে আশীর্ব্বাদ কর, এইরূপ আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র পাপ থেকে মুক্ত হই, আর আমরা বিলম্ব যেন না করি। মা, আমাদের কপট সাধন, কুটিল প্রার্থনা, তাই আমাদের ভাল হতে এত বিলম্ব হয়। দয়াময়ি, এক বার বিবেক বৈরাগ্যকে আমাদের কাছে সাজিয়ে আন। আগে তাঁদের সম্মান করি, ঈশাদত্ত অস্ত্র নিয়ে পাপকে খণ্ড খণ্ড করি। মা আনন্দময়ি, বাহাদুরী এই নাটকের ভিতর যে, এই পাপী এই পুণ্যবান্, এই নারকী এই ধার্ম্মিক। সহস্র প্রণাম এই কল্পনাকে, মানুষ কেমন এক রাত্রিতে ভাল হতে পারে, মা। মা. অভিনয়রাত্রির মতন যেন সত্য সত্য স্বর্গারোহণ করিতে পারি। দয়াময় পতিতপাবন, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা ঐ রঙ্গভূমির মাটি ছুঁয়ে, শুদ্ধ হয়ে, আনন্দে নাচিতে নাচিতে স্বর্গারোহণ করি।"

"মত্ততা"—৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ

"হে আনন্দময় হরি, তোমার জন্য আমরা কি না করি। যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলাম, শেষে তোমার জন্য। তুমি যদি বানর নাচাইতে ইচ্ছা কর, আমরা বানর সাজিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না; পৃথিবীতে এ কথা থাকিবে যে, আমরা হরির জন্য যাত্রা অবধি করিলাম। আমরা বৃদ্ধাবস্থায় নির্লজ্জ হয়ে, কোমর বেঁধে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলাম। হরিকে আমরা ভালবেসেছি; যখন ভালবেসেছি, তখন নাকাল হতে হবে, এই আমাদের অদৃষ্টে ছিল। ওরে হরি, যাকে মজাস্, তাকে এমনি করে নাকাল করিস্ ? নাথ, একটু ভালবাস্লে কি শেষ্টা এই রকম করিতে হয় ? কিই বা ভালবেসেছি, অতি সামান্য। আমরা বার্দ্ধক্য শোক রোগ এই সব নিয়ে যে বেহায়া হয়ে ভাঁড় সাজ্তে লাগ্লাম, এ কার জন্য ? নিশ্চয় তোমার জন্য। হৃদয়েশ্বর, যা কিছু হচ্চে, তোমার জন্য। ভগবান্ পাপীদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে ইয়ার্কি করেন, এ সব রঙ্গের কথা কেবল ভাবগ্রাহী লোক বুঝ্তে পারেন। বৃদ্ধবয়সে কি এত দরকার হয়েছিল যে, একটা নাটক না করিলেই নয় ? তুমি বল্চ, মন্দির করা যেমন আবশ্যক, তেমনি নাট্যশালা করা আবশ্যক। মন্দিরে সে মন্দিরের রাজার মত, আর নাট্যশালায় বসিলে ইয়ারের মত। সেই

ব্রাহ্মদের গুরু মন্দিরে এক রকম, আর নাট্যশালায়, ব্রাহ্মেরা যেখানে মাতাল হয়ে মদ খাচ্চে, তাদেরও সাজের ঘরে সাজালে। আমাদের তোমার সঙ্গে আমোদ করিবার অধিকার দিলে, কি উচ্চ অধিকার দিলে! রাজার রাজা ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি। দেবতা, বলিহারি যাই। তোমার গুণে বশীভূত না হলে, আর চলে না। মা আমার, এত তোমার ভাব! যাদের তুমি ভালবাস, তাদের এত আদর কর! তুমি আমাদের মত অধমদের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে এসে নাচ্‌লে। সকলকে সাজিয়ে রঙ্গভূমিতে পাঠিয়ে দিলে, কেন না লোকে দেখুক, আর ভাল হোক্। এই সদ্য মুক্তি সব চেয়ে ভাল। কে আমাদের সাজ্‌তে বল্লে, কে সাজিয়ে দিলে, কে নাটক লিখ্‌তে বল্লে, সকলি তুমি, হরি। কেবল কি শিক্ষক হয়ে নেবে এলে? তা নয়, ইয়ার হয়ে নেবে এলে তুমি। হে দীনবন্ধু, ভক্তদের সাজিয়ে নাট্যশালায় পাঠিয়ে দিলে, এত ভালবাসা তোমার! আমাদের দেখ্‌তে তুমি এত ভালবাস? ভগবান্ ইয়ার্কি দিলেন ভক্তদের সঙ্গে, এটা কি কম কথা? এটা বোঝে কে, আর মজে কে? আমরাও বেহায়া হয়ে গেলাম; বুড়ো বয়সে কোথায় ধ্যান পূজা করে কাটাব, তা না হয়ে লোকের কাছে বেহায়া হয়ে নাটক কচ্চি। যে ভক্তেরা গম্ভীরভাবে তোমার চরণসাধন কর্ত্তেন, এখন কি না, ইয়ার্কি দিতে আরম্ভ কর্‌লেন। ভগবতী পাগ্‌লীর জ্বালায় অস্থির। তুমি গম্ভীর গুরু, সে মূর্ত্তিও যেমন, আর ইয়ার্কির মূর্ত্তি, সেও তেমনি মিষ্ট! সেই মাই তুমি, তবে এবার তোমার মূর্ত্তি কিছু পাগলিনীর ন্যায়। মা, আমাদেরই মজাতে এলে? আর কি লোক পাও নাই? পৃথিবীতে তুমি আমাদের সকলকে নিজের মত পাগল কত্তে চাও? অভিনয়ের প্রেমে সকলে চারুশীলার মত এলোকেশী পাগলিনী হয়ে থাক। চারুশীলার দশা সকলেরই হোক্। পাগল পাগলিনী না হলে, পাগ্‌লীর অভিনয়ে কেউ যোগ দিতে পার্‌বে না। আমাদেরও মন্দিরের পূজা মন্দিরে, এ মন্দির নাট্যমন্দির, এ দুই এক। পরমেশ্বর আমাদের মা ক্ষেপী যে দিন ক্ষেপেছে, সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্চে। আমাদের জিনিস ভাঙ্গচে, ভদ্রতা ভাঙ্গচে, সব যাচ্চে। আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা আর রহিল না। বুড়োবয়সে কি হলো! আপনার হাতে রেঁধে খেতে হলো, সুধু পায়ে থাক্‌তে হলো, নাট্যমন্দিরে সাজ্‌তে হলো! মা, এই তবে বলি, যদি পাগ্‌লী হয়ে আমার মাথা খেলি, তবে এই দল শুদ্ধ

সকলকে পাগল করে দে। সকলের মাথা খা। আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলের মাথা খা। পাড়া শুদ্ধ সকলকে পাগল কর। মা, বড় সুখে আছি। আর বাকি রইল কি ? এত আমোদ তোমার বাড়ীতে। মাতাল কটা বসে আছে, আর মদ যোগাচ্চ, প্রেমসুরা যোগাচ্চ। ব্রহ্মাণ্ডপতি কত সাজই সাজ্‌চেন। একবার সাজ্‌চ মা, একবার সাজ্‌চ বাপ। কোন্ নাটক তোমার বাকি আছে, বল। সেই সৃষ্টির দিন থেকে সাজ্‌চেন, আর কত লীলা খেলা কল্লেন। লীলা আর কি, কেবল নাটক। ওগো অধিকারী, তোমার অভিনয় চূড়ান্ত। হেরে গিয়াছে সকলে তোমার কাছে। কত রকমই সাজ্‌চ। বল্লে, আমি মানুষ সাজ্‌ব বলে মানুষের ভিতর থেকে অভিনয় কচ্চি। একবার মা, একবার বাপ সাজ্‌চ। হৃদয়ের বন্ধু, পাগল করে দাও না। এই নাটকের পথ ধরে স্বর্গে উঠে যেতে পারিব। মা, মা, মা—মা, তোমাকে আরো ভালবাসিতে দাও। তোমার জন্য সব দি, লজ্জা ভয় সব দি। আমরা মার স্বর্গরাজ্যের জন্য কিছুতে লজ্জিত হব না; কোন কাজ করিতে লজ্জিত হব না। আর ভদ্রতায় কাজ নাই। বলুক লোকে, অত্যন্ত বেহায়া নির্লজ্জ, অভদ্র। মজিব, আর মজাব। সখ্যভাব না হলে সুখ হবে না। এ যেন কেমন বেশ বিশুদ্ধ আমোদ। পাগলের ভাব পেয়ে তোমার সঙ্গে মজে গেলে আর কোন ভয় থাকে না। মা, আমরা বা কি থিয়েটার করেছি ? এ অতি ছাই, তুমি যে থিয়েটার কর, তার কাছে। মা আনন্দময়ী সেখানে নিজে ভক্তদের সাজান। আহা, কি চমৎকার সাজ, প্রেমের সাজ, পুণ্যের সাজ! আমরা আবার তা দেখিব। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পাগল পাগলিনী হয়ে তোমার অভিনয়ে শুদ্ধ এবং সুখী হই।”

১৬ই সেপ্টেম্বর (১৮৮২ খৃঃ), প্রকাশ্যে অভিনয় হয়। শ্রোতৃবর্গ অভিনয়ের কত কি প্রশংসা করিয়াছিলেন, সে কথার উল্লেখে তত প্রয়োজন মনে করি না, কেন না আজও লোকের মুখ হইতে সে প্রশংসা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। কি অধ্যাত্মভাবে অভিনয় সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের কার্য্য। কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা যেমন এই ভাব ব্যক্ত করে, তেমন আর কিছুতেই নয়। সুতরাং সে দিনের প্রার্থনা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"অভিনয় দ্বারা জয়ভিক্ষা"—১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ

"হে পরম পিতা, তোমার রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিয়া আমরা নিন্দিত হইতেছি। গালাগালি খাইতেছি। আমরা তোমার কার্য্য করিতে গিয়া অকারণ কেন অপমানিত হইব? হরি, তোমার সাক্ষী আমরা হইব, আমাদের সাক্ষী তুমি হও। আমরা তোমার কার্য্যই করিতেছি। তোমার একটি একটি নূতন বিধান যখনই পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে, পৃথিবী কাঁপিয়াছে। এবারও কাঁপুক। হরি, হাজার অলৌকিক ক্রিয়া করিলেও, সকলে যে এই নববিধান মানিবে, সে আশা নাই। মহর্ষি ঈশা অত শুদ্ধ ছিলেন, তোমার জন্য প্রাণ দিয়ে গেলেন, তবু তাঁর ধর্ম্ম লোকে লইল না। তাঁকে বিশ্বাস করিল না। এখনও তাঁর কত শত্রু! বড় বড় বিদ্বান্ জ্ঞানীরা তাঁকে কি না বল্‌চে। হরি, এমন একটা ব্যাপার কর, যাতে পৃথিবীর লোক বুঝতে পারে, এদের সঙ্গে ঝগড়া করা অন্যায়। তোমার দল ক্রমে দুর্জ্জয় হউক। কোন যুদ্ধে যেন আমরা না হারি। প্রত্যেক বার সংগ্রামজয়ী হইব। দিগ্বিজয়ী সেনাদল; তোমার প্রসাদে এবারও আমরা নাট্যভূমিতে শত্রু জয় করিব। মা, যখন তোমার পা যত বার ছুঁয়েছি, তত বারই জিতেছি, তখন এবারও জয়ী হইব। মা, যাদের তুমি তোমার অভেদ্য কবচে আবৃত করিয়া দিগ্বিজয়ী করিয়াছ, তখন এবারও তাদের সংগ্রামবিজয়ী কর। অলৌকিক ব্যাপার সকল দেখাও। জয় রঙ্গভূমির জয়, দুহাজার লোক সমস্বরে বলিবে। মা, তোমার সম্বন্ধে লোকে এসে গালাগালি দেবে? এত বার আগুন খেলাম, আবার আগুন খেতে হবে? মা, তুমি বাহির হও। যখন নাট্যশালা করেছ, তখন বাহির হইতেই হইবে। ভগবতী, এবার নামিয়া আসিতে হইবে। মা দুর্গতিহারিণী, কৃপা করে এবার ভারতে এস, এসে শত্রু দমন কর। দাও, দয়াময়ী, বিবেক বৈরাগ্যের খড়্গ হস্তে। সেই খড়্গ লইয়া যুদ্ধে মাতিব। মা, একবার এস। পৃথিবীর লোকগুলিকে দেখাও, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তুমি ঘুমিয়ে নেই। মা, এখন প্রমাণের সময় এয়েছে। ভগবান্, তোমার রূপ গুণ পৃথিবীকে দেখাও। তোমার গৌরব আর তেজ একবার পৃথিবীকে দেখাব। যেমন দেখাব, অমনি সকলে মানিবে। মা, রণসজ্জা ধরে এস। দেখি, শত্রুদের কেমন বীরত্ব! হে দীননাথ, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর,

আমরা যেন আর ভয় না করিয়া, সময় এয়েছে জানিয়া, শত্রু নিপাত করিয়া, তোমার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।"

অভিনয় দ্বারা কাহার কি হইল, আমরা জানি না; কিন্তু কেশবচন্দ্র যে নাট্যাভিনয়জনিত আনন্দে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত প্রার্থনা:—

"ব্রহ্মে বিলীন"—১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ

"হে প্রেমময়, ভক্তের সুলভ, অভক্তের দুর্লভ রত্ন, তুমি যে কি বস্তু, তাহাত নির্ণয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির অতীত দুর্জ্ঞেয় পদার্থ তুমি, এ কথা বিজ্ঞানবিদেরা বলেন। কে তুমি, কি তুমি, কেহই জানে না,—কিছুই বুঝা যায় না। আমরা কিছু বুঝিতে পারি না। অচিন্ত্য পরব্রহ্ম। অকূল চিনির পানা, অনন্ত মিশ্রী, অনন্ত গোলাব জলের সাগর তুমি, এ বলিলে কিছু বেশী বলা হয় না। আমি বুঝ্‌তে পারি না, তুমি কে, তুমি কি; ছোট, কি বড়, কি পদার্থ তুমি; অথচ তোমাকে জানি। যত সুগন্ধ, তারই ঘনীভূত তুমি, অতি সুশীতল সুমিষ্ট সরবত, সুশীতল জলধারা হয়ে আমার মাথায় পড়্‌চ চিরকাল তুমি। তুমি পুরুষও নও, স্ত্রীও নও, অরূপ অপরূপ তুমি। যা বলে তোমাকে ডাকি, তাই তুমি। বাপ বলে ডাকিলেও তুমি বেজার হও না। অথচ যদি বলি, তুমি বাপও নও, মাও নও, বন্ধুও নও, তুমি আকাশ, তাও বলা যায়। যেমন ফুলের সৌরভ দেখা যায় না, অথচ নাকে গন্ধ যায়, আচ্ছন্ন করে ফেলে, তেমনি তুমি। কোথায় তুমি আছ, কি রকম তুমি, কেউ জানে না; অথচ কর্ণের ছিদ্র ব্রহ্মবাণীতে পূর্ণ, চক্ষু দুইটি ব্রহ্মরূপে পূর্ণ, নাসিকা ব্রহ্মের সুগন্ধে পূর্ণ, মুখ ব্রহ্মসুধায় পূর্ণ, ব্রহ্ম অভিষেকে সমুদায় শরীর ইন্দ্রিয় পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে হইলাম ব্রহ্ম-অঙ্গ। সমুদায় দেহ তোমার ভিতর গেল, গিয়া পুণ্য হয়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল; আর আমার অসার জমাট অংশ পড়ে রহিল। যা সারাংশ, ঠাকুরে মিশে গেল। আমার যা ভাল, যেটা আসল মানুষ, ঠাকুর নিয়ে গেলেন। আমি যাব হরিতে, না, হরি আস্‌বেন আমাতে? আমি ডুবিব হরিতে, না, হরি ডুবিবেন আমাতে? আমি যাব হরির বাড়ীতে, না, হরি আস্‌বেন আমার বাড়ীতে? একই কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ। নির্ব্বাণ হয়ে গেল। আমি আনন্দ হয়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রহ্মেতে মিশে গেলাম।

এক হয়ে গিয়ে পাপ অসম্ভব হয়ে গেল। আর বুঝ্‌তে হলো না, জান্‌তে হলো না, ভাব্‌তে হলো না। সাধন করিতে করিতে যেটা স্থূল ছিল, সূক্ষ্ম হয়ে গেল; ভাবের উত্তাপে লঘু হয়ে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু হয়ে ব্রহ্মেতে মিশে গেল। জল হয়ে বৃহৎ সমুদ্রে মিশিয়ে গেল। এই চিন্তা বড় আনন্দপ্রদ। হরি, তুমি যে হও সে হও, আমি সত্য বলিলাম। সত্যেতে বিলীন হয়ে গেলাম। দ্বৈতবাদ নয়, অদ্বৈতবাদ নয়। তবে বিলীন থাকিতে পারি না। এই খানিক পরে ভিন্ন হয়ে যাব। ভ্রম পাপেতে তোমা হইতে স্বতন্ত্র হয়ে যাব। হরি, আমাকে তোমাতে বিলীন কর, যেন আমরা সকলে এক হয়ে যাই। আর ভেদ স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। সুগন্ধির বাগান, সুরভির উদ্যান। ব্রহ্মকে খাও, ব্রহ্মের ঘ্রাণ লও, এই যোগ। হরি হে, বুকের ভিতর হইতে জীবাত্মাকে টানিয়া লইয়া তোমার ভিতরে শীঘ্র ডুবাও। সুখ, প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ হয়ে যাব। এখন উড়িলাম ব্রহ্মের সঙ্গে। এই শুদ্ধতা, এই পরিত্রাণ। হরি, প্রসন্ন হও। তোমার ভিতরে আমাদিগকে সূক্ষ্ম পরমাণু করিয়া শীঘ্র বিলীন কর, এই তবে চরণে প্রার্থনা।"

এই সময়ে "মুক্তি ফৌজ" বঙ্গে পদার্পণ করেন। কেশবচন্দ্র কোন ঘটনাকে বৃথা যাইতে দেন না। ইহাদের আগমনোপলক্ষে তাঁহার মনে কি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা এই প্রার্থনাতে প্রকাশ পায়ঃ—

"মুক্তিফৌজের বৈরাগ্য"—১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ

"হে দয়াল হরি, সাধকবন্ধু, পাপীর সহায়, নির্ধনের পালক, আমাদের দলটিকে কৃপা করিয়া আর একটু ভাল কর। দলটি, ঠাকুর এখনও বিধানের উপযুক্ত হয় নাই। নিজমুখে যে সকল কথা বলিতে পারিলাম না, তা হইল না; যা বলিতে পারিলাম, তাও হইল না। মা, আর এক দল হয়েছে, আমাদের লজ্জা দিবার জন্য। তাদের মধ্যেও আদিষ্ট প্রত্যাদিষ্ট সেনাপতি আছে। এক সময় দুইদল প্রস্তুত হইল। তারা বিলাতে বসে বসে খুব জোরের সহিত বল্‌চে; আমরা নির্জীব হয়ে বল্‌চি। নববিধানের দলকে তারা লজ্জা দিতেছে। বলিতেছে, 'ধিক! স্বর্গীয় রাজার সেনা হয়ে কোথায় তোরা ভারত জয় করিবি, না, আমাদের শেষে ভারতে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইল! আমরা নিশান খাঁড়া নিয়ে উপস্থিত। আমাদের নাম মুক্তির সৈন্য।' মা,

এইবার অপমানিত হইলাম, হারিয়া গেলাম। এত দিন বড় হারি নাই, আমাদের দলের চেয়ে মহাত্মা বুথের দল বড় হইল। তাঁর সৈন্যদল সমুদ্র টলমল করিয়া আসিতেছে। তারা বলেছে, লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে প্রস্তুত করিবে। মা, তবে তাই হোক। তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক। দয়াময়ি, এরা কি করিল? আমাদের খুব আক্কেল দিক্। এক সময়ে কি দুটো এক রকম দল হয়? তারা আস্‌ছে, বেশ হইল; তোমার ইচ্ছা যদি ইহা হয়, পূর্ণ হউক। আমাদের ওদের চিহ্নিত বলে, প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত বলে মানিতে হইবে। মা, ওদের দলের যদি খুব আগুনের মত বৈরাগ্য হয়, আমাদেরও তাদের চেয়ে উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাতে হবে। এবার আমাদের গুরু শিক্ষক আস্‌চে। ওরা ত বিধান মানে না, কিন্তু ওদের কত জীবন্ত ভাব! কত তেজ! আমাদের সকল বিষয়ে লজ্জা দিল ওরা। ওরা গরিব হয়ে, বৈরাগী হয়ে আস্‌চে। আবার ওদের মধ্যে মেয়েরা সৈনাধ্যক্ষ হয়ে নিশান ধরেছে। আমাদের মধ্যে তা ত নাই। হবার সম্ভাবনাও নাই। ওদের দ্বারা যদি দেশের মঙ্গল হয়, হউক; আমাদের মুখে চূণ কালী পড়িল। আমরা এত দিনে কিছু করিতে পারিলাম না; আর ওরা তোমার আদেশ পেয়ে, এই এত দূরে সন্ন্যাসীর মত হয়ে, দীন হয়ে আস্‌চে? এ এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত নূতন সংবাদ। এ তোমার বিচিত্র লীলা। তুমি আমাদিগকে খুব শিক্ষা দিলে, আমাদের খুব লজ্জা দিলে। প্রাণেশ্বরি, তবে কি ওরা ভারত নেবে? তবে কি ওরা ভারত জয় করিয়া লইবে? এই দল পড়িয়া থাকিবে? তাইত। আমরা গুণে বড় না হলে তাই হইবে। বৈরাগী ফৌজ আস্‌ছে। আমরা যে পারিলাম না। মা, ওরা যেমন বৈরাগ্য দেখাচ্চে, আমরা যদি তদপেক্ষা অধিক বৈরাগ্য দেখাতে পারি, ওরা যেমন পিতা পিতা বল্‌চে, আমরা যদি তেমনি মা, মা, মা, মা আদ্যাশক্তি ভগবতী বলিতে বলিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারি, তবে হয়। মা, তোমার এই গরিব দল যেন মরা না হয়। ঐ দল যেন একখানি প্রকাণ্ড পাথরের মত নাইনীতাল থেকে গড়াতে গড়াতে আস্‌চে আমাদের মাথার উপর। ওরা জমাট বেঁধেছে ভক্তিতে, বাধ্যতায়, বিনয়, শাসন, বৈরাগ্যে। আর আমাদের দল দার্জ্জিলিংএর মত মাটির পাহাড়, ঝুর ঝুর করে মাটী খসে পড়্‌চে। জমাট বাঁধে নাই আমাদের মধ্যে। এই

দলের স্বেচ্ছাচারী লোকগুলিকে শিক্ষা দাও। মা, যদি আমরা উচ্চতর বৈরাগ্য দেখাইয়া জিতিতে পারি, তবেই হয়, নতুবা গেলাম। লড়াইয়ের ফৌজ হইল না। এমন তেজ জমাট আমাদের হোক্। দীনবন্ধু, কৃপাময়, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উহাদের উদাহরণ দেখিয়া, সাধন দ্বারা উচ্চতর জীবনের, উচ্চতর বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর।"

মুক্তিসৈন্যকে অভিনন্দন

নববিধানের প্রেরিতবর্গের পক্ষ হইতে মুক্তিসৈন্যকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়, আমরা এস্থলে তাহার অনুবাদ দিতেছি; পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, কীদৃশ উদারহৃদয়ে মুক্তিসৈন্যকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল :—

"স্বাগত বীর সেনাপতি! স্বাগত মুক্তিসৈন্য! স্বাগত খ্রীষ্টনিয়োজিত পরাক্রান্ত সৈনিকপুরুষের দল! স্বাগত! স্বাগত! স্বাগত! ভারতবর্ষে আপনাদের আগমনে আমরা হৃদয়ের সহিত আপনাদিগকে স্বাগতসম্ভাষণার্পণ করিতেছি। হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া সারল্য ও প্রেমত্তোৎসাহসহকারে আমরা আমাদের কথা আপনাদিগকে কহিতেছি। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার মধ্যে কোন ছল নাই, কোন তোষামোদ বাক্য নাই। তোষামোদে লাভ কি? আমরা কোন স্তুতিবাদ চাই না, আমরা কোন আনুকূল্য চাই না। আমাদের বিশ্বাস স্বতন্ত্র, মত বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কোন মিল নাই। আপনারা প্রাচীন খ্রীষ্ট-সম্প্রদায়, আমরা ব্রাহ্ম। ভারতবর্ষের লোকদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে আপনারা ভারতে আসিয়াছেন; আমরা নববিধানের প্রেরিত, আমাদের দেশীয় লোকদিগকে পবিত্র উদার মণ্ডলীতে ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য আমরা নিযুক্ত। তবুও আমরা আপনাদিগকে সম্মানসহকারে স্বাগত-সম্ভাষণ করিতেছি; কেন না, আমরা বিশ্বাস করি, খ্রীষ্টধর্ম্মের কল্যাণার্থ আপনাদিগের উত্থান স্বয়ং বিধাতৃনিয়োজিত, এবং আপনাদের ভারতে আগমনও বিধাতৃনিয়োজিত। অধিকন্তু আপনাদের খ্রীষ্টভ্রাতৃবর্গ আপনাদিগকে যে সম্ভ্রম দিতে প্রস্তুত, আমরা আপনাদিগকে তদপেক্ষা অধিক সম্ভ্রম দিতেছি। আমরা অতিগাম্ভীর্য্যসহকারে বিশ্বাস করি, আপনাদের পরাক্রান্ত সেনাপতি

উইলিয়ম বুথ ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট প্রেরিত। ভগবান্ তাঁহার হস্তে দেবানুমোদিত সংবাদ ন্যস্ত করিয়াছেন, এবং উহা সম্পন্ন করিবার উপযোগী স্বর্গীয় শক্তি ও আয়োজন দিয়াছেন। সেনাপতি বুথ সাধারণ লোক নহেন, তিনি ঈশ্বরের লোক; ভগবান্ পৃথিবীতে যে কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে নিয়োগ করিয়াছেন, সে জন্য তিনি সম্যক্ প্রত্যাদিষ্ট। এই ভাবেই আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। মুক্তিসৈন্যের সমগ্র গঠন আমরা পবিত্র ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া মনে করি। ঈদৃশ পরাক্রান্ত কার্য্যসাধনোপায় কোন মানুষের করা নয়। ইহার সকল প্রকারের অবস্থা ও ক্রিয়াপ্রণালীর মধ্যে ঈশ্বরের অঙ্গুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আজ পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ আপনাদের সেনাদল, আপনাদের জাতিমধ্যে যাহারা অতি নীচ, অতি কুৎসিতচরিত্র, তাহাদিগের ভ্রান্তি ও পাপের বিরুদ্ধে যে প্রকার সংগ্রাম করিতেছেন, এবং অনেক পতিত ভ্রাতা ও ভগিনীকে পাপের গভীর গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদের কার্য্যে যে স্বর্গস্থ রাজাধিরাজের অনুগ্রহ প্রচুরপরিমাণ আছে, তাহাই প্রকাশ পায়। ক্রুশের উৎসাহী সৈনিকগণ, প্রভু যে আপনাদের সঙ্গে এবং আপনারা যেখানে যান, সেখানেই তাঁহার কৃপা যে আপনাদের মধ্যে, ইহা আপনারা নিঃসংশয়ভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আপনাদের গুরু এবং সেনানীর ভাবে প্রণোদিত হইয়া, আপনারা পতিতগণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ও উদ্ধার করিবার জন্য যেখানে সেখানে যান, ইহাতে আপনারা প্রভূত পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। অতিহীন এবং অতিপতিতগণের প্রতি প্রেমই যে একমাত্র আপনাদের গৌরব, তাহা নহে; অতি নিন্দনীয় মৃত্যুসদৃশ নিদ্রা ও আলস্যপ্রধান সময়ে আপনারা যে প্রজ্বলিত অগ্নি, ইহা আপনাদের আরও গৌরব। আপনারা লোকের নিকটে জীবন্ত বিশ্বাস প্রচার করেন, আপনারা জীবন্ত ঈশ্বরের পতাকাধারী, আপনারা পৃথিবীকে শক্তি ও জীবনপূর্ণ কথা কহিয়া থাকেন। জীবন্ত স্বর্গের সহিত আপনারা কথা কন এবং জীবন্ত দেবনিশ্বসিত আপনারা লাভ করিয়া থাকেন। এ জন্যই আপনাদের বল, এজন্যই আপনাদের কৃতকার্য্যতা। আপনাদের স্বর্গীয় প্রমত্তোৎসাহ এবং খ্রীষ্ট-রাজ্যের জীবনহীন হীনতর জড়তামধ্যে পবিত্রাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য আর যে সকল এতৎসদৃশ ব্যাপার আছে, উহারা পাশ্চাত্য দেশের সমগ্র ধর্ম্মজীবন

পবিত্র ও উৎসাহান্বিত করিবে এবং জড়বাদ ও সংশয়বাদ বিনাশ করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্য অগ্রসর করিয়া দিবে। অপিচ আপনাদের আত্মত্যাগ ও দীনতা, সহজভাব ও চরিত্রের শুদ্ধতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা, সোৎসাহ প্রার্থনা ও মিষ্ট উপাসনা, সাহস ও বীরত্ব, প্রশান্ত ভাব ও সংযম, ঈশ্বরপ্রেম ও পার্থিব-বিচারনিরপেক্ষতা, নিশ্চয়ই আপনারা যেথানে কার্য্য করিতে যাইবেন, সেখানেই আত্মাগুলিকে সজীব করিয়া তুলিবে, এবং পবিত্র করিবে। আপনারা নিশ্চয় বিশ্বাস করুন, এ যুগে আপনাদিগকে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে; এমন কি, বর্ত্তমান গ্রীষ্টধর্ম্মের অসাড়ভাবের ভিতরে আপনারা জীবনসঞ্চার করিবেন। আপনাদের বিপক্ষেরা যাই বলুন, ভারতেও আপনাদের দেবনিয়োজিত কার্য্য আছে, স্বয়ং ভগবান্ উহা পূর্ণ করিবেন। স্মরণ করুন, আপনারা এখানে এই প্রমাণ করিতে আসিয়াছেন যে, আহারপান গ্রীষ্টের ধর্ম্ম নহে, মৃত মত বা জীবনহীন ক্রিয়াকলাপ নহে, কিন্তু ঈশ্বরে জীবন; যথার্থ গ্রীষ্টধর্ম্ম আর কিছুই নহে, দেবভাবপূর্ণ প্রমত্তোৎসাহ, আত্মসমর্পণ, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম ও বিশুদ্ধি। আপনারা আমাদিগকে এত ভালবাসেন, এবং আপনাদের গুরুকে এত সম্মান করেন যে, তাঁহার জন্য দেশীয় ভাষা ও পরিচ্ছদ নিজের করিয়া লইয়া, হীন হইয়া, পথের প্রচারক হইতে আপনারা লজ্জানুভব করেন নাই। আপনারা সম্ভ্রম ও বংশগৌরব পরিহার করিয়া, ভারতের দুঃখী পাপীদিগের উদ্ধার করিবার জন্য, গরিব ও হীন হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভক্তিযুক্ত প্রমত্তোৎসাহ-বিনয়-নম্রতা ও দীনতাসহকারে আমাদের নিকটে এ দেশীয় পরিচ্ছদে গ্রীষ্টকে উপস্থিত করিবার জন্য আপনারা আসিয়াছেন। ভারতের ঈশ্বর এজন্যই আপনাদিগকে এবং আপনাদের কার্য্যকে আশীর্য্যুক্ত করিবেন। আপনারা মনে রাখিবেন, যে জাতির সহিত আপনারা ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা উচ্চবংশের অভিমান করিতে পারেন, এবং তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষ হইতে অতিসম্পন্ন সাহিত্য ও সত্য উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন। আপনারা লোকদিগকে সম্মান করুন, এবং আমাদের শাস্ত্র ও সাধুগণের মধ্যে যাহা কিছু ভাল ও ঐশ্বরিক আছে, তাহার সম্মাননা করুন। আপনাদের সত্য আপনারা দিন, কিন্তু আমাদের সত্য ধ্বংস করিবেন না। এ দেশের জীবনে যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাহার সঙ্গে গ্রীষ্টানোচিত জীবন ও চরিত্রের শোভা সংযুক্ত করুন; গ্রীষ্টের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব ও

পশ্চিমকে ঈশ্বরেতে জীবনের পূর্ণতালাভে সমর্থ করুন। ঈশ্বর আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং আপনাদের সঙ্গে থাকুন।

নববিধানের প্রেরিতগণ।"

বম্বে মুক্তিসৈন্যের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে 'ধর্ম্মতত্ত্বের' মন্তব্য

বম্বের শাসনকর্ত্তৃগণ মুক্তিসৈন্যের উপরে যে অত্যাচার করেন, তৎসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক) লিখিয়াছেন :—

"'মুক্তিসৈন্য' দল ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই স্বদেশীয়গণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছেন, খ্রীষ্টের সৈন্য খ্রীষ্টশিষ্যাভিমানী গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের দ্বারা লাঞ্ছিত, এ দৃশ্য কি ভয়ানক! খ্রীষ্টের ভাগ্যে এই ছিল যে, স্বীয় অনুযায়িবর্গ দ্বারা অবমানিত এবং তাড়িত হইবেন! সৈন্যদল দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবে, এই ছল করিয়া তাঁহাদিগের অর্থদণ্ড করা, কারারুদ্ধ করা, দৃশ্যতঃ এ যুক্তি মন্দ নয়; কিন্তু যাঁহারা অপরে মারিলেও দ্বিরুক্তি করেন না, হস্তপদ ভগ্ন, চক্ষু উৎপাটিত, চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলেও পুলীসের আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তাঁহাদিগের প্রতি শান্তিভঙ্গচ্ছলে অত্যাচার, এ কোন্ রাজনীতি? ইংলণ্ডের রাজনীতি যাঁহাদিগের মহত্ত্ব, উচ্চত্ব, বিনয় ও শান্তস্বভাব দর্শন করিয়া পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট অন্যবিধ নীতি অবলম্বন করিলেন, ইহার অর্থ কি? মুক্তিসৈন্যগণের দেশীয় ভাব গ্রহণ, একজন সিবিলিয়ানের এরূপ নীচতা স্বীকার তো স্বদেশীয়গণের অভিমানে আঘাত অর্পণ করে নাই? একবার পাশ দিয়া তাহা প্রতিগ্রহণ, সামান্য একটি বাদ্যযন্ত্র-বাদনে বিংশতি মুদ্রা অর্থদণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে প্রচার আরম্ভ করাতে আসেধে অবরোধ, পরিশেষে অর্থদণ্ড অর্পণ না করাতে দুই জন অবলাকে সাত সাত দিন এবং ছয় জন পুরুষকে পোনের পোনের দিন কারারোধ, এ সকল কি ভয়ানক অত্যাচার! ইউরোপীয়গণের স্ত্রীজাতির প্রতি যে সম্মাননা, তাহা এখন কোথায় গেল? মুক্তিসৈন্যের আট জন অধিনায়ক এদেশে যদি নীচ পতিতদিগের মধ্য হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিতে গিয়া, পদে পদে অবমানিত, তাড়িত, ভর্ৎসিত, কারারুদ্ধ হন, এবং এইরূপে জীবন শেষ করিয়াও যাইতে পারেন, তাঁহাদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে, ভারতবর্ষ চিরকাল তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবে; কেন না, তাঁহারা যে প্রভুর নামে বাহির হইয়াছেন, তাঁহার

উপযুক্ত জীবন নির্ব্বাহিত হইল। মুক্তিসৈন্যের সেনাপতি ঈশ্বরের আদেশ লইয়া সমুদায় কার্য্য করেন, ইহা তিনি নির্ভীকচিত্তে জগতের নিকটে প্রকাশ করিয়া, ঘোরতর জড়বাদাচ্ছন্ন ইংলণ্ড হইতে অতি শুভ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা কখন বিলুপ্ত হইবার নহে। ভারতের লোকের মুখে আদেশবাদ-প্রচার অসম্ভব নহে; কিন্তু ইংলণ্ডের লোকের মুখে ইহা প্রচার অতীব সুখপ্রদ।"

'মুক্তিসৈন্যের' প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য টাউন হলে সভা

'মুক্তিসৈন্যের' প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধানজন্য টাউনহলে যে সভা হয়, তৎসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক) লিখিয়াছেন :—

"'মুক্তিসৈন্য'গণের প্রতি বম্বে গবর্ণমেণ্ট যে অনুচিত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ জন্য টাউন হলে একটী সভা হইয়াছিল। আমাদিগের আচার্য্য সভাপতি হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যাঁহারা বক্তা বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহারা সকলেই সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শুদ্ধ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং দেশবিদেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ মুক্তিসৈন্যের দুঃখে দুঃখী হইয়া সভাস্থ হইয়াছিলেন, তাহা নহে; গোস্বামিবংশ হইতে আরম্ভ করিয়া, সমুদায় হিন্দুগণের প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্টের এই অনুচিত ব্যবহারের প্রতিবাদ-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তি দ্বারা গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। প্রতি বক্তাই সময়োচিত বক্তৃতায় উপস্থিত জনগণের হৃদয় উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এই সভার পক্ষ হইতে, বম্বে গবর্ণমেণ্টের এই আচরণ প্রতিনিবৃত্ত হয়, এজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, উদার ভারতগবর্ণমেণ্ট ইহার সমুচিত প্রতিবিধান করিবেন।"

মেজর টকরকে সহানুভূতিসূচক পত্র

কেশবচন্দ্র সহানুভূতিসূচক যে পত্র মেজর টকরকে লিখেন, উহা 'মুক্তি-সৈন্যের' পত্রিকা 'ওয়ার ক্রাইয়ে' (সংগ্রামনির্ঘোষে) প্রকাশিত হয়। পত্র-খানি এই :—

"প্রিয় মহাশয়,—আপনি যে সস্নেহসংবাদ দিয়াছেন, তৎপ্রাপ্তিস্বীকার করিতে গিয়া এই কথা বলিতেছি যে, আপনাদের পরীক্ষা এবং বিপৎকালে আমাদের অতি সামান্য সহানুভূতি যে আপনারা এমন উদারভাবে গ্রহণ করিয়াছেন,

তজ্জন্য আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রভূত মতভেদ-সত্ত্বেও, আমরা যে ঈদৃশ ভ্রাতৃসমুচিত সহানুভূতি অর্পণ করিয়াছি, তাহা আর কিছুই নয়, ঈশ্বরের লোক অত্যাচরিত হইলে তৎপ্রতি যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাই। আপনারা যে নিষ্ঠুরভাবে অন্যায়রূপে অত্যাচরিত হইয়াছিলেন, তাহার অন্য কোন কারণ নাই ; এই কারণ যে, আপনাদের ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম লৌকিকাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আপনারা ভারতসমাজের নামে অত্যাচরিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন ; সুতরাং প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় লোকের গুরুতর কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আপনাদের প্রতি যাঁহারা অত্যাচার করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদিগের কেবল সহানুভূতি নাই, তাহা নহে, আপনি এবং আপনার সঙ্গিগণ যে নিষ্ঠুর অন্যায় ব্যবহারের বিষয় হইয়াছেন, তাহার তাঁহারা প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত। এদেশের রাজবিধি, হিন্দুজাতির ভাব, উভয়ই এ ব্যবহারের প্রতিকূল। উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টানগণ আপনাদের দীন সহধর্ম্মিগণের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস পরীক্ষাধীন করিতেছেন, এই অবনতিসূচক দৃশ্য-দর্শনে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম লজ্জিত। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, এদেশের সমাজের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই কার্য্যের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিয়া দোষবিমুক্ত হইয়াছেন। আপনাদের অনুকূলে তাঁহারা যে আবেদন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের উচ্চমনা রাজপ্রতিনিধি তৎসম্বন্ধে কি করেন, এখন ইহাই দেখিবার বিষয়। তিনি কি মতসহিষ্ণুতা প্রতিপোষণ করিবেন না ? আপনারা প্রতিবিধান করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, ইহা জ্ঞানের কার্য্য হইয়াছে। ক্ষমা করুন, বহন করুন, অন্তে বিনয়েরই জয় হইবে। আপনি আপনার সঙ্গিগণের জন্য আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম এবং হৃদ্‌গত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করুন, এবং আমায় বিশ্বাস করুন যে,

ভারতে স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের জন্য
চিরদিন আপনারই—
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন”

অসুস্থতার মধ্যেও কার্য্যোদ্যম

কেশবচন্দ্রের শরীর এখনও সুস্থ হয় নাই। দৈহিক দৌর্ব্বল্য এবং শিরঃপীড়া এ সময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঈদৃশ অবস্থাতেও তিনি যে জীবনের

কার্য্যে অলস হইবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? মদ্যপাননিবারণের জন্য সার উইলফ্রিড লসন যে বিধি নিবদ্ধ করিবার জন্য যত্ন করিতেছিলেন, সে যত্নসিদ্ধির ফলে বিলম্ব দর্শন করিয়া, কেশবচন্দ্র ইউনাইটেড কিঙ্ডম আলায়েন্সের সম্পাদককে এই সময়ে পত্র লিখেন। সে পত্র পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, এ সকল সংস্কারকার্য্যে এখনও তাঁহার কি প্রকার অক্ষুণ্ণ যত্ন আছে। ২রা ডিসেম্বর (১৮৮২ খৃঃ) মান্যবর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহে নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয় হয়, তাহাতে তিনি যাদৃশ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা ভগ্নদেহের পক্ষে অসম্ভব। এই পর্য্যন্ত নহে, ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৮২ খৃঃ) ডেলহাউসি ইনিষ্টিটিউটে তাঁহার যে বক্তৃতা হয়, তাহাতে তিনি অতি ওজস্বিতা-সহকারে, খ্রীষ্টানমিশনকার্য্যের অবনতি কেন উপস্থিত, তাহা প্রদর্শন করেন।

পারিবারিক সম্বন্ধকে উচ্চতম ভূমিতে প্রতিষ্ঠাচেষ্টা

সাধারণের সেবা তিনিতো অক্ষুণ্ণ পরিশ্রমের সহিত করিতেছেন, করিবেনই; পারিবারিক সম্বন্ধকেও উচ্চতম ভূমিতে আরূঢ় করাইবার জন্য, তাঁহার ঔদাসীন্য কোন কালে প্রকাশ পায় নাই। স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ তাঁহার নিকটে কি প্রকার উচ্চ ছিল, তাহা "স্বামী ও স্ত্রীর আত্মা" প্রবন্ধে (১৫৭৯ পৃঃ) বিলক্ষণ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এখন যে ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, সে ব্রত জীবনে উহার সফলতা প্রদর্শন করিতেছে। এই ব্রতসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০৪ শক) লিখিয়াছেন :—

যুগলধর্ম্মসাধনব্রতের জন্য আচার্য্যপত্নীর কেশভারোন্মোচন ও ব্রতের নিয়মানুবর্ত্তন

"বিগত রবিবার (২৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ) আচার্য্য মহাশয়ের পত্নী কেশভার উন্মোচন করিয়া স্বামী সহ যোগধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই সংসার ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সমুদায় প্রকারের সাংসারিক সম্বন্ধ হইতে অপসৃত হইয়া, একত্র ধর্ম্মের উচ্চতর অঙ্গ সাধন এখন ইঁহাদিগের জীবনের ব্রত। এই ব্রতের নাম যুগলধর্ম্মসাধনব্রত। এক সপ্তাহ কাল আচার্য্যপত্নী এই নিয়মগুলির অনুসরণ করিবেন। সোমবার ঈশা-চরিত্র-পাঠ বা শ্রবণ, স্বামিসেবা, কাঞ্চনদান; মঙ্গলবার গৌতমচরিত্র-পাঠ বা শ্রবণ, পিতামাতাসেবা, রজতদান; বুধবার গৌতমচরিত্র-পাঠ বা শ্রবণ, সন্তানসেবা, তাম্রদান; বৃহস্পতিবার মহম্মদচরিত্র-পাঠ বা শ্রবণ, ভাই ভগ্নীর সেবা, বস্ত্রদান;

শুক্রবার নানকচরিত্রপাঠ বা শ্রবণ, দাসদাসীসেবা, ধান্যদান; শনিবার শিবতুর্গাচরিত্র-পাঠ বা শ্রবণ, তুঃখীর সেবা, ঔষধদান; রবিবার যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীচরিত-পাঠ বা শ্রবণ, প্রচারক-সেবা, জ্ঞানদান। প্রাত্যহিক:—প্রাতঃস্মরণীয়—সচ্চিদানন্দকে প্রণাম, সাধ্বীসতীদিগকে নমস্কার, নববিধানকে নমস্কার; স্নানের সময় 'জলে হরি' তিন বার উচ্চারণ, আহারের সময় 'অন্নে হরি' তিন বার উচ্চারণ, পতি সহ যোগধর্ম্ম-সাধন, দেবমন্দির-পরিষ্কার, কুটীরে নির্জ্জন সাধন।"

২৯শে অক্টোবর এই ব্রত গৃহীত হয়। সে দিনের প্রার্থনা * এই:—

"যুগলব্রতগ্রহণ"—২৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ

"হে দীনবন্ধু, হে পতিতদিগের পরিত্রাতা, তোমার আদেশে, তোমার প্রসাদে জীবনের শেষভাগে সংসার ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া, তোমার বিধি গ্রহণ করিতে আসিলাম। এ ব্রত গম্ভীর, গম্ভীর হইতেও গম্ভীর। এ ব্রত তুমি লওয়াইলেই মানুষ লইতে পারে, নতুবা দশ সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও হয় না। এ ব্রতে আসক্তি-ত্যাগ, বিষয়-ত্যাগ, এ ব্রত একটি বিশেষ ব্রত। ইহা জীবনের অপরাহ্ণ সময়ের ব্রত। এ ব্রতে পরলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। এ ব্রত অন্যান্য ব্রত অপেক্ষা ঘনীভূত। মা, অনেক দিন পৃথিবীর রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, জীবনের অপরাহ্ণে সতী স্ত্রীর শীতল ছায়া শ্রান্ত স্বামীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হয়। এজন্য এই শুভক্ষণে নরনারীর পবিত্র মিলনের সময়, বহুদিনের আশাপূর্ণের সময় দেবতারা আনন্দিত হইলেন। অনেক দিন হইল, তুই জনে ধর্ম্মের জন্য গৃহ হইতে তাড়িত হইলাম। কোথায় যাইব, জানিতাম না, নৌকা খানা জলে ভাসাইয়া দিল। সেই তরী ভাসিতে ভাসিতে এখন নববিধানের যুগলসাধনের ঘাটে আসিয়া লাগিল। বহুকালের আশা, দীনবন্ধু, তুমি পূর্ণ করিলে। চারহাত মিলাইয়াছিলে একবার, সে সংসারের পক্ষে কাজের বটে, ধর্ম্মের পক্ষে বড় কাজের নয়। আর আজ চারহাত মিলাইলে ধর্ম্মের ঘরে। সেই বিবাহ দিয়াছিলে বালির ঘাটে, আর আজ বিবাহ দিলে বিধানের ঘাটে। বলিলে, সুখে থাক, সুখে থাক। আজ বড়

---

* ২৯শে অক্টোবরের এবং পরবর্ত্তী ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবরের প্রার্থনা 'দৈনিক প্রার্থনা'—কমলকুটীর—৪র্থ ভাগে দ্রষ্টব্য।

সুখের দিন। এ বিবাহে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল। এ বিবাহ উচ্চ পবিত্র প্রশান্ত সুন্দর। উভয়ের মনে নিকৃষ্ট ভাব থাকিবে না। এ বিবাহ পবিত্র। নীচ তিক্তভাবে উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইব না। এমন ভালবাসিব পরস্পরকে, যাহা বিষয়ী স্বামী স্ত্রীরা কখনও পারে না। পরস্পরের দিকে যখন তাকাইব, উভয়ের ভিতর দেবত্ব দেবীত্ব দেখিব। মা, এত শীঘ্র যে এ আশা পূর্ণ করিবে, জানিতাম না। মা, প্রার্থনায় কি না হইতে পারে? প্রার্থনা কি সামান্য জিনিষ? এই একটি সামান্য ছোট লোক, বিধির বিধি চাহিতে চাহিতে কি পাইল! এ স্ত্রীর কি আসিবার কথা ছিল? না। বড় প্রতিকূল, বড় বাঁকা। এক দিকে আমি, আর অন্যদিকে উনি চলেন। কিন্তু এখন কি শয়তান বাধা দিতে পারিল? শয়তান যে বলেছিল, দুজনকে দুই পথে রাখিবে। পরস্পরের দেখা হবে না, মধ্যে অনেক কণ্টক থাকিবে, অনেক বিঘ্ন থাকিবে। স্ত্রী পরিবার লইয়া যে হরিনাম করিবি, তা পারিবি না। শয়তান, তুই যা, দূর হ! তুই কি কিছু করিতে পারিলি? আমার বিশ বৎসরের প্রার্থনা কি জলে ভেসে যাবে? এই যে আশা পূর্ণ হইতেছে। মা, তুমি দেখালে, হরিনামে কি হইতে পারে। মা, কবে আমরা দুজন যুগলসাধন করিতে করিতে, শান্তিধামে গিয়া উপস্থিত হইব। শুভ দিনে শুভক্ষণে পরলোকের যোগ আরম্ভ হইল। আমরা দুজন এখন থেকে, মা ভগবতী, তোমারই। তোমার চরণতলে চিরদিন বসিবার অধিকার চাই। আসন দুখানি তোমার চরণতলে থাকিবে। উপাসনা, সংসারের সকলি ওখানে বসে করিতে হইবে। আর বিষয়ীর মত চলিতে পারিব না। আর পশুভাব রাখিতে পারিব না। আর রাগী স্ত্রী, রাগী স্বামী হইয়া পরস্পরকে দংশন করিতে পারিব না। এবার কি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর মত হইতে পারিব না? মা, আড়ম্বর করে, ধুমধাম করে ব্রত লইয়া কি করিব? বাড়াবাড়ি কাজ নাই, যদি আবার পা পিছ্লে পড়ি, যদি আবার ঝগড়া করি, যদি আবার বিষয়ী হইয়া ধর্ম্ম নষ্ট করি। তাই বলি, আস্তে আস্তে চলি। মা, আমার সহধর্ম্মিণী যিনি হইলেন, তিনি পবিত্রাত্মা হউন। তিনি ধর্ম্মের তেজে পূর্ণ হউন। মা, নববিধানে যুগলসাধনের দৃষ্টান্ত এই হতভাগা হতভাগিনী দেখাক্। হতভাগ্য আগে ছিল, এখন সৌভাগ্য হইল। মা, অনেকের সংশয় ছিল, এটা হইবে না।

সকলে দেখিল, বেঁচে থাকিতে থাকিতে দুজনে এক হইল। এক আসনে বসিল, এক হরির নাম করিতে করিতে শুদ্ধ হইল। যখন ইহা হইল, তখন গেল শোক, গেল নিরাশা, গেল দুঃখ। নববিবাহে যে পতি পত্নীর মিলন হয়, এটা কেউ মানিত না। কিন্তু তুমি দেখিয়ে দিলে, প্রমাণ করিলে, এটা হয়। ছেলেপিলেদের এদিকে আনিতে পারিলেই এখন হইল। কটাকে পাই, আর বাড়ীখানা তোমার হয়, তা হলে এখনকার মত অনন্তকালের জন্য এক পরিবার হইয়া থাকি। দলের কথাটা আর বলিলাম না, দুদিন বলেছি, মা; স্ত্রীকে পোড়াইলে আবার সেই জ্বলন্ত আগুন হইতে নবস্ত্রী বাহির হইবে, এটা দেখাও প্রত্যক্ষ, নতুবা বিশ্বাস হয় না। মা, তোমার পদচুম্বন করি। তোমার নববিধানের নিশান চারিদিকে খুব উড়ুক। মা, এত দিনের কান্নাকাটির পর এ গরিবের কি হইয়াছে, আমিই জানি। এ কি কম কথা? একটা স্ত্রীলোক, একটা পুরুষ এক হইল। একজন আমার কাছে বসিল, সে ইহকাল পরকালের জন্য আমার হইল। শঙ্খধ্বনি শুনিলাম, অমরাত্মা দুইটির যোগ হইল। স্ত্রী আর মেয়েমানুষ নয়। আমার বন্ধু হইলেন। উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইলাম। লও তবে, সন্তানগণ, সংসারের চাবি। লইয়া সংসার পালন কর। আমাদিগকে অবসর দাও সংসার হইতে। দুজনে চলে যাক্, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদীর ধার দিয়া, সেই সুখের গ্রামে। মা, পুত্র কন্যা পুত্রবধূ ইহারা সংসারে ধর্ম্ম পালন করুন, তাঁদের এখনও কাজ আছে, তাঁরা সেই সব কাজ করুন। আমাদিগকে অবসর দিন সংসার হইতে। আমরা আশীর্ব্বাদ করিব তাঁদের যে, বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ধর্ম্ম করিতে সময় দিলেন তাঁরা। তাঁদের যা কাজ. তাঁরা করুন। তাঁরা আমাদের বৃদ্ধ বয়সে যষ্টিস্বরূপ হউন। আর পুরাতন জীবন নয়। সবে নূতন নৌকা ভাসাইল দুজনে। দুজন লোক রৌদ্রে বাহির হইল। এ মস্ত ব্যাপার নয়, ঈশা চৈতন্যের মত নয়। দুটি শ্রান্ত পাখী উড়িল, উড়িয়া গিয়া সেই বিধানের বৃক্ষে বসিবে। মা, অধিক আর কি বলিব, সকলে বিধানের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমরা দুজন একজন হইলাম, তোমার হইলাম। দাস বলে, দাসী বলে মনে রেখ। এ নূতন ব্রতের পথে, এই কঠোর পথে, এই পুরুষটিকে, এই মেয়েটিকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিও। আমরা দুইটি বৈকুণ্ঠবাসী, বৃন্দাবনবাসী হইলাম। বৈরাগ্যের ভস্ম মাখিলাম। আজ সকলে বিদায়

দিলেন। বিদায় নিলাম। সংসার আমাদের চায় না। বন্ধুরা চান কি না, জানি না। চাহিলে আসিতেন সঙ্গে। বৃন্দাবনবাসী হইতেন। এঁরা সংসারের কুমন্ত্রণায় ভুলিলেন। স্ত্রীর কথায় কাণ দিলেন, শেষে কি হইল ? এক নৌকায় সকলে যাবেন, তাতো হল না। তুমি ছোট নৌকা পাঠালে কেন ? যাঁদের এক সঙ্গে নৌকায় চড়িয়া যাবার কথা ছিল, তাঁরা ঘাটে দাঁড়িয়ে বিদায় দেন কেন ? চল চল না বলে, এস এস বলেন না কেন ? আচ্ছা তাই হউক, দুটো লোককে বিদায় দিয়া তাঁরা যদি সুখী হন, তাই হউক। আমরা এ দেশে আর থাকিব না, এ দেশের কিছু ছুঁইব না, অন্য দেশে চলিয়া যাইব। যুগল-মূর্ত্তির কথা এত বলিলাম, কেহ শুনিলেন না। মা, সকলের মনে শুভবুদ্ধি দাও। প্রত্যেকে যেন বৈকুণ্ঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, উপযুক্ত হন। হে মাতঃ, হে মঙ্গলময়ি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকল প্রকার কপটতা অসরল ভাব ত্যাগ করিয়া, দুইজনে সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারি।"

পরদিনের প্রার্থনা এই ব্রতের উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। প্রার্থনাটী এই :—

"সতীত্বলাভের অভিলাষ"—৩০শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ

"হে প্রেমসিন্ধু, প্রেমের আকর, বড় জলে যেমন ছোট ছোট জল সকল ক্রমে মিশাইয়া যায়, তেমনি দেখিতেছি, সাধনের বলে ক্রমে তোমার ভিতর আমরা মিলিয়া যাইতেছি। হে প্রেমময়, তুমি যদি মাতৃরূপ হইলে, তবে স্বামী এবং স্ত্রী এই পৃথিবীতে সেই মাতৃরূপ সাধন করিতে করিতে, স্বামী যিনি, তিনি সতীত্ব প্রাপ্ত হইলেন, পতি যিনি পত্নীত্ব পাইলেন। দুই জনে তোমার প্রকৃতিতে মিশাইলেন। পুরুষ এবং স্ত্রীর প্রভেদ, কৃপা করে ঘুচাইয়া দাও, এই প্রভেদ ভাল নয়। আমরা সকলেই নারীপ্রকৃতি লাভ করিয়া তোমার আনন্দে ভাসিব, রসাধার হইব, কোমল হইব, সৌন্দর্য্য শুদ্ধতা পাইব, একা একাতো হইবে না। দুই জনে বসিব, পুরুষ প্রকৃতি, প্রকৃতি পুরুষ, এই ভাবিতে ভাবিতে পুরুষের জ্ঞান, পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে পরিণত হইবে। নারী-প্রকৃতির প্রেম দাও—তোমার দাসী হইয়া তোমাকে ভালবাসিতে, ভক্তি করিতে দাও। গোপনে তোমাকে সেবা করি, স্বামিসেবা, প্রভুসেবা করিয়া জীবন

কাটাই। আমরা দুই জনে নারী হইয়া, তোমাকে পতিরূপে সেবা করি। যুগলসাধনের পূর্ণানন্দ তোমাতে বিকাশ কর। এখনকার ব্রত কিরূপে সাধন করিব, তার নিয়ম বলে দাও। খুব শুদ্ধ এবং সুখী হব, আর এ স্বভাব রাখিব না। একেবারে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য পাইব। লোকে বলিবে, আচার্য্যের মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত হইয়াছে। সাধন করিতে করিতে কঠোর মুখ কেমন কোমল হইয়াছে। মার শোভাতে সন্তানের শোভা হইয়াছে। মা, কোমল কুসুমের মত সুগন্ধ সরস কর। আর পৃথিবীতে কেন এ সব থাকে? এসব পুরুষ-কণ্টক বিনাশ কর। পাথরের মত কঠোর হৃদয়কে কোমল কর। খুব ক্ষমা, খুব ভালবাসা, খুব ভক্তি, খুব পবিত্রতা দাও। সতী নারীর মত সতী হয়ে, ঐ পতির দিকেই কেবল মন ধাবিত হউক। ইহকালে ঐ এক পতি, পরকালে ঐ এক পতি, অনন্তকালের ঐ এক পতি। যুগলসাধনের এই ফল। স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া সাধন করিলে, মন সতী হইয়া পতির অন্বেষণ করে। জন্ম-জন্মান্তরে চিরকাল অনন্তকাল, ঠাকুর, তোমার প্রিয় হব, তুমি আশীর্ব্বাদ করিবে। মানুষের সম্পর্ক নয়, নির্ব্বাণের সম্পর্ক। আমার ক্ষুদ্র প্রেম তোমার প্রেমসমুদ্রে মিশাইবে। হৃদয়ের জ্বালা, অশান্তি ঘুচিবে। ভাইয়ে ভাইয়ে, ভগ্নীতে ভগ্নীতে বিবাদ রহিল না। দেব, চাই দেবত্ব। সতী হইতে চাই। ঐ এক চাই। ভাবিতে ভাবিতে ঐ এক হই। আমাদিগকে সতী করিয়া তোমার ভিতর এক কর। প্রেমময় দীনবন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যুগলসাধনব্রতে ব্রতী হইয়া, শীঘ্র শীঘ্র তোমার ভিতর বিলীন হইয়া, এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে, যথার্থ যোগানন্দ সম্ভোগ করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারি।"

মনে হইতে পারে, কেশবচন্দ্র আপনার পত্নীর সঙ্গে একাত্মা হইয়া, তাঁহার বন্ধুগণকে সে ভূমি হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি যে তাহা করেন নাই, করিতে পারেন না, তাহার নিদর্শনস্বরূপ, এই প্রার্থনার পরদিনের প্রার্থনাটী আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"একাত্মতা"—৩১শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ

"হে দীনজনপ্রতিপালক, হে চিরবসন্ত, লেখা ছিল শাস্ত্রে, একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে, এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে

এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহা নববিধানের তাৎপর্য্য। বিধির এই অভিপ্রায় ছিল, গুরু হউক না হউক, আচার্য্য উপদেষ্টা শ্রেষ্ঠ হউক না হউক, এক জন মধ্যবিন্দুতে দশ জন আকৃষ্ট, দশ জন মিলিত হইবে। যেখানে দশ জন শত জন তোমাতে এক হইবে, সেখানে একটা অবলম্বন চাই। একখানি প্রতিমাতে দশ খানি মূর্ত্তি যদি থাকে, তাহা জলে বিসর্জ্জনের সময় দেখিতে ভাল। গুরু বলে, মধ্যবর্ত্তী বলে মানিতে হয় না; কিন্তু ভগবানের লীলা বলে, অভিপ্রায় বলে এ সব মানিতে হয়। হে পিতা, নববিধানের ব্যবস্থা তুমি এই রকম করিয়াছ। আমরা তাহা মানিলাম না বলিয়া, মিলন হইল না। এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করি। যারা পরস্পরের নয়, তারা আমারও নয়, তোমারও নয়, নববিধানেরও নয়, এ কথা মানিতে হইবে। যাঁরা এক জন হন, তাঁরা তোমার, তাঁরা বিধানের। আমি চাই, হে ভগবান্, সকলে একেবারে তোমার ভিতরে বিলীন হয়ে যায়। দশ দরোজা নাই স্বর্গে, এক দরোজা দিয়া যাইতে হইবে। সপরিবারে সবান্ধবে ভগবানের বুকের ভিতরে প্রেম-সমুদ্রে ডুবিব, মা, আমার এই সাধ ছিল। অনেকে সস্ত্রীক তোমাকে সাধন করিতে করিতে তোমার গাড়িতে যায়। বন্ধুরা একখানা হয়ে, আমার সঙ্গে এক হয়ে, যাবেন তোমার গাড়ী করে। মা, একটি বই দরোজা নাই। সেখানে নববিধান দরোয়ান হয়ে বসে আছেন। প্রবেশ করিতে গেলে জিজ্ঞাসা করেন, প্রাণেশ্বরকে ভালবাস? প্রাণেশ্বরের সন্তানদের ভালবাস? যদি বলি, 'না', প্রবেশ করিতে দেন না। মা, আর কি ভিক্ষা চাহিব? এক শরীর, এক আত্মা হয়ে তোমার ভিতর মিশিতে চাই। ভিন্নতা, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, 'আমি আমি' যেখানে, সেখানে আমার বাপ নাই, আমি সে 'আমি' ভূতের রাজ্যে থাকিতে চাহি না। হে কৃপাসিন্ধু, হে মঙ্গলময়, তুমি আজ কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা সকলে যেন ভূতের দেশ হইতে, স্বাধীনতার ভিন্নতার দেশ হইতে শীঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিয়া, সকলে একপ্রাণ হইয়া, তোমার পবিত্র প্রেমরাজ্যে গমন করিয়া, একাত্মা হইয়া তোমার বুকের ভিতর বিলীন হই।"

কেশবের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের ব্যর্থতা

আমরা একটী কথা বলিয়া, এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিতেছি। কেশব-

চন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধিগণ কত আন্দোলন করিলেন, তাঁহাদের আন্দোলনের আজও শেষ হয় নাই। নিন্দা-অবমাননাসূচক কথায় সংবাদপত্র পূর্ণ করিয়াই যে তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা নহে, গ্রন্থাকারে নিন্দাপ্রচার করিয়া উহার স্থায়িত্বদানে তাঁহারা অলস ছিলেন না। এরূপ অসদ্‌যত্নের কি ফল ফলিয়াছে, তাঁহারা কত দূর ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন, তৎপ্রদর্শন জন্য পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর এবং রেবারেণ্ড জি অস্লেলের পত্রের অনুবাদ আমরা নিম্নে দিতেছি :—

পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের পত্র

"অক্সফোর্ড, ৭ই মে, ১৮৮২ খৃঃ।

"মদীয় প্রিয়বন্ধু।—সংগ্রামের নিবৃত্তিদর্শনে আপনাকে অভিনন্দন করিবার জন্য পুনরায় আপনাকে পত্র লিখিতে, অনেক দিন হইল, আমার অভিলাষ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কার্য্যভূমির জন্য আপনি সংগ্রামভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে আমি নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। আত্মসমর্থনজন্য বিচারবিতর্কে সময়ক্ষয় করা অপেক্ষা আপনার করিবার গুরুতর কার্য্য আছে। প্রচার করিতে থাকুন, শিক্ষা দিতে থাকুন, যত মঙ্গল কার্য্য করিতে পারেন করুন, সর্ব্ববিধ নিন্দাবাদের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তর। আপনি জানেন, আমি আপনাকে তোষামোদ করি না। যখনই মতভেদ হইয়াছে, তখনই আমি পরিষ্কার করিয়া তাহা বলিয়াছি। কিন্তু আপনি পৃথিবীতে যে কার্য্য করিতে আসিয়াছেন, সে কার্য্যসম্বন্ধে আমার অতি উচ্চ ভাব ; সুতরাং আমি আর আপনার নিকটে সে সকল বিষয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা করিব না, যে সকল বিষয়ে আপনি ঠিক হইতে পারেন, আমার ভুল হইতে পারে। না, না, আমরা যখন পরস্পরকে নাও বুঝিতে পারি, তখনও আমাদের পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শেখা উচিত। আপনি পূর্ব্বদেশীয়, আমি পশ্চিমদেশীয়। এক জন আছেন, যিনি জানেন, কে ঠিক, কার ভুল ; তিনি আমাদের অন্তরাত্মা পুরুষ।

"আমাদের বন্ধু ষ্টান্‌লির বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে। আমি তাঁহার অভাব বড়ই অনুভব করি। আপনার প্রতি তাঁহার চির দিন সদ্ভাব ছিল। এক বার তিনি যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতেন, তিনি আর কদাপি তাঁহাকে মন হইতে বিদায় করিয়া দিতেন না। তাঁহার উদ্বেগের কারণগুলি নিয়ত আপনার উদ্বেগের কারণ স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি নিয়ত এই

অভিযোগ করিতেন যে, তাঁহার কাজ এত অল্প হইল যে, মণ্ডলীর উপরে তাঁহার যে প্রভাব ছিল, তাহা তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি কত দূর কি করিয়াছেন, যথার্থ ই তাঁহার প্রভাব কত দূর, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার মৃত্যু তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। আমি ইহা নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, দৃশ্যতঃ আমাদের কত দূর কৃতকার্য্যতা হইল, সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত নয়; দৃশ্যতঃ যদি অকৃতকার্য্যতা দেখা যায়, তাহাতে আমাদের ভগ্নহৃদয় হওয়া উচিত নয়। আমরা কি পারি? সোজা চলিতে পারি—আমাদের সোজা চলা যদি বাঁকা লোকের নিকটে বাঁকা বলিয়া মনে হয়, সে দিকে আমরা কেন মন দিব। যদি আপনি আর কিছু নাও করেন, তবু অনুভব করা উচিত যে, যে মহৎ ভাল কাজ আপনি করিয়াছেন সে কাজ কখন পুনরায় ব্যর্থ হইবার নহে। এই বোধই আপনাকে প্রফুল্ল রাখিবে এবং এই ভাবেই প্রফুল্লমনে ক্রমান্বয়ে কাজ করিবেন।

"আমি আগামী সপ্তাহে ক্যাম্ব্রিজে যাইতেছি। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের বিষয় বক্তৃতা দিতে আহূত হইয়াছি। 'ভারত আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতে পারেন', এই বিষয় আমি মনোনীত করিয়াছি। আশা করি, আপনি এ বিষয়টির অনুমোদন করিবেন। বিশ্বাস করুন,

নিরতিশয় সরলভাবে আপনার

এফ্ মোক্ষমূলর।"

রেঃ জি, পি, অস্লেলের পত্র

"শ্রদ্ধেয় মহাশয়—আমি এই মাত্র 'ব্রাহ্মইয়ার বুকে' আপনার কার্য্যের বৃত্তান্ত দেখিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এ সময়ে তাঁহার দাসকে তাঁহার পবিত্র মন্দির এবং তাঁহার সুন্দর উপাসনা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য উদিত করিয়াছেন। সত্য এবং সৌন্দর্য্যে উহা দৃঢ়মূল হইতেছে। আপনার কার্য্য-সম্বন্ধে নিন্দাবাদ পাঠ করিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি এবং ঐ লেখাই আমার নিকটে উচ্চ প্রশংসা। অনন্ত ঈশ্বর আপনার সৌভাগ্যবর্দ্ধন করুন। আমার নির্জ্জন চিন্তায়, আপনার নিকটে যে ভাব আসিয়াছে, সেই ভাব আসিয়াছে। আমি কিছু দিন পূর্ব্বে যে স্তোত্র বা মন্ত্র লিখিয়াছি, তাহার এক খণ্ড আপনার নিকটে পাঠাইতেছি, ইহাতেই আপনি দেখিতে পাইবেন, কেমন একই ভাব

আমায় পরিচালিত করিতেছে।......ইয়ারবুকপাঠে যাহা জানিতে পাই, তাহা ছাড়া আপনার ভাল ভাল কাজের কিছুই জানি না। আপনার যে মণ্ডলী জাতীয় দেবদেবীগণকে একই সত্যস্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া সকলকেই আলিঙ্গন করে, সেই মণ্ডলীর সহব্যবস্থান যদি কয়েক পংক্তিতে আমাকে বুঝাইয়া দেন, আমি অত্যন্ত বাধিত হইব। এইরূপেই আপনি অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড ভগ্ন কাচ একত্র করিয়া, এক অখণ্ড বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন।

প্রিয় শ্রদ্ধেয় পিতা, অতীব সারল্য সহকারে
আমি আপনার
জি, পি, অস্লেলে।"

২৪

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক উৎসব

উৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে গুটিকয়েক সংবাদ এস্থলে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

বেদবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা

১লা জানুয়ারী (১৮৮৩ খৃঃ), সোমবার, বেদবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা হয়। এতদুপলক্ষে পণ্ডিতবর ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী বৈদিক স্তোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক, বেদাধ্যয়নের ফল কি, তাহা বর্ণন করিয়া বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনও বেদবিদ্যালয়ের প্রয়োজনবিষয়ে কিছু বলেন এবং তাঁহার স্বদেশীয়-গণকে—জাতীয় জীবন, সাহিত্য ও ধর্ম্মের মূল আর্য্যজাতির প্রাচীনলিপি বেদের অধ্যয়নে—অনুরোধ করেন। সর্ব্বশেষে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের প্রধানোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এরূপ প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়সংস্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, যদিও বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সহিত দেশীয় পণ্ডিতগণ ধর্ম্মবিষয়ক মতে ভিন্ন হউন, তথাপি সকলেই তাঁহার নিকটে এজন্য কৃতজ্ঞ হইবেন। পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয়ের বেদে গভীর-জ্ঞানবিষয়ে তিনি প্রচুর প্রশংসা করেন। প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার সায়ঙ্কালে আলবার্টকলেজে দুই ঘণ্টা কাল বিদ্যালয়ের কার্য্য হয়।

নববর্ষের নিবেদন

পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকটে, নববর্ষে কেশবচন্দ্র যে পত্র ৭ই জানুয়ারীর (১৮৮৩ ইং) নববিধান-পত্রিকায় প্রচার করেন, তাহার অনুবাদ * নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রধান জাতি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়, মুষা-ঈশা-বুদ্ধ- কন্‌ফিউসস্‌-জোরেস্তার-মোহম্মদ-ও-নানক-শিষ্যগণ, বিস্তৃত ভারতার্য্য-

* সংস্কৃত অনুবাদ ১৮০৪ শকের ১লা মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

মণ্ডলীর প্রশস্ত বহুশাখা এবং সেই সেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধু, ঋষি, প্রধান ধর্ম্মযাজক, জ্যেষ্ঠ ও আচার্য্য, ইঁহাদিগের নিকটে, ঈশ্বরের ভৃত্য, আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী পবিত্র কলিকাতানগরীস্থ নববিধানমণ্ডলীর প্রেরিতত্বে আহূত শ্রীকেশবচন্দ্রের নিবেদন।

"আপনাদের প্রতি দেবপ্রসাদ ও আপনাদের চিরশান্তি হউক!

"যেহেতুক আমাদিগের পরমপিতার পরিবারে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসংবাদ বিচ্ছেদ ও বৈরভাব বিরাজ করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা সমধিক তিক্তভাব, অসুখ, অপবিত্রতা, অধর্ম্ম, সমর, শোণিতপাত, প্রাণহননাদি উপস্থিত।

"যেহেতুক ধর্ম্মের নামে ভ্রাতৃবিরোধ, ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর, ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার, ভগিনীর প্রতি ভগিনীর বিরোধ কেবল নানা বিরোধের কারণ, তাহা নহে, এটি ঈশ্বর ও মানববিরোধী পাপ।

"এজন্য পুণ্যময় ঈশ্বর পৃথিবীতে শান্তি, প্রেম, মিলন ও একতার শুভবার্ত্তা-প্রেরণের অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

"তাঁহার অপরিমেয় করুণায় প্রাচ্যদেশীয় আমাদের নিকটে তাঁহার নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির নিকটে ইহার সাক্ষী হইবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন।

"ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন:—'আমার নিকটে সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত ঘৃণিত, আমি ভ্রাতৃবিরোধ সহ্য করিব না।

"'আমি প্রেম ও একতা চাই, আমি যেমন এক, তেমনি আমার সন্তানগণ একহৃদয় হইবে।

"'কালে কালে মহাজনগণের মধ্য দিয়া আমি কথা কহিয়াছি। যদিও আমার বিধান বহু, তথাপি তন্মধ্যে একতা আছে।

"'কিন্তু এই সকল মহাজনগণের শিষ্যেরা পরস্পর বিবাদ ও সংগ্রাম করিয়াছে, পরস্পর ঘৃণা করিয়াছে, এক অপরকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে।

"'তদ্দ্বারা তাহারা দিব্যধাম হইতে আগত বার্ত্তাসমূহের একতা বিস্মৃত হইয়াছে। যে বিজ্ঞানে উহাদিগের একতাবন্ধন হয়, সে বিজ্ঞান তাহাদিগের চক্ষু দেখিতে পায় না, হৃদয় স্বীকার করে না।

"'মানবগণ, শ্রবণ কর; তানলয় একই অথচ বাদনযন্ত্র বহু, দেহ একই অথচ

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহু, আত্মা একই অথচ প্রতিভা বহু, একই শোণিত অথচ জাতি বহু, একই মণ্ডলী অথচ মণ্ডলী বহু।

"'সেই সকল শান্তি-সংস্থাপকেরা ধন্য, যাহারা সকল ভেদ মিলনে পরিণত করে, ঈশ্বরের নামে শান্তি, শুভকামনা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে।'

"আমাদের প্রভু ঈশ্বর এই সকল কথা আমাদিগকে কহিয়াছেন, এবং আমাদিগের নিকটে অতি আনন্দকর নবীন শুভবার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন।

"এই দেশে তিনি এই সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সমুদায় শাস্ত্র, সমুদায় মহাজন সুষমসমাধানে মিলিত হইয়াছেন।

"আমায় এবং আমার প্রেরিতভ্রাতৃগণকে প্রেমময় পিতা পৃথিবীর সমস্ত জাতির নিকটে এই শুভসংবাদ ঘোষণা করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, সকলে একশোণিত একবিশ্বাস হইয়া ঈশ্বরেতে আনন্দিত হউক।

"এইরূপে সমুদায় বিসংবাদ তিরোহিত হইবে, সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করিবে, স্বয়ং ঈশ্বর ইহা বলিয়াছেন।

"হে ভ্রাতৃগণ, এই বিশ্বজনীন নবীন সংবাদ আপনারা গ্রহণ করুন, আমি বিনীতভাবে আপনাদিগকে এই নিবেদন করিতেছি।

"ঘৃণা করিবেন না, কিন্তু আপনারা পরস্পরকে প্রীতি করুন; পিতা যেমন এক, তেমনি আপনারা সত্যেতে এবং ভাবেতে এক হউন।

"যে কোন জাতি বা মণ্ডলীমধ্যে ভ্রম এবং অপবিত্রতা আছে দেখিতে পান, সে সমুদায় আপনারা পরিহার করুন; কিন্তু কোন শাস্ত্র, কোন মহাজন, বা কোন মণ্ডলীকে ঘৃণা করিবেন না।

"সর্ব্ববিধ কুসংস্কার, ভ্রম, অবিশ্বাস, সংশয়, পাপ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিহার করুন এবং পূত ও পূর্ণ হউন।

"ঈশ্বরের জন বলিয়া আপনারা প্রতিসাধু, প্রতিমহাজন, এবং প্রতিধর্ম্মার্থনিহতব্যক্তিকে প্রীতি ও সম্ভ্রম করুন।

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান আপনারা সংগ্রহ করুন এবং সকল কালের সাধুগণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ ও আত্মসাৎ করুন।

"এইরূপে পুরুষোত্তমজনগণের অতি প্রমত্ত ভক্তি, গভীরতম যোগ, স্বার্থ-

নাশকর গাঢ় বৈরাগ্য, প্রোৎসাহপূর্ণ হিতৈষণা, সুদৃঢ় ন্যায় ও সত্য এবং উচ্চতম সত্য ও পবিত্রতা আপনাদের হউক।

"সর্ব্বোপরি আপনারা পরস্পরকে ভালবাসুন এবং আপনাদের সর্ব্বপ্রকারের ভিন্নতা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিসর্জ্জন দিন।

"প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আপনারা আমাদের প্রেম গ্রহণ করুন, আপনাদের প্রেম আমাদিগকে দিন এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম একহৃদয় হইয়া নববিধানের আনন্দগীতি সঙ্গীত করুন।

"এসিয়া এবং ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা বিবিধ বাদনযন্ত্রে নববিধানের প্রশংসা করুন, এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগণের ভ্রাতৃত্ব গান করুন।"

[ইউরোপ ও আমেরিকা, ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া, চিন ও জাপানের প্রধান প্রধান পত্রিকা-সম্পাদক এই লিপি তাঁহাদের সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিবেন, বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করা যাইতেছে।]

নববর্ষের শুভবার্ত্তা-সম্বন্ধে মতামত

এই নিবেদনানুসারে এ দেশের ইংরেজ সম্পাদকেরা নিজ নিজ পত্রিকায় পত্রখানি মুদ্রিত করেন এবং তাঁহাদিগের কেহ ইহাকে গ্রহণ, কেহ ইহাকে আধ্যাত্মিক অভিমানের উন্মত্ততায় পরিণতি, কেহ ইহাকে নববিধানে ও নবনৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্য গীতি, কেহ ইহাকে অন্তঃসারশূন্য সার্ব্বভৌমিকতা বলিয়া উপহাস করেন। বিদেশের পত্রিকায় যে ইহার বিপরীত ভাব প্রদর্শিত হইবে, তাহা অতি স্বাভাবিক। নিউইয়র্কের 'খ্রীষ্টান ইউনিয়ন' এই পত্রের ভিতরে 'বহুল পরিমাণ সুন্দর চিন্তা ও ভাব' দর্শন করেন। ইউনাইটেডষ্টেটস্থ পেন্নসিল্‌বানিয়ার উইলিয়ম কডবিল্ এই পত্রের ভাবে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—মহর্ষি ঈশার জন্মকালে দেবদূতগণ যে শান্তিগীত গান করিয়াছিলেন, নববিধান সেই গীতের ভাবে পূর্ণ, ইহা দেখিয়া তিনি আনন্দিত। ফিলেডেল্‌ফিয়া হইতে মেস্তর হেনরি পিটার্সন্ পূর্ণহৃদয়ে এই পত্রের অনুমোদন করিয়া পত্র লিখেন।

মেজর টকারের সহধর্ম্মিণী সহ কমলকুটীরে আগমন

এদেশে মুক্তিসৈন্যদলের অধিনায়ক সপত্নীক কমলকুটীরে আগমন করেন। সেই সংবাদটি ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা মাঘ, ১৮০৪ শক) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে:—"মুক্তিসৈন্যদলের ভারতবর্ষস্থ অধিনায়ক মেজর টকার সাহেব

এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী গত সোমবার (২৫শে পৌষ, ১৮০৪ শক) (৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ) সন্ধ্যার সময় কমলকুটীরে আগমন করিয়া অনেকক্ষণ প্রচারকদিগের সঙ্গে কথোপকথন ও গানবাদ্যাদি করিয়াছিলেন। ইহাদের জীবন অতি উচ্চ, ইহারা বৈরাগ্য দীনতা বিনয় ক্ষমার দৃষ্টান্তস্বরূপ। মিসেস্ টকারের উৎসাহ ও প্রেম আশ্চর্য্য। তিনি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ঘাঘরা পরেন, তাঁহার মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র চাদর দ্বারা আবৃত ও কেশ ছিন্ন, তিনি ধর্ম্মপ্রচারে সর্ব্বাপেক্ষা সুনিপুণা। কোচবিহারের মহারাণী ও তাঁহার মাতা, এবং অপর কতিপয় ব্রাহ্মিকা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মেজর টকারের পরিধানে ইজার চাপকান ও মস্তকে উষ্ণীষ, স্কন্ধে পীত উত্তরীয়। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী আচার্য্যমহাশয়ের প্রদত্ত মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়াছিলেন। মেজর টকার সাহেব পূর্ব্বে একজন সিভিলিয়ান ও পঞ্জাবের ডিপুটী কমিসনর ছিলেন, এইক্ষণ তাঁহার ভিক্ষান্ন উপজীবিকা। তাঁহার পত্নী আচার্য্য মহাশয় হইতে একটি কাষ্ঠের কমণ্ডলু চাহিয়া লইয়াছিলেন।”

১লা মাঘ—‘আরতি’

১৮ই পৌষ (১৮০৪ শক) (১লা জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ), সোমবার হইতে ২৯শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী) শুক্রবার পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বৎসরানুরূপ উৎসবের আরম্ভসূচক উপাসনা হয়। ১লা মাঘ হইতে উৎসবের বিবরণ আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০৪ শক) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—“১লা মাঘ (১৮০৪ শক) (১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ), শনিবার ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। এই উদ্ঘাটনে, আরতি সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। আকাশব্যাপী ঈশ্বরের মহতী সত্তা আরতির বিষয়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পরব্রহ্মের আরাধনা সাধারণতঃ প্রচলিত। আরতির দিনে নেত্র উন্মীলন করিয়া বিস্তৃত আকাশে ঈশ্বর-দর্শন। যোগ অপূর্ণ, যদি কেবল অন্তরে বদ্ধ থাকে, বাহিরে আসিয়া আপনার অধিকার বিস্তার না করে। আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি কতক্ষণের জন্য ? যদি এককালে অধিক সময়ের জন্য হয়, তবে আড়াই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা। অবশেষ সময় আমাদিগের চক্ষু খুলিয়াই অতিবাহিত হয়। এই চক্ষু খোলার অবস্থাতে যদি আমরা ব্রহ্মহীন হইয়া অবস্থান করি, তবে আমাদিগের ব্রহ্মভক্ত উপাধি গ্রহণ কি প্রকারে সম্ভবে ?

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র যদি ইষ্টদেবের অধিষ্ঠান উপলব্ধ না হইল, তবে ভক্তি প্রেম অবশ্য সঙ্কোচাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় আরতির জন্য বেদীতে আসীন হইলেন, উন্মীলিতনয়নে ব্রহ্মের আরতি আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরের বিরাট্ মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ পাইল। সেই মহতী মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া, হৃদয়ের বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম-পুণ্য-প্রদীপ লইয়া, তাঁহার আরতি করিতে লাগিলেন। আরতিতে বাহিরের কোন উপকরণ ছিল না, সকলই ভিতরের। ঈশ্বরের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-দর্শনে তাঁহার মুখশ্রী এরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, স্বর এরূপ গম্ভীর হইয়াছিল, বাক্যসমূহ এমন মহৎ ভাব প্রকাশ করিতেছিল যে, সে সময় যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন না, বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের নিকটে সে ছবি চিত্রিত করিয়া সমুপস্থিত করা একেবারে অসম্ভব। আমরা প্রতিবৎসর এখানে আমাদিগের অসামর্থ্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না; এই অসামর্থ্যই যেন, যাঁহারা আরতির ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে ব্যগ্র, তাঁহাদিগকে স্বচক্ষে ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, ব্রহ্মমন্দিরে আনিয়া তৎকালে উপস্থিত হইতে প্ররোচিত করে। আরতির পূর্ব্বে পৃথিবীর সমুদায় জাতির প্রতি আচার্য্য মহাশয়ের নিবেদন ইংরেজী, সংস্কৃত, উর্দ্দু ও বাঙ্গলা ভাষায় পঠিত হয়। ১লা মাঘ হইতে পারিবারিক উপাসনাগৃহে প্রতিদিবস উপাধ্যায় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত জিজ্ঞাসাগুলি পঠিত হয়, সমবেত সাধকগণ অন্তরে অন্তরে তাহার প্রত্যুত্তর দান করেন।

'নববিধানের আদর্শ মনুষ্য'

"উপাসকমণ্ডলী প্রত্যেকে বলুন:—

"আমি নারীকে ব্রহ্মকন্যা জানিয়া প্রীতি এবং সম্মান করি এবং তৎসম্বন্ধে কোন অপবিত্র চিন্তা বা ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করি না।

"আমি আমার শত্রুদিকে প্রীতি এবং ক্ষমা করি, এবং উত্যক্ত হইলে রাগ করি না।

"আমি অপরের সুখে সুখী হই এবং হিংসা বা ঈর্ষা করি না।

"আমি নম্রস্বভাব, আমার অন্তরে কোন প্রকার অহঙ্কার নাই। কি পদের অহঙ্কার, কি ধনের অহঙ্কার, কি বিদ্যার অহঙ্কার, কি ক্ষমতার অহঙ্কার, কি ধর্ম্মের অহঙ্কার।

"আমি বৈরাগী, আমি কল্যকার জন্য চিন্তা করি না। পৃথিবীর ধন অন্বেষণ করি না, স্পর্শ করি না; কেবল যাহা বিধাতার নিকট হইতে আইসে, তাহা গ্রহণ করি।

"আমি সাধ্যানুসারে স্ত্রী পুত্রদিগকে ধর্ম্ম ও উপাসনা শিক্ষা দি।

"আমি ন্যায়বান্ এবং প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য প্রদান করি। দ্রব্যাদির মূল্য এবং লোকদের বেতন যথাসময় দিয়া থাকি।

"আমি সত্য বলি এবং সত্য ভিন্ন কিছু বলি না। সকল প্রকার মিথ্যা আমি ঘৃণা করি।

"আমি দরিদ্রদিগের প্রতি দয়ালু এবং দুঃখমোচনে ব্যাকুল; আমি সঙ্গতি অনুসারে দাতব্যে দান করি।

"আমি অপরকে ভালবাসি এবং মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনে সর্ব্বদা যত্ন করি। আমি স্বার্থপর নই।

"আমার হৃদয় ঈশ্বর এবং স্বর্গীয় বিষয়েতে সংস্থাপিত, আমি সংসারাসক্ত নহি।

"আমি প্রত্যেক প্রেরিত ভ্রাতাকে আপনার বলিয়া খুব ভালবাসি এবং সম্মান করি এবং এই দলমধ্যে ঐক্য-স্থাপনের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যাকুল ও যত্নবান্।

"প্রতিদিন উপাসনাস্থলে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক এইটি যে পঠিত হয়, ইটি 'নববিধানের আদর্শ মনুষ্য'। নববিধানবাদী প্রত্যেক সাধকের এই আদর্শে জীবন গঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা নববিধানবাদী বলিয়া পরিগণিত হওয়া অসম্ভব। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের ভ্রাতৃমণ্ডলী যে কোন স্থানে আছেন, সেখানে প্রতিদিন উপাসনাকালে এই 'আদর্শ নববিধান মনুষ্য' পঠিত হইয়া, তদনুরূপ জীবন-গঠনে সর্ব্বতোভাবে যত্ন হইবে।

২রা মাঘ—দুই বেলা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা

"২রা মাঘ (১৪ই জানুয়ারী), রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে দুই বেলা উপাসনা হয়। প্রাতঃকালে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সায়ঙ্কালের উপদেশের বিষয় 'উৎসবে উজ্জীবন-লাভ'।

৩রা মাঘ—'বন্ধুসম্মিলনসভা'

"৩রা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী), সোমবার, বন্ধুসম্মিলনসভা। ভাই উমানাথ

গুপ্ত এই সভার কার্য্য আরম্ভ করেন, আচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয়। এই সভাতে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্ব এ দুইয়ের প্রভেদ অতি সুন্দররূপে বিবৃত হয়। ভাই আমাদিগের সকলেই, কিন্তু বন্ধু বলিতে পারি, এরূপ ব্যক্তি আমাদিগের অতি অল্পসংখ্যক। বন্ধু বলিতে গেলে, সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি যায়। এমন লোক নাই, যে তাঁহাকে দীনবন্ধু না বলিয়া থাকে। ঈশ্বর আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসভাজন। যিনি আমাদিগের বন্ধু হইবেন, তিনি সকল বিষয়ে আমাদিগের বিশ্বাসভাজন হইবেন। ধন, জন, পরিবার, দেহ, প্রাণ, কিছুই তাঁহাকে দিয়া আমরা তিলমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারি না; যেখানে অণুমাত্র অবিশ্বাস আসিল, সেখানে আর বন্ধুতা রহিল না। বন্ধুতা একান্ত সহানুভূতিময়। ঈশ্বর আমাদিগের সুখ দুঃখের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে যেমন পারেন, এমন আর কে পারে? পৃথিবীর বন্ধু সর্ব্বথা সহানুভূতিতে আমাদের সঙ্গে এক হইবেন, তবে তিনি বন্ধু। সুতরাং বন্ধু অতি দুর্ল্লভ। সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি, যাহার পৃথিবীতে ঈদৃশ একটি বন্ধুও আছে। ভ্রাতৃত্বের ভূমি অতি বিস্তৃত, এই বিস্তৃত ভূমির মধ্য হইতে যদি এক জন বন্ধুও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সমুদায় অবস্থায় অতীব বিশ্বস্ত সহানুভূতিময় হৃদয়বন্ধু হয়েন, তবে এই পৃথিবীতেই স্বর্গের শোভা ও সুখ অনুভূত হয়।

৪ঠা মাঘ—'দরবার'

"৪ঠা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী), মঙ্গলবার, দরবার। দরবারের কার্য্য ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু এবং ভাই কেদারনাথ দে কর্ত্তৃক আরব্ধ হয়, আচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক পরিসমাপ্ত হয়। পরস্পর পরস্পরকে সহানুভূতি অর্পণ করিলে কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হয়, সুতরাং সহানুভূতির প্রয়োজন; ইহার বিপরীতে এই কথা হয় যে, যদি কাল জমীর উপরে সাদা পদ্মফুল জন্মায়, দুঃখে নৃত্য হয়, তবে জানা যায় যে, যাহা কিছু হইতেছে, খাটি। সুখ, ক্রমান্বয়ে সুখ না হইলে, ধ্যানাদি হয় না, একথা কিছুই নয়। যদি কেহ বলেন, আমি প্রেম না দিলে প্রেম দিব না, এই সীমার মধ্যে আমি প্রেমকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম, তবে জানিতে হইবে, সেখানে গভীরতম প্রেম নাই। গভীরতম প্রেম হৃদয়ের গভীরতম নিম্ন স্থানে স্থিতি করে। সুতীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী

বাণ হৃদয়কে বিদ্ধ না করিলে, সে প্রেম কখন বাহিরে প্রকাশ পায় না। জুডাস শিষ্য হইয়া ঈশার প্রাণবধের কারণ হইল, ইহা অপেক্ষা মর্ম্মভেদী ব্যাপার আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই ঘটনা হইল বলিয়া, ঈশার জগতের প্রতি প্রেম সর্ব্বজনবিদিত হইয়া পড়িল। ঈশার প্রতি যখন এরূপ হইল, তখন আমরা কে যে আশা করিব, আমরা সর্ব্বদা কেবল সহানুভূতিই সকলের নিকট হইতে লাভ করিব। হইতে পারে যে, আমাদিগের অতি নিকটস্থ বন্ধু আমাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশের কারণ হইতে পারেন। এজন্য আমাদিগের সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। প্রেম কোন দিন নির্য্যাতনে খর্ব্ব হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তির স্থির সঙ্কল্প এই যে, নির্য্যাতন সহ্য করিব এবং নির্য্যাতনের বিনিময়ে প্রেম দিব, তাহার সম্বন্ধে কখন নির্য্যাতন থাকে না। অনেক সময়ে পরস্পরকে শাসন করিবার কথা হয়, কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, এখানে প্রেমের শাসন ভিন্ন অন্য কোন শাসন নাই। যে বিষয়ে ঈশ্বর আমাদিগের আদর্শ, সে বিষয়ে অন্য কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এ বিধির ব্যতিক্রম করিতে পারা যায় না। ঈশা অত্যাচারের বিনিময়ে ক্ষমা ও প্রেম প্রদর্শন করিলেন, ইহা তাঁহার পিতারই অনুরূপ। প্রেমিক চৈতন্য গুরুতর অপরাধে ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিলেন, সে ব্যক্তি এক বৎসর কাল পুনর্গৃহীত না হইয়া, পরিশেষে ত্রিবেণীতে আত্মবিসর্জ্জন করিল। এস্থলে দৃশ্যতঃ এ বিধির ব্যতিক্রম প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু জানা আবশ্যক যে, আঘাত দুই প্রকার আছে। এক আঘাত ক্রোড়ের দিকে টানিয়া আনে, আর এক আঘাত ক্রোড় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। প্রথমোক্ত আঘাত প্রেমিকগণের, দ্বিতীয় প্রকার আঘাত অপ্রেমিক জনের। ফল কথা এই, প্রেম সহানুভূতি অসহানুভূতি, আলিঙ্গন অত্যাচার, সুখ দুঃখ, এ সকলের নিরপেক্ষ। বরং দুঃখ ক্লেশের অবস্থায় প্রেম উথলিত হয় বলিয়া, দুঃখকে সাধক মাতা বলিয়া জানেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে এই জন্য অণুমাত্র সাহস করেন না।

৫ই, ৬ই, ৭ই মাঘ—প্রান্তরে বক্তৃতা, নববৃন্দাবনাভিনয়, ব্রাহ্মিকাগণের সভা

"৫ই মাঘ (১৭ই জানুয়ারী), বুধবার, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রান্তরে বক্তৃতা। ভাই অমৃতলাল বসু, ভাই দীননাথ মজুমদার, কাণপুরের ভ্রাতা

ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, উড়িষ্যার ভ্রাতা ভগবান্‌চন্দ্র দাস, পঞ্জাবী ভ্রাতা লালা কাশীরাম, ইহারা স্ব স্ব দেশের ভাষায় সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করেন। এক এক বার এক একজনের কথার বিরামে সঙ্কীর্ত্তন হইয়া সে দিনের কার্য্য শেষ হয়। ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয়, ৭ই মাঘ শুক্রবার ব্রাহ্মিকাগণের সভা ও সৎপ্রসঙ্গ।

৮ই মাঘ—টাউনহলে ইংরেজী বক্তৃতা

"৮ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী), শনিবার, টাউনহলে আচার্য্য মহাশয়ের ইংরাজী (শেষ) বক্তৃতা হয়। বিষয়—'ইউরোপের প্রতি আসিয়ার নিবেদন'। বৎসর বৎসর যে প্রকার শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে টাউন-হলাপেক্ষা প্রশস্ততর স্থান হইলে শ্রোতৃবর্গের সুখকর হয়। আমরা বক্তৃতার সারাংশ দেশীয় ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম, ইহা দ্বারা পাঠকবর্গ কথঞ্চিৎ এবারকার মূল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

"আসিয়া এবং ইউরোপস্থ ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণ—কোথা হইতে সেই সকল দুঃখের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, যাহা শুনিয়া দেশানুরাগী জনের হৃদয় গভীর ব্যথায় ব্যথিত? যেন সমুদায় জাতি অত্যাচারের কশাঘাতে যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, এবং হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে দুঃখের রোদনাবেদন প্রেরণ করিতেছে। অতি বিস্তৃত ক্রন্দনধ্বনি আকাশে উত্থিত হইতেছে, এবং আকাশের চারি পক্ষপুট চারি দিকে লইয়া যাইতেছে এবং যখন উহারা এই দুঃখের সংবাদ অর্পণ করে, তখন প্রত্যেক সহৃদয় চিত্তের তার স্পর্শ করে এবং প্রতীত হয়, যেন উহারা প্রত্যেক ব্যক্তি এবং জাতির নিকটে সহানুভূতি ও সহায়তা যাচ্ঞা করিতেছে। কে রোদন করিতেছে? তোমরা কি শুনিতেছ? ভারতবর্ষ রোদন করিতেছে, আসিয়া রোদন করিতেছে। আহা, পূর্ব্বদিকের সেই মধুর স্বর্গীয় দূত, যাহার সৌন্দর্য্যে যেন দিব্যধামের বর্ণ সমুদায় সংমিশ্র হইয়াছে, আরক্ত কপিলবসনে ভূতলে শোণিতাক্ত কারা-বাসী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! আসিয়ার দুঃখের উচ্চতা গভীরতা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কে পরিমাণ করিতে পারে? তাহার শান্তি নাই, সে কোন সান্ত্বনা দেখিতে পায় না। আসিয়ার বিলাপের বিষয় কি? ইউরোপের উদ্ধত সভ্যতার সাংঘাতিক আক্রমণ, যাহাতে তাহার হৃদয়ে শোক, তাহার নিষ্কলঙ্ক নামে

কলঙ্ক, তাহার সমুদায় চিরপোষিত সদনুষ্ঠানসমূহে মৃত্যু আনয়ন করিয়াছে। ইউরোপে অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন যে, ইউরাইল পর্ব্বতের ইউরাইল নদীর অপরদিকে দূরতর প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে জনস্থান নৈতিক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, পূর্ব্বভাগের মানবমণ্ডলী গভীর কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের ত্বকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, আসিয়ার ভূমি পাপ ও দুরাত্মতা, অন্ধকার ও অন্ধতামিস্র ভিন্ন আর কিছুই উৎপাদন করে না। উহারা সহোদরার ন্যায় সমুদায় ভূমির উপরে আপনার ভয়ঙ্কর অধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাহারা বলে, আসিয়া কুৎসিত কলঙ্কিত নারী, অপবিত্রতা এবং অবিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ। উহার ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় অসত্য প্রতিপাদন করে, উহার সমুদায় মহাজন প্রতারক, উহার সমুদায় জনমণ্ডলী—স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা—সকলেই অসত্যবাদী এবং বঞ্চনাপরায়ণ। আসিয়াতে না আছে আলোক, না আছে শুদ্ধতা। সমুদায় মূর্খতা, অসভ্যতা, এবং অবৈধ ধর্ম্মে পূর্ণ, এবং বলে, এই অভিশপ্ত দেশ হইতে ভাল কিছুই আসিতে পারে না। এই ভাবে, এই বিবেচনায় ইউরোপ বহু বর্ষ যাবৎ আসিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে, এবং চির শত্রুর ন্যায় পূর্ব্বভাগের সীমান্ত ভূমি পর্য্যন্ত লুণ্ঠন বিস্তার করিয়াছে। ঘোরতর শোণিতপাত এবং মৃত্যুকর এই সমর চলিতেছে, এবং সত্যই বিগ্রহের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। পূর্ব্ব-বিভাগের সমুদায় জাতি মধ্যে উহা শোচনীয় বিনাশ আনয়ন করিয়াছে, প্রবল জলপ্লাবনের ন্যায় ইহার প্রাচীন গৌরব ও মহত্ত্ব সমুদায় বিলোপ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এখনও সংগ্রাম অপরিসীম রোষে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। ইউরোপ, এখনও কেন তোমার চক্ষু অপরিতর্প্য হিংসা এবং ক্রোধাবেশে ঘুরিতেছে, যেন তুমি আসিয়াকে এককালীন ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প? রজনী অবসান হইয়াছে এবং উষার আলোক সমরক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্য প্রদর্শন করিতেছে। ইউরোপ, তুমি কি দেখিতেছ না, কি ভয়ানক পরিমাণে তুমি জাতীয় বিনাশকার্য্য সাধন করিয়াছ? এখানে আমাদিগের দৃষ্টির সন্নিধানে কি হৃদয়বিদারক হত্যা ও শোণিতপাত, দুঃখ ও পতন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আহা কি দুঃখ! ইউ-রোপের বলপ্রয়োগপরায়ণ সভ্যতাশতঘ্নী সম্মুখে, পূর্ব্ববিভাগের শাস্ত্র ও মহাজন, ভাষা এবং সাহিত্য, এমন কি আচার ব্যবহার, সামাজিক এবং গৃহ্য বিধান, সমুদায় পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার নিষ্ঠুর মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত। পূর্ব্ববাহিনী এবং

পশ্চিমবাহিনী নদী সকল শোণিতে আরক্ত। অনেক হইয়াছে, ইউরোপ, এখন থাম, শোণিতপাতের ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হও। আর সংগ্রাম নয়, এই তোমার সম্মুখে আমি নববিধানের পতাকা ধারণ করিতেছি, ইহা শস্ত্রপরিহার এবং সম্মিলনের পতাকা। আর সমর নহে, এখন হইতে শান্তি এবং সদ্ভাব, ভ্রাতৃভাব এবং বন্ধুত্ব। এই ভর্ৎসনার স্বর নীচ অকৃতজ্ঞতার স্বর নহে। ইউরোপ যে সকল ভাল করিয়াছে, যে সকল বাহ্য এবং আন্তরিক উপকার অর্পণ করিয়াছে, সে সকলের জন্য আসিয়ার আমরা অতীব কৃতজ্ঞ। তাহার বিজ্ঞান এবং সাহিত্য, তাহার বাণিজ্য এবং ব্যবসায়, তাহার রাজনীতি এবং ধর্ম্ম, আমাদিগকে মূর্খতা ভ্রম হইতে রক্ষা করিয়াছে; আমাদিগকে আলোক, স্বাধীনতা ও আনন্দ বিতরণ করিয়াছে এবং সমুদায় আসিয়াকে চিরবাধ্যতাপাশে বদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ইউরোপ, তুমি এক হস্তে জীবন, অপর হস্তে মৃত্যু অর্পণ কর। তোমার সভ্যতা আশিষ সপ্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু যে পরিমাণে উহা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের জাতীয় ভাব বিনষ্ট করে এবং পূর্ব্বভাগে যাহা কিছু আছে, সমুদায় ধ্বংস করিয়া ইউরোপীয় করিতে চায়, উহা আমাদিগের পক্ষে অভিশাপ। এ জন্যই আমি আসিয়ার দোষাপনয়ন করিব। হাঁ, আমিই করিব, কেন না আসিয়ার সন্তান, তাহার দুঃখ আমার দুঃখ, তাহার আনন্দ আমার আনন্দ। এই ওষ্ঠাধর আসিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবে। বিশ্বস্ত অনুগত দাস, অনুরক্ত পুত্রের ন্যায় আমার পিতৃভূমির সেবা করিব। আমি যখন শিশু ছিলাম, শিশুর ন্যায় কথা বলিতাম, শিশুর ন্যায় বুঝিতাম, শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম। এখন আমি মানুষ হইয়াছি, এখন শৈশবের সমুদায় পরিহার করিতেছি। সময়ে আমি ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় কলিকাতার সেবা করিয়াছি; আমার সেবা ও সহানুভূতি এই রাজধানীর সীমামধ্যে আবদ্ধ ছিল। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, ক্ষুদ্র শিশু ক্রমে বালক হইল এবং আমি প্রশস্তহৃদয়ে প্রশস্ত সহানুভূতিতে বঙ্গদেশের সেবা আরম্ভ করিলাম। যখন বাল্যকাল যৌবনে প্রবিষ্ট হইল, সমুদায় ভারতবর্ষের জন্য আমি দণ্ডায়মান হইলাম। এ সময়ে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কিছু আমার উচ্ছ্রিত আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিত না, এবং ঈদৃশ বিস্তৃত প্রচারক্ষেত্রে আমি আনন্দকর কার্য্য লাভ করিলাম। এখন মনুষ্যত্বের প্রারম্ভে, প্রভু আমায় তদপেক্ষা উচ্চতর

এবং বৃহত্তর সেবকত্বে আহ্বান করিয়াছেন। সমগ্র মহাদেশের কিসে লাভ হয়, তাহা প্রদর্শন এবং অভাব-পরিপূরণের জন্য আমি আহূত হইয়াছি। আসিয়ার সেবক এবং প্রবক্তা হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াতে, আমার উন্নত পদবীর অভিমান অনুভব করিতেছি। আসিয়ার হইয়া, এক মহারাজ্যের প্রতিনিধি হইয়া, আমি এমন অনুভব করিতেছি, যেমন কখন করি নাই, কেবল ভারতবর্ষীয় হইয়া কখন অনুভব করিতে পারি না। আসিয়ার এক সীমান্ত হইতে অন্য সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রশস্ত গৃহ, প্রশস্ত জাতীয় ভাব, এবং বিস্তৃত আত্মীয়তার গর্ব্ব আমি করিতে পারি। আমি কেবল উচ্চতর প্রশস্ততর ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহা নহে, আমি পবিত্র ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়াছি। আসিয়া কি বড় বড় ঋষি মহাজনের জন্মভূমি নয়? অবশেষে পৃথিবীর পক্ষে কি ইটি সর্ব্বপ্রধান পবিত্র তীর্থসমাগমের স্থান নহে? হাঁ, তাঁহারা আসিয়ার ভূমিতেই আবির্ভূত এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, যাঁহাদিগের পদতলে পৃথিবী ভূমিষ্ঠ হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। যে ধর্ম্মে লক্ষ লক্ষ লোককে জীবন ও পরিত্রাণ প্রদান করিয়াছে, তাহা আসিয়াতেই সর্ব্ব প্রথমে অভ্যুদিত হইয়াছে। আমার নিকটে আসিয়ার ধূলি স্বর্ণরৌপ্যাপেক্ষা মূল্যবান্। নিশ্চয়ই আসিয়াতে যে ভূমির উপরে আমরা পদনিক্ষেপ করি, তাহা অতি পবিত্র। পূর্ব্বভাগ সর্ব্বতোভাবে পবিত্রভূমি? কিন্তু আসিয়া কেবল পবিত্র ভূমি নহে, ইহা উদারতার ক্ষেত্র। এই এক স্থানে তোমরা সমুদায় প্রধান মহাজন এবং পৃথিবীর ধর্ম্মসম্পর্কীয় সমুদায় মহানুভাব মনীষিগণকে গণনা করিতে পার। আসিয়ার সীমার বহির্ভূত স্থানে কোন বড় মহাজন জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইটি কি একটি বিশেষ গণনার বিষয় নহে? পৃথিবীতে যত ধর্ম্মমণ্ডলী আছে, আসিয়া তাহার গৃহ। ইহা কেবল কোন একটি ধর্ম্মবিশ্বাসের অবস্থিতি-স্থান নহে। ইহা কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নহে। য়িহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, সকলেই আসিয়াকে সাধারণ গৃহ স্বীকার করে। আসিয়ার ভাব সার্ব্বভৌমিক, উদার, এবং সর্ব্বান্তর্ভাবক; পক্ষপোষক, একদেশদর্শী বা সাম্প্রদায়িক নহে। আসিয়ার অধমতম শত্রুও সঙ্কীর্ণবহিষ্কারক ভাব তাহার বিশেষণ করিতে পারে না। আসিয়াই পূর্ব্ব পশ্চিমের সমুদায় ধর্ম্মমণ্ডলীকে ক্রোড়ে লালন পালন, প্রতিপোষণ এবং স্তন্যদান করিয়াছে। কেমন সর্ব্বতোমুখী

তাহার মনীষা, কেমন বিবিধ তাহার ঈশ্বরদত্ত গুণ, কেমন বিস্তৃত তাহার সহানুভূতি, কেমন সর্ব্বান্তর্ভাবক তাহার স্বভাব, কেমন মহত্তম তাহার স্তন, যাহা এতগুলি অতীব ভিন্ন ভিন্ন মত ও মণ্ডলীকে স্তন্যদান করিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম-হিন্দুধর্ম্মের মাতা, পৃথিবী তোমাকে মহীয়সী করিতেছে, এবং তোমার অনুপম ঔদার্য্যের সম্মাননা করিতেছে। তুমিই ঈশা, বুদ্ধ এবং জোরেস্তারকে ধাত্রী হইয়া লালন পালন করিয়াছ। সত্যই আসিয়ার ভাবে সমুদায় সম্প্রদায় এক হইয়া যায়। ইংলণ্ডে ওয়েষ্টমিনেষ্টার আবি সম্বন্ধে ঠিক বলা হইয়াছে, উহা মৌনভাব এবং সম্মিলনের মন্দির, যন্মধ্যে বিংশতি পুরুষের শত্রুতাও সমাধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষমা লাভ করে। ইহার পবিত্র তোরণশ্রেণী মধ্যে, মৃত্যুর গম্ভীর মৌনভাব মধ্যে শান্তিদেবী বাস করেন। ইহা সত্য যে, ইংলণ্ডের বড় বড় লোক সমুদায় পার্থক্য, মত ও বিশ্বাসের প্রভেদ বিস্মৃত হইয়া কুশলে নিদ্রিত। ওয়েষ্টমিনেষ্টার আবিতে যাঁহারা শয়ান, তাঁহাদিগের মধ্যে শুভ একতা আছে। কিন্তু ইহা সমাধি-স্থানের একতা, জন্মস্থানের নহে। ইহা মৃত্যুর একতা, জীবনের নহে। আসিয়া উচ্চতর একতার অভিমান করেন। ইহা জ্ঞাতিত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের একতা। ইহা সাধারণ গৃহ, স্বজাতীয় আত্মা সকলের নিকট সম্বন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন আকারে জাতীয় মত-বিশ্বাসে সহযোগিত্বের একতা। এস্থান সেস্থান নয়, যেখানে মৃত্যুর পর সকলে একত্রিত হন, যেখানে বিভিন্ন মত, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমাধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ সেই স্থান, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন মত, ধর্ম্ম ও নীতির স্রোত প্রবাহিত হইয়া, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে গিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, দেশে এবং কালে ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপাদন করিয়াছে, অথচ মূল উৎসে তাহারা সকলে এক। ইহাদিগের শাখা সকল ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে, হইতে পারে, বিপরীত দিকে গিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের ধর্ম্মমূল আসিয়াতে। আমি কি তাহাদিগের জাতীয় একতার কথা বলিতেছি ? হাঁ, আসিয়ার হইয়া পূর্ব্ব পশ্চিমের সমুদায় ধর্ম্ম-মন্দিরের নেতৃগণেতে আমাদিগের প্রয়োজন। সমুদয় মহাজন, ঋষি, ধর্ম্মার্থ নিহত, ভক্তগণ, যাঁহারা যেমন, আমরা তাঁহাদিগকে তেমনি সম্মান করি। শুদ্ধ মানুষ বলিয়া, আসিয়ার বলিয়া সম্মান করি না, কিন্তু আমাদিগের স্বদেশীয় বলিয়া সম্মান করি। আসিয়ার এইএক আশ্চর্য্য সামর্থ্য যে, একজাতীয়ভাবাপন্ন হইয়াও এত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম উৎপাদন করে এক ভূমিতে এমন বিপরীত চরিত্র

সকল কেমন আবির্ভূত হয়! ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার ভূমিতে আমরা একবিধতা দেখিতে পাই; কিন্তু এই আসিয়াতে অগণ্য ভিন্নতা দর্শন করি, যাহা একই আসিয়ার উর্ব্বরা ভূমি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। নিশ্চয়ই ভারতীয় হৃদয়ের গভীরতম স্থানে বহুত্ব আছে। আজ ইহা ভিন্ন আর এ ব্যাপারের কোন হেতু নির্দ্দেশ হইতে পারে না। ঈদৃশ পবিত্র উদার ভূমির উপরে দাঁড়াইয়া, আমি আসিয়ার নহি, যদি আমি পৃথিবীর সমুদায় মহাজন, ভক্ত ও ধর্ম্মার্থনিহতগণের প্রতি ন্যায়-প্রদর্শন জন্য উদার পবিত্র ভাষায় কথা না বলি। সাম্প্রদায়িক ভাব পরিহার করিয়া আমি কি সকলকে আলিঙ্গন করিতে পারি? বাঙ্গালী হইয়া পারি না, ভারতবর্ষীয় হইয়া পারি না; কিন্তু আসিয়ার হইয়া পারি। আমার চারিদিকে এতগুলি ধর্ম্মার্থ ত্যক্তজীবন, এতগুলি ধর্ম্মমত, এতগুলি ধর্ম্মপ্রণালী যে, আমি চলিতে পারি না, জীবিত থাকিতে পারি না, যদি তাহাদের সঙ্গে মিলিত না হই, যদি আমি তাহাদিগের সত্য পরিহার করি। অতএব, ইউরোপ, আমি তোমাকে অসাম্প্রদায়িক হইতে বলিতেছি। পাশ্চাত্য জাতির প্রতি আসিয়ার প্রথম নিবেদন এই, তোমাদিগের শস্ত্র কোষে সংগ্রহ কর। ইউরোপ কি সাম্প্রদায়িক হইতে বাধ্য? সাম্প্রদায়িকতা কি? ইহা ইন্দ্রিয়াসক্তি। যখন তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তখন কি তোমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহ? সাম্প্রদায়িকতা ইন্দ্রিয়াসক্তি, কেন না উহা হিংসা-দ্বেষ ঈর্ষা হৃদয়ের নীচ ভাব সকল উদ্দীপন করে; ইহাতে এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার, এক ভগ্নী অপর ভগ্নীর বিরোধে দণ্ডায়মান হয়। উহা ভ্রাতৃত্ব ভগিনীত্বের বন্ধন নির্দ্দয়ভাবে ছিন্ন করে, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা ইন্দ্রিয়াসক্তি। আমরা কখন ইন্দ্রিয়াসক্তির গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হইব না। তোমাদিগের নিজ নিজ হৃদয় দর্শন কর, দেখ, সেখানে ইন্দ্রিয়াসক্ত সাম্প্রদায়িক ভাব আছে কি না? তুমি তোমার বিশ্বাস, বিবেক এবং তোমার পদের অভিমান করিতে পার; কিন্তু যদি তোমার হৃদয়ে সাম্প্রদায়িকতা থাকে, তবে তুমি ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রচুর নিশ্চয় প্রমাণ পাইলে। যেমনই কেন বিশুদ্ধচরিত্র হউক না, সাম্প্রদায়িকতার গতিই এই যে, উহা অপ্রেম বিসংবাদ উৎপন্ন করে, ভ্রাতা ও ভগিনীকে পরস্পরের বিরোধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। মহর্ষি পল এই সাম্প্রদায়িকতা-পাপের বিরোধে ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছেন, নিন্দাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা

যে সাম্প্রদায়িকতাতে বাস করিতেছি, উহা যে কেবল ইন্দ্রিয়াসক্তি, তাহা নহে, উহা অবৈজ্ঞানিক। বহু সম্প্রদায়! পৃথিবীর সমুদায় ইতিহাসে এতদপেক্ষা আর কি অবৈজ্ঞানিক আছে? দুই, চারি, বিংশতি, দুই শত ভিন্ন নিয়ম বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিবে। বিজ্ঞানের অর্থ ঐক্য। তোমরা কি বিংশতি জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা বল? বিজ্ঞান একই। যথার্থ বিজ্ঞান প্রথম শতাব্দীতে যাহা ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও তাহাই। বিজ্ঞান একই, ইহা মত, জাতি, বর্ণ কিছুই স্বীকার করে না। ঈশ্বরের বিজ্ঞানে একতা আছে, উহাতে কখন বহু সম্প্রদায় হইতে পারে না। তোমাদের ঈশ্বর এক হইলে, মণ্ডলীও এক হইবে। যেমন পরিবার এক, মণ্ডলী এক, তেমনি এ সকলই এক হইয়া যাইবে। দার্শনিক ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ ইউরোপ, পৃথিবী তোমাকে বিজ্ঞানের জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে; বিজ্ঞানের সাহায্যে তুমি সমুদায় বিদূরিত করিয়া দাও, ধর্ম্মেতে বিজ্ঞানের একত্ব সংস্থাপন কর এবং এই বিজ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ কর। বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম বলে, এক ধর্ম্ম, এক বিশ্বাস, এক সত্যই সম্ভবপর। দুই মত? এতে যে সমুদায় বিজ্ঞানের বিনাশ। বিজ্ঞানের অনুরোধে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, সমুদায় মনুষ্যজাতির মঙ্গলের অনুরোধে, ইউরোপীয় জাতিকে বাধ্য হইয়া সমুদায় প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিতে হইতেছে। আসিয়ার আদেশে ইউরোপকে এরূপ করিতেই হইতেছে। আসিয়া এই ভূমি অধিকার করিয়া আছে। আসিয়া তাহার হস্তে সমুদায় ধর্ম্ম ধারণ করিয়া ইউরোপকে বলিতেছে, বিজ্ঞান লইয়া আমার হস্তস্থিত ধর্ম্মসমুদায়ে প্রবিষ্ট হও। আসিয়ার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। গণিত বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সে জানে না। আসিয়া বিদ্যা বিনা, কঠোর পরিশ্রম বিনা, সহজে বিশ্বাসের একতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আসিয়া যাহা সহজে উপলব্ধ করিয়াছে, ইউরোপ তদুপরি চিন্তা নিয়োগ করুক। উহার বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একতা অন্বেষণে সময়ক্ষেপ না করিয়া, সমুদায় ধর্ম্ম, সমুদায় ধর্ম্মমতের একতাস্থাপনে প্রবৃত্ত হউন। বিজ্ঞানের জন্য আমরা ইউরোপকে বলি, আইস, আমরা এক ঈশ্বর, এক মণ্ডলী, এক সত্যে আবদ্ধ হই, সমুদায় মনুষ্যজাতিকে এক করিয়া ফেলি। যখনই সাম্প্র-দায়িকতার কথা হইবে, তখনই যেন আমরা বলি, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ,

সমুদায় উন্নতির বিরুদ্ধ, সমুদায় ঋষি মহাজনের বিরুদ্ধ। আসিয়া ইউরোপের দিকে, ইউরোপ আসিয়ার দিকে আকৃষ্ট হউক, আর যেন সাম্প্রদায়িকতা না থাকে। যদি বলা হয়, আমরা বহুবিধত্ব ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নই। সাম্প্রদায়িকতা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে। প্রকৃতিতে অগণ্য ভিন্নতা, অশেষ প্রকার। ঈশ্বরের নিয়ম বিবিধ, একবিধ নয়। আমায় বলিতে দাও, একতাতে আমি একবিধত্ব অভিপ্রায় করি না। একবিধত্বে প্রকৃতির মৃত্যু, ঈশ্বরের তিরোধান। আমরা একত্ব চাই, একবিধত্ব কখন চাই না। জাতি বা ব্যক্তিকে জীবনহীন একবিধত্বের সমভূমিতে আনয়ন করিও না। আসিয়ার অভ্যুদয় হউক, কিন্তু সর্ব্বোপরি স্বর্গীয় ঐশ্বরিক একত্ব স্থিতি করুক। একতানতায় ঐক্য সমুপস্থিত হউক, কেন না উহাতে বহুতান মিলিত হইয়া বিবিধ স্বরে একই তানলয় সমুপস্থিত করে। একই স্বরের ভিন্নতার মধ্যে একতা আছে। প্রতিযন্ত্রের স্বতন্ত্রতা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, নিজের কিছু পরিত্যাগ করে না। কিন্তু যখন সমুদায় যন্ত্র বাজিয়া উঠে, জাতীয় স্তোত্র নিঃসৃত হয়, বিবিধ স্বরের যন্ত্র হইতে সুমধুর মনোহর তানলয় সমুত্থিত হয়। ইহা কি সম্ভবপর নয়? বহু জাতি, বহু সম্প্রদায়, বহু মণ্ডলী, বহু মতের মধ্যে এরূপ সম্ভব। সকলে মিলিত হইয়া একটি শরীর হউন। আমি সকলকেই নাক, কাণ, হাত, পা, মাথা হইতে বলিতেছি না। একেতো শরীর বলে না। শরীরের সমুদায় অবয়বের যথাযোগ্য সংস্থান আছে, এবং সকলেরই স্বতন্ত্রভাব স্বীকৃত হয়, অথচ সমুদায় শরীরে একটী একতা আছে। সমুদায় শরীর এক, ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত অথচ সমঞ্জস সমষ্টি, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ায় নিযুক্ত অথচ একতাবিশিষ্ট। সমুদায়েতে একটি মনোহর নিয়মিত সুশৃঙ্খলা, পরস্পরে কোন বিরোধ বা বিসংবাদ নাই। পরিবারের একতাও এইরূপ। পরিবারে স্ত্রী আছে পুরুষ আছে, যুবা আছে বৃদ্ধ আছে, প্রভু আছে দাস আছে, অথচ নিয়মিত পরিবারে কি সুমধুর সামঞ্জস্য বিরাজ করে, যুবা বৃদ্ধ পরস্পরের প্রতি ঠিক সম্বন্ধ রক্ষা করে, পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা সম্ভবপর হয়। পরিবার এ পৃথিবীতে স্বর্গ, তোমরা কি দেখিতেছ না? পরিবারের সকলের ভাবের ভিন্নতাতেও একতা বিনষ্ট হয় না। রুচি সহানুভূতি প্রকৃতি ভিন্ন হইয়াও পরিবারের কল্যাণের জন্য সকলে একত্র গ্রথিত, এবং যাহার যে স্থান

অধিকার করিয়া অবস্থিত। এই সাদৃশ্যটি আমরা আরো উচ্চ ভূমিতে লইয়া যাই। উৎকৃষ্ট শাসনে শাসিত রাজ্যমধ্যে কেমন পূর্ণ একতা। অনেক দেশের লোক, অনেক জাতি, অনেক দল, যেন এ উঁহার বিরুদ্ধ, এ উহার উচ্ছেদসাধনোন্মুখ, অথচ এক মধ্যবিন্দুতে সকল ভিন্ন ভাবকে একত্র আবদ্ধ রাখিয়াছে। এখানেও সামঞ্জস্য এবং একতা। আমাদিগকে আশ্চর্য্য হইতে হয়, ইহা কিরূপে সম্ভব হইল! ইহার আর কোন হেতু নাই, ঈশ্বর এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়াই হয়। অসংখ্য লোক এক পরাক্রান্ত হস্তে বিধৃত। সমুদায় রাজ্যে একই বিধি, বহু জাতি, বহু বংশ, বহু লোকের মধ্যে কুশল ও শান্তি; কাহারও সাহস নাই যে, এই পরাক্রান্ত ক্ষমতাকে অতিক্রম করে। একটী গূঢ় শক্তিতে সমুদায় চাকা নিজ নিজ স্থানে একত্র বদ্ধ রহিয়াছে এবং একই শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে, মানবজাতি উহার অবরোধে অক্ষম। এইটি একতার পূর্ণভাব। ইউরোপ, তুমি কি মনে কর, ইংলণ্ড জার্ম্মণিকে বিনাশ করিবে, জার্ম্মণি ফ্রান্সকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবে? তোমরা কি সম্ভব মনে কর যে, রাসিয়া তুরস্ককে উচ্ছেদ করিবে? ইহা মানুষের অভিপ্রায় হইতে পারে, কিন্তু মানবজাতির পূর্ণতাসম্বন্ধে ইহা সম্ভবপর নহে। বিধাতার বিধানে ইহা সম্ভবপর নহে যে, সমুদায় ইউরোপ ইংলণ্ড হইবে, ফ্রেঞ্চ হইবে বা জার্ম্মণ হইবে, অথবা সমুদায় পৃথিবী আমেরিকান্ হইয়া যাইবে। ইহা আমাদিগের ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা নহে, অভিপ্রায় নহে। বহুবিধত্ব থাকিবে, অথচ তাহার মধ্যে একত্ব স্থিতি করিবে। তোমরা জান, ইউরোপীয় জাতির মধ্যে প্রতিনিধিত্বের নিয়ম আছে, এই প্রতিনিধিত্ব উন্নত শাসনপ্রণালী। দেখ, প্রতিনিধিত্বের প্রণালীতে সকলেই স্বাধীন। লক্ষ লক্ষ অতি মূর্খ অজ্ঞানী লোকের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি গৃহীত হইয়া থাকে; তোমরা পার্লিয়ামেণ্টে তাহাদিগের কথা বলিতে দাও। তোমরা তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দাও না, তাহাদিগকে হেয় করিয়া ফেল না, তাহাদিগের স্বাধীন ভাবকে অবরুদ্ধ কর না। পরিশ্রমজীবীরাও হাউস অব কমন্সে ন্যায়বিচার চায় এবং তোমরা রাজা প্রজা ধনী নির্ধন সকলকে সমান ভাবে একত্র বসাও, এবং সকলের সম্বন্ধে সমান বিচার করিতে যত্ন কর। এ সকল লোক পরস্পর কত বিভিন্ন, অথচ কেমন সামঞ্জস্য এবং শান্তি। রাজ্যসম্বন্ধে তোমরা যাহা কর, ধর্ম্মসম্বন্ধেও

তাহাই কর। সমুদায় মত এক জাতীয় সাধারণ সভায় উপবেশন করুক। সকলকেই তাহার কথা বলিতে দাও, এবং এইরূপে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দ্বারা একটী ধর্ম্মের রাজ্যের সার, ধর্ম্মের মূলসূত্র সকল, মণ্ডলীর শাসনপ্রণালী, পৃথিবীর শাসনপ্রণালী লব্ধ হইবে। আমি তোমাদিগকে ইহাই করিতে বলি। কিন্তু তোমরা বলিতে পার, "অতি প্রশস্ত হইলে গভীরতা থাকে না।" এক গ্লাস জল লও, এবং উহা টেবিলের উপরে ঢালিয়া দাও, জলের অধিকৃত স্থান অধিক হইল, কিন্তু উহার গভীরতা কমিয়া গেল। সামান্য পার্থিববিষয়সম্বন্ধে এ ন্যায় ঠিক, কেন না উহাতে সীমাবদ্ধ বিষয় সকল লইয়া কার্য্য হয়। একবার প্রশস্ত সমুদ্রকে গ্রহণ কর। উহার উপরিভাগের কি তুমি পরিমাণ করিতে পার? উহার গভীরতম স্থানের পরিমাণ লইতে কি তুমি সক্ষম? একবার উচ্চতম আকাশে উত্থিত হও, আকাশের কি মস্তক আছে, না, চরণ আছে? আকাশের সূর্য্য কি পশ্চিমে অস্তমিত হয়? ইহার উচ্চতা, গভীরতা, ইহার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কে পরিমাণ করিতে সমর্থ? বিজ্ঞান লজ্জায় তাহার মস্তক অবনত করে। তবে কেন প্রশস্ত হইতে গিয়া অল্প গভীর হইবে? এতো আমি কিছুতেই বুঝিতে পারি না। আমি ইচ্ছা করি, সমুদায় ইউরোপ প্রশস্ত মণ্ডলী হয়। প্রশস্ত মণ্ডলীই একালের নিয়ম। ইংলণ্ড, আমেরিকা, আসিয়ার, সমুদায় পৃথিবীর উহাই ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম। গভীর হইবে বলিয়া কি তোমাদিগকে কম প্রশস্ত হইতে হইবে? তোমরা কি বল যে, উচ্চ মণ্ডলী প্রশস্ত হইয়া ইহার পবিত্রতা এবং মণ্ডলীত্ব রক্ষা করিতে পারে না? ঈদৃশ ভাবকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি এবং অবৈজ্ঞানিক মনে করি। ইহাতে ধর্ম্মসম্পর্কীয় পবিত্রতার মূলসূত্র ধ্বংস হইয়া যায়। আকাশের ন্যায় উচ্চ হও, আকাশের ন্যায় প্রশস্ত হও, এবং যদি তোমরা খ্রীষ্টের ওষ্ঠাধর হইতে শুনিয়া থাক, 'ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, তেম্নি পূর্ণ হও', তবে আমি বলিতেছি, ঈশ্বরের ন্যায় প্রশস্ত হও, উন্নত হও, গভীর হও। ঈশ্বর অপেক্ষা উদার প্রশস্ত কে আছে? ঈশ্বরের ন্যায় উচ্চ গভীর প্রশস্ত হও; এমন ধর্ম্ম লাভ করিবে, যাহা প্রশস্ততম সহানুভূতি, পুণ্য এবং পবিত্রতা অর্পণ করিবে। এমন সময় ছিল, যে সময়ে এক বর্ব্বর মনুষ্য গর্ত্তমধ্যে বাস করিত এবং গর্ত্তে থাকিয়া অতি মূর্খের ন্যায় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে আপনাকে আপনি বলিল, আমি যদি গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া

গিয়া লোকমণ্ডলীর সঙ্গে মিশি, হয় তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিবে, না হয় আমি তাহাদিগের কতকগুলিকে বধ করিব, আমাদিগের মধ্যে মিল বা বন্ধুত্ব হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার সমুদায় সম্পত্তি চলিয়া যাইবে, আমার গৃহের কিছুই থাকিবে না। কিছু দিন মধ্যে সে আর বর্ব্বর থাকিতে পারিল না, বর্ব্বরত্বে তাহার সন্তোষ হইল না। সে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিল, মনুষ্যসমাজের সঙ্গে মিশিল; প্রতিবাসিগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিল, বন্ধু সংগ্রহ করিল, এবং এক দুই তিন চারি করিয়া সকলে মিলিত হইল এবং তাহা হইতে একটী ক্ষুদ্র পল্লী সংগঠিত হইল। এই ক্ষুদ্র পল্লীর লোক তখন মনে করিতে লাগিল, যদি নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গিয়া আমরা মিশি, আমরা সকলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব, এবং সেখানে কেবল ঘোরতর অরাজকতা এবং অন্ধকার সমুপস্থিত হইবে। সুতরাং তাহারা তাদৃশ সঙ্কল্প হইতে বিরত থাকিল। কিন্তু সময় সকলই বিনষ্ট করে, সময়ে তাহাদিগের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল এবং দুই গ্রাম এক গণ্ডগ্রাম হইল, এবং বাড়িতে বাড়িতে একটী প্রশস্ত জনমণ্ডলী হইয়া পড়িল। এই জনমণ্ডলী দিন দিন বাড়িয়া প্রশস্ত রাজ্য হইয়া গেল, এবং এ সময়ে সকল মানুষ যে প্রকার সুখী এবং সমদুঃখসুখ হইল, এমন আর কোন সময়ে ছিল না। এমন মানুষ আছে, যাহারা মনে করে যে, তাহাদিগের স্ত্রী পরিজনগণকে বিস্তৃত সমাজে লইয়া গেলে, তাহাদিগের গৃহের সুখ বিনষ্ট হইবে এবং তাহাদিগের আশা ভরসা বিশুষ্ক হইয়া যাইবে। গ্রামের মানুষ কি বলে যে, গ্রামান্তরের লোকের সঙ্গে মিশিলে বন্ধুত্ব হারাইবে? কখনই না। সর্ব্বত্র একসমাজ হইবার জন্য গতি সমুপস্থিত। স্বয়ং বিধাতা, দেখ, উন্নতি আনয়ন করিতেছেন। বর্ব্বর অসভ্য গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রশস্ত জনসমাজের অন্তর্ভূত হইয়া গেল, ক্ষুদ্র পরিবার এক প্রশস্ত পরিবারে পরিণত হইল। এমনই সাম্প্রদায়িকতা-পশুকেও গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, ঈশ্বরের জীববর্গের সম্মুখাসম্মুখীন হইতে হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্ম, তুমি কি ভীত এবং কম্পিত? খ্রীষ্টের ধর্ম্ম, তোমার কি এমন বল নাই যে, তুমি পৃথিবীর ধর্ম্মসমুদায়ের সমযোদ্ধা হইয়া দাঁড়াইতে পার? তোমরা কি বল না যে, অবৈধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে মিশিলে আমাদিগের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধি যাইবে? খ্রীষ্ট কখন একথা বলেন নাই। তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে সমুদায় পৃথিবীর

জন্য অভিপ্রেত করিয়া গিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতা ত্রস্ত এবং কম্পিত। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সমুদায় শিবিরে এই বলিয়া ত্রাস সমুপস্থিত যে, লোক সকল উচ্চনীচ-মণ্ডলী এবং অপরাপর মণ্ডলীর সঙ্গে যদি মিলিত হয়, তবে ধর্ম্মগ্রন্থের সত্য সমুদায় ভ্রষ্ট এবং খ্রীষ্টীয় গৃহের পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে। আমি বলি, যদি তোমরা হিন্দুগণের সঙ্গেও মেশ, তাহা হইলে তোমরা আরও অধিক খ্রীষ্টান হইবে। আমি জানি না, প্রশস্ত হইতে গেলে গভীরতা কেন অল্প হইবে? প্রশস্ত হইলে কি প্রার্থনা-সকল কম তেজস্বান্ হয়? ভক্তি কি উষ্মা রক্ষা করিতে পারে না? যদি বাপ্তিষ্ট বা মেথডিষ্ট হইয়া কোরাণ, ঋগ্বেদ বা ললিতবিস্তর পড়, অবশ্য সমুদায় পৃথিবীকে উচ্চতর ভূমিতে লইয়া যাইবে। যদি খৃষ্টের ধর্ম্মের অভিপ্রায় দেখ, তবে দেখিতে পাইবে, উহার সঙ্গে সমুদায় মণ্ডলী সংযুক্ত আছে। খৃষ্টের মণ্ডলী অতি প্রশস্ত মণ্ডলী। এই মণ্ডলী প্রশস্ত হউক, উহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মণ্ডলীও প্রশস্ত হইবে। মনে করিও না যে, সকল লোকেই রোমাণ কাথলিক হইবে, প্রটেষ্টাণ্ট হইবে, বাপ্তিষ্ট হইবে, বা ইউনিটেরিয়ান হইবে। এরূপ হইবে না। আমি বলিতেছি বলিয়া নহে, প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন জন্য। আমাদিগের জ্ঞানের বহির্ভূত যে অপরিজ্ঞেয় দূরবর্ত্তী কাল অবস্থিতি করিতেছে; তাহার মধ্যে আমরা প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম নহি। তবে প্রভু এই কথা বলিতেছেন যে, মনুষ্যমণ্ডলী ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইবে, প্রশস্ত হইতে হইতে প্রশস্ততম সম্প্রদায়, সর্ব্বসমঞ্জস ভ্রাতৃত্বে একত্র মিলিত হইবে। মূল যাহা আছে, এখন তাহা তদ্রূপই থাকুক। বর্ত্তমানে পত্তনভূমির দিকে দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। মণ্ডলীর ঊর্দ্ধভাগ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকুক। এখন মণ্ডলী সকল একান্ত পার্থিব, অপবিত্র, অভক্ত, এবং সাম্প্রদায়িক থাকিতে পারে; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নানাস্থানে বিকীর্ণ সত্যসমূহ গভীর প্রেমের পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে উত্থিত হইবে, এবং পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। পৃথিবীতে সম্মিলন বিরাজ করিবে, এবং আত্মা উচ্চ হইতে উচ্চে উত্থান করিয়া, একেবারে উচ্চতম স্থানে অধিরোহণ করিবে; সেখানে পূর্ব্ব পশ্চিমের মহাজনগণের সঙ্গে মিলিত হইবে এবং তাঁহারা সকলে তাহাকে প্রেমে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিবেন। এইরূপে এক সমাজ (Community) সমুপস্থিত, ইহাকেই খৃষ্ট স্বর্গরাজ্য বলিয়াছিলেন।

এখানে সকল মণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ একত্রিত হন। এখানে সকলে রাজার রাজা, প্রভুর প্রভুর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন। এই রাজ্যসংস্থাপনের জন্যই খৃষ্ট আসিয়াছিলেন। এই সত্যে সকলের হৃদয় অধিকৃত হউক, এবং এই পবিত্র রাজ্যে মিলিত হইতে যেন আমরা ইতস্ততঃ না করি।

"লোকে বলে, একজন নববিধানের লোক আছে, যে একটী নূতন ধর্ম্ম পৃথিবীতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। ধিক্ আমায়, যদি আমার মনে অণুমাত্রও এরূপ অভিলাষ থাকে যে, আমি পৃথিবীতে একটী নূতন সম্প্রদায় গঠন করিব। ধিক্ আমায়, যদি বড়বড় পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের প্রতি আমি অবিচার করি। আমি খ্রীষ্টের মণ্ডলীর বিরোধে মণ্ডলী স্থাপন করিব? এ ওষ্ঠাধর ধ্বংস হইয়া যাউক, যদি ইহা এরূপ কোন কথা বলে। আমার শোণিত অবরুদ্ধ হইয়া যাউক, যদি এরূপ কিছু আমার মনে থাকে। কোন নূতন মণ্ডলীর সংস্থাপন নহে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ সাধন। আমি এই বলি, অবৈধধর্ম্মাবলম্বীর হউক, মুসলমানের হউক, সভ্যাসভ্য যাহারই হউক, সাম্প্রদায়িকতার রাজ্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। ভারতীয় হউক, ইউরোপীয় হউক, যে কোন স্থানের হউক, এই জঘন্য সাম্প্রদায়িকতাকে ঈশ্বরের পবিত্র গৃহে স্থান প্রদান করা হইবে না। কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, অপবিত্রতা, অসতীত্ব, সামাজিক কোন প্রকারের অবিশুদ্ধি থাকিবে না। সকলই পবিত্র হইবে, প্রশস্ত হইবে, সকলই স্বর্গরাজ্যের ন্যায় পূর্ণ হইবে, এই আমাদিগের মত, ইহাই আমাদিগের আছে। এ কি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম নহে? আসিয়ার লোক বিনম্র, এ বিনম্র ভাব কি খৃষ্টীয় নহে? হিন্দুগণ ক্ষমাশীল, এ ক্ষমাশীলতা কি খৃষ্টীয় নহে? হিন্দুগণ সত্য বলে, এ সত্যনিষ্ঠা কি খৃষ্টীয় নহে? হিন্দুগণ দরিদ্রগণকে অন্নদান করে, ইহা কি খৃষ্টীয় নহে? যাহা কিছু পবিত্র, তাহা কি খৃষ্টীয় নহে? এমন কিছু সৎ আছে কি, যাহা খ্রীষ্টীয় নহে? এমন কিছু দেবত্ব কি আছে, যাহা খৃষ্টের নহে? আমি এরূপ বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি, যাহা কিছু সত্য, শিব, সুন্দর, তাহাই খ্রীষ্টীয়; কারণ খ্রীষ্ট, যাহা ঠিক নয়, তাহা করিতে পারেন না। তোমরা তোমাদিগের সত্যনিষ্ঠতা স্থানীয় বলিতে পার, বল। খৃষ্ট, যদি তুমি এখানে অধ্যাত্মভাবে বিদ্যমান থাক, আমাদিগের হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে তুমি বাক্যে প্রকাশ করিয়া দাও; কারণ আমি জানি

এবং সমুদায় হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি, আসিয়াতে সাধুত্ব আছে, খৃষ্টীয় সাধুত্ব আছে এবং তোমাদিগের এবং আমার মধ্যে যদি অল্পপরিমাণেও ঈশ্বরপুত্র থাকেন, উহা খ্রীষ্ট। বৈরাগ্য, যোগ, সমাধি, ধ্যান, সকলের মধ্যে খ্রীষ্ট বিদ্যমান। হিমালয়শিখরে বসিয়া হিন্দু বা বৌদ্ধ যোগী ধ্যান করিতেছেন, সেখানে খ্রীষ্ট। পুণ্য পবিত্রতা পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য একজন প্রার্থনা করিতেছে, সেখানে খ্রীষ্ট। শিশুর মুখে আমি বিনম্র খ্রীষ্টের মুখ দর্শন করি। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের কথা বলিয়াছেন, যথাসময়ে তাঁহার বল শক্তি এবং সত্যের কথা বলিয়াছেন। যদি এ কথা স্বীকার করা হয়, তবে যে কোন সত্য আমাদিগের ওষ্ঠাধর হইতে বিনিঃসৃত হয়, তাহা খৃষ্ট হইতে সমাগত হয়, স্বর্গ হইতে সমাগত হয়, খৃষ্টের ঈশ্বর হইতে সমাগত হয়। সত্য দুই নহে, পবিত্রতা দুই নহে। একই সত্য, একই পবিত্রতা, দুই নহে। একই সত্য, একই পবিত্রতা সম্ভবপর। সার ধর্ম্ম এক, পবিত্রতা এক, সাধুত্ব এক, দেবত্ব এক, প্রার্থনা এক, সর্ব্ববিধ বৈরাগ্য এক। অতএব আইস, আমরা সকলে প্রশস্ত মণ্ডলী হই। সকল বিষয়ে আমরা প্রশস্ত হই, নিম্নে সমুদায় সম্প্রদায় অবস্থান করুক। এস, সকলে মধ্যগত সত্যের সমীপে এস। খৃষ্ট ঈশা অপেক্ষা আর মধ্যগত সত্য কোথায় পাইবে ?

"আমি এই মাত্র সমাজ* (Community) সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি, এই শব্দের ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য কর; সমাজ এক ব্যক্তির সম্মিলন নহে, জাতি জাতির সম্মিলন, বহু ব্যক্তির একত্র সমাবেশ। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের একত্র সমাবেশ এখানে প্রচুর নহে, এখানে এক ধর্ম্ম আর আর ধর্ম্মকে ঘৃণা করিতে পারে না, এক জাতি আর এক জাতিকে অভিভূত করিতে পারে না; সমুদায়ের একত্র সম্মিলনে অবস্থানই সমাজ। সুতরাং সমাজ শব্দ অন্বর্থ। পৃথিবীর সমাজসম্বন্ধে যাহা সত্য, স্বর্গীয় সমাজসম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতে তেমনি সমুদায় জাতি ঈশ্বরেতে একতাবদ্ধ। একতাই সমাজ, একতাই যোগ। এই দুই শব্দ কি একার্থ নহে ? ঈশ্বরেতে এক হও, মনুষ্যেতে

---

* সং পূর্ব্বক অজ্ ধাতুতে ঘঞ্ করিয়া সমাজ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সম্যক্ প্রকারে যেখানে সকলে আগত হয়, ইহাই ব্যুৎপত্তির মূল অর্থ। ইংরেজী কমিউনিটি শব্দের সঙ্গে ইহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়া, এই শব্দটি আমরা ব্যবহার করিলাম।

এক হও। মনুষ্যসম্বন্ধে একতা, সকলে মিলিয়া ঈশ্বরসহ বাস, এ দুই মহাত্মা ঈশাতে আমরা দেখিতে পাই। 'পিতা আমাতে, আমি পিতাতে', খৃষ্টান ইউরোপ, এ অংশ তুমি গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আমায় বলিতে দাও, ইহার অপরাংশ তুমি গ্রহণ কর নাই। আমি আসিয়ার লোক, আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি। 'আমি এবং আমার পিতা এক' এ বাক্য আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করি; আমি এতদপেক্ষা আরো কিছু বেশি বিশ্বাস করি, এবং খৃষ্ট তাহা আপনি বলিয়াছেন। হাঁ, তিনি বলিয়াছেন, 'তোমরা আমাতে, আমি তোমাদিগেতে'। খ্রীষ্ট শিষ্যগণেতে ছিলেন, শিষ্যগণ খৃষ্টের বক্ষে একত্রিত ছিল। হাঁ, পবিত্রমণ্ডলী তাঁহাতেই ছিল। খৃষ্ট তাঁহার মণ্ডলীতে ছিলেন, আজও আছেন। সমুদায় মণ্ডলী অবিভক্তভাবে খৃষ্টের বক্ষে এবং খৃষ্ট উহার সমুদায় অংশে বর্ত্তমান। খৃষ্টের ইহাই সুন্দর জীবন। আমরা বুঝিতেছি যে, তাঁহার চিত্তের গভীরতম স্থানে তাঁহার পিতার সঙ্গে একতা ছিল। পিতা কথা বলিতেন, অমনি তিনি কথা বলিতেন। তিনি পিতার মধ্য দিয়া, পিতা তাঁহার মধ্য দিয়া কথা বলিতেন। এখানে সৎ চিৎ প্রেম এবং ইচ্ছার একতা ছিল। সকল সময়ে তিনি বলিতেন, 'পিতা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!' খৃষ্টধর্ম্ম ইহা গ্রহণ করিয়াছে। খৃষ্টীয় স্ত্রী পুরুষ, তোমরা ধন্য, যদি তোমরা এই উজ্জ্বল গৌরবান্বিত সত্য গ্রহণ কর। কিন্তু ইহার উপরে আরো কিছু আছে। খৃষ্ট খৃষ্টীয়গণের হৃদয়ে বাস করেন এবং সমুদায় খৃষ্টীয়গণের হৃদয় খৃষ্টেতে বাস করে। এ হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলন কি? একত্ব, খৃষ্ট আপনাকে সমুদায় মনুষ্যজাতির ঐক্যবন্ধন (Atonement) * বলিয়াছিলেন। আমি কি ঐক্যবন্ধন বলিতেছি? এ সভায় আমার এ কথা বলায় সকলে চমৎকৃত হইবেন। হাঁ,

* সাধারণতঃ আটোনমেণ্ট (Atonement) শব্দের অনুবাদে প্রায়শ্চিত্তশব্দও ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ইংরেজীতে প্রায়শ্চিত্ত শব্দের যে অর্থ, সংস্কৃতে সে অর্থ নহে। ইংরেজী শব্দের অর্থ একতানিবন্ধন, সংস্কৃত শব্দের অর্থ ব্রতার্থ নিশ্চয়। প্রায়শ্চিত্ত শব্দের প্র+ই+ঘঞ্+সুট্ ও চিত্তশব্দ লইয়া নূতন অর্থ সংলগ্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম না। খ্রীষ্ট ঈশ্বর ও মনুষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে এক হইয়া গিয়া, পৃথিবীর জন্য তভাব রাখিয়া গিয়াছেন। যিনি তভাবে ভাবাপন্ন হইবেন, তিনি ঐক্য লাভ করিবেন; ইহা মূল ভাব।

খৃষ্ট ঐক্যবন্ধন। সমুদায় ভারতবর্ষকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বর তাঁহাতে পরিতুষ্ট। সমধিক সাহস অবলম্বন করিয়া বলিতেছি, সমুদায় ভারতবর্ষকে খৃষ্টকে ঐক্যবন্ধনরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, ইনি সমুদায় মনুষ্যজাতির ঐক্যবন্ধন। আমি এ কথা বলিয়া সত্য ভিন্ন আর কিছুই বলিতেছি না। খৃষ্ট, তুমি কি? তুমি সেই সত্য, যে সত্য সমুদায়ের মধ্যে একত্ব আনয়ন করে। ঐক্যবন্ধন কি? তোমরা সকলে দার্শনিক, ইহার অর্থ নির্দ্দেশ কর। যেখানে বহুত্ব, যেখানে দ্বিত্ব, সেখানে একত্ব নাই। এক ঈশ্বর, এক ঈশ্বরপুত্র। এক জন আসিয়াছিলেন, এক জন আছেন, এক জন থাকিবেন। এই পুত্রেতে তোমরা এবং আমি এবং সমুদায় মহাজনগণ এক। আমরা সকলে তাঁহার বক্ষে বাস করি। আমি কি কেবল খৃষ্টীয়গণের কথা বলিতেছি? সমুদায় খৃষ্টীয়, অবৈধধর্ম্মবাদী, বর্ব্বর, মনুষ্যখাদক অসভ্য জাতি, সকলের জন্য খৃষ্ট তাঁহার শোণিতদান করিয়াছেন। তিনি পাপী দুঃখী পতিত পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমাপর্য্যন্ত সকলের জন্যই ঐক্যবন্ধন, তিনি আপনি ইহা বলিয়াছেন। তিনি য়িহুদী, বিধর্ম্মী, সকল দেশ, সকল কাল লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। তোমরা এবং আমিই যে তাঁহার চিন্তাতে প্রধানরূপে ছিলাম, তাহা নহে, আমরা সকলেই সমষ্টিতে ব্যষ্টিতে তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিলাম। তিনি আপনাকে ঐক্যবন্ধনরূপে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগের সঙ্গে এক হইয়াছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়াছেন। তিনি আপনার ভিতরে দেবত্ব ভিন্ন আর কিছু স্থান দেন নাই। তাঁহার হস্তে, হৃদয়ে, শোণিতে, মাংসে দেবত্ব প্রকাশ পাইত। তাঁহাতে দেবত্ব প্রকাশ পাইয়া সমুদায় পবিত্র করিয়াছিল, বিশুদ্ধ করিয়াছিল, পরিত্রাণ আনয়ন করিয়াছিল। তিনি আপনি ইহা অনুভব করিতেন, অন্যথা এরূপ কথন বলিতেন না। তিনি সমুদায় পৃথিবীর ঐক্যবন্ধন, তিনি পৃথিবীর অতি দূরবর্ত্তী লোকদিগকেও সম্মিলন দান করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় মনুষ্যজাতিকে আপনার দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন। সমুদায় পৃথিবী খৃষ্টেতে, সমুদায় মানবজাতি খৃষ্টেতে প্রবিষ্ট এবং গ্রস্ত হইয়াছিল। অন্যথা তিনি সমুদায় মানবজাতির জন্য ঐক্যবন্ধন হইতে পারিতেন না। যদি তিনি ক্ষুদ্র ঐক্যবন্ধন হইতেন, তিনি অল্পসংখ্যক শিষ্যের ঐক্যবন্ধন হইতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে সমুদায় মনুষ্যজাতিকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য,

তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক, এবং তাঁহাতেই সমুদায় পৃথিবীর ঐক্য-বন্ধন হইয়াছে। সমুদায় মানবমণ্ডলী ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে, সত্য একই হইয়াছে, সমন্বিত হইয়াছে, সমুদায় দ্বিত্ব বহুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, য়িহুদী বিধর্ম্মী গ্রীক প্রভৃতি সমুদায় প্রভেদ চলিয়া গিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বে যে প্রভেদ ছিল, এখন আর তাহা নাই। বর্ব্বর, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, স্ত্রীপুরুষ সকলে আসিয়া সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছে, কেন না তিনি সকলেরই জন্য ঐক্যবন্ধন। খৃষ্ট সকল রক্ত মাংসের জন্য, অনন্ত কালের জন্য ঐক্যবন্ধন হইয়াছেন; এখন এই চাই যে, আমরা উহা আপনাদিগেতে প্রয়োগ করি। এস, আমরা সকলে বিশ্বাস করি যে, মানবীয় পবিত্রতার আদর্শ নাসরথে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি এ পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন এবং পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগের সকলের জন্য ঐক্যবন্ধনরূপে আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগের সকলকে তাঁহার পিতা এবং আমাদিগের পিতার সন্নিধানে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং প্রভু পরমেশ্বর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আমরা সকলেই খ্রীষ্টেতে এবং খ্রীষ্ট আমাদিগেতে। আসিয়ার হইয়া আমি খ্রীষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। খৃষ্ট আসিয়ার হইয়া আমার রক্তমধ্যে বাস করিতেছেন এবং ঈশাতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমি সম্মিলিত হইয়াছি। তোমরা আধ্যাত্মিক ভাবে সকলেই ইহা করিতে পার, এবং তোমাদিগের সকলকেই খৃষ্টের নামে উহা করিতে হইবে। তোমরা আজ অস্বীকার করিতে পার, কিন্তু কালে কালে এই একীভাব চলিতেছে। যেখানে দ্বিত্ব আছে, সেখানেই একত্ব হইবে; একেবারে অভেদ একত্ব, এ একত্ব পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। খৃষ্টের সত্যেতে ঈশ্বরেতে সকল সম্প্রদায় এক সম্প্রদায় হইবে, অথচ তাহাদিগের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকিবে। ইহাকেই সম্মিলন বলে। খৃষ্ট যেমন এ সম্বন্ধে বাগ্মিতা-সহকারে বলিয়াছেন, এমন কি আর কোন দেবপ্রেরিত দূত বলিয়াছেন? খৃষ্টই পিতার সঙ্গে সম্মিলিত হইবার পথ, তিনিই ঐক্যবন্ধন, তিনিই পূর্ণ বিশ্বজনীন সম্মিলন। পুত্রত্বের ভিতর দিয়া আমি ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রভা, সুমিষ্ট প্রেম, এবং স্বর্গীয় ক্ষমা দেখিতে পাই। আমি এইটি দেখিতেছি; আর দেখিতেছি, সম্মিলন সম্পন্ন হইয়াছে। শিক্ষিত ভারতকেও এক দিন ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে।

কারণ যদি আমরা স্বতন্ত্র হিন্দু হইয়া থাকি, সম্মিলন হইল না। খৃষ্টের আত্মা অসম্মিলন ঘৃণা করে। এই সম্মিলন সাধন জন্য সমুদায় ভেদ ছাড়িয়া দাও, সার্ব্বজনীন ঐক্যবন্ধন সম্পন্ন হইবে। যত সমুদায় উদার প্রশস্ত দল, পুত্রত্বের এই মধ্য বিন্দুতে আসিয়া দণ্ডায়মান হও, সকলে ঈশার সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইবে। হাঁ, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, আসিয়া এক হইতে বাধ্য। এই অধিনায়কের পতাকার নিম্নে আমরা সকলে এক হইব। আমাদিগের সৈন্যদল ইহারই অধীনে শিক্ষিত হইবে। তিনি সকলকে ঈশ্বরের বক্ষে লইয়া যাইবেন, কারণ তিনিই সম্মিলন। তিনি কখন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন নাই, তিনি সার্ব্বভৌমিক সহযোগিত্বের কথা বলিয়াছেন, তাঁহার মণ্ডলী সার্ব্বভৌমিক স্বর্গরাজ্য হইবে; তন্মধ্যে পৃথিবীর সমুদায় সম্প্রদায় এক হইয়া যাইবে। জোরেস্তারে খ্রীষ্ট ছিলেন, বুদ্ধেতেও খৃষ্ট ছিলেন, মোহম্মদেও খৃষ্ট ছিলেন, চৈতন্যেও খৃষ্ট ছিলেন, নানকেতেও খৃষ্ট ছিলেন, পলেতেও আমি খৃষ্টকেই দেখিতে পাই। খৃষ্টই সর্ব্বত্র। তিনি পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন মনুষ্যখণ্ড-সকলকে, সমুদায় বংশ ও জাতিকে এক স্থলে সংগ্রহ করিয়া উচ্চতম স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে সমুদায় সম্মিলন। তিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের গৌরব। ইহাই খ্রীষ্টধর্ম্ম। আমি খ্রীষ্টের বিরোধী হইব না, অথবা তাঁহা ছাড়া কোন পতাকা বা সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিব না। না, সকলেই এক হইয়া দণ্ডায়মান হউন। সম্মিলনই কথা। প্রেমেতে অপরিসীম, প্রেমেতে তিনি আপনাকে মনুষ্যজাতির জন্য দিয়াছেন। ইহাই মনুষ্যত্বের ছবি, ইহাই হৃদয়ের গভীরতম ভাব। আমি খৃষ্টকে ভালবাসি, এবং ইচ্ছা করি, তোমরাও তাঁহাকে ভালবাস। সমুদায় আসিয়াবাসীরই খৃষ্ট সহ বাস করা সমুচিত। এই এখানে খৃষ্টের আত্মা, ঈশ্বরের আলোক; তুমি কি কেবল খ্রীষ্টীয় রাজ্যের? একি, এই যে তুমি আমাদিগেরও! কি দেখিতেছি? আমাদিগের ভিতরে যে দেবত্ব দেখিতে পাইতেছি। আমা-দিগের অধম হৃদয়ের ভিতরে যে স্বর্গীয় আলোক বেগে প্রবেশ করিতেছে। আমরা যে খ্রীষ্টের ভাবে স্নাত। আমি আমার ভিতরে যাই সার্ব্বভৌমিক সম্মিলন এবং ঐক্যবন্ধনের ভাব গ্রহণ করিয়াছি, অমনি আমার ভিতর স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে পাইতেছি। আমার হৃদয় মন চক্ষু কর্ণ মুখ, আত্মা, জীবন

সমুদায় যে স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত। ইহা কে করিল? সেই প্রকাণ্ড ঐন্দ্রজালিক খ্রীষ্ট। তিনি তাঁহার ঐন্দ্রজাল দণ্ড ঘুরাইলেন, আর সার্ব্বভৌমিক সম্মিলন সমুপস্থিত। আমার ধমনীসকলের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের আলোক প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং খ্রীষ্টই এই পরিবর্ত্তন সমুপস্থিত করিয়াছেন। খ্রীষ্ট সর্ব্বদা অতি সহজ ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। দুইটি বিষয়ে তিনি তাঁহার সমুদায় ধর্ম্ম আবদ্ধ করিয়াছেন—স্নান এবং আহার। স্নান কর, আহার কর, স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। সার্ব্বভৌমিক সম্মিলনের জন্য যে জলে খৃষ্ট স্নান করিয়াছেন, সেই জলে স্নান করা চাই এবং তাঁহার রক্ত মাংস পান ভোজন করা চাই। আমরা ইহা করিয়াছি এবং আমাদিগের ভিতরে ঈশ্বর এবং ঈশা আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। হিন্দুদিগের প্রতিদিনের অন্নাহার তাঁহাদিগকে অনন্ত জীবন অর্পণ করিয়াছে। হিন্দুগণ জল অপেক্ষা পবিত্রকর আর কিছুই বলেন না। তোমরা জান, তাঁহারা গঙ্গাজলকে কেমন সম্মান করেন। জলেতে গুণা-রোপের মধ্যে কুসংস্কার আছে, কিন্তু আমি বলি, জোর্ডান নদীর জলেতে খৃষ্ট স্নান করিয়াছিলেন, তাহা কি তেমনি জীবনার্পক নহে, যেমন যমুনা এবং গঙ্গার জল। হিন্দুগণ বংশানুক্রমে যে গঙ্গার সম্মাননা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কি বুঝায়? স্বাভাবিক পবিত্রতাসম্পাদক সামর্থ্য বুঝায়। যদি তোমার দেহে অপবিত্রতা থাকে, তুমি কখন স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে পার না। তোমার দেহকে সর্ব্বপ্রকার পাপ অপবিত্রতা বর্জ্জিত করিয়া, তোমাকে ঈশ্বরের গ্রহণীয় করিতে হইবে। ইহাই প্রতিদিনের প্রাতঃকালের কর্ত্তব্য, প্রতিদিন জলেতে যেমন তোমার দেহ পবিত্র হয়, অমনি পবিত্র ঈশ্বর বারিরূপে তোমার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ের গভীরতম স্থানকে পবিত্র করিয়া দেন। হিন্দুগণ আহার কি, তাহা জানেন। অন্ন সম্মুখে আসিলেই তোমরা বল, ইহাতে আমাদিগের স্বাস্থ্য বৰ্দ্ধিত হইবে, দেহ পুষ্ট হইবে; তেমনি ঈশার রক্ত মাংস তোমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বর্গীয় জীবন ও উৎসাহ অর্পণ করিবে। তোমরা ঈশার রক্ত মাংস পান ভোজন করিবে। এক দিন নয়, প্রতিদিন। এইরূপে খ্রীষ্টের রক্ত মাংস তোমাদিগের রক্ত মাংস হইবে, এবং ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট সহ এক হইয়া যাইবে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরেতে তোমরা খৃষ্টেতে, ঈশ্বর খৃষ্টেতে তোমরা ঈশ্বরেতে, এইরূপে একেবারে মিলিত ভাব

ধারণ করিবে। মণ্ডলী, মনুষ্যজাতি, সমুদায় সম্প্রদায়, সমুদায় মত এক হইয়া খৃষ্টেতে মিলিত, এবং খৃষ্টে মিলিত হইয়া ঈশ্বরে মিলিত। সুন্দর মিলন, সুন্দর সামঞ্জস্য। এইটি আমরা গ্রহণ করি এবং এইটি যখন বিজ্ঞান ও আন্তরিক পবিত্রতা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তখন স্পষ্ট ঈশ্বরকে লাভ করি।

"খৃষ্টান ইউরোপ, আমরা তোমাদিগের নিকটে অনেক শিক্ষা করিয়াছি, আমাদিগকে তোমরা অনেক দিয়াছ, আমরা তজ্জন্য তোমাদিগের নিকট চিরবাধ্য, এবং তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞ হইয়া তোমাদিগের চরণতলে বসিব। ব্রিটিষ শাসন, ইউরোপীয় সভ্যতা হইতে যে সকল মহোপকার আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা চিরকাল আমরা কৃতজ্ঞতা-সহকারে ঘোষণা করিব। কিন্তু তোমাদিগের দেশীয় পণ্ডিতগণ যে নিয়ত বলেন, পূর্ব্বভাগ হইতে আমাদিগের কিছুই শিক্ষা করিবার নাই, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে বলিতে দাও, তাঁহারা একটু আমাদিগকে বুঝিয়া লউন। দুটি বিষয় আছে, যাহা আসিয়াবাসীদিগের নিকট হইতে তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। তোমরা বলিবে, আসিয়ার অধিবাসিগণ অতীব কল্পনাপ্রিয়, তাহারা অজ্ঞেয় বিষয়ের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে চায়। মানি যে, আমাদিগের জাতির ভিতরে অনেক কুসংস্কার আছে, কিন্তু জানিতে হইবে, উহার অভ্যন্তরে, উহার মূলে সত্য আছে। ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয়, এ নিশ্চয়ের ভিতরে অবশ্য কিছু অবৈজ্ঞানিক আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর অজ্ঞেয়, অস্বীকৃত, অপরিজ্ঞাত বস্তু হইবেন? যদি সেই সত্যসূর্য্যকে আমরা আচ্ছাদন করি, সর্ব্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে, আমরা কোথায় আমাদিগের এই মস্তক রাখিব? আমরা সর্ব্বথা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া আছি, এ চেতনা তো কখনই তিরোহিত হইবার নহে। আসিয়া, পরিজ্ঞেয় ঈশ্বর আছেন। ইউরোপ বলুক, ঈশ্বর অপরিজ্ঞেয়, আসিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করে। আমি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকি, এবং আমি এখানে উহা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি। ইউরোপ বলুক, সে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, কখন দেখিবে না; আমরা তাঁহাকে দেখিতে চিরকৃতসঙ্কল্প। ইউরোপ একটু জ্ঞান পরিষ্কার করিলে, তাঁহাকে অবশ্য দেখিতে পাইবে। এক দিন নয়, দুই দিন নয়, আজ বিশ বৎসর আমি আমার ঈশ্বরকে দেখিতেছি, তাঁহার কথা শুনিতেছি। ইহা আসিয়াবাসী বলিয়া হইয়াছে, এবং চির জীবন আমি এইরূপ দর্শন করিব,

শ্রবণ করিব। আমার মনে ঈশ্বর অবেদ্য নহেন, আর আমার ঈশ্বরদর্শন মস্তিষ্কের উত্তেজনা-সম্ভূত নহে। আমি ছায়া দর্শন করি না; আমার ঈশ্বর আমার কল্পনাপ্রসূত কে বলিবে? আমি আমার সম্মুখে সত্য ঈশ্বরকে দর্শন করি, যিনি সমুদায় আকাশ পূর্ণ করিয়া স্থিতি করিতেছেন। আমি ঈশ্বরকে দেখিলে, তবে প্রার্থনা করিতে পারি। ঈশ্বরের কথা না শুনিলে, আমি কিছু বলি না। ঈশ্বর আমায় পূর্ণ না বলিলে, আমি পূর্ণ নহি; তিনি আমাকে আহার করিতে না বলিলে, আমি আহার করিতে পারি না। ঈশ্বর আমাকে বক্তৃতা করিতে না বলিলে, আমি বক্তৃতা করিতে সমর্থ নহি। তিনি না চালাইলে, আমি চলিতে অক্ষম। আমি তাঁহার কথা বিংশতিবার শুনিয়াছি, শতবার শুনিয়াছি। আমি ধর্ম্মোন্মত্ত নহি, আমি দার্শনিক। আমি এমন কোন মন্দির নির্ম্মাণ, এমন কোন নূতন মত সৃষ্টি করিতে প্রস্তুত নহি, যাহার মূলে দর্শন নাই। আমি স্থিরপ্রকৃতির লোক, আমি পাগল নহি। আমার ঈশ্বর এখানে। বিজ্ঞান, গণিত, সকলের সত্য মধ্যেই ঈশ্বরের প্রমাণ। যখন আমি বাইবেল দেখি, উহার সমুদায় পত্র জীবনে পূর্ণ। যখন আমি খ্রীষ্টের সুসংবাদ পাঠ করি, তখন তিনি মৃত নহেন, পরমাত্মজাত। যখন মুষার অধ্যায় পাঠ করি, তখন তাহার প্রত্যেক পত্রে অগ্নিময় ঝোপ প্রত্যক্ষ হয়। ঈশ্বর সর্ব্বত্র—মণ্ডলীতে, খ্রীষ্টধর্ম্মে, সমুদায় মানবমণ্ডলীতে। সর্ব্বত্র সকলে একই ঈশ্বরের নিয়ম মানে। মুষা যথার্থই অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন। তিনি একবার করিয়াছেন, আমরা বিজ্ঞানযোগে উহা নিত্য করিতেছি। বিজ্ঞান অগ্নিকে ঈশ্বরের অগ্নি করিয়াছে, শক্তিকে ঈশ্বরের শক্তি করিয়াছে। ঈশ্বর-পুত্রের মুখে অপূর্ব্বজ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল, যদি আমরা প্রতিজন বিশ্বাস করি, অবশ্য উহা দেখিতে পাইব। যদি আমরা বিশ্বাস করি, আমরা ঈশ্বর এবং তাঁহার জনগণের প্রীতিমুখ আজও অবলোকন করিব। সুন্দর হিমালয়, উচ্চতম গিরিরাজি, সকলই প্রেমে পূর্ণ। ঈশ্বরের করুণায় পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান আসিয়াছে। এই বিজ্ঞান সৃষ্টির বস্তু, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, পর্ব্বত, নদ নদীর কথা আমাদিগকে বলিতেছে। আমরা কি দেখিব? সর্ব্বত্র প্রিয়তম ঈশ্বরকে অবলোকন করিব। এই টাউনহলের স্তম্ভসকলেতে বিদ্যমান থাকিয়া, তিনি আমাদিগের প্রতি পিতা হইয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আমরা

ইহাই প্রত্যক্ষ করিব। ইউরোপ, তুমি প্রকৃতিকে পাঠ কর, আমরা প্রকৃতির সঙ্গে যোগ সাধন করি। ইউরোপ, উদ্ভিদ্বিজ্ঞান আলোচনা কর, আমরা এখান হইতে ভক্তি ও উপাসনা প্রেরণ করিব। ইউরোপ সত্য, জ্ঞান এবং দর্শনের কথা বলে, কিন্তু দেবনিঃশ্বসিত প্রাপ্ত হয় না। ইউরোপ, অবিশ্বাস হইতে সর্ব্বদা আপনাকে প্রমুক্ত রাখ, এবং সেই সত্য ঈশ্বরের নিকটে সত্য হও, যে ঈশ্বরকে আমরা সহজে উপলব্ধি করিয়া থাকি। আসিয়া বলে, 'আমি পবিত্র ইতিহাস ভিন্ন আর কিছু রাখি না। আমার সমুদায় পর্ব্বতরাজি ঈশ্বরেতে পূর্ণ, আমার উপাসনা প্রার্থনা ঈশ্বরের উচ্চতা গভীরতার কথা বলে। আমার নদ নদী প্রস্রবণ সকলই ঈশ্বরাবির্ভাবে উজ্জ্বল।' হাঁ, আসিয়ার সকলই ঈশ্বরময়, নদ নদী, নক্ষত্র, বনরাজি, নরনারী সকলই ঈশ্বরময়। যদি উহার মধ্যে অবৈধ সংস্কার, পৌত্তলিকতা থাকে, কঠোর কুঠারাঘাতে উহার মূল পর্য্যন্ত ছিন্ন করিয়া ফেল, এবং সত্য নবীন জীবনকে তাহার স্থলাভিষিক্ত কর, দেখিবে কেমন তেজে উহা বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে। আমরা সত্য পবিত্র ঈশ্বরকে দর্শন করিব, এবং কদাপি সংশয় ও সন্দেহের সাগরে গতায়াত করিব না। আমরা আমাদিগের সম্মুখে এমন এক ঈশ্বরকে দর্শন করি, যাঁহাকে আমরা দেখি এবং শুনি। কিন্তু বিজ্ঞান বলিতেছে, 'তুমি প্রমাণ করিতে পার না যে, এই আমার ঈশ্বর।' আমি একথা শুনিব না। আমি ইহা অগ্রাহ্য করি। দুঃখী আসিয়াধিবাসী আমার নিকটে কিছুই গ্রাহ্য নহে, যদি ঈশ্বরের নিকট হইতে, ঈশ্বরের নামে, উহা সমাগত না হয়। তুমি বলিতেছ, গোলাপ অতি সুন্দর। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে তোমার চক্ষু ঈশ্বরকে দেখিতেছে না; আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কখন গোলাপকে দেখিতে পারি না। প্রত্যেক গিরি, প্রত্যেক প্রত্যন্ত পর্ব্বত ঈশ্বরের মহিমা ব্যক্ত করে। আমার নিকটে বিগত বংশীয়েরা যাহা যাহা বলিতেছেন, আমি তৎপ্রতি মনোযোগী। ইউরোপ, আর অকুশল কেন? এস, আমরা পরস্পরের হস্ত স্পর্শ করি। আমি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা বলিয়া অভিমান করি, ব্রিটিষগণকে প্রীতি করি, এবং মহারাণীর প্রতিনিধির নিকটে প্রণত হই। আমি আমার সম্মুখে সেই জাতিসম্মিলনের ব্যাপার দেখিতে পাইতেছি, যাহা এক দিন অতি সুন্দর একতা সম্পাদন করিবে এবং সমুদায় শত্রুতা বিনষ্ট করিবে। প্রত্যেক সায়ংসম্মিলন এবং বন্ধুসমাগম আমার নিকটে উপাসনা-সভা, কারণ আমি

তন্মধ্যে পরস্পরকে একতাবদ্ধ করিবার উপাদান দেখিতে পাই। আমি দেখি-তেছি, কালপ্রবাহে সমুদায় ধর্ম্ম মিশিয়া যাইতেছে, প্রত্যেক বিষয় সম্মিলনের ব্যাপার সত্বর করিতেছে। বন্ধুগণ, আমাদিগের জাতীয় ভাব অগ্রাহ্য করিও না, তোমাদিগের সভ্যতা, সাহিত্য, ভাষা আমাদিগকে দাও, কিন্তু আমাদিগের ভাষা ও সাহিত্য, আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষা কর। যাহা কিছু অপবিত্র এবং অবিশুদ্ধ, তাহা বিলুপ্ত করিয়া ফেল; কিন্তু আমাদিগকে আমাদিগের প্রকৃতি অনুসারে চলিতে দাও, তাহা হইলে জানিও, ঈশ্বরের অভিপ্রায় আমাদিগেতে পূর্ণ হইবে। যে অনন্ত ধর্ম্ম কখন শেষ হইবে না, এবং ইউরোপ ও আসিয়াকে একত্র বদ্ধ করিবে, ঈশ্বরের প্রেমে পরস্পর পরস্পরকে আপনার দিকে টানিবে, সেই ধর্ম্মে শান্তি কুশল ও ভ্রাতৃত্ব অনন্তকাল রাজত্ব করিতে থাকুক।"

৯ই মাঘ, প্রাতে আচার্য্যের উপদেশ—'আত্মাই আমার বন্ধু, আত্মাই আমার শত্রু'

"৯ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী), রবিবার। অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিন উৎসব। প্রাতে আচার্য্য মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার প্রথমভাগ নিষ্পন্ন করেন। আচার্য্য মহাশয় উপদেশ প্রার্থনা দ্বারা প্রথম বেলার উপাসনার সমাপ্তি করেন। উপদেশের বিষয় সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে,—আত্মাই আমার বন্ধু, আত্মাই আমার শত্রু। কেহ যে মনে করিবেন, অমুকে আমার সর্ব্বনাশ করিল, অন্যথা আমার এইরূপ দুর্গতি হইত না, এরূপ মনে করা অন্যায়। আমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, করিতেছি। কেহ সর্ব্বনাশ করে নাই, করিতে পারে না, ইহাই সত্য কথা। আচার্য্য তাঁহার জীবনে এই সত্য সর্ব্বদা দেখিয়াছেন, ইহাতে তিনি নিঃসংশয়। আত্ম-ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী হইলেই দুঃখ, ক্লেশ, অকৃতকৃত্যতা, তৎসহ এক হইলে সুখ শান্তি ঐশ্বর্য্য। এই প্রণালীতে তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, আশা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা লাভ শত গুণে অধিক হইয়াছে। তিনি চাহি-লেন একটি সামান্য দেশ, পাইলেন প্রকাণ্ড পৃথিবী। এমন বিষয় নাই, যাহা তাঁহার আশা অতিক্রম করিয়া যায় নাই। সকলে আত্মাকে আত্মার বন্ধু করিয়া, আত্ম-ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত করিলে, এমন কিছু নাই, যাহা তাঁহাদিগের অপ্রাপ্য থাকিবে। মধ্যাহ্নকালে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মধ্যাহ্নকালের উপাসনা সম্পন্ন করেন। তদনন্তর মহর্ষি ঈশার এবং এব্রাহিমের জীবন হইতে

কিছু পঠিত হয়। এক এক ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, সায়ঙ্কালীন সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই সঙ্কীর্ত্তনের প্রমত্ততাতে সমুদায় ব্রহ্মমন্দির আশ্চর্য্য গম্ভীর ও মধুর ভাব ধারণ করে। সায়ঙ্কালীন উপাসনার প্রথম ভাগ ভাই উমানাথ গুপ্ত এবং শেষ ভাগ ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। নববিধান সমুদায় পৃথিবীকে অধিকার করিল, বলা হইতেছে, অথচ দৃষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, উহা অল্প কয়েকজনের মধ্যে বদ্ধ আছে; এই যে বৈসাদৃশ্য, ইহা দৃশ্যতঃ, বস্তুতঃ নহে, উপদেশে এইটি সুন্দররূপে বিবৃত হয়।

১০ই মাঘ—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা ও ইংরাজীতে উপাসনা

"১০ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী), সোমবার। অপরাহ্ণ ৫টার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা হয়। ভ্রাতা জয়গোপাল সেন সভাপতির কার্য্য করেন, ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচারবিভাগের আয় ব্যয়াদির বিষয়ে হিসাব দিয়া তাঁহার মন্তব্য ব্যক্ত করেন। এদিন সভার কার্য্য সমগ্র হইতে পারে নাই বলিয়া, অপর এক দিবস অবশেষ কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত হয়। সায়ংকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরাজীতে উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। উপদেশের বিষয় 'পৃথিবী প্রদক্ষিণ।'

১১ই মাঘ—নগরসঙ্কীর্ত্তন ও বিডনপার্কে বক্তৃতা

"১১ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী), মঙ্গলবার, প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। অপরাহ্ণে কলুটোলা হইতে নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়া বিডনপার্কে গমন করে। সেখানে সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া আচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন :—

"হে অগ্নিস্বরূপ! হে জ্যোতির্ম্ময়! হে আর্য্যজাতির প্রাচীন দেবতা! উপরের ঐ মেঘের মধ্য হইতে দর্শন দাও। দাও, দাও, দর্শন দাও। ঐ মেঘ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হও। যেমন সূর্য্য পূর্ব্ব দিকের মেঘ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া চারিদিকের অন্ধকার বিনাশ করে, তেমনি করিয়া ভারতবাসীদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হও। আমার নিকট প্রকাশিত হও; তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর পরিবর্ত্তে, হে পরাৎপর ব্রহ্ম! তুমি আসিয়া উপস্থিত হও। আমি তোমাকে ডাকিতেছি, কৃতাঞ্জলিপুটে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ভ্রাতৃগণ আসিয়াছেন, কি বলিতে হইবে, বলিয়া দাও; সকলের সঙ্গে মিলিয়া, সাহস পাইয়া, ভারত উদ্ধার করিতে হইবে। কাঙ্গালশরণ, দয়া কর, দেখা দাও; সহাস্য ভাব ধারণ করিয়া, কয়েকটী কথা বলিয়া, সদ্গতি লাভ করিব। এই আকাশ পূর্ণ করিয়া তুমি বর্ত্তমান রহিয়াছ। সুবুদ্ধি দাও, রসনায় স্বর্গীয় রস দান কর; জীবনপ্রদ কথা বলিয়া ভাইগণকে সন্তুষ্ট করি, কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর।

"আমি কে, যে আজ এখানে বৎসরান্তে উপস্থিত হইলাম? আমি জ্বলন্ত আগুন! কত জ্বলন্ত প্রত্যাদেশ পাইলাম; যেমন অগ্নি ছোটে, তেমনি আমার মুখ হইতে জ্বলন্ত সত্যের কথা বাহির হইবে। আমি এক জন লোক, তোমাদের দেশে বাস করি; এই লোক মৃত শাস্ত্র, মৃত দেবতা, মৃত মন্ত্র তন্ত্রকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। কল্পিত শাস্ত্র ও কল্পিত ঈশ্বরকে আমি মানি না। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, আমার ঈশ্বর অগ্নির ন্যায়। বিশ্বাসের তেজে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত অগ্নি উঠে; অগ্নি আমার জীবনকে সঞ্জীবিত রাখে। অগ্নি-সমান আমার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের জন্যই, কোটী লোক একত্র হইলেও, আমায় বাধা দিতে পারিবে না। ব্রহ্মাগ্নির এক স্ফুলিঙ্গ কেহই নির্ব্বাণ করিতে পারে না। যদি ভাল চাও, অগ্নিপ্রচারকের কথা শ্রবণ কর। আর কোন মৃত দেব দেবীর কথা বলিও না। হয়, দেখাও তোমাদের দেবতা, না হয়, আমাদের জীবিত দেবতাকে দেখাইয়া দিব। প্রত্যেকের নিকটে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মকে দেখাইয়া দিব; নতুবা আমি প্রবঞ্চকের শরীর মন ধারণ করি। পরের কথা আমি শুনিব না, পরের শাস্ত্র মানিব না; পরীক্ষা করিয়া দেখিব, এই হরি, তবে আমি মানিতে পারি। অবিশ্বাস কোন মতেই হইতে পারিবে না। আমি স্পষ্ট দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, হরি এই বর্ত্তমান। যত ভক্ত ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলে এই কথা কহিতেছেন। কোথায়? এই এখানে। ভূত নয়; প্রেততত্ত্বের কথা বলিতেছি না। তাঁরা কি গত? বল, তাঁহারা কি পরলোকগত? বেদ কি বই? না, আগুন; বেদ আগুনের মত জ্বলিতেছে। পুরাণ কি ঘুমায়? আর ভারতকে ঠকাইও না। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ কে? কাশী, বৃন্দাবন কি? যদি আগুন থাকে, দেখাক্। এক আগুনে দশ গ্রাম পুড়িয়া যায়, কোটী অগ্নি একত্রিত হউক। এস, ভক্তগণ,

এস ; এস, চার বেদ, এস ; গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী প্রভৃতি একত্র হও। হইবে না ? সমুদায় একস্থলে আসিবে না ? এখনই আসিতে হইবে। হিন্দু ভাই, শাক্ত বৈষ্ণবে মিলিতে হইবে। তুমি কি মনে করিতেছ, কেবল কাশীধামেই যাপন করিবে ? কেবল শ্রীক্ষেত্রের পক্ষপাতী হইবে ? তোমার দেবতা ইনি, উনি তোমার দেবতা নন ? এই মন্ত্র তোমার ভাল লাগে, ঐ মন্ত্র তোমার ভাল লাগে না ? এ কথা যদি তুমি বল, তবে হিন্দু নও। সাম্প্রদায়িক, হিন্দু ? হিন্দু কে ? আর্য্যসন্তান কে ? 'অতলস্পর্শ' বিশেষণ পাসিফিক মহাসাগরে খাটে না, কিন্তু হিন্দুভাবে খাটে। তুমি সাম্প্রদায়িকের সন্তান ? বৈষ্ণব, শাক্তের সহিত কলহ করিতেছ ? শাক্ত, মৃদঙ্গ দেখিলে তুমি চটিয়া যাও ? এই যে নিশান উড়িতেছে, ইহা ঐ সমস্তের ভয়ানক প্রতিবাদ করিতেছে। হিন্দুরক্ত থাকিলে কাহারও সাম্প্রদায়িক হইবার সাধ্য নাই। নববিধানের রব শুনিয়া, নিশান দেখিয়া এবার বলিতে হইবে, শাক্ত ভক্ত সমুদয় আমার, বেদ পুরাণ সকলই আমার। আমার ভারত যেমন নির্ব্বাণ শিক্ষা দিবে, এমন কে পারিবে ? এমন ভক্ত আর কোথায় পাওয়া যাইবে ? এমন শাক্ত কোথায় ? এমন সন্ন্যাসী কোথায় ? যোগী কোথায়, হিমালয়বাসী যোগীর ন্যায় ? সে দিন ইউরোপকে কি বলিয়া আসিয়াছি, জান ? ইউরোপকে বলিলাম, আয় ; ঈশ্বরের হুকুম, আয়, আসিয়ার সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে। আসিয়া মলিন ? আর্য্যসন্তান কাল ? একথা বলিবার আর সাধ্য নাই ; ক্ষান্ত হও। ইউরোপ, তুমি কি দিতে চাও ? ঈশা ? যীশু খৃষ্ট মহর্ষি ; হিন্দু তাঁহাকে কেন লইবেন না ? যোগে ব্রহ্ম লাভ করিয়া যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ হইয়াছিলেন, সৎপুত্রের দৃষ্টান্ত যিনি দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাকে হিন্দু পরিত্যাগ করিবেন ? ভেদ কি ? কাল সাদা ভেদ ?

" 'অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥'

"এই যে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ, ইহাতে হিন্দু বলিতেছেন, বসুধার সকলই কুটুম্ব। যে সাধুকে আমার কাছে আনিবে, আমি তাঁহাকেই নমস্কার করিব। দেহের মধ্যে আর্য্যশোণিত এই কথা বলিতেছে। শোণিত গরম রহিয়াছে। আমি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারিব না। পঁচিশ বৎসর খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনেক সাধু মহর্ষিকে লাভ করিয়াছি। উদার ঋষিসন্তান আমরা ; আমরা

জন্মেও কাহাকেও শত্রু বলিব না। দেশীয় কি বিদেশীয়, সকল সাধুকেই হৃদয়ে স্থান দিব। শ্রীগৌরাঙ্গ বক্ষের ধন, যদি আজ দেখিতে পাইতাম, চরণ জড়াইয়া ধরিতাম। হরিদাস মুসলমান সন্তানকে তিনি কোল দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া অস্পৃশ্য মুসলমান সন্তানকে তিনি আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিদাস যে হরিনাম লইয়াছিল। সে হরিপ্রেমে প্রেমিক, সে কেবল জানে হরিনাম। যাহাকে সে হরিনাম বলিতে দেখে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া ধরে। প্রেমের মত্ততা এমনই। সে বলে, ভাই! আমার প্রভু তোমার প্রভু। অভেদমন্ত্র লও। আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, চলে এস। উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর, চলিয়া এস। নববিধানের বিধাতার আদেশ। কি মন্ত্র চাই, জান? ভালবাসা। আর কি? ভালবাসা। আর কি? ভালবাসা। মনের দ্বার খোল, মোহ পরিত্যাগ কর। যত ধর্ম্ম আছে, আমরা সকলকে বুকে রাখিব। ভেদজ্ঞান নাই। যোগী সন্তান হইয়া যোগমন্ত্র পাঠ করিব। 'যোগ, যোগ, যোগ, যোগ।' আর কিছুই বাকী থাকিবে না; যোগে সমস্ত এক হইয়া যাইবে। যোগে সকল সাধু, সকল মহাভাব বুকের ভিতর লাভ করিব। ভাগবতী তনু লাভ করিব। হৃদয়ে আগুন, প্রাণের ভিতরে আগুন। কে এঁরা? সকল ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে। দেশভেদ নাই; কালভেদ নাই। চারি শত নয়, কিন্তু চল্লিশ হাজার বৎসরের সাধুরাও আমাদের। প্রেমই কেবল দিতে হইবে। তাহা হইলে তোমার আমার জন্যও নূতন ধ্রুবলোক নির্ম্মিত হইবে। নববিধানের নবধ্রুবলোক প্রস্তুত হইবে। প্রেমের গণ্ডীর ভিতরে থাকিতে হইবে। নতুবা মহা বিপদ্। জানকী, আজ শিক্ষা দাও। হনুমান্, তুমি আসিয়া আজ আমাদের শিক্ষা দাও। হনুমান্ কি? ভক্ত তুমি; সীতা উদ্ধার তোমা হইতে। 'জয় রাম' বলিয়া তুমি জানকীকে উদ্ধার করিলে। কে সীতা আজ? জগৎপতি আমাদের পতি। যে গণ্ডী তিনি দিয়াছেন, তাহার এক চুল এদিক্ ওদিক্ হইলে নিশ্চয় মৃত্যু; ভিতরে থাকিলে কিছুতেই প্রাণ যাইবে না। সোণার হরিণ,—ধন, মান, ঐশ্বর্য্য। সোণার হরিণ চাহিলেই গণ্ডীর ভিতর একাকী থাকিতে হয়। গণ্ডী পার হইলে মায়াবী রাক্ষসের হাতে পড়িতে হইবে। তখন কোথায় যোগিবেশে বলপূর্ব্বক রথে তুলিয়া লইয়া যাইবে। (এই সময় বক্তৃতা সমাপ্ত করিবার জন্য মৃদঙ্গধ্বনি-সহকারে সঙ্কেত

করা হইল।) বন্ধুগণ সাবধান করিয়া দিতেছেন, শরীর অসুস্থ, বলা শেষ করিতে হইল। ভারত! তুমি ধার্ম্মিক; চিরকাল ধর্ম্মপথে আছ। ভগবান্ পতি আমাদের; আমরা সোনার মৃগ দেখিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব না। কোটী মৃগেও মন টলাইতে পারিবে না। কিছুতেই প্রেমের পথ, ধর্ম্মের পথ ছাড়িব না। তুমি আমি ভাই, চীৎকার করিয়া তুরী ভেরী বাজাইয়া তাই বলিতেছি, ভেদভাব দূর করিয়া দাও; সমস্ত জগতে প্রেম বিস্তার কর। ভগবান্ সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

"সায়ঙ্কালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন।

১২ই মাঘ—মঙ্গলবাড়ীর উৎসব ও ভারতবর্ষীয় সাধারণ সভার অবশেষ কার্য্য

"১২ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী), বুধবার, মঙ্গলবাড়ীর উৎসব ও ব্রাহ্মভোজন হয়। অদ্য ভারতবর্ষীয় সাধারণ সভার অধিবেশনের অবশেষ কার্য্য হয়। ইহাতে পশ্চিমে হিন্দী ভাষায় একখানি নববিধান পত্রিকা বাহির করিবার এবং ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সাহায্য সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব হয় এবং তত্তৎকার্য্য-সম্পাদনের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র সভা স্থাপিত হয় *।

---

* ১৮ই ফেব্রুয়ারীর নববিধানপত্রিকায় লিখিত হইয়াছে:—"অদ্য অপরাহ্নে কমলকুটীরে সাধারণ সভার পুনরধিবেশন হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজসকল হইতে এবার অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি আগমন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির জন্য স্বতন্ত্র সভা (Committees) হয়:—(১) উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষায় পাক্ষিক পত্রিকা এবং নববিধান-ধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ পুস্তিকা প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশ করা। (২) কলিকাতা ও মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম পুত্রকন্যাগণকে পরীক্ষা করা ও পারিতোষিক দেওয়া। (৩) ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সাহায্য সংগ্রহ করা। (৪) প্রচারকার্য্যালয় ও ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক পুস্তিকা প্রভৃতির বিক্রয়ের ভাল ব্যবস্থা করা। (৫) সাধকশ্রেণীতে আরও অনেকে ভুক্ত হন, তজ্জন্য উপায়াবলম্বন করা। যে সকল মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজ নববিধান স্বীকার করিয়াছেন, সেই সেই সমাজের সম্পাদক ও সমাজের নাম লিখিয়া লওয়া। গত বর্ষে ভাগলপুরের বন্ধুগণ এবং বিহারস্থ অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ভাই দীননাথ মজুমদার এবং তাঁহার পরিবারের সেবা করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। নিকটবর্ত্তী প্রদেশের সমাজ সকলেতে তিনি গমন করিবেন এবং সেই স্থানের ব্রাহ্মগণ বিহারপ্রচারভাণ্ডারে সাহায্য করিবেন, এইরূপ প্রস্তাব হইল। মণ্ডলীর সহানুভাবক ও বন্ধুগণকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।"

১৩ই মাঘ—আর্য্যনারীসমাজ

"১৩ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী), বৃহস্পতিবার, আর্য্যনারীসমাজ। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনা করেন, আচার্য্য মহাশয় উপদেশ দেন। সায়ঙ্কালে নারীগণ বরণাদির কার্য্য সম্পন্ন করেন।

১৪ই মাঘ—'আশালতা' সভার উৎসব

"১৪ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী), শুক্রবার, 'আশালতা' সভার উৎসব। আশালতার বালকবৃন্দ সুরাপান-নিবারণ বিষয়ে সঙ্গীত করিতে করিতে, আলবার্ট কলেজ হইতে কমলকুটীরে উপস্থিত হয়। দেশীয় বিদেশীয় বক্তা সকলে বক্তৃতা করিয়া, সুরাপাননিবারণ বিষয়ে সকলকে প্রোৎসাহিত করেন। সন্ধ্যাকালে সুরাদানবের দাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উদরস্থ বোম সকলের ভয়ানক শব্দচ্ছলে চিৎকার করিয়া দানব প্রাণত্যাগ করে, বালকবীরবৃন্দ দানব-নাশে অতীব প্রসন্নহৃদয়ে স্ব স্ব গৃহে গমন করে।

১৫ই মাঘ—কমলকুটীরে 'নবনৃত্য'

"১৫ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী), শনিবার, কমলকুটীরে সন্ধ্যা ৭টার পর 'নবনৃত্য' হয়। নবনৃত্য যে দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। এ নৃত্যে কাহার আত্মসংবরণ করিয়া বসিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যে মনে করিয়া আসিয়াছিল, নাচিবে না, সেও নাচিয়াছে। মণ্ডলে মণ্ডলে বালক যুবা বৃদ্ধ সকলের মণ্ডলাকারে বিপরীত ক্রমে নৃত্য, এ অতি নবীন; ইহা দেখিলে কাহার না হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে? মানুষ প্রেমময়ের নামে প্রমত্ত হইয়া নাচিবে না, তো কাহার নামে নাচিবে? এমন পাষণ্ড হৃদয় কাহার আছে, যাহারা ঈশ্বরের নামে নৃত্য না করিয়া বিরোধী হয়? ভ্রাতা কুঞ্জবিহারী দেব নৃত্যে নেতৃত্বকার্য্য করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ স্থূল শরীর কাহার দ্বারা আবৃত থাকিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং নৃত্যস্থলে তিনি যে নেতা হইয়া নৃত্য করিতেছেন, যে না জানে, সেও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয়ের নৃত্যের নিবৃত্তি নাই, তাঁহার শরীর অসুস্থ, অথচ তৎসম্বন্ধে বিস্মৃতি, সুতরাং বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল।

১৬ই মাঘ—প্রাতঃসন্ধ্যা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, মধ্যাহ্নে কমলসরোবরে জলাভিষেক

"১৬ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী), রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃসন্ধ্যায় উপাসনা

হয়। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, ভ্রাতা দীননাথ চক্রবর্ত্তী, ভাই প্রসন্নকুমার সেন, ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। মধ্যাহ্নকালে কমল-সরোবরে জলাভিষেক হয়। অনুষ্ঠান-প্রারম্ভে আচার্য্য মহাশয় বলেন :—

"প্রাচীনকালে, হে বন্ধুগণ, আর্য্যসন্তানগণ, আর্য্যমুনিঋষিগণ এই জলের প্রশংসা করিতেন। মধ্যকালে যিহুদী এবং ঈশার শিষ্যগণ এই জলের প্রশংসা করিয়াছেন। এখন নববিধান এই জলের প্রশংসা করিতেছে। যে কাল গত হইয়াছে, তাহার আদি মধ্য অন্তে পবিত্র মহাজলের প্রশংসা হইয়াছে। কেন, হে জল, শুদ্ধ জল, সুমিষ্ট জল, স্বাস্থ্যপ্রদ শান্তিপ্রদ জল, তোমার এত গুণ? ঋষিকুল তোমার প্রশংসাগীত যে সুরে ধরেন, বিনীত দাস কিরূপে সে সুরে তোমার প্রশংসাগীত ধরিবে? 'সত্যম্'—জলময় সত্য। ঈশ্বরের সত্তা এই জলরাশিতে বেড়াইতেছে। জীবন, সত্য, প্রাণ, শক্তি এই সমস্ত জলবিন্দুতে। এই জলরাশির মধ্যে শক্তি সাঁতার দিতেছে, ডুবিতেছে, বিশ্বাসী ইহা দেখিতে পায়। ঐ শক্তি নাবিতেছে, উঠিতেছে। প্রত্যেক জলবিন্দু সৎ। 'আমি আছি' প্রত্যেক জলবিন্দু হইতে এই কথা আসিতেছে। এই জল সত্যে পরিপূর্ণ, হাত দিলাম সত্যের ভিতরে, শক্তির ভিতরে। 'জ্ঞানম্'—দেখ, চক্ষুসকল জলে ভাসিতেছে, জলের ভিতর হইতে বিশ্বতশ্চক্ষু দেখিতেছেন। এই বিশ্বের চক্ষু কোটি কোটি সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে, নদনদী মহাসাগরে। দেখ, জলের ভিতর হইতে বৃহদ্ব্রহ্ম তাকাইতেছেন, সকলকে দেখিতেছেন। 'প্রেম'—ঐ প্রেম, ঐ ভালবাসা ভাসে কমলসরোবরে। প্রেম খেলা করিতেছে, কেলি করিতেছে জলের ভিতরে। প্রেমময়ী মা, তুমি এই জলে নামিয়া আছ। শত পদ্মফুল ফুটিয়াছে। কমলদ্বারা অর্চ্চিত. কমল সকল লইয়া কমলালয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রেমের সরোবর, এই সরোবরের চারিদিক তুমি প্রেমেতে পূর্ণ করিয়াছ। করুণাবারি, স্নেহধারা, তুমি সলিল ভালবাস। সলিল অতি শীতল, তোমার মত। জগৎপ্রসবিনি, যেমন তুমি প্রেম, তেমনি তোমা হইতে নিয়ত প্রেমবারি বহির্গত হইতেছে। 'পুণ্য'—এই জলময় পুণ্য। শুদ্ধতা জলকে শুদ্ধ করিতেছে। পুণ্যময়ী মা যিনি, তিনি জলের ভিতর। হে জল, পুণ্যের অধিষ্ঠানে পুণ্য হও। পুণ্য চক্ষু চারিদিকে, পুণ্যের তেজ জলের ভিতরে। পুণ্যের জলরাশি গভীর পূর্ণ। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কেবলই

পুণ্য। মা পুণ্যময়ীর মুখ হইতে তেজের প্রতিভা পড়িতেছে, তাঁহার মুখ-জ্যোতিতে সমুদায় জল জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। সকলই শুভ্র বর্ণ। এই জলে সেই পুণ্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, শুদ্ধি ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট করাই। জল, তুমি পুণ্যের জল, শুদ্ধ জল। পাপ প্রক্ষালন করিতে তুমি সক্ষম হইবে। পাপ দূর করিবার পক্ষে পুণ্য তোমার প্রাণ হইল। জল, তুমি আনন্দময়। স্বর্গের আনন্দ, স্বর্গের সম্পৎ তোমার ভিতরে। মধুময় সরোবর কমলসরোবর, শান্তি, প্রফুল্লতা, সুখ, বিমল আনন্দ জলে। জল স্পর্শ কর, সুখী হইবে; জলে অবতরণ কর, শোক যাইবে, শান্ত হইবে। প্রত্যেক জলবিন্দুতে শান্তি ভাসিতেছে, 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'। জল চুপি চুপি প্রত্যেক ভক্তের কাণে বলে, শান্তি দিব, সুখ দিব, অসুখীর অসুখ হরণ করিব, প্রাণ যদি জ্বলে, নির্ব্বাণে নিমগ্ন করিয়া দিব। জলে শান্তি, নির্ব্বাণ, সুখ, মধুরতা। এ মিছরী গোলা জল, এ মধুময় জল, এ সরোবরে সমুদায় তৃষ্ণা নিবারণ হয়, সমস্ত হৃদয় শীতল হইয়া যায়। ঐ সৎ, ঐ চিৎ, ঐ আনন্দ, ঐ জীবন ভাসিতেছে। ঐ জ্ঞান, ঐ ভালবাসা, ঐ পুণ্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সচ্চিদানন্দ। ঐ ঈশা স্নান করিতেছেন সৎসলিলে, উঠিলেন সলিল হইতে জ্ঞানপ্রভা লইয়া। জ্ঞানপুরুষ উঠিলেন, আর ঐ আকাশ হইতে আনন্দকপোত পক্ষ বিস্তার করিয়া অবতীর্ণ হইলেন, শান্তি দিলেন। সৎ এই সরোবরে ডুবিল, উঠিল জ্ঞান, উড়িল সমুজ্জ্বল কপোতপক্ষ 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিতে বলিতে। ঈশা, ডুব দাও, আজ সহস্র বৎসরের ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া যাউক। এই জলে ঈশা স্নান করিতেছেন, আজ ভারতবর্ষ সেই স্থানে সঞ্জীবিত, প্রাচীন জলমন্ত্র সঞ্জীবিত। এই তো যোগী ঈশা আসিয়াছেন, এস, চল, স্নান করি। ঋষি মুনি সকলে উপবেশন করুন। বড় বড় প্রাচীন শ্বেতকায় শ্বেতকেশ শ্বেতশ্মশ্রু সকলে গম্ভীর ভাবে মন্ত্র পাঠ করুন, জলকে পুণ্যময় করুন, সত্যময় করুন, আনন্দময় করুন, মুক্তিপ্রদ করুন। বল, জল, বড় হও, জল শুদ্ধ হইল। গঙ্গা যমুনা নর্ম্মদা কাবেরী সকলে এই জলের প্রশংসা করিতেছেন। যেখানে গঙ্গা যমুনার উৎপত্তি, সেখান হইতে সমুদায় ভাগীরথী-তীরে ঋষিগণ বসিয়া গঙ্গার স্তব করিতেছেন। আমরা কি সে স্তব শুনিব না? সম্মুখে জলরাশি রাখিয়া মুনি ঋষিগণ কি ভাবিতেছেন, আর গাইতেছেন? আহা, কি জলের মধুর স্তব,

গম্ভীর স্তব, জলের ভিতরে কি পুণ্য! আমরা কি জলের অবমাননা করিতে পারি? ভক্তগণ জলের প্রশংসা করিয়াছেন, প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা জলের মহিমা গান করিয়াছেন, প্রাচীন আর্য্যেরা জলে লক্ষ্মীকে অবতীর্ণা দেখিয়াছেন। জল তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট এত পবিত্র, এত গুণযুক্ত, এত উন্নত প্রশংসার বিষয় ছিল। বর্ত্তমানে ভক্তেরা জলের মহত্ত্ব ভুলিতে পারেন না। ওরে নাস্তিকবংশ, জলকে তুই ব্রহ্মহীন বলিয়া পরিহাস করিস্? সন্দেহযুক্ত আত্মা মরে। জল কমলার পদবিহীন, তাঁহার চরণরেণু জলে নাই, তুই কখন এ কথা বলিস্ না। আর্য্য পিতা মাতা জলকে বড় বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, আদি অন্ত মধ্যে সকলে জলের গুণ গান করিয়াছেন। ঐ দেখিতেছিস্, ঈশা অম্বু স্নান করিতেছেন, কপোত মধ্য স্থানে স্থির হইয়া পক্ষপুট বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বদিক্ আজ পশ্চিম দিকের যিহুদিগণের সঙ্গে সম্মিলিত হইল। আজ জলমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করি। আমার সৌভাগ্য! ঈশা স্নান করিতেছেন, সাঁতার দিতেছেন, নির্দ্দোষ মেষশাবক সকলকে ধরিয়া স্বর্গধামে লইয়া যাইতেছেন। জলবিন্দু গাত্রে ছড়াই, পুণ্য সলিলে শরীর সুশীতল করি। এইটুকু জলের ভিতরে সত্য জ্ঞান পুণ্য আনন্দ অবস্থিতি করিতেছে। এই সত্য, এই জ্ঞান, এই পুণ্য, এই আনন্দ; এই সত্য, এই জ্ঞান, এই পুণ্য, এই আনন্দ; এই সত্য, এই জ্ঞান, এই পুণ্য, এই আনন্দ; এই জল শরীরে প্রবিষ্ট হউক, ব্রহ্মকৃপায় পুণ্য শান্তি অর্পণ করুক, এই শান্তি-জল স্পর্শ করিয়া শরীর শুদ্ধ হউক। হে জল, তুমি পাপ নষ্ট কর, অকল্যাণ হরণ কর, নিরানন্দ আনন্দে পূর্ণ কর। হে জল, মৃতদিগকে সঞ্জীবিত কর, জীবনে সংযুক্ত কর। জীবন ব্রহ্মময়, আনন্দ এই জলবিন্দুতে। এই জল রক্ত মাংসকে পুণ্যময় করুক। ব্রহ্ম ভাসেন জলে। সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে দোলাই, ভাসাই, খেলাই জলে। জল ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মশক্তিস্বরূপ। জল তুমি মহৎ হও, প্রবল হও, প্রশংসিত হও, আরাধিত হও। সূচিকাগ্রে ব্রহ্মতেজ বাহির হইল। হে জ্যোতি, চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান্ কর। জলের ভিতরে, ব্রহ্মতেজ, এস। চক্ষু, শুদ্ধদর্শনে শুদ্ধ হও; কর্ণ, শুদ্ধ কথা শ্রবণ কর; নাসিকা, শুদ্ধ সৌরভ গ্রহণ কর; রসনা, শুদ্ধ রস আস্বাদন কর; প্রাণ, শুদ্ধ হও, শুদ্ধতায় সঞ্জীবিত হও। হস্ত, শুদ্ধ হও; পদ, শুদ্ধ হও; পা, শুদ্ধ পথে চল; হস্ত, শুদ্ধ কর্ম্ম কর। সর্ব্বাঙ্গ, পুণ্য

দ্বারা পূর্ণ হও। জলেতে সাধন ঘনীভূত হইল। চক্ষু সকলই ব্রহ্মময় দর্শন করিতেছে। ঋষিগণ, মহর্ষি ঈশা এই জলে নামিলেন, ঘাটে অবতরণ করিলেন। ঈশা যে জলে স্নান করিয়া পবিত্রাত্মাকে দেখিয়াছেন, সেই জলে স্নান করি, স্নান করিয়া পবিত্রাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করি। ঋষিগণের সঙ্গে ঋষি হইয়া, ঈশার ন্যায় হইয়া আমরা ঈশা হইব, আমাদিগের জীবনে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে। উৎসবের হরি, তোমায় স্তব করি, ব্রহ্মময় জলে তোমার সঙ্গে হাসিতে হাসিতে অবতরণ করি। জল, তোমার মাকে দেখাও, তোমার ভিতরে মা আছেন। সচ্চিদানন্দ, একবার জলে হাস। হাসিতে হাসিতে জলে ডুবি, প্রাণ শীতল করি, সর্ব্বাঙ্গ শীতল করি। প্রাণ যে জুড়াইল। সচ্চিদানন্দের গভীর আনন্দে মগ্ন হইয়া ঋষিকুল দাঁড়াইলেন। আজ পূর্ব্ব পশ্চিম দুই এক হইল। স্বর্গ স্পর্শ করিলেন পৃথিবীকে, পৃথিবী স্পর্শ করিলেন স্বর্গকে। আজ ভক্তির ঘাটে স্নান করিয়া আমরা সকলে পাপমুক্ত হই।

"মা দেবি, দেখা দাও, জলে দেখা দাও। মা, প্রাণ জুড়াক, জল মধু বর্ষণ করুক, স্বর্গ হইতে বৈরাগ্য পুণ্যধন জলে অবতীর্ণ হউক। মা, দেখা দাও, মা, দেখা দাও, মা, দেখা দাও, এই তোমার শ্রীপাদপদ্মে বিনীত প্রার্থনা।

"অনন্তর আচার্য্যমহাশয় সকলের মস্তকে নিজহস্তে তৈল দেন, সকলে সমাহিতচিত্তে অবগাহন করেন। অবগাহনানন্তর সঙ্কীর্ত্তন হইয়া এ দিনের কার্য্য শেষ হয়।

১৭ই ও ১৮ই মাঘ—প্রচারযাত্রা

"১৭ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী), সোমবার, ১৮ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী), মঙ্গলবার, প্রচার-সৈন্য-যাত্রা ; প্রথম দিবসে ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভ্রাতা হরিসুন্দর, দ্বিতীয় দিবসে ভাই অমৃতলাল বসু ও ভ্রাতা রামেশ্বর দাস বক্তৃতা করেন।

১৯শে মাঘ—উৎসবসমাপ্তি

১৯শে মাঘ (৩১শে জানুয়ারী), বুধবার, অপরাহ্ণে কমলসরোবরের চারিদিকে নির্জ্জনযোগ সাধন হয় ; ইহাতে ব্রাহ্মিকাগণও যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে উপাসনাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সমাপ্তিসূচক প্রার্থনা, সঙ্কীর্ত্তন, সস্ত্রীক যোগসাধন নিষ্পন্ন হইয়া, সমানীত মোহনভোগ ও জলে সাধুগণের শোণিত মাংস ভক্তগণ পানভোজন করেন।"

২৫

দল হইতে বিদায়

লর্ড বিশপকে কেশবচন্দ্রের পত্র

উৎসবের সময়ে 'ইউরোপের প্রতি আসিয়ার নিবেদন' কেশবচন্দ্র বিবৃত করিয়াছেন। শীঘ্র কলিকাতায় ভারতবর্ষের প্রধান খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণের একটী সমিতি হইবে, ইহা অবগত হইয়া কেশবচন্দ্র লর্ড বিশপ্ জন্‌সন্ সাহেবকে পত্র লিখেন (ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ)। এই পত্রে তিনি প্রথমতঃ অনুরোধ করেন, এ দেশে যে সকল উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টান আছেন, তিনি যেন তাঁহাদের দায়িত্ব ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। খ্রীষ্টের জীবন ভারতবর্ষীয়গণের জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া, ভারত ও ইংলণ্ড খ্রীষ্টেতে এক হইয়া যায়, ইহা একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয়। এ কার্য্য খ্রীষ্টের অনুগামিগণের উচ্চজীবন ভিন্ন কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তিনি যদি তাঁহাদিগকে উপাসনাশীল, ধার্ম্মিক ও অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতের হৃদয় খ্রীষ্টের দিকে আকৃষ্ট হইবেই হইবে। খ্রীষ্টান কর্ম্মচারিগণ চার্চে নিয়মিত উপাসনায় যোগ দেন, এ সম্বন্ধে যত্ন করিতে কেশবচন্দ্র বিশেষ অনুরোধ করেন। দ্বিতীয়তঃ এ দেশে বহু সম্প্রদায় আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের একত্ব বিঘটিত করিয়া ফেলিয়াছে। ভারতের খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিবার পক্ষে এটি একটি মহান্ অন্তরায়। এদেশের খ্রীষ্টমণ্ডলী ঈদৃশ উদার ও প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন যে, প্রোটেষ্টাণ্ট ও কাথলিক এ উভয়ের একত্র সমাবেশ হয়। অনেকে ইহা অসম্ভব মনে করেন; কিন্তু স্বয়ং খ্রীষ্ট যখন বলিয়াছেন, "তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, ইহা দেখিয়া লোকে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য," তখন তাঁহার শিষ্যগণের নিকটে এটি আশা করা কিছু অধিক কথা নয়। সুতরাং লর্ড বিশপ্ যথাশক্তি মতভেদ নিবারণ করিয়া, যত দূর একত্ব আনয়ন করিতে পারেন, তজ্জন্য কেশবচন্দ্রের অনুরোধ। তাঁহার তৃতীয় অনুরোধ এই যে, ভারতের ধর্ম্মের প্রতি কেহ যেন বিদ্বেষপোষণ না করেন। ভারতের ধর্ম্মের প্রতি সশ্রদ্ধচিত্তে, ভারতবাসীর নিকটে ভারতবাসী হইয়া আগমন

করিতে হইবে। এ দেশে যে সকল অমূল্য সত্য আছে, শাস্ত্র আছে, সে সকল সম্ভ্রমের সহিত তাঁহারা অধ্যয়ন করুন, দেশীয় ঋষি মহাজনগণকে ভক্তির চক্ষে দেখুন। ইউরোপীয়গণের নিকটে ইউরোপীয় ভাবে, ভারতবাসিগণের নিকটে ভারতবাসিগণের ভাবে প্রচার হউক। এরূপ করিলে ধর্ম্মকে খর্ব্ব করা হইবে না ; পল যে ভাবে প্রাচীন কালে প্রচার করিতেন, সেই ভাবে প্রচার হইয়া, যাহারা খ্রীষ্টান নয়, তাহাদের হৃদয় এতদ্দ্বারা আকৃষ্ট করা হইবে। কেশবচন্দ্রের সর্ব্বশেষ অনুরোধ এই যে, যাঁহারা এ দেশে ধর্ম্মপ্রচারব্রতে ব্রতী, তাঁহারা দেশীয় লোকদিগের সঙ্গ করেন, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কার্য্যে যোগ রাখেন, এখনকার মত বিচ্ছিন্ন ভাবে না থাকেন। শিক্ষা, দাতব্য, দেশসংস্কার, দেশের নীতি ও সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে তাঁহারা নিরন্তর সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এইরূপে তাঁহারা সমগ্র জাতির হৃদয়াধিকার করিতে পারিবেন। খ্রীষ্টেতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইবে, কেশবচন্দ্র সেই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আছেন, এবং তাঁহার সরল বিশ্বাস ও প্রার্থনা এই যে, পবিত্রাত্মা তাঁহাকে (লর্ড বিশপকে) ঈদৃশ সামর্থ্য বিধান করুন যে, তাঁহার অধিকারের সমুচিত ব্যবহার দ্বারা ঈশ্বরের গৌরববর্দ্ধন এবং ভারতের উদ্ধারকার্য্য হয়। এই সকল অনুরোধ করিতে গিয়া যে ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইল, তজ্জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিয়া কেশবচন্দ্র পত্র সাঙ্গ করেন।

এই পত্রপাঠে রোমাণকাথলিকগণের রুষ্টভাব

এই পত্রপাঠে রোমাণকাথলিকগণ যে রুষ্ট হইবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক। কাথলিক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট উদার প্রশস্ত হইয়া একভূমিতে দাঁড়াইবেন, এ কথা তাঁহাদিগের পক্ষে অসহ্য। আহামদাবাদ হইতে এক জন রোমাণ কাথলিক কেশবচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠান, জল ও তৈল যে প্রকার কখন মিশিতে পারে না, সেইরূপ রোমাণ কাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট কখন এক হইতে পারেন না। একমাত্র রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায়ই সত্যধর্ম্মাশ্রয়ী। এ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে যে সংশয় আছে, তাঁহাদের বিশপ্ তাহা অনায়াসে অপনোদন করিতে পারেন।

লর্ড বিশপের কেশবচন্দ্রের পত্রের উত্তর

আমরা দেখিতে পাই, কেশবচন্দ্রের পত্র বিফল হয় নাই। প্রধান খ্রীষ্টধর্ম্ম-

যাজকগণের মিলিত সমিতি হইতে, চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী ধর্ম্মবিশ্বাসিগণের নামে যে পত্র লিখিত হয়, তাহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্রের ভাবোদ্দীপ্ত। স্বয়ং বিশপ্ কেশবচন্দ্রের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "আপনার পত্রে আপনি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি যে আমার চিন্তা ও মনোযোগের বিষয়, এবং আমি যদি সকলকে এক করিতে পারি, এবং সকলের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া উচ্চভূমিতে তাঁহাদিগকে তুলিতে পারি, তাহা হইলে আমি যে আমাকে কৃতার্থ মনে করি, তাহা আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু বিষয়টি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে আপনি দেখিতে পাইবেন—বিষয়টি বড়ই কঠিন। আমি নিশ্চয় জানি, এ দেশের ভূত-ভবিষ্য বর্ত্তমানঘটিত বিষয়সমূহের প্রতি খ্রীঃসমাজের প্রকৃত মনোভিনিবেশের অভাব নাই। তবে এ সকল বিষয়ে যে সকল অন্তরায় আছে, সেগুলি কি প্রকারে অতিক্রম করা যাইতে পারে, ইহাই কঠিন সমস্যা। আর এক দিন ভিক্টোরিয়া কলেজে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই এস্থলেও বলিতে হইতেছে—সামাজিক, শিক্ষাঘটিত, এবং অন্যান্য প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমরা দিন দিন যে সকল কঠিন সমস্যা অনুভব করিতেছি, সেগুলির মর্ম্মোদ্ভেদ কেবল এ দেশের লোকেরাই নিজে করিতে পারেন। আমরা কেবল আমাদের অভিজ্ঞতায় যাহা জানিতে পারিয়াছি, তদ্দ্বারা সাহায্য করিতে পারি, এবং কত দূর উন্নতি হইল, না হইল, পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি।

"নিরতিশয় সত্যভাবে আপনার
ইউওয়ার্ড আর
কলিকাতা।"

লর্ড বিশপের সভাপতিত্বে ভিক্টোরিয়া কলেজের পারিতোষিক-দান

ভিক্টোরিয়া কলেজের পারিতোষিকদানের সভায় লর্ড বিশপ সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন, এস্থলে তিনি তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ৯ই মার্চ্চ (১৮৮৩ খৃঃ), শুক্রবার, ১০ সংখ্যক অপার সারকিউলার রোড ভিক্টোরিয়া কলেজ-গৃহে এই সভা হয়। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রীগণকে এই সভায় প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। বক্তৃতা-শ্রবণ ও গৃহে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। লর্ড বিশপ্ উহার সভাপতি ছিলেন,

অনরেবল মিষ্ট্রেস্ বেয়ারিং স্বহস্তে পারিতোষিক দেন। মিসেস্ গিবন্, মিষ্ট্রেস্ গ্রাণ্ট, ফাদার লাঁফো প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহার শিক্ষাপ্রণালীটি কেশবচন্দ্র পরিষ্কার ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। লর্ড বিশপ্ যাহা বলেন, তন্মধ্যে প্রধান কথা এই যে, নারীশিক্ষা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সমুচিত। ইংরাজগণ যে সকল সম্পৎ স্বদেশ হইতে আনিয়াছেন, সেগুলি তাঁহারা ইহাদের সম্মুখে ধরিতে পারেন, ইঁহারা আপনাদের বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রেরণায় অবস্থা বুঝিয়া উহাদের গ্রহণ ও ব্যবহার করিবেন। নারীগণের শিক্ষা অতি গুরুতর বিষয়, ইহাতে ইউরোপীয়গণের হস্তপেক্ষ করা কখন সমুচিত নয়। নারীশিক্ষা প্রয়োজন, এইটি তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু দেশীয়গণ, কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি গ্রহণীয় নয়, তাহার বিচার করিবেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, পুরুষোচিত শিক্ষা ইহাতে প্রদত্ত হয় না, নারীসমুচিত শিক্ষা ইহাতে দেওয়া হইয়া থাকে। নারীগণের মধ্যে কেহ বি এ, এম এ, পরীক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু ইহা সকলের উপযোগী নয়। এই বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা উৎকৃষ্ট, কি উৎকৃষ্ট নয়, সে কথা হইতেছে না; কেশবচন্দ্র যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, উহা নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইবে। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলেন, মহিলাগণ আপনারা গৃহে শিখিয়া পরীক্ষা দিয়াছেন। এ অতি প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। এ প্রণালীর শিক্ষায় এক বৎসরে যদি এরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, মনে হয়, এরূপ শিক্ষা চলিলে অল্পদিন মধ্যে এটি একটি বড় বিদ্যালয় হইবে। তিনি আশা করেন যে, ইউরোপীয় মহিলাগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন। তাঁহাকে বিদ্যালয়ে আহ্বান করা হইয়াছে, এ জন্য ধন্যবাদ দিয়া তিনি উপবেশন করেন।

প্রতাপচন্দ্রের পৃথিবীভ্রমণার্থ যাত্রোপলক্ষে কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমগ্রপৃথিবীভ্রমণার্থ যাত্রা করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রেরিত বন্ধুগণ ও অনেকগুলি ব্রাহ্মসহ, ১২ই মার্চ্চ, ১৮৮৩ খৃঃ (২৯শে ফাল্গুন, ১৮০৪ শক) প্রাতে ৯টার সময় তাঁহাকে 'খেদিব' নামক পোতে আরূঢ় করাইয়া দেন। যাত্রার পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র দেবালয়ে এইরূপ প্রার্থনা করেন :—"হে দয়াময়, আমরা মিথ্যা মানি না, সত্য মানি, এই আমাদের

গৌরব। ধর্ম্মটা অভ্রান্ত সত্য, এই ভাবিলে মনে কি কম গৌরব হয়? সত্যের শ্বেত প্রস্তরের উপর বরাবর সত্যের নিশান রক্ষা করিলাম, জয় জয় সত্যের জয়, জয় জয় ব্রহ্মের জয়। ব্রহ্মই সত্য, তুমি সত্য, হে ঠাকুর। পরমেশ্বর, এ ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম তুমি। প্রত্যাদেশের আগুনে আমরা সত্যবাদী হইলাম। একটা অন্যায় মত প্রচার হলো না, একটা অন্যায় কথা বলিলাম না, একি কম? একি মানুষে পারে? ধন্য ধন্য ব্রহ্ম! সত্যের ক্ষমতা এমন যে, কলিযুগের মধ্যেও কাল বাঙ্গালীকে সত্যের মধ্যে রাখে। মাথার প্রত্যেক চুল, দেবতা, তোমাকে সাক্ষী করিয়া নববিধান প্রচার করিতেছে। বিশ্বাস করি যে, এ কিঙ্কর তোমারি, এ কিঙ্কর তোমারি। যে তোমার মানুষ হইয়াছে, সে অনন্তকাল তোমারই মানুষ। পঁচিশ বৎসর পরীক্ষিত হইয়া তোমার নবধর্ম্ম পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে। এই অভ্রান্ত সত্য যেন পৃথিবীতে স্থাপিত হয়। যে শান্তির সমাচার আমরা পাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছি, সেই সমাচার যেন পৃথিবী পাইয়া, সকল মানুষ পাইয়া, তাঁহাদের অশান্ত বক্ষ শান্ত করেন, ইহার উপায় কর; অভ্রান্ত প্রবঞ্চনাশূন্য সত্যকে সর্ব্বত্র বিস্তার কর। আমরা সাক্ষী হইয়া ইহার প্রত্যেক খণ্ড প্রমাণ করি। আমরাত বইয়ে কিছু পড়ি নাই, আমাদের বেদশাস্ত্র তোমার মুখে। আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত তোমার মুখের কথা। একটা কথা ভাঙ্গে, এমন কারো সাধ্য নাই। ভক্তের কথা চন্দ্রসূর্য্য অপেক্ষা বড়, তাহা কখন মাটীতে পড়ে না। অতএব এই যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমুদায়ধর্ম্মসমন্বয়, ইহা কেবল সকল দেশের ভাই ভগিনীকে লইয়া একটি বিস্তীর্ণ পরিবার। এই ধর্ম্ম অভ্রান্ত। এই সত্য পরিষ্কৃতরূপে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত হয় যদি জগতে, পৃথিবী জানিবে, কলির জীবেরাও মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, আজও নূতন বেদ ছাপা হয়। মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যে সত্য স্থাপন করেছ, তাহা যেন পৃথিবীতে খুব বিস্তার হয়। চীন আমেরিকা সব আমাদের দলের মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবে, ভাবিলে আশা আহ্লাদ হয়। সকলেই এক বাড়ী করে নিয়ে এক পরিবার হবে, এটা যেন অনুমান না হয়। হরি বলেছেন, নববিধান ঠিক। যদি ঠিক, তবে সমস্ত পৃথিবীতে এই সত্য প্রচারিত হউক। হে দীনশরণ, তুমি এই অভ্রান্ত সত্য জগতে প্রচারিত কর।

যেখানে যাওয়া হইবে, কেহই আমাদের অপরিচিত নয়, বিদেশী নয়। আমেরিকা, চীন, বিলাত, এরা সকল কে, ঠাকুর! এরা আমাদের কুটুম্ব। বড় বড় রাজারা এখন আমাদের আত্মীয়। পিতার প্রেমরাজ্য আসিবে, রাজসূয়-যজ্ঞ হবে, সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবে। সুখের উৎসব, সুখের যাত্রা, আনন্দের ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে। পিতা, পৃথিবীকে বুকে করি। পৃথিবী ঘুরে আসা, এসিয়া, অফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ এই চারিটির মুখে অমৃত দেওয়া, ইহাদের সেবা করা একই। তবে আর দূর থাকে কেন? বিদেশ, স্বদেশ হও। আমাদের বন্ধুকে গ্রহণ কর, আত্মীয় হয়ে কুশলে রক্ষা কর। পরমেশ্বর, আমরা বিজয়ী হব, প্রবল হব; আর ভয় কি? হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার ধর্ম্মামৃত, তোমার পূর্ণ সত্য জগতে বিস্তার করিয়া, তোমার প্রেমরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে পারি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!"

প্রচারবন্ধুগণের সহিত কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধের বিপর্য্যয়

কেশবচন্দ্র দিন দিন যোগে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, অধ্যাত্ম সম্পদ্ তাঁহাতে অধিকতররূপে সঞ্চিত হইতে লাগিল; এ দিকে গ্রহীতৃগণের তদ্গ্রহণে বিরাগ উপস্থিত। এ সময়ে প্রচারবন্ধুগণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কি প্রকার বিপর্য্যয় ঘটিল, অনুবাদিত প্রবন্ধটি হইতে সকলে তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন:—"হিন্দু এবং খ্রীষ্টানগণের মধ্যে আচার্য্যের সহিত উপাসকগণের যে সম্বন্ধ, আমাদের উপাসকগণের আচার্য্য সহ সম্বন্ধ তাহার বিপরীত। মনে হয়, ব্রাহ্ম উপাসকেরা বিবেচনা করেন, তাঁহাদের উপদেষ্টা যে কেবল অধ্যাত্মবিষয়ের অভাবপূরণ করিবেন, তাহা নহে, তাঁহাদের সাংসারিক সুখ-বিধানেরও উপায় করিয়া দিবেন। আচার্য্য যে কার্য্য করেন, তদ্বিনিময়ে তাঁহারা অর্থসাহায্য করেন না। তিনি অবৈতনিকভাবে তাঁহাদের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে সৎপরামর্শ দেন। এই যথেষ্ট যে, তাঁহারা তাঁহার কথা শোনেন, তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন। তাঁহারা যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ না করেন, উহাই তাঁহার বেতন ও পুরস্কার। যদি অনেক লোক তাঁহার নিকটে আসেন, দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, এবং মনে হয় যে, তাঁহার অনুগামী অনেক, সেইটি তাঁহার পক্ষে পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি। খ্রীষ্টধর্ম্মের

আচার্য্য হিন্দু গুরুর মত অর্থ পান। তিনি তাঁহার লোকদিগকে অধ্যাত্ম আহার ও সম্পদ্ দেন, তাহারা পার্থিব আহার ও ধন দেয়। তিনি তাহাদের আত্মার সেবা করেন, তাহারা তাঁহার দেহের সেবা করে। যখন তিনি পীড়িত হন, তখন তাহারা আসিয়া দেখা করে, তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণের অনাহার উপস্থিত হইলে তাহারা ভোজ্যসামগ্রী যোগায় এবং তাহাদিগকে প্রফুল্ল করে, তাঁহার বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহারা তন্নিবারণ করে। এইরূপে উভয়ের মধ্যে সহানুভূতি ও সেবাবিনিময় হয়। ব্রাহ্ম উপাসকমণ্ডলীর নেতার পদ স্বতন্ত্ররূপ। তাঁহার অন্নবস্ত্র ঈশ্বর যোগাইবেন, তাহারা নয়। বিধাতার উপরে সম্যক্ নির্ভর করিয়া তাঁহার দেহ ও আত্মাকে একত্র রক্ষা করিতে হয়। যদি তিনি বা তাঁহার পত্নী বা তাঁহার সন্তানেরা পীড়িত হন, স্বর্গ হইতে ঔষধ আসা চাই, কোন পৃথিবীর বন্ধু তজ্জন্য আপনাকে দায়ী মনে করেন না। যদি তাঁহার বাড়ী না থাকে, তাঁহার লোকদিগের নিকটে তিনি তৎসম্বন্ধে সাহায্য আশা করিতে পারেন না। তিনি বৈরাগী হইয়া 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিব না' ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বিপৎকর মত স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং যেরূপে পারেন, আপনার ও পরিবারের জন্য আপনি আয়োজন করিবেন। এটি আমরা বুঝি, কেন না যে আচার্য্য বিনা বেতনে বৈরাগী হইয়া লোকদিগের সেবা করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ ঘটা অনিবার্য্য। কিন্তু ইহা হইতে অন্য দিকে যাহা ঘটিতেছে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। উপাসকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রচারক বা সাধকের জীবন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার নেতার নিকটে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ে সাহায্য চান। তিনি তাঁহাদিগকে স্বর্গের পথ দেখাইবেন এবং তাঁহাদের পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দতারও প্রতিভূ হইবেন। তাঁহাদের প্রতিদিনের অভাবপূরণ করিতে যদি ত্রুটি হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিরক্ত হন। তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের পরিজনবর্গকে পূর্ণ পরিমাণ আহার যোগাইতে না পারিলে, তাঁহারা রুষ্ট হন। তাঁহাদের সন্ততিবর্গের যত জোড়া পাদুকার প্রয়োজন, যথাসময়ে তাহা যোগাইতে হইবে এবং এটিকে অধিকার বলিয়া তাঁহারা দাবী করেন। বস্তুতঃ উচ্চশ্রেণীর সাধকেরা তাঁহাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সুখের জন্য আচার্য্যকে সম্পূর্ণ দায়ী মনে করেন; সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে, তাঁহারা নিশ্চয় তাহার প্রতিবাদ করেন। আমাদের

আশঙ্কা, আচার্য্যের নিকট এত দূর আশা করা আতিশয্য। যদি তিনি জীবনের পোষণসামগ্রীলাভের উপায় করিয়া দিতে পারেন, তাহাই যথেষ্ট। পার্থিব ভোজ্যসামগ্রীর জন্য তাঁহার উপরে নির্ভর করা পুরুষকারও নয়, ভক্তি-বিশ্বাসসমুচিতও নয়। অবশ্য তিনি সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উভয়সম্বন্ধে সকল বিষয়ে অভিভাবকের যাহা সমুচিত, তাহা করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে ইহাই সমুচিত যে, তাঁহারা তাঁহার আচার্য্যকৃত্যে পরিতুষ্ট থাকিবেন, সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতা তাঁহার নিকটে দাওয়া করা তাঁহারা অন্যায় মনে করিবেন।”

বন্ধুবর্গের মধ্যে নানা মারাত্মক রোগ

বন্ধুবর্গের সহিত কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধের ব্যতিক্রম আজ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নহে। দলস্থ ব্যক্তিগণ সাত্ত্বিক অন্ন ভোজন করিবেন, সাত্ত্বিক পরিধেয় পরিধান করিবেন, কোনরূপ অবৈরাগ্য দলের মধ্যে স্থান পাইবে না, তাঁহারা অনলস হইয়া যুবার ন্যায় উৎসাহে সেবার কার্য্য করিবেন, এজন্য কেশবচন্দ্র ক্রমান্বয়ে প্রার্থনায় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার কথা কেবল বিফল হইয়া যাইতেছে, তাহা নহে, তাঁহার বন্ধুগণ আপনাদিগকে ত্যাগী, বৈরাগী, শুদ্ধচরিত্র বলিয়া অভিমান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই দেখিয়াই তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “আমি যত দিন আমার মত পাপী না পাই, আমার কাজ করা হইবে না।” এ সময়ে পরস্পরের প্রতি প্রেমের অভাব উপস্থিত, অথচ এজন্য কাহারও মনে কিঞ্চিন্মাত্র গ্লানি নাই। এতদ্দর্শনে কেশবচন্দ্রের মনে মহান্ ক্লেশ উপস্থিত। তাই তিনি মনের ক্লেশে প্রার্থনা করিয়াছেন, “ইহারা বলেন, একটু ভাইকে ভালবাসিতে না পারিলে ক্ষতি কি? ভগবান্, আমি যে বিশ্বাস করি, ভাইকে ভাল না বাসিলে ব্রহ্মদর্শনও হইবে না, স্বর্গে যাওয়াও হইবে না।” যেখানে ভালবাসার অভাব, সেখানে এক জন আর এক জনের ভাবের সমাদর করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? একে অপরের ভাবের যেখানে আদর করিতে পারেন না, সেখানে মন সঙ্কুচিত ঔদার্য্যবিহীন হইবে, ইহাতো অবশ্যম্ভাবী। যেখানে আধ্যাত্মিকতার অভিমান উপস্থিত, সেখানে বিধিনিয়মপ্রতিপালন বা নীতির প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা কোন কালে থাকিতে পারে না, সুতরাং গূঢ়রূপে জীবনে

নীতিশৈথিল্য প্রবিষ্ট হইতে থাকে। আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে এই সকল মারাত্মক রোগের প্রবেশ দর্শন করিয়া তিনি নিরতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইলেন, এবং বিধানের প্রতি, দলপতির প্রতি বিশ্বাসের অভাবে কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, প্রার্থনায় তাঁহাদিগের নিকটে তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সকল করিয়া যে কিছু ফলোদয় হইল না, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। তাঁহার দল হইতে বিদায়গ্রহণ এবং রোগের প্রতীকারজন্য ব্রতস্থাপন করিবার পূর্ব্বে, তিনি নবধর্ম্মপ্রচারের প্রণালী কি মনে করিতেন, তৎপ্রদর্শক একটি প্রবন্ধের আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

নবধর্ম্মপ্রচারের প্রণালী

"এ কথা অনেকে জানেন না, কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, নববিধান-মণ্ডলীতে নিজ ধর্ম্মে আনিবার জন্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে যত্ন হয় না। যদি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রচার না করেন, তাহা হইলে অন্য ধর্ম্মে প্রচারক প্রচারকই নহেন। তাঁহাদের যে সকল বিদ্যালয়াদি আছে, সেগুলি যদি লোকদিগকে স্বধর্ম্মে আনিবার জন্য উপায় না হয়, তাহা হইলে উহারা কিছুই নয়। এমন কি, তাঁহাদের আলাপ-পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মে আনয়নের দিকে ধাবিত। অতগুলি কথায় না বলুন, মনে হয়, যেন তাঁহারা সর্ব্বদাই বলিতে প্রস্তুত—'আশা করি, আপনি জলাভিষেকগ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্রই আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন।' যখনই কোন পাদ্রির সহিত সাক্ষাৎকার হয়, রেলওয়ের প্ল্যাটফরমেই হউক বা ভোজনের স্থানেই হউক, ঈদৃশ অভিভাবকোচিত আশীর্ব্বচনসূচক কথা তোমায় শুনিতে হইবে। তোমার নিকটে উহা অভব্যতা, এমন কি অত্যাচার মনে হইতে পারে, কিন্তু তোমার তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এমন করিয়া সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে স্পষ্ট কথায় পরিত্রাণ আনিয়া উপস্থিত করা আমরা সঙ্গতও বলি না, নিন্দাও করি না। প্রচার করা যাঁহারা জীবনের একমাত্র কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা যেখানে যাইবেন, সেখানেই প্রচারের কার্য্য করিবেন, তাহাতে আপত্তি কি ? খ্রীষ্টধর্ম্ম বা অন্য ধর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও গোঁড়ামিতে প্রচার করা তাঁহারা জীবনের এক মাত্র কার্য্য মনে করেন; সুতরাং সকল স্থানে, সকল সময়ে সুযোগ পাইলেই উহা প্রচার করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে আহ্লাদিত হন।

আমাদের মণ্ডলী কিন্তু অন্যরূপ বিশ্বাস করেন, অন্যরূপ ব্যবহারও করেন। তিনি সংস্কার—সর্ব্ববিধ সংস্কারে বিশ্বাস করেন। যে কোন প্রকারে মঙ্গল সাধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সামাজিক, মানসিক, নৈতিক, রাজকীয়, ধর্ম্মসম্পর্কীয় সংস্কারসাধনে তাঁহার যত্ন ও প্রয়াস। যে কোন কার্য্যে মানবের সাংসারিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়, তাহাতেই তাঁহার সহানুভূতি, তাহাতেই তাঁহার শক্তিনিয়োগ উপস্থিত হয়। যদি তিনি মিতাচারপ্রবর্ত্তন, পরিণয়ঘটিত দোষের সংস্কার, দাতব্যব্যবস্থা বা ভিন্ন ভিন্ন জাতির সম্মিলন, অথবা কোন এক জাতির পদদলিত কোটি কোটি সামান্য লোকের রাজ্যসম্বন্ধে অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে পারেন, তিনি সুখী হয়েন। ক্ষুধিতকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অথবা যাহারা যাতনা পাইতেছে, তাহাদিগকে কেবল সান্ত্বনার কথা বলা, তিনি আপনার উপযুক্ত কার্য্য মনে করেন। তিনি শিক্ষার জন্য শিক্ষাদানে উৎসাহ দেন, তাহাতে ধর্ম্মগ্রহণের ব্যাপার থাকুক বা না থাকুক। অন্যকে ব্রাহ্ম করা আর দশটি বিষয়মধ্যে একটি বিষয়মাত্র। তাহা ছাড়া, ভাল মানুষ করা, সুখী করা, শান্তি স্থাপন করা, সকল প্রকার দুঃখনিবারণার্থ চিকিৎসালয় কার্য্যালয় স্থাপন করা অন্যান্য কাজ। তাঁহার উদ্দেশ্যের সঙ্গে এ সকলগুলিকে তিনি মিশাইয়া লইয়াছেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিয়া তিনি ঈশ্বরেরই আদেশ পালন করিতেছেন, তাঁহার রাজ্যবিস্তার করিতেছেন, ইহা তিনি নিষ্ঠাসহকারে বিশ্বাস করেন। তাঁহার বিবিধ কার্য্য ও কর্ত্তব্যের মধ্যে একটিও সাংসারিক নহে। সকলই পবিত্র, সকলই স্বর্গীয় উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। কোন ব্যক্তিকে মদ্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করা, ধর্ম্মমত-প্রচারের মত তিনি সাধু কার্য্য বলিয়া গণনা করেন। কোন ভ্রাতৃসম্মিলনে যোগদান, আর প্রেমপ্রচার তাঁহার নিকটে ঈশ্বরের চক্ষে দুইই সমান। যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু ভাল, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মসমুচিত। এজন্যই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মমণ্ডলী যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সত্য, অক্ষুণ্ণ উৎসাহ ও অবিভক্ত-নিষ্ঠা-সহকারে তাহার উৎকর্ষ সাধন করেন। এ কথা লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু এটি একটি বাস্তবিক ঘটনা যে, আমাদের কোন বালক-বা-বালিকা-বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মঘটিত কোন পাঠ্য পুস্তক নাই, এবং আমাদের ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন শিক্ষক নাই; ধর্ম্মে আনিবার জন্য, ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য

কোন প্রয়াস নাই। অথচ ঈশ্বরকৃপাতে এই সকল বিদ্যালয়াদিতে দিন দিন ভগবানের কার্য্য সাধিত হইতেছে।"

বন্ধুবর্গের নিকট হইতে বিদায়সূচক প্রার্থনা

বন্ধুগণের চৈতন্যসাধনজন্য সর্ব্ববিধ প্রার্থনা বিফল হইল। সুতরাং এই শেষ প্রার্থনায় তিনি তাঁহাদিগের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন :—(৩রা এপ্রেল, ১৮৮৩ খৃঃ; ২১শে চৈত্র, ১৮০৪ শক) "হে প্রেমস্বরূপ, যদি আমাদের মধ্যে আর উন্নতির সম্ভাবনা না থাকে, যাহা হইয়াছে, তাহাতেই সকলের উন্নতির পরিসমাপ্তি হয়, তবে আর অকর্ম্মণ্য জীবদিগের পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যদি ইহাদের সকলের মত ও চরিত্র গঠন হইয়া গিয়া থাকে, লইবার বা শিখিবার কিছু না থাকে, তবে আমার পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যা যা করিবার, আপনি করিয়া লইয়াছে। হে পিতা, ইহাদের ভার লইয়াছ? নাটক শেষ হইয়াছে, মানুষ জোর করিয়া কেন বাজাইবে? যতক্ষণ কাজ, ততক্ষণ দরকার। ঔষধের যতক্ষণ দরকার, ততক্ষণ কবিরাজের প্রয়োজন। জোর করে চিকিৎসা করা কি ভাল দেখায়? হে দয়াল হরি, মানসিক চিকিৎসা এইরূপ। একটা অবস্থা আছে, মন যার ওদিকে আর যায় না। খুব ভক্তি, প্রেম, উপাসনা, তার পর একটা সীমা। একটা সীমা পর্য্যন্তও গিয়ে মানুষ একটু আধটু উপাসনা করে, কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেয়। ঠাকুর ঘরে আমোদের কাজ আর হয় না। আবার আস্তে আস্তে সংসারে চলে যাবেন সকলে। প্রেমের মৃত্যু হবে। মিছামিছি সময় কাটাইবার জন্য তোমাকে ডাকা, এই রকম ব্যাগারঠেলা হবে। মা, সাধু হব, কিন্তু মিলন হবে না। হরি, এই ভিক্ষা চাই, এই সময়ে সময়োচিত কর্ত্তব্য বলে দাও। বিশ্বাস নাই পরস্পরকে, প্রেম নাই, অধীন কারও হব না, ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেব কেন? এক নৌকায় স্বর্গে যাওয়া হবে না, একলা গিয়ে নরকের রাজা হব, কিন্তু সকলের সঙ্গে স্বর্গে যাব না, সকলে এই কথা বলিবে! মা, দেখ, কি হচ্চে। হে দেবী, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই অন্ধকারের মধ্যে তোমার শ্রীপাদপদ্ম ধরে, যতটুকু আলো পাই, তোমার নিকট হইতে, সেইরূপে কাজ করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!"

তৎপরবর্ত্তী কয়দিনের প্রার্থনা

এ দিনের পর হইতে যে সকল প্রার্থনা হয়, সে সকল লেখিকার অবরোধ-হেতু লিপিবদ্ধ হয় না। ভাই কালীশঙ্কর দাসের দৈনন্দিনলিপি হইতে সে সকল প্রার্থনার সার এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"২২শে চৈত্র, ১৮০৪ শক (৪ঠা এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ), বুধবার—হে হরি, আর প্রতীকার তবে হইবে না। আর কোন উপায় নাই, ইঁহারা বলিতেছেন। ইঁহারা ঔষধ খাইবেন না। ঔষধ না খাইলে আশা কি ? বিনা ঔষধেতো রোগের প্রতীকার হয় না।"

"২৫শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল), শনিবার—গুরু পাপী, শিষ্য পুণ্যবান্ ; গুরুর গলায় বিষ্ঠার হাঁড়ী, শিষ্যবর্গ অতি গৌরবাস্পদ ভদ্রলোক। এস্থলে মিল হওয়া অসম্ভব। একত্র নৌকা ছাড়িলাম, একত্র চলিলাম, এখন শেষকালে ছাড়িয়া চলিলাম। মিল যে হয় না, ঠাকুর ! আমি তো মিল করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আমার এত দোষ থাকিতে কেমন করিয়া নির্দ্দোষীদের সঙ্গে মিলিব।"

"২৬শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল), রবিবার—ভিক্ষুর জীবন পবিত্র, ভিক্ষান্ন পবিত্র।"

"২৭শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল), সোমবার—উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী কেহ হয় না, কিন্তু অতি সামান্য কাজ করিয়া দিন কাটাইতে চায়।"

"২৮শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল), মঙ্গলবার—পুঁথিলেখা, বক্তৃতা করা যাহা-দিগের কাজ, তাহারা তোমার লোক নহে। চণ্ডাল তোমার গৃহে যাইতে পারে না, ব্রাহ্মণ পারে। আমরা যে প্রার্থনা করি, তাহা পিতামাতার নিকটে সন্তান যেরূপ করে, সেরূপ নহে ; রাজার নিকটে দূরদেশবাসী প্রজা যেমন দরখাস্ত লিখিয়া পাঠায়, আমরা তাই করি। যদি ঠিক ছেলের মত আবদার করিতে পারিতাম, তুমি ও ঘরে গেলে সঙ্গে গেলাম, এ ঘরে এলে সঙ্গে এলাম, এইরূপ আঁচল ধরিয়া যদি বেড়াইতে পারিতাম, তবে অবশ্যই কিছু না কিছু পাইতাম ; কিন্তু তাহাতো পারিলাম না। তৃণপত্রাদি সব তোমার পরিচয় দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমি তোমার হইতে পারিলাম না।"

"২৯শে চৈত্র (১১ই এপ্রিল), বুধবার—রাজপুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা।"

"৩০শে চৈত্র, (১২ই এপ্রিল), বৃহস্পতিবার—অবিশ্বাস তো গেল না,

স্থিরতর নিশ্চিত ভূমিতে তো কেহ অদ্যাপি দাঁড়াইল না। হে ঈশ্বর, তোমার দোষ নাই, সব দোষ আমাদের।"

"১লা বৈশাখ (১৮০৫ শক) (১৩ই এপ্রিল), শুক্রবার—নূতন বৎসরে নবজীবন পাইব। পাপরাজ্য হইতে ডুব দিয়া পুণ্যরাজ্যে যাইব। ব্রাহ্মসমাজ আর থাকিবে না, নববিধানের নব জীবন লইয়া নূতন বৎসরে প্রবৃত্ত হইব। ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ বুদ্ধ কনফুসস্ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত নূতন প্রেমের রাজ্য সংস্থাপন করিব।" (অদ্য চারিটি ব্রত প্রদত্ত হয়।)

"২রা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল, শনিবার—হে সন্ন্যাসীর ঈশ্বর, পূর্ব্বে বৈরাগ্য আসিয়াছিল, নবদ্বীপের রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। নব বিবাহিতা পত্নী বিষ্ণু-প্রিয়াকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস গৌরকে লইয়া শ্রীক্ষেত্রে গেল। সে সন্ন্যাস আর কি ফিরিবে না ? আমরা সকলেই বিষ্ণুপ্রিয়া হইব ; সন্ন্যাসীর কি সন্ন্যাসিনী হইবে না ? সন্ন্যাসী কি চিরকাল স্ত্রী-বিহীন থাকিবে ? ঈশ্বর, বিবাহ দাও।"

"৩রা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল), রবিবার—হে প্রেমের ঈশ্বর, সংসার বলে, আমি সুখে থাকিব, আর আমার ভাইগুলি দুঃখে মরুক ; ধর্ম্ম বলে, আমিও দুঃখ পাব, আর ভাই ভগ্নীগুলিকেও দুঃখ দিব। নববিধান বলে, কারু কথা থাকিবে না ; সকল শাস্ত্রের অর্থ পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন অর্থ করিব। যে অন্ন আছে, সকলে খাবে, বস্ত্র সকলে পরিবে, আমি উপবাসী থাকিব, আমি ছেঁড়া নেকড়া পরিব। আমি ছাতি হইয়া সকল রৌদ্র সহ্য করিব, ভ্রাতারা আমার হৃদয়ে বাস করিবে। আমি গৃহ হইব, ভ্রাতারা আমাতে বাস করিবে।'

"৫ই বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল), মঙ্গলবার—হে মঙ্গলময় ঈশ্বর, অমঙ্গল আর রাখিও না। আমাদিগের প্রতি দয়া করিয়া এক হইতে শিখাও, আমরা এক এক জনে এক এক যন্ত্র বাজাইব, কিন্তু সুর ও তাল, রাগ ও রাগিণী এক হইবে। যে আমাদের ভিতরে থাকিয়া ভিন্ন সুরে, ভিন্ন তালে বাজায়, সে অভদ্র লোক। আমরা কয়জনে মিলিয়া একখানি শরীর হইব। এক শরীরের যে কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে যেমন সকল শরীরে লাগে, আমাদিগকে সেইরূপ কর।"

"৬ই বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল), বুধবার—হে প্রেমের হরি, আমি পূর্ব্বে যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম ; তাহা ফিরাইয়া লইলাম, ইঁহারা—এই বন্ধুগণ, আর আমার সঙ্গে যাইতে পারিতেছেন না। ইঁহারা দুইটি পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়াই

পরিশ্রান্ত হইয়া আর চলিতে পারিতেছেন না। আমি বন্ধুদিগের জন্য কি না করিলাম? মিথ্যাবাদী হইলাম, চুরি ডাকাতি সকলই যে করিলাম।"

"৭ই বৈশাখ (১৯শে এপ্রিল), বৃহস্পতিবার—হে বিশ্বাসীর পিতা, তুমি কি সত্য সত্যই নাই? এই যে আমার বন্ধুগণ বলিতেছেন, নাই। তুমি আর উত্তর দেও না, কাঁদিলে শুন না? আমাদিগের দেশে পিতৃহীন বলিলে, বড় শক্ত গালি হয়। চোর বল, দস্যু বল, বদ্‌মায়েশ বল, তাহা সয়; কিন্তু তোমার পিতামাতা নাই, একথা সয় না।"

"৮ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল), শুক্রবার—হে ঈশ্বর, প্রেম স্বর্গেও আছে, পৃথিবীতেও আছে। স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, পিতামাতা পুত্রকন্যাকে ভালবাসে দেখিয়াছি; এ সকল প্রেমের সঙ্গে তোমার প্রেমের তুলনা হয় না। তোমার প্রেম, যে মারে, গালাগালি দেয়, খেতে দেয় না, তাহাকেই ভালবাসে। তোমার প্রেম লইয়া গৌর নিতাই জগাই মাধাইকে ভালবাসিলেন। ঈশা বুকের রক্ত দিয়া শত্রুর মঙ্গল সাধন করিলেন।"

"৯ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল), শনিবার—হে হরি, আমাদের বয়সের উপযুক্ত ধর্ম্ম দেও। আমরা বৃদ্ধ হয়ে দুর্ব্বল রুগ্ন হয়েছি, এই রুগ্নাবস্থায় যাহা সাধন করিতে পারি, সেই ধর্ম্ম দেও।"

"১০ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল), রবিবার—হে ঈশ্বর, যখন প্রথম সৃষ্টি করিলে, তখন কি ভোগ করিবার কেহ ছিল? ধান্য দেও, অন্ন দেও, ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যায়, এই বলে কাঁদিল; তার পর কি তুমি নদীর সৃষ্টি করিয়াছ? না। তুমি আগে থেকে জান, মানুষের অন্ন জলের প্রয়োজন হইবে, তাই তুমি এ সকলের সৃষ্টি করিয়াছ। সেইরূপ ধর্ম্ম পুণ্য প্রেম এ সকল মানুষের প্রয়োজনে লাগিবে, তাই তুমি মানুষ-সৃষ্টির আগে ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলে।"

ব্রহ্মমন্দিরে 'সৃষ্টিতে সামঞ্জস্যের কর্ত্তা ও সপ্তসুর' বিষয়ে শেষ উপদেশ

কেশবচন্দ্রের শরীর অত্যন্ত ভগ্ন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি সপরিবারে শিমলায় গমন করা স্থির করিলেন। অদ্য রবিবার (২২শে এপ্রিল) তিনি ব্রহ্মমন্দিরে "সৃষ্টিতে সামঞ্জস্যের কর্ত্তা এবং সপ্তসুর" বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের সারমাত্র আমরা "নববিধান পত্রিকায়" দেখিতে পাই। সে সার এই;—"একতা ও শান্তি

স্থাপনের জন্য যখনই মানুষ একবিধত্বরূপ মৃত সমভূমিতে সকল মানুষকে আনিতে চায়, তখনই রাগরাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী ঈদৃশ প্রয়াসের প্রতিবাদ করেন, এবং সঙ্গীতবিজ্ঞানের একতানতা এবং বহুত্বের মধ্যে একত্বের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করেন। স্বর্গরাজ্য সপ্ত স্বরের মত সপ্ত ভ্রাতার সপ্ত পরিবার। সা রি গ ম প ধ নি, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন, অথচ সকলগুলি মিলিয়া একতান উৎপাদন করে।" * কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মমন্দিরে এই শেষ উপদেশ। আর তিনি মন্দিরে বেদীতে উপবেশন করিবার জন্য দেহে অবস্থান করেন নাই। এই শেষ উপদেশ, বলিতে হইবে, সকল উপদেশের সারভূত। যেখানে প্রকৃতি ও প্রকৃতির নিয়ন্তা সহ প্রতিব্যক্তির একতা উপস্থিত হয় নাই, সেখানে পরস্পর মধ্যে ভিন্নতা সত্ত্বে একতা কখনই সম্ভবপর নহে। হিমালয়ে কেশবচন্দ্র যে সকল প্রার্থনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে যেখানেই একতার কথার উল্লেখ আছে, সেখানেই এই একতা তিনি চাহিয়াছেন। যে একতায় স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় না, অথচ ঈশ্বরাধীনতা ভিন্নতার মধ্যে একতা আনয়ন করে, নববিধানে সেই একতাই চির সমাদৃত। যিনি আপনি স্বাধীন হইয়া অপরের স্বাধীনতার সম্মান করিতে পারেন না, তিনি নববিধানে সকলকে এক করিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। কেশবচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পরবর্ত্তী ইতিহাস তাঁহার বন্ধুগণমধ্যে এই সামর্থ্যের অভাব স্পষ্ট প্রদর্শন করে।

পুনর্ম্মিলন জন্য ১লা বৈশাখ ব্রতচতুষ্টয়ের বিধি

দলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াও, কেশবচন্দ্র দলের পুনর্মিলনের আশা কোন কালে পরিত্যাগ করেন নাই। এখানে না হয়, পরলোকে পুনর্মিলন হইবে, এ আশা তাঁহার হৃদয়ে চির প্রবল ছিল। কি উপায়ে পুনর্মিলন হইতে

---

* On Sunday last, the minister preached a sermon in the Brahma Mandir, on the Author of Harmony in creation and the Seven Notes of Music. He said, whenever men seek to establish union and peace by bringing all men to the dead level of uniformity, Saraswati the supreme Goddess of Music, protests against such attempts and insists upon alliance on the science of music or the principle of harmony in variety. The kingdom of heaven is a family of seven brothers like unto the seven notes sa ri ga ma pa dha ni, that differ and yet make one music —THE NEW DISPENSATION APRIL 29, 1883.

পারে, সে উপায় তিনি বলিয়া না দিয়া বিদায়গ্রহণ করিবেন, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। সুতরাং বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে, তিনি প্রচারকবর্গের জন্য চারিটি ব্রতের ব্যবস্থা করেন। পর সময়ে এই ব্রতানুষ্ঠানের প্রতি অনাদরবশতঃ, কি ঘোর পরীক্ষা মণ্ডলীমধ্যে সমাগত হইয়াছে, তাহা আজ সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আর অধিক কিছু না বলিয়া, আমরা সেই ব্রতচতুষ্টয়ের বিধি (১৮০৫ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"অদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে দয়াসিন্ধু পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, সমস্ত পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া, উপস্থিত অনুপস্থিত সমুদয় ভ্রাতৃগণকে, প্রেরিতবর্গকে ঈশ্বরের আদেশানুসারে ঘোষণা করিয়া, এই জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এই নববর্ষের প্রথম হইতে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। বৈরাগ্যের নিয়ম পূর্ণভাবে পালন করিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত সাংসারিক চিন্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে হইবে। আহার ও পরিধান সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকিবে না। তোমরা নিজে স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিতে পার না। ঈশ্বরের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ ভাবে যাহা আসিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে পাইবে। এতদিন কিয়ৎ পরিমাণে প্রচারভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিতে, আবার কিয়ৎ পরিমাণে পরকীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে; এখন হইতে আর তাহা হইবে না। এত দিন তোমরা কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত পালন করিতে, কিন্তু তোমাদের পত্নীরা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেন; অতঃপর তোমরা যেমন টাকা কড়ি গ্রহণ করিবে না, তোমাদের স্ত্রীরাও তেমনই অপরের দান গ্রহণ করিবেন না। তোমাদের পত্নীদিগকে বৈরাগ্যপথের সঙ্গিনী করিয়া লও। প্রচারক-পরিবার বৈরাগী ও বৈরাগিণীর পরিবার হইবে; সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর পরিবার হইবে। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা অন্য অর্থ স্পর্শও করিবে না। বৈরাগী স্বামী ও সংসারাসক্ত স্ত্রীর মিলন হইতে পারে না। এক জন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবেন, অন্যজন সংসারের ধন খুঁজিয়া বেড়াইবেন, ইহা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। এই স্থান হইতে সমস্ত সাহায্যকারী দাতাদিগকেও ঘোষণা করা যাইতেছে, আমাদের প্রেরিত প্রচারকদিগের হস্তে তাঁহারা একটি পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে, এই স্থানে

অথবা প্রচারভাণ্ডারে অর্পণ করিতে পারিবেন। উঁহারা দিবেন না, ইঁহারা লইবেন না। ভাণ্ডারীর হস্তে সমস্ত ধন আসিবে। কোন বিশেষ বন্ধু কোন বিশেষ বন্ধুর জন্যও দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাণ্ডারীই তাহা গ্রহণ করিবেন। ভাণ্ডারীর হস্তেই তাহা দিতে হইবে। প্রচারকেরা ধন চাহিবেন না, ধন লইবেন না; কিন্তু ভাণ্ডারে ধন আসিলেই সন্তুষ্ট হইবেন। ভাণ্ডারে ধন আসুক, আরও ধন আসুক, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ভাণ্ডারপতি স্বয়ং ঈশ্বর। ভাণ্ডারের উপরে যাহারা নির্ভর করে, তাহাদের মুখ কখনই শুষ্ক হয় না, বালক বালিকাগণ দৈন্যসাগরে ডোবে না। পবিত্রাত্মা সেখানে বিতরণ করেন। কল্যকার জন্য চিন্তা বন্ধ করিয়া দাও; বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হও। বৈরাগ্যের পূর্ণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক। প্রত্যেকে বৈরাগী হইয়া সহধর্ম্মিণী সহ বৈরাগ্যব্রত সাধন কর। এত দিন বিরোধী ছিলেন স্ত্রী; এখন দুই জনে একত্র হইয়া অর্থ-পিপাসা পরিত্যাগ করিয়া, ধনলোভ অপবিত্র জানিয়া, পৃথিবীর শাস্ত্রেতে জলাঞ্জলি দিয়া, পতিপত্নী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া বাস কর। নববর্ষের এই নব নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়ম ভালবাসা। পরস্পরে প্রেম কর, কলহ বিবাদ পরিত্যাগ কর। যদি ভয়ানক কলহ বিবাদের কারণ আসে, লিখিয়া দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে, মুখে উপস্থিত করাও হইবে না। প্রশ্ন লিখিয়া দরবারে দাও; পবিত্রাত্মা তাহার উত্তর দিবেন। এতদ্ব্যতীত লঘু বিষয় সকল প্রেমের দ্বারাই মীমাংসিত হইবে। কোটী কোটী কারণ অন্যপক্ষে থাকিলেও, পরস্পরে প্রেম করিবে। কোন বিষয়ে মতে না মিলিলেও, প্রেম করিবে। তোমাদের প্রেমের কীর্ত্তিস্তম্ভ যেন পৃথিবী দেখিতে পায়। ভালবাসার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইবে; প্রেমের অভূতপূর্ব্ব উদাহরণস্থল হইবে। প্রেমের ভিতরে ক্ষমা সহিষ্ণুতা থাকিবে। প্রেম দোষ ভুলাইয়া দেয়। প্রেম উৎপীড়ন সহ্য করে; প্রেম শত্রুর সহিত এক ঘরে বাস করে। এইরূপ প্রেমে প্রেমিক হইয়া, নববিধানে কত প্রেম, তাহাই পৃথিবীকে দেখাও। যেখানে যাইবে, প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। তৃতীয় নিয়ম উদারতা। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমন্বয় হইয়া উদার ভাব প্রদর্শিত হইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় আর থাকিবে না। ঈশা মুষা প্রভৃতি তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। সকলকে সম্মানিত করিবার জন্য তোমরা নববিধান

কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছ। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। এই ঘরে ঈশা মুষা শাক্য গৌরাঙ্গের সম্মান বাড়িল, এই যেন দেখা যায়। উদার হইয়া উদার ধর্ম্ম পরিপোষণ কর। উদার ধর্ম্মেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। প্রেরিতগণ! কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশে এক এক বিষয়ের বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া, প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে। সকল দেবদেবীর ভাব সুরক্ষিত হইবে, বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা। এক এক মুনির হাতে এক একটি রত্ন অর্পণ কর; এক এক ধর্ম্মরাজ্য এক এক দেব-কুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে, আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেবদেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ; এক এক প্রেরিতের দ্বারা একটি একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণধর্ম্ম প্রকাশিত। এই প্রকার উদারতাকে আহ্বান করিতেছি। নববর্ষে সঙ্কীর্ণতা যেন আর না থাকে। চতুর্থ এবং শেষ প্রত্যাদেশ, পবিত্র হও, শুদ্ধ হও। নীতিকে অমান্য করিও না। ধর্ম্মের উচ্চসাধন করিতে গিয়া, নীতির প্রতি উদাসীন হইও না। যোগ করিতে গিয়া, দুর্নীতিপরায়ণ হইও না; ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, নীতি উল্লঙ্ঘন করিও না। রসনাসম্বন্ধীয় নীতিতে, আনুষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শ্রবণের নীতিতে, সমুদায় নীতিতে আপনাদিগকে সমুজ্জ্বলিত কর। অঙ্গে নীতি, হৃদয়ে নীতি; ক্রমাগত নীতি সাধন করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইয়া দাও, নববিধান সাক্ষী, ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ সাধন করিতে গেলে নীতি চলিয়া যায় না। ঘর সাজান, দ্রব্যাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, খরচ যাহাতে ঠিক হয়, বাক্য সুমিষ্ট হয়, ব্যবহার পবিত্র হয়, কথাগুলি ঠিক সত্যের সঙ্গে মিলে, বিধবা অনাথদের প্রতি যাহাতে ঠিক কর্ত্তব্য করা হয়, এই সকল বিষয়েই নীতিকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। প্রেরিতগণ! দেখাও, বড় বড় প্রশংসনীয় কার্য্যে তোমরা যেমন সুনিপুণ, ছোট ছোট কার্য্যেতেও সেইরূপ। বড় বড় বিষয়ে বিচার কর, উত্তীর্ণ হইবে; ছোট ছোট বিষয়ে পরীক্ষা কর, উত্তীর্ণ হইবে; এই কথা প্রমাণ করিয়া ব্যক্ত কর। বৈশাখের প্রথম দিবসে তোমরা এই চারি লক্ষণের

সাক্ষী হও ; সমস্ত বৎসর তোমাদের মধ্যে এই চারি নিয়মের সাধন ও পালন দর্শন করিবে। প্রেরিত প্রচারকেরা এই ব্রত গ্রহণ করিলেন, প্রেরিত দরবার সমক্ষে এক বৎসরের জন্য। পরম দেবতা সহায় হউন। তাঁহার সমক্ষে, তাঁহার অনুচর পিতার সন্তানগণের সমক্ষে, গলায় বস্ত্র দিয়া প্রেরিতেরা যে ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহার ফল দেখিবার জন্য ভারত আশা করিয়া থাকিল ; পৃথিবীও আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।”

২৬

শিমলায় গমন ও স্থিতি

পৌত্রের জন্ম এবং দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ

পূর্ব্বাধ্যায়ে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল, তাহার পূর্ব্বের তুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য ; একটি কেশবচন্দ্রের প্রথম পৌত্রের জন্ম, আর একটি তাঁহার দৌহিত্র রাজকুমারের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ। পৌত্রের জন্মসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই ফাল্গুন, ১৮০৪ শক) লিখিয়াছেন, "বিগত ২৭শে মাঘ (১৮০৪ শক ; ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃঃ), বৃহস্পতিবার রজনীতে, আচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনের একটি নবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শিশুটি অতি সুন্দর ও সুস্থকায়সম্পন্ন। দয়াময় ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" রাজকুমারের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে কেশবচন্দ্র দিনের বেলায় (৮ই ফেব্রুয়ারী) কুচবিহারে গমন করিলেন, রজনীতে পৌত্র জন্মগ্রহণ করিল। পরদিন শুক্রবার রাজকুমারের 'রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ' নাম রক্ষিত হইল। এ সম্বন্ধে কুচবিহার হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৮৮৩ খৃঃ এই টেলিগ্রাম আসে :—"গত কল্য (৯ই ফেব্রুয়ারী) রাজবাটিতে মহারাজকুমারের অন্নপ্রাশনানুষ্ঠান মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর সন্তানের নাম শ্রীমান্ 'রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ ভূপ' রক্ষিত হইয়াছে। দরবারে কুমারকে লইয়া মহারাজ নজর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তোপধ্বনি হইয়াছে। রজনীতে দীপমালা ও আতোষবাজী হইয়াছিল।"

শিমলায় গমন

শিমলায় গমনসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক) লিখিয়াছেন— "ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় সপরিবারে (১১ই বৈশাখ, ১৮০৫ শক ; ২৩শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খৃঃ) শিমলায় গমন করিয়াছেন। অসুস্থ শরীরে পথের ক্লেশ-নিবন্ধন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এখন সুস্থতা লাভ করিয়াছেন, সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হিমালয়ের শীতল প্রদেশ তাঁহার অসুস্থ শরীরকে সুস্থ করিবে, আমরা তাঁহাকে সুস্থ শরীরে আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইব, ইহাই

আমাদিগের প্রবলতর আশা। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে শিমলায় গমন করিয়াছেন।”

নবসংহিতাপ্রণয়ন

সুস্থ শরীর হউক, বা অসুস্থ শরীর হউক, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের কার্য্যে কখন অলস থাকিতে পারেন না। তিনি হিমালয়ে গমন করিয়া, কয়েক দিন পরেই 'নবসংহিতা' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। বৈশাখ মাসের শেষে (১৩ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ) 'নবসংহিতা' 'নববিধান পত্রিকায়' মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৬ই) উহার সংস্কৃতে অনুবাদ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইতে থাকে। নবসংহিতার সংস্কৃতানুবাদ, বেদবিদ্যালয় ও ব্রতাদিসম্বন্ধের অবস্থা উপাধ্যায় কেশবচন্দ্রকে অবগত করেন, তদুত্তরে তিনি লিখেন ঃ—

উপাধ্যায়কে পত্র

“তারা বিউ
শিমলা, ৩১শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ।

“প্রিয় গৌর,

“সংবাদগুলি তত মনোহর নহে। যাহা হউক, ভাল মন্দ সকলই আমার জানা উচিত। কিন্তু হইল কি? এত দিনে ক্ষমা সহিষ্ণুতা জন্মিবে না? আর আমার বলা বৃথা। বলাতে যদি কিছু হইত, এত দিনে নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু দেখিতেছি, আমার উপদেশে আর তত হইবার নাই। তাই এখন তোমাদের ভার তোমাদেরই হাতে। কলিকাতায় আমায় থাকিতে হইলে, কেবল অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বকা। তাহাতে সকলকে কষ্ট দেওয়া মাত্র। এখন আরামের অবস্থা হইল। উপদেশ শুনিবার লাঞ্ছনা কিছুকালের জন্য মিটিয়া গেল। আর এখন আমাকে প্রয়োজন নাই। কাহার বিশেষ অভাব বোধ হইতেছে না, এখানে আমারও হস্তে যথেষ্ট কার্য্য। আমি এখানে নূতন সংহিতা লিখিয়া তোমাদের সেবা করিতে পারি। ঋষিভাব-উদ্দীপক হিমালয় আমার পরম বন্ধু। ইহার আশ্রয়ে শরীর ও আত্মা উভয়ের উপকারের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ইটি ধর্ম্মসম্বন্ধে বড় অনুকূল। সংহিতা প্রভৃতি নূতন নূতন সত্য ইনি অনেক আনিয়া দেন। এস্থলে কেবল সত্য ধরিতে ও লিখিতে ইচ্ছা হয়। বোধ হয়, ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিবার এই স্থান। তোমরা সকলে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মন্বাদি শাস্ত্রকার

আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে সত্যাগ্নিতে প্রদীপ্ত করেন। সংহিতার প্রতি ভাইদের তত আদর দেখিতেছি না। কিন্তু শত শত বৎসর পরে, সেবকের পরিশ্রম কি সফল হইবে না? এই আমার প্রত্যাশিত পুরস্কার। ব্রাহ্ম-বিবাহ এবং শ্রাদ্ধের মন্ত্রাদি আমাকে খুব শীঘ্র ডাকযোগে পাঠাইবে। যদি হিন্দু শাস্ত্রাদির কোন অংশ তোমার ভাল বোধ হয়, তাহাও আমাকে লিখিতে পার। সংস্কৃত বাঙ্গলায় মূল অর্থ, পরে পরে লেখা আবশ্যক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

"বেদ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাদব বাবুকে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি।"

রাজ্যসম্পর্কে

কেশবচন্দ্র কলিকাতায় অবস্থানকালে দেশীয় এবং ইউরোপীয়গণের মধ্যে "কার্য্যবিধানব্যবস্থা" লইয়া যে ঘোর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, তাহা অতি ক্লেশের সহিত দেখিয়া, তৎপ্রতিবিধানের জন্য যত্ন করিয়াছেন। এখন "নবসংহিতা"-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, তৎসম্বন্ধে শিথিলযত্ন হইবেন, ইহা কখন তাঁহাতে সম্ভবপর নহে। ইংলণ্ডের ভারতে আগমনমধ্যে, যিনি বহুকাল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এক আর্য্যবংশের দুই শাখার মিলন দর্শন করেন, ইংলণ্ড ও ভারত উভয়ের গৌরববর্দ্ধন জন্য স্বয়ং ভগবান্ এই মিলন সাধিত করিয়াছেন, ইহাতে যিনি বিশ্বাস করেন, এক অপরকে পরিহার করিয়া কদাপি সৌভাগ্যের পথে আরোহণ করিতে পারে না, ইহা যাঁহার ধারণা, "যাহাতে সুশাসনপ্রণালী ও সুব্যবস্থা রক্ষা পায়", তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টা করা যিনি গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করেন, এমন কি "পদদলিত কোটি কোটি সামান্য লোকের রাজ্যসম্বন্ধে অবস্থার উন্নতি-সাধন" উচ্চতম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিয়া যিনি গ্রহণ করেন, "রাজভক্তিকে নীচ আনুগত্য ও দাসত্ব হইতে রক্ষা করা" যাঁহার রাজভক্তির মূলে অবস্থান করিতেছে, এ সম্বন্ধে দর্শন ও মত্ততা উভয়কে যিনি সমভাবে জীবনগত করিয়াছেন, সর্ব্বোপরি রাজভক্তির সহিত হরিভক্তি মিলাইয়া যিনি "যাহা তোমার, তাহাই আমার, তাহাই আমাদের; যাহা তোমার নয়, তাহা আমাদের নয়। আমরা রাজ্যটাজ্য মানি না, আমরা কেবল হরিকে মানি" ঈদৃশ নির্ভীক বাক্য যিনি অটল বিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন, তিনি যে রাজ-প্রতিনিধির নিরপক্ষপাতশাসনপ্রণালীস্থাপনের উদ্যোগে সৎপরামর্শদান করিবেন,

২৫০

অথবা উপযুক্ত সময়ে রাজভক্তি-প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করিবেন ও ঘোষণাপত্র ঘোষিত করিবেন, ইহা নিরতিশয় স্বাভাবিক।

মহারাজ্ঞীর জন্মদিনে প্রার্থনা

২৪শে মে (১৮৮৩ খৃঃ), বৃহস্পতিবার, মহারাজ্ঞীর জন্মদিনে তিনি এই প্রার্থনা করেন:—"হে প্রেমময়, হে ভারতের রাজা, আজ হরিভক্তির সঙ্গে রাজভক্তি মিলাইয়া তোমার পূজা করিব, কৃপা করিয়া পূজা গ্রহণ কর। আজ রাজ্ঞীর জন্মদিন উপলক্ষে ভারত আনন্দের উৎসব করিতেছে। আরো আনন্দিত হউক, আরো উৎসব করুক। হে মহারাজাধিরাজ, আমরা তোমারি দাস; হে গুরু, আমরা তোমারি সন্তান; হে পরম পিতা, আমরা সংসার জানি না, পরিবারের পিতামাতাকে জানি না, আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে জানি। আমাদের সকলি তুমি, আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তোমারি। আমাদের ভারতশাসন পরিত্রাণের শাসন, কল্যাণের হেতু, আমরা তাহাই জানি। এই রাজ্ঞী তোমারি প্রেরিত, এই আমরা মানি। হরি, সংসারে আমাদের মা যেমন, রাজ্যে তেমনি আমাদের মা মহারাণী। যাহা তোমার, তাহাই আমার, তাহাই আমাদের; যাহা তোমার নয়, তাহা আমাদের নয়। আমরা রাজ্যটাজ্য মানি না, আমরা কেবল হরিকে মানি।

"আমাদের রাজার কীর্ত্তি আমরা একটুও বাদ দিতে পারি না। মা, তোমার বিধানের ভিতর এই রাজা; তোমারি ভিতরে এই রাণী। এই আর একখানি রূপ। মা, কত রূপ দেখাও। রাজ্যে গিয়া রাণী হও, রাণীর মন্ত্রী হও। কীর্ত্তি তব অনেক প্রকার, কিন্তু ভক্তের কাছে এক প্রকার। যত দিন বাঁচিব, তোমার কীর্ত্তি মাথায় করিব। মা, তাই আজ তোমার কন্যার জন্মদিনে, তুমি তাঁহাকে স্নান করাইয়া, সকলের অপেক্ষা বড় যে সিংহাসন, তাহার উপরে বসাইতেছ। সমুদ্র পর্ব্বত তাঁহাকে রাজভক্তি দিবে। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা তাঁকে রাজভক্তি দিব না? মা, তুমি যাঁহাকে রাজ্যেশ্বরী করিলে, কোটি কোটি লোক যাঁর অধীনে, আমরা তাঁহাকে মানিব না? মা, তুমি আমাদের বলিলে, তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি একটি ছোট মাকে পাঠাইলাম, তোমরা ইহাকে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, রাজভক্তি সব দিবে। মা, আমাদের যাঁহাকে যাহা বলিতে বলিবে তুমি, আমরা তাঁহাকে তাহাই বলিব। মা, আজ তোমার কাছে কত হীরা

মুক্তা পান্নার মুকুট রহিয়াছে, কত বাজনা গান হইতেছে। ইংরাজ বাঙ্গালী সকলে রাজভক্তির গান করিতেছে। মা, ভাগ্যে আজ তোমার বাড়ীতে আসিলাম, তাই দেখিতেছি, তুমি আজ তোমার সদ্‌গুণে ভূষিতা, সুনীতিসম্পন্না রাজকন্যাকে নিজে অভিষিক্ত করিতেছ। আজ যখন আমি দেখিলাম, রাজকন্যা নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে বসিলেন, তখনই শুনিলাম, তুমি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছে, 'ভারতের রাণী, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।' অমনি স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি হইল। হিমালয়, তোমার উপরে আজ মহারাণীর জন্মোৎসব হইতেছে, কত কামানের শব্দ হইতেছে। তুমি একবার বল, রাণীর জয়! তার সঙ্গে সঙ্গে বল, জয় মার জয়! মা, তুমি একবার সকল ভক্তকে লইয়া, তোমার ভারতের রাণীকে লইয়া এইখানে বস, আমরা দেখি। আমরা কেমন সুখে সুখী, আমরা রাজ্যটাকেও মার কাছে আনিলাম। মা, আজ সব এক হইয়া গেল। ধন্য নববিধান, তুমি সকল ধর্ম্ম এক করিলে। যেমন নববিধানের লোক রাজভক্ত, এমন কি আর কেহ হইতে পারে? যে বলিল, তোমাকে মার সন্তান, বল দেখি, রাণী, এমন রাজভক্তি আর কার হতে পারে? ভারতকে তুমি কুশলে রেখেছ, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা লও, ভক্তি লও; আর রাজার রাজা তুমি, হে হরি, তোমার এই ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য, নববিধানের রাজ্য আমরা কুশলে রাখিব। মা, আমরা কয়টি তোমারি দাস, তোমার আজ্ঞা শুনিয়া কাজ করিব। রাজাধিরাজ তুমি, তোমারি চরণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ এক হউক। মা, তুমি আজ সকল বিবাদ বিসংবাদ দূর কর, আমরা সকলে এক হই। মা, আমরা তোমার নববিধান পূর্ব্ব পশ্চিমে সকল স্থানে যেন প্রচার করিতে পারি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন রাজভক্তি দেখাইয়া, কুশলের রাজ্য স্থাপন করিতে পারি।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মহারাজ্ঞীর জন্মদিনে হিমালয় হইতে ঘোষণাপত্র

'নববিধান পত্রিকার অতিরিক্ত' এই নামে মহারাণীর জন্মদিনে হিমালয় হইতে এই ঘোষণাপত্র বাহির হয়:—"আজ (২৪শে মে) আমার রাণীর জন্মদিন। ভারত, আনন্দ কর। সমগ্র দেশস্থ স্বদেশীয় নরনারী, বন্ধুগণ, সমবিশ্বাসিগণ, আনন্দ কর। ব্রিটিষ জয়পতাকার নিম্নে যাহারা নিরাপদে জীবনযাপন করি-

তেছে, তাহাদের প্রত্যেকে আজ এই আনন্দের দিনে সকৃতজ্ঞ আনন্দ করুক। ভিক্টোরিয়ার কল্যাণকর শাসনাধীনে যে সকল কল্যাণ সম্ভোগ করিতেছে, তজ্জন্য কোটি কোটি নরনারী আজ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্তোত্রনিনাদ ভগবৎ-সন্নিধানে প্রেরণ করুক। আমাদের অনুকম্পনশীলা মহারাজ্ঞীর নামে আমরা নূতন সঙ্গীত গান করি। মহোচ্চ হিমালয় 'ঈশ্বর রাণীকে আশীর্ব্বাদ করুন' এই শব্দ নিনাদিত করুন; গভীর গর্জ্জনে তরঙ্গমালা তুলিয়া, বলয়বেষ্টন প্রকাণ্ড সমুদ্র সেই আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত করুন। ঈশ্বর বলিতেছেন, রাজভক্ত লোকদিগের ওষ্ঠাধরে 'রাণী' 'আমাদের প্রিয় রাণী' 'আমাদের কল্যাণী রাণী' এই শব্দ উচ্চারিত হউক। সকল জাতি, সকল ধর্ম্মের নৃপগণ, নৃপতনয়গণ, অভিজাতগণ, জ্ঞানিগণ, সাধুগণ, ভক্তগণ, নরনারী বালকবালিকাগণ, ভারতের দূর দূরান্তর প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের মন্দিরে সমাগত হউন এবং তাঁহার পবিত্র সিংহাসনসন্নিধানে রাজভক্তির কর অর্পণ করুন। পঞ্জাবী ও সিন্ধি, রাজপুত ও মহারাষ্ট্রী, বিহারী ও বাঙ্গালী, দাক্ষিণাত্যের তামিল ও তেলেগুভাষী জাতি, পার্ব্বত্য ও আদিম জাতি, হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ এবং পারসিক, সকলে আইস; তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন সমবেততানলয়ে উন্নতমনা রাজ্ঞীর প্রশংসা গান কর এবং তোমাদের সঙ্গীত-ধ্বনিতে স্বর্গের প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হউক। হৃদয়শূন্য ভক্তি, লাভালাভগণনায় কপটবাধ্যতাস্বীকার মহান্ ঈশ্বর কখন গ্রহণ করিবেন না; রাজা নয়, কিন্তু তাহার ছায়া বা সংজ্ঞামাত্র স্বীকার, অথবা ফলাফলবিচারপ্রণোদিত রাজনীতির হৃদয়শূন্য অবিশ্বাস তাঁহার সন্তোষের কারণ হয় না। হৃদয়োত্থিত উচ্ছ্বসিত অনুরাগ, পুত্রসমুচিত প্রকট প্রীতি, উদ্দাম অকৈতব কৃতজ্ঞতা, প্রমত্তোৎসাহপূর্ণ রাজভক্তি, এই সকলের জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ, এই সকল আজ আনন্দোৎসবের দিনে অর্পিত হইবে। আমাদের রাজ্ঞী উৎকৃষ্টগুণসম্পন্না, ভূমণ্ডলে যত সকল শাসনপ্রবৃত্ত নৃপতি আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মেতে শোভনগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, প্রকৃতপক্ষে সুকোমল স্নেহময়ী আমাদিগের মাতা, রাজ্যসম্পর্কে যে সকল বিবিধ কল্যাণ আমরা সম্ভোগ করিতেছি, তাহার উৎস, রাজ্ঞীসমুচিত সদ্গুণে যথাযোগ্য অত্যুন্নত। অনুরক্তসন্তানসমুচিত রাজভক্তি-উপহারে আমরা ঈদৃশী মাতা রাজ্ঞীর সম্মাননা করিতেছি, অপিচ পৃথিবীর অধিরাজকে স্বীকার করিতে

গিয়া আমরা স্বর্গাধিরাজের বিধাতৃত্ব স্বীকার করি। আমরা ইহার সম্মান করিতে গিয়া, যিনি ইহাকে আমাদের শাসনকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা গৌরবান্বিত করি। সত্যই আমাদের সাংসারিক ও নৈতিক শিক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে ইংলণ্ডের শাসনাধীনে স্থাপন করিয়াছেন। পার্থিব রাজশাসনপ্রণালীর সঙ্গে যে সকল ভ্রম ভ্রান্তি অপূর্ণতা সংযুক্ত আছে, সে সকলেতে যদিও সময়ে সময়ে দেশশাসন কলঙ্কিত হয়, তথাপি দেখ, সর্ব্বাভিভবকারী বিধাতা তাঁহার মঙ্গলসঙ্কল্প কেমন সাধিত করিয়া লইতেছেন, এবং সমগ্র ভারত ইংলণ্ডের রক্ষণাধীনে বিবিধ জাতির মধ্যে তাহার প্রাপ্য স্থান এবং স্বর্গরাজ্য তাহার আসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অতএব সর্ব্বপ্রকার অসন্তোষের ছল দূরে পরিহার করিয়া, ভগবদধীন মাতা রাজ্ঞীর প্রতি গভীর রাজভক্তি অর্পণ করি। এ সময়ে ভারতে জাতীয় বিদ্বেষ প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছে এবং লোকদিগের অসন্তোষ ও বিরাগ উদ্দীপন ও বর্দ্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমরা যেন এই সকল প্রতিকূল প্রভাবের অধীন না হই; কিন্তু আমাদের অনুকম্পনশীলা রাজ্ঞী ও তাঁহার অভিজাত প্রতিনিধি —যিনি ভগবৎপরিচালনায় আমাদের এত উপকার করিয়াছেন—দৃঢ়তাসহকারে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করি। উৎসাহপ্রমত্ত রাজভক্তিসহকারে সমগ্র ভারত আজ আনন্দ প্রকাশ করুক এবং সকলে মিলিত হইয়া করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ সম্রাট্, মহারাজ্ঞী, রাজপরিবার, ইংলণ্ডস্থ মন্ত্রিবর্গ, ভারতস্থ অভিজাত রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার সহযোগিগণের মস্তকে বর্ষিত হউক এবং ইংলণ্ড ও ভারত অকপট সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, ইহ পর-লোকের সুখসৌভাগ্য উপার্জ্জন করুক।"

জেতৃগণের সহিত অসদ্ভাবে বিজিতগণের সমুচিত কর্ত্তব্যতা

বিজিত ও জেতৃগণের মধ্যে যখনই অসদ্ভাব হয়, তখন বিজিতগণের কি প্রকার ভাবালম্বন করা সমুচিত, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ "করিও না" এতচ্ছীর্ষক প্রবন্ধের আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"'কার্য্যবিধানব্যবস্থা' লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত, তাহাতে আমার ইচ্ছা হয় যে, সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় সমাজের সংস্রব ত্যাগ করি, আর কখনও উহার সঙ্গে যোগ না রাখি। সৎপরামর্শ—(এরূপ) করিও না।

"এই পাণ্ডুলিপির বিরোধী সংবাদপত্রগুলি দেশীয় সমাজের জঘন্য-কুৎসা-নিন্দায় এমনই পূর্ণ যে, আমার প্রবৃত্তি হয় যে, আমার টেবিল হইতে উহাদিগকে সরাইয়া দি, আর উহাদিগের গ্রাহকশ্রেণী হইতে নাম উঠাইয়া লই।—(এরূপ) করিও না।

"আমার চিত্ত এমনি বিরক্ত ও খিট্‌খিটে হইয়াছে যে, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি আমায় জনবিদ্বেষী সংশয়ী করিয়া তুলি।—(এরূপ) করিও না।

"সমুদায় উন্নতি বন্ধ হইয়া গেল, দেশীয় সমাজ শতবর্ষ পিছাইয়া গেল, আমি উন্নতিসম্বন্ধে আর আশা করি না।—(এরূপ) করিও না।

"আমি ক্রোধন, খিট্‌খিটে এবং বিদ্বেষী হইয়া পড়িতেছি এবং আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ক্ষমা হারাইয়া ফেলিতেছি।—(এরূপ) করিও না।

"ইউরোপীয় এবং দেশীয়গণের মধ্যে মিল হইতেছিল, এখন উভয়ের মধ্যে ব্যবধান এত বাড়িয়া গেল যে, ভারতের ইতিহাসে ঈদৃশ দুই বিরোধী জাতির কোন কালে মিলন হইতে পারে না, আমি এই দর্শন-রাজনীতি ও ধর্ম্মসঙ্গত সিদ্ধান্ত করিতেছি।—করিও না।

"ইংরাজেরা যদি আমার দেশীয়গণকে গালি দেয়, আমিও তাহাদিগকে গালি দিব।—(এরূপ) করিও না।

"আপনারা উচ্চ জাতি বলিয়া যদি তাহারা অভিমান করে, আমিও আমাদের জাতিকে উচ্চ বলিয়া অভিমান করিব এবং তাহাদিগকে বিদেশী বলিয়া ঘৃণা করিব।—করিও না।

"নিঃসম্বন্ধ জাতিকে ভালবাসা অসম্ভব, আমি এই বিশ্বাস করি।—করিও না।

"যে সকল ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নয়, তাহারা গবর্ণমেণ্টকে এবং আমাদের প্রতিনিধিকে ধিক্কার করিতেছে, আমিও তাহাই করিব।—করিও না।

"এত সভ্যতা ও উন্নতিসত্ত্বেও যদি এইরূপ হয়, আর আমি বিধাতায় বিশ্বাস করিব না, প্রার্থনা করিব না।—(এরূপ) করিও না।"

বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ

বেদ, বেদান্ত ও পুরাণ এ তিনের ঐক্যস্থল নববিধান। বৈদিক বিশ্লেষ হইতে বৈদান্তিক সংশ্লেষে, বৈদান্তিক সংশ্লেষ হইতে পৌরাণিক বিশ্লেষে ভারত

স্থগিতগতি হইয়াছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক বিশ্লেষকে মহত্তর সংশ্লেষে উপনীত করিয়া, নববিধান বিধানের ঈশ্বরকে জগতের সন্নিধানে উপস্থিত করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"বৈদিক ঋষিগণ ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়াছিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রধান মধ্যবিন্দুতে দেব-শক্তির স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এগারটি আকাশে, এগারটি অন্তরীক্ষে, এগারটি পৃথিবীতে, ঋগ্বেদ এই প্রধান তেত্রিশটি দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অধিষ্ঠিত এই দেবগণের বহুত্বমধ্যে একত্ব আভাস-মাত্রে স্বীকৃত হইয়াছিল। হিন্দুমন যখন দার্শনিক চিন্তার দিকে অগ্রসর হইল, তখনই বৈদান্তিক সময়ে এক মহতী সংশ্লেষক্রিয়া উপস্থিত হইয়া, অগ্নি ইন্দ্র সূর্য্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইল। পৌরাণিক সময়ে এই দার্শনিক একত্ব খণ্ড খণ্ড হইল এবং তন্মধ্য হইতে বহুল দেবগুণ উদ্ভূত হইল, আর সেই গুণ-গুলি এক একটি দেবতা বলিয়া গৃহীত হইল। এইরূপে এক তেত্রিশকোটি হইলেন। বেদের বিবিধ শক্তি ও পুরাণের বিবিধ গুণ পুরুষবিধ একত্বে বিলীন করিয়া, নবমণ্ডলী এক নবীন সংশ্লেষ সিদ্ধ করিয়াছেন। এই অন্তিম সংশ্লেষে ভারত শান্তি ও বিশ্রান্তি লাভ করিবে।

"তেত্রিশটি বৈদিক দেবতা।
|
বৈদান্তিক ব্রহ্ম।
|
তেত্রিশ কোটি পৌরাণিক দেবতা
|
নববিধানের ঈশ্বর।"

এখানে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মকে যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কার্য্যসাধন করিয়াছেন; নববিধান তবে আর এখানে কি নূতন করিলেন? যাঁহারা সগুণবাদিগণের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই সকল সগুণবাদী অপর পক্ষের উপাস্য দেবতাকে অধঃকরণ করিয়া, স্বীয় উপাস্য দেবতাকে পরব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতে এই হইয়াছে, যে বহুত্ব পূর্ব্বেও ছিল, সেই বহুত্বই

থাকিয়া গিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা ঘনীভূত হইয়াছে। বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম, শিব, ইঁহাদের প্রত্যেকেই অন্যনিরপেক্ষ পরব্রহ্ম; সুতরাং যাঁহারা যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্ম, অপরে যাঁহাকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি আবির্ভূতস্বরূপ জীবমাত্র। এইরূপ বিরোধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবই পরব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপমাত্র। নববিধান আগমন করিয়া সেই বিরোধনির্ব্বাণ করিয়াছেন, "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতিকে মার সাজে সাজাইয়া, গৃহস্থের বাড়ীতে আনিয়াছেন।"

ইউনিটেরিয়ান্‌গণের নিকটে পত্র

শিমলা হইতে প্রতিবার "নববিধান পত্রিকার" জন্য এক একটি প্রার্থনা কেশবচন্দ্র লিখিয়া পাঠান, এই প্রার্থনাগুলি "ইংরাজী প্রার্থনা" গ্রন্থের প্রথমেই মুদ্রিত হইয়াছে। শেষ প্রার্থনা "রোগের অবস্থায় ঈশ্বর মাতা ও ধাত্রী।" এই প্রার্থনান্তেই কলিকাতায় প্রত্যাগমনার্থ তিনি শিমলা পরিত্যাগ করেন। মণ্ডলীর বিষয়ে তিনি কোন কালে উদাসীন ছিলেন না। লণ্ডনস্থ 'ইন্‌কোয়ারার' পত্রিকা, ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইউনিটেরিয়ান্‌গণের সহানুভূতি তিরোহিত হইতেছে, এই কথা লিপিবদ্ধ করেন। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ লণ্ডনস্থ ইউনিটেরিয়ান্ সমাজের সম্পাদকের নামে একখানি পত্র শ্রীদরবারের সম্পাদক দ্বারা তিনি প্রেরণ করেন। এই পত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"লণ্ডনস্থ ব্রিটিষ এবং বিদেশীয় ইউনিটেরিয়ান্ সমাজের সম্পাদক,

মহাশয় সমীপে।

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রেরিতগণের দরবার

কলিকাতা, ২৩শে জুন, ১৮৮৩ ইং।

"শ্রদ্ধেয় মহাশয়,—অল্পদিন হইল 'ইন্‌কোয়ারার' পত্রিকায় (১২ই মে, ১৮৮৩ খৃঃ) যে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, সেই প্রবন্ধ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রেরিত দরবারের মনোযোগাকর্ষণ করিয়াছে। যেহেতুক ঐ পত্রিকা-খানি লণ্ডনস্থ ইউনিটেরিয়ান্ সমাজের মত প্রকাশ করে বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত,

এবং ঐ প্রবন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা; অতএব তৎসম্বন্ধে বাস্তবিক ব্যাপার কি, তাহা আপনাদের সন্নিধানে উপনীত করিয়া, আমি আপনাদের সংশয় ও অসৌহৃদ্য অপনয়ন করি, প্রেরিত দরবার এই অভিলাষ করিয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন যে, 'এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ ও ইউনিটেরিয়ান্‌গণের মধ্যে গভীর সহানুভূতি ছিল, এখন আর সে সহানুভূতি নাই।' এইটি মূল করিয়া তিনি আমাদের ধর্ম্ম এবং আমাদের নেতার চরিত্রের উপরে কঠিন উদ্বেগকর দোষোদ্ঘাটন করিয়াছেন। পত্রিকার সঙ্গে আমাদের কোন বিসংবাদ নাই। যে কোন প্রকারে হউক না কেন, পত্রিকাসম্পাদক সাহস ও সারল্যসহকারে আপনার মত ব্যক্ত করিতে পারেন। আমাদের এবং আমাদের ক্রিয়াসম্বন্ধে বাস্তবিকই যদি তাঁহার ঘৃণা থাকে, তবে তিনি সরলভাবে তাহা বলিবেনই তো; তাঁহার ন্যায্য-স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। কিন্তু যখন তিনি একটি সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি হইয়া বলিতেছেন, তখন এ ব্যাপার ভিন্ন। 'চন্দ্রসেন অতিরিক্ত দাবী দাওয়া উপস্থিত করিতেছেন' এবং 'তাঁহার মণ্ডলী বালোচিত কুসংস্কারের দিকে যাইতেছে' এই দেখিয়া কেবল তিনি নন, 'সমগ্র ইউনিটেরিয়ান্ মণ্ডলী ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন', 'ইন্‌কোয়ারার' অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মত এই কথা বলিতেছেন। এ কথা কি সত্য যে, ব্রাহ্মসমাজ ও ইউনিটেরিয়ান্‌গণমধ্যে আর সৌহৃদ্যসমুচিত সম্বন্ধ নাই? একথা কি সত্য যে, 'চন্দ্রসেন অতিরিক্ত দাবী দাওয়া' উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া, ইউনিটেরিয়ান্-গণ তাঁহাকে তাদৃক্ লোক এবং তাঁহার মণ্ডলীর ধর্ম্ম কতকগুলি অর্থশূন্য রহস্য-পূর্ণ কুসংস্কার জানিয়া, তাঁহাকে এবং তাঁহার ধর্ম্মকে ঘৃণা করেন? অপিচ এ কথা কি সত্য যে, এই হেতুতেই ইউনিটেরিয়ান্‌গণের সহানুভূতি সাধারণতঃ চন্দ্রসেনের মণ্ডলী হইতে নিবৃত্ত হইয়া, যে দল সে মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহার দিকে গিয়াছে? এ সকল প্রশ্নের আধিকারিকোচিত উত্তর এক 'ব্রিটিষ এবং বিদেশীয় ইউনিটেরিয়ান্ সমাজ' দিতে পারেন, কেন না তিনিই যুক্তরাজ্যের ইউনিটেরিয়ান্‌মণ্ডলীর সভার প্রকৃত প্রতিনিধি। প্রেরিত-গণের দরবার এ জন্যই আপনাদের সমাজের নিকটে নিবেদনপূর্ব্বক বিশ্বাস করিতেছেন যে, এই ব্যাপারটিতে যখন দুইটি গণ্য সমাজের সম্বন্ধে, এমন কি,

দুই প্রধান দেশের ভাবী ধর্ম্মে, গুরুতর ব্যাঘাত উপস্থিত, তখন তাঁহারা উহার গুণাগুণ পর্য্যালোচনার বিষয় করিবেন।

"আমি প্রেরিতগণের দরবারের পক্ষ হইতে এই নিবেদন করিতেছি যে, দরবারের যত দূর সংস্রব, তাহাতে তাঁহারা ইউনিটেরিয়ান্ মণ্ডলীর প্রতি চির দিন নিরতিশয় সৌহৃদ্য ও সম্ভ্রমপূর্ণ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছেন, আজও করিতেছেন। তাঁহাদের নেতা এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রতি তাঁহারা ইংলণ্ডে যে অতি উদার ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে মূল্যবান্ গ্রন্থগুলি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাদের নিকটে অতীব কৃতজ্ঞ। 'চ্যানিং কৃত সমগ্র গ্রন্থ' ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বিক্রয় করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। এ দেশে ঐ গ্রন্থের যাহাতে বহুল প্রচার হয়, তজ্জন্য সমাজ বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ ও ইউনিটেরিয়ান্গণের মধ্যে একত্বনিবন্ধনের এটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন, এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নিদর্শন কি মনে করা যাইতে পারে। সেই সুন্দর মহাত্মার ভাবে দুই মণ্ডলী মিলিত হইবেন, ইহার অপেক্ষা আর কি অভিলষণীয় হইতে পারে। ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মের মূলমতসম্বন্ধে ভারতে হিন্দুগণমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সেই কার্য্য করিতেছেন, যে কার্য্য ইউনিটেরিয়ান্ মণ্ডলী ইংলণ্ডে করিতেছেন। বস্তুতঃ অনেক ইউনিটেরিয়ান্ আচার্য্যমুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতে ইউনিটেরিয়ান্ প্রচারক্ষেত্রগঠনে কোন প্রয়োজন নাই, কেন না ব্রাহ্মসমাজই সে কার্য্য বিশিষ্টরূপে নিষ্পন্ন করিতেছেন। এই দুইটী মণ্ডলী সহোদরা, ইহারা বিধাতৃনিয়োগে মিলিতভাবে কার্য্য করিতেছেন এবং আমরা সরলভাবে বিশ্বাস করি, বিশ্বাসের সমতা এবং সৌহৃদ্যের সমচিত্ততা এ দুইকে একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছে। যাঁহাদিগকে ভগবান্ মিলিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি কি প্রকারে হইতে পারে? এরূপ ছাড়াছাড়ির চেষ্টা বা উহা ঘটান অসত্যমূলক এবং ক্ষতিকর উভয়ই। প্রেরিতগণের দরবার যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি, তৎপক্ষ হইতে বিদ্বেষ, বিসংবাদ, বিচ্ছেদ বা অসম্ভ্রমের মত কিছু হইয়াছে, ইহা আমরা সর্ব্বথা অস্বীকার করিতেছি। ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের ইউনিটেরিয়ান্ সহযোগিগণের প্রতি তাঁহারা চিরদিন সম্ভ্রম ও সৌহৃদ্য পোষণ করিয়াছেন, আজও করিতেছেন। এইটি দৃঢ়তাসহকারে নির্দ্ধারণ করিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি।

"কিন্তু একত্ব কখন একবিধত্ব নয়। যেস্থলে মতভেদ অপরিহার্য্য, সেস্থলে আমরা সহানুভূতি চাইও না, দাবীও করি না। দুই মণ্ডলী কখন বিচ্ছিন্ন হইবেন না বলিয়া মিলিত হইয়াছেন; কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন ও বিশেষ অভাবানুসারে, অবান্তর বিষয়ে সাধন ও মতঘটিত ভিন্নতা আছে এবং হইবে। যদি ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান্‌গণ তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ মত ও ভাব আমাদের উপরে চাপাইতে চাহেন এবং যে সকল বিশেষ মূল মত আমাদের স্বজাতীয় মণ্ডলীর নিকটে অতীব প্রিয় ও পবিত্র, সেগুলিকে সর্ব্বথা পরিহার করাইতে চান, তাহা হইলে আমরা ঈদৃশ যত্নকে দর্শন ও প্রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিবাদ করিব। আমাদের যোগ ও ভক্তিকে স্বপ্নদর্শন বলিয়া উপহাস করা, বালোচিত কুসংস্কার বলিয়া আমাদের ভারতের নিত্য অনুষ্ঠেয় অভিষেক ও প্রাণযজ্ঞের (Sacraments) প্রতিবাদ করা, সকল কালের বঞ্চকেরা যেরূপ করিয়াছে, সেইরূপ আমাদের নেতা অমিত আত্মগরিমার প্রভাবে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মোহের পথে দিন দিন অবতরণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করা, নির্ব্বোধ রহস্যপ্রিয় স্বপ্নদর্শী বলিয়া আমাদের সমগ্র মণ্ডলীকে প্রেম ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করা—ইউনিটেরিয়ান্ সমাজের নামে ইন্‌কোয়ারার পত্রিকার লেখক যেরূপ করিয়াছেন, সেইরূপ কথা—এটি নিশ্চয়ই ঘোরতর পরমতাসহিষ্ণুতা; উদার খ্রীষ্টানমণ্ডলী এরূপ পরমতাসহিষ্ণুতায় অবশ্য লজ্জানুভব করিবেন। এ কথা বলা অধিকন্তু নয় যে, ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান্‌গণ আমাদের যোগভক্তির সূক্ষ্মতম মূলতত্ত্ব, খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি আমাদের পূর্ব্বদেশসমুচিত করিয়া লওয়ার দার্শনিক তত্ত্ব ভাল করিয়া বোঝেন না এবং তাঁহারা সেগুলি গভীর আলোচ্য বিষয়ও করেন নাই। সুতরাং আমরা সম্ভ্রমসহকারে বলিতেছি, তাঁহাদের সিদ্ধান্তসন্নিধানে আমরা প্রণতমস্তক হইতে পারি না। জন্মের পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টের স্থিতি, ত্রিত্বৈকত্বঘটিত সমন্বয়বাদ, ঈদৃশ উচ্চতর যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মের মত ও সাধন আমাদিগের মণ্ডলীতে দিন দিন প্রকাশ পাইতেছে, সেগুলিকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবুদ্ধ রহস্যবাদ বলিয়া যে তাঁহারা দোষপ্রদর্শন করিয়াছেন, উহাও আমাদিগের গ্রহণীয় নহে। এরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মবিরোধী দোষপ্রদর্শন খ্রীষ্টধর্ম্মবিশ্বাসিগণ হইতে উপস্থিত হইতে পারে, আমরা এরূপ আশা করি নাই; এবং তজ্জন্যই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, আমাদিগের নিকটে

উহার কোন গুরুত্ব নাই, আমরা উহার নিমিত্ত খ্রীষ্টের শিষ্যগণের মধ্যে আমাদের অগ্রগণ্যতা পরিহার করিতে প্রস্তুত নই।

"কোন এক জন বা দুই জন ইউনিটেরিয়ান্ আমাদের এবং আমাদের মণ্ডলীর প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতে পারেন, কেন না ব্যক্তিগত বিচারের প্রতি বলপ্রকাশ করিতে কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু আমরা যদি জানিতে পাই যে, মণ্ডলীবদ্ধ ইউনিটেরিয়ান্‌গণের প্রতিনিধি ব্রিটিষ এবং বিদেশীয় ইউনিটেরিয়ান্‌গণের সভা তাঁহাদিগের পূর্ব্বদেশস্থ ভ্রাতৃবর্গের সম্বন্ধে ঈদৃশ বিরুদ্ধ মত ও ভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। এ দেশে এবং ইংলণ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমাদের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে দোষোদেঘাষণ, এমন কি, গালিবর্ষণ করিতে কেন প্রোৎসাহী হইয়াছেন, তাহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই দক্ষিণ ও বাম পক্ষ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি ভক্তি-প্রেম-আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন, কতকগুলি বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন এবং বাহিরের সভ্যভব্যতায় অনুরক্ত। এ দুই পক্ষের ভিতরে সর্ব্বদাই অমিল, এমন কি, সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। এ কথা আপনারাও অস্বীকার করিবেন না যে, ইউনিটেরিয়ান্ মণ্ডলীও দুই বিরুদ্ধ ভাগে বিভক্ত এবং যেমন আমাদের মধ্যে অপরোক্ষজ্ঞানী ও পরোক্ষজ্ঞানী ব্রাহ্ম আছেন, তেমনি আপনাদের সমাজমধ্যেও অপরোক্ষজ্ঞানী ও পরোক্ষজ্ঞানী ব্রহ্মবাদী আছেন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বৌদ্ধভাবাপন্ন, তাঁহারা যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা বৌদ্ধভাবাপন্ন, তাঁহাদের সহিত সহানুভূতিপ্রদর্শন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য। ঈদৃশ সহানুভূতি সহসম্বন্ধনিয়মমূলক এবং সমজাতীয়-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহা নিয়তই দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা বস্তু-স্বভাবানুসারে অদ্ভুত বা অনিয়ত ব্যাপার নয় বলিয়া, আমরা ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। যদি শত শত বা সহস্র সহস্র ব্যক্তি বৌদ্ধভাবাপন্নতা এবং সাংসারিকতা-বুদ্ধিনিবন্ধন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এ পরিত্যাগ একটুও অদ্ভুত বলিয়া আমরা মনে করি না। ইতিহাসে এরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে এবং ঈদৃশ অবস্থা যখনই উপস্থিত হইবে, তখনই পুনঃ পুনঃ ঘটিবে। এইরূপ বৎসর বৎসর ইউনিটেরিয়ান্ এবং অপর অপর খ্রীষ্টান-মণ্ডলীর মধ্য হইতে কত শত শত সহস্র সহস্র লোক স্বমতনিষ্ঠ অধ্যাত্মভাবাপন্ন

মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের দলে গিয়া মিশিতেছেন। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের নিকটে পূজোপাসনা ভারবহ, সুখের ব্যাপার নয়, কঠোর কর্ত্তব্য, আধ্যাত্মিকতা অবুদ্ধ রহস্যবাদিত্ব এবং নির্ব্বুদ্ধিতা, পাঁচ ঘণ্টা যোগ উন্মাদের স্বপ্নদর্শন। এখানেই হউক বা পাশ্চাত্য প্রদেশেই হউক, যে সকল দৃশ্য স্পৃশ্য বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেই সকল ইহাদিগের নিকটে মূল্যবান্; পবিত্রাত্মা হইতে যে সকল সূক্ষ্মতম বিষয় উপস্থিত হয়, সেগুলি কুসংস্কার, কুসংস্কার বিনা আর কিছুই নহে। আত্মার জন্য নবভাবাপন্ন গৃহনির্ম্মাণাপেক্ষা তাহারা বিদ্যালয়নির্ম্মাণ সমধিক প্রশংসা করে। তাহাদের নীতি আত্মবলিদান নহে, বিবেকস্থ ঈশ্বরবাণীর নিকটে বাধ্যতা নহে, দৈনিক জীবনের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে উচ্চতম বৈরাগ্যোচিত সাত্ত্বিকতা নহে, কিন্তু সুবিধামত বাহ্য সভ্যতার নিবন্ধনবিধির অনুবর্ত্তন। ঈদৃশ ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, প্রশংসাবাদ করে, শ্রেষ্ঠতাদান করে। হইতে পারে, এ জন্যই ইউনিটেরিয়ান্‌গণমধ্যে যাঁহাদের মন অল্পাধিক পরোক্ষব্রহ্মবাদীর অনুরূপ এবং যাঁহাদিগের আধ্যাত্মিকতা বৌদ্ধভাবে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদিগের সহানুভূতি আমাদের আধ্যাত্মিকতাপ্রধান বিভাগ হইতে প্রত্যাহার করিয়া, বৌদ্ধভাবপ্রধান বিভাগে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ করা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল পরোক্ষবাদীর পরিধি অতিক্রম করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাই, এখানে এবং পশ্চিমে, হিন্দু ও খ্রীষ্টানগণমধ্যে শত শত অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তি, শেষ কয়েক বৎসর হইল, সহানুভূতি ও উৎসাহদান দ্বারা আমাদিগকে উৎফুল্ল করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে যাঁহারা অধ্যাত্মভাবাপন্ন, তাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান অধ্যাত্মসংগ্রাম ও বিজয়কে যে প্রকার হৃদয়ের সহিত অনুমোদনের চক্ষে দেখিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্ব ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আর কখন সে প্রকার হয় নাই, আমাদের নববিধান পত্রিকায় মুদ্রিত এ বিষয়ে অনেকগুলি প্রমাণ তাহাই প্রদর্শন করে। তবে ইহার সঙ্গে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, তাঁহাদের অনেকে আমরা 'নূতন' স্বাধীন মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছি বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বৌদ্ধভাবাপন্ন, তাঁহারা যদি, আমাদের মধ্যে যাঁহারা বৌদ্ধভাবাপন্ন,

তাঁহাদের পক্ষাশ্রয় করেন, আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ভক্তিভাবাপন্ন, তাঁহারা আমাদিগকে সহানুভূতি দিন। আমাদের এরূপ সহানুভূতির আশা করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে; কেন না, আমরা দেখিতে পাই, গত বর্ষের ইউনিটেরিয়ান্ সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে, আপনাদের এক জন অতি ভক্তিভাবাপন্ন আচার্য্য রেবারেণ্ড জে পেজ হপ্‌স সাহসপূর্ব্বক আত্মিকতার পক্ষসমর্থন করিয়াছেন এবং নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে বর্ত্তমান সময়ের প্রবল বৌদ্ধভাবের প্রতি সুতীব্র ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন:—'এক্ষণে আমরা বৌদ্ধভাবাপন্ন স্বাধীন খ্রীষ্টানগণ অবুদ্ধ রহস্য বলিয়া এ সকল হইতে সঙ্কুচিত হইতে পারি না।' 'নিরতিশয় ভক্তিভাবাপন্ন খ্রীষ্টানগণের মধ্যে আমাদের পরিগণিত হওয়া সমুচিত, অন্যথা আমরা কেবল ভাণমাত্র।' (খ্রীষ্টানলাইফ, ১৯শে মে, ১৮৮৩ খৃঃ)। এই কথাগুলিতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অপ্রবুদ্ধ ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের নিকটে যাহা অবুদ্ধ রহস্য বলিয়া প্রতীত হয়, অধ্যাত্মভাবাপন্ন ব্যক্তির নিকটে উহা সেরূপ নয়; উহা একমাত্র শাশ্বত পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ, এবং উহা ব্যতীত ভাল ভাল ইউনিটেরিয়ানের জীবনও 'কেবল ভাণ মাত্র'। এটি যদি ইউনিটেরিয়ান্ সমাজের পরিপক্ক আধিকারিকোক্তি হয়, তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি যে, উচ্চতর পরমাত্মজ্ঞানপ্রকাশে এবং আত্মার উচ্ছ্বাস ও জীবনে, ব্রাহ্ম এবং ইউনিটেরিয়ান্‌গণের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন, তাঁহারা প্রীতি ও আনন্দযুক্ত সখ্যবন্ধনে মিলিত হইবেন। পিতা ঈশ্বরের নামে এবং স্বর্গীয় ভ্রাতা খ্রীষ্টের নামে আমরা এই উচ্চতর সখ্যবন্ধন প্রার্থনা করি এবং চাই। পবিত্রাত্মার যোগে সমুদায় দেশের বিশ্বাসী ভক্তগণমধ্যে এই সখ্যভাব এবং ভ্রাতৃসমুচিত প্রেম বিরাজ করুক। যে সকল বিষয় মৌলিক নয়, তৎসম্বন্ধে মতভেদ অনিবার্য্য। আমি সরল ভাবে বিশ্বাস করি, এই মতভেদ যথার্থ আধ্যাত্মিক মিলনের অন্তরায় হইবে না, এবং কোন একটি ব্যক্তিঘটিত বিষয় সমগ্র সমাজের উপরে কলঙ্কারোপের কারণে পরিণত হইবে না। আমাদিগের ইংলণ্ডস্থ ইউনিটেরিয়ান্ ভ্রাতৃবর্গ ভবিষ্যতে যদি আমাদের কোন মত বা অনুষ্ঠানের বিচার করা কর্ত্তব্য মনে করেন, তবে যেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সকল কাগজ পত্র এবং বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণগুলি পর্য্যবেক্ষণ না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন একটী নিষ্পত্তি

করিয়া না ফেলেন। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই এই সকল প্রমাণ আমি আহ্লাদের সহিত যোগাইব।

"বাধ্যতা ও ভ্রাতৃত্বে,
শ্রদ্ধেয় মহাশয়গণ,
আমি আপনাদের
গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রেরিতগণের
দরবারের সম্পাদক।"

স্বর্গে প্রবেশের পূর্ব্বে শুদ্ধিপ্রক্রিয়া

পাপ লইয়া কেহ স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন না, ইহা কেশবচন্দ্রের স্থিরতর মত। "তাহারা সকলেই স্বর্গে যাইতেছে—তাহারা এইরূপ বলে" এই প্রবন্ধে তাঁহার এই মতের সঙ্গে স্বর্গের বহির্ভাগে শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমিতে (Purgatory) অবস্থানের মত সংযুক্ত দেখিতে পাই:—"আমাদের সমাজের প্রত্যেক সভ্য মৃত্যুর পরেই তৎক্ষণাৎ স্বর্গে যাইবেন, এ বিষয়ে নিঃসংশয়। এতদপেক্ষা বিপৎকর মোহ আর কল্পনাও করা যাইতে পারে না। আমরা প্রতিজনই পুণ্যনিলয় স্বর্গে গমন করিতেছি, ইহা উপহাসের কথা। এরূপ অসঙ্গত অনুমানের যুক্তি কি? আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বরকে ভালবাসি, আমরা মানুষকে ভালবাসি এবং তাহাদের সেবা করি, আমরা আমাদের কর্ত্তব্যসাধনে যত্ন করি, আমরা উৎসাহী; সুতরাং যাই আমরা নশ্বর-দেহ ত্যাগ করি, অমনি একেবারে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করি, এই তাঁহাদের যুক্তি, এ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃষ্ট প্রাবেশিক-পত্র! স্বর্গে যাওয়ার অতি অদ্ভুত সহজ পথ! পৃথিবীতে আমরা যে সকল ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিয়াছি, ঈদৃশ সহস্র ব্যক্তি স্বর্গের বাহিরে প্রবেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, শোধন ও পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্য দিয়া তাঁহারা যাইতেছেন, এই দৃশ্যটি একবার দেখিতে না পাইলে, আর কিছুতেই এ সকল লোকের ভ্রম ঘুচিতে পারে না। পৃথিবীর ভাল লোকদের পারলৌকিক জীবনের প্রকৃত অবস্থা যদি তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কম্পিতকলেবর হইতেন এবং জ্ঞানলাভ করিতেন। যে কোন ব্যক্তি একটি সামান্য পাপ করিয়াছে, তাহাকে কি ভীষণ

সুনিশ্চিত শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, সে বিষয় কেমন অল্প লোকেই চিন্তা করে। যে কোন আত্মা কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা বা অসত্যপ্রিয়তা লইয়া যায়, তাহাকে স্বর্গের দ্বাররক্ষক বলেন, 'এখন নয়, এখন নয়; যত দিন না সম্মুখবর্ত্তী শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমিতে দণ্ডভোগ করিয়াছ, তোমার পাপ সম্যক্ ধৌত হইয়া গিয়াছে, তত দিন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সন্নিধানে তোমায় উপস্থিতকরা হইবে না।' যদি জীবনে একবার কেবল আমরা একটী মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি, একটি দাতব্যোচিত ব্যক্তিকে স্বার্থপরতাবশতঃ উপেক্ষা করিয়া থাকি, ক্রোধ বা বিদ্বেষের বিক্ষেপে পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে তৎপরিমাণে শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমির প্রতিবিধান আমাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে! যদি আমাদের সময়, সামর্থ্য, উপকরণ বৃথা নষ্ট করিয়া থাকি, সেগুলির হিসাব স্বর্গদ্বারের বাহিরে থাকিয়া আমাদিগকে দিতে হইবে। অনুদার, অহঙ্কৃত, স্বার্থপর, অক্ষমী কেমন করিয়া পাপ লইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিবে। কোন মানুষ যদি ছয়টি মিথ্যা লইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে ষাটটি মিথ্যা লইয়া এক জন মিথ্যাবাদী কেন স্বর্গে প্রবেশ করিবে না? অপবিত্র চিন্তা লইয়া যদি মানুষ স্বর্গে প্রবেশ করে, এক জন ব্যভিচারী কেন প্রবেশ করিবে না? যে দশবার ক্রোধ করিয়াছে, সে যদি প্রবেশ করে, তবে একজন; নরহন্তা কেন প্রবেশ করিবে না? আমাদের আচার্য্যেরা, প্রচারকেরা এবং সাধকেরা মনে করেন, তাঁহারা যাহা তাহা করিয়াও, তাঁহাদের ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার জন্য নিশ্চয় স্বর্গে যাইবেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বেশ ভাল, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের কথা স্মরণ করুন এবং শুদ্ধিপ্রক্রিয়াভূমির জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজও তাঁহাদের হৃদয়ে অহঙ্কার আছে, ক্রোধ আছে বা অপর কোন নীতিঘটিত কলঙ্ক আছে; সুতরাং তাঁহাদের পাপের পরিমাণানুসারে তাঁহারা অবশ্য দণ্ডভাজন হইবেন। যদি এখানে আমরা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হই, সোজা স্বর্গে যাইতে পাইব না।"

পূর্ণবিশ্বাসী মণ্ডলী

মণ্ডলীসম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস কি প্রকার পূর্ণ ছিল, এই প্রবন্ধটিতে সকলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবেন;—"আমরা পূর্ণবিশ্বাসী (orthodox) মণ্ডলীর সভ্য বলিয়া আমাদিগকে গণ্য করি, এবং ইহাতে আমরা গৌরব করি। লোকে স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্মের

সঙ্গে পূর্ণবিশ্বাসের যোগ, ইহার অর্থ কি? ব্রাহ্মেরা কি পূর্ণবিশ্বাসী হইতে পারেন? যাহারা শাস্ত্র নয়, প্রেস্তার, মহাজন বা পরিষৎ নয়, আপনাদের সহজজ্ঞানের অনুসরণ করে, তাহারা কি পূর্ণবিশ্বাসী হইতে পারে? হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান পূর্ণবিশ্বাসী হইতে পারেন, ব্রাহ্ম পূর্ণবিশ্বাসী, ইহা কখন হইতে পারে না। পৃথিবীতে লোকাতীত ধর্ম্মমত বলিয়া যেগুলি প্রসিদ্ধ, উহাদের মধ্যে যেমন পূর্ণবিশ্বাসিত্ব আছে, আমাদের নৈসর্গিক ধর্ম্মেও ঠিক উহা তেমনই আছে। কারণ পূর্ণবিশ্বাসিত্বের আর কোন অর্থ নাই, কেবল এই অর্থ যে, পূর্ণপরিমাণ বিশ্বাস। যে হিন্দু সমগ্র মত, সমগ্র শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তিনি পূর্ণবিশ্বাসী। পূর্ণবিশ্বাসী খ্রীষ্টান তিনি, যিনি বাইবল, ঈশা, মণ্ডলী, বিধান, ভবিষ্যদর্শিগণ, পিতৃগণ ইত্যাদি সমগ্র খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইরূপ ভারতস্থ পূর্ণবিশ্বাসী ব্রাহ্মও সার্ব্বভৌমিক মণ্ডলীর প্রত্যেক মত ও প্রত্যেক মহাজনের নিকটে বিশ্বাস ও সম্ভ্রম, হৃদয় ও আত্মা অর্পণ করেন। আমাদের শাস্ত্রের প্রত্যেক বাক্যকে অভ্রান্ত অবতীর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, এবং তৎপ্রতি সংশয় করিতে সাহস করি না। অন্যান্য পূর্ণবিশ্বাসী মণ্ডলী এবং আমাদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, তাঁহাদের শাস্ত্র লিখিত, আমাদের অবতীর্ণ সংবাদ অলিখিত। কিন্তু আত্মার দিক্ দিয়া দেখিলে, ইহাতে কোন পার্থক্য হয় না। কেন না পূর্ণবিশ্বাসী কোন হিন্দু বা খ্রীষ্টান যেমন, তেমনি আমরাও আমাদের মত, বিশ্বাস ও মণ্ডলীর নিকটে সম্পূর্ণ বদ্ধ। ঈশ্বরের দাস এবং প্রেরিত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক দৃশ্যমান ব্রাহ্মসমাজমণ্ডলী যে সময়ে সংস্থাপিত হইল, সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বিধাতার অধীনে যে প্রত্যেক ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে বিরোধের সমগ্র ইতিহাসও গণ্য, আমাদিগের নিকটে পরিত্রাণপ্রদ শুভসংবাদ। শোচনীয় তাহার অবস্থা, যে এই অলিখিত গ্রন্থের একটি বাক্য বা তদংশ অবিশ্বাস করে। এই তিপ্পান্ন বৎসর আমাদিগের সকলের সঙ্গে বিধাতা যে লীলা করিতেছেন, উহা আমাদিগের সমগ্র সম্মতি এবং সমগ্র হৃদয়ের বশ্যতা চায়। এ বিষয়ে স্বাভিলাষ বা স্বাধীনতা নাই। আমরা পূর্ণবিশ্বাসের নিকট কারারুদ্ধ, আমরা যথার্থমতের দাস, এবং যেখানে মণ্ডলীর মধ্য দিয়া ঈশ্বর কথা কহেন, সেখানে আমাদের কোন বিচার চলে না। আমরা কি স্বাধীন নই? হাঁ, তত দূর, যত দূর আমরা স্বাধীনভাবে

সত্যের শৃঙ্খল আপনি গ্রহণ ও চুম্বন করি, স্বাধীনভাবে প্রভু এবং তাঁহার মণ্ডলীর নিকটে আত্মবিক্রয় করি; স্বাধীনভাবে নববিধানের সত্য আমরা মনোনীত করিয়া লইয়াছি, এখন আমরা ইহার দাস, এখন সমগ্র বিধানের নিকটে প্রণত থাকা এবং প্রভুর প্রত্যেক বিধির অক্ষর ও প্রত্যেক দাসকে গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। আংশিক বিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িক অধ্যয়নশালার লোকেরা বলে, আমরা রাজা রামমোহন রায়ের, আমরা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, আমরা বঙ্গের, আমরা মান্দ্রাজের; ব্রাহ্মধর্ম্মে পূর্ণবিশ্বাসী মণ্ডলী বলে, আমরা ঈশ্বরের এবং আমরা সমুদায় শাস্ত্র গ্রহণ করি। এখন আমাদিগের মধ্যে বিংশতিজনের অধিক প্রেরিত এবং প্রচারক আছেন, প্রধান ও জ্যেষ্ঠ আছেন, ইহাদিগের প্রত্যেকের নিকটে আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং রাজভক্তি সমর্পণ করিতে আমরা আহূত। যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় পিতৃস্থানীয় রামমোহন রায় অথবা বিশ্বাসিমণ্ডলীর এই প্রেরিতসকলের এক জন সামান্য ব্যক্তিকেও অস্বীকার করে, সে আপনার সম্প্রদায় বা দলের নিকটে, যত মহৎ কেন হউক না, ভ্রষ্ট এবং পতিত। প্রবঞ্চকদিগের হইতে সাবধান হও। শত শত ব্যক্তি আছে, যাহারা এই উদারমণ্ডলীর বলিয়া মুখে বলে, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বিশেষ বিশেষ মত তুচ্ছ করে, বিশেষ বিশেষ ঘটনা অস্বীকার করে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ঘৃণা করে, বিশেষ বিশেষ প্রমাণ অস্বীকার করে, বিশেষ বিশেষ সাধনপ্রণালী ঘৃণা করে। এই সকল লোক মুখে যাহা বলুক, নববিধানের প্রতি রাজভক্ত নয়, তাহারা আমাদিগের পবিত্র পূর্ণবিশ্বাসী মণ্ডলীর নহে। পূর্ণবিশ্বাসিগণ অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হউন, এবং তাঁহাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা প্রতিবাদিগণের অভিমান, শুষ্কজ্ঞানজনিত অবিশ্বাস, ইন্দ্রিয়পরায়ণতাজনিত উচ্ছৃঙ্খলতা, সুবিধার নিমিত্ত সংসারের সহিত সন্ধিবন্ধন, দুর্ব্বলতাজনিত ভীরুতা এবং সংশয়ীর হৃদয়শূন্য বশ্যভাবকে লজ্জিত করুন।" কাহার পূর্ণবিশ্বাস আছে, কাহার পূর্ণবিশ্বাস নাই, এই প্রবন্ধটি তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়।

'যোগবিদ্যালয়'

হিমালয়শিখরে বাস কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে কোন কালে নিষ্ফল হইতে পারে না। তিনি দিন দিন গভীরতম যোগে নিমগ্ন হইতেছেন, আমেরিকার বন্ধুগণ

কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নবযোগ লিখিতে অগ্রসর। এ সময়ে যোগশিক্ষাসম্বন্ধে 'নববিধান পত্রিকায়' প্রবন্ধ বাহির হইবে, ইহা স্বাভাবিক। এই 'যোগবিদ্যালয়' প্রবন্ধের অনুবাদ আমরা নিম্নে দিলাম :—

"আচার্য্য। বৎস, তুমি কি সাধনারম্ভে প্রস্তুত ?

"শিষ্য। হাঁ, মহাশয়, আমি শান্ত হইয়াছি। যোগের বিষয়টি কঠিন, আমাকে আস্তে আস্তে অগ্রসর করিয়া লউন।

"আচার্য্য। এই আসনে উপবেশন কর এবং তোমার চক্ষু সম্যক্ মুদ্রিত কর।

"শিষ্য। করিলাম।

"আচার্য্য। সম্যক্ শান্ত হও। সকল প্রকার উদ্বেগ ও চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের উপর মন স্থির করিয়া রাখ।

"শিষ্য। আমার হৃদয়কে চিন্তাবিবর্জ্জিত করিবার সময় দিন।

"আচার্য্য। আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি না। আমি যাহা বলি, তুমি তাহারই অনুসরণ কর। মুহূর্ত্তে হৃদয় শান্ত কর, এবং তোমার ভিতরে কি হইতেছে, আমায় জানিতে দাও।

"শিষ্য। জানাচ্ছি।

"আচার্য্য। আচ্ছা, ভিতরে কি দেখিতেছ ?

"শিষ্য। অন্ধকার, তূষ্ণীম্ভাব, তার পর যেন একটি ভয়বিস্ময়োদ্দীপক সত্তা মহাগম্ভীর, অনন্তপ্রসার! —— থাম। আমি দেখিতেছি, আমার দর্জ্জী পাওনার বিল লইয়া উপস্থিত, আমার বাছা আমায় চুম্বন করিতেছে, ভাঙ্গা বারাণ্ডা এখনই মেরামত চাই, মুক্তিফৌজের পক্ষে টাউনহলের বৃহৎ সভা, উঃ, কি উৎসাহপূর্ণতা! ঐ ইলবার্ট বিলের বিরোধী সভা দেখ, কি বিপরীত! আমাদের বার্ষিক নগরকীর্ত্তন, মাথায় মাথায় সাগরসমান মাথা ——

"আচার্য্য। মূঢ়, আর নয়। এমন ঘোর অর্থশূন্য কথা বলিও না। যোগীর আসনের অসম্মান করিলে। ঈশ্বরের বিরোধে পাপ করিলে। আমার অবমান করিলে। চক্ষু খোল, বাহিরে যাও, বিক্ষেপকে তৃপ্ত কর, অনুতাপ করিয়া পুনরায় আইস।

"শিষ্য। মহাশয়, যাই, অনুতাপ করি, মনের গতি ফিরাই।

∴ ∴ ∴ ∴

"আচার্য্য। অনুতপ্ত হইয়াছ? পুনরায় আরম্ভ করিতে প্রস্তুত?

"শিষ্য। হাঁ, ঈশ্বর সহায় হউন।

"আচার্য্য। আপনার অহঙ্কৃত আত্মার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক, বিনীতভাবে প্রার্থীর ভাবে আরম্ভ কর। কেহ আপনার বলে যোগী হয় নাই। প্রার্থনায় আরম্ভ কর। ভিতরে প্রবেশকালে সংসারকে বাহিরে রাখিয়া যাও।

"শিষ্য। তাই হউক। মুদ্রিত চক্ষু, নির্জ্জিত চিত্ত লইয়া আমি শান্ত হইয়াছি, পাষাণমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল হইয়াছি।

"আচার্য্য। সতর্ক হও, কোন চিন্তা যেন সহজে প্রবেশ না করে। স্মরণে রাখিও, অভিনিবেশভঙ্গ পাপ।

"শিষ্য। মহাশয়, বলিতে থাকুন, আমি প্রস্তুত।

"আচার্য্য। বল, এখন কি দেখিয়াছ?

"শিষ্য। ঊর্দ্ধে, অধোতে চারি দিকে কেবলই অন্ধকার। আমি অন্ধকারে মগ্ন হইয়াছি, সংসার অন্ধকারে মগ্ন হইয়াছে, আমার সব চিন্তা, সব উদ্বেগ অন্ধকারে ডুবিয়াছে। অভেদ্য অন্ধকার বিনা আর কিছুই নাই। আর সকলই মৃত্যুগ্রস্ত।

"আচার্য্য। এখন যেখানে তুমি উপস্থিত, এটি নির্ব্বাণরাজ্য, শান্তি ও অন্ধকারের রাজ্য। এখানে বুদ্ধ সমাধিসুখলাভ করিয়াছিলেন। আরও অগ্রসর হও, আরও গভীরতর দেশে যাও। বল, তোমার উপলব্ধি কি? অভাবপক্ষের সাধন হইল, এখন ভাবপক্ষ আরম্ভ কর।

"শিষ্য। আমি আর এক রাজ্যে উপস্থিত। উষা, প্রত্যুষ, দেখিতেছি, একটী সত্তা সম্মুখীন হইতেছেন।

"আচার্য্য। কিরূপ সত্তা?

"শিষ্য। গম্ভীর, ভয়বিস্ময়োদ্দীপক, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বতোবিসারী, শান্ত, অচল।

"আচার্য্য। অগ্রসর হও।

"শিষ্য। আর এক সোপান, আর এক সোপান, আর এক সোপান। অনেক দূর অন্তঃপ্রবিষ্ট। এই সত্তা হইতে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর আলোক আসিতেছে, এতদ্দ্বারা অন্তর্জগৎ আলোকিত হইতেছে। সত্তা মধুরতর, প্রিয়তর! পিতা, মাতা, বন্ধু অতি নিকটে।

"আচার্য্য। তার পর।

"শিষ্য। দীপ্যমান গ্রহনিচয়।

"আচার্য্য। সত্য ও পুণ্য উজ্জ্বল কান্তি।

"শিষ্য। শোভন জলপ্রপাত, নদী, জীবনপ্রদ সলিল।

"আচার্য্য। উচ্ছ্বসিত প্রেম—নিত্যপ্রবৃত্ত প্রবাহ।

"শিষ্য। স্মিতশোভী উদ্যান, সুন্দর সুন্দর পুষ্প।

"আচার্য্য। অপরিমেয় আনন্দ।

"শিষ্য। বিহঙ্গসঙ্গীত—মনোহর তান।

"আচার্য্য। হৃদয়ানন্দকর প্রফুল্লকর ঋষিকণ্ঠধ্বনি।

"শিষ্য। আলোকনগরী, নব আনন্দলোক, চিরসুস্মিত ঈশ্বর। কেমন মধুর! আমি তাঁহার আলিঙ্গনমধ্যে ঝাঁপ দি। আমি আনন্দে আলোকে আত্মহারা হইলাম, মধুরতা মধ্যে মগ্ন হইলাম। মহিমা, মহিমা, ঈশ্বরের মহিমা!"

ঈশা ও কেশব

এক জন অকৃতকৃত্য, আর এক জন কৃতকৃত্য পাদ্রির আখ্যায়িকা কল্পনা করিয়া, কৃতকৃত্য পাদ্রির মুখে তিনি এই কথাগুলি দিয়াছেন, "এই মাংস খ্রীষ্টের মাংস, এই শোণিত খ্রীষ্টের শোণিত, অথচ তুমি বলিতেছ, তাঁহাকে (খ্রীষ্টকে) তুমি দেখ নাই?" কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে এই কথাগুলির নিয়োগ হয় কিনা, নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধের অনুবাদে (১৮০৫ শকের ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) সকলে পরিগ্রহ করিবেন :—

"খ্রীষ্ট এবং কেশবচন্দ্র সেন"—"প্রস্তাবের শিরোভাগ চমকিত হইবার! পাঠক, তবু স্খলিতপদ হইও না, কিন্তু পাঠ কর। ঈশা খৃষ্ট পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার আর কোন লক্ষ্য ছিল না। কেশবচন্দ্র সেনও, পৃথিবী পাপ ও ভ্রান্তি হইতে বিমুক্ত হয়, ধর্ম্মেতে পুনর্জীবিত হয়, এ জন্য উৎকণ্ঠিত। খৃষ্ট সামাজিক পূর্ণতার আদর্শ এবং উন্নতিশীল মনুষ্য-

জাতির শেষগতিস্বরূপ স্বর্গরাজ্য প্রচার করিয়াছিলেন। কেশবও বিনীত প্রার্থিভাবে ভারতে স্বর্গরাজ্যস্থাপনে যত্নবান্। খৃষ্ট সর্ব্বথা আত্মত্যাগ এবং বৈরাগ্য চাহিতেন, কেশবও চেষ্টা করিতেছেন যে, মনুষ্য সাংসারিকতা এবং ইন্দ্রিয়াধীনতা পরিহার করে এবং কল্যকার বিষয়ে কোন চিন্তা না করে। খৃষ্ট ক্ষমাধর্ম্মের উপরে অত্যন্ত ভর দিতেন, এবং প্রেমের অতি উচ্চতম মত শত্রুর প্রতি প্রেম প্রচার করিতেন। কেশবও নীতির সেই উচ্চতম মত তাঁহার দেশীয় লোকগণের নিকট প্রচার করেন। খৃষ্ট বলিয়াছেন, জলাভিষেকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতার তত্ত্ব এবং আহার্য্য আহারে আধ্যাত্মিক দেবজীবন আত্মস্থকরণের তত্ত্ব অবস্থিতি করিতেছে। কেশবও সেই প্রকার হিন্দুগণকে বলিতেছেন। ঈশ্বরকে প্রীতি কর এবং তোমার প্রতিবাসীর প্রতি প্রেম কর, এতদ্ভিন্ন খৃষ্টের আর কোন মত ছিল না। কেশবও আর কোন মত স্বীকার করেন না, এবং সর্ব্বদা সেই সহজ সুমিষ্ট শুভসংবাদ প্রচার করেন। খৃষ্ট সমুদয় সত্য প্রকাশ করিয়া যান নাই, কিন্তু পবিত্রাত্মা সমগ্র সত্যে মনুষ্য-গণকে লইয়া যাইবেন, এজন্য তাঁহারই হস্তে উহা রাখিয়া গিয়াছেন। কেশবও সেই পবিত্রাত্মাকে জীবন্ত গুরু বলিয়া মহিমান্বিত করেন, যিনি সমুদায় সত্য শিক্ষা দেন এবং খৃষ্টের শিক্ষা পূর্ণ করেন, এবং তিনি যাহা শিক্ষা দিতে অবশেষ রাখিয়াছেন, তাহা শিক্ষা দেন। খৃষ্টের মতে পাপের বন্ধন হইতে মুক্তি পরিত্রাণ নহে, কিন্তু দেবস্বভাবাংশ লাভ করা। ঈশ্বর ও মানবস্বভাবের চিরন্তন যোগ ভিন্ন আর কি উচ্চতম মুক্তি বলিয়া কেশব প্রচার করেন। খৃষ্ট বলিয়াছেন, 'স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ, সেইরূপ পূর্ণ হও', এতদপেক্ষা কোন নীচ লক্ষ্য তিনি মনুষ্যগণকে স্বীকার করিতে দিতেন না। কেশবের ধর্ম্মশাস্ত্রও পার্থিব শ্রেষ্ঠতার সমুদায় নীচতর আদর্শ অস্বীকার করে, এবং সর্ব্বপ্রকার পাপপুণ্যের সন্ধি বা অর্দ্ধসংস্করণের নিন্দা করে। অন্যান্য বিধানকে বিনষ্ট না করিয়া, তাহার পূর্ণতা সাধন করা, খৃষ্ট আপনার জীবনের লক্ষ্য ঘোষণা করিয়া-ছিলেন। সেইরূপ কেশবও ঈশ্বরের পূর্ব্ববিধান সকলের শত্রু বা বিনাশক নহেন, কিন্তু মিত্র, যিনি সেই সকলকে পূর্ণ করিতে এবং যুক্তিসঙ্গত চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতে যত্নপর। খৃষ্ট অমিতাচারী পুত্রের আখ্যায়িকা দ্বারা অতি নীচতম পাপীর নিকটেও বিশ্বাস, আশা এবং স্বর্গ প্রচার করিয়াছেন।

কেশবেরও এই আখ্যায়িকা অপেক্ষা অন্য কোন সুসংবাদ প্রচার করিবার নাই, যে সুসংবাদ সমুদায় শ্রুতির সার। গ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র এবং পুণ্যময় পিতার সঙ্গে সমুদায় পাপী মনুষ্যমণ্ডলীর নিত্য সার্ব্বভৌমিক একত্বসাধন বলিয়াছেন। কেশবও খৃষ্টের পুত্রত্ব এবং তাঁহাতে একত্বসাধন সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন এবং এ সত্যের সাক্ষ্যদান করেন। গ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি পথ। হে ঈশা, তুমি তাই, কেশব বলেন। খৃষ্ট বলেন, আমি জীবনের আহার্য্য, এবং শিষ্যগণ আমাকে আহার করিবে যে, আমি তাহাদিগের মাংসের মাংস, রক্তের রক্ত হইতে পারি। প্রভু ঈশাভক্ত শিষ্য কেশব খৃষ্ট ঈশাতে বাস করেন, তাঁহার বলে বৰ্দ্ধিত হন, তাঁহার আনন্দে আনন্দিত হন, এবং সত্যই বিশ্বাসযোগে কেশবের মাংস খৃষ্টের মাংস, কেশবের রক্ত খৃষ্টের রক্ত। খৃষ্ট সত্যই বলিয়াছেন, যেখানে আমার শিষ্য এবং দাসগণ, সর্ব্বদা আমি সেইখানেই এবং যেখানে আমি, সেখানে তাহারা থাকিবে। এজন্যই যেখানে ঈশাদাস কেশব, সেখানেই কৃতকৃত্য (ধন্য) ঈশা এবং যেখানে ঈশা, সেখানেই তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশাদাস চিরকাল থাকিবেন। ঈশা অধম পাপীকে ভালবাসেন, তৎপ্রতি করুণার্দ্র। তাহাকে পুনর্জীবিত করেন, এবং তাহাতে বাস করেন, এবং সে তাঁহাতে বাস করে এবং তাঁহারা উভয়ে একত্র পিতাতে বাস করেন। এজন্যই ঈশাদাসে ঈশা, এবং ঈশাতে ঈশাদাস গূঢ়-যোগে ,পারম্পরিক যোগে অবস্থিত; এবং সৎপ্রভু এবং নীচ দাস উভয়ে পিতাতে এক। সুখী সুখী সুখী আমি, দাস সেন বলেন, এবং ত্রিগুণ সুখী আমার প্রভু ঈশাতে।"

নববিধি

নবসংহিতাপ্রণয়ন এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অধ্যায় 'নববিধান পত্রিকায়' মুদ্রিত হইয়াছে। উহার সঙ্গে সঙ্গে 'নববিধিসম্বন্ধে' এই প্রবন্ধটি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়:—"সমাজগঠন প্রয়োজন, সময়ের চিহ্ন ইহা পরিষ্কার দেখাইয়া দিতেছে। সখ্য ও একতাবন্ধনের জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে ডাকিতেছেন। আমাদের প্রভু, আমাদের গুরু যখন আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তখন কে উদাসীন হইতে পারে, কে তুচ্ছ করিতে পারে? প্রভু বলিতেছেন, বিচ্ছিন্ন ইজ্‌রায়েল বংশধরগণকে একত্র করিতে হইবে। অদান্ত অশাসিত

সৈনিকগণকে দান্ত ও শাসিত করিয়া লইতে হইবে এবং বিশ্বাসিগণের সৈনিক-দল এখনই সঙ্গঠন করিতে হইবে। অনুরাগ ও জ্ঞাতিত্বের পারিবারিক বন্ধনে সকলকে সম্মিলিত করিতে হইবে, এবং ভারতবর্ষে ঈশ্বরের সন্তানগণের গৃহনির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রভু পরমেশ্বরের লোক সকল আর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অপরিচিত অবস্থায় বাহ্যশক্তির অধীনে বাস করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের আধিপত্যাধীনে নববিধানের পবিত্র নগরীতে একত্র বাস করিবে। উচ্ছৃঙ্খল নরনারীগণ নিয়মের রাজ্যাধীনে শান্তিতে এবং একতায় স্থিতি করিবে। আমরা আমাদের প্রভুর এই আজ্ঞা বুঝিতেছি, আমরা অতি সত্বর রাজানুরক্তিসমুচিত বশ্যতা স্বীকার করিব। নবসংহিতা শীঘ্রই প্রস্তুত হইবে, আমাদের লোকদিগের মধ্যে উহার ঘোষণার জন্য দিন স্থির হওয়া সমুচিত; সেই দিন হইতে অরাজকতা, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি ও অনিয়তাচারের দিন শেষ হইবে, বিধি, সাধন ও মিলনের প্রবেশ হইবে। রাজধানী এবং প্রদেশস্থ সকল মণ্ডলীতে এবং যে সকল ব্যক্তি স্বর্গীয় বিধানের প্রতি অনুরক্ত শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া আপনারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের আত্মপরিচালনা এবং সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপার-সমুদায়ের নিয়মনজন্য, সেই দিনে বিধি গ্রহণ ও স্বীকার করা তাঁহাদের সমুচিত। সংহিতা যেন একটি অর্থশূন্য নূতন আরাধ্যসামগ্রী না হয়। ইহা অভ্রান্ত শুভ-সমাচার নয়, ইহা আমাদের পবিত্র বেদ নয়। ইটি কেবল ভারতবর্ষের নবীন-মণ্ডলীর আর্য্যগণের প্রতি জাতীয় বিধি; সামাজিকজীবনে নবধর্ম্মের ভাব নিয়োগ করিলে যাহা হয়, তাহাই ইহাতে নিবদ্ধ আছে। ইহাতে সংস্কৃত হিন্দুগণের বিশেষ অভাব ও গঠনোপযোগী জাতীয় সহজভাব ও বৃদ্ধব্যবহারমূলক ঈশ্বরের নৈতিক বিধির সার আছে। ভারতবর্ষের নবীনমণ্ডলীর প্রতি, অক্ষরে অক্ষরে নয়, মূলতঃ ইহা ঈশ্বরের নিদেশ। সুতরাং আমাদের পরিচালনার জন্য আমরা ইহার অক্ষরের নিকটে প্রণত হইব না, ইহার ভাব ও সার গ্রহণ করিব। ভারতবর্ষের কয়জন আমাদের পবিত্র মণ্ডলীর আহ্বানের অনুগত হইতে প্রস্তুত? নূতন বিধির ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন করিতে কয়টি পরিবার প্রস্তুত? ভারতের সকল ভাগ হইতে শত শত ব্যক্তি আসুন এবং কেবল মতবিশ্বাসে নয়, কিন্তু এক বিধির আনুগত্যমূলক দৈনিক জীবনে মিলিত হউন। এক ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক বিধি, এক অভিষেক, এক গৃহ পরাক্রান্ত ভ্রাতৃত্বনিবন্ধনে

আমাদিগকে নিবদ্ধ করিবে, কোন শত্রু প্রবল হইবে না, সর্ব্ববিধ অকল্যাণের প্রভাব অন্তে পরাভূত হইবে। শুভ সময় আসিবে, সকল ভাই প্রস্তুত হউন।" এই ঘোষণার মধ্যে কেমন আশ্চর্য্যরূপে নিত্য জীবন্ত জাগ্রৎ দেবনিঃশ্বসিতকে মহোচ্চ স্থান অর্পণ করা হইয়াছে; অথচ সেই দেবনিঃশ্বাসসম্ভূত সংহিতাকে তাহার প্রকৃত স্থান হইতে বিচ্যুত করা হয় নাই। কাল-দেশ-পাত্রানুসারে সংহিতার নব নব নিয়োগে উহার মৌলিক ভাবের ক্ষতি হয় না, ইহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে সংহিতা যে কদাচ 'অর্থশূন্য আরাধ্য সামগ্রী' হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

পত্র

শিমলা হইতে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার যেগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, আমরা সেগুলি নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

"তারাবিউ
শিমলা (ভারতবর্ষ)
২২শে জুন, ১৮৮৩ খৃঃ

"শ্রদ্ধেয় ডসন বরণ ডি ডি সমীপে—

"শ্রদ্ধেয় প্রিয় মহাশয়,—আপনি আমায় যে স্নেহপূর্ণ আনন্দপ্রদ সত্য সত্য স্বাগতসম্ভাষণপত্র লিখিয়াছিলেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই। ত্রয়োদশবর্ষ-পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মদ্যপাননিবারণী সভার বন্ধুগণ ও আপনার সঙ্গে আনন্দে দিন কাটাইয়াছি, আপনি সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ হইতে সময়ে সময়ে শুভাকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করিয়া, মদ্যপাননিবারণঘটিত সেই সম্বন্ধ জাগাইয়া রাখিব, আপনি ইহা চাহিয়াছেন। হাঁ, এখন আমার লিখিবার সময় উপস্থিত, এবং অতি আনন্দপূর্ণহৃদয়ে আমি লিখিতেছি, কারণ আপনারা সম্প্রতি অতি মহত্তর জয়লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি নিবিষ্টমনা, তাঁহারা সে জন্য সার উইল্‌ফ্রিড লসন্ এবং যুক্তরাজ্যের সম্মিলনী সভার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবেন। পরিশেষে ইংলণ্ডের ভীষণ রক্ষণশীলতা আপনারা পরাজিত করিয়াছেন, এবং ইটি কিছু সামান্য লাভ নয়। বদ্ধমূল স্বার্থ, লাভালাভ, প্রবলতর সাধারণের মত, পদস্থ লোক, সভ্যতাসংশ্লিষ্ট পাপ, এ সকলের প্রতিকূলে আপনারা ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছেন। আপনারা

কেমন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন, ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা, আপনারা যাহা করিয়া তুলিলেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে সম্ভ্রম দিবেন এবং সুরাপাননিবারণের সৈনিকগণের জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন। অনেকবর্ষব্যাপী ভীষণ প্রতিরোধের সম্মুখীন থাকিয়া, আপনারা গৌরবকর জয়লাভ করিলেন, ইহা কেবল তাঁহারই শক্তিতে। এখন আমরা সকলে মিলিত হইয়া, তাঁহার করুণাবিধানের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দি। বন্ধু, ভ্রাতঃ, এ জয়ের ফল যেন আপনারা একা ভোগ না করেন, আমাদিগকেও উহার সমভাগী করুন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অবিচারসম্ভূত নিষ্ঠুর মদ্য-সম্পর্কীয় আইনের দ্বারা, আমাদিগের লোকদিগকে হীন ও নীতিভ্রষ্ট করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, তাহার শোধন ও প্রায়শ্চিত্তের কি কাল উপস্থিত নয়? যখন তিনি রোগ দিয়াছেন, তখন তাহার ঔষধ দিন। (সুরা-বিপণিস্থাপনে) 'স্থানীয় অভিরুচির' (Local Option) (অনুবর্ত্তনরূপ) আশিষ অর্পণ করিবার নিমিত্ত, দুঃখভারগ্রস্ত ভারতের ঈশ্বর গবর্ণমেণ্টের হৃদয়কে উন্মুখীন করুন।

"আমাদের ভাল বন্ধু মেস্তর বার্কারকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিন।

মদ্যপাননিবারণের পক্ষে আপনাদের চির অনুরক্ত
কেশবচন্দ্র সেন।"

রোগ-বৃদ্ধির সংবাদ শুনিয়া, ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ কলিকাতায় আসিতে কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, সে পত্রের উত্তর এই :—

"হিমালয়
১৯শে জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ

"শুভাশীর্ব্বাদ

"'ঘরে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।' সে এক ভাব, আর এ এক ভাব। কলিকাতায় কি আকর্ষণ আছে? দেখা যাউক, আছে কি না। যদি না থাকে, সর্ব্বনাশ। মনে হইল, যেন আমার দল বিষ্ঠা ভিক্ষা করিতেছে। ছি ছি ছি ছি! বলে, কাপড় দাও, টাকা দাও, উচ্চপদ দাও, বাহবা দাও, বাহাদুর উপাধি দাও। অর্থাৎ বিষ্ঠা দাও! আমি দিতে পারিব না, দিব না।

এই জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে বল। কোটী টাকার সোণার স্বর্গ দিয়াছি। এখন ময়লা দিব! কি লজ্জার কথা।

সেবক শ্রীকে"

ভাই গৌরগোবিন্দ রায়কে তিনি এই পত্র লিখিয়াছেন ;—

"হিমালয়
২৬শে জুলাই, ১৮৮৩ খৃঃ

"শুভাশীর্ব্বাদ,

"কে ১১ই মাঘের মধ্যে শুদ্ধাচার হইতে পারেন? রাগ লোভ হিংসা অপ্রেম দমন করিয়া কে উৎসবের পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী হইতে পারেন? এবার এই পরীক্ষা দিতে হইবে। দেখা যাউক, কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন! মিথ্যা আড়ম্বরে কি প্রয়োজন? ভক্তি প্রেমের ধুমধাম বাহিরে দেখাইলে কি হইবে? যে ক্ষমা না করে, যে রাগ করে, সে কি আমার লোক? যে দলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, সে দলকে কি আমার দল বলিয়া স্বীকার করি? খাঁটি লোক চাই, খাঁটি লোক দাও। আর আমার প্রতি শত্রুতা করিও না। আমার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দাও, পুণ্য দৃষ্টান্তের জল ঢালিয়া। এই উপকার চাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী কে"

ভাই উমানাথ গুপ্তের পত্রের তিনি এই উত্তর দেন ;—

"হিমালয়
২রা আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃঃ

"শুভাশীর্ব্বাদ,

"আমার সঙ্গে যোগ আছে কি না, ইহা আমার বলা ঠিক নহে। এ কথাটী তো আমার উত্তরসাপেক্ষ নহে। লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। আমার যোগ বৈরাগ্য চরিত্র যেখানে, সেইখানে আমি। আমার সহিত গূঢ় যোগ সেইখানে। এ সকল না থাকিলে ভালবাসা হইতে পারে, মায়া হইতে পারে; কিন্তু যোগ ও বিশ্বাস সম্ভব নহে। আমার দলের সমস্ত লোক এবং প্রত্যেক লোকের আমি যেমন দেবত্বের অংশ ও ব্রহ্মাবতরণ দর্শন করি, সেইরূপ দর্শন করিতে

হইবে। দল ছাড়া আমি এক জন আছি, ইহা ভ্রান্তি; সুতরাং দল ছাড়িয়া আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা কিরূপে সম্ভব হইবে? দল ও আমি এক জন, সমুদায় লইয়া নববিধান। একটি লোকের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা আমাকে অস্বীকার; প্রত্যেকের পদধূলি ভক্ষণ ও প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরিতত্বকে দর্শন, ইহা ভিন্ন আমাকে পাইবার উপায় দেখিতেছি না। রিপুগুলি ছাড়িয়া, পরস্পরের হইয়া, আমাকে লইতে হইবে। কে প্রস্তুত? দল ছাড়া দলপতির নিকটে আসিবার পথ নাই। অন্য পথ চোরের পথ। আমরা এক জন, আমি এই বিশ্বাস করি।

চিরসেবক

শ্রীকে"

যোগ—অধিভূত, অধ্যাত্ম

আমেরিকার 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার সম্পাদক, তাঁহার পত্রিকায় যোগ-সম্বন্ধে কিছু লিখিতে কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। এখনও তিনি সংহিতা-লেখা সমাধা করেন নাই। হিমালয় তাঁহাকে যে যোগশিক্ষা দিয়াছে, সে যোগ জগতের নিকটে প্রকাশ করিতে তিনি প্রোৎসাহিত ছিলেন; সুতরাং এই সুযোগ তিনি কেন হারাইবেন? অজ্ঞেয়বাদনিপীড়িত ইউরোপ এবং আমেরিকাকে যোগে অধিকারী করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল, সুতরাং তাঁহাদের উপযোগী করিয়া তিনি এই গ্রন্থপ্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার মন আধিভৌতিক যোগের অনুকূল, সুতরাং এ যোগগ্রন্থের অধিকাংশ অধিভূতযোগে নিয়োজিত হইয়াছে। এক ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ তিনি ত্রিবিধ যোগের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। বাহ্যজগতে শক্তিরূপে প্রকাশমান ঈশ্বর অধিভূত বা বৈদিক যোগের বিষয়। আত্মাতে পরাত্মদর্শন অধ্যাত্ম বা বৈদান্তিক যোগ। ইতিহাসে বা বিধানে ভগবদ্দর্শন ও তল্লীলানুভব পৌরাণিক বা ভক্তি-যোগ। খ্রীষ্টধর্ম্মে পিতা, তৎপর পুত্র, তৎপর পবিত্রাত্মা। হিন্দু আর্য্যগণেতে এই ক্রমের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্রে পিতা, তৎপর পবিত্রাত্মা, তৎপর পুত্র *। এই

* যিনি পবিত্রাত্মজাত, তিনি পুত্র। পুত্র অপরেতে পবিত্রাত্মা সংক্রামিত করিলে, তবে তাঁহারা পবিত্রাত্মাকে লাভ করিবেন, যিহুদী জাতির এই বিশ্বাস। ভারতবর্ষীয়গণ যোগপরায়ণ,

ব্যতিক্রমে মূলতঃ কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। যোগ দুই বস্তুর একত্র মিলন। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, সেই ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া একত্বলাভ আর্য্যানুষ্ঠিত যোগের মূল। বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ অন্তরে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহারা বাহিরে মহত্তম পদার্থে শক্তির প্রভাব ও আবির্ভাব দর্শন করিয়া, তাঁহার নিকটে প্রণতমস্তক হইয়াছেন। এখনও তাঁহারা চিন্তাশীল হয়েন নাই। শক্তি এক, কি বহু, এ সকল বিচার তাঁহাদের মনে উঠে নাই। সুতরাং যে কোন মহত্তম বস্তুতে শক্তির প্রভাব ও আবির্ভাব তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহাকেই পরম পুরুষজ্ঞানে বন্দনা করিতেন। বস্তু ও শক্তি এ পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিবার বিচারশক্তি তাঁহাদিগেতে উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে অদ্বৈতবাদী বা বহুদেববাদী বলিয়া নির্দ্ধারণ করা ভ্রান্তি। যে শক্তি তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেন, সে শক্তি তাঁহাদিগের নিকটে অন্ধশক্তি ছিল না। জ্ঞান-প্রেম-সৌন্দর্য্যপূর্ণ শক্তি ছিল। এ শক্তি নিরন্তর তাঁহাদিগকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেন, পিতা, মাতা, বন্ধু হইয়া তাঁহাদিগের প্রার্থিতব্য বিষয় দিতেন। এ কালের বিজ্ঞানবিদ্গণ শক্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বৈদিক ঋষিগণের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া যদি তাঁহারা ঐশী শক্তির ক্রিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারাও চন্দ্রে সূর্য্যে পুষ্পে বৃক্ষালতাতে সমুদ্রে আকাশে সর্ব্বত্র সেই শক্তির নিয়মনী শক্তি দর্শন করিয়া মোহিত এবং স্তম্ভিত হন। সমুদায় প্রকৃতি, সমুদায় জগৎ সেই মহাশক্তিতে জীবন্ত ক্রিয়াশীল, সুতরাং তন্মধ্যে সর্ব্বকারণকে অব্যবহিতভাবে দেখা সহজ। অধ্যাত্মযোগই প্রকৃতযোগ, এখানে আত্মার মধ্যে পরমাত্মদর্শন। বাহিরের কোলাহলাপেক্ষা অন্তরের কোলাহল নিবৃত্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন। একটি করিয়া রিপুর উচ্ছেদ করিলে এখানে কৃতকৃত্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সকল রিপুর মূল আমি, সেই আমির মূলোচ্ছেদ না করিলে এ যোগ সিদ্ধ হয় না। আমি চলিয়া গেলে, আমি যে কিছুই নয়, জ্ঞান প্রেম পুণ্য সকলই ঈশ্বরের, ইহা যোগী হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জ্ঞানচক্ষে পরমাত্মার জ্ঞান, প্রেমচক্ষে প্রেম, বিবেকচক্ষে পুণ্য দর্শন করিয়া,

---

তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করিতেন। স্বর্গ হইতে কেহ আসিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে পরমাত্মার যোগসাধন করিয়া দিবেন, এজন্যই পৌরাণিক সময়েও এ ভাব এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাঁহার সঙ্গে একত্বানুভব করেন। যোগী তখন অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য দ্বারা অভিভূত হইয়া, নিত্য তাঁহাতেই স্থিতি করেন।

এই নবযোগের প্রথমপ্রবন্ধসম্বন্ধে, 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ নেতা কেশবচন্দ্র সেন 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, বিশেষতঃ ঈশ্বরের সহিত যোগবিষয়ক যে প্রবন্ধগুলি লিখিতেছেন, তাহার প্রথমটি এ সপ্তাহে আমরা পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি ; আমরা জানি, এই প্রবন্ধ সোৎসুকচিত্তে পঠিত হইবে। কেশবচন্দ্র —হয়তো নিজে তত জানেন না—খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল উৎস হইতে প্রভূত রসপান করিয়াছেন, এই প্রবন্ধপাঠে যদি পাঠকগণ এটী হৃদয়ঙ্গম না করেন, তাহা হইলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব। এই স্বদেশজ হিন্দু ইংরাজী ভাষা প্রকৃষ্টসৌন্দর্য্য-সংমিশ্রণে ব্যবহার করেন, পাঠকগণের মন কেবল সেই দিকে আমরা আকর্ষণ করিতেছি না, কিন্তু তাঁহার চিন্তামধ্যে যে সুখকর হৃদয়োচ্ছ্বাসবর্দ্ধক মাধুর্য্য ও আধ্যাত্মিকতা আছে, সেই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। আমরা যাহাকে বিধর্ম্ম বলি, এ যে তা নয়, এ যে শুভসংবাদ-নিঃসৃত-আধ্যাত্মিক-আলোকসংমিশ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মের নীতি ও অপরোক্ষব্রহ্মবাদ, ইহা সকলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ করিবেন। 'যোগ—ঈশ্বরের সহিত একত্বানুভব' এ সম্বন্ধে যিনি প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাঁহাকে যাঁহারা নূতন কুসংস্কারের স্রষ্টা অথবা শিষ্যগণের আরাধ্য হইবার জন্য আপনাকে নূতন বুদ্ধ বা নূতন ঈশ্বর করিয়া তুলিবার চেষ্টাবান্ বলিয়া লোকের নিকটে উপস্থিত করেন, তাঁহারা তাঁহাকে ঠিক বোঝেন না, ইহা আমাদিগকে এখানে বলিতে হইতেছে।"

শিমলায় অবস্থিতির সংক্ষেপ বৃত্তান্ত

(ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র লিখিত)

শিমলায় যাইয়া রোগবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গেল। প্রথমতঃ জ্বর, তাহার পর উদরে দারুণ বেদনা আরম্ভ হইল। বেদনা সব সময় থাকিত না, কিন্তু যখন ধরিত, তখন একেবারে অস্থির করিয়া ফেলিত। অত্যন্ত টিপিলেও সে যাতনা নিবারণ হইত না। কি যে সে যন্ত্রণা, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্মিত হইয়া কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। ডাক্তারগণ দেখিয়া, এ যে কিসের জন্য বেদনা, কিছুই স্থির করিতে

পারেন না ! ইংরাজ ডাক্তার দেখিলেন, ঔষধপথ্যের নানা প্রকার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু বেদনার বিশেষ প্রতিকার আর কিছুই হইল না, বরং ক্রমে ক্রমে রোগবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এ অবস্থাতেও তিনি প্রতিদিন প্রাতে নিয়মিতরূপে পারিবারিক উপাসনা করিতেন। তারাবিউ নামক একটি সুন্দর বাড়িতে বাস। এই বাড়িটী শিমলা সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে, ছোট শিমলায় কুসুমটী নামক পল্লিতে স্থিত। সহরের গোলমাল এখানে কিছুই নাই, অতিশয় নির্জ্জন প্রদেশ। সহর হইতে অনেকটা দূর বলিয়া বন্ধুবান্ধবগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে পারিতেন না। লাহোরনিবাসী লালা কাশীরাম ও লালা রলারাম এই বাড়ির নিকটে একটী ছোট বাড়িতে বাস করিতেন; তাঁহারা উভয়েই প্রতিদিন সপরিবারে সন্ধ্যার সময় আচার্য্য মহাশয়ের নিকট আসিয়া সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। রবিবার ভিন্ন প্রতিদিনের প্রাতের উপাসনায় তাঁহারা প্রায় আসিতে পারিতেন না। প্রতিদিনের সরল উপাসনায় আমাদের সকলকারই মন মোহিত হইয়া যাইত। এত রোগের দারুণ যন্ত্রণাতেও উপাসনার নূতনত্ব ও সরল ভাব একটুও খর্ব্ব হইত না। এইরূপ কিছুদিন গত হইল। শারীরিক পরিশ্রম করার পরামর্শ ডাক্তারগণ ব্যবস্থা করায়, প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর ছুতার মিস্ত্রীর কার্য্য আরম্ভ করিলেন। যখন যে কার্য্য ধরিতেন, তাহার ভিতর একটি আশ্চর্য্য প্রভাব দেখা যাইত। অল্পদিন মধ্যে ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর টেবিল আলমারি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা তাঁহার সব কাঠের গড়ন দেখে বিস্ময়াপন্ন হইতাম। প্রাতে উঠিয়াই গৃহের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় বসিয়া প্রথমতঃ 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং' এই শ্রুতিটী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া, খানিকটা নিস্তব্ধে ধ্যান করিতেন, পরে চা পান করিয়া নবসংহিতা লিখিতেন। এই নবসংহিতাই তাঁহার শেষ গ্রন্থ। প্রতিদিন যাহা লিখিতেন, তাহা পর সপ্তাহের New Dispensation পত্রিকায় ছাপার জন্য পাঠান হইত। রোজ প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত এইরূপ সংহিতা লিখিয়া, ৯॥ টার সময় স্নান করিয়া উপাসনায় বসিতেন। যত দিন শরীরে বল ছিল, তত দিন স্বহস্তে রন্ধন করিতেন, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে নিজে আর রন্ধন করিতে পারেন নাই, তাঁহার সহধর্ম্মিণীই তাঁহার জন্য রন্ধন করিয়া দিতেন। ক্রমেই পীড়াবৃদ্ধি হইয়া সেই বেদনাটী বড়ই

প্রবল হইয়া উঠিল। এখন আর সেই যন্ত্রণার উপশমের কোন প্রকার উপায় নাই দেখিয়া, নিজে যোগ আরম্ভ করিলেন। লালা রলারাম একজন বলিষ্ঠকায় পঞ্জাবী যুবা, ভাই বলদেব নারায়ণের শরীরেও যথেষ্ট শক্তি ছিল; আচার্য্য মহাশয়ের যখন বেদনা আরম্ভ হইত, তখন ইঁহাদের ন্যায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ খুব সজোরে টিপিয়াও কোন প্রকারে যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিতেন না। তিনি এই অবস্থাতেই মা মা শব্দ করিতে করিতে যোগে ডুবিয়া যাইতেন, অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিতেন। ডাক্তারগণ এবং নিকটস্থ বন্ধুগণ, এইরূপ যোগ করিলে তিনি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, এই আশঙ্কা করিয়া, যোগের মাত্রা কমাইবার পরামর্শ দেন; কিন্তু তিনি বলিতেন, আমি যে এরূপ যোগেতে নিমগ্ন না হইলে, রোগের দারুণ যাতনা হইতে কিছুতেই অব্যাহতি পাই না। যোগের সময় তাঁহার যে আন্তরিক একটা সুখানুভব হইত, তাহা তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই বিলক্ষণ বোঝা যাইত। যত দিন শরীরে বল ছিল, তত দিন অপরাহ্নে কুসুমটীর নির্জ্জন প্রদেশের রাস্তায় খানিকক্ষণ পদব্রজে বেড়াইতেন এবং মধ্যে মধ্যে গাছতলায় বিশ্রাম করিতেন। তারাবিউ বাটীর নিকটে কুচবিহারের মহারাজের বাটী, প্রাতের উপাসনায় মহারাণী প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন; কোন কোন দিন মধ্যাহ্নে রাজকুমার রাজরাজেন্দ্রকে লইয়া তাঁহার চাকর বেড়াইতে আসিত, আচার্য্য মহাশয় দৌহিত্রকে লইয়া অনেক আদর যত্ন করিতেন, তাঁহার নিজের হস্তের গঠিত কাষ্ঠের খেলনা তাঁহাকে দেখাইতেন। শারীরিক রোগ তাঁহার মনের প্রসন্নতা বিনষ্ট করিতে পারে নাই। প্রতিদিনের সন্ধ্যার আলোচনায় খুব গভীর তত্ত্ব সকল আলোচিত হইত। পঞ্জাবী বন্ধুরা এবং তাঁহাদের পরিবারেরা তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন, তিনি খুব উৎসাহ ও আহ্লাদের সহিত তাহার উত্তর দিতেন। ভ্রাতা কাশীরাম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, বিদ্বানেরা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না, পল্লীগ্রামে গিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিলে, তাহারা সহজে উহা গ্রহণ করিবে। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার এ ধর্ম্ম জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হইবে। বিশ্বাস কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা পাইলে এই কেলু বৃক্ষ হইতে যদি কেহ ঝাঁপ দিয়া পড়িতে পারে, তবে তাহাকে বলি

বিশ্বাস। বলদেব তাঁহার সঙ্গে শিশুর মত সর্ব্বদা কথা কহিতেন। ইনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আপনি আমার পিতা, আমি আপনার সন্তান।' তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমরা পরস্পর ভাই, আমাদের মধ্যে পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ হইতে পারে না। আমি যে তোমাদের কাছে শিখি।' বলদেব বলিলেন, 'আমার এমন কি আছে, যা আপনি শিখেন।' তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার যাহা আছে, তাহা আমার নাই, আমি তাই শিখি।' বড় শিমলায় আমাদের চন্দননগরবাসী ভ্রাতা যদুনাথ ঘোষ থাকিতেন। প্রায় প্রতিরবিবার তিনি নিজে, মধ্যে মধ্যে পরিবারসহ তারাবিউ আসিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন এবং সমস্ত দিন তথায় থাকিয়া নব নব প্রসঙ্গ করিতেন। শিমলায় একটি ব্রহ্মমন্দির হয়, আচার্য্য মহাশয় এমন ইচ্ছাপ্রকাশ করায়, সেই সময় হইতেই উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান হইতে থাকে। এখন যে সুন্দর ব্রহ্মমন্দির হইয়াছে, ইহা সেই সময়কার আচার্য্য দেবের ইচ্ছার ফল। শীতপ্রধান দেশে বাস করিয়া, কলিকাতায় অবস্থানকালে বহুমূত্র রোগের যে দারুণ একটি শরীরের উত্তাপ এবং পিপাসা প্রবল ছিল, তাহার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল বটে, কিন্তু ক্রমে বেদনার বৃদ্ধি এবং আহারাদিতেও অরুচি হওয়ায় শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতা হইতে সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার বাবু মাধবচন্দ্র রায় কোন কার্য্য উপলক্ষে শিমলায় আগমন করেন। তিনি আচার্য্য মহাশয়ের আত্মীয় এবং বাল্যবন্ধু বলিয়া তারাবিউতেই অবস্থান করেন। মাধব বাবু থাকিতে থাকিতেই শিমলায় ভাদ্রোৎসব হয়। তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় সন্তানসন্ততির প্রতি চির দিন ভালবাসাতে পূর্ণ ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা নিম্নে পত্রখানি এখানে দিলাম।

"পরম কল্যাণীয়—

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্র ভূপ বাহাদুর—

"শুভাশীর্ব্বাদ,

"আগামী কল্য ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে তুমি আমার ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া, আমাদিগকে আনন্দিত করিবে। বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্ন খাইয়া এবং সকলের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিয়া গৃহ মাতাইবে। তুমি—

"সুনীতিনন্দন হৃদয়রঞ্জন।
নৃপেন্দ্রনন্দন নয়নঅঞ্জন॥
প্রসন্নবদন মধুরগঠন।
প্রাণের ভূষণ মোহনদর্শন॥

"এখানে আসিয়া 'পাপা চিয়া, চপ', কুস্তি, চুম্বন, যত মজার ব্যাপার জান, সমুদায় থলি ঝাড়িয়া, বিদ্যা বুদ্ধি বাহির করিয়া, সকলকে সুখী করিবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, কিছু মনে করিবে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে এবং Kiss Hand শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
মাতামহ"

শিমলায় ভাদ্রোৎসবে প্রার্থনা

বড় শিমলা এবং ছোট শিমলা হইতে অনেকগুলি বন্ধু সেই উৎসবে যোগদান করেন। সেদিনকার প্রার্থনা 'রোগে শোকে যোগে নিমজ্জন' এই শিরোনামে প্রার্থনাপুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রার্থনাটী এই :—

"হে হৃদয়ের মিত্র, হে জীবনের রক্ষক, আমরা নিতান্ত মূর্খ, তাই অনেক বিষয়কে মন্দ বলি; যাহারা আমাদের বন্ধু, তাহাদিগকে ঘোর শত্রু মনে করি। অধিক বয়স আমাদিগের অপ্রিয়। বার্দ্ধক্য আমাদের মনে অপ্রিয় বস্তু। রোগ আমাদের অসহ্য, ইহাকে আমরা ভালবাসি না। ভগবান্, পৃথিবীর যাবতীয় শোক, বিপদ, অন্ধকার, ইহাদিগকে আমরা একেবারে বিদায় দিতে ইচ্ছা করি। দিন লাগে ভাল, রাত্রি মন্দ; যৌবনের হাসিখুসি ভাল, বার্দ্ধক্য ভাল লাগে না। বসন্তকালের প্রফুল্ল কুসুম নয়নের যেমন প্রিয়, শীতকালের সৌন্দর্য্যরহিত জগৎ তেমন নহে। আমরা হইয়াছি বিচারক। এটা ভাল, এটা মন্দ বলি; অথচ জানি, দুইই মার হাত হইতে। উপাসনার সময় ভাল লাগে। আপিসে বড় কষ্ট পেতে হয়। দয়াময়, দেখ, অনেক সত্য দ্রব্য মূর্খের কাছে মন্দ লাগে। যখন ভাব প্রস্ফুটিত হয়, তখনি বুঝিতে পারা যায়। অমৃতসাগরে যে ভাসে, সে যদি চিৎ হয়ে সাঁতার দেয়, তার পিঠে লাগে, উপুড় হলে সামনে লাগে। ভাসা তত সুখ নয়, ডোবা যত! ডুবিব স্বীকার, কিন্তু যদি ভার না পড়ে। দুঃখের ভার যদি একটা না আসে, তবে কেমনে ডুবিব?

হাসি অন্তরের উপরে, ভিতরে নয়। আনন্দময়ি, আমাদের মনে ভার পড়ুক। যত বার্দ্ধক্য হইতেছে, যত রোগ বাড়িতেছে, তত মন তোমার দিকে চায়। শুধু ভার কেন? সেই ভারে ডোবে। হে ভগবান্, ভারের রহস্য কে বুঝে? রোগে যে আমার সুখ আছে, তাহা কে বুঝে? যদি একটা রোগ আসে, মুখ ভার হয়, বিরক্ত হই; বলি, কুড়ি বছর পূজা করিলাম দুঃখের জন্য, একতারা বাজাইয়া গান করেছি, এই জন্য? দে ভগবতীকে তাড়াইয়া; কিন্তু এখন বুঝিতেছি, যাই হোক, তোমার হাতটা মিষ্ট। উহা হইতে যাই আসুক, তাই সুখ। যখন দুঃখের ভার জীবনতরীতে পড়ে, আস্তে আস্তে তরী ডুবে যায়। আরোহীর কত সুখ! এ কি মজা, আগে জান্‌তাম না। আগে জান্‌তাম, ভাসা মজা, ডুবা দুঃখ। কিন্তু এখন দেখি, মজার তরী মজার সাগরে ডুবেই সুখী। গভীর জলের ভাব কে বুঝে? উপরে যে থাকে, গভীর জলে মকর কি করে, তা কি সে জানে? হে ভগবান্, দুঃখের ভারে মনটা তোমাতে ডুবে গেল। চল্লিশ অপেক্ষা পঞ্চাশ ভারি, ষাট্ আরো; যৌবনে এ মজা নাই। নীচেই মজা, উপরে গরম; নীচে এস, শান্ত, ঠাণ্ডা, শীতল। আর যত বড় মকর, সবার সঙ্গে এখানেই দেখা। ঈশা মকর, মুষা মকর। আর উপরে সব অল্প ভক্ত চিংড়ী মাছের মত লাফাচ্ছে। এই সকলের সঙ্গেই ব্রহ্মসমাজের লোকের দেখা। তাই বলি, মা, এ কি? বড় বড় মকরের সঙ্গে দেখা হল না? মা, কল্লে কি, পঞ্চাশ বৎসরেও তাঁদের সঙ্গে দেখা হল না? হেসে বলিলে, 'আগে ভার পড়ুক, তবেতো হবে।' তাঁরা কি এখানে থাকেন? গভীর জলে তাঁদের বাস। ভার না হলে কি হবে? ভার কে দেবে? এখন বয়স এলেন ভার নিয়ে, রোগ এলেন খান দশ পাথর নিয়ে; দিলেন আমার নৌকায় ফেলে। এবার মজা, তরী আপনাপনি ডুবিল। মা, খুব ডুবিলাম; প্রেমে আনন্দে, বিশ্বাসে ভক্তিতে মন মজা করে ডুবিতেছে। মা, এ জায়গায় কত মজা; যত বড় বড় মকর এখানে। আঃ, এ জায়গা ছেড়ে উপরের তাতের জলে কি আমার গৌর যাবেন? ভক্তসঙ্গে দেখা লোকের ঐ জন্যই হয় না। গভীর জলে না এলে কি ভক্ত দেখা যায়? মা, কি আশ্চর্য্য! রোগ, শোক, দুঃখ —একেও সুখের সোপান করে দিলে। মা, তোমার হাত কি! এই দুঃখের কারাগার তোমার করস্পর্শে সুখের আগার হল। মা, শোকের আগুন অমৃত-

সরোবরে ডুবাইল। মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যোগের সাগরে, ভক্তির সাগরে, প্রেমের সাগরে, সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া, দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর স্থানে যেন ডুবিতে পারি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !"

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা লেখা

প্রতি দিনের প্রার্থনা মধ্যম কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীকে লিখিতে বলা হয়। তিনি প্রথমে এ গুরুতর কার্য্যের ভার লইতে স্বীকার করেন নাই, পরে পিতৃ-আজ্ঞায় তাহা লিখিতে আরম্ভ করেন। মনে করিয়াছিলেন, সময়ে পিতৃদেবকে দেখাইয়া সংশোধন করিয়া লইবেন, কিন্তু পীড়ার বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার আর সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। হিমালয়ের অধিকাংশ প্রার্থনাই তাঁহার লেখা, মহারাণী ও করুণাচন্দ্রের লেখাও কিছু আছে। কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সেই অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যার লেখা প্রার্থনাই এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া, কত লোকে তৎপাঠে নূতন জীবন লাভ করিয়াছেন।

হোলকারের সঙ্গে সম্বন্ধ

আচার্য্য মহাশয় বৈরাগ্যব্রত লওয়া অবধি নিজের আহার ভিক্ষান্নের দ্বারা সম্পন্ন করিতেন। শিমলায় যাইয়া হোলকারের রাজার নিকট তিনি মাসিক ৫৲ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ চাহিয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহার এই সামান্য অর্থভিক্ষার জন্য বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন। ইন্দোরের মহারাজ ইঁহাকে একটি পরম বন্ধু ভাবিয়া ভালবাসিতেন। এমন কি, তিনি আচার্য্যমাতাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন।

যোগবিষয়ক প্রবন্ধ

এই সময় আমেরিকা হইতে, হিন্দুযোগসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার অনুরোধ আইসে; তিনি এই ভগ্ন শরীরে, তাঁহাদের অনুরোধে, 'yoga—Objective and Subjective' এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। পর সময়ে ইহা পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। গভীর পীড়ায় আক্রান্ত, তথাপি তাঁহার মানসিক বিকাশ যে ক্রমে কত উন্নতির দিকে যাইতেছিল, প্রাত্যহিক প্রার্থনা সকল পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়।

শিমলা পরিত্যাগ

রোগ যখন শক্ত হইয়া আসিল, তখন বাটী ফিরিয়া আসাই স্থির হইল।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে শিমলা পরিত্যাগ করিয়া, দুই দিন আম্বালায়, এক সপ্তাহ দিল্লীতে অবস্থান করিয়া, কাণপুরে আগমন করেন। দিল্লীতে ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতেই বাস হয়। হেমবাবুর বিশেষ যত্নে দিল্লীর একটি প্রসিদ্ধ হাকিমের চিকিৎসা আরম্ভ হয়। হাকিম খুব যত্নের সহিত দেখিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করেন। কাণপুরে আসিয়াও ঐ চিকিৎসা চলিয়াছিল, কিন্তু কোন বিশেষ প্রতীকার হইল না। কাণপুরে গঙ্গার ধারে একটী সুন্দর বাঙ্গলায় বাসা লওয়া হয়। স্থানটি অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হইলেও, আচার্য্যের পক্ষে কিছুই ফলদায়ী হইল না। দিল্লীতে, কাণপুরে তিনি প্রাত্যহিক নিয়মিত উপাসনা সকলকে লইয়াই করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিনই নূতন ভাবে প্রার্থনা হইত। কাণপুরে প্রিয়তম ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ যথেষ্ট যত্ন ও আদর করিয়া, আচার্য্যদেবের সেবা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পক্ষে অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত, ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ সাহায্য দিতে প্রস্তুত। "তাঁহার পিতা যদি ঈদৃশ রোগে অশক্ত হইয়া পড়িতেন, তবে কি তিনি ঋণ করিতেন না," এই বলিয়া তিনি রোদনাবেদন করিলেও, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি আরও ঋণগ্রস্ত করিতে পারেন না বলিয়া, সাহায্যগ্রহণে অসম্মত হইলেন। ইহাতে ক্ষেত্রনাথ দুঃখিত হইলেন, তথাপি তিনি তাহাতে সম্মতি দিলেন না। এই সময়ে স্বর্গগত ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র আস এবং ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত যথোচিত সাহায্য প্রেরণ করেন, এজন্য তাঁহারা আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন।

অন্তিম জীবন—নিত্যব্রহ্মসংস্থত্ব ও দলের সঙ্গে একত্ব

কেশবচন্দ্র হিমালয় হইতে যতই নিম্নে নামিতে লাগিলেন, ততই নিত্যব্রহ্ম-সংস্থত্ব তাঁহাতে ফুটিয়া বাহির হইল। দিল্লী হইতে কাণপুরে আসিলেন। কাণপুরের প্রার্থনাগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এ কথায় সাক্ষ্য দান করিবেন। কাণপুরের শেষ প্রার্থনায় আমরা এই কথাগুলি দেখিতে পাই :—"দয়াল হরি, এই সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া, জীব যখন তোমার নিকট থাকে, তখনই মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হরি, তোমার বুকের নামই বৃন্দাবন। শান্তিবক্ষ, আনন্দবক্ষের ভিতরে তব পদকৃপায় কোন রকমে জীব আস্তে আস্তে প্রবেশ করে, ইহা লোকে জানে না, বোঝেও না। হরিকে ডাকিতে ডাকিতে,

শরীর, সংসার, ধন, ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া, আস্তে আস্তে কোন্ দিক্ দিয়া হরির বক্ষে প্রবেশ করে। তখন শরীরের জীব যাইয়া তাহাকে ডাকে, সে কি আর আসিবে? তোমাকে দুহাত তুলে ধন্যবাদ করি, জীবের জন্য এমন সুন্দর মোক্ষ রাখিয়া দিয়াছ। আমি যদি তোমার বক্ষের ভিতরে যাইয়া বসি, তাহা হইলে আমি যে অনন্ত সুখে সুখী হইলাম। দেখ, নাথ, সুখই যথার্থ, কেন না খনির ভিতর গিয়া পড়া। সোণা আর আবশ্যক নাই, কেন না, সোণা হইয়া গেলাম। হরি ভক্তদের বক্ষের মধ্যে পূরে তাদের হরিময় করে দেন। যদি এই দেহে থেকে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলাম, তবে বৈকুণ্ঠবাস হইল না। হরির ঘরে, হরির বুকের বারাণ্ডায় বসিব, হরির বুকের ভিতর খেলা করিব, ইহাই আমরা চাই। হে আনন্দময়ী, ইহাই কর। এক এক সন্তানকে ধরে বুকের মধ্যে রাখ। দেখিব, মা, চির দিন কেমন রাখিতে পার ঐ রকম করে। আর কান্নাটান্না একেবারে থামিয়ে দাও। 'সোণা হয়ে যাব' এই কথা জগৎ শুদ্ধ সকলে বলুক। এবার স্পর্শমণি হরিতে সকলে লেগে হরিময় হয়ে যাব। আশা করুক জীব, হরির কৃপা হইলেই হইল। মাগো, তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে তোমার বক্ষ-বৈকুণ্ঠে বসে, ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া অপার প্রেমসমুদ্রে ডুবে, সংসারের প্রলোভনে আর প্রমুগ্ধ হব না, এবং চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইব, মা, অনুগ্রহ করিয়া কাঙ্গালদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!"

পরিণামে তিনি যে অবস্থা আপনি লাভ করিলেন, সাধন, ভজন, উপাসনা, বন্দনা, ধ্যান, ধারণা এ সকলের যাহা চরমপ্রাপ্তি, সেটি তিনি আপনি একা ভোগ করিবেন, অন্যে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন, ইহা যে তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল, এই প্রার্থনায় তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে একা নন, সকলকে লইয়া এক জন, ইহার প্রমাণ আর এতদপেক্ষা কি হইতে পারে? ভাই বন্ধুগণ তাঁহার পথে চলিলেন না, সর্ব্বথা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন, তাঁহারা নিকটে আসিলেই ভগবানের কথা না বলিয়া ছাই সংসারের কথা তুলিবেন, এই আশঙ্কায় যিনি কলিকাতায় অসঙ্গ উদাসীন হইয়া নির্জ্জনে বাস করিবেন, এই সঙ্কল্প লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত ছিলেন, তাঁহাদিগেরই জন্য তাঁহার এই প্রার্থনা। ঘোর মদ্যপায়ী কোন কালে একা মদ্যপান করিয়া সুখী হয় না, আত্মসম কতকগুলি সঙ্গী চায়, ব্রহ্মরসপানে প্রমত্ত

ব্যক্তিগণেরও সেই দশা। হিমালয়ের প্রার্থনাগুলি বন্ধুগণের জন্য আর্ত্তনাদে পূর্ণ; তাঁহাদের বিমতিতে তিনি শোকভারাক্রান্ত। মনে হয়, যেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার আশা ফুরাইয়াছে; কিন্তু তাঁহার এমন একটী প্রার্থনাও নাই, যাহাতে সেই সকল ব্যক্তির উপরে চরমে সুগতির আশা রাখিয়া, তিনি প্রার্থনা পরিসমাপ্ত করেন নাই। ইহাকেই বলে একত্ব। এত ভিন্নতাসত্ত্বেও যিনি ঈশ্বরের চরণতলে সেই সকল ব্যক্তির প্রতি আশাস্থাপন করিতে পারেন, যাঁহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয়, আর এ পৃথিবীতে কোন আশা নাই, তাঁহার প্রেম কি সামান্য প্রেম! ইঁহাদের সঙ্গে তাঁহার যে কি গভীর অচ্ছেদ্য নিত্যকালের যোগ, এই সকল প্রার্থনাবাক্যই তাহার সাক্ষী। এ সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁহার রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত দেহই তাহার অভ্রান্ত সাক্ষী হইয়া পৃথিবীর নিকটে চিরদিন বিদ্যমান রহিল। বন্ধুগণের মধ্যে একটী অমিলের কথা শুনিলে, সমুদায় রজনী যাঁহার নিদ্রা হইত না, রোগ বাড়িয়া যাইত, তাঁহার প্রেমসম্বন্ধে অন্য পরিচয়দান নিষ্প্রয়োজন।

২৭

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

কমলকুটীরে পদার্পণ ও নবদেবালয়-নির্ম্মাণের উদ্যোগ

৮ই কার্ত্তিক (১৮০৫ শক) বুধবার (২৪শে অক্টোবর, ১৮৮৩ খৃঃ) কেশবচন্দ্র কমলকুটীরে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার দেহ রোগে জীর্ণশীর্ণ, তিনি যাহা ছিলেন, তাহা আর নাই। চিকিৎসক কেন, সাধারণ লোকেই বুঝিতে পারে, রোগের এ আক্রমণ হইতে তাঁহার দেহ যে নিষ্কৃতিলাভ করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ দেখিয়াই বলিলেন, এবার শীতকাল কাটে কি না সংশয়। তিনি গৃহে আসিয়া বসিয়া থাকিবার ব্যক্তি ছিলেন না। বৎসর বৎসর উৎসবে উপাসকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদের স্থানের অভাব হইতেছিল, সে অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহার ব্যস্ততা। ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই আশ্বিন ও ১লা কার্ত্তিক, ১৮০৫ শক) লিখিয়াছেন, "আচার্য্য মহাশয়ের নিজ ভবনে কমলকুটীরে একটি উপাসনামন্দির-নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইতেছে, তাহাতে এক শত উপাসক বসিয়া উপাসনা করিতে পারেন, এরূপ সুবিধা করা হইবে। আচার্য্য মহাশয় রোগজীর্ণ শরীরে শয্যায় পড়িয়া, এইক্ষণ এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার শরীর দেখিলে লোকের কান্না পায়, কিন্তু আত্মার তেজ উৎসাহ ও যোগভক্তির গভীরতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।" তিনি যখন শিমলায় ছিলেন, তখন ইঞ্জিনিয়ার মাধব বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

দেহের একটু স্বাস্থ্যের দিকে গতি

সপ্তাহমধ্যে দেহের একটু স্বাস্থ্যের দিকে গতি হয়, তাই ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০৫ শক) লিখিয়াছেন :—"আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় কাণপুর হইতে যেরূপ অবস্থায় গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা সম্প্রতি কিছু স্বাস্থ্য অনুভব করিতেছেন। কতকগুলি ভয়ঙ্কর উপসর্গ (যাহা অতীব যন্ত্রণাপ্রদ হইয়াছিল) একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে, জ্বর এখন প্রায় বুঝা যায় না,

পেটে যে বেদনা ছিল, তাহা আর উঠে না, কাসি আছে, কিন্তু পূর্ব্ববৎ বেগবান্ নহে, অরুচিরও অনেক লাঘব। প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্মিথ সাহেব ও কেলী সাহেব পরীক্ষা করিয়া পীড়া নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে চিকিৎসা চলিতেছে। চিকিৎসকগণ যেরূপ সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিতেছেন, তাহাতে আশা হইতেছে যে, শীঘ্রই তিনি সুন্দর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন। আর প্রকৃত পীড়া যাহা, যাহার জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন; কেমিক্যাল পরীক্ষক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, প্রস্রাবে 'শুগার', প্রায় নাই 'এলবুমেন' চিহ্ন মাত্র আছে, 'লাইম' নাই ইত্যাদি ; কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতা কমিতেছে না, উঠিতে বসিতে কষ্ট ঘুচিতেছে না, দুই চারিটি কথা বলিলেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন; ইহাতে বোধ হয়, আভ্যন্তরিক পীড়া এখন আছে। যত দিন শরীর সম্পূর্ণ সবল ও মাংসল না হইতেছে, তত দিন নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতেছে না।"

কুচবিহারের মহারাজার সিংহাসনোপবেশনে প্রার্থনা

তাঁহার এই অসুস্থতার মধ্যে একটি আনন্দকর অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়। অনুষ্ঠানে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন না। অসুস্থতাসত্ত্বেও তিনি স্বগৃহে বন্ধুগণকে লইয়া প্রার্থনা করেন। আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০৫ শক) হইতে প্রার্থনা ও অনুষ্ঠানের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ; প্রার্থনাটী দেখাইয়া দিবে, কি আশায়, কি ভাবে তিনি কুচবিহার রাজ্যের সঙ্গে যোগনিবন্ধন করিয়াছিলেন :—"২৩শে কার্ত্তিক (১৮০৫ শক) (৮ই নবেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ), বৃহস্পতিবার, কুচবিহারের মহারাজার সিংহাসনোপবেশন উপলক্ষে, কলিকাতায় পারিবারিক উপাসনাগৃহে, আচার্য্য প্রেরিতমণ্ডলী সহ মিলিত হইয়া, এই ভাবে বিশেষ প্রার্থনা করেন। 'হে প্রভো, তোমার দাসবর্গের পক্ষে আজ একটি বিশেষ আনন্দের দিন। আজ তুমি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ কর। আমরা কান্দিতে কান্দিতে বপন করিয়াছিলাম, আজ আমরা হাসিতে হাসিতে সংগ্রহ করি। এত বিঘ্ন, এত বাধা, এত বিপদ পরীক্ষা এত দিন বহন করিয়া, তোমার অগম্য বিধানের ফল লাভ করিয়া আমরা একান্ত সুখী এবং কৃতার্থ হইলাম। গভীর জ্ঞানপূর্ণ মঙ্গলাভিপ্রায় পূর্ণ হইল বলিয়া, আমরা তোমার প্রশংসা করিতেছি, তোমাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি। আমরা তোমায় বিশ্বাস করিলাম, তোমার আদেশে

বাধ্যতা স্বীকার করিলাম, তজ্জন্য আমাদিগের সুমহৎ পুরস্কার হইল। আমাদিগের কন্যা চাহিলে, এবং আমরা বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তোমার যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, পৃথিবীর রাজ্য তাহাদিগের নিকট তুচ্ছ কপর্দ্দকতুল্য। তুমি বলিলে, 'তোমাদিগের কন্যা আমাকে দাও যে, আমি পতিত জাতিকে জ্ঞান সভ্যতার আলোকে আলোকিত করিতে পারি, নূতন ইজরায়েল বংশের শোণিত পুরাতন জাতির ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। উভয় জাতির সম্মিলনে লক্ষ লক্ষ দুঃখভারাক্রান্ত লোকের মধ্যে জীবন ও আলোক আনয়ন করিব যে, আমার বিধাতৃত্ববিষয়ে তাহারা সাক্ষ্য দান করিতে পারে।' আমরা তোমার কথা শুনিয়া আমাদের কন্যা তোমায় অর্পণ করিলাম। এইরূপে দাসগণ তোমার সেবায় মিলিত হইয়া অন্ধকারাবৃত দেশে গূঢ়রূপে কল্যাণ বিস্তার করিল। আজ তোমার ক্রোড়ে সেই কন্যা ও তাহার স্বামীকে লইয়া তাহাদিগের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিতেছ। আজ তাহাদিগের প্রজাবর্গের কত আনন্দ। কিন্তু আমাদিগের আনন্দ তদপেক্ষা সমধিক, কেন না আমরা তোমার বিধানের জয় দেখিতেছি, এবং এই দুই ব্যক্তি দ্বারা যে সুমহৎ সংস্কার আনয়ন করিবে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। পৃথিবীর প্রবল বাধার মুখে তুমি যে তোমার বিধান দোষমুক্ত করিলে, এজন্য আহ্লাদের সহিত তোমায় ধন্যবাদ দান করি। আজ অন্ধকার রজনী চলিয়া গেল এবং ভারতের এক কোণে শুক্রতারকার উদয় হইল, উজ্জ্বল নব দিন সমাগত হইল। আমরা বিনীতভাবে তোমার নিকটে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি, আজ তুমি তাহাদিগের হস্তে গুরু ভার অর্পণ করিলে, তাহারা যেন তাহার উপযুক্ত হয় এবং চিরকাল তোমার অনুগত দাস থাকিয়া প্রজাবর্গের কুশল সম্পাদন করিতে পারে। তোমারই সমুদায় রাজ্য, হে প্রভো, গৌরব ও ঐশ্বর্য্য সকলই তোমার। তোমার রাজ্য সমাগত হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

কুচবিহারের মহারাজাকে রাজগৃহে বরণ ও আচার্য্যের আশীর্ব্বাদপত্র

"২৪শে কার্ত্তিক (৯ই নবেম্বর ১৮৮৩ খৃঃ) শুক্রবার, খাসদরবারের অন্তে কুচবিহারের মহারাজাকে রাজগৃহে বরণ করা হয়। এতদুপলক্ষে বাহিরের সোপান হইতে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত বস্ত্র বিছাইয়া পথ করিয়া দেওয়া হয়। ভোজন-

গৃহ রূপার চৌকিতে আলিপনা দ্বারা পরিশোভিত, এবং চারিদিকে পুষ্প দ্বারা সজ্জিত হয়। রৌপ্য থালায় নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় এবং চন্দনাদি রক্ষিত হয়। মহারাজা পুত্রকে লইয়া আসনে উপবিষ্ট হন, মহারাণী পার্শ্বে স্থিতি করেন। এই সময়ে নিম্নলিখিত লিপিখানি পঠিত হয়ঃ—

"প্রিয়তম মহারাজ!

"বাহিরের ব্যাপার সম্পন্ন হইল। এখন আমাদের মনের কথা, আন্তরিক স্নেহের কথা শ্রবণ করুন। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় অনুরাগ, আদর, ভক্তি, স্নেহেতে পূর্ণ। প্রত্যেকে একটি একটি মালা গাঁথিয়া আপনার গলদেশে পরাইতেছে। আলিঙ্গন করুন।

"মহারাজ, প্রেমসাজে সজ্জিত হইয়া এখন একবার পৃথিবীপতির দিকে লক্ষ্য করুন। আপনার মস্তকের উপর সেই দয়াময় পরমেশ্বরের হাত। আজ হইতেআপনি যেমন আমাদিগের পতি হইলেন, তেমনি আবার সেই দয়াময় পিতা আপনার পতি হইলেন। আপনার দয়ার উপর যেমন সমুদায় প্রজাবর্গ নির্ভর করিবে, তেমনি আপনিও দয়ার জন্য দিবানিশি বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত সেই পরম পিতাকে ডাকিবেন। দেখুন, কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! জগদীশ্বর আপনার মস্তকে রাজ্যের মুকুট পরাইয়া দিলেন। সেই মুকুট যেন চিরদিন সূর্য্যের ন্যায় প্রভা ধারণ করিয়া, সহস্র সহস্র লোককে আনন্দিত করে।

"মহারাজ, মহারাণী, এই গুরুতর রাজ্যব্রতে আপনারা পরস্পর সখা সখী ভাবে থাকুন। মহারাজা তরুবর হইয়া অসংখ্য লোককে ছায়া দান করিবেন এবং মহারাণী সুকোমল লতা হইয়া মহারাজার হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন এবং সমুদায় রাজ্যকে সুখী করিবেন।

"মহারাজ, আপনার হৃদয় সুখের আবাস হউক। আপনার চক্ষু সুদর্শন হউক, আপনার জিহ্বা মধু বর্ষণ করুক, আপনার হস্ত মঙ্গল আচরণ করুক। পৃথিবীর কল্যাণ আপনার হস্তে। পরম পিতা পরমেশ্বর আপনাকে মুক্তহস্তে আশীর্ব্বাদ করুন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!"

"লিপি পাঠানন্তর রাজমাতা নিজহস্তে চন্দন গ্রহণ করিয়া, মহারাজ এবং মহারাণীকে চন্দন পরাইয়া দেন, স্বয়ং মহারাজ পুত্রকে চন্দনচর্চ্চিত করেন।

বরণ-কার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেন এবং ভাই প্রসন্নকুমার সেন কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। রাজবাটীর দাস দাসী প্রভৃতি সকলে অঙ্গনে উপস্থিত ছিল। বরণান্তে মহারাজ স্বয়ং রৌপ্য মুদ্রা দাসদাসীগণের জন্য অঙ্গনে ছড়াইয়া দেন। সে সময়ে আচার্য্য মহাশয়ের অনুপস্থিতিনিবন্ধন সকলেই দুঃখ করিতেছিলেন। মহারাজ বলিলেন, তাঁহার শুভ ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে, তাহাই যথেষ্ট। এই বরণের ব্যাপারে রাজমাতা, মহারাজ এবং পুরন্ধ্রীবর্গ সকলেরই মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।"

নবদেবালয়নির্ম্মাণাদি বিষয়ে ভাই গিরিশচন্দ্রের প্রবন্ধ

নবদেবালয়নির্ম্মাণাদি বিষয়ে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ধর্ম্মতত্ত্বে (১লা আশ্বিন, ১৮০৬ শক) একটি প্রবন্ধ লেখেন। যদিও এই প্রবন্ধটী প্রায় এক বৎসরের অন্তে লিখিত হইয়াছিল, তথাপি আমরা এখন যাহা লিখিব, তাহা হইতে সময়সম্বন্ধে উহা অতি নিকটবর্ত্তী ; সুতরাং প্রবন্ধটির সেই অংশ, যাহাতে তৎসম্বন্ধের বিবরণ আছে, আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"গত বৎসর শ্রীআচার্য্যদেব কেশবচন্দ্র যখন রুগ্ন ও ভগ্নদেহে হিমালয়শিখরে বাস করিয়া, যোগবিজ্ঞান ও নবসংহিতা এই দুই অমূল্য তত্ত্বশাস্ত্র জগতে বিতরণ করিয়াছিলেন, তখনই স্বীয় কলিকাতাস্থ ভবনে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হন। ক্রমশঃ রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অধিক দিন আর পৃথিবীতে থাকিবেন না, নশ্বর দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে যাইবার জন্য মাতার আহ্বান আসিয়াছে বুঝিতে পারিলেন। মন্দিরে নববিধানের তেমন আদর হইল না, জননীর একটি বিশেষ ঘর নাই, যেখানে ভক্তগণ মাকে লইয়া প্রতিদিন আমোদ করিবে, যোগ ধ্যান সাধন ভজন করিয়া স্বর্গের নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করিবে। মা বলিলেন, আমার খাসদরবারের জন্য ও আমার বিধানরক্ষার জন্য শীঘ্র একটি ঘর নির্ম্মাণ কর। সুপুত্র কেশব আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন, হাতে টাকা নাই, তাহা বলিয়া ভাবিলেন না। মার আজ্ঞা হইয়াছে, তাঁর ঘর হইবেই। তিনি আপন বাড়ীর কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া, ইট কুড়াইয়া, জননীর আলয় নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দেবালয়নির্ম্মাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া কলিকাতার বন্ধুদিগের নিকটে পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন ও দেবালয়ের একটি আদর্শ স্বয়ং অঙ্কিত করিলেন। কিয়দ্দিন অন্তর রোগ-

জীর্ণ কঙ্কালাবশেষশরীরে কমলকুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে পদার্পণ করিয়াই তিনি দেবালয়নির্ম্মাণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ব্রাহ্ম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নির্ম্মাণ-কার্য্যের ভার ও প্রচারক ভাই রামচন্দ্র সিংহের প্রতি তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। দেবালয়ের চূড়া ইত্যাদির আদর্শ অঙ্কিত করিয়া পাঠাইবার জন্য জলপাইগুড়ির একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায়কে অনুরোধ করিয়া পাঠান। কমলকুটীরের পূর্ব্বাংশের পতিত ভূমিতে ভিত্তি স্থাপন করা অবধারিত হয়। আচার্য্যদেব বাড়ীর পশ্চিমাংশের একতালা গৃহটি এবং বাসভবনের কোন কোন অংশ ভগ্ন করিয়া তদুপকরণে দেবালয়নির্ম্মাণের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দিবা রাত্রি রোগযন্ত্রণায় অভিভূত ও শয্যাশায়ী, তাহার মধ্যে এ কার্য্যে জ্বলন্ত উৎসাহ ও ব্যস্ততা। শয্যায় পড়িয়া চূণ স্থুর্কির যোগাড় করিতেছেন, ইঞ্জিনিয়ারকে উপদেশ দিতেছেন, রাজমিস্ত্রীর কার্য্যের সংবাদ লইতেছেন, বিশ্রাম নাই; যে দেখিয়াছে, সেই অবাক্ হইয়াছে। এক দিন মুখ দিয়া রাশি রাশি রক্ত পড়িল, ভয়ঙ্কর রক্তপাত দেখিয়া পরিবারস্থ সকলে আকুল হইলেন ও অনেকে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহাতে আচার্য্য-দেবের ভ্রূক্ষেপ নাই দেখিয়া, তাঁহার ধর্ম্মপত্নী বলিলেন, 'হেগো, তোমার যে বড় সাজ্ঘাতিক পীড়া হইয়াছে, তুমি কি তাহা ভাবিতেছ না?' তিনি উত্তর করিলেন, 'রোগের বিষয় ভাবিবার আমার সময় নাই, আমি দেবালয়ের চূণ স্থুর্কি ভাবিব, না, রোগ ভাবিব?'

"ভিত্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে পর, আচার্য্যদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, প্রত্যেক প্রেরিত কোদালী যোগে ভিত্তির কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন করিবেন; তদনুসারে সকলেই কোদালী হস্তে করিয়া কিছু কিছু ভূমি খনন করেন। ২৩শে কার্ত্তিক, ১৮০৫ শক (৮ই নবেম্বর, ১৮৮৩ খৃঃ) পৌর্ব্বাহ্লিক উপাসনার পর, আচার্য্যদেব প্রেরিতদিগকে সঙ্গে করিয়া, ভিত্তিস্থাপনের জন্য বহু ক্লেশে নীচে নামিয়া আইসেন। প্রার্থনান্তে স্বয়ং ভিত্তি স্থাপন করেন ও দুই এক খানা করিয়া ইট গাঁথিতে প্রেরিতদিগকে বলেন। একে একে সকল প্রেরিতই গাঁথিতে প্রবৃত্ত হন। অনেকের গাঁথনির জমাট হয় না। তাহা দেখিয়া তিনি বলেন যে, তোমরা দুইখানা ইট জুড়িতে পারিতেছ না,

তোমাদের দ্বারা মিলন অসম্ভব। যাহা হউক, কিঞ্চিৎ অধিক এক মাসের মধ্যে প্রাচীর ও ছাদ হইয়া দেবালয় এক প্রকার প্রস্তুত হইয়া উঠে। প্রাচীর গাঁথা হইলেই প্রচারক ভাই কালীশঙ্কর দাসের প্রতি এই বিধি হয় যে, তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেখানে শঙ্খ ও কাঁসর বাজাইবেন ও স্তোত্র পাঠ করিবেন। তদনুসারে নিয়মিতরূপে তাঁহা দ্বারা এ কার্য্য সম্পাদিত হইতে থাকে। দেখা গিয়াছে, যখনই প্রত্যুষে শাঁক কাঁসর বাজিয়া উঠিত, তখনই আচার্য্যদেব শয্যা হইতে উঠিয়া করজোড়ে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেন।

"১লা জানুয়ারি, ১৮৮৪ খৃঃ, এই দেবালয়-প্রতিষ্ঠার দিন নির্দ্ধারিত ছিল। তখন আচার্য্যদেবের পীড়া ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি নামিয়া আসিয়া যে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেই দিন প্রত্যুষে তিনি প্রেরিতদিগকে দেবালয়ে যাইয়া সঙ্গীতাদি করিতে বলেন। নববিধানাঙ্কিত ধাতুময়ী পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়কে ইঙ্গিত করেন। দেবালয়ের ভিতরে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণানন্তর সম্মুখস্থ রোওয়াকে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য আচার্য্যদেব বলিয়া পাঠাইলেন। সঙ্গীতপ্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বন্ধুগণকে লইয়া মাতৃবন্দনার সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেব শয়নাগারে জানালার দ্বারে চৌকিতে বসিয়া সেই মাতৃগুণানুবাদ শ্রবণ করিতে করিতে মত্ত হইয়া উঠিলেন, বিকসিত পদ্মের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ভক্তিভাবে করযোড়ে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর উপরে থাকিতে পারিলেন না। নীচে নামিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ চরণে পড়িয়াও ক্ষান্ত রাখিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র এই ভয়ঙ্কর রুগ্ন অবস্থায় তাঁহাকে দেবালয়ে লইয়া যাইতে একান্ত বাধ্য হইলেন। একখানা চৌকিতে বসাইয়া ধরাধরি করিয়া দেবালয়ে আনা হইল। যাই দ্বারে আসিলেন, অমনি উত্থানশক্তিবিহীন দুর্ব্বল শরীর সত্ত্বেও "মা এসেছি" বলিয়া মহা উৎসাহে করযোড়ে চৌকি হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সেই ভাবে করযোড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বেদীতে যাইয়া বসিলেন ও সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তখন মাকে সম্বোধন করিয়া, তিনি ভক্তিভাবে

ধীরে ধীরে যে সকল মধুর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ হইল না। সে দিন আচার্য্যদেবের স্বর্গীয় ছবি যাঁহারা দেখিয়াছেন ও তাঁহার সুমধুর অন্তিম প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। সে ছবি ও সে কথা ভুলিবার নহে। এই দেবালয়প্রতিষ্ঠাই তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য। প্রতিষ্ঠার অন্তে উপরে তাঁহাকে লইয়া আসিলে পর, তাঁহার ধর্ম্মপত্নী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নামা উঠা ও অধিক কথা বলার দরুণ অসুখতো বাড়ে নাই ? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'তাহাতে যদি অসুখ বাড়ে, তবে ধর্ম্মই মিথ্যা। তোমরা আমার যথার্থ চিকিৎসা করিলে না।' সেই দিন হইতে দেবালয়ে প্রাত্যহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। আচার্য্যদেবের বাসগৃহের দ্বিতলস্থ এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে যে উপাসনা হইতেছিল, তাহা রহিত হয়।

"দেবালয়নির্ম্মাণে ন্যূনাধিক ছয় সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছে। তাহার দৈর্ঘ্য ৩০ ফিট, চৌড়া ২৪ ফিট। পশ্চিম পার্শ্বে ব্রাহ্মিকা মহিলাগণের উপাসনা করিবার জন্য, বাসভবনের সংলগ্ন এক প্রান্তে কুঠরী আছে। দেবালয়ের বেদী ও মধ্য ভাগ মার্ব্বল প্রস্তরে খচিত। বেদীর উপরে আচার্য্যদেবের আসন ও গৈরিক বস্ত্র, সম্মুখভাগে কমণ্ডলু ও নববিধানাঙ্কিত রজতপতাকা ও আচার্য্যদেবের স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থ ইত্যাদি সংরক্ষিত। বেদীর সম্মুখভাগে ও উভয় পার্শ্বে মার্ব্বল প্রস্তরের উপরে উপাসনার জন্য প্রেরিতমণ্ডলীর আসন স্থাপিত। দেবালয়ের চূড়ার নিম্নভাগে বৃহৎ ঘটিকাযন্ত্র, ঊর্দ্ধভাগে নববিধানাঙ্কিত প্রতিষ্ঠাদিনে হস্তধৃত সেই ধাতুময়ী পতাকা *। সম্মুখভাগে প্রশস্ত রওয়াক। আচার্য্যদেবের ইচ্ছা ছিল যে, ভক্তগণ এই রওয়াকে তাঁহার মার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করেন।"

---

* এই পতাকাসম্বন্ধে তাঁহার কীদৃশী নিষ্ঠা ছিল, তাহার এই এক প্রমাণ যে, উপাধ্যায় পতাকা এক জন বন্ধুর হস্তে দিয়া, উপাসনায় কি হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে উপরে তাঁহার নিকটে গেলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীরনাদে বলিয়া উঠিলেন, 'পতাকা কোথায় রাখিয়া আসিলে ?' উপাধ্যায় আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না, অমনি দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিয়া স্বহস্তে পতাকাধারণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাকালে বেদীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

নবদেবালয়প্রতিষ্ঠা

দেবালয়প্রতিষ্ঠাবিষয়ক সংবাদ ও প্রার্থনাটি তৎকালের ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই পৌষ, ১৮০৫ শক, ২৪শে পৌষ প্রকাশিত) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—"বিগত ১লা জানুয়ারী, মঙ্গলবার, আচার্য্যগৃহে নূতন দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠা যেরূপ আয়োজনের সহিত মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবার কথা ছিল, আচার্য্য মহাশয়ের পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছে। তথাপি নিয়মিত দিনে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদিগের সংস্কার ছিল, উত্থানশক্তি-রহিত আচার্য্য আর এই মঙ্গলাবহ কার্য্যে যোগ দিতে পারিলেন না ; কিন্তু প্রাতঃকালে যখন ৬টা বাজিয়া গেল, নিয়মানুসারে সমুদায় ভক্তবৃন্দ নূতন মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রভাতকালের ভজন-সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। বলপূর্ব্বক চেয়ারে বসিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং নূতন বেদীর উপরে উপবিষ্ট হইয়া দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন ; তাঁহার রোগদুর্ব্বল কণ্ঠ হইতে অতি কাতরস্বরে, অতি ক্ষীণস্বরে যখন প্রার্থনার শব্দ উত্থিত হইল, তখন সেই ভাব দর্শন করিয়া ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে মহাক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। তাঁহার সেই প্রার্থনার সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এইরূপ বলিলেন, "এয়েছি, মা, তোমার ঘরে। ওরা আস্‌তে বারণ করেছিল, কোনরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর অধিকার করে বসেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর। 'নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে, নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে, নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে।' আজ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১লা জানুয়ারী, মঙ্গলবার, ১৮০৫ শকের ১৮ই পৌষ, এই দেবালয় তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করা হইল। এই ঘরে দেশ দেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসিয়া তোমার পূজা করিবেন। এই দেবালয় দ্বারা এই বাড়ীর, পল্লীর কল্যাণ হইবে, এই সহরের কল্যাণ হইবে, ও সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থানা-ভাবে তোমার ভক্তেরা ফিরিয়া যাইতেন ; আমার বড় সাধ ছিল, কয়েক খানা ইট কুড়াইয়া তোমার একখানা ঘর করে দি ; সেই সাধ মিটাইবার জন্য, মা লক্ষ্মী, তুমি দয়া করিয়া স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলে। আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের ঐ রকে তোমার ভক্তবৃন্দ

সঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুজালম, এস্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব। আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শনযন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়া দি।

"প্রিয় ভাইগণ, তোমাদিগকেও বলি, তোমরাও মার ঘরখানি সাজাইয়া দিও। কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও; মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মার পূজা করিও না। মা তোমাদিগকে বড় ভাল-বাসেন; তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া, দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান, এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ, পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে। ভাই রে, আমার মা বড্ড ভালরে, বড্ড ভাল। মাকে তোরা চিন্‌লিনে। তোরা মার হাতে যাহা দিস্, পরলোকে গিয়ে দেখ্‌বি, তাহা আদর ও যত্নের সহিত সহস্র গুণ বাড়াইয়া তাঁহার আপনার ভাণ্ডারে রাখিয়া দিয়াছেন। এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্যশান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য্য। মা আমার ইহলোক পরলোক। মা আমার সম্পদ্, সুস্থতা, বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ-সুখ। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহলোকে পরলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে! শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!"

চিকিৎসা সম্বন্ধে কেশবের অভিমত

এখন তাঁহার দেহের কি প্রকার অবস্থা এবং তাঁহার চিকিৎসাসম্বন্ধেই বা মত কি, তাহা প্রদর্শন জন্য এই সংবাদটি (১৮০৫ শকের ১৬ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) আমরা নিবদ্ধ করিতেছি:—"আমাদিগের আচার্য্য মহাশয় বিগত সপ্তাহ হইতে পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কররূপে রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। কয়দিন ক্রমাগত দন্তমূল হইতে শোণিত নির্গত হইতে হইতে শরীর ক্রমে নিঃসত্ত্ব ও দুর্ব্বল

হইয়া পড়িয়াছে। এই রক্তপাতনিবারণ জন্য চিকিৎসকদিগের সমুদায় যত্ন মনোযোগই বৃথা হইয়াছে। এইরূপ সাঙ্ঘাতিক দুরবস্থার কারণ যে কি, তাহা নির্ব্বাচন করিতে গিয়া সমুদায় চিকিৎসকের মস্তক ঘুরিয়া গেল। নববিধানের সম্মিলন রক্ষা করা ইহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, আপন শরীরের চিকিৎসা করাইতেও ইনি এই সম্মিলনের সূত্র ধরিয়া আছেন। ইহার মনোভাব এই যে, ঔষধে যে রোগ দূর করে, তাহা বিজ্ঞানের শক্তি ও সত্য। বিজ্ঞান যাহা, তাহাতে ঐক্য অবশ্যই আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কেন না, সত্য কখন দুই প্রকার হইতে পারে না। যদি এক মূল সত্য সকল বিজ্ঞানের আশ্রয়স্থান হয়, তবে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হকিমি ও আয়ুর্ব্বেদ মিলিয়া এক হইবে ও সকলে একমত হইয়া আমার চিকিৎসা করিবে। ইহা সম্পন্ন হওয়া বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে অসম্ভব। কেন না, বর্ত্তমান কালের অনুন্নত বিজ্ঞান কেবল স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে চায়, সম্মিলন করিতে চায় না। তত্তন্মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ কেবল অসম্মিলন দর্শন করেন, সম্মিলন দর্শন করেন না। সম্মিলন কোথায় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা জানেন না। কাজেই তাঁহার ইচ্ছানুসারে চিকিৎসা হইতে পারিল না। তাঁহার ইচ্ছানুসারে এক চিকিৎসক অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়া, মতে মতে মিলাইয়া, চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হইলেন না, অথচ পুনঃ পুনঃ চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করা হইল, ইহাও তাঁহার বর্ত্তমান ক্লেশের একটি প্রবল কারণ।"

'সুলভে' লিখিত বিবরণ

এ সময়ের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর সুলভে লিখিত হয়। আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্তের সেই অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"বিগত ২২শে এপ্রিল (১৮৮৩ খৃঃ) বায়ু-পরিবর্ত্তন জন্য তিনি (কেশবচন্দ্র) শিমলায় গমন করেন। প্রথম প্রথম তথায় তাঁহার শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু বর্ষার সমাগমে তাঁহার রোগের উপসর্গ সকল এমনি বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে, তাঁকে তথা হইতে দেশে ফিরাইয়া আনা কঠিন বলিয়া আশঙ্কা হইল। অনেক ভাবনা কষ্টে অবশেষে তাঁহাকে বিগত ২৪শে অক্টোবরে (১৮৮৩ খৃঃ) কলিকাতার কমলকুটীরে আনয়ন করা হয়, তখন তাঁহার রোগযন্ত্রণায় শরীর এরূপ কাতর যে, তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন,

তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন না। যখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন তিনি যোগে নিমগ্ন হইয়া শরীরকে ভুলিয়া যাইতেন এবং আপনাকে মা আনন্দময়ীর বক্ষে বিলীন করিয়া হাসিতে হাসিতে অথবা কাঁদিতে কাঁদিতে অতি চমৎকার ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। সে স্বর্গীয় শোভা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন। এই সময় বিখ্যাত ডাক্তার স্মিথ ও কেলি সাহেব চিকিৎসার্থ তাঁহাকে দেখিতে আসেন। ডাক্তার জগন্নাথ সেন তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। জগন্নাথ বাবুর নিঃস্বার্থ যত্ন ও চিকিৎসায় আচার্য্য মহাশয়ের শরীর প্রথমে অনেকটা সুস্থতা লাভ করে, উপসর্গ সকল অনেক কমিয়া আসে এবং শরীর একটু সবল হইয়া উঠে। যে দিন তিনি শিমলা হইতে ফিরিয়া আসেন, তাহার পর দিন এবং যে দিন তাঁহার পৌত্র ও দৌহিত্রীর নামকরণ হয় সেই দিন, এই দুই দিন পারিবারিক উপাসনাগৃহের বেদীতে আসন গ্রহণ করেন *। তিনি আপনার রোগ-শয্যায়েই দৈনিক উপাসনা করিতেন। এক দিন উপাসনা-কালে আনন্দময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মা, তোমার হুকুম পাইয়াছি, তোমার জন্য একটি প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এই অপ্রশস্ত ঘরে লোকে উপাসনা করিতে আসিয়া স্থানাভাবে ফিরিয়া যায়, ইহা তোমার দাসের প্রাণে সহ্য হয় না; রুগ্ন শরীর লইয়া তব দাস তোমার একটি নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা করিবে।' সেই দিনের পরই তাড়াতাড়ি নূতন দেবালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, ইষ্টকের অভাব হইল; নিজ বাটীর এক দিক্ ভাঙ্গিয়া তাহার ইষ্টক দ্বারা গৃহের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার দাঁতের গোড়া দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে লাগিল, এবং তাঁহার রোগের অন্যান্য কষ্টকর উপসর্গ সকল আবার বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। ডাক্তারগণ তাঁহাকে যোগে নিমগ্ন হইতে নিষেধ করায়, তিনি উত্তর করিলেন, আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব; তবে আমি এই করিতে পারি যে, একেবারে দুই একবার অধিক পরিমাণে মত্ত না হইয়া, আমি দিনের মধ্যে অনেক বার অল্পক্ষণ করিয়া

---

* কেশবচন্দ্র সংহিতার পদ্ধতি অক্ষরে অক্ষরে অনুবর্ত্তন করিয়া 'সুনন্দ' এবং 'সুধাংশু-বিকাশিনী' এই নাম দেন। বিবাহাদিতে পূর্ব্বে যে পদ্ধতি অনুসারে স্বয়ং কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই সামান্য পরিবর্ত্তনে সংহিতায় নিবদ্ধ আছে, নামকরণের অংশ নূতন।

তাঁহার সহিত যোগে থাকিব। তাঁহার কষ্ট বৃদ্ধি হওয়ায়, তিনি ডাক্তার-দিগকে বলিতেন, আমি তাহাদিগকে চুম্বন করিব, তাহারা আমার ধর্ম্মপথের সহায়; কিন্তু আপনারা আমার চিকিৎসা করিয়া আমাকে সবল করিয়া তুলুন। এক দিন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পরিবারস্থ কয়জন তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, 'এ ভগবানের কি বিচার ? অকারণ তিনি কেন তাঁহার ভক্তকে এত দুঃখ দেন ?' এই কথা শুনিয়াই অমনি তিনি যোগে নিমগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'মা গো, তোমাকে না জানিয়াই ইহারা এইরূপ তোমায় দোষারোপ করে, এই অজ্ঞানদিগকে ক্ষমা কর; আমার আনন্দময়ী মা আমাকে ভিতরে ভিতরে ক্রোড়পতি রাজা সম্রাট্ করিয়াছেন, আমি তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আমি তাঁহার নিকট সিকি পয়সার পুঁইশাক কি করিয়া চাইব ? আমার রোগ ও দুঃখ দূর কর, এরূপ প্রার্থনা করিয়া আমি আমার মাকে অপমান করিতে পারিব না। তিনি আমাকে যে কি ধন দিয়াছেন, তাহা কি তোমরা জান ?' এই সময় তাঁহার রোগবৃদ্ধি হওয়ায় বাঙ্গালা কবিরাজ মহাশয়দিগের চিকিৎসা আরম্ভ হয়। সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত গোপী-মোহন রায়, শ্রীযুক্ত লোকনাথ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন মহাশয়গণ তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা কেহই অর্থের প্রত্যাশী ছিলেন না, যেরূপ যত্ন ও স্নেহ সহকারে তাঁহারা তাঁহার চিকিৎসা করেন, তাহা তাঁহার বন্ধুগণ ও পরিবারবর্গ চিরকৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন। তিনি বিষম রোগে পড়িয়াও বাটীতে যে নূতন দেবালয় হইতেছে, অত্যন্ত ভক্তির সহিত তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন; তাহা দর্শন, তাহার বিষয় চিন্তা ও সে সম্বন্ধের কথাতেই তিনি ঘোর যন্ত্রণার মধ্যে সুখী থাকিতেন। তাঁহার এক জন আত্মীয় একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'তুমি কি পীড়ার বিষয় অত্যন্ত চিন্তা কর ?' তিনি অম্লানবদনে বলিয়া উঠিলেন, 'আমি দেবালয়ের ইট কাঠ সুরকী প্রভৃতির ভাবনা ভাবিবারই সময় পাই না, ইহার মধ্যে আপনার পীড়ার কথা কখন ভাবিব ?' তাঁহার শরীরের ভার তাঁহার আনন্দময়ী মাতার হস্তে, তাহা তিনি স্পষ্ট জানিতেন। প্রাতে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ বন্ধুদিগের সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, এক দিন পরলোকের বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, 'আমি যেমন সম্মুখের বৃক্ষ সকল দেখিতেছি,

যেমন এই ঘর দেখিতেছি, ইহার কোথায় কি আছে, সকলি জানিতেছি, তেমনি যদি তোমরা পরলোক দেখিতে পাও, ইহলোকে থাকিয়া তাহার শোভার ভিতর বাস করিতে পার, তবেই বুঝিব, তোমাদের পরলোকে বিশ্বাস যথার্থ, নতুবা পরলোকের অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আমি বিশ্বাসই বলি না।' তাঁহার এক জন দাস এই সময়ে মহর্ষি ঈশার কথা, যথা,—'আমার পিতার গৃহে অনেক প্রাসাদ আছে, যদি তাহা না হইত, তবে আমি বলিতাম না' এই কথা বলিয়া উঠায়, তাঁহার মুখ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সত্যে সত্যে সম্মিলন ও সামঞ্জস্যই তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল, নববিধানে তিনি সকল ধর্ম্মের মিলনের স্থান দেখাইয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, 'চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসকগণ পরস্পরে কেন বিবাদ করিবে? এলপেথি, হোমিওপেথি, কবিরাজী চিকিৎসায় কেন মিল হইবে না? সকল সম্প্রদায়স্থ চিকিৎসকগণ একত্র হইয়া কেন রোগীদিগকে চিকিৎসা করিবেন না? তাঁহার চিকিৎসা করিবেন না?' তাঁহার চিকিৎসায় সকল সম্প্রদায়স্থ চিকিৎসক এক হইয়া চিকিৎসা করেন, ইহাই তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, এবং এই জন্যই তিনি একেবারে এই তিন সম্প্রদায়স্থ চিকিৎসকের ঔষধ সেবন করিতেন; কোন চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা না করিতে পারিয়া মনে দুঃখ পান, ইহা তিনি কখনই দেখিতে ইচ্ছা করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, 'চিকিৎসকেরা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দেখিতে আসেন, তাঁহারা সকলেই চিকিৎসক; কেন তাঁহাদিগের ঔষধ আমি খাইব না?' এই সময়ে তাঁহার কোমরের পীড়া যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি হয়। স্থির হইল, সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপেথি মতে তাঁহার চিকিৎসা করিবেন; মহেন্দ্র বাবুও অর্থের আশা করেন নাই, তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে আচার্য্য মহাশয়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। দুই দিন হোমিওপেথি চিকিৎসার পর তাঁহার একটু সুরাহা অনুভূত হইল। বিগত ইংরাজী নববর্ষের দিবসে বাটীর নূতন দেবালয়-প্রতিষ্ঠার দিন স্থির। সে দিন প্রাতে তাঁহার শরীরের অবস্থা এরূপ ছিল যে, কেহ আশা করেন নাই যে, তিনি সে দিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারিবেন। বেলা ৬টার সময় নূতন দেবালয়ে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, আচার্য্য-

দেব শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ ধুইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, গৈরিক উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া দেবালয়ের দিকের জানালায় যোড় হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন; অল্পক্ষণের পর ক্ষুদ্র শিশু যেমন জননীকে দূর হইতে দেখিয়া, তাঁহার নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তিনিও সেইরূপ দেবালয়ে যাইবার জন্য বালকের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, তথায় লইয়া যাইবার জন্য নিকটস্থ বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলে যোড় হস্তে তথায় যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, তখন আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার যষ্টি আনিয়া দেও, আমি পদব্রজেই যাইব। বন্ধুগণ তখন নিরুপায় দেখিয়া, একখানি চৌকি করিয়া, নূতন দেবালয়ের নিকট তাঁহাকে লইয়া গেলেন। তিনি অনতিদূর হইতে পদব্রজে চলিয়া গিয়া দেবালয়ের বেদীতে উপবেশন করিলেন। যেরূপ সুমিষ্ট স্বরে প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া দিলেন, সেরূপ মিষ্ট কথা কেহ কখন আর শ্রবণ করে নাই। তিনি বলিলেন, 'মা আমি আসিয়াছি, রুগ্ন শরীরে অনেক কষ্টে আসিয়াছি। মা, তুমি বড় ভাল, মা, ইট কুড়াইয়া আমি এই তোমার বাড়ী করিয়াছি, তুমি ইহার ভিতরে বসিবে, আমরা তোমার পূজা করিব, তাহাতে আমার শোণিত বিশুদ্ধ হইবে, আমার পরিবার ও ছেলে পিলে পবিত্র হইবে, বন্ধুগণ পরিত্রাণ পাইবে, সমস্ত পৃথিবীও উদ্ধার হইবে। এখানে সমস্ত ভারতবর্ষের লোক আসিয়া তোমার পূজা করিবে। আমার মা বড় সৌখীন মা; ভাই, তোমরা মনে করিও না, আমার মা পাথরের মত শুষ্ক মা, তাঁহার কোন সখ নাই। তোমরা সকলেই মাকে কিছু কিছু দিও, মার ঘর সাজাবার জন্য যে যাহা কিছু দিবেন, মা তাহাতেই বড় খুসী হইবেন। কেহ একটি ফুল তুলিয়া অন্তরের সহিত যদি মার হাতে দেন, তাহা হইলে মা তাহাতেই আহ্লাদ করিয়া তাহা লইয়া স্বর্গের দেবতাদিগকে আদর করিয়া দেখান।' পরে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি এই বলিয়া কথা শেষ করিলেন, 'মা. আর অনেক কথা বলিব না, এরা আমাকে বকৃবে।' প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া নূতন বেদী হইতে তাঁহার জীবনের এই প্রকাশ্য শেষ প্রার্থনা করিলেন। তিনি উপরে আসিলে এক জন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নীচে যাওয়ায় কি বড় কষ্ট ও শ্রান্তি হইয়াছে?" তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'যদি এতে

কষ্ট হয়, তবে ধর্ম্মই নাই; তোমরা যদি আমার এত দিন এইরূপ চিকিৎসা করিতে, তাহা হইলে আমি আরাম হইতাম।"

রোগের অবস্থায় পরমহংস রামকৃষ্ণ, লর্ড বিশপ্ এবং মহর্ষির আগমন

কেশবচন্দ্রের রোগের অবস্থায় পরমহংস রামকৃষ্ণ, লর্ড বিশপ্ এবং মহর্ষি প্রধানাচার্য্য তাঁহাকে দেখিতে আইসেন। তাঁহাদিগের আগমনবৃত্তান্ত ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা মাঘ, ১৮০৫ শক) হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

"অনেকেই জানেন, দক্ষিণেশ্বরের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং শ্রদ্ধা করিতেন। এক দিন আচার্য্যদেবের শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ও যন্ত্রণাগ্রস্ত, সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে পরমহংস মহাশয় হঠাৎ কমল-কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আচার্য্যদেব নিদ্রিত, পরমহংস মহাশয় গৃহে উপস্থিত হইলেও, অসুস্থতাবৃদ্ধি হইবে ভয়ে, কেহই তাঁহাকে জাগ্রৎ করিতে সাহসী হইলেন না; প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরমহংস মহাশয় বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া, আচার্য্যদেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, বলিতে লাগিলেন, 'যদি তিনি এখন না আসিতে পারেন, যে ঘরে তিনি শয়ন করিয়া আছেন, সেই ঘরটি আমায় দেখাইয়া দাও, আমি দৌড়িয়া এখনই তথায় যাই, তাঁহাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না।' আচার্য্যদেব গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিতে প্রস্তুত হইতেছেন, পরমহংসও সমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'ওগো বাবু, আমি অনেক দূর হইতে তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি, একবার দেখা দাও, আমি আর থাকিতে পারি না।' আচার্য্যদেব এই সময় বাহির হইলেন এবং পরমহংস মহাশয়কে প্রণাম করিলেন, উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। তখন স্পষ্ট প্রতীতি হইল, দুই অশরীরী আত্মা যেন একত্র মিলিত হইলেন, তাঁহাদের সম্মিলনে যেন আগুন উঠিল, দুই জনেই শরীরের কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা যে কিরূপ গভীর সৎপ্রসঙ্গে ডুবিয়া গেলেন, তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই জানেন। পরমহংস মহাশয় পীড়িত আচার্য্যদেবকে দেখিতে আসিয়া-ছিলেন, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া অনেক কথা কহিলেন, কেবল তাঁহার পীড়ার কথা হইল না। এ সম্বন্ধে তিনি এই মাত্র বলিলেন যে, 'সময়ে সময়ে মালী ভাল বস্‌রাই গোলাপ বৃক্ষের গোড়া খুঁড়িয়া দেয়, শিশির খাওয়ান হইলে আবার

মাটি দিয়া তাহা পূর্ব্বমত পূর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে গাছে খুব ফুল ও তেজ হয়। তোমার সম্বন্ধে মা তাহাই করিতেছেন, এ তোমার পীড়া নয়, তুমি মার বস্‌রাই গোলাপ গাছ, মা তোমার গোড়া খুঁড়িয়া দিয়াছেন; কার্য্যসিদ্ধি হইলে আবার পূর্ব্বমত করিয়া দিবেন।' তিনি আরও বলিলেন, 'মাকে পাকা রকম পাইতে গেলে, শরীরে এক এক বার বিপদ হয়, তিনি শরীরটাকে আত্মার উপযোগী করিয়া লইবার সময় এক বার খুব নাড়িয়া চাড়িয়া লন। আমারও একবার ঠিক এইরূপ হইয়াছিল, মুখ দিয়া ঘটি ঘটি রক্ত উঠিত, সকলে বলিত, আমার যক্ষ্মা হইয়াছে, আর বাঁচিব না।' তিনি আরও বলিলেন, 'সেবার যখন তোমার অত্যন্ত রোগ হইয়াছিল, আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল, সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানিয়াছিলাম, এবার তত ভাবনা হয় নাই। কেবল কাল রাত্রিতে প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, নিদ্রা হয় নাই; মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, যদি কেশব না থাকে, তবে কাহার সঙ্গে কথা কহিব।' অর্দ্ধ ঘণ্টা কথোপকথন করিয়া আচার্য্যদেবের শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়িল, তিনি শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।"

"কলিকাতার লর্ড বিশপ্ আচার্য্য মহাশয়কে এক দিন প্রাতে হঠাৎ দেখিতে আসেন। তখন আচার্য্য মহাশয় বহির্দ্দেশে গিয়াছিলেন, সেখানে বসিয়া তাঁহার মুখ দিয়া হু হু করিয়া রক্ত পড়িতেছিল, তাঁহার যেরূপ অমায়িক প্রকৃতি ছিল, তাহাতে তিনি সেই অবস্থাতেই একটী ওভার কোট পরিধান করিয়া, বিশপ্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রক্তেতে তাঁহার মুখ পূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি একটি পাত্রে সেই রক্ত ফেলিতে লাগিলেন। বিশপ্ সাহেব তাঁহার ভাব, সহিষ্ণুতা, ভয়ানকরোগসম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা ও কষ্টের মধ্যে শান্তভাব দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, সংসারের তত্ত্বজ্ঞানীরা কষ্ট ও পীড়ার গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, অবিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরকে দোষ দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যু তাহার অর্থ সংসারকে বুঝাইয়া দিয়াছে। তিনি আচার্য্যদেবের ভাব দেখিয়া বলিলেন, ধর্ম্ম ব্যতীত এ সমস্ত দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনার উপায় নাই। তিনি অনবরত রক্ত ফেলিতে লাগিলেন, বিশপ্ সাহেব তাঁহার বীরত্বের মুখ দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন, ধর্ম্মের গভীর কথা সকল পরস্পরে বলিতে

লাগিলেন। বিশপ সাহেব যে রোগীকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া, খ্রীষ্টসমাজের আধ্যাত্মিক ভাবের অভাবের কথা এবং বর্ত্তমান সময়ে যে একটু আধ্যাত্মিকতা জাগ্রৎ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যদেব প্রতিখ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টের খণ্ড জানিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। তিনি বিশপ্ সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি সর্ব্বদাই তোমাকে মনে মনে ভাবিয়া থাকি। খ্রীষ্টের এই জন্মোৎসবের সময় আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, শীঘ্রই আমাকে মধ্য ভারতে যাইতে হইবে, অনেক দিন হইতে তোমাকে দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া এবার মনে করিলাম, তোমায় না দেখিয়া আর কোথাও যাইব না। যদিও তোমার সঙ্গে মতসম্বন্ধে আমার অনেক প্রভেদ আছে, তথাপি আমি জানি, তুমি অত্যন্ত মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছ, আমি তোমাকে অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতি করি।' বিশপ্ সাহেবের অকৃত্রিম ভাব ও অনুরাগ দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তাঁহার যে আচার্যদেবের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও তাঁহাদের পরস্পর যে গভীর যোগ ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশপ্ সাহেব চলিয়া গেলে, তিনি বরফাদি দিয়া রক্তনিবারণের অনেক উপায় করিলেন; সে দিন প্রায় এক ছটাক রক্ত নির্গত হইলে, তাহার বেগ রুদ্ধ হইল। আচার্য্যদেবের এমনি উদার ভাব ছিল যে, তিনি হিন্দু খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম মুসলমান সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন; কেবল পুণ্য ও প্রেম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য দেখিলেই তিনি মোহিত হইতেন, এ সম্বন্ধে সম্প্রদায় মানিতেন না।"

"বিগত ২৮শে ডিসেম্বর, (১৮৮৩ খৃঃ), শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণে, ভক্তিভাজন বৃদ্ধ মহর্ষি প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রোগশয্যায় শায়িত আচার্য্য মহাশয়কে দেখিবার জন্য কমলকুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি উপরে ড্রয়িংরূমে যাইয়া আসন গ্রহণ করিলে পর, আচার্য্য মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন; প্রধান আচার্য্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া, গভীর প্রেমভাবে তাঁহাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক আপন আসনের পার্শ্বদেশে বসান। তখন আচার্য্য প্রধান আচার্য্যের হস্ত ধরিয়া স্বীয় মস্তকে স্থাপন করেন। সেই সময়ে উভয়ের আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রধান আচার্য্য সস্নেহবচনে বলিলেন, 'আমি আমার জামাতার মৃত্যুজন্য তত দুঃখিত নহি, তোমার পীড়ার

সংবাদ পাইয়া যতদূর দুঃখিত হইয়াছি। আমি কেবল তোমাকে দেখিবার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছি। মালী গোলাপ গাছের মূল খুঁড়িয়া দেয়, তাহাতে আর ভাল ফুল ফুটে; তোমার জীবন দ্বারা তিনি আরও ভাল ফুল ফুটাইবার জন্যই, তোমার দেহে এইরূপ রোগের আঘাত করিয়াছেন। আমি সেই তোমাকে আচার্য্য ও প্রচারক করিয়া যে পরিব্রাজক হইয়াছিলাম, এখনও তাহাই আছি। তুমিই আচার্য্য ও প্রচারক। ব্রাহ্মধর্ম্ম চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এইক্ষণ ইউরোপ এমেরিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এমেরিকায় প্রতাপের বড় সুখ্যাতি হইয়াছে, তাঁহার বাগ্মিতা, ভাব ও প্রেমের অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছে।' আচার্য্য বলিলেন, সেই সকল দেশে অনেকটা শুষ্ক ধর্ম্মভাব, এদেশের ধর্ম্মের সরস ভাব ও নূতনত্ব দেখিয়া সে দেশের লোকেরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকে। তিনি ইহাও বলেন যে, পৃথিবীকে এখনও অনেক আমার দেওয়ার আছে। রোগের কষ্টের সময়ে পরম জননীকে যেরূপ অত্যন্ত নিকটে দেখা যায় ও বক্ষে ধারণ করা যায়, সেরূপ সুস্থতার সময়ে হয় না, রোগযন্ত্রণার মধ্যে বড় আনন্দ লাভ হয়। রোগযন্ত্রণার মধ্যে যে আনন্দ-লাভ হয়, অন্য সময়ে তাহা পাওয়া যায় না, এ বিষয়ে অনেক কথোপকথন করিলেন, এবং স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা যে এ দেশের মহোপকার হইয়াছে, তিনি যে দেশের পৌত্তলিকতার বিনাশক, সত্যধর্ম্মের পথপরিষ্কারক ছিলেন, তদ্বিষয়ে দুই জনেই কিছু কিছু বলেন। অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় চলিয়া গেলেন। আচার্য্যের ইচ্ছা ছিল যে, এক দিবস বৃদ্ধ মহর্ষিকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। তৎপর রোগবৃদ্ধি হওয়াতে সে বাসনা অপূর্ণ রহিল।"

২৮

স্বর্গারোহণ

(৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ খৃঃ)

আসন্নকাল ও মহাপ্রয়াণ

যে দিন তিনি অবতরণ করিয়া দেবালয়প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিলেন, "সে দিন অপরাহ্ণে তাঁহার শরীর আরও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাঁহার বেদনা বৃদ্ধি পাইল ও অসহ্য হইয়া উঠিল, পরদিন বেদনায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। এই সময় তাঁহার আত্মীয় ও ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া, কেলি, রে, হার্ব্বি, ও মেকনেল সাহেবদিগকে এবং বাঙ্গালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভগবান্‌চন্দ্র রুদ্র, দয়ালচন্দ্র সোম, দুর্গাদাস রায় ও গোপালচন্দ্র বসুকে একত্র করিয়া আনয়ন করিলেন। সাহেবেরা পীড়ার যন্ত্রণা হইতে তাঁহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, মর্ফিয়া পিচকারী তাঁহার শরীরে দেওয়ায়, তিনি তখনই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার বেদনার উপশম হইল না। পরে কয় দিন আবার বেদনা উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার বেদনা যে সাংঘাতিক হইয়াছে, তাহা তাঁহার পরিবারগণ বুঝিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে বলিলেন, 'তোমরা উঁহাদিগকে বুঝাইয়া ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত কর না কেন?' তাঁহারা উত্তর করিলেন, 'আমাদিগের কথা কি উঁহারা শুনিবেন? আপনার মুখের কথা শুনিলে, উঁহারা সান্ত্বনা পাইবেন।' ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, 'আমি এখন বৈকুণ্ঠের নূতন নূতন কত কথা ভাবিতেছি, আমি এখন তাহাই বলিব, তাহা বলিলে উঁহারা আরও কাঁদিয়া উঠিবেন: তোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া দেও যে, সংসার সকলি মিথ্যা ও মায়া।' ক্রমে কোন ঔষধে রোগের কোন উপকার হইল না। বিগত সোমবার (৭ই জানুয়ারী) অপরাহ্ণে সকলেই বুঝিলেন, তিনি আর এই মায়াপূর্ণ সংসারে অবস্থিতি করিবেন না। তিনি গভীর যোগে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন কথা বার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ

জ্ঞান রহিল। সেই দিন অপরাহ্নে তাঁহার নিকট কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত গান হইল, তাঁহার প্রসন্ন মুখকমল আরও প্রসন্ন হইল, তাঁহার মুখ হাসিতে লাগিল। তাঁহার স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে কয়েক রজনীতে প্রায় পঞ্চাশ জন বন্ধু বান্ধব কমলকুটীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিন চারিজন ডাক্তার আপনাপনি অনবরত তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে ডাক্তার মেকনেল আসিয়া তাঁহার অনেক চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার শরীরকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রত্যূষে নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল, দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য মহাশয় সেই মুমূর্ষু অবস্থায় সকলের সহিত যোগ দান করিলেন। এই সময় কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত হওয়ায় তাঁহার চক্ষু স্থির হইল, মুখকমল হাসিতে লাগিল, ক্রমে তিনি পৃথিবী ও কায়া ছাড়িতে লাগিলেন। 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে' শব্দ অনবরত উচ্চারিত হইতে লাগিল, এবং বেলা ৯টা ৫৩ মিনিটের সময় (৮ই জানুয়ারী) বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন ; বন্ধুগণ সমস্বরে 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' উচ্চারণ করিলেন। এই সময় তাঁহার মুখকমল যেন ফুটিয়া উঠিল, রোগযন্ত্রণার চিহ্ন ও মলিনতা চলিয়া গেল, অপূর্ব্ব হাস্য আসিয়া তাঁহার মুখকে অধিকার করিল, তিনি হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সেরূপ অপরূপ মুখমণ্ডলের শোভা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। সকলেই এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না যে, তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া, হাসিতে হাসিতে মা আনন্দময়ীর কোলে গিয়া বিলীন হইলেন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত পুস্তকের প্রুফ * দেখিয়া, নববিধান পত্রিকায় লিখিয়া জীবনের ব্রত পালন করিয়াছেন।" (১৮০৫ শকের ১লা মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।)

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

আমরা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বর্ণনা এত দিন পরে কি করিব ? তৎকালে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলিয়া লিখিত প্রবন্ধের শেষ অংশ এখানে আমরা (১৮০৫ শকের ১লা মাঘের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) তুলিয়া দিতেছি :—"কলিকাতার রাজপথ,

* নবযোগ প্রবন্ধের প্রুফ তিনি আপনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। সংহিতা পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কণ তাঁহার স্বর্গারোহণের পর হয়।

তুমি ধন্য হইলে। যিনি আপনি পথ হইয়া শত শত লোককে স্বর্গের যাত্রী করিলেন, আজ তুমি তাঁহার তনুকে পবিত্র ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য নিজ বক্ষ বিস্তার করিয়া দিলে। ভক্তবৃন্দের 'জয় সচ্চিদানন্দ হরে' ধ্বনির সঙ্গে, হে মদমত্ত মাতওয়াল,* তুমি আসিয়া হরিনাম করিতে লাগিলে! এ কি! তোমার পাপ তোমায় আমাদিগের আচার্য্য হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে নাই, তুমি পাপে ডুবিয়া থাকিয়াও তাঁহার প্রতি এমন ভক্তি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছ? জগৎ দেখুক, পাপীরও কেমন ভক্তের প্রতি টান। তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে সকলকে অনুনয় বিনয় করিতেছ। তুমি ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া কাহাকে প্রণাম করিতেছ? আচার্য্যকে? তোমার শুভ নিশ্চয়ই। পথ জনতায় পূর্ণ কেন? সকল সম্প্রদায় আজ একত্র মিলিত কেন? শত্রুর শত্রুতা আজ কোথায় লুকাইল? মৃত্যু উজ্জীবন, এই আচার্য্যবাণী আজ সপ্রমাণিত হইল। পথ ঘাট শ্মশানভূমি আজ নিস্তব্ধ গম্ভীরভাবাক্রান্ত জনসমূহে আচ্ছন্ন। সকলেই তাঁহার যোগবিকশিত মুখকমল দর্শনার্থ ব্যগ্র। তোমরা সকলে দর্শন কর, দর্শন করিয়া ধন্য হও। দেখ, মৃত্যুঞ্জয়ের শরণাপন্ন হইলে, কেমন হাসিতে হাসিতে, প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে চতুর্দ্দিকে দিব্যজ্যোতি বিস্তার করিয়া, স্বর্গে চলিয়া যাওয়া যায়।

"চন্দনকাষ্ঠবিরচিত চিতাশয্যা, তুমি এই পবিত্র তনু নিজ বক্ষে ধারণ করিবে? তোমার অভিপ্রায় কি? তুমি শুদ্ধসত্ত্ব তনু শুদ্ধসত্ত্ব জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গে মিশাইয়া, ইহাকে সমুদায় জগতের উপাদানের সঙ্গে এক করিয়া দিবে? অগ্নি জল বায়ু আকাশ ও ভূমিকে এই তনুর অনুরূপ মন্দির করিয়া দিয়া, তুমি কি সাধকগণের সাধনের পরম সহায় হইবে? আমাদিগের আচার্য্যতনু কোথায়, এ বলিয়া কি আর আমাদিগের আক্ষেপ করিতে হইবে?

'খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতিংষি সত্ত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥'

---

* এ ব্যক্তি মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া কেশবচন্দ্রকে দেখিত ও উপদেশ শুনিত. ভিতরে ভিতরে কেমন একটা ইহার অব্যক্ত অনুরাগ ছিল।

"এই মহাসত্য, হে চিতাশয্যা, তুমি আজ আমাদিগের নিকটে প্রচার করিবে? আমরা ঈশ্বরসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী নহি, কিন্তু আচার্য্যগণসম্বন্ধে অদ্বৈত-বাদী; আমাদিগের এই মত কি করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করাইবে? যদি এই মতে আজ তুমি আমায় দীক্ষিত কর, চিতা, আমি অন্তিমে আমার এই দেহ কৃতজ্ঞতাভরে তোমার করে সমর্পণ করিব।

"হে প্রজ্বলিত হুতাশন, তুমি জ্বলন্তশিখা কেন বিস্তার করিলে? ধূপধূনা ঘৃত ও গন্ধদ্রব্যের আহুতি পাইয়া কি তুমি আনন্দিত হইয়াছ? এ সকল দিয়া কে না তোমার মান বর্দ্ধন করিয়া থাকে? আজ মহাগ্নির সন্তান, হে ভূতময় অগ্নি, তোমার উপরে শয়ান। ইনি আত্মদেহ তোমায় অর্পণ করিয়া তোমার সমাদর করিতেছেন, এবং জগৎকে এই বলিয়া যাইতেছেন, পূর্ব্বপুরুষ বৈদিক মহর্ষিগণ সামান্য সমিৎকুশাদি অর্পণ করিয়া যে অগ্নির অর্চ্চনা করিতেন, সেই অগ্নিকে পরমমাতার আবাসমন্দির এই তনু দিয়া আজ তৃপ্ত করিতেছি; এই তনু অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইল, এ যেমন দগ্ধ হইতে থাকিবে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে যেন জগতের সর্ব্ববিধ তনুদোষ দগ্ধ হইয়া যায়। 'জয় সচ্চিদানন্দের জয়' 'জয় সচ্চিদানন্দের জয়' 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্'।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!"

অন্তিমকালে কেশবচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী

সেবানিরত দুই জন বন্ধু এবং পত্নীর সম্মুখে কেশবচন্দ্র ভবিষ্যৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। সেগুলি উল্লেখ করিবার আমরা আর প্রয়োজন মনে করি না, কেন না এ কয়েক বৎসরের ইতিহাস তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। তবে তাহার সংক্ষিপ্তভাব তৎকালের লেখার দ্বারা রক্ষা করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্যজ্ঞানে, ধর্ম্মতত্ত্ব (১লা মাঘ, ১৮০৫ শক) হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"আমাদিগের আচার্য্য সুদূর ভবিষ্যতের মধ্যে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া কি কি বলিয়াছেন, পৃথিবীর নিকটে জ্ঞাপন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি জানিতেন, তিনি যে ধর্ম্ম জগতের নিকটে প্রচার করিলেন, পৃথিবী এখনও তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। যদি দশ সহস্র বর্ষে পৃথিবী তাহা

গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি আত্মপরিশ্রম সফল মনে করেন। বর্ত্তমানে এ ধর্ম্মের মধ্যে বিমিশ্র ভাব প্রবেশ করিবে, তিনি তাহা সময়ের লক্ষণ দর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলেন। এই বিমিশ্র ধর্ম্ম সমুদায় পৃথিবীকে অনায়াসে আত্মকরস্থ-করিবে, ইহাও তাঁহার জানিবার অবশেষ ছিল না। তিনি তাঁহার প্রিয় অনুযায়িবর্গকে এই বলিয়া অনুযোগ করিতেন যে, তিনি বহুবর্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া আসিয়াছেন, কেহ তাঁহার সাবধান বাক্যের প্রতি মনোভিনিবেশ করেন নাই; এখন তিনি এমন কাহাকেও দেখিতেছেন না, যিনি এই বিমিশ্র ধর্ম্মের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। এই বিমিশ্র ধর্ম্ম সকলকে গ্রাস করিবে, এই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক মনো-বেদনা। যদি ঈশ্বরের প্রতি অণুমাত্র কোন বিষয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়, তবে তিনি বিমিশ্র ধর্ম্মে নিপতিত হইলেন, এই তাঁহার মত। কোন সময়ে এক জন বন্ধু হিমালয় শিখরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিশ্বাস কি, বুঝাইয়া দিন। তিনি সম্মুখস্থ অত্যুচ্চ বৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, এই বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় উত্থান করিয়া ঝম্পদানের নাম বিশ্বাস। এ কথা সামান্য কথা নহে। বিশ্বাস সদা নির্ভীক, বহু ভয়ের কারণের মধ্যেও ভয়শূন্য। সে কেবল প্রভুর দিকে তাকাইয়া থাকে। যাহা তাঁহার মুখে শুনে, নির্ভয়ে তাহা সম্পাদন করে। সে কি প্রকারে তাহার প্রভুর আদেশ পালন করিবে, সে বিষয়ে একবারও ভাবে না। আচার্য্য মহাশয় এই জন্যই সর্ব্বদা দুঃসাহসিক কার্য্যসকলেতে হস্তক্ষেপ করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম গণনার ধর্ম্ম ছিল না। তিনি আশ্বস্তমনে সর্ব্বদা আপনার পরম মাতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। যখন হাতে এক কপর্দ্দক নাই, তখন মার আদেশে বহুসহস্রমুদ্রাব্যয়সাধ্য কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিতেন। তিনি কতবার এরূপ কার্য্য করিয়াছেন, এবারও হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবদেবালয়নির্ম্মাণকার্য্যে সেই ভাবেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বাস তাঁহার জীবনের সার ধন ছিল। তিনি তাঁহার মাকে যেমন বিশ্বাস করিতেন, এমন আর কে করিবে? যে ব্যক্তি তেমন বিশ্বাস না করিবে, সে তাঁহারই বা হইবে কি প্রকারে? এই জন্য যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন, পৃথিবী এখন আমাকে গ্রহণ করিতেছে না; যাহারা ধর্ম্মের সঙ্গে পৃথিবীর গণনার শাস্ত্র

মিশাইয়া দিবে, এখন তাহাদিগেরই রাজত্ব। যখন সময় আসিবে, তখন তাঁহাকে গ্রহণ করিবে এবং গ্রহণ যে করিবেই, তদ্বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

"আচার্য্য মহাশয় বিশ্বাসবিবৃতি (Ture Faith) প্রচার দ্বারা জীবন আরম্ভ করিলেন, সংহিতা ও যোগ শিখাইয়া ইহলোকের দৃশ্যমান জীবন শেষ করিলেন। তিনি ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, এখনও আমার দেবার ও বলিবার অনেক আছে ; কিন্তু থাকিলে কি হয়, পৃথিবী তাহা গ্রহণে অনুপযুক্ত বলিয়া, সে সমুদায় তিনি পবিত্রাত্মার হস্তে রাখিয়া তিরোহিত হইলেন। যাইবার বেলা প্রফুল্ল ঈষদ্ধাস্যযুক্ত মুখকমল দ্বারা, রোগ, শোক, মৃত্যু কিছুই নয়, এই শুভ সংবাদ পৃথিবীকে দিয়া গেলেন। এখন আমরা তাঁহাকে আমাদিগের মধ্যে গ্রহণ করিব, না, বিমিশ্রধর্ম্মের পতাকার নিম্নে মস্তক রাখিয়া আমাদিগের নিজ নিজ জীবন নরকের প্রশস্ত মুখে নিঃক্ষেপ করিব ? ভাবী জীবন আমাদিগের এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবে। আমরা নববিধানের পূর্ণ ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য শোণিতের এক এক বিন্দু অর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প, ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হউন *।"

হলদীবাড়ীর নাগা সাধুর কথা

কুচবিহারের অন্তর্গত হলদীবাড়ীতে ব্রহ্মস্বরূপনামা এক জন নাগা সাধু, বহুবর্ষ হইল, বাস করিতেছিলেন। তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে দেখেন নাই, অথচ তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কি প্রকার অধ্যাত্মযোগ ছিল, তৎকালে লিখিত বিশ্বস্ত বন্ধুর পত্র (১৮০৫ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য) হইতে সকলে তাহা অবগত হইবেন :—"৬ই জানুয়ারী (১৮৮৪ খৃঃ) সন্ধ্যাকালে তাঁহার কুটীরের সম্মুখে কদম্ববৃক্ষমূলে চৌতরার উপরে উপবিষ্ট হইয়া, কতকক্ষণ হরিগুণ গান করিতে করিতে, শোকে অভিভূত হইয়া এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, 'আমি এখন বাহির বাড়ী হইতে ভিতর বাড়ী

---

* বন্ধুগণের দোষদর্শনসত্ত্বেও তাঁহাদিগের দেবনিঃশ্বসিতে যে তাঁহার আস্থা যায় নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, নিরতিশয় যন্ত্রণাকালে একজন বন্ধুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার চিকিৎসাবিষয়ে মার কাছে কি কিছু শুনিয়াছ ?' না, এই উত্তর দিলে বলিয়া উঠিলেন, 'মা, এই বার হাতী দঁকে পড়িয়াছে।' পরে যোগাবস্থায় বলিতে লাগিলেন, 'মা শাক্যজননী, নির্ব্বাণ দাও, নির্ব্বাণ দাও।'

যাইব, মার কাছে যাইব। বড় ভয় হইয়াছে। জগতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এই সময়ে কলিকাতার লোকে অনেক করিয়া চাউল খরিদ করে না কেন?' তার পরেই বলিলেন, 'কেশববাবু কেমন আছেন?' (কেশব বাবুর পীড়ার সংবাদ তিনি কিছুই জানিতেন না) আমি বলিলাম, তিনি কলিকাতার বাড়ীতে অত্যন্ত পীড়িত আছেন। তিনি বলিলেন, 'তাঁহার সহিত এখানে আমার সাক্ষাৎ হইল না, সময়ান্তরে অবস্থান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।' এই বলিয়া হো হো করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। আমি বলিলাম, আমি কলিকাতায় আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব এবং কেশব বাবুকে দেখাইব। তিনি বলিলেন, 'কলিকাতায় যাওয়ার হুকুম নাই।' এই বলিয়া ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া চীৎকাররবে কাঁদিতে লাগিলেন এবং বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ৬।৭ বৎসরের মধ্যে আমি তাঁহাকে এরূপ শোকাকুল কখনও দেখি নাই। সে দিবস কিছু আহার করিলেন না। কিছু দুগ্ধপান করুন, বলায় বলিলেন, 'মা ভিতরে ডাকিতেছেন, তথায় গিয়াই দুগ্ধ পান করিব।' এই বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'ঐ দেখ, মা কেমন ক্রোড়ে লইয়া দুগ্ধ পান করাইতেছেন!' ৭ তারিখ (জানুয়ারী) আমাকে প্রয়োজনবশতঃ মেখলীগঞ্জ আসিতে হইয়াছিল। ঐ দিবস বলিয়াছিলেন, 'কলিকাতার লোক বড় নির্ব্বোধ। এক দল পাজী আছে, বড় শক্ত শক্ত পাজী। জগৎ বার বার ভক্তকে অপমান করিয়া আসিতেছে।' কেহ যদি ঐ দিবস বলিত, ঐ কলিকাতার গাড়ী আসিতেছে, অমনি হু হু করিয়া কাঁদিতেন। আমাকে বলিলেন, 'মা আমাকে স্থানান্তরে যাইতে বলিয়াছেন, আর হলদীবাড়ীতে থাকিব না। মাকে (আমার পত্নীকে) প্রণাম জানাইও, আমি বিদায় হইলাম।' পর দিবস (৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪ খৃঃ) বেলা আন্দাজ ১০টার সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন।"

'সুসংবাদলিপিকরের' অনুতাপ ও আচার্য্যচরিত্রের স্বর্গীয় ভাব বর্ণন

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর 'সুসংবাদ-লিপিকর' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা এস্থলে (১৮০৫ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে) উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"হে স্বর্গস্থা জননীর হৃদয়বিহারী আচার্য্য, তুমি দেহত্যাগ করিয়া তোমার মার কোলে এখন সুখে বিচরণ করিতেছ; কিন্তু

তুমি আমাদিগকে দুর্বিষহ শোক দুঃখ তাপে নিক্ষেপ করিয়া গেলে। তুমি স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে আমাদিগের সম্পর্কে যাহা বলিয়া ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেলে, তাহা স্মরণ করিয়া তীব্র শোকানলে আমাদিগের প্রাণ দগ্ধ হইতেছে। আমাদিগের বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা, পবিত্রতা ও যোগের অভাবদর্শনে তুমি দারুণ দুঃখ-শেলবিদ্ধ হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলে। ভয়ানক রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তুমি আমাদিগের কল্যাণ কামনা করিতে ক্ষান্ত হইলে না। গত ১লা বৈশাখ (১৮০৫ শক) নববর্ষোপলক্ষে তুমি প্রেরিতদিগের প্রতি তোমার স্বর্গস্থ প্রভুর যে আদেশ ঘোষণা করিলে, আমাদিগের জীবনে তাহা পালিত হইল না দেখিয়া, তুমি বিষম দুঃখ যাতনা সহ্য করিলে। আমরা ঈশ্বরপ্রদত্ত বৈরাগ্যব্রত, প্রেমব্রত ভঙ্গ করিয়া, তোমার কোমল হৃদয়কে ভয়ানক আঘাত করিয়াছি। এই গুরু অপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না হইলে, আর আমাদিগের শান্তি নাই। তুমি পৃথিবী ছাড়িবার পূর্ব্বে আমাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া গেলে, আজীবন তোমার ও তোমার প্রভু-প্রদত্ত এই ব্রত-পালন ভিন্ন আমাদিগের কলঙ্কমোচনের অন্য উপায় নাই। এই জন্য আমরা ব্যাকুলিতচিত্তে তোমার স্বর্গস্থা সর্ব্বসাক্ষিণী মার সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমরা যত দিন পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন এই ব্রত পালন করিতে করিতে শেষ রক্তবিন্দু পর্যান্ত ক্ষয় করিব। প্রাণান্তেও বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা, পবিত্রতা, যোগ পরিত্যাগ করিব না। তোমার জীবন, তোমার চরিত্র এ সমস্ত স্বর্গীয় ভাবের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

"(১) জীবন্ত বৈরাগ্য স্থাপন করিবার জন্য তুমি এখানে আসিয়াছিলে; তুমি ঐহিক সুখকে মহাপাপ জানিয়া ঘৃণা করিতে। তুমি তোমার নিজের জন্য কিম্বা তোমার ক্ষুদ্র পরিবারের জন্য ধন সংগ্রহ করা পাপ মনে করিতে। ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সুখস্পৃহাকে তুমি নরহত্যা, নারীহত্যার ন্যায় গুরুতর পাপ মনে করিতে। আত্মেচ্ছা বিনাশ করিয়া, তুমি কেবল তোমার স্বর্গস্থ প্রভুর ইচ্ছা-পালনার্থ, সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য, জীবনের কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ, সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ। তোমার স্বার্থ ছিল না, কেবল প্রভুর মহিমা মহীয়ান্ করিবার জন্যই তুমি জীবন ধারণ করিতে। আহার, পরিচ্ছদ, ব্যবহারে তোমার বৈরাগ্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইত।

পলান্ন পরিত্যাগ করিয়া তুমি শাকান্ন ভোজন করিতে রুচি প্রকাশ করিতে। উৎকট রোগের অবস্থাতেও তুমি সুস্বাদু বেদানা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া মুড়ি খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ; স্বর্ণথালা তুচ্ছ করিয়া তুমি কদলীপত্রে আহার করিতে; রৌপ্যময় ঘটির পরিবর্ত্তে তুমি ক্ষুদ্র মাটীর ঘটিতে জলপান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে; বহুমূল্য জরির শাল উপেক্ষা করিয়া তুমি গৈরিক বসনে আপনাকে আচ্ছাদিত দেখিতে ভালবাসিতে; ইউরোপীয় সভ্যতা ও সুরুচি অনুসারে সুসজ্জিত হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতলগৃহে দরিদ্র যোগকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তুমি যোগ সাধন করিতে; তোমার প্রিয়তম, অন্তরতম বৈরাগ্যকে তুমি প্রাণের মধ্যে পোষণ ও বর্দ্ধন করিতে, লোককে দেখাইতে না; বরং সভ্যতা সামাজিক সৌজন্য দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিতে। তুমি তোমার চরিত্র ও উপদেশাদি দ্বারা তোমার স্বর্গস্থ পিতা, সর্ব্বত্যাগী পরম বৈরাগী ঈশ্বরকে প্রকাশ করিয়া, জগতে বৈরাগ্যের পূর্ণ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছ।

"(২) দ্বিতীয়তঃ তোমার প্রেম তোমার ভয়ানক শত্রুদিগকেও পরাস্ত করিত। তোমার শত্রুরাও মুক্তকণ্ঠে বলিত, উঁহার কাছে বসিলে, উঁহার সুমিষ্ট প্রেমার্দ্র হৃদয়ের কথা শুনিলে, আর মনের মধ্যে উঁহার প্রতি কোন অসদ্ভাব থাকিতে পারে না। তোমার হৃদয় ক্ষমার অতীত স্থানে অর্থাৎ নিত্য প্রেমে বসতি করিত। তোমার প্রেমের শাস্ত্র এত উচ্চ যে, তাহাতে ক্ষমাও পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ক্রোধ বা বিরক্তি-সম্বরণের নাম ক্ষমা; কিন্তু তুমি বলিতে, অপরের দোষ-দর্শনে বিরক্তি বা ক্রুদ্ধ হওয়া পাপ। শান্তভাবে প্রেমার্দ্রহৃদয়ে পাপীর পাপ-মোচনের জন্য প্রার্থনাই তোমার শাস্ত্র ও জীবন। এই প্রেমের শাসন ভিন্ন তুমি অন্য শাসন জানিতে না। তুমি তোমার আশ্রিতগণের নিতান্ত গর্হিত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, ক্রোধ, বিলাসিতা, মূঢ়তা, অহঙ্কার, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি দেখিয়াও, তাহাদিগকে দূর করিয়া দাও নাই; বরং বিশেষ ব্যাকুল ও দয়ার্দ্র হইয়া, আজীবন বিধিমতে তাহাদিগকে সংশোধন করিতে যত্ন করিয়াছ। তোমার এই প্রেমধর্ম্ম নিশ্চয়ই জয়লাভ করিয়াছে। তোমার স্বর্গস্থ পিতার মুক্তিপ্রদ প্রেমই তোমার প্রেম।

"(৩) সকল ধর্ম্ম ও সমুদায় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের সামঞ্জস্য করিয়া, তুমি জগতে

আশ্চর্য্য স্বর্গীয় উদারতার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিলে। তুমি প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছ ও কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হও নাই। অধিক কি, তুমি জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যেও জগদ্গুরু ঈশ্বরের জ্ঞান ও সত্য উপলব্ধি করিতে।

"(৪) পূর্ণ পবিত্রতা তোমার ধর্ম্ম, কোন প্রকার অপবিত্রতা তুমি সহ্য করিতে পারিতে না। অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারকে তুমি ঘৃণা করিতে। অপবিত্র দৃষ্টি, অপবিত্র আলাপ, অপবিত্র ব্যবহারকে তুমি তোমার জ্বলন্ত পুণ্যানলে দগ্ধ করিতে। পবিত্রাত্মার স্পষ্ট আদেশ ভিন্ন স্ত্রীপুরুষের একত্র উপবেশন, কি কথোপকথনকে তুমি পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতে; এবং স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি অবৈধ আসক্তিকে তুমি ভয়ানক নরকাগ্নি মনে করিতে। তোমার এই পবিত্রতাই তোমার প্রাণসিংহাসনস্থ পবিত্রাত্মা ধর্ম্মরাজের প্রবেশ করিবার একমাত্র দ্বার।

"(৫) হে মহাযোগী, বিষয়ান্ধ লোকেরা তোমাকে ঘোর সংসারী মনে করিত; কিন্তু তুমি সংসারে আসিয়াও স্বর্গবাসী ছিলে, কায়স্থ থাকিয়াও ব্রহ্মস্থ ছিলে। পরিবার ও বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে একটী সুখী বৈরাগী পরিবার গঠন করা তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও ব্রত ছিল। সম্পদে, বিপদে, সুখে, সুস্থতায় ও রোগে, যোগেশ্বর প্রাণেশ্বরের সঙ্গে তোমার যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। ভয়ঙ্কর পীড়া-যন্ত্রণা তোমার যোগভঙ্গ করে নাই; মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি তোমার যোগের মহা জয় দেখাইয়া গেলে। কে বলে, তুমি অচেতন হইয়াছিলে? তুমি মহাযোগ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলে। তোমার চৈতন্য না থাকিলে, প্রাণত্যাগের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তুমি সঙ্গীত ও ব্রহ্মস্তোত্রে যোগদান করিতে পারিতে না। তুমি বিষম যন্ত্রণার মধ্যেও কেবল 'বাবা' 'মা' এই সম্বোধন ভিন্ন আর কিছুই করিতে না। তুমি তোমার পিতা যোগেশ্বর, তোমার মাতা যোগেশ্বরীর প্রাণের মধ্যে বিহার করিয়া, ভয়ানক মৃত্যু বিষাদের মধ্যেও হাসিয়াছ। নিঃশ্বাসবায়ুপ্রয়াণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তোমার চক্ষুদ্বয়ের আশ্চর্য্য ঔজ্জ্বল্য ও স্থির গম্ভীর দৃষ্টি ও মুখমণ্ডলের স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন, প্রশান্ত প্রফুল্ল ঈষদ্ধাস্য তোমার অন্তরের নিগূঢ়তম যোগ, তোমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ, ব্রহ্মস্পর্শ ও বৈকুণ্ঠদর্শনের সাক্ষ্যদান করিয়াছে। এই যোগভ্রষ্ট অযোগী

কুযোগী জগৎকে যোগবলে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছিলে; তোমার জীবনের কার্য্য সকল সফল হইয়াছে, তুমি ভয়ানক রোগ ও মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও তোমার মা আনন্দময়ীকে দেখিয়া হাসিয়াছ; মৃত্যুকে জয় করিয়াছ। ঘোর দুঃখ বিষাদের মধ্যে যোগানন্দরস আস্বাদন করিয়াছ। আমরা যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন জগতের নিকট এই 'সুসংবাদ' প্রচার করিব।"

আচার্য্যসমাগম

৩০শে পৌষ, ১৮০৫ শক (১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ খৃঃ), রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যসমাগম হয়। কি ভাবে সমাগম হয়, তৎপ্রদর্শনজন্য আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব (১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০৫ শক) হইতে 'আচার্য্যসমাগম' উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"হে স্নেহময়ী জননী, তুমি তোমার সন্তানকে তোমার বক্ষে তুলিয়া লইলে, এখন আর আমরা এ পৃথিবীতে তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিতে পাইব না। তাঁহাকে দেখিতে হইলেই, আমাদিগকে তোমার নিকটে আসিতে হইবে, তোমার বক্ষে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। কোথায় পূর্ব্বকালে লোকেরা সন্তানের মধ্য দিয়া তোমায় দেখিত, এ যুগে তুমি তাহার বিপরীত করিলে। কেহ তোমার মধ্য দিয়া ভিন্ন তোমার সন্তানকে যে আর দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে না। মাতঃ, আমরা আমাদিগের আচার্য্যের নিকটে আমাদের মনের কথা বলিব। তুমি তোমার বক্ষে সন্তানকে লইয়া প্রকাশিত হও। তোমার মধ্য দিয়া আমরা তোমার সন্তানকে সম্মুখীন করি, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া আমাদিগের যাহা বলিবার বলি।

"হে মাতৃবক্ষবিহারী আচার্য্য, আমরা অপরাধী হইয়া আজ তোমার নিকটে দণ্ডায়মান। আমাদিগের অপরাধ তুমি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছ, আমরা সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সংশয় করিতে পারি না *। তুমি রোগ-

---

* Asceticism has not taken root.

Decline of inspiration and apostolic spirit among missionaries.

Decay of true brotherhood and forgiveness; growth of proud and selfish individuality.

Neglect of yoga.

Want of harmony of characters.

শয্যায় শয়ান থাকিয়া আমাদিগের অপরাধের জন্য শোক করিতে, এ কর্ণ তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছে। তোমার মাতার নিকটে আদেশ পাইয়া, তুমি আমাদিগের নিকটে যাহা প্রচার করিলে, আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিলাম। তুমি লিখিয়া গেলে যে, আমাদিগের বৈরাগ্য হয় নাই। আমরা এ অপরাধ মস্তক নত করিয়া স্বীকার করিতেছি। আমরা বিষয় ছাড়িয়া ধর্ম্মরাজ্যে আসিলাম, কিন্তু বিষয়াসক্তি আমরা ছাড়িলাম না। আমাদিগের আহার ব্যবহার পরিচ্ছদ সকলেতেই বিষয়াসক্তির গন্ধ তুমি নিরন্তর পাইতে এবং সে জন্য যে তোমার কত ক্লেশ হইত, তাহা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তুমি বলিলে, কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, আমরা চিন্তা করিয়া করিয়া জীবন হারাইলাম। তুমি আমাদিগের মধ্যে বিষয়বাণিজ্যের উপক্রম দেখিয়া কত শোক প্রকাশ করিলে, তোমার দুর্বিষহ রোগযন্ত্রণা অপেক্ষা সে যন্ত্রণা আরো অবিষহ্য ছিল; মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, আমরা তোমার রোগের কারণ হইলাম। সে কালে এক জন জুডাস স্কেরিয়ট ছিল, এবার যে তোমার সম্বন্ধে আমরা সকলেই জুডাস স্কেরিয়ট হইলাম। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? আমরা অনুতাপ করিয়া পাপ স্বীকার করিতেছি, ক্ষমা কর। না, ক্ষমা কর, বলিতে পারি না। তোমার শাস্ত্র যে অতি তীব্র, তুমি ক্ষমা মান না। তুমি আবার ক্ষমা করিবে কি? তুমি কি আমাদিগের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছ যে, ক্ষমা করিবে? তোমার হৃদয়ে অপরিসীম স্নেহ, নৈলে তুমি মাতৃক্রোড়ে লুকাইবার পূর্ব্বে আমাদিগের দোষগুলি লিখিয়া রাখিয়া গেলে কেন? আমরা আমাদিগের দোষ অপরাধ জানিয়া শোধনে প্রবৃত্ত হইব, এই জন্য কি নয়? তুমি বলিলে, আর আমরা তেমন দেবনিঃশ্বসিত গ্রহণ করি না। এখন আমরা আমাদিগের বুদ্ধির দাস হইয়াছি। এখন আমরা নিজ নিজ বুদ্ধির কথা শুনিয়া চলি। বুদ্ধির কথা শুনিয়া চলি বলিয়াই, আমাদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের অহঙ্কৃত স্বার্থপর ব্যক্তিত্ব প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। তুমি তোমার বন্ধুজনকে বলিয়াছ, আমরা স্বর্গের মনোনীত লোক হইয়াও, এক অহঙ্কারে পতিত হইয়াছি। অহঙ্কারী স্বার্থপর আত্মপরায়ণ লোকেরা দেবনিঃশ্বসিত গ্রহণ করিবে কি প্রকারে? হে আচার্য্য, আমরা অপরাধ স্বীকার করিতেছি, এবং যাহাতে দেবনিঃশ্বসিত আমাদিগের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করে, অভিমান

অহঙ্কার স্বার্থপরতা ব্যক্তিত্ব বিদায় করিয়া দিয়া নত হই, তজ্জন্য নিরন্তর তোমার মাতার নিকটে প্রার্থনা করি। আমরা যোগী হইলাম না, এ তোমার বড়ই দুঃখ। তুমি রোগশয্যায় পড়িয়া ঘোর রোগযন্ত্রণার মধ্যে যোগানন্দ সম্ভোগ করিতে, সে যোগানন্দ তোমার নিকটস্থ প্রাণের বন্ধুগণ গ্রহণ করে, এতো তোমার স্বভাবতই ইচ্ছা হইতে পারে। এইটি আমরা গ্রহণ করিলাম না, তাই তুমি বলিলে, আমার রোগের চিকিৎসা তোমরা করিলে না। আমরা ইহার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিলাম না, যথার্থ চিকিৎসাও করিলাম না। এ অপরাধ-কলঙ্ক আমাদিগের চিরদিন থাকিয়া যাইবে। কে যে কি দিয়া আমাদিগের কলঙ্ক পুঁছিয়া ফেলিবে, আমরা জানি না। এই জানি, যদি আমরা তোমার বৈরাগ্য উদারতা পবিত্রতা ও যোগ গ্রহণ করিতে পারি, জীবনে আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদিগের জীবনে কথঞ্চিৎ নিষ্ক্রয় হয়। আমরা এই সকল গ্রহণ করিলাম না বলিয়া, আমাদিগের চরিত্রের সামঞ্জস্য তুমি দেখিতে পাইলে না। আমরা তোমার প্রদর্শিত পথে চলিলাম না, তাই আমাদিগকে কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া তোমার নিকটে দাঁড়াইতে হইল, এবং তুমি যাইবার বেলা আমাদিগের কলঙ্ক জগতের নিকটে বিদিত করিলে। সাধু ভাই অঘোরনাথ তোমার অগ্রে গমন করিলেন, তুমি তাঁহাকে নিজ হাতে সাধুর সিংহাসনে বসাইলে, আর আজ আমরা কলঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান। আজ অনুতপ্তহৃদয়ে তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এ দেহের এক এক বিন্দু শোণিত দিয়া এই কলঙ্ক ধুইয়া ফেলিব। যদি বৈরাগ্যের তীব্রাঘাতে এ দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, তবু বৈরাগ্যকে মস্তকের শিরোভূষণ করিয়া রাখিব। আজ বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া দেবনিঃশ্বসিত মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি, ইনি আসিয়া আমাদিগের ভগ্ন অস্থি সকল মৃতসঞ্জীবন-মন্ত্রে যোড়াইয়া দিন। আমরা দেবনিঃশ্বসিতের নিকটে আর বুদ্ধিকে বড় করিব না, আমরা অহঙ্কারে স্বার্থে অন্ধ হইয়া তোমার মাতার গৃহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আনয়ন করিব না। আমরা দৃঢ়ব্রত হইয়া তোমার প্রদত্ত বৈরাগ্যব্রত, প্রেম-ব্রত, উদারতাব্রত, এবং পবিত্রতাব্রত গ্রহণ করিব ; তোমার মাতা আমাদিগের সহায় হউন। মাতার ক্রোড়ে বসিয়া যেন তোমায়, আমরা ব্রতধারী হইলাম না বলিয়া, শোক করিতে না হয়। এখানে আমরা তোমার শোকের কারণ

হইলাম ; আনন্দময়ীর গৃহে কোথায় তুমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসম্ভোগ করিবে, না, আমাদিগের জন্য তোমায় রোদন করিতে হইবে, ইহা যেন কখন না হয়। তোমার আনন্দময়ী মা যেন আমাদিগের চিত্তপরিবর্ত্তনের সংবাদ দিয়া তোমায় সুখী করিতে পারেন।

"হে আচার্য্য, তুমি যাইবার বেলা পৃথিবীতে যে শুভসংবাদ রাখিয়া গেলে, ইহা যেন আমরা সিংহবলে জগতের নিকটে প্রচার করিতে পারি। তুমি যে বিধান স্থাপন করিতে আসিলে, এ বিধান যে পবিত্রাত্মার বিধান, আনন্দের বিধান। তুমি জগৎকে দেখাইলে, রোগের অবিষহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দময়ীর সন্তান কেমন যোগানন্দে হাসেন, ও জগতের দুঃখে কাঁদেন। তোমার শেষ রোগযন্ত্রণা কি তীব্র, আমরা বলিয়া উঠিতে পারি না। তুমি যদি দুর্ব্বল ধাতুর লোক. হইতে, তবে মনে করিতাম, এ যন্ত্রণা অপরের রোগযন্ত্রণার অনুরূপ। তুমি প্রথম বয়সে যে তীব্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলে, তাহাতে তোমার যে বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কাহার না মনে আছে ? তুমি প্রফুল্লমুখে কত বার শস্ত্রচ্ছেদ বহন করিলে ; এমন কি তীব্র ঔষধের যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইলে, তবু 'উঃ' এই শব্দ মুখে উচ্চারণ করিলে না। তোমার সে ক্ষত দেখিয়া অপরে মূর্চ্ছিত হইত, কিন্তু তুমি বসিয়া হাসিতে। তোমার জীবন নিরন্তর প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্যই কি মার সব লীলা ? তুমি বলিতে, অন্যত্র কপটতা পাপ, কিন্তু যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য কপটতা ধর্ম্মমধ্যে গণ্য। তুমি অন্তরে বাহিরে নিরন্তর মাকে দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে, অথচ লোকে তোমায় সাধারণ মানুষের মতন দেখিত। তোমার বৈরাগ্য অতিশয় তীব্র, অথচ লোকে তোমায় অট্টালিকায় সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থিত জানিয়া ঘোর বিষয়ী বলিয়া মনে করিত। এই যে আর একদিন তোমার অনুবর্ত্তিনী ধর্ম্মপত্নী, এই বলিয়া তাঁহার বন্ধুগণের নিকটে হৃদয়ের আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন যে, তোমায় শত সুখাদ্য দ্রব্য দিলে, তুমি তাহা স্পর্শ না করিয়া আহ্লাদের সহিত কেবল শাকান্ন খাইতে ; বড় অনুরোধ করিলে, সে সকল সামগ্রী অঙ্গুলী দ্বারা এক বার রসনায় সংযুক্ত করিতে মাত্র। তুমি রোগশয্যায় বেদানা প্রভৃতিতে বীতরাগপ্রদর্শন করিয়াছিলে, কেবল গরিবের সেব্য মুড়ীর প্রতি তোমার অনুরাগ ছিল। তোমার বৈরাগ্য তোমার ধর্ম্ম-

বন্ধুগণ বুঝিতে পারিলেন না বলিয়া, তোমার মনে কষ্ট ছিল, এবং এই জন্য তোমার পত্নী এক দিন রোগদৌর্ব্বল্যসময়ে তোমার গাত্রাবরণের বন্ধনী আঁটিয়া দেওয়ার বেলা তুমি বলিয়াছিলে, এই এখনি পাড়ায় কথা উঠিবে যে, উনিও তো স্ত্রীর বশ। তুমি যে বৈরাগ্যের তীব্রবাণে তোমার পত্নীকে ঘাল করিয়া ফেলিয়াছিলে, বল, তাহা কে না জানে? তোমার মা তোমাকে সর্ব্বদা আবরণে আবৃত রাখিয়া লোকদৃষ্টির বহির্ভূত রাখিবেন, তাই তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইবার বেলা, তোমাকে অসহ্য রোগযন্ত্রণা দিয়া, অপরের চক্ষুর নিকটে তাঁহার স্নেহ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। দুষ্ট পৃথিবী শেষে তাঁকে পক্ষপাতী বলে, এই জন্য বুঝি, তাঁহার সন্তানদিগকে লইয়া তিনি এই প্রকার লীলা করেন। যদি তুমি প্রথমে বীরত্ব না দেখাইতে, তাহা হইলে এই অষ্টাহব্যাপী তীব্র যাতনাকে আমরা লঘু মনে করিতাম। তীব্র যাতনারূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া, তোমার মা তোমায় আনন্দসুধাপান করাইতেন, প্রথমে তো আমরা বুঝিতে পারি নাই। সংশয়ী মন এই বলিয়া সংশয়াপন্ন ছিল, এক জন সাধারণ ব্রাহ্মও পরলোকে যাইবার বেলা কত ভাল কথা বলিয়া যায়, তোমার মা তোমাকে অবসরও দিলেন না। তুমি সংহিতা লিখিয়া, সংহিতানুসারে সংসারের সব কথা ছাড়িয়া, আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলে জানি; তুমি সাধু অঘোরনাথের স্বর্গগমনকালে মৌনাবলম্বন * লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলে, যোগিগণের প্রয়াণকালের এইরূপই ভাব বটে, কিন্তু জগতের লোকের নিকট তোমার অচেতনত্বের অপবাদ তো কিছুতেই ঘুচিল না। তুমি সঙ্গীতে স্তোত্রে শেষ পর্য্যন্ত শ্বাসাগমকাল পর্য্যন্ত যোগ দিয়াছিলে সত্য, কিন্তু তোমার মুখের

---

* মৌনাবলম্বন করিবার পূর্ব্বে যখন তিনি ঘোর যন্ত্রণায় অস্থির, তখন সঙ্গীতাচার্য্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল সঙ্গীত করেন। সঙ্গীতান্তে তিনি তাঁহার গলদেশ ধারণ করিয়া বলিলেন, 'এই আজ তোমার সঙ্গীত শুনিলাম, আর এখানে নয়, স্বর্গধামে তোমার সঙ্গীত শুনিব।' ভাই অমৃতলাল বসুর গলা ধরিয়া বলেন, 'ভাই, দেবালয়ের বেদী ও সম্মুখভাগ মার্ব্বলপ্রস্তর দ্বারা বান্ধিয়া দিও।' শ্রীমান্ কৃষ্ণবিহারী সেন রাজনিয়োগে বিদেশে ছিলেন, তাঁহার নিকটে শেষ বিদায় লইবার জন্য কলিকাতায় আসেন। প্রিয় কনিষ্ঠ আসিয়াছেন, জানিতে পারিয়া তাঁহার গলদেশ ধরিয়া বলেন, 'তুমি আমায় বড় ভালবাস।' তাঁহার প্রয়াণকালে পঞ্চ পুত্র, পঞ্চ কন্যা, এক পৌত্র, এক দৌহিত্র, এক দৌহিত্রী ও জামাতৃদ্বয় উপস্থিত ছিলেন।

কথা না শুনিয়া যে সকলেই সন্দিগ্ধ ছিল। তুমি লোক দেখান ঘৃণা করিতে, স্বভাবের সন্তান, নৈলে অনেক অলৌকিকত্ব জগৎকে দেখাইতে পারিতে। কিন্তু তুমি তোমার ভিতরের আনন্দ শান্তি তীব্র যাতনার দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াও জগৎকে বঞ্চিত করিতে পারিলে না। তোমার প্রাণবায়ুনির্গমের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখকমল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, চক্ষু দিব্যজ্যোতি ধারণ করিল, ওষ্ঠাধরে আনন্দহাস্য প্রকাশ পাইল, পার্শ্বস্থ লোকদিগকে চকিত করিল। মুহূর্ত্তে কি পরিবর্ত্তন! সে রোগের চিহ্ন কোথায়? এ আনন্দের হাসি, প্রফুল্ল কমলসদৃশ মুখশ্রী, জ্যোতির্ম্ময় নেত্র কোথা হইতে আসিল? তুমি যাইবার বেলা, তোমার মুখপদ্মের দিব্যভাবে জগতের নিকটে যে শুভসংবাদ প্রচার করিয়া গেলে, মৃত্যুকে, রোগকে, যন্ত্রণাকে কি প্রকারে জয় করিতে হয়, দেখাইয়া গেলে, উহাই আমাদিগের প্রচারের বিষয় হইয়া রহিল। আমাদিগের কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, তোমার যাতনার সমভাগী হইয়া, জগতের নিকটে জীবনের দ্বারা এই শুভসংবাদ সপ্রমাণিত করিয়া যাইতে পারিব? যাহা, মা আনন্দময়ী, তোমার মনে আছে, তাহাই হইবে; আমরা সে সম্বন্ধে কিছু অভিলাষ করিতে চাই না।

"হে মাতঃ আনন্দময়ী, এতক্ষণ তোমার সন্তানকে সম্মুখে রাখিলে, এখন আবার তুমি তাঁহাকে তোমার বক্ষের ভিতরে লুক্কায়িত কর। তোমার বক্ষের ধন তোমার বক্ষে রাখিয়া আমরা নিবৃত্ত হই। আমাদিগের পাপ অপরাধের জন্য তোমার ধন তুমি প্রতিগ্রহণ করিলে ভাল, কিন্তু দেখিও, যেন আমরা আমাদিগের জীবনের আনুগত্য দ্বারা আমাদের সে সমুদায় অপরাধ ধৌত করিয়া ফেলিতে পারি। হে মাতঃ, তুমি এই বিষয়ে আমাদিগের সহায় হও, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।"

২৯

কেশবচন্দ্রের মহত্ত্বস্বীকার *

মহারাজ্ঞী

কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনের নিকট লর্ড রিপণ সাম্রাজ্ঞীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন :—

"গভর্ণমেণ্ট হাউস,
বারাকপুর, ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮৪

"মহাশয়,

অদ্য প্রাতঃকালে ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম, তিনি আমাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, আপনি সার হেন্‌রী পন্‌সন্‌বীকে আপনার পিতৃবিয়োগ-সংবাদ তারযোগে প্রদান করিয়াছেন, উহা মহারাণী সাম্রাজ্ঞীকে জ্ঞাপন করা হইয়াছে, এবং তিনি আপনাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন যে, মহারাণী এই সংবাদে ব্যথিত হইয়াছেন, এবং আপনাদের পরিবারের এই গুরুতর ক্ষতিতে তিনি শোক ও সহানুভূতি জানাইয়াছেন। আপনি এবং আপনার পরিবারবর্গ মহারাণীর এই সদয় সহানুভূতি সাদরে গ্রহণ করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই।

মহাশয় আপনার বিশ্বস্ত
রিপণ।"

গভর্ণর জেনারেল

"গভর্ণমেণ্ট হাউস,
কলিকাতা, ১০ই জানুয়ারী, ১৮৮৪

"প্রিয় মহাশয়,

আপনার গত কল্যকার পত্র লর্ড রিপণকে প্রদর্শন করিয়াছি, তিনি আপনাকে জানাইতে অনুমতি করিলেন যে, তিনি আপনার পিতৃ-বিয়োগ-সংবাদে

* এ অংশে যতগুলি অনুবাদ প্রকাশিত হইল, তাহা ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ কৃত।

অতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন। লাট বাহাদুর তাঁহাকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিতেন না, কিন্তু অনেকবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে প্রসঙ্গ করিয়া তিনি সুখী হইয়াছেন। তিনি মনে করেন, এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভাব সমুদায় ভারতবর্ষ অনুভব করিবে।

আপনার বিশ্বস্ত

এইচ, ডব্লিউ, প্রিম্‌রোজ।"

হিন্দু পেট্রিয়ট্

"একজন রাজকুমারের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন পরলোকস্থ হইয়াছেন। তিনি রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজপুত্র হন নাই, তিনি রাজ্যসূত্রে কিংবা অন্য অর্থে রাজকুমার নহেন। তিনি মানবজাতিমধ্যে রাজপুত্র ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব চিন্তারাজ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। স্বীয় বুদ্ধিবলে, সাধনবলে ও চরিত্রবলে তিনি সেই উচ্চস্থানে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যয়ন অত্যধিক ছিল না, কিন্তু প্রথম জীবনেই ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, উহাই তাঁহাকে চিন্তা ও ধ্যানের রাজ্যে উপনীত করিয়াছিল। অধ্যয়ন, আত্মকর্ষণ ও আত্মশাসন তাঁহার জীবন গঠন করিয়াছিল। জনসাধারণের জন্য জীবন উদ্‌যাপনের প্রারম্ভে তিনি যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই অত্যাশ্চর্য্য বাগ্মিতা, অসাধারণ প্ররোচনার ক্ষমতা ও মানব অন্তরের নিগূঢ় স্থানে প্রখর দৃষ্টি তাঁহাকে জনসমাজে শক্তিশালিপ্রভাববিস্তারে সমর্থ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধনে তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি আজ্ঞা করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুজ্ঞাত হইতে নহে; তিনি পরিচালিত করিতে জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু পরিচালিত হইতে নহে; তিনি পথপ্রদর্শন করিতে জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু প্রদর্শিত পথে চলিতে নয়। কাজেই তিনি প্রথম জীবনে যাঁহাদের সঙ্গে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং আপনার দল ও শ্রোতৃমণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি পরমত-অসহিষ্ণু ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার নিজ চিন্তা ও ভাবের বল ও বিশ্বাস এবং প্রত্যয়ের সাহসিকতা ছিল। অল্পতর সমালোচনার যুগে জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি ভবিষ্যদ্‌বক্তা হইতে পারিতেন।

এই লৌহযুগেও তিনি চিন্তার পরিচালকরূপে, শিক্ষকরূপে, পথপ্রদর্শকরূপে এবং দার্শনিকরূপে লোকের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন।

"কিন্তু বাবু কেশবচন্দ্র সেন কেবল ধর্ম্মসংস্কারকই নহেন। তিনি সমাজ-সংস্কারও বটেন। তিনি মদ্যপাননিবারণের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি শিক্ষারও প্রধান সহায় ছিলেন, এবং স্বীয় সমাজের ব্যয়ে বিদ্যালয়াদি পরিচালন করিতেন। তিনি সংবাদপত্রের নিকটে অতীব ঋণী ছিলেন, এবং তাহার কার্য্যকারিতাবৃদ্ধির জন্যও যত্নবান্ ছিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম সুলভ সংবাদ-পত্র করেন; বাঙ্গলা ভাষায় "সুলভ সমাচার" নামে এক পয়সা মূল্যের কাগজ তিনি বাহির করিয়াছিলেন। তিনি আলবার্ট হল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্বদেশবাসীদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য তিনি ভারতসংস্কারক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজনৈতিক বিষয় ব্যতীত স্বদেশের হিতকল্পে যে কোন অনুষ্ঠান হইত, তাহাতেই তিনি যোগ-দান করিতেন। পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রম এবং তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টার অনুরূপ যদিও তাঁহার তালিকাভুক্ত অনুগামীর সংখ্যা হয় নাই, তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, সমগ্র শিক্ষিত সমাজের উপর তিনি অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ইয়োরোপীয় ও স্বদেশীয়দের মধ্যে তিনি এক সংযোগসূত্রস্বরূপ ছিলেন। দেশের শাসনকর্ত্তারা, বিশেষতঃ লর্ড লরেন্স ও লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন। স্বদেশী সমাজের নেতৃবর্গ তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। যদিও তাঁহার সঙ্গে নেতৃবর্গের মতদ্বৈধ ছিল, তথাপি তাঁহার নম্রব্যবহার, অমায়িকতা, বৈরাগ্য এবং চরিত্রের উচ্চতা-হেতু সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না।

"সকল ব্যাপারের বিধাতা যাঁহাকে এই অল্প বয়সে তুলিয়া লইলেন, তিনি এইরূপ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে (মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর তাঁর বয়স হইয়াছিল) দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইবে না। তাঁহার সকল দিক্ দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার মত আমরা আর একটী পাইব না।"

ষ্টেট্স্‌ম্যান ও ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া

"আমরা গত কল্য প্রাতের কাগজে লিখিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রধান

নেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের অবস্থা এত সঙ্কটাপন্ন যে, সম্ভবতঃ আমাদের কাগজ পাঠকদের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইবে। অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত শান্তভাবে অত্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করিয়া, বেলা দশটা দশ মিনিটের সময় আচার্য্য মহানিদ্রায় আবিষ্ট হইয়াছেন। প্রত্যুষ পাঁচটা হইতেই তাঁহার নাড়ী ডুবিতেছিল, তাহার পাঁচ ঘণ্টা পরেই প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জামাতা কোচবিহারের মহারাজ ও বহুসংখ্যক শিষ্য ও বন্ধু তাঁহার নিকটে থাকিয়া সেবা করিয়াছেন। মৃত্যুশয্যা-শায়ী আচার্য্যের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মসমাজের একজন উপাচার্য্য প্রার্থনা করিলেন, উপস্থিত সকলেই উহাতে যোগদান করিলেন। কেশবের প্রাচীন বন্ধু এবং শিক্ষক ডাক্তার ডাল সাহেবও তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। আমাদের সমক্ষে 'একজন রাজপুত্র ও মহাপুরুষের অদ্য মৃত্যু হইয়াছে' এবং এই মহানুভব আচার্য্য কি ছিলেন ও তাঁহার মহৎ জীবনের কার্য্য কি ছিল, তাহা মনুষ্যজাতিকে বলা সহজ কার্য্য নহে। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মারা গেলেন, আমাদের বোধ হয়, তাঁহার মাত্র ৪০।৪২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। গত কল্য অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে নীমতলা ঘাটে তাঁহার স্বপ্রণীত নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।"

২য়

"তিনি চলে গেছেন। এক্ষণ যাঁহারা কেশবচন্দ্র সেনের বিষয় প্রশ্ন করেন, তাঁহাদিগকে এই উত্তর দিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের নিকটে গিয়াছেন। যাঁহারা সুদূরবর্ত্তী দেশ হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নহে। ভারতপরিব্রাজকগণ বলিতেন, 'পূর্ব্বদেশীয় এই দুর্লভ কুসুমকে আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তাঁহার সান্নিধ্য স্মৃতিপটে রাখিবার বস্তু।' বঙ্গের সেই আদর্শ সৌন্দর্য্য ও গৌরব-স্বরূপ পুরুষের সুন্দর দেহের মুষ্টিমেয় শ্মশানভস্মমাত্র আমাদের নিকট পড়িয়া রহিল, ইহা কি কখনও বলা যাইতে পারে? মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর, আর তিনি চলিয়া গেলেন! এই মাত্র জীবনের প্রথম অবস্থা, আর আমরা সে বীণার ঝঙ্কার শুনিতে পাইব না! ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বহু মাসের তীব্র রোগযন্ত্রণায়ও তাঁহার মুখমণ্ডলে কিংবা ললাটে বার্দ্ধক্যের রেখাপাত করিতে পারে নাই। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার সুন্দর

নয়ন প্রিয়জনদের উপর ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল; বোধ হইতেছিল, যেন মৃত্যুর কঠোরতাতে সেই বাগ্মীর রসনা অসাড় এবং সেই আশীর্ব্বাদ-উদ্যত হস্ত অবশ হইয়া গেলেও, তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে রহিলেন। কয়েক মাস শারীরিক যন্ত্রণায় তাঁহার দেহ শেলবিদ্ধ হইতেছিল, এবং ইহা বস্তুতই সান্ত্বনার বিষয় যে, আর তাঁহার সে যন্ত্রণা নাই। শিশু সন্তান মাতাকে যেরূপ ডাকে, দেবালয়ে তাঁহার শেষ প্রার্থনা সেই রূপ হইয়াছিল। যিনি একমাত্র তাঁহার সহায়, তৎপ্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপূর্ণ মা মা সম্বোধনের প্রার্থনা সে দিন যিনি শুনিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। সেই অন্তিম কালে 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে' সঙ্গীত কেশবের শয্যাপার্শ্বে উচ্চারিত হইতেছিল। সেই সঙ্কটে তাঁহার চতুর্দ্দিকে কেহ দীর্ঘ নিঃশ্বাসে, কেহ চক্ষুর জলে, কেহ বিলাপ-ধ্বনিতে প্রার্থনা করিতেছিলেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী আচার্য্যের আত্মা দেহের উপর জয়লাভ করিয়াছিল। পাছে তাঁহার কর্ণে ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিয়া মনকে বিচলিত করে, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার বন্ধুরা যখনই শোকাবেগ-ধারণে অসমর্থ হইতেছিলেন, তখনই গৃহের জনতার বাহিরে যাইতেছিলেন। যাঁহারা স্বীয় প্রেম ও বিশ্বাস-বাহুতে তুলিয়া রোগীকে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করিতে-ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে অনেক ইংরেজ ও মার্কীণদেশীয় লোক আগ্রহের সহিত যোগ দিতেন, এ শ্রেণীর একটি মাত্র লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া সৌভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন।

"ঝঞ্ঝাবাতের পরে নিস্তব্ধতা। ভবিষ্যতের প্রশান্ত চিন্তার সময়ে ইতিহাস ও জীবন-চরিত লিখিত হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য লোকেরা এ ব্যক্তিকে অসাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন, অদ্য আমরা এই মাত্র লিখিয়া রাখিতেছি। ব্রাহ্ম-আন্দোলন এত জীবন্ত যে, অনেকের ধারণা, যেখানে প্রাচ্য উপাসনা প্রতীচ্য চিন্তার সহিত সংস্রবে আসিবে, সেই স্থানেই ইহার উদয় ও উন্নতি হইবে। ইহা অনেক রকম হইবে ও ইহার বহু পরিচালক হইবেন। এক জন মাত্র ইহার নেতা রহিবেন না। কোনও মানুষ ইহার আকার ও গঠন প্রদান করিতে পারে না, উহা সম্পূর্ণ পবিত্রাত্মার কার্য্য। 'স্বরূপ অনুসারে আত্মা দেহ গঠন করে।' কেশবচন্দ্র তাঁহার ভাবকে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় স্বরূপ দিবার জন্য বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছেন।"

ইংলিশম্যান

"কেশবচন্দ্র সেনের তিরোধানে হিন্দু জাতি আপনাদের প্রখ্যাতনামা প্রতিনিধি এবং সমুন্নত ধর্ম্মচিন্তার অধিনায়ক হারাইয়াছেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে এবং তাঁহার শক্তিনিচয়ের পূর্ণ বিকাশের অবস্থায় তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইল, এ ক্ষতি গভীররূপে অনুভূত করিতেই হইবে, এবং ইহা অতীব শোকজনক। যিনি বহু বৎসর তাঁহার ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তিসঞ্চালনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, এবং স্বদেশী লোকের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার স্মরণার্থ আমরা আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ সম্মান দান করি।

"বহু বিষয়ে তাঁহার কার্য্যাবলী এত অসাধারণ যে, তাঁহার প্রভাব ও কার্য্যের পরিমাণ করা এখনও অতি সুকঠিন। তিনি অনেক সময় শিষ্যবর্গ দ্বারা অত্যধিক প্রশংসিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, এবং ইদানীং তাঁহার শত্রুবর্গ তাঁহাকে আত্মম্ভরি প্রবঞ্চক বলিয়া অযথা কুৎসা করিতেও ক্রটী করে নাই। অসাধারণশক্তি ও লোকাতীতপ্রণালীসম্পন্ন লোকদের সাধারণতঃ এইরূপই ভাগ্য; অন্যদের যেমন হয়, তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। সত্য অবশ্যই এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী। আমাদের ইংরেজী পরিমাণ এ সকলের অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষক, কেন না যাহা কার্য্যকরী, তাহাই স্থায়ী হয়। কেশবচন্দ্র সেনকে আমরা যেরূপেই কেন পরীক্ষা করি না, তিনি সাধারণ হিন্দু ছিলেন না, কৃতী ও স্বকৃতজ্ঞানী পুরুষের ন্যায় তাঁহার কৃতকার্য্যতা স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও লক্ষ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে দিক দিয়াই দেখা যাউক, তাঁহাতে যে বহু পরিমাণ সাধুতা ছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার মনোহর চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার, সুমার্জ্জিত আচরণে সকলেই প্রীত হইতেন, এবং উহাতেই তাঁহাকে আধুনিক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সুন্দর আদর্শ ও সমকালিক হিন্দুজীবনের গৌরবান্বিত পুরুষ করিয়া তুলিয়াছিল।

"তাঁহার জন্মভূমি এবং চিরবাসস্থান কলিকাতাই তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল, এখানেই স্বদেশী সমাজে তিনি মাধুর্য্যময় মনোজ্ঞ জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সুবিখ্যাত ঘটনাবলী পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, কেন না ঘটনাচক্রেই উহা এক প্রকার সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাঁহার ন্যায় কোনও হিন্দুই স্বদেশের বাহিরে এত অধিক প্রখ্যাত হইতে পারেন নাই, এবং সমকালে জীবনের সামান্য কার্য্যকলাপ সর্ব্বসাধারণের এত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তথাপি তাঁহার জীবন অতি সাদাসিদে এবং বিনম্র ছিল, কেন না প্রকৃতিই তাঁহাতে তাঁহার মানবত্বের উপাদান সকল সম্মিলিত করিয়াছিলেন। মনোযোগপূর্ব্বক আত্মকর্ষণ, আপনাতে অচল বিশ্বাস এবং স্বীয় অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিবার সুকৌশল তাঁহার সফলতার প্রধান হেতু।

"ইংলণ্ডগমনে তাঁহার সুযশ বিস্তার হইয়াছিল এবং উহা স্থায়ী হইয়াছিল। রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় প্রসিদ্ধ ক্ষমতাপন্ন ও শিক্ষিত লোকেরাও ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, এবং নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোককে চমৎকৃত করিয়াছিলেন ; কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ভারতের জাতীয় সংস্কারের ভাব বক্তৃতা-মঞ্চে ও সংবাদপত্রসহযোগে সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনর্গল বক্তৃতাপ্রভাবে এবং সাগ্রহ নিবেদনে ইংলণ্ডের জনমণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছিল এবং কখনও অজ্ঞাতসারে বিভ্রান্তও হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার সমুন্নত চরিত্র ও সদ্‌গুণাবলী দ্বারা লোকের মনে এক গভীর ভাবের উদ্দীপনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বদেশের প্রতি ইংরেজের নবতর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তিনি ইংরেজের সেই মনোযোগ বৃদ্ধি করিতে ও সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন যে কোনও ইংরেজ দর্শক কলিকাতায় আসিতেন, তিনিই 'লিলিকটেজে' এই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যকে তীর্থযাত্রার ন্যায় দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি ও প্রসঙ্গে অনেকেই অভিনব ভাবাপন্ন হইতেন, এবং সোৎসাহ তাঁহার প্রশংসা করিতেন, অত্যধিক তার্কিক ও সমালোচকগণও রিক্তহস্তে তাঁহার নিকট হইতে ফিরিতেন না।

"বক্তার হিসাবে তিনি তাঁহার শিক্ষিত স্বদেশবাসীদের মধ্যে উচ্চতম কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অচিন্তিতভাবে বক্তৃতা প্রদান করিতেন, কিন্তু সে ক্ষমতা স্পষ্টতই শিক্ষা ও অনুশীলনের গুণে তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁর ইংরেজি আশ্চর্য্যরূপ পরিশুদ্ধ ; তাঁহার বচনপ্রণালী প্রমুক্ত এবং মনোহর, সময় সময় উহা এতই সুমার্জ্জিত হইত,—যেন উহা "সিসরওনিয়ান"

(Ciceronian) বলিয়া মনে হইত। বর্ষে বর্ষে টাউন হলে সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে তিনি তথায় বক্তৃতা করিতেন, ইংরেজ শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যাইতেন; যে নব্য বাঙ্গালী বক্তৃতায় কৃতিত্বলাভের উচ্চাভিলাষী, এই জন্যই তিনি তাঁহাদের নিকট পুতুলরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।"

ইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টান হেরাল্ড

"সত্য সত্যই এক জন রাজপুত্র এবং মহাপুরুষ চলিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র সেন সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বহু দিন যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় ভুগিয়া গত মঙ্গলবার (৮ই জানুয়ারী) প্রাতঃকালে তিনি কালনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও আসিয়াতে বহু লোক তাঁর জন্য শোক করিবে। সমস্ত সভ্য জগতে কেশবের নাম গৃহকথারূপে জপিত হইত, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইলেই তাঁহার প্রেমবন্ধনে আকৃষ্ট হইতে হইত। বিশেষতঃ আমাদের ভারতবাসীদের এ ক্ষতি আর পূরণ হইবার নহে। আমরা জাতীয় সঙ্কটে আক্রান্ত হইয়াছি। আমরা অবশপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি।

"আমরা আমাদের ভাব ও চিন্তাকে এখনও এত টুকু সংযত করিতে পারিতেছি না যে, কেশবের জীবন ও কার্য্যাবলীর বিবরণ দিতে পারি। আমাদের হৃদয় আকুলিত। তিনি এক মধ্যবিন্দুরূপে আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্তের অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিধাতা স্পষ্টতঃ তাঁহাকে উচ্চ অভিপ্রায়সাধনের জন্য উন্নমিত করিয়াছিলেন, এবং তৎসাধনের উপযোগী গুণনিচয় দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের দিক্ দিয়া তিনি তৃতীয় প্রতিষ্ঠাতা, সে কার্য্য তাঁহার চরিত্রে ত্রিবিধ আকার ধারণ করিয়াছিল। সমাজের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন তাঁহার এক প্রধান কার্য্য, ধর্ম্মভিত্তিতে সমাজসংস্কারস্থাপন ও তাহা কার্য্যগত জীবনে পরিণত করা তাঁহার এক প্রধান কার্য্য, এবং সর্ব্বোপরি, স্বদেশীয় লোকদিগকে যিশুগ্রহণে প্রস্তুত করা, ভারতের নিকট খ্রীষ্টকে উপস্থিত করা তাঁহার এক প্রধান কার্য্য ছিল।

"ইংরেজী শিক্ষাপ্রভাবে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রচারকগণের কার্য্য যদিও এ স্রোতের প্রতিরোধে সাহায্য করিয়াছিল, তথাপি সময়ের অভাবমোচনজন্য একজন ধর্ম্মনেতার

প্রয়োজন হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সেই স্থান পূর্ণ করিবার জন্য কেশবকে সৃজন করিয়াছিলেন। বিধাতার নিয়োগে তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, শিক্ষিত যুবকগণ তাঁহার চারিধারে সম্মিলিত হইলেন এবং এমন একটী মণ্ডলী গঠিত হইল যে, তাঁহারা তখন হইতে উদীয়মান বংশের লোকদিগকে ধর্ম্মভাবে উজ্জীবিত করিতে লাগিলেন।

"সমাজসংস্কারের আন্দোলন পূর্ব্বেও হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অতি অল্পই ফলপ্রদ হইয়াছিল। সভ্যতাকে মূলশক্তি বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছিল, এবং যেমন সম্ভব, সংস্কারের ভাবসকল যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। লোকের লম্বা লম্বা কথার আর সীমা ছিল না; কিন্তু কার্য্যগত ফল অতি নিরাশাজনক। ধর্ম্মভিত্তির প্রয়োজন ছিল, এবং কেশবচন্দ্র সে ভিত্তির বিষয় ঘোষণা করিয়া-ছিলেন, এবং তিনি নিজে উহা জীবনে পরিণত করিয়া লোককে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। ইহাকে বলে ত্যাগস্বীকার, কিন্তু কেশব ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। যে উপদেশের উপর দৃষ্টান্তের ছাপমারা থাকে, তাহা নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হয়।

"খ্রীষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত যে কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহাকে প্রশংসাদান করিয়াছি, উহাতে কেহ কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সে প্রশংসা তাঁহাকে দিয়াছি। খ্রীষ্টসম্পর্কে তাঁহার ভাব অনেক সময়েই লোকে বুঝিতে পারে নাই, এবং না বুঝিবার কারণও থাকিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাস তাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল যে, খ্রীষ্টের নিকটে কেশব আন্তরিক বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, যে দিন ভারতের অন্তঃকরণ খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে। তাঁহার সঙ্গে লোকে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করুক, এজন্য তিনি লালায়িত ছিলেন, এবং লোকের অপ্রস্তুত অবস্থাদর্শনে তিনি—সম্পূর্ণ সঙ্গত হউক বা না হউক—এক প্রকার সংযতভাব পোষণ করিয়াছিলেন। ইহাতে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার অন্তঃকরণে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, সমুদায় জাতি খৃষ্টের দিকে অগ্রসর হউক। ইহাই তাঁহার জীবনের পরিষ্কার লক্ষ্য ছিল, এবং যত সময় গিয়াছে, তাঁহার জীবনের বিবিধ কার্য্যাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, খৃষ্টের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং সেই দিকেই

তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। জাতির অন্তঃকরণ খৃষ্টের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল, এবং ইহা হয়ত প্রয়োজন ছিল যে, একজন লোক এমন উত্থিত হইবেন, যিনি স্বজাতি হইতে অবিচ্ছিন্ন বিবেচিত হইবেন এবং লোকের নিকট খৃষ্টের কথা বলিবেন। বিধাতা কেশবের হস্তে এই কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত এই কার্য্য সাধন করিয়াছেন, এবং ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে, পূর্ব্বকালে লোকের খৃষ্টের প্রতি যে বিরুদ্ধভাব ছিল, তাহা বহু পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে।

"কেশবের ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিষয় আমাদের অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন ; তাহা প্রসিদ্ধ। কেশব আধিপত্য করিতে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নেতৃত্বের ভাবব্যঞ্জক দেহ ছিল। আমরা কি তাঁহার রসনার বাগ্মিতার কথা বলিতেছি ? তাহাও বটে, কেন না, সে চিত্তবিমুগ্ধকর কথাই বা কে ভুলিতে পারে ? কিন্তু আমরা তাঁহার অন্তঃকরণের বাগ্মিতার কথাও বলিতেছি, উহা রসনা অপেক্ষা অত্যধিকতর নেতৃত্বব্যঞ্জক ছিল। তাঁহার নিকটে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদেরই হৃদয় তিনি অধিকার করিয়া বসিতেন। শ্রদ্ধা প্রীতি দ্বারা উদ্দীপ্ত না হইয়া, কেহ তাঁহার নিকট উপনীত হইতে পারিত না। তিনি যে কোন কর্ম্ম করিতেন, তাহাতেই অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি সদাই আপনার জীবনকে সম্মুখভাবে স্থাপন করিতেন, কোনও বিষয় ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে সে ভাব স্বীয় জীবনে আয়ত্ত করিয়া লইতেন। ধর্ম্ম তাঁহার নিকট জীবন্ত সত্য ছিল, উহা তাঁহার জীবনের অতি সামান্য কথা ও কার্য্যকে অধিকার করিয়া থাকিত। তিনি শিশুর ন্যায় ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতেন, অনুরাগভরে উপাসনা করিতেন, তাঁহার অপ্রতিহত বিশ্বাস ছিল, এবং তিনি সর্ব্বদা আপনার চতুর্দ্দিকে সুখকর প্রশান্ত বায়ুমণ্ডল প্রস্তুত করিতেন। সে সকল যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অন্তরে উহার ছাপ রহিয়াছে। তাঁহার পীড়িতাবস্থায় ঈশ্বরপ্রেমের উপর বিশ্বাস তাঁহার ক্লেশকর যাতনা বহু পরিমাণে প্রশমিত করিত। তিনি ঈশ্বরের সহবাসে থাকিতেন এবং পরলোকের সুখকর ভবিষ্যতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। যত দিন তাঁহার শক্তি ছিল, আপনার প্রিয় সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিতেন

এবং তাঁর ইঙ্গিতে শেষ যে সঙ্গীত গীত * হইয়াছিল, তাহা খৃষ্টসম্বন্ধীয়, উহাতে তিনি বিলক্ষণ আরাম বোধ করিয়াছিলেন।

"খৃষ্টের প্রতি প্রেমে তাঁহার অন্তরে স্বভাবতঃ খৃষ্টদাসদের প্রতিও প্রেম উদ্দীপন করিত। খৃষ্টের ভৃত্যদের কেহ বিপন্ন হইলে, তিনি উহা সহিতে পারিতেন না। বোম্বাই নগর যখন সেল্‌ভেশন আর্মী বিপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেমের সহিত পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যখন আমাদের প্রচারকগণ বিডন স্কোয়ারে মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের অর্থ দণ্ড হইবে; সে দিন তিনি টাকা সহ পুলিশকোর্টের দ্বারে উপস্থিত ছিলেন, যদি প্রচারকদের অর্থ দণ্ড হয়, তিনি টাকা দিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবেন। বাঙ্গালী খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে তিনি অতিশয় ঘনিষ্ঠ প্রেমযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিতে সমুৎসুক ছিলেন। আমরা স্বয়ং এমন বিচ্ছেদানুভব করিতেছি যে, তাহা আর পূর্ণ হইবে না। প্রভুর পরিত্রাণপ্রাপ্তদের মধ্যে আমরা কেশবের সঙ্গে মিলিত হইব, এ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে, ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

"ভারতবর্ষ তাহার মহৎ সন্তানকে হারাইয়া শোক করিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ তাহার মহৎ পরিচালক হারাইয়া শোক করিতেছে এবং খ্রীষ্টীয়সমাজ তাহার মহাসহযোগী হারাইয়া শোক করিতেছে।

"আমাদের প্রিয় ভ্রাতার শোকাকুল পরিবার, সহযোগিগণ, শিষ্যগণ এবং বন্ধুবর্গের জন্য সান্ত্বনাময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।"

ভাইসচেয়ারম্যান রেনল্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন সভাতে তাহার ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রেনল্ড সাহেব বলিয়াছেন :—

... ...

"পবিত্র জীবন, বদান্য অন্তঃকরণ, নির্দ্দোষ বিবেক ও সহানুভূতিপূর্ণ আত্মা, এই সকল সারস্বতশিষ্যগণের ভূষণ; সরস্বতী এবম্প্রকারের লোকদিগের নিকট থাকিতে সম্মত। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানানুশীলন করিতে হইবে, তদ্দ্বারা যে ধন ও

* "যদি হয় সম্ভব, হে প্রাণবল্লভ, কর এই পানপাত্র স্থানান্তর।"

সম্মান লাভ হয়, তজ্জন্য নহে; কিন্তু জ্ঞানলাভই উহার পুরস্কার। জ্ঞান যাহা দান করে, তজ্জন্য নহে, কিন্তু জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, এবংবিধ সভাতে অনেক সময় এরূপ বলিতে শুনিয়াছি। নিঃসন্দেহ ইহা মহৎ লক্ষ্য, কিন্তু অদ্য আমি উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলীকে এতদপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছি। বিদ্যার্থী জ্ঞানানুশীলনে নিঃস্বার্থ ও আত্মত্যাগী হইলেও, নৈতিক জীবনে হীন হইতে পারেন; এবং এ অভিযোগ অনেক সময় শুনা যায় যে, আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ, উহাতে নীতিশিক্ষার প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদত্ত হয় না। কিন্তু যিনি জ্ঞানকে লক্ষ্য করিবেন, তিনি যেমন মানসিক উন্নতি করিবেন, তেমনি প্রবৃত্তিনিচয়কে সংযত করিবেন; তাঁর জীবন নিষ্কলঙ্ক হইবে। কেবলমাত্র জ্ঞানের জন্য তিনি জ্ঞানকে ভালবাসিবেন, তাহা নহে, কিন্তু তদ্দ্বারা তিনি পরের উপকার করিতে পারিবেন। তিনি (যেমন কবি বলিয়াছেন) কেবল শক্তি ও জ্ঞানমাত্রে নহে, কিন্তু মুহুর্মুহু শ্রদ্ধা ও বদান্যতাতে বর্দ্ধিত হইবেন।

"ইহা অতি উচ্চ আদর্শ, কিন্তু আয়ত্তের অতীত নহে। আমরা কখনও কখনও এরূপ লোক দেখিতে পাই, যাঁহার চরিত্রে বিবিধ প্রকারের উপাদান সকল সুন্দরমত সংমিশ্র হইয়াছে, মানসিক শক্তি সকল পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছে, অথচ আত্মা শিশুর আত্মার ন্যায় নির্ম্মল, হৃদয় রমণীহৃদয়ের ন্যায় কোমল। এ প্রকার ব্যক্তি যখন স্বীয় আত্মাতে নিহিত মহাসত্য সকল অপরের অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দিবার ঐশী শক্তির পাত্র হন, তখন তিনি লোকগুরু হন এবং তাঁহার অভ্যুত্থানে পৃথিবীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক নূতন যুগের আরম্ভ হয়। শাক্যমুনি এই প্রকার ব্যক্তি ছিলেন, এদেশে তিনিই হয়ত মহত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তোমরা হয়ত বলিবে, শাক্যমুনি অর্দ্ধপৌরাণিক পুরুষ, সে যুগ এখন হইতে বহু দূরবর্ত্তী; আধুনিক জীবনের অবস্থা উহা হইতে স্বতন্ত্র, তিনি আমাদের নিকটে প্রায় নামমাত্র, চিন্তনীয় বিষয়মাত্র। ভাল, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এদেশ সেই ছাঁচে গঠিত একজনকে প্রসব করিয়াছে, তিনি আমাদের মধ্যে বাস করিয়াছেন ও কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার মূর্ত্তি আমাদের সকলেরই পরিচিত, অদ্য উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকের স্মৃতিতে এখনও তাঁহার বচনাবলী সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। ইতিহাস

কেশবচন্দ্র সেনকে চিন্তাশীল, সংস্কারক এবং জনহিতৈষীর দলে কোন্ শ্রেণীতে স্থানদান করিবে, আমি তাহা বিচার করিতে চাহি না। বর্ত্তমান বংশীয় আমরা হয়তো তাঁহার মহত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ; যেমন কোন পথিক কোন পর্ব্বতের পাদদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উহার উচ্চতার প্রকৃত পরিমাণ করিতে পারে না। এখনকার অপেক্ষা পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা ইহার উপযুক্ত বিচার করিতে পারিবেন। আমি বোধ করি, ইহা বলিলে ভুল বলা হইবে না যে, ভবিষ্যৎ বংশ যখন কেশবচন্দ্র সেনের জীবন ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন, তখন তাঁহার চরিত্রের চারিটী বিষয় তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। প্রথমটী আশ্চর্য্য সমন্বয়ক্ষমতা, যদ্দ্বারা তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার কতকগুলি ফলকে প্রাচ্য জ্ঞানের চিন্তাশীলতা ও গভীরতার সঙ্গে মিশ্রিত করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার প্রকৃতিতে চিন্তা ও কার্য্যের উপযুক্ত সমতা রক্ষিত হইয়াছিল। যদিও তিনি ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বপ্নদর্শী রহস্যবাদী ছিলেন না। যে কার্য্যে তাঁহার জীবন ও শক্তি উৎসর্গিত হইয়াছিল, তৎসাধনার্থ আত্মিক বল-সঞ্চারের জন্য তিনি সময় সময় নির্জ্জনবাস ও ধ্যান চিন্তন করিতেন। তৃতীয়তঃ তাঁহার উদার ভাব, যদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের সত্য সকল নির্ণয় করিতে পারিয়াছিলেন এবং সে সকলের উচ্চতম ও মহৎ ভাব সকল স্বয়ং জীবনে সংশ্লিষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ মহানুভব উদার হৃদয়ের বদান্যতা, ইহা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানতা, উৎপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিয়াছিল। দুঃখবিমোচন, শিক্ষাবিস্তার, মদ্যপাননিবারণের চেষ্টা, বাল্যবিবাহনিবারণ, হিন্দু বিধবাদের উদ্ধার, এই সকল কার্য্যকরী রীতিতে তিনি লোকের দুঃখভারমোচনের যত্ন করিতেন, এবং বিমল উচ্চ একেশ্বর-বাদের সত্য শিক্ষা দিয়া, চতুর্দ্দিকস্থ জনমণ্ডলীকে সমুন্নত করিতে প্রয়াস পাইতেন।

"এ বিষয়ে একটু বিস্তারিতরূপে বলিবার হেতু আছে। এবম্প্রকার সভাতে ভারতের মহত্তম সন্তানদের এক জনের মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করা স্বাভাবিক, এবং আমরা যে উদ্দেশে আজ সমবেত হইয়াছি, ইহা তাহারও অনুপযোগী নহে। কারণ, যদিও কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব তাঁহার নিজেরই, তথাপি তাঁহার

চরিত্র বহু পরিমাণে শিক্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। ধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মারা পরমতসহিষ্ণু, এ অতি বিরল। ধর্ম্মসংস্কারক অতীব প্রমত্ত, এবং প্রমত্ত লোক স্বীয় বিশ্বাসের আতিশয্যবশতঃ ভিন্ন মতাবলম্বীকে সহ্য করিতে পারেন না, এবং তাঁহাদের সদ্গুণের প্রতি অন্ধ হয়েন। প্রমত্তভাবের জন্য কেশবচন্দ্র সেন প্রখ্যাত, কিন্তু যে উদারচিত্ততা তাঁহাকে অসহিষ্ণুতা-বর্জ্জিত প্রমত্ততা, এবং গোঁড়ামিবর্জ্জিত বিশ্বাস দান করিয়াছিল, উহার হেতু (যদি আমার ভুল না হয়) ইতিহাস অধ্যয়ন, ধর্ম্মমত সকলের উত্থান ও উন্নতির জ্ঞান, এবং প্রাচীন কালীয় ও অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্মচিন্তার সহিত পরিচয়। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সহযোগে প্রাচ্যদেশের মানসিক উন্নতি-সাধন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; কেশবচন্দ্র সে বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারত যে মহাপুরুষকে হারাইয়াছে, আজকার সভায় তাঁর বিষয় বলিবার আরো একটি কারণ আছে। বিধাতা এ দেশের জন্য ভবিষ্যতে যে মহাসৌভাগ্য রাখিয়াছেন, কেশবচন্দ্র সেনের জীবন তাহার পূর্ব্বসূচনা ও অঙ্গীকারস্বরূপ। যে যুগ ও দেশ এমন ব্যক্তিকে প্রসব করিয়াছে, সে দেশ আশার সহিত ভবিষ্যতের অভিনয়জন্য প্রতীক্ষা করিতে পারে। কিন্তু আশার সহিত প্রতীক্ষা করাই এক মাত্র যথেষ্ট কার্য্য নহে। বর্ত্তমান বংশের ছাত্রবৃন্দ, এক্ষণ তোমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে, তাঁহার কার্য্য সম্পূর্ণ করিবে, তবেই তোমরা তাঁহার স্বদেশীয় নামের উপযুক্ত হইবে।"

ডবলিউ ডবলিউ হণ্টার

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণান্তে দুই সহস্রাধিক লোক কলিকাতা টাউনহলে সমবেত হইয়া তাঁহার স্মরণার্থ সভা করেন। গভর্ণরজেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বর W.W. Hunter সাহেব সভাপতি হন। তিনি বলেন :—

"মহারাজগণ ও ভদ্রমহাশয়গণ, এক জন মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য অদ্য আমরা সমবেত হইয়াছি। আমাদের কাহারো কাহারো সঙ্গে তাঁহার অতি সুকোমল পবিত্র সম্বন্ধ ছিল, কাহারো তিনি ধর্ম্মনেতা, কাহারো তিনি প্রিয়তম বন্ধু। তাঁহার মৃত্যুতে যে অনেকে ব্যক্তিগত ক্ষতি বোধ করিয়াছেন, বিবিধ প্রকারেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আমরা অদ্য তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধুরূপে অথবা সমধর্ম্মাবলম্বিরূপে এই সাধারণ

সভায় সমবেত হই নাই। যে সকল ভদ্রমহোদয় শেরিফকে এই সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকা আপনারা অনেকে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া থাকিবেন। আপনারা জানেন, তাহাতে সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির প্রতিনিধিগণ আছেন। তাহাতে কাউন্সিলের উচ্চপদস্থ ইংরেজগণ আছেন, ইংরেজ শাসনকর্ত্তা, প্রধান আদালতের উকীল বারিষ্টারগণ আছেন; প্রাচীন উচ্চ বংশের ভূম্যধিকারী ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ হইতে নব আলোক-প্রাপ্ত উন্নতিশীল প্রত্যেক সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ আছেন; মোশলমান সমাজের নেতৃবর্গ এবং রোমাণ কাথলিক ও প্রটেষ্টেণ্ট খৃষ্টীয় আচার্য্যগণও উহাতে আছেন। যখন আমি উক্ত তালিকা পাঠ করি, আমি আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতে বাধ্য হই, আমাদের বন্ধুর কোন্ প্রভাবে এত বিভিন্নমতাবলম্বী, ভিন্নভাবাপন্ন লোককে একত্র সমবেত করিয়াছে। তখন তাঁহারই একটী কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়:—'মহাপুরুষকে চেনা সহজ, কিন্তু বুঝা কঠিন।' কেন না, আমরা বিভিন্ন জাতির বিভিন্নমতাবলম্বী লোকেরা কেশবচন্দ্রে মহত্ত্বের অব্যর্থ চিহ্ন সকল দেখিয়া তাঁহাকে চিনিয়াছি। আমরা তাঁহাতে দুর্লভ সরলতা, মৌলিকতা, এবং শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাঁহার জীবন পরহিতে উৎসর্গিত ছিল, এবং অকাল মৃত্যুতে তিনি পবিত্রীকৃত হইয়াছেন, আমরা তাঁরই প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন জন্য সমবেত হইয়াছি। কেশবচন্দ্র সেন বেনামী ব্যক্তি নহেন। তিনি আমাদের মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। জনহিতে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, তাঁহার কথার চিত্তাকর্ষকতা, তাঁহার পারিবারিক সম্বন্ধের গভীর প্রণয় সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার প্রসিদ্ধ বাগ্মিতার অপেক্ষা ব্যক্তিগত জীবনের নির্ম্মল গৌরব অল্পতর ছিল না। বস্তুতঃ তাঁহার চরিত্রে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ ছিল, উহা বিশেষভাবে স্বচ্ছ ছিল, তাহাতেই ইহার ক্রটী দুর্ব্বলতা এবং আত্মনিগ্রহও প্রতিবিম্বিত হইত। কেশবচন্দ্রের কেবল একটী বিষয় লোকে বড় জানিত না, উহা তাঁহার গুপ্ত দানের পরিমাণ। তিনি যে অবস্থায় জন্মিয়াছিলেন, জীবনের যে কার্য্যসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, উহা তাঁহার একান্ত উপযোগী ছিল। তাঁহার পিতামহ উইলসনের বন্ধু ও সহকর্ম্মী ছিলেন; হিন্দুসমাজে তাঁহার পরিবারবর্গ ধন ও উচ্চপদের সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞানানুরাগের সংমিশ্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম

জীবনে তাঁহার গৃহে প্রাচীন ও নবীন বাঙ্গালী জীবনের যাহা কিছু উৎকৃষ্টতম, তাহা দৃষ্ট হইত। প্রাচ্য ধর্ম্মনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতীচ্য স্বাধীন চিন্তার সংযোগে নির্ম্মিত সাধারণ সংগ্রামক্ষেত্র হইতে, তিনি যুবাপুরুষের ন্যায় স্বকীয় জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ের ক্লেশ, উৎপীড়ন ও ত্যাগস্বীকারের বিষয়ে অন্যেরা বলিবেন, এবং তৎকালের বিষম সংগ্রাম ও সে সংগ্রামে আত্মজয় পৃথিবীতে জয়লাভ হইয়াছিল, তাহাও অন্যেরা বলিবেন। এ সভা বিশেষভাবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় প্রতিনিধিদের সভা, কেশবচন্দ্র সেনেও ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও ভারতীয় চিন্তার এক প্রকার বিশেষ সংমিশ্রণে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, এ সভাতে তন্মাত্র বলাই আমার কর্ত্তব্য। স্বদেশীয় লোকের বোধগম্য ও অন্তর প্রবিষ্ট করিবার জন্য প্রাচীন বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হইতে আধুনিক সংবাদ-পত্র-লেখা পর্য্যন্ত সকল উপায়ই তিনি অবলম্বন করিতেন। যুবক কেশবচন্দ্র বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় করিয়া যে কেবল ভারতীয় নাট্যাভিনয়ে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তদ্দ্বারা বিধবাবিবাহসম্বন্ধে সাধারণ মতও সমুন্নত হইয়াছিল। 'নব্য বাঙ্গালী, ইহা তোমার জন্য' (Young Bengal, this is for you) প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া আর এক প্রাণপ্রদ প্রণালীতে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। এক জন মৌলিক ও শক্তিশালী পুরুষ স্বদেশীয়দের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে সকল উপায় গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি পরিণত বয়সে সে সমুদায় আধুনিক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, প্রচারযাত্রায় বাহির হইতেন, সর্ব্বদা লিখিতেন, উপদেশ ও বক্তৃতা প্রদান করিতেন, অক্লান্ত উৎসাহের সহিত লোককে শিক্ষা দান করিতেন, এই সকল অস্ত্রযোগে তিনি প্রাত্যহিক সংগ্রাম সমাধান করিতেন। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, এখানকার উপস্থিত জনমণ্ডলী ও দূরতর দেশ হইতে সমাগত সমাচার সকল সপ্রমাণ করিতেছে যে, ভারত ও ইংলণ্ড সমবেতভাবে সংকল্প করিয়াছে যে, তাঁহার স্মৃতি ভোলা হইবে না। মহামতি মিঃ গিব্‌স সাহেবকে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে, কেশবচন্দ্র সেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহাপুরুষসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা আবৃত্তি করিবার অনুমতি দিন। তিনি বলিয়াছেন, 'একটি

আদর্শের জন্য জীবনযাপন ও জীবনদান প্রত্যেক মহাপুরুষের বিশেষ নিয়তি। সময়ের উপযোগী বিশেষ সংস্কার ভিন্ন এই আদর্শ আর কিছুই নহে। তিনি তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ সমাজ অতিকলুষিত, পতিত, বিনাশোন্মুখ দেখিতে পান। সমাজ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার আদর্শ আপন অন্তরে দেখিতে পান, এবং তিনি সেই আদর্শকে সদাই আয়ত্ত করিতে ও প্রসারণ করিতে প্রয়াস পান। এই জন্যই তাঁর জীবন চির সংগ্রামের স্থল, এবং জীবনান্তে কেবল সে সংগ্রামের নিবৃত্তি হয়।' বন্ধুগণ, স্বদেশীয়দের উচ্চতর নৈতিক উন্নতি, ধর্ম্মোন্নতি ও প্রমুক্ত চিন্তার উন্নতি-সাধনই কেশবচন্দ্র সেনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেই আদর্শের জন্য তিনি জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি জীবনপাত করিয়াছেন।"

মাননীয় জে গিব্‌স সাহেব (যিনি তৎকালে গভর্ণর জেনারেলের স্থলবর্ত্তি-রূপে কার্য্য করিতেছিলেন) কেশবচন্দ্রের বিবিধ গুণের উল্লেখপূর্ব্বক প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নবাব আব্দুললতিফ খাঁ বাহাদুর কেশবচন্দ্রের মদ্যপান-নিবারণের উদ্যোগ, বাল্যবিবাহনিবারণের চেষ্টা ও এক পয়সা মূল্যের সুলভসমাচার প্রচারের বিষয় উল্লেখ করিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন, এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে কেশবের গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রস্তাবের পোষকতা করেন। হাই কোর্টের মাননীয় জজ কনিংহাম সাহেব, ফাদার লাফোঁ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি স্বর্গগত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন করিয়া অপরাপর প্রস্তাব ধার্য্য করেন।

কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সংবাদ পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনকে এ দেশীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও মহারাজ এবং দেশ বিদেশের মহাত্মারা যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক খণ্ডের মাত্র অনুবাদ এখানে দেওয়া গেল; বিস্তারভয়ে অনেকগুলি সহানুভূতিপত্র এবং সংবাদপত্রের মহত্ত্ব-সূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে বিরত থাকিতে হইল।

কমেণ্ডার-ইন্-চিফ

"প্রিয় মহাশয়,

"আপনার ৯ই জানুয়ারীর পত্রোত্তরে সার ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্ট আপনার পিতৃ-বিয়োগে শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের অভাবে সমুদায় ভারত ক্ষতি বোধ করিবে। আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের সঙ্গে তাঁহার প্রকৃত সহানুভূতি জানাইতেছেন।

আপনার

(স্বাক্ষর) ই, এফ, মিলিটারী সেক্রেটারী”

বাঙ্গলা ও পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরও শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বরদার মহারাজ গুইকুয়ার

“মতিবাগ, বরদা

১৭ই জানুয়ারী, ১৮৮৪

“প্রিয় মহাশয়,

“মহারাজা সাহেব সেনা খাস খেল সম্‌সের বাহাদুরের অনুজ্ঞাক্রমে আপনার পিতৃবিয়োগের দুঃখজনক সংবাদ-সম্বলিত ১০ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। মহারাজ বাহাদুর বিগত বৎসর যখন কলিকাতায় ছিলেন, কেশববাবুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, তিনি পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন ও কলিকাতায় যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অনুভব করিতেছেন যে, এ প্রকার বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুতে মহাক্ষতি হইয়াছে।

“যে ব্যক্তির প্রতি আমারও শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার অভাবে এতৎসঙ্গে আমারও সহানুভূতি গ্রহণ করুন।

আপনার

(স্বাঃ) ভি, এম, সমর্থ

মহারাজার সেক্রেটারী”

সার টি মাধব রাও

“মান্দ্রাজ

জানুয়ারী, ২২, ১৮৮৪

“প্রিয় মহাশয়,

“আপনার ১০ই তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি।

“ইহা বলা বাহুল্য যে, আপনার পিতৃদেব বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুসংবাদে

আমি কত দূর গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছি। আমি এক জন অতিশয় মূল্যবান্ বন্ধু হারাইয়াছি। আমাদের সমাজ এক জন হৃদয়বান্ হিতৈষী হারাইয়াছে, এবং সমগ্র ভারতখণ্ড ধর্ম্মচিন্তার অতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ নেতা হারাইয়াছে। বহুকাল বিস্তৃত ভাবে লোকে এ অভাব বোধ করিবে। এই শোকের ঘটনাতে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করুন।

সারল্যসহকারে আপনার

(স্বাঃ) টি, মাধব রাও"

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

"জানুয়ারী, ৩০, ১৮৮৪

"প্রিয় মহাশয়,

"ভগবান্ আপনাদের গৃহকে যেরূপ শোকাকুল করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার আন্তরিক শোক-সহানুভূতি গ্রহণ করুন। আমাদের মধ্য হইতে এক জন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি চলিয়া গেলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার সদৃশ আর কাহাকেও আমরা অচিরে পাইব না।

"সহানুভূতিতে যদি দুঃখের সান্ত্বনা হয়, আপনাদের সে সান্ত্বনা আছে, কেন না সমগ্র জাতি আপনাদের শোকে শোকাকুল; কেন না যিনি সাধুতা ও সদ্-গুণে মহৎ ছিলেন, তাঁহার অভাবে সমুদায় ভারতবর্ষ শোক করিতেছে।

"পুনরায় আমি আপনাকে আমার গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রকৃতই আপনার

(স্বাঃ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর"

মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

"শোভাবাজার রাজবাড়ী,

কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৪

"প্রিয় করুণাচন্দ্র,

"তোমার বাঙ্গলা ও ইংরেজী দুইখানি শোকপত্র পাইয়াছি, এবং তৎপাঠে গভীররূপে শোকগ্রস্ত হইলাম। তোমার পিতৃবিয়োগে আমি আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। তোমার পিতৃদেব আমাদের দেশের অলঙ্কারস্বরূপ

ছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে এমন ক্ষতি হইল, যাহা কদাচিৎ পূর্ণ হইবার আশা আছে। আরো দুঃখের বিষয় যে, তিনি জীবনের কুসুমিত অবস্থায়ই চলিয়া গেলেন, ইহাই আমাদের স্বদেশীয়দের গভীর দুঃখের কারণ হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করি, তুমি ধর্ম্মপথে তোমার সুপ্রসিদ্ধ পিতার মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে, এবং দয়ালু পরমেশ্বর তোমার সহায় হউন।

"বংশানুক্রমে আমাদের সঙ্গে তোমাদের পরিবার বন্ধুতাসূত্রে সংগ্রথিত। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে আমি কেবল মাত্র এক জন সুবিখ্যাত স্বদেশী হারাইয়াছি, তাহা নহে, কিন্তু আমি আমার একজন উৎকৃষ্টতম সন্তান হারাইয়া গভীর রূপে শোক করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তুমি পিতৃশোকবহনে সমর্থ হইবে, এবং পরিবার ও আত্মীয় বন্ধুদের শোকাপনোদনের উপায় করিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

(স্বাঃ) কমলকৃষ্ণ"

রেভারেণ্ড আর, এড্ওয়ার্ড

"সাগর,

জানুয়ারি, ১৯, ১৮৮৪

"প্রিয় করুণাচন্দ্র সেন,

"আমি সংবাদপত্রে তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদ দেখিয়াছি, এবং অতীব দুঃখের সহিত উহা পাঠ করিয়াছি।

"যদিও আমি এ ঘটনার জন্য অপ্রস্তুত ছিলাম না, কেন না আমি গত বারে কলিকাতাপরিত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার পীড়ার যেরূপ গুরুতর অবস্থা দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার মনে হইয়াছিল যে, পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে পাইব, ইহা সংশয়ের বিষয়।

"আমি তোমার ও তোমার পরিবারের সঙ্গে সহানুভূতি করি, এবং বস্তুতই তাঁহার অভাব সকলের পক্ষেই অতি গুরুতর ক্ষতি। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ভবিষ্যদ্বংশীয় লোকেরা তাঁহার জীবনের ফলভোগ করিবে। তাঁহার সঙ্গে প্রসঙ্গ করা সর্ব্বদাই আমার নিকট আনন্দজনক ছিল, এবং আমার পক্ষে

ইহাও এক সান্ত্বনার বিষয় যে, তাঁহার শেষ পীড়ার অবস্থায় আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন দুঃখের পবিত্রকর প্রভাববিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল, সে কথা সর্ব্বদাই আমার স্মরণ হইবে।

"যিশুখৃষ্টে ঈশ্বর যে সত্যের পরিচয় দান করিয়াছেন, তোমরা এবং আমরা সকলে যেন সেই পূর্ণ সত্যে নীত হই।

তোমার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) আর, এড্ওয়ার্ড"

লর্ড নর্থব্রুক

"এডমিরালটী এস্. ডব্লিউ
ফেব্রুয়ারী ৮ই, ১৮৮৪

"প্রিয় মহাশয়,

"আপনার অনুগ্রহপত্র পাইবার পূর্ব্বেই আমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমার বন্ধু বাবু কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারের নিকট আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ পত্র লিখি।

"আপনার পিতার প্রতি আমি প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতাম, তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তির প্রতিও আমার শ্রদ্ধা ছিল।

"স্বদেশীয় লোকের মঙ্গলকার্য্যে তাঁহার জীবন অতিপাত হইয়াছে, এবং তৎকার্য্যে মহৎ ফল লাভ হইয়াছে। ইহা আমি নিশ্চয় অনুভব করি যে, তাঁহার অকালপ্রয়াণের অভাব বিস্তৃতভাবে ও গভীররূপে অনুভূত হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) নর্থব্রুক"

অধ্যাপক মোক্ষমূলর

"অক্সফোর্ড,
৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪

"প্রিয় মহাশয়,

"আপনার পত্রের জন্য বহু ধন্যবাদ। আমি আপনার পিতৃবিয়োগসংবাদ পাইয়াছি, এবং উহা আমার ব্যক্তিগত ক্ষতিরূপে অনুভব করিয়াছি। আমি আপনার পিতাকে কেবল সম্মান করিতাম, এমন নহে, কিন্তু আমি তাঁহাকে

ভালবাসিতাম, এবং তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতাকে আমি আমার জীবনের এক মহামূল্য স্মৃতিরূপে গণনা করি। আমার চিন্তা অনেক সময় ভারতের দিকে প্রধাবিত হয় এবং যে সকল ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যাঁহারা সেখানে প্রকৃত সৎকার্য্যে লিপ্ত আছেন) আমি জানি, তাঁহাদের বিষয় ভাবি। এখনও যেন আমি আপনার পিতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ করিতেছি, এরূপ মনে হয়; যদিও তৎক্ষণাৎ আবার স্মরণ হয়, তিনি এক্ষণ আর পৃথিবীতে জীবিতদের মধ্যে নাই। ভারতের মহাক্ষতি হইয়াছে, তেমনি ইয়োরোপেরও; কেন না আপনার পিতার প্রভাব যেমন ভারতের, তেমনি ইয়োরোপীয় জনমণ্ডলীতে কার্য্য করিয়াছে। আমরা ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ের গভীরতার পরিমাণ করিতে পারি না; যখন মানুষ পৃথিবীতে অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, সেই কার্য্যক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে তুলিয়া লইলে, আরো আমরা ঐশ্বরিক অভিপ্রায় অবধারণে অসমর্থ হই। আপনার পিতা এত অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং তাঁর মন কত শক্তিশালী ছিল! আমি তাঁহা হইতে এখনও কত আশা করিতেছিলাম—আজ তাঁর স্থান শূন্য—এবং কে আর সে স্থান পূরণ করিবে? যাহা হউক, তিনি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন—সে কার্য্য কখনও বিনষ্ট হইবে না—এবং এই চিন্তাই শেষ মুহূর্ত্তে অবশ্য তাঁহার সান্ত্বনার কারণ হইয়া থাকিবে। আপনাদের পক্ষে এবং তাঁহার প্রিয়তম সকল লোকের পক্ষেই উহা সান্ত্বনার বিষয়। আপনার পিতার আরব্ধ সম্পন্ন ও অসম্পন্ন সকল কার্য্যেই তিনি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ভরসা করি, ভারতে তাঁহার কার্য্য পরিচালন ও তাঁহার মহৎ ভাবকে জাগ্রৎ রাখিতে সমুৎসুক অনুগামীর অভাব হইবে না। পেলমেল গেজেটে আমি আপনার পিতার সংক্ষিপ্ত মৃত্যুসমাচার লিখিয়াছি, উহার এক খণ্ড আপনাকে পাঠান হইয়াছে। আমি আশা করি, উহা আপনি পাইয়াছেন। আমার ইচ্ছা আছে যে, তাঁহার মহৎ জীবনের ও কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করি; কিন্তু যাবৎ আর কিঞ্চিৎ অবসর না পাই ও আরও বিবরণ সংগৃহীত না হয়, তাবৎ আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

প্রকৃত সহানুভূতি সহকারে
আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) এফ্, মোক্ষমূলার"

রেভারেণ্ড আর, স্পিয়ারস্
(আচার্য্যপত্নীর নিকট ।)

"২২নং গাস্কোন রোড,
ভিক্টোরিয়া পার্ক, লণ্ডন
মার্চ্চ, ১৯, ১৮৮৪।

"প্রিয় মিসেস্ সেন,

"ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও আমেরিকার প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ভদ্র মহিলা ও ভদ্রলোকের সহানুভূতিসূচক পত্র-পরিপূর্ণ একটী বাক্স অদ্য গ্লোভ পার্শেল এক্স্প্রেস যোগে আপনার নিকটে প্রেরিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্য, অধ্যাপক এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। মোক্ষমূলারের নাম উহাতে দেখিতে পাইবেন। খ্রীষ্টিয়ান লাইফে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল যে, আমি সহানুভূতিপূর্ণ পত্র পাঠাইব। তাতেই এই নামগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। যাঁহাদের নিকট আপনার প্রিয়তম স্বামী সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের পরিবারের সকলেই তাঁহাদের নাম পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নিয়ম ছিল যে, মাত্র দুটি নাম দেওয়া হইবে। উহার মাশুল সমস্ত এখানে প্রদত্ত হইয়াছে, আপনার নিকট উহা বিনাব্যয়ে পৌছিবে। আমি পুনরপি বলি, মিঃ. সেনের কার্য্যাবলীতে আমাদের গভীর অনুরাগপূর্ণ সহানুভূতি ছিল, এবং তাঁহার মৃত্যুতে আমরা কত গভীর মনোবেদনা অনুভব করিয়াছি।

"আপনাকে এবং আপনাদের সকলকে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, এবং সেই সুখধামে যেন আমরা সকলে সম্মিলিত হইতে পারি, যেখানে মৃত্যু আর এই সকল বিষাদময় বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। এ সকল উক্তিতে আমার সহধর্ম্মিণীর যোগ আছে।

অতি সারল্যসহকারে আপনার
(স্বাঃ) স্পিয়ার্স।"

মার্টিনো, সাণ্ডারলেণ্ড ও মোক্ষমূলার প্রভৃতি
৫০০ সম্ভ্রান্তলোকের পত্র *।

"প্রিয় মিসেস্ সেন,

"ভারতবাসীদের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনের জন্য আপনার স্বামীর নিঃস্বার্থ ও

* I. Adair, I. Alexander, I. Allen, M. Anderson, E. Andrews, G. F.

মহান্ যত্নের কথা স্মরণ করিয়া, আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের এই শোকের সময়ে যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে, তৎসহ আমরা সকলে মিলিয়া

Armistead, A. Arnold, M. Atkinson, I. Atkinson, H. Austin, G. L. Apperson, R. B. Apperson, M. Ball, I. Bagshaw, C. H. Bauford, D. Bartlett, G. Batchelor, F. Bennet, R. Blackburn, L.E Bond, A. Browett, I. Browett, E. H. Ballard, A. Bourne, A. Brahner, I. Bradley, M. Bradley, M. Bramley, I. A. Brinkworth, I. Broadbent, E. Brookes, E. G. Brown, N. Burge, W. Burton, E. R. Butler, W. G. Cadman, E. Cannon, T. D. Carpenter, I. E. Carpenter, A. M. Carpenter, W. Caryne, H. Castle, W. H. Channing, I. M. Channing, F. A. Channing, B. M. Channing, S. Charlesworth, M. Charlesworth, M. Charlesworth, R. D. Charlton, F. A. Child, F. C. Clark, M. A. Clarke, I. Clarke, I. Clarke, I. Clay, M. Clay, F. Clay, E. Cleland, I. Christie, I. Christie, I. I. Clephan, E. Clephan, E. Clephan, I. H. Cliff, E. Coe, N. Coleman, W. Colsell, I. Colvin, M. Colvin, M. I. Cook, R. Cook, I. D. Conyers, O. Cornish, H. Cousins, E. Cousins, A. B. Cox, C. Cowan, Miss Craven, E. Crootes, M. Cross, I. Cross, H. R. Darlison, E. J. Darlison, S. Davies, M. E. Davies, W. Davis, S Davis, E. DeLaporte, A. V. DeLaporte, R. Dawson, A. Dean, A. Dean, I. Dean, S. Debenham, A. Debenham, A. Denning, A. Dimons, W. Dorling, S. Dundee, W. Duplock, H. Eade, E. M. Earp, R. E. Edwards, A. & M. Elliott, T. H. Elliott, T. R. Elliott, W. Elliott, I. Ellis, M. E. Else, E. Evans, M. Evans, T, Evans, R. Evans, J. H. Every, J. Every, G. Failes LePla, S. Farquhar, W. Fielding, J. H. Filchie, W. Ford, G. Fox, I. Fox, M. Fox, W. Galpi , H. I. Galpin, S. T. Galpin, T. S. Garriock, E. Gault, W. Gault, J. Gault, J. Geliner, T. E. Gillard, M. Gillespie, W. Glossop, F. & A. E. Glover, I. A. Goode, S. Greenway, W. & A. Greaves, I. Greenfield, F. W. Greenfield, F. J. Greenfield, T. H. Gregg, A. Grigg, A. Grinold, I. I. Gunge, E. P. Hall, E. Hall, I. Hall, E. C. Hall, M. Hall, T. Hailing, W. Hailing, I. Hamilton, I. Hamilton, E. Harding, A. J. Harding, C. Harding, W. Harker, G. Harris, E. Harrowin, I. Harrowin, H. Harsent, W. J. Harson, J. A. Haswell, H. Hawkes, M. Hemingway, A. B. Henry, M. Herbert, R. F. Higgins, H. Hilding, T. Hill, E. Hind, E. M. Hodgetts, G. Hollamby, M. Hollamby, J. Hopgood, N. Hood, A. Hood, W. S. Houghton, F. Houghton, E. Honston, G. Hulls, G. R. Humphery, I. Hunter, M. Hunter, M. Hutchinson, P. Hutchinson, Miss. Hutchinson, H. Jeffery, H. Jelly, C. Jecks, W. John, E. Jolly, O. J. Jones, T. L. Jones, I. S. Jones, R. I. Jones, R. Keating,

সহানুভূতি করিতেছি। যিনি পিতৃহীনের পিতা ও স্বামীহীনার স্বামী, আমরা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি যে, তিনি এখন ও চিরদিন আপনাদিগকে সান্ত্বনাদান ও রক্ষা করুন।”

M. Keating, A. R. Keating, E. I. N. Keating, R. A. Keating, I. Kodwords, A. Keeling, I. A. Kelly, I. Kerby, R. Kitching, A. Konon, E. Laird, I. Land, M. W. Lambert, M. Lambert, W. F. Landon, E. Lane, A. Lansdowne, E. Lansdowne, F. Lansdowne, G. Lansdowne, E. Lawrence, H. LeBreton, E. Lee, D. Lister, E. W. Lloyd, I Longdon, M. Longdon, E. Lucas, I Lynn, A Madocks, A F. Macdonald, I T. Mackey, R. E. B. Maclellan, F M'Cammon, I. M Caw, D. Maginnis, H. A. McGowan, E. & Mrs. Marsh, D. Macrae, E. Maeby, I. I. Marten, S. Mason, M. Martineau, D. Martineau, L. Mason, A. E. Marshall, H. Mason, G. Mason, I. Mason, W. M. ason, W. Mattocks, D. Matts, S. H. Matts, F. E. Millard, H. Minnitt, I. Minnitt, A I Minster, I. Miskimmin, I.C &E. Mitchell, G. Mitchell, I. K. Montgomery H. Moore, I. & E. Moore, H. Moore, I. Morgan, W. Morrow, F. Morley, E. Myers, L. M. Myers, F. Max Muller, F. Nettlefold, W. Noel, I. Nelson, W. Noddall, M. Noddall, I. Oakeshott, T. B. Oliver, I. K. Ovamo, M. C. Osborne, E. Osborne, I. Osborne, L. Oman, I. Owen, S. Owen, W. Parker, I. T. Parker, W. Parry, A. S. Patten, I. Payne, H Payton C. Peach, W. Phillips, D. Phillips, I. M. Pilkington, W. Plimpton, G. Pool, E Pond, F. C. Pond, W. E. Pond, K. A. Ponder, E. Ponder, L. Pope, A. Potter, A. Poulton, T. Prime, P. Prime, E. Prime, L. Prime, A. Pumphrey, I. Pyott, M. Pyott, F. Radley, I. Ramsden, G. Rayne, F. Y. Reed, D. Rees, W. Rex, G. Ride, T. Rix, C. D. Rix, I. Robberts, W. Robberts, A. Robertson, I. Robinson, P. Robson, E. Robson, F. H. Rogers, Y. De Rome, H. Y. Rowland, K. M. Rowland, H. K. Rudd, M. H. Rutt, I. Saint, I. W. Saint, M. Saunders, E. Saunders, Y. Sear, T. H. M. Scott, M. Serwenel, W. Serwenel, G. Sexton, J. Shelley, E. Shelly, W. Simms, M. Simmonds, G. W. Skinner, J. G. Slater, G. J. Slipper, C. M. Smith, J. D. Smith, E. Smith, J. Smith, L. J. Smith, M. C. Smith, W. Spackman, R. Spears, E. Spears, T. P. Spedding, H. Stanshald, M. Stannus, H. Stannus, A. W. Stannus, J. Steadman, I, E. Stephens, T. Stevenson, J. Stoate, M. Stoate, J. S. Stone, E. Sulley, F. Summers, I. & E. Sundell, J. T. Sunderland, W. E. Sunpner, J. & E. Tapp, E. E. Taylor, N. M. Taylor, H. S. Taylor, M. Taylor, J. Taylor, J. Taylor, J. Tebb, M. Tester, L. Tester, F. Thomas, J. Thomas, T. Thomas, D. Thompson, M. Tiffin, C. S. Tinney, J. Tinney,

অধ্যাপক কেসারলিঙ্গ

(ভাই প্রতাপচন্দ্রকে লিখিয়াছেন)

"সুইজারলেণ্ড জুরিচ,

"প্রিয় মহাশয়,

"আপনাদের সমাজের মহৎ প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কেশবচন্দ্র সেনের পরলোক-প্রাপ্তিতে আমরা আমাদের গভীর শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। অনেক বৎসর যাবৎ আমরা অতীব অনুরাগসহকারে এবং গভীর আধ্যাত্মিক একভাবাপন্নভাবে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। অনেক সময় মিঃ সেনের উপদেশ ও বক্তৃতার উচ্চ উদ্দীপনা ও গভীর সত্যে আমাদের মন আলোকিত হইয়াছে ও সমুন্নত হইয়াছে, এবং তাঁহার হৃদয়ের পবিত্র প্রবাহ আমাদের আত্মাকে অধিকার করিয়াছে। যখন তাঁহাকে লোকের কঠোর আক্রমণ বহন করিতে হইয়াছে এবং গুরুতর পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইয়াছে, এবং আমরাও তাঁহার সকল কার্য্য ও মতের অনুমোদন করিতে পারি নাই, তখনও আমরা এক মুহূর্ত্তের তরেও তাঁর অভিপ্রায়ের নির্ম্মলতার প্রতি সংশয় করিতে পারি নাই, এবং তিনি ভারতের মহত্তম সন্তানদের মধ্যে একজন, এইরূপে দেখিতে ক্ষান্ত হই নাই, এবং তাঁর স্বদেশীয়দের ধর্ম্ম ও নৈতিক পুনর্জীবনের জন্য তিনি মনোনীত পরিচালক, এ জ্ঞান করিতেও বিরত হই নাই। তিনি বিশ্বস্ততার সহিত প্রভুর সেবা করিয়াছেন, এক্ষণ তাঁহা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি শান্তিধামে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশীয়দের মধ্যে এবং

T. Towers, J. S. Toye, A. Turner, J. J. Turner, E. J. Turner, R. Turner, C. W. Tweed, E. Tweed, G. R. Twinn, N. M. Tyler, H. W. Tyndall, C. B. Upton, R. W. Waddell, W. Waid, R. D. Walbey, C. Walbey, W. Walker, D. Walton, G. Wamock, H. Warwick, H. J. Wastie, R. Waterall, T. N. Waterhouse, H. Watson, T. Weatherley, A. Webster, C. R. Welch, J. Willings, M. Willings, E. E. G. Wench, M. West, E. West, S. D. West, R. Wheatley, M. Wheatley, E. Whitelead, W. Whitecliff, H. Williamson, J. A. Willmett, S. Willmett, J. Wilson, R. Willson, M. Wilson, M. A. Wilson, M. Withall, L. Withers, E. Withers, W. Withers, J. Wright, A. Wood, G. S. Wood, E. Woodside, M. J. Woodside, C. Woollen, J. Woolley, R. Woolley, J. Wartlington, M. D. Wright, E. Wright.

সমুদায় মানবসমাজের লোকে তাঁহার নাম. কখনও বিস্মৃত হইবেন না। মিঃ সেন, বিশেষ ভাবে, জর্ম্মণ ও স্থইজারলেণ্ড দেশীয় উদারচেতা ধর্ম্মাধ্যাপকদের বিবিধপ্রকার হৃদয়ের সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন। উদারভাবাপন্ন কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্টধর্ম্মের গভীর আদর্শ-জ্ঞান ও গভীর অনুরাগ—ঐতিহাসিক কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাবিষয়ে পূর্ণ স্বাধীন বিচারের সহিত মিলিত হইয়া—ইংরাজ রাজকীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান অপেক্ষা জর্ম্মণ ধর্ম্মবিজ্ঞানের সঙ্গে একভাবাপন্ন হইয়াছিল। বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি কেন খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ করেন নাই, আমরা তাহার কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি। তিনি দেখিলেন, খৃষ্টানেরা আপনারাই বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন; অনেক নামতঃ খ্রীষ্টীয় ইতিহাস আদিম যিশুর সুসমাচারের অনুরূপ নহে, এবং সত্যও নহে, ইহা তিনি জানিতেন; ধর্ম্মবিষয়ক সত্য কোনও নামে কিংবা সমাজে একচেটিয়ারূপে আবদ্ধ নহে, ইহা তিনি জানিতেন; সুতরাং যদিও সুসমাচারের প্রকৃত ভাব তাঁহার ধর্ম্মাদর্শের কেন্দ্র ছিল, তবুও বিভিন্ন ধর্ম্মের সত্যসকল, বিশেষতঃ তাঁর স্বদেশীয় ধর্ম্মের সত্য তিনি অনুরাগভরে স্বীকার করিতেন। আমরাও প্রকৃত বিশ্বাসে খ্রীষ্টান। ঈশ্বর মানবজাতির অপরাপর অংশেও তাঁহার সত্যের সাক্ষী সকল রাখিয়াছেন, আমাদের পক্ষেও ইহা বিশ্বাস করা প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস করি যে, বিশেষতঃ হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক গভীর নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সত্য আছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যে সকল সত্য আমরা খৃষ্টীয় সত্য নামে আখ্যাত করি, তাহার অনেক সত্য খৃষ্টানধর্ম্মের বহির্ভূত ধর্ম্মাত্মা লোকের জানা আছে ও তাঁহারা সে সকল অনুষ্ঠান করেন। যদিও সত্যের পরিমাণ, দিক্ এবং কথার বহু ভিন্নতা আছে, সত্য কিন্তু মূলতঃ এক, ইহা আমরা মানি।

"পূর্ণ খৃষ্টধর্ম্ম,—যাহা এখনও তাহার অনুযায়িবর্গের পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় নাই, বরং অনেক সময় তৎকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়াছে,—অন্যান্য ধর্ম্মের সত্য আপনার অন্তর্ভুক্ত করেন; অন্যান্য ধর্ম্মেরও অন্তিম লক্ষ্য সেই দিকে, এবং যখন তাহাদের আদর্শের পূর্ণতা লাভ হইবে, তখন সেই লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইবে। অন্যান্য ধর্ম্ম যেরূপ উদ্ভূত হইয়াছে, খৃষ্ট ধর্ম্ম তদতিরিক্ত কোনও অলৌকিক প্রণালীতে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। যিশু খৃষ্ট আমাদের নিকট মানবাতীত অন্য কোনও ব্যক্তি নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে

যোগযুক্ত ব্যক্তি; তাঁহার অন্তরে প্রত্যেক মানবের ভবিতব্য, ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ পিতৃভক্তি ও মানবের প্রতি পূর্ণ ভ্রাতৃপ্রেম অতি উজ্জ্বলরূপে ও বিশুদ্ধরূপে আয়ত্তীকৃত হইয়াছিল, এবং সেই ভবিতব্যের প্রতি মানবজাতির চিত্ত আকর্ষণ করিবার ও উহা আয়ত্ত করিবার পক্ষে তাঁহার কথা ও ভাব মহা-কার্য্যকরী শক্তি।

"মিঃ সেনের মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ বিনষ্ট হইবে না, এ আশাতে আমরা আশ্বস্ত হই। প্রিয় মহাশয়, আপনি আমাদের নিকট বহুকাল যাবৎ উক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রসিদ্ধ প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত আছেন; আমরা নিশ্চিত আশা করি যে, পিতৃহীন নববিধান সমাজের আপনি অতি সুদৃঢ় পৃষ্ঠ-পোষক হইবেন। যেহেতু আপনি বিগত বর্ষে স্বয়ং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া তদ্দেশবাসী একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে বন্ধুতার বন্ধন সুদৃঢ় করিয়া-ছেন; অতএব আমরা আশা করি যে, জর্ম্মণি ও সুইজারলণ্ডের যে সকল একেশ্বরবাদী বহু দিন যাবৎ আপনাদের সঙ্গে অধ্যাত্ম যোগে সম্বদ্ধ, তাঁহাদের সঙ্গে পত্রযোগে প্রসঙ্গ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। আমাদের নূতন 'জেনারাল প্রটেষ্টেণ্ট মিশন সোসাইটী' প্রতিষ্ঠা হইয়া অবধি আপনাদের ও আমাদের মধ্যে প্রকৃত উপকারী ভাববিনিময়ের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণ আরো অধিকতর অনুকূল হইয়াছে। খৃষ্টান নাম ও খৃষ্টীয় বাহ্যানুষ্ঠানে লোককে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য এ সভা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু পৃথিবীতে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উন্নতি এবং পরস্পর আধ্যাত্মিক উপকারের বিনিময় জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ বিনীতভাবে সকলের সঙ্গে সমবেতভাবে কার্য্য করিবার জন্য, যেন পৃথিবীতে স্বর্গীয় পিতার রাজ্যে সমুদায় মানবমণ্ডলী সম্মিলিত হইতে পারেন। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ভাগে এই সভা হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাতে পত্র প্রেরিত হইয়াছে। মিঃ চন্দ্র সেনের মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে নববিধানসমাজের পত্র তাঁহার নামে প্রেরিত হইয়াছে। উহা যথাস্থানে পৌছিয়াছে কি না, তাহা আমরা জানি না, তাই আর একখানা পত্র আপনার নামে পাঠাইতেছি। ইহার প্রত্যুত্তর পাইলে সুখী হইব, এবং ঐ প্রত্যুত্তর যদি ৪ঠা জুন নাগাইত ইউরোপে পৌছে, তবে দ্বিগুণ কৃতজ্ঞ হইব; কেন না সেইদিন ও তৎপর জর্ম্মণির অন্তর্গত উইমারে আমাদের সমাজের সাংবৎসরিক

হইবে। অধ্যাপক কেসারলিঙ্গ, জুরিচ, সুইজারলণ্ড, অথবা সাংবৎসরিকের সময়ে অধ্যাপক কেসারলিঙ্গ, জুরিচ, সুইজারলণ্ড, পোষ্টে রেষ্টেণ্টে, উইমার, জার্ম্মণি, এই ঠিকানায় পত্র পাঠাইলেই পাইব।

(স্বাঃ) অধ্যাপক কেসারলিঙ্গ
রেভারেণ্ড ডব্লিউ স্পিনার

"পুনঃ নিঃ—আমাদের ইংরাজী লেখার দোষ মার্জ্জনা করিবেন।"

নিউইয়র্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট

"মহৎ হিন্দুসংস্কারক বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুজনিত আমাদের শোক অপর পৃষ্ঠায় যোসেফ কুক সাহেব ভালরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর এক জন সাধুপুরুষ ছিলেন, মানুষের নিকটে সাহসী এবং ঈশ্বরের নিকট বিনম্র ছিলেন। তিনি এক জন খৃষ্টান ছিলেন, যদিও উহা তিনি জানিতেন না; তিনি যিশুখৃষ্টের ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভারত যে সকল আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে ঈশার শিক্ষা মহত্তম। পৃথিবীর সকল মহত্তম ব্যক্তিরই যেমন কখনও কখনও গভীর পাপবোধ উপস্থিত হয় এবং তাহার ক্ষমালাভের প্রয়োজন হয়, তেমনি তাঁহারও হইত; এতদ্দ্বারাই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত যোগ লাভ করিয়াছিলেন, (যাহা পাশ্চাত্য বিশ্বাসীরা অনেক সময় হারাইয়া ফেলেন) তাহাতেই তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে স্বীয় ইচ্ছা মিশাইয়া দিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের পরিণামদর্শী অবস্থাতে আমরা আমাদের নিজ মনের ক্রিয়া ও আত্মাতে ঈশ্বরের প্রভাবের পার্থক্য করিতে চাই না। তাঁহার সে অন্তরায় ছিল না। প্রাচীন কালের ভবিষ্যদ্‌বক্তাদের ন্যায় তিনি অন্তরাত্মাতে সুদৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীতে তাঁহার প্রভাব অনেক বিস্তৃত ছিল। তাঁহার প্রকৃত চরিত্র ও প্রভাব বিষয়ে লোকের মতের বিষম ভিন্নতা, পাদ্রীদের অনেকে তাঁহাকে কপটাচারী অথবা উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মোন্মাদ অথবা উভয়ই মনে করেন। যদি তাঁহা দ্বারা পরিচালিত সংস্কারকার্য্যের সঙ্গে জ্ঞানালোকিত সাধন ও পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণ না থাকিত, তবে তিনি তাঁহার মৃত্যুর পরে পূজিত হইতেন, আমাদের এ ভয়ের কিঞ্চিৎ কারণ ছিল, কিন্তু এক্ষণ ঐ সংমিশ্রণে উহা নিবারণ করিবে। যাহা হউক, আমরা মনে করি যে, তাঁহার জীবিতকাল অপেক্ষা

মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রভাব অধিকতর হইবে। তিনি মূষা ও মহম্মদের ন্যায় ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন, কেন না বিধাতা তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা বলা অধিক নহে যে, তাঁহার জীবন প্রদর্শন করিতেছে যে, যাঁহারা খ্রীষ্টজগতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের হইতে ঈশ্বর বড় দূরে নহেন, কেন না তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন।”

আমেরিকার বোষ্টন নগরে পার্কার মেমোরিয়াল গৃহে, ফ্রি রিলিজিয়াস্ এসোসিয়েশন নামক সভা কেশবচন্দ্রের স্মরণার্থ ১৮৮৪ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী এক সভা করিয়াছিলেন। সভার সভাপতি মিঃ পটার সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহার কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

“ফ্রি রিলিজিয়াস্ এসোসিয়েশনের একটী উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃযোগের বৃদ্ধিসাধন; আজকার সভাও সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আহূত। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের এক ব্যক্তি ও আন্দোলনের স্মৃতিপ্রতিষ্ঠার আমরা উদ্‌যোগ করিয়াছি; কিন্তু এমন সকল নৈতিক সম্বন্ধ আছে এবং আধ্যাত্মিক বন্ধন আছে, স্থান যাহার ব্যবধান নহে। এমন এক ব্যক্তির ও আন্দোলনের স্মরণার্থ আমরা উপস্থিত, যাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির ও দেশের অন্তর্ভুক্ত, যাহার এক জাতীয়তা নির্দ্দেশ করিতে গেলে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা ভাবিতে হয়। এখানে উপস্থিত সভ্যগণ যে ধর্ম্মে শিক্ষিত, তাহা হইতে উক্তব্যক্তি ও আন্দোলন অনেক ভিন্ন; কিন্তু এক প্রকার আধ্যাত্মিক যোগ আছে, তাহা জাতীয় সীমা দ্বারা বদ্ধ নহে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সমর্থ। এই ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, আমরা ফ্রি রিলিজিয়াস এসোসিয়েশনের পক্ষে এ সভা আহ্বান করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন অতি প্রসিদ্ধ নেতা ও প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা উক্ত ব্যক্তি ও সমাজকে স্মরণ করিতেছি। ... ...

“তাঁহার ধর্ম্মমতকে নহে, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে আমরা সম্মানের সহিত স্মরণ করিতেছি। ব্যক্তি অপেক্ষাও তিনি যে জন্য আমাদের নিকট পরিচিত, সেই ধর্ম্মসংস্কারের জন্য আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। ভারতবর্ষে অনেকে তাঁর জন্য শোক করিতেছেন, কেন না তাঁহারা তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুতা হইতে বঞ্চিত

হইয়াছেন; অনেকে শোক করেন, কেন না তিনি একজন অতি হৃদয়বান্, চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণকারী পুরুষ ছিলেন; অনেকে শোক করিতেছেন, যেহেতু তিনি তাঁহাদের প্রিয় ধর্ম্মবিশ্বাসের ও সমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু আমাদের নিকট তিনি এক জন ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজসংস্কারক। আমাদের সহানুভূতি এই জন্য যে, যিনি স্বজাতিকে উচ্চ ধর্ম্মবিশ্বাস, পবিত্র ও উদার চরিত্র এবং জীবন দান করিবার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

... ...

"আমার বোধ হয়, ফ্রি রিলিজিয়াস্ সোসাইটী দ্বারাই কেশবচন্দ্র সেন প্রথমতঃ আমেরিকাতে পরিচিত হন। তৎপূর্ব্বে সংবাদপত্রে ভারতবর্ষে এক জন ধর্ম্ম-সংস্কারক সেদেশের পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইত্যাকার অল্প অল্প সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল। তৎপর ডাল সাহেবের (ভারতে আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান প্রচারক) পত্রে তাঁর বিষয়ে পাঠ করিয়া, আমি মিঃ সেনকে পত্র লিখি। ইহা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের কথা, সেই বৎসর ফ্রি রিলিজিয়াস্ এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়াছে। এ সভার বিবরণ ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি তাঁহাকে জ্ঞাপন করি।

"কেশবচন্দ্র সেন তখন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। তিনি সেই পত্র পাইয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর বিবরণ সহ অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ও প্রেমপূর্ণ পত্র লেখেন। উক্ত পত্র ১৮৬৮ সনের বার্ষিক সভাতে পঠিত এবং কার্য্যবিবরণীতে ছাপা ও নিউইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকাতে ছাপা হয়। ইহাই আমেরিকার নিকট তাঁহার প্রথম সুসমাচার।

"এই পত্রপাঠে সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাহাতে যেমন ভাবের ও চিন্তার উচ্চতা, তেমনি ভাষার সৌন্দর্য্য, হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর, এ সমস্তই উচ্চতম শিক্ষার পরিচায়ক। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, বুদ্ধিমানের মত উত্তর পাইব এবং তাহাতে ভ্রাতৃত্বেরও বিনিময় থাকিবে; তৎসঙ্গে ইহাও মনে হইয়াছিল যে, পত্রলেখক অবশ্য কোনও ইংরেজ খৃষ্টান কেরাণী দ্বারা অনুবাদিত করিয়া উত্তর দিবেন, তাহাতে হিন্দুর সুসমাচারের ভিতরের ও ভাষার পরিচ্ছদ বিদেশীয় আকার ধারণ করিবে। কিন্তু যখন

আমি দেখিতে পাইলাম যে, চিঠি খানা তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত, তখন আমার মনে স্বতঃ এই চিন্তার উদয় হইল যে, এ পত্র সেই দেশ হইতে আসিয়াছে, যে দেশের লোককে আমরা পৌত্তলিক বলি ও আমাদের প্রচারক তথায় পাঠাই! যে সকল ইউনিটেরিয়ান্ বন্ধু উক্ত পত্র দেখিলেন, তন্মধ্যে একজন মহানুভবা বিদ্যাবতী মহিলা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'আপনারা কি মনে করেন, সত্য সত্যই একজন হিন্দু (পৌত্তলিক) এই পত্র লিখিয়াছেন ও রচনা করিয়াছেন? এবং তিনি যে ধর্ম্মসমাজের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন?' আমি তাঁহাকে এই মাত্র বলিলাম যে, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

* * * * *

বেঙ্গল পাব্লিক ওপিনিয়ন

"মৃত্যুর নির্ম্মম হস্ত আর একজন ভারতীয় মহাপুরুষকে হরণ করিল। বাবু কেশবচন্দ্র সেন আর নাই। বিগত তিন চারি মাস যাবৎ তিনি নানাবিধ পীড়াতে ভুগিতেছিলেন, ডাক্তারগণ অনেক দিন যাবৎই তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় ক্লেশ পাইয়া তিনি গত মঙ্গলবার প্রাতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমুদায় ভারত অন্ধকারময় হইবে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমেরিকা ও ইয়োরোপস্থ তাঁহার বন্ধুবর্গ ও সহানুভূতিকারিগণ ভারতীয়দের শোকাশ্রুতে আপনাদের শোকাশ্রু মিশাইয়া দিয়া শোক করিবেন। কেশবচন্দ্র এখনও প্রবীণ ছিলেন, যখন তাঁকে নিষ্ঠুর মৃত্যু হরণ করিল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স চল্লিশের কিছু উপরে ছিল। সমুদায় ভারতবর্ষ তাঁহার মৃত্যুতে গভীররূপে শোকগ্রস্ত হইবে। যে সমাজের তিনি প্রধান পুরুষ ও অবলম্বন ছিলেন, তাহার ক্ষতি দুর্নিবার। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে কেশবচন্দ্র একজন মহাপুরুষ, হয়ত মহোত্তম পুরুষ, এ কথা অল্প লোকেই অস্বীকার করে। বন্ধুশত্রুনির্ব্বিশেষে তাঁহার মৌলিক প্রশংসা ও তৎসহ তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক করেন। তাঁহার দোষ দুর্ব্বলতা তাঁহার ভস্মের সঙ্গে এক্ষণ প্রোথিত হইবে, কিন্তু তাঁহার সদ্গুণাবলী স্বদেশীয়দের বক্ষে চিরদিনের জন্য মহাসম্পদ্রূপে রহিল, এবং ঈশ্বর ও স্বদেশের গৌরবার্থে

শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইবে। দয়ালু ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে শান্তি দান করুন।"

বেঙ্গলী

"এদেশ ও বর্ত্তমান যুগ যে সকল মহত্তম পুরুষের জন্মদান করিয়াছে, গত মঙ্গলবার তাঁহাদের এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। ভবিষ্যতের রহস্যভেদ করিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। ভবিষ্যতের বিষয় যদি কিছু বলিবার আমাদের অধিকার থাকে, আমরা বলিতে পারি যে, বাবু কেশবচন্দ্র সেন ভবিষ্যৎ বংশীয়-দের অতিশয় শ্রদ্ধা পাইবেন, তিনি এক জন মহামানবগুরু বলিয়া সম্মান পাইবেন, মানবের ধর্ম্মপ্রকৃতির দিকে তিনি চিন্তার নব উৎস, কার্য্যের নব প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা ও ব্যক্তিগত কার্য্যকলাপের গুণসম্বন্ধে তাঁহার সমকালিক লোকদের মতের ভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, তিনি ভবিষ্যৎ বংশীয়ের নিকট এক জন মহামৌলিকশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ ও বক্তা বলিয়া প্রতীত হইবেন। তিনি মানবজাতির সেবার জন্য সমুদায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদি তাঁর দুর্ব্বলতা থাকে, উহা লোকে ভুলিয়া যাইবে; যদি তাঁর ভুল থাকে, আমাদের মধ্যে কেই বা ভ্রমশূন্য, তাহাও উপেক্ষিত হইবে। তাঁহার কার্য্যের স্মৃতি থাকিবে এবং তাঁহার কৃতকার্য্যতার জয় লোকে স্মরণ করিবে। স্বদেশের ধর্ম্মচিন্তাতে তিনি যে উদ্দীপনা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা লোকে সকৃতজ্ঞ অন্তরে ধারণ করিবে, এবং আমাদের মহাপুরুষদের মন্দিরে, যে মহামন্দিরে সকল কালের মৃত মহাত্মারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবেন, যাঁহাদের নামে আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি সঞ্চার করে, আমাদের জাতির সেই সকল মহাগুরুর পার্শ্বে তিনি স্থান লাভ করিবেন। চৈতন্য, রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র আধুনিক ভারতে ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি। লোকে তাঁহার শিক্ষার গুণে যত না হউক, কিন্তু তিনি যে স্বদেশীয়দের ধর্ম্ম ও নৈতিক চিন্তাতে এক উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে স্মরণ করিবে। তিনি এক মহাবিপ্লবের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি স্বদেশের মৃতপ্রায় নৈতিক ধর্ম্মজ্ঞানকে পুনর্জীবনদান করিয়াছেন। তাঁর কথায় এমন যাদুকরী শক্তি ছিল যে, তাহা নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিয়া দিত এবং মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চার করিত। এমন ব্যক্তি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন এবং আমরা আশা

করি, শীঘ্রই তাঁহার স্থায়ী স্মরণচিহ্ন-স্থাপনের উদ্যোগ হইবে। তিনি আমাদের জন্য জীবনধারণ করিয়াছেন, তিনি আমাদের সন্তানদের, সন্তানের সন্তানদের এবং আরো ভবিষ্যদ্বংশের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকুন। আমরা আশা করি, সকলে সর্ব্বপ্রকার ভিন্নতা বিসর্জ্জন দিয়া, আমাদের জাতির এই মহাপুরুষের সম্মানার্থ সম্মিলিত হইবেন।"

বঙ্গবাসী

"২৯শে পৌষ, ১২৯০

১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৪ খৃঃ

"নির্ম্মল নীলগগনে সহসা বজ্রাঘাত হইল। আজ সুমেরুশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আকাশ হইতে পূর্ণচন্দ্র খসিল; কেশব আর ইহজগতে নাই। মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে নিমতলার ঘাটে যাহা পুড়িয়াছে, কতকাল হইল, ভারতের কোন শ্মশানে তাহা পুড়ে নাই। ভাগীরথী সে দিন যে ভস্ম ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন, আজ কতকাল হইল, পুণ্যসলিলের পবিত্র স্রোতে সেরূপ ভস্ম মিশায় নাই। কতকাল হইল আনন্দময়ী কলিকাতা নগরীর এরূপ নিরানন্দ ঘটে নাই, শীতঋতুর এ সুখদিনে আনন্দ কোলাহল কখন এরূপ নীরব হয় নাই। আজ সহসা দিবসে আঁধার দেখা দিল, বঙ্গভূমি আঁধার হইল, ভারতবাসীর গৌরব কেশবচন্দ্র স্বজন-সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

"২৫শে পৌষ, মঙ্গলবার, বেলা ৯টা ৫৩ মিনিটে, কেশবচন্দ্রের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু চাহিয়া রহিল, আর পলক পড়িল না, যেন জগদ্বাসীকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, "ভাই ভাবিও না, আমি চলিলাম,— দুই দিন পরে শুভদিনে স্বর্গে অনন্ত সমক্ষে আবার তোমার আমার সাক্ষাৎ হইবে।" সেই সদা হাসি মাখান মুখে আজ কালিমা পড়িয়াছে, তথাচ প্রফুল্ল অধরে শান্তির রেখা ঘুচে নাই; যেন মনে হইল, একবার "কেশব, কেশব" বলিয়া ডাকিলেই আবার তিনি হাসিমুখে কথা কহিবেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র আজ অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত, মহাযোগে নিমগ্ন—শত চিৎকারেও আর কথা কহিলেন না। সম্মুখে সজলনয়ন রাজাধিরাজ কুচবিহারাধিপতি জামাতা, পার্শ্বে রোরুদ্যমান পুত্র, চতুর্দ্দিকে হাহাকারী শিষ্যবৃন্দ, আর অদূরে বিয়োগ-বিধুরা সহধর্ম্মিণী—আলুলায়িতকেশা, উন্মত্তা, ধূলিধূসরিতকলেবরা। আর ঐ

যে ধরাবিলুণ্ঠিতা বৃদ্ধা "বাপ, কোথায় কোথায় গেলি" বলিয়া কান্দিতেছেন, উনি কে? উনি অভাগিনী জননী। মা, দুঃখ করিও না, তোমার সন্তান ভারতকে শিক্ষা দিল, ইউরোপকে মোহিত করিল, জগৎ আলোকিত করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন! ইহ সংসারে তোমার মত রত্নগর্ভা কে?

"কুক্ষণে কেশবের এমনি রোগ জন্মিল যে, নশ্বরজগতে কেহ আর আরাম করিতে পারিল না। আজ দুই বৎসর হইল, কেশববাবু বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হন। তিনি শিমলা শৈলের শীতলবায়ু সেবনার্থ চলিয়া গেলেন। তথায় ডাক্তারেরা বলিল,"আপনি মানসিক চিন্তা, লেখাপড়ার কাজ একেবারে ত্যাগ করুন।" কেশব তখন শারীরিক পরিশ্রমে ছুতার মিস্ত্রীর কার্য্যে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, ব্রাহ্মসমাজের 'নবসংহিতা' রচনা আরম্ভ করিলেন। রোগ বৃদ্ধি হইল। তথাচ ভ্রূক্ষেপ নাই, রুগ্ন অবস্থাতেই এই সুবৃহৎ গ্রন্থ শেষ করিলেন। এই সময় তিনি আবার যোগশাস্ত্রসম্বন্ধে আপন মতামত প্রকাশ করিয়া একখানি গভীর চিন্তা-প্রসূত গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করেন। ডাক্তারের নিষেধ শুনিলেন না, বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ শুনিলেন না, ধ্যানমগ্ন রোগীর ন্যায় যোগশাস্ত্র রচনায় ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু শরীরে সহিল না, রোগ বৃদ্ধি হইল, ক্রমে গুরুতর হইল, পাথুরি ও শ্বাস-রোগ দেখা দিল; তথাচ ক্ষান্ত নাই, যোগশাস্ত্র মুদ্রিত হইতে লাগিল, রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া কেশব প্রুফের পর প্রুফ দেখিতে লাগিলেন। শরীর অবসন্ন হইল, সেই সর্ব্বাবয়বসুন্দর পুরুষের অঙ্গ বিশীর্ণ হইল, চক্ষে কালিমা পড়িল; স্মিথ, ম্যাকলেন, মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি চিকিৎসকগণ নিরাশ হইলেন। ১৮ই পৌষ যখন তিনি আপন আবাসভূমি কমলকুটীরের উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, চেয়ারে শোয়াইয়া তাঁহাকে নীচে নামাইতে হইয়াছিল। ২০শে পৌষ তিনি যোগশাস্ত্রের শেষ প্রুফ দেখিয়া বলেন, 'এ সংসারে আমার এই শেষ কার্য্য।' ২২শে পৌষ পীড়া আরো বৃদ্ধি হইল। কেশব অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, যেন মহাযোগী মহাধ্যানে বিভোর হইলেন। ২৫শে পৌষ প্রাতঃকালে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিল, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হইল, গৃহে হায় হায় শব্দ উঠিল; তখন হরির সেই মধুময় নাম উচ্চারিত হইতে লাগিল, যেন কেশবের কাণে সুধা ঢালিতে

লাগিল। বেলা প্রায় দশটার সময় কেশব ইহসংসার ত্যাগ করিলেন। বঙ্গভূমি আঁধার হইল।

"সেই দিন অপরাহ্নে 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে,' 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে'—এই মধুর রবের সঙ্গে সঙ্গে কেশবের মৃতদেহ নিমতলাভিমুখে নীত হইল। কেশব পালঙ্কে শয়ান, পট্টবস্ত্র পরিধান, শরীর শালে আবৃত, চারিদিকে ফুলের রাশি; বদন অনাবৃত, চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছে। কেশবের সঙ্গে সহস্রাধিক লোক; আজ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম বিচার নাই, সকলেই অবনতবদনে, ধীরে, গম্ভীরে, ছলছল নয়নে, শবের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। নিমতলার ঘাটে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা দিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী প্রবাহিতা, সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ; চন্দনকাষ্ঠে কেশবের চিতা সজ্জিত হইল। ভক্তবৃন্দ গাহিতে লাগিলেন;—'এস মা আনন্দময়ী।' ইংরেজ পুরুষ ও ললনা, হিন্দু ও মুসলমান প্রায় দুই হাজারের অধিক লোক নীরবে নিস্পন্দে দণ্ডায়মান। তখন সন্তান পিতার মুখাগ্নি করিলেন *; চিতা ধূ ধূ জ্বলিতে লাগিল, মাটীর দেহ মাটীতে মিশিয়া গেল।

"সব ফুরাইল; কিন্তু সকলি রহিল। কেশবের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল বটে, কিন্তু কেশবচন্দ্র, যাবচ্চন্দ্রদিবাকর, জীবিত রহিলেন। পঁচিশ শত বৎসর পূর্ব্বে এক দিন কুশীনগরে রুদন্তি নিচ্ছবি সমক্ষে বুদ্ধদেব কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নীলাচলে শচীনন্দন চৈতন্য দেহবিমুক্ত হয়েন, পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় বিলাতে ব্রিষ্টল নগরে সমাধি প্রাপ্ত হন, কেহই ইহসংসারে আজ নাই; কিন্তু সকলেই আজ মানবজাতির হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। কেশবমূর্ত্তি সম্মুখে নাই বটে, কিন্তু কেশবের অমর অন্তরাত্মা চিরদিন মানবকুলের অন্তরে বিরাজ করিবে। সেই মনোমোহন মূর্ত্তি, সেই মধুর কথা, সেই তেজস্বিনী বাগ্মিতা, সেই মোহনমুখে হরিনাম-কীর্ত্তন, কে ভুলিবে? যিনি ব্রাহ্মসমাজের বীজ, জাতীয় জীবনের উৎস, যাঁহার বাগ্মিতায় ইউরোপ মুগ্ধ, ব্রাইট গ্লাডষ্টোন চমকিত, এমন মহাপুরুষের নাম কেন না চিরস্মরণীয় হইবে? কেশব সুলভ সংবাদপত্রের উদ্ভাবক; কেশব সাধারণ শিক্ষার প্রবর্ত্তক; কেশব বহু বিবাহের শত্রু, কেশব বিধবা-

* চিতায় অগ্নি দিলেন।

বিবাহের আকাঙ্ক্ষী, উনবিংশ শতাব্দীর মহাযোগী, ইউরোপ আমেরিকায় উপাসিত, এই ভারতের মুকুটমণি কেশবকে কে বিস্মৃত হইবে?

"আজ কমলকুটীরের মধ্যাহ্ন সূর্য্য অকালে অস্ত গেল, টাউন হল বক্তাশূন্য হইল, বিডনপার্ক আঁধার হইল, ব্রহ্মমন্দিরের বেদী আচার্য্যহীন হইল। এ শূন্যপদ কে পূরণ করিবে? লর্ড লরেন্স যাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, লর্ড রিপণ যাঁহার কথা মান্য করিতেন, হোলকার সিন্ধিয়া যাঁহার উপদেশ বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন, সেই মহাপুরুষের মহাপদ আজ কে পূরণ করিবে? হতভাগ্য বঙ্গদেশ! তুমি অকালে কত রত্ন হারাইলে, অসময়ে সন্তান হরিশ্চন্দ্র প্রাণত্যাগ করিল, অসময়ে দ্বারকানাথের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল, অসময়ে কবিকুলচূড়ামণি মাইকেল স্বর্গে গেলন;—আর আজ অকালে ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমে, প্রবীণত্বের প্রারম্ভে কেশবচন্দ্র অনন্তধামে নীত হইলেন।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একাদশ কল্প

প্রথম ভাগ

মাঘ, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৪।১৮০৫ শক।

"আমরা শোক-সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন গত ২৫শে পৌষ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মধ্যাহ্নের সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। অযথাকালে তাঁহার জন্য যে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন হইল, এই আমাদের বড় ক্ষোভ। তাঁহাকে দেখিতে পাইবার আর আমাদের আশা নাই, তাঁহার সেই সুকণ্ঠ-বিনিঃসৃত স্নিগ্ধ ও কোমল বাক্য শুনিবার আর সম্ভাবনা নাই, এবং আমরা তাঁহার পবিত্র সংসর্গলাভেও জন্মের মত বঞ্চিত হইলাম, এই আমাদের বড় দুঃখ। তাঁহার সেই পুণ্য জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ বিনীত মুখচ্ছবি আমাদের স্মৃতিপটে অবিনশ্বর বর্ণে অঙ্কিত রহিয়া গেল। এখন অনন্ত ক্ষেত্রে তাঁহার প্রচার-ভূমি। তিনি বক্ষ হইতে পৃথিবীর ভার অবতারণ করিয়া, নূতন রাজ্যে নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন। এখানে আমাদের হাহাকার, কিন্তু সেখানে তাঁহার মহোল্লাস। তিনি যথায় গিয়াছেন, তথায় সুখে থাকুন। যিনি জীবন ও মৃত্যুর প্রভু, তিনিই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে রক্ষা করুন।

"অনেকেরই জন্ম স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য, কিন্তু মহাত্মা কেশবচন্দ্রের জন্ম সমস্ত পৃথিবীর জন্য। তাঁহার বিশাল হৃদয় জাতি ও বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ব্যথিত হইত। এই জন্য তাঁহার জীবনের যেটুকু স্বার্থ, সাধারণে তাহা উদ্বোধিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণের একটা ব্যাকুলতা ছিল। তিনি অকাতরে সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়া, এই ব্যাকুলতা-শান্তির জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং জীবনের সার ধন ধর্ম্মকে দীন দুঃখী অনাথের মধ্যে বিতরণ করেন। ফলতঃ কেশবচন্দ্রের অশ্রান্ত শ্রমস্বীকার ও দীপ্ত উৎসাহে ক্রমশঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ বিদেশ অধিকার করে। তিনি ধর্ম্ম কি, যেরূপ বুঝিতেন, মুক্তির সংবাদ যেরূপ পাইতেন, দ্বারে দ্বারে তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষা ইঁহার দাস, কবিত্ব ইঁহার সহোদর, বাগ্মিতা ইঁহার বাল্যসখা এবং প্রতিভা দৈব পুরস্কার। এই শ্রীমান্ ধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্রে অটলপদে দাঁড়াইয়া যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, জগৎ তাহা কখন ভুলিবে না। ইঁহার পবিত্র উজ্জ্বল জীবন দীপ্ত দিবালোকের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া, অনেককেই মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়াছিল। সঙ্কটে অধ্যবসায়, গন্তব্য পথের কণ্টক শোধন করিবার জন্য চেষ্টা, প্রতিপক্ষের অত্যাচার সহিবার জন্য মহানুভাবতা এবং সকলকে এক সূত্রে বাঁধিবার জন্য দক্ষতা কেবল ইঁহারই ছিল। এই সমস্ত বিষয়ে এই মহাত্মার পদাঙ্ক বালুকারাশির উপর নয়, শিলা-পট্টে পতিত আছে। এক্ষণে এই উজ্জ্বল ভারত-নক্ষত্র অস্তমিত, যদিচ তিনি অস্তমিত, কিন্তু তিনি যশ ও কীর্ত্তিতে জীবিত। যদিও ইদানীং আমাদের সহিত তাঁহার কোন কোন বিষয়ে কিছু মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তথাচ আমরা এক জন প্রকৃত বন্ধু ও ভ্রাতাকে হারাইলাম এবং প্রধান আচার্য্য মহাশয় এক সময়ে যাঁহার উপর ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও একটী সর্ব্বপ্রধান সৎশিষ্যকে হারাইলেন।

"উজ্জ্বল নক্ষত্র কিবা বঙ্গের খসিল,
মহাদ্রুম বাত্যাহত পড়িল ভূতলে।
ভারত অমূল্য নিধি কিবা হারাইল,
কেশব! তোমার তরে কাঁদিছে সকলে।
শুভক্ষণে জন্ম তব ভারত ভিতরে,
ভারতের তরে তুমি সঁপিলে জীবন।

রহে তব সুধা-বাণী সবার অন্তরে,
রবে তাহা সুরভিয়া ব্যাপিয়া ভুবন।
সে বাণী আত্মার তব জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
সে আত্মা নিয়ত ভরা স্বর্গীয় প্রেমেতে।
সে বাণী স্বর্গের সুধা করিত আভাস,
ডুবাত সবারে কিবা প্রেমাশ্রুজলেতে।
ভক্ত মহাজন তুমি ছিলে হে ধরায়,
পিতার অমৃত তুমি বিলালে ভুবনে।
তব কথাগুলি মিলি আত্মায় আত্মায়,
শরণ লইত সবে পিতার চরণে।
অকালে নিলেন পিতা তোমারে তুলিয়া,
পৃথিবী তোমার তরে করে হাহাকার।
তাঁর ইচ্ছা কর পূর্ণ স্বরগে থাকিয়া,
চির শান্তি হোক এবে তোমার আত্মায়।"

প্রভাতী

(প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শ্রুত)

"কেশবের মধ্যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি (Spiritual insight) এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল যে, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায়ে সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও চমৎকার বোধ হইত। যে কোন প্রকারের, যতই কঠিন হউক না কেন, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্ন করিবামাত্র, অষ্টাদশ-বর্ষীয় যুবা কেশবচন্দ্র তদ্দণ্ডে নিজ স্বভাবসুলভ সরল ভাবে ও ভাষায় সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। বেদ, কোরাণ, জেন্দাভেস্তা, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের কোন স্থানেই ঐরূপ উত্তর পাওয়া যাইত না, সুতরাং উহা কেশবের নিজের হৃদয়ের উত্তর, অথচ অতি প্রাঞ্জল, জ্ঞানগর্ভ, হৃদয়গ্রাহী, শ্রুতমাত্র ব্যুৎপত্তিপ্রদায়ক বলিয়া অনুভূত হইত। আমি বেদ ও বাইবেল তন্ন তন্ন করিয়াও ঐরূপ ভাব পাইতাম না। কোন স্থানে কখন পড়ি নাই, অথচ আমার হৃদয়ের ভাবের সহিত মিলিয়া যাইত। আমি প্রতিদিনই কেশবের সন্দর্শনলাভমাত্র ঐরূপ ২।১টী প্রশ্ন উপস্থিত করিতাম, মুহূর্ত্তেকের মধ্যেই যেন নিজের বিদ্যালয়ের

অভ্যস্ত পাঠাবৃত্তির ন্যায় উত্তর প্রদান করিতেন। কেশবের অভিনবত্ব এত অধিক ছিল যে, হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত সুন্দর। যে ভাষায় হউক না কেন, সেই ভাষা জানুন বা না জানুন, যেরূপ অক্ষর দেখিতেন, অবিকল তাহার প্রতিলিপি করিতে পারিতেন। একদা আমি তাঁহাকে পারসি ভাষার পুস্তক দিয়াছিলাম, সেই পুস্তক কলিকাতার কোন দোকানে পাওয়া যাইত না। কেশবের তখন পারসি বর্ণ-পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু পারসি পড়িবেন বলিয়া ঐ পুস্তক-খানি আমার নিকট হইতে লইয়া যান, পর দিন প্রাতে আসিয়া ঐরূপ আর একখানি পুস্তক আমাকে দেখাইলেন, উহা ছাপা বোধ হইল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলাম, এই পুস্তক তুমি কোথায় পাইলে! সুন্দর ছাপা, চমৎকার বই। কেশব বলিলেন, 'ভাল করিয়া দেখুন'। আমি অনেক ক্ষণ সন্দর্শনের পরেও কহিলাম, ইহা নিশ্চয় ছাপা, তুমি কোথায় পাইলে। শেষে কেশব হাস্যান্বিত হইয়া আমার কৌতূহল ভাঙ্গিয়া বলিলেন, ইহা আপনার পুস্তকের অবিকল প্রতিলিপি করিয়া আমি স্বহস্তে লিখিয়াছি।" (১৮০৫ শকের ১লা মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)।

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

(ক)

কতকগুলি বিশেষ কথা

এই সংস্করণের ৫০ পৃষ্ঠায় দেওয়া ফুট্‌নোটের (Foot note) মধ্যে উপ-রেরটী উপাধ্যায় মহাশয়ের দেওয়া। নিম্নের তুইটী সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়টী লইয়া নানা লোকে নানা প্রকার অলীক গল্পের সৃষ্টি করিয়া অনৃত কাহিনী প্রচার করিয়াছেন। তাহার ফলে লোকমধ্যে ভ্রান্ত ধারণার আবির্ভাব হইয়াছে। সেজন্য বিষয়টী পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক বিধায়, এ সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যতদূর তাহা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা এই পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিয়া, ৫০ পৃষ্ঠার ফুট্‌নোটের সংযোজনরূপে দেওয়া গেল। তন্মধ্যে Indian Mirror সম্পাদক স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন, কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরী এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যতম প্রিয়শিষ্য স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি ও পত্রাদি বিশেষ মূল্যবান।

ইং ১৮৭৪ সাল হইতে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের বহুকাল পর পর্য্যন্ত, তাঁহার নামে কালিমা লেপন ও তাঁহাকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা হইয়া আসিয়াছিল। ফলে বহু বিদ্বেষপ্রসূত ও অনৃতকাহিনীপূর্ণ গ্রন্থ পত্রিকাদি * এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যস্থ বিরোধী দল হইতে এবং ব্রাহ্ম-

---

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-রচিত "History of the Brahmo Somaj"—"New Dispensation and the Sadharan Brahmo Somaj"—"নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" গ্রন্থাদি এবং "সমদর্শী". "সোমপ্রকাশ" ইত্যাদি পত্রিকা। ইহা ছাড়া রামকৃষ্ণ-পরমহংসের শিষ্যদের দ্বারা রচিত অনেকগুলি পুস্তক।

সোমপ্রকাশে প্রকাশিত একটী কবিতা (কেশবকে লক্ষ্য করিয়া) নমুনাস্বরূপ নিম্নে দেওয়া গেল :—

"সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার অপরূপ লীলা।
(তুমি) চর্ব্ব্যচোষ্য লুচি মার, যত চোট্ গেলাসের বেলা!

সমাজের বাহিরের দল বিশেষ ও লোক দ্বারা অন্যায় ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণতঃ যাঁহাদের প্রকৃত বিবরণ পাইবার ও পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই, তাঁহাদের ঐ অনৃতকাহিনীপূর্ণ পুস্তকপাঠে কেশব সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মিয়া থাকে। প্রতীচ্যদেশে সাধারণতঃ কেহ কোন বিষয়ে কিম্বা কোন লোক সম্বন্ধে কিছু লিখিবার বা বলিবার পূর্ব্বে, সেই বিষয় সম্বন্ধে বা লোক সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সময়ে সময়ে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, তাঁহারাও ঐ প্রকার অনৃতকাহিনীপূর্ণ গ্রন্থাদিকে প্রকৃত বিবরণপূর্ণ পুস্তক মনে করিয়া, ভুল ধারণা করিয়া প্রতারিত হয়েন। আমাদের দেশেরও অল্পসংখ্যক লোকই প্রকৃত ব্যাপার উদ্ঘাটন করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত। অনেকেই কোন ঘটনা বা কোন লোকের বিষয় সমালোচনা করিবার সময়, বিষয়টীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, অলীক গল্পকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়া, তাহার উপরই নির্ভর করিয়া লিখেন ও সমালোচনা করেন। যে ঘটনা বা যে লোকের বিষয় আলোচনা করেন, সে বিষয়ের ও সে লোকের লেখা পুস্তকাদি পড়িয়া প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করেন না। কাজেই তাঁহাদের লেখায় সত্যের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে অসত্যেরই প্রচার হয়। দেখা গিয়াছে যে, কেশব ও তাঁহার দলস্থ লোকের পুস্তকাদি যাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া পাঠ করিয়াছেন,

---

তোমার গাড়ী নইলে প্রচার হয় না,
তেতলায় বেঁধেছ চালা।
আবার নিরাকারে পূজা কর, দিয়ে গন্ধপুষ্পমালা॥
তোমার রেঁধে খাওয়া পরম সাধন,
নিজের হাতে রুটী ডলা।
(আবার) হাতা বেড়ী যোগের যন্ত্র,
আসল সাধন শিকেয় তোলা॥
ভাল খেলা খেল্‌লে যা হোক্,
জন্মে কলির সন্ধ্যা বেলা।
যত মেড়াকান্ত হ'ল ভ্রান্ত,
যেমন গুরু, তেমনি চেলা॥"

(May 1876 ; সোমপ্রকাশ)

তাঁহাদের সকলেরই কেশবের প্রতি শ্রদ্ধা গাঢ়তর হইয়াছে এবং বিপক্ষ দলের রচিত পুস্তকাদিপাঠে যে ভুল ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছে। এমন কি, যাঁহারা স্বয়ং পূর্ব্বে কেশবের প্রতি অতিশয় রূঢ় ও অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্ত্তী কালে নিজেদের পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বের লিখিত পুস্তকাদির মধ্যে যে সব উক্তি আছে, তাঁহার পরবর্ত্তী কালের লেখা ও উক্তি সেই সকলের সম্পূর্ণ বিপরীত *।

Prof. Dwijadas Dutt এক সময়ে কেশব-বিদ্বেষী বিরোধিদলের অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পরে তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় অনুতপ্ত হয়েন। তাঁহার স্বীকারোক্তি এবং অন্যান্য অনেক তথ্য ও প্রকৃত কথা তাঁহার রচিত "Behold the Man" পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নিজের লেখা Diaryর এক খণ্ডে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজকে (সাধারণ সমাজকে) wrong tractএ (বিপথে) লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কন্যার রচিত পিতৃজীবনীতে ঐ খণ্ড হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী ঐ জীবনীতে আরো লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার ডায়েরির অন্যখণ্ডগুলি আরো চমৎকার উক্তিতে পরিপূর্ণ এবং উহা যখন প্রকাশিত হইবে, তখন লোকে দেখিবে, উহা কি অমূল্য জিনিষ! দুঃখের বিষয় সেগুলি এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল না। যদি ঐ ডায়েরীগুলি ও তাহাতে লেখা অত্যাবশ্যকীয় কথাগুলি প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে উহা একটী মহাপরাধের কার্য্য হইবে, সন্দেহ নাই। শিবনাথ-জীবনী হইতে পাওয়া যায় যে, পরবর্ত্তী কালে শিবনাথের অতিশয় অনুতাপ হয়। কেশব-প্রচারিত "আদেশ" সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বে যে বিদ্রূপের ভাব ছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রদ্ধার ভাব ধারণ করে এবং তাঁহার রচিত "গুরুবন্দনায়" তিনি কেশবকে "আদেশানুগতোভক্তঃ কেশবো ব্রহ্মসাধকঃ" বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি ঐ গুরুবন্দনাটী প্রত্যহ আবৃত্তি করিতেন।

---

* G. C. Banerji প্রণীত "Keshubchandra and Ramkrishna" এবং "Keshub as Seen by his Opponents" এবং তাঁহার সঙ্কলিত "Keshubchandra Sen—Testimonies in Memoriam" 2 Vols. দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিত শিবনাথ, যিনি এক সময়ে "নববিধানকে" অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ও পুস্তকাদিতে বিদ্রূপ করিয়াছেন, সেই "নববিধান" সম্বন্ধে ইং ১৯১০, জানুয়ারি মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আহূত সভায় স্বয়ং বলিতেছেনঃ—

"কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে এক উদার আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বজনীন মহাধর্ম্মরূপে দেখিতে পান এবং তাহা ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার প্রদত্ত 'Jesus Christ—Europe and Asia', 'Greatmen' প্রভৃতি বক্তৃতা এবং 'শ্লোক-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ ঐ মহাভাব-পরিচায়ক। বলিতে গেলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদারতা ও সার্ব্বজনীনতা তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান ভাব ছিল। ইহা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার আকাঙ্ক্ষাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং তাঁহার চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ইহা পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার নববিধানের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাবকে প্রসব করে। ইহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য। এ কার্য্যের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব প্রতীতি করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও জগতের ধর্ম্ম সকল প্রাচীন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লইয়া বাস করিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা দেখিতে পাইতেছে না ; কিন্তু দিন আসিতেছে, যখন তাহা দেখিতে পাইবে। তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তি পাইবে।"

এই বক্তৃতায় শিবনাথবাবু আরো বলিতেছেন ঃ—

"কে না স্বীকার করিবেন যে, পূর্ব্বোক্ত ভাবগুলি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবনকে গাঢ়তা প্রদান করিয়া, স্থায়ী আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন ? কেবল কুসংস্কারের প্রতিবাদ ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ঘোষণা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম নহে, জাতীয় জীবনে আধ্যাত্মিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করা ইহার প্রধান কার্য্য।"

"কেশবচন্দ্র যে সকল ভাব প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, সেই সকল ভাব রক্ষা করিতে পারিলে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবন যে গাঢ় ও গভীর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গাঢ়তা-সম্পাদনের পথ তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।"

"কেশবচন্দ্রের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ, ঈশ্বরাদেশের বশবর্ত্তী হওয়া।

এই উপদেশ তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।"

"আচার্য্য কেশবচন্দ্র আধ্যাত্মিক অর্চ্চনার ন্যায় মানবের সামাজিক জীবনকে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত করিলেন।"

"তিনি (কেশবচন্দ্র) ব্রাহ্মসমাজের এই এক মহোপকার সাধন করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্রস্বরূপ বা তাঁহার বিধান, এ সত্যটি ব্রাহ্মদিগের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ যে সেই মঙ্গলময় পুরুষের কৃপার বিধান, তাহাতে কি সন্দেহ আছে ?"

"তিনি (কেশব) ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভক্তির ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছেন। ... .. এই পথে অনুসরণ করিয়া তিনি বঙ্গীয় ধর্ম্মসমাজের ইতিবৃত্তে 'ভক্তকেশব' নামের উপযুক্ত হইয়াছেন।"

যে প্রচারকদলকে শিবনাথ পূর্ব্বে কতই বিদ্রূপ করিয়াছেন, সেই প্রচারকদিগের সম্বন্ধে শিবনাথই স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) অপর একটী প্রধান কার্য্য, ঈশ্বরের করুণাতে বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক, তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ করিতে পারেন, এরূপ এক প্রচারকদল সৃষ্টি করা। ... ... তাঁহাদের অনেকে কল্য কি খাইব, সে চিন্তা না করিয়া, মহা উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ঝাঁপ দিলেন। ... ... এই বিশ্বাসী দল দেখা না দিলে, ব্রাহ্মসমাজকে এক্ষণে সকলে যাহা দেখিতেছেন, তাহা দাঁড়াইত কিনা সন্দেহ।"

[শিবনাথপুত্র শ্রীমান্ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত শিবনাথপ্রদত্ত "মাঘোৎসব বক্তৃতা, ১৯১০ খৃঃ—'মহর্ষি দেবেন্দ্র ও কেশবচন্দ্র'"—এবং G. C. Banerji কৃত "Keshub as seen by his Opponents" দ্রষ্টব্য।]

শিবনাথ ১৯১০ খৃঃ, ৮ই জানুয়ারি তারিখে, Keshub Anniversary দিনে (at the Scottish Church College) বলেন :—

"বঙ্গদেশ যখন তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন শ্রীচৈতন্যের সমুত্থান হইয়াছিল। আবার চারি শত বর্ষ পরে যখন বঙ্গভূমি-ভারতভূমি পতিতদশাপন্ন, তখন এখানে মহাপুরুষদের সমাগম হইল। আজ যাঁহার (কেশবের) প্রতি

শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য আমরা এখানে সমাগত, তিনি সেই শ্রেণীর একজন মহাপুরুষ।"

শিবনাথ বাবু তাঁহার প্রদত্ত Lahore Speechএ (১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৭ খৃঃ) বলিয়াছেন ঃ—

"It was he (Keshub) who first distinctly articulated the special feature of Brahmoism as a religion of obedience to the Divine Will. Before his time Brahmoism was a religion of intellect. It was he who first taught that the culture of the heart was as much necessary to religion as that of the mind. He brought devotional fervour and enthusiasm into the Brahmo Somaj and transformed the religion of intellect which Brahmoism before his time was, into a religion of heart and soul. It was Keshub Chunder Sen who first taught us to revere the good and pious men of all ages and countries."

"From him (Keshub) we learnt the lesson of reverence, and it is through his influence that reverence for godly men, without which religion can not stand, has become a permanent and noble feature of Brahmoism. Further he gave us the idea of Brahmoism as a Divine Dispensation......... Keshub Chunder Sen is the originator of all these special features that characterise the Brahmo Somaj as a spiritually elevated society."

[From the "Theist", Lahore—Reproduced in the "World and the New Dispensation" 29th September, 1923, also in "Keshub as seen by his Opponents" pp. 13 and 14.]

শিবনাথবাবু অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ—

"Mr. Sen's (Keshub's) conception of the great and

glorious mission of the theism of the Somaj to unify conflicting sects and creeds, was certainly prophetic."

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় ও একজন অগ্রণী Dr. V. Roy কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' ও অন্য গ্রন্থাদি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া, 'জীবনবেদ' ইংরাজিতে অনুবাদ করেন ও তাহার নাম 'Bible of Life' দেন। এই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন :—

"Keshub is up to now, *the highest water-mark* of the universal religion of the Brahmo Somaj, and it may be safely predicted that his *Jeeban Veda* will occupy a permanent and honourable place in the religious literature of the world."

অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন :—

"—that all sincere and thoughtful men who had no first hand knowledge of Keshub's article (All religions are true") will think twice before accepting such charges against the greatest religious teacher of Modern India."

(From—Indian Messenger—July 29, 1923.)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় সভ্য স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী তাঁহার প্রণীত 'দীপ্তি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"কেশবচন্দ্রের উদয় ও ব্রাহ্মধর্ম্মের চরম উন্নতি একই কথা। তাঁহার জীবন এবং সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় একই কথা। তিনি বিশ্বজনীন উদারতা এবং স্বাধীনতার মহা-সম্মিলন সংঘটন করিয়া যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বহু যুগ লাগিবে।"

সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত 'অনুশীলন' ১ম ভাগে বলিয়াছেন :—

"ঐ মহাত্মা (কেশবচন্দ্র) সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।"

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন (বীরপূজা)—"এরূপ

(কেশবের মত) মহাপুরুষের সংখ্যা জগতে অতি বিরল। এ অবস্থায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— জীবন, মরণ কিছুরই উপর হেয়োপাদেয়তা জ্ঞান থাকে না। ... ... মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই দশায় উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি ধন্য ও জগন্মান্য। তাঁহাকে আমরা বার বার নমস্কার করি। ... ... তাঁহাকে আমরা মুক্ত পুরুষজ্ঞানে বার বার নমস্কার করিতেছি। হে দেব! তুমি আমার পূজা গ্রহণ কর। ওঁ শান্তিঃ।"

অধ্যাপক N. N. Ghosh, F.R.S.L., (London) Bar at-law লিখিয়াছেন :—

"He (Keshub) thus came to his idea of the Harmony of Religions, of the Religion of the New Dispensation, most fiercely attacked by those who know it least."

"Keshub has agitated the speculative thought of all the English-speaking Bengalees. There have been many 'leading men' but scarcely another such leader of thought."

(খ)

সত্যের অনুসরণ করিতে গিয়া ও নিজ বিশ্বাস ও ভগবদ্ ইঙ্গিত অনুযায়ী কার্য্য করিতে গিয়া আচার্য্যদেবকে যে কত অপমান ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অনৃত প্রচার বা কৌশলে দলপুষ্টি করা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল। বরঞ্চ তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম্মসমাজে অল্প লোক হইলেও ক্ষতি নাই। আসল লোক অল্পসংখ্যক হইলেও শক্তিশালী।

তিনি দুষ্ট propagandaকারী লোক ছিলেন না। অসত্য বা অর্দ্ধসত্য দ্বারা কোন বিষয় লোকের মুখরোচক করিয়া জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কাহাকেও জানিতেন না। মনুষ্যকে তিনি কোন কালে গুরু বা মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরাভিপ্রায় বুঝিতে চেষ্টা করিতেন ও যাহা ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতেন, ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অনুগত দাসের ন্যায় তাহা করিয়া যাইতেন। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, তিনি

ভগবান দ্বারা আদিষ্ট হইয়াই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তাই অতি অল্প বয়সেই, ইং ১৮৬০ সাল হইতেই তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এবং বক্তৃতাদিতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উপাদানগুলির স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে সে সকল খবর না রাখিয়াই, মিথ্যা গল্পের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ভুল ও ভিত্তিহীন ধারণা লইয়া থাকেন। সত্য কিন্তু চিরকাল গোপন থাকিবার বস্তু নহে। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, সত্য নিজেকে প্রকাশ করিবেই করিবে। সত্যের জয় হইবেই হইবে। যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধানীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্যকে পরিণামে আবিষ্কার করিবেই করিবে। ইহার লক্ষণ এখনই কিছু কিছু দেখা যাইতেছে।

সমাজমধ্যে যখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সঠিক বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে; তাহা ছাড়া উপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকাংশ বিষয়ে নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান (personal knowledge) থাকায়, এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি লিখিবার অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

অনেক সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়া, কিম্বা তৎকালের লিখিত প্রকৃত বিবরণ না পাইয়া, কিম্বা না পাঠ করিয়া, ঘটনার বহু বৎসর পরে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বকপোলকল্পিত গল্পের সাহায্যে গ্রন্থাদি লিখিলে, কিম্বা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়াও অন্যায় উদ্দেশ্যে প্রকৃত ঘটনাগুলিকে বিকৃত করিয়া গ্রন্থাদি লিখিলে, তাহাতে যেরূপ অলীক ও প্রতারণাপূর্ণ গল্প ও ত্রুটি থাকে, বর্ত্তমান গ্রন্থে সে সকল ত্রুটীর স্থান নাই। সেজন্য এই গ্রন্থখানির মূল্য অত্যন্ত অধিক। ইহা সত্যানুসন্ধানীদের ও নিরপেক্ষ প্রকৃত ইতিহাসলেখকদিগের বিশেষ সাহায্যে আসিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(গ)

(৫০ পৃষ্ঠার ফুটনোটের সংযোজন)

কেশবচন্দ্রের পাঠত্যাগ ঘটনাটিকে কেহ কেহ বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অনৃত কাহিনী দ্বারায় বাড়াইয়া, প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করিয়া স্থানে অস্থানে প্রচার করিয়াছেন এবং বিকৃত বিবরণ মুখে মুখে বাড়িতে বাড়িতে অধিকতর বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে। এইরূপে কেশবচন্দ্রকে লোকচক্ষে হেয় করিতে

সাহায্য করা হইয়াছে। প্রচারকারীদের মধ্যে কেহই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, কিম্বা যাঁহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এমন কাহারও নিকট হইতে প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করেন নাই।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কেশবজীবনীতে (দ্বিতীয় সংস্করণ) এই বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে আছে। (প্রকাশ থাকে, ভাই প্রতাপচন্দ্রও ঘটনাস্থলে ছিলেন না, কিম্বা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, এমন কাহারও নিকট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও বলেন নাই।)

"—One of the Professors who were appointed to watch the examinies, found him (Keshub) comparing papers with the young man that sat next to him. It is difficult to say with whom the irregularity originated, whether with Keshub or with his neighbour."

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত বিবরণ ভাই প্রতাপচন্দ্র পান নাই, কিম্বা পাইতে চেষ্টা করেন নাই। কেশবও তাঁহাকে কিছু বলিলে, তিনি অবশ্য তাহা উল্লেখ করিতেন। অধিকন্তু বাল্যকাল হইতে কেশবের দৃঢ় নীতিজ্ঞান ছিল, এ বিষয়ের ব্যক্তিগত জ্ঞান প্রতাপচন্দ্রের ছিল। এই সকল কারণেই প্রতাপচন্দ্র নিঃসংশয়ে কেশবকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, প্রতাপচন্দ্রের ঐ লেখার উপর রং দিয়া, শিবনাথ তাঁহার "History of the Brahmo Somaj" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "He (Keshub) was caught using unfair means to pass one of his college examinations." 'রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গীয় সমাজ' গ্রন্থেও ঐরূপে বিবরণটী সাজাইয়া লিখিয়াছেন। শিবনাথের ব্যক্তিগত জ্ঞান এ বিষয়ে কিছুই ছিল না, অথচ তিনি এ ভাবে যে লিখিলেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইহা যে বিদ্বেষ-ভাব হইতে লেখা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিদ্বেষভাব তাঁহার নানা গ্রন্থাদিতে ও নানা স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী কালের অনুসন্ধানের ফল হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে যে, কেশবের প্রতি যে অসাধু আচরণের দোষ দেওয়া হইয়াছে, তাহা

একেবারেই ভিত্তিহীন ও অমূলক এবং কেশব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

কেশবচন্দ্র বড়ই অভিমানী ছিলেন এবং তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগায়, তাঁহার প্রতি অবিচার হওয়া সত্ত্বেও, তিনি Collegeএ নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে বিরত থাকেন। ইহাই তাঁহার চিরন্তন প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই প্রকৃত বিবরণ তাঁহার জননীর এবং নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নিকট বলেন।

অনুসন্ধানকালে বহুকাল পরে যখন কেশবজননীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাঁহার যেটুকু মনে ছিল, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। তাহার পরে নরেন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া যাইতেছে।

(১) কেশবজননীর উক্তি

"কেশব আর কৃষ্ণবিহারী ছোট বেলা থেকে বড় অভিমানী ছিলেন। ... ... এই অভিমানের জন্য দুই ভাইই জীবনে অনেক ভুগিয়াছিলেন। কেহ তাঁহাদের নিজের উপর অন্যায় অত্যাচার করিলে, তাঁহারা একেবারে গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। আপনার পক্ষে একটী কথাও বলিতেন না। এই জন্য কেশব ছেলে বেলায় আর একবার ভুগিয়াছিলেন। ছোট বেলায় যখন পড়িতেন, সেই সময় আর একটী ছেলে কেশবের কাছ থেকে কি একটা জানিবার জন্য জেদ্ করিতেছিল। মাষ্টার টের পান। কিন্তু যে ছেলে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সে বেশ চেপে গেল; কেশবকেই মাষ্টার দোষী মনে করিলেন। ইহাতে কেশবের অভিমান হইল—তিনি একটী কথাও বলিলেন না। নিজে শাস্তি লইলেন, তবুও নিজে যে নির্দ্দোষী, তাহা একটী বারও বলিলেন না।"

[কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, পৃঃ ৮২।
—যোগেন্দ্রলাল খাস্তগিরি সম্পাদিত।]

(২) Editor, "Indian Mirror," late Mr. Narendra Nath Sen's version :—

"I wish to say at once that this (what Pandit Shivanath Shastri wrote in his books on this matter and which has been

quoted above) is a libel on the memory of the good departed man (Keshub). Keshub and myself lived under the same roof. None of our family heard of the incident as it has been related. What actually happened was this. When Keshub was sitting at the examination, one of the boys near him spoke to him. Keshub who was naturally polite and affable, replied to his fellow-student, with the result that both of them were sent out of the examination hall. He described the incident to me on his return home, and from what I heard I did not think he was to blame. The statement that this incident had an effect upon Keshub in turning him to prayer and meditation, has been introduced, apparently to embellish the story. As a matter of fact, Keshub from his childhood was of a religious and meditative disposition. Keshub's scholastic career lasted till the age of twenty, and all that time he was a devout student of mental and moral philosophy."

[Vide "Narendranath Sen, Editor, Indian Mirror"—at pp. 93·94 of the "Appreciation of K. C. Sen" compiled and published by Rev. Mahendra Nath Bose—reproduced in "K. C. Sen—Testimonies in Memorial" pp 93-94, compiled by G. C. Bannerjee.]

(৩) স্বর্গীয় অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ও কেশবকে এ বিষয়ে নির্দ্দোষ মনে করিতেন।

(৪) শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যতম প্রিয় শিষ্য চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত খোলা চিঠি।

'নব্যভারত'—(জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯, পৃঃ ৮২) পত্রিকায় প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে লেখা খোলা পত্র হইতে উদ্ধৃত :—

"হিন্দু সংস্কার অনুসারে 'গ্রহবৈগুণ্য' বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। অশ্লেষা ও মঘা মানুষের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, ইহাও হিন্দুসংসারে চির বিদিত। আচার্য্য, উপদেষ্টা ও গুরুস্থানীয় ব্যক্তি হইলেও, কেশবচন্দ্রের প্রতি আপনার (শিবনাথের) প্রচুর সম্মানের ভাব, শ্রদ্ধার ভাব বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহার প্রতি আপনার অশ্লেষার দৃষ্টি, মঘার মারাত্মক আক্রমণ গোপনে কার্য্য করিতেছে কেন? তিনি বহুদিন লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে যুক্তিযুক্ত ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদিত আলোচনায় কেহ আপত্তি করিবে না। অধুনা শোকের ব্যাপারে পরিণত হইলেও, কুচবিহার বিবাহ বিষয়ক আলোচনা মোটের উপর বিধিসঙ্গত ভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে তাতেও আপনার হৃদয়ের লুক্কায়িত দারুণ বিরুদ্ধভাব বাহির করা যায়। কিন্তু তত খুঁটাইয়া অনুসন্ধান করিয়া আপনার ভিতরের ভাব বাহির করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে বিষয়টী সর্ব্ববাদিসম্মত অন্যায় কাজ, আমি কেবল সেই বিষয়টী সর্ব্বাগ্রে দেখাইতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ ৺ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনীতে কেশবচন্দ্রের ছাত্রজীবনের সামান্য একটা ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়া ইতিপূর্ব্বেই আপনি নিন্দার পাত্র হইয়াছিলেন। আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই, রামতনু বাবুর জীবনচরিতে কেশব বাবুর বাল্যজীবনের একটা ভ্রম বা অসাবধানতাকে উত্তমরূপে স্থায়ী করিবার প্রয়াস আপনার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল। আপনি সে জীবনচরিতে ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, এইরূপ ভূমিকা করিয়া, সে সময়ের অনেক ব্যক্তির বিষয়েই আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু বলিয়াছেন, তাঁহাদের আর কাহারও সম্বন্ধে কি কেশবচন্দ্রের পরীক্ষা বিষয়ক ত্রুটীর ন্যায় কোন প্রকার সামান্য বা বৃহৎ ত্রুটী দেখিতে পান নাই? অথবা আপনি ঐরূপ বহুলোকের জীবনী আলোচনা ক্ষেত্রে কেবল কেশবচন্দ্রেরই দোষ দেখিতে পাইয়াছিলেন? 'চাঁদে কলঙ্ক' সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু অপর সকলের কলঙ্ক-কালিমা ত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র কেশবচন্দ্রের কলঙ্ক-রটনায় এত ব্যস্ততা প্রদর্শন, আপনার শিক্ষা, দীক্ষা, পদমর্য্যাদা ও ধর্ম্মবুদ্ধির সমক্ষে কি একটা সঙ্গত কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন? লিখিতে বসিয়াছিলেন রামতনু বাবুর জীবনচরিত, তাহাতে আপনার আচার্য্য ও উপদেষ্টার

কোষ্ঠী-প্রণয়নের কি প্রয়োজন ছিল? আপনি কি আপনার পাঠকমণ্ডলীকে একথা বেশ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন? কেশবচন্দ্রের জীবনী-রচনা হইলেও বা কথা ছিল, কিন্তু ঐ বৃহৎ গ্রন্থের কয়টী পৃষ্ঠা কেশবচন্দ্রের আলোচনায় ব্যয় করিয়াছেন, এবং তাঁহার বহু কর্ম্মের সমগ্র উত্তমাংশ আলোচনা করিয়া কি স্থান এত প্রচুর এবং প্রয়োজনীয়তা এত প্রবল হইয়াছিল যে, ঐ পরীক্ষার কথাটা না বলিলে সে স্থানে আপনার ধর্ম্মবুদ্ধি আপনাকে তিরস্কার করিত? আপনার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া যদি স্বীকার করিয়া লই যে, আপনার কালি কলম, আপনার মন ঐরূপ ভাবে অন্যের জীবনচরিতে কেশবচন্দ্রকে ঐ প্রকারে চিত্রিত করার অধিকারের সুসঙ্গত যুক্তি আপনার ছিল, তাহা হইলে, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে যে উহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলের আলোচনায় বিরত রহিলেন কেন? সেখানে আপনার সুবিবেচনা আপনাকে তিরস্কার করিল না?

"এটা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় যে, যেখানে সে বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই, সেখানে তাহা করিলেন; যখন করিলেন, তখন সকলের প্রতি একটা সাম্যের ভাব প্রদর্শন করা আপনার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানই আপনার পক্ষে আদর্শ কার্য্য হইত। আপনি তাহা করেন নাই; এবং সেজন্য যথেষ্ট তিরস্কৃতও হইয়াছেন। কিন্তু ঘোর পরিতাপের বিষয় এই যে, সে তিরস্কারে আপনার কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হয় নাই। আপনি এই বর্ত্তমান আলোচ্য ইতিহাস গ্রন্থেও পুনরায় সেই অপ্রীতিকর অনাবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে আপনার ঐরূপ আলোচনার যে উত্তর বাহির হইয়াছিল, সেগুলিরও প্রত্যুত্তর দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এতেই বুঝা যায় যে, আপনি কেশবচন্দ্রের পরীক্ষাগারের ব্যাপারটীকে সাধারণ মানবীয় অসাবধানতা অপেক্ষাও গুরুতর বলিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং তাহাকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের ন্যায়, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন। কিছুতেই ছাড়িবেন না! যদি নিতান্তই ঐ ঘটনা ছাড়িতে অসম্মত হন, দুঃখ নাই, আমরা মনে করিব, এটা আপনার দুর্ব্বলতা; কিন্তু কখনই ইহাকে ন্যায়-বিচার বা বিধিসঙ্গত অনুষ্ঠান বলিব না, কেন বলিব না, তাহাই দেখাইতেছি।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন, সেই ইতিহাসে মহর্ষি মহোদয়ের জীবন-সংগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন, আর তাহা মোটের উপর এক প্রকার সুন্দরই হইয়াছে; পড়িতে আনন্দ হয় এবং লেখকের দূরদর্শন ও চিন্তাশীলতার প্রচুর প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের সংগ্রামটুকুও আপনার পাঠকমণ্ডলীকে দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই কেন? এখানে এ মজ্জাগত দুর্ব্বলতার পরিচয় দিবার আপনার কি অধিকার ছিল? যে অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের পরীক্ষাগারে অপর কোন বালকের সঙ্গে বাক্যালাপ তিরস্কার আনয়ন করিয়াছিল, এবং তাড়িত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে এবং আপনার সে কাজের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রচুর প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু সেই মহাশক্তিশালী পুরুষের দীক্ষাগ্রহণের দিন কৌলিক রীত্যনুসারে কলুটোলার সেনবংশের কুলগুরু বৎসরান্তে গৃহের পরিজনবর্গকে দীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইলে, গৃহের বয়স্ক বালকগণের দীক্ষার অনুষ্ঠান হইল। পূর্ব্বদিন বালকগণকে একত্র করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল। দলের মধ্যে কেশবচন্দ্রও ছিলেন। তিনি অতি শান্ত প্রকৃতির যুবক ছিলেন। অতি ধীরভাবে অভিভাবক ও গুরু-সমীপে নিজের আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন। ইতি পূর্ব্বেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া উচ্চ আদর্শের পথে পদার্পণ করিতে অগ্রসর, এমন সময়ে পরিবারে দীক্ষার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অভিভাবকগণ বাড়ীর যুবকগণকে কৌলিক ধর্ম্মের আচার আচরণে নিষ্ঠাবান করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, এমন দিনে এমন সময়ে কেশবচন্দ্রের দীক্ষা-প্রত্যাখ্যানে যে কি একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, তাহা কি আপনি অবগত নহেন? সে দিন সেই রাত্রিতে অভিভাবকগণ যে কেশবের মুণ্ডপাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কি আপনি অবগত নহেন? সে দিন এবং তৎপরদিন প্রাতঃকালে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইতেছেন, কেশবের দেখা নাই, তিনি বাহিরের ঘরে একাকী শান্তভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া যখন অভিভাবক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক দীক্ষার স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বলপ্রয়োগে উদ্যত, তখন যে ভগবান স্বয়ং কেশবের উদ্ধার-সাধনে অগ্রসর হইয়া গুরুমুখে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং গুরুর দ্বারা বলাইয়াছিলেন যে, 'এরূপ পীড়নপূর্ব্বক দীক্ষা দেওয়ায় উত্তম ফল

হয় না, আমি ইহার বিরোধী, এ বৎসর থাক, বালককে আগামী বৎসরে দীক্ষা দিলেই হইবে, উহাকে সময় দাও।'

"আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এ সংবাদ অবগত নহেন? এই সুবৃহৎ ঘটনাটীর অন্তরালে যে আরও গুরুতর ব্যাপার লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গেল, তাহাতেও কি আপনার দৃষ্টি পড়িল না? আশ্চর্য্য বটে! আপনি মহর্ষি মহোদয়ের যে সকল মহদ্‌গুণের পরিচয় পাড়িবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কেশবচন্দ্রের দীক্ষা-গ্রহণের অন্তরালে সেই মহর্ষিরই যে একটা অনন্যসাধারণ গুণপণার পরিচয় বিদ্যমান, তাহাও কি লক্ষ্য করেন নাই! তবে ইতিহাস লেখা কেন? কেশবচন্দ্র গৃহে দীক্ষার আয়োজন দেখিয়া চিন্তিতহৃদয়ে দেবেন্দ্রনাথ-সদনে উপস্থিত হইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মহর্ষি ব্রহ্মানন্দকে কি পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাও আপনি পূর্ব্বে কি অবগত ছিলেন না, ইহা কি আপনার নিকট নূতন সংবাদ? আপনি বলেন নাই, আমিই বলিয়া যাই। মহর্ষি বলিয়াছেন, 'এরূপ গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ও নেওয়া নিরাপদ নহে, এরূপ বিষয়ে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রেচ্ছ হওয়া উচিত, আর এরূপ বিষয়ে প্রত্যেকেরই আত্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলা অবশ্য কর্ত্তব্য।' এরূপ একটা ঘটনা ঘটায় কেশবের হৃদয়ের শক্তি, আত্মার আগ্রহ, পরীক্ষার মহামুহূর্ত্ত আপনি কোন্ প্রাণে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন? আবার গেলেন কোথায়, না, যেখানে কেশবের এক বিন্দু অনবধানতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে ও আগ্রহের সহিত তাহাই যেখানে যখন সুযোগ পাইয়াছেন লিপিবদ্ধ করিতে, ইহা কি খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? যাঁহারা জনমণ্ডলীর উপদেষ্টা ও গুরু, তাঁহাদের এতাদৃশ আচরণ যে অমার্জ্জনীয়, তাহা কি আপনি স্বীকার করিবেন না? আপনার যে সরলতা ও নির্ম্মল নিষ্ঠার ভাব দেখিয়া আমাদের হৃদয় সর্ব্বদা নাচিয়া উঠিত, সে মহাভাব কি এই গাঢ় কলঙ্ক-কালিমা-কলুষিত পক্ষপাতিতার পক্ষ সমর্থন করে? ইহাই কি আপনার ও আপনার দলের দারুণ দুর্ব্বলতা নহে? এই সুকঠিন ব্যাধির আক্রমণের প্রাবল্যে ধর্ম্ম-বস্তু কি স্থান পায়? যদি সত্যই এ অন্যায়ের প্রতিকারপরায়ণ হইতে প্রয়াস পান, তাহা হইলেই বুঝিব যে, আপনার চিরপূজনীয় পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর অশ্রুপাত

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়

ও দীর্ঘনিঃশ্বাস-ত্যাগ সার্থক হইয়াছে, নতুবা বুঝিব, দল-সর্ব্বস্ব মানবসন্তান না করিতে পারে, এমন কর্ম্মই নাই।*

(ঘ)

উপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক সম্বন্ধে মন্তব্য

THE SAMANVAYA-BHASHYAS OF THE LATE PANDIT GAURGOVINDA ROY UPADHYAYA

BY KOKILESHWAR SASTRI VIDYARATNA, M.A.

Pandit Gaurgovinda was snatched away by the cruel hand of death at a time when the lovers of Sanskrit literature were just beginning to receive the incalculable benefit of his able pen in the discovery and development of a harmony in the teachings of the great scholars, who represented the apparently conflicting theories in the six main schools which have branched out from the same enigmatical Aphorisms of Badarayana's Bramha-Sutra, including the teachings of the Bhagvad-Gita. A philosopher of great eminence and a powerful thinker and vigorous writer, his abilities were of a type that made his lines of thought invaluable in constructing work of a unique character in the domain of Indian philosophy, particularly in the Vedanta system. The fervour with which he vitalized the Vedantic movement, providing it with intellectual force, and at the same time inspiring it with a genuine devotional tone, enhanced the value of all his writings.

He was a master of debate in abstruse subjects. His

style was always characterized by great lucidity and a remarkable grandeur and dignity. Forgoing luxurious habits and courting the hard life of an ascetic, he dedicated himself to the study of Sanskrit and he has left behind a rich legacy in his immortal works—specially in his Upanishad or Vedanta Samanvaya and Gita-Samanvaya, commentaries of which India may justly be proud. He was second to none in the sacrifice he made for the cause of Sanskrit. Each of the pages of these two monumental works is full of profound and practical wisdom, making them very useful volumes for daily needs and giving solace to stricken souls.

Pandit Upadhyaya seems to have a special gift for finding harmony among ideas which to an ordinary mind appear bristling with conflict and to be amaze of puzzle. The author also utilized the results of modern critical research; and his observations and critical discussions on many a knotty point and on some most obscure and controversial passages of the Vedanta were most illuminating, and his Gita-Bhashya presents in almost all difficult stanzas the different views of eminent ancient commentators along with his own, enhancing the value of his work. These two works, together with his Gita-Prapurti—which last is a compendium of the famous Bhagavata Purana—embody sublime thoughts on spiritual life expressed in beautiful, pure, charming and chaste Sanskrit. His writings reveal a warm expression of the deeply spiritual side of his nature, coupled with a high sense of purity and love, which will not fail to keep the mind of the reader above the vulgar and sensuous plane,

offering at the same time a healthy intellectual treat to the mind.

These invaluable Sanskrit works of the late lamented author deserve to be very widely read. And we hope the publishers, if any, will place the works at different centres of India in such a way as to render them easily accessible to those who love Sanskrit and those also who take an interest in our Upanishads and the Bhagwad-Gita. We regret to find that there are many who are not even acquainted with the names of such works of the Upadhyaya. It is our firm belief that no spiritual aspirant can read these Samanvaya Bhashyas without experiencing an ennobling thrill of exaltation, both spiritual and intellectual.

The learned author made, for the first time, perhaps, in Bengal, an attempt to reconcile the contested points of disagreement between the two great commentators—Shankara and Ramanuja and this attempt at reconciliation, which was a desideratum for all scholars of philosophy, has, to our view, been attended with a unique success. His very thoughtful and learned discussions on several points of these two apparently irreconcilable and rival systems will, we are sure, carry conviction into the minds of the readers and at the same time throw a flood of light, clearing away several obscure points about them.

The editions already published of these big volumes seem to have been long exhausted and we hope the lovers of Sanskrit will not allow these invaluable gems of Sanskrit commentaries to be forgotten, for a careful perusal of them

is sure to repay the labour spent. The diction is so simple and refreshing that interest never lags and no exhaustion of brain is felt, although the discussions on many a passage are often exceedingly deep and penetrating. The Pandit seems to have left no worthy successor who could take up and continue their publication and thus secure the works against the fate of oblivion, into the gulf of which many a worthy Sanskrit work has fallen and been lost for good. We hope our appeal will not go unheeded.

The idea of unification and the finding of harmony where there is conflict, which marks and characterizes the writings of Pandit Gaurgovinda, received their original inspiration and first inception through his long connection with New Dispensation Church of the Brahmo Somaj, whose founder was the great Keshub Chunder Sen, who was his master. The grand unification of all the various religions of the world, which the great Keshub Chunder Sen tried to crystallize into a Universal Religion, founded by him in his own Church, effectively contributed to the growth of the idea of harmony which the Upadhyaya sought, like his master, to infuse into his own writings. It was the master's great personality which exerted its beneficial influence upon his worthy disciple, who did not fail to take the cue from him and to give it a practical shape in another direction. It was the light of the New Dispensation which has thus enlivened and left its permanent mark on these Sanskrit works.

His works deserve to be translated into English, so that the result of his researches may be known and published

among the learned men of other provinces and countries. His labour on the great work of the grammarian Patanjali, whose Bhashyas he explained under the title of Bhashya-Sangamani stands today as witness to his many-sided genius. But this work he could not finish in his lifetime. His was a life whose manifold usefulness could hardly be overestimated, and the country has been left poorer by the removal by death of this outstanding figure.

From 'The MODERN REVIEW'
of Sept. 1932—(pp. 280—281).

বিষয়নির্ঘণ্ট

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮২৮ (১৭৫০ শক, ৬ই ভাদ্র)	কলিকাতা	রামমোহন দ্বারা মাণিকতলা ষ্ট্রীটে কমল বসুর বাটিতে "উপাসনা-সমাজ" প্রতিষ্ঠা	১৫
১৮৩০, জানুয়ারী (১১ই মাঘ, ১৭৫১ শক)	"	কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা	১৫
১৮৩১	"	রামমোহনের বিলাতযাত্রা—'রাজা' উপাধি প্রাপ্তি	১৬
১৮৩৩, ২৭শে সেপ্টেম্বর	ব্রিষ্টল	রামমোহনের মৃত্যু	১৭
...	...	রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্ম	১৭
...	...	তাঁহার খৃষ্ট সম্বন্ধে মত	২১
...	...	তোহ্‌ফতুল মোহ্‌দীন	২২
১৮৩৯ (২১শে আশ্বিন, ১৭৬১ শক)	কলিকাতা	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রযত্নে "তত্ত্ববোধিনীসভা" প্রতিষ্ঠিত	২৪
১৮৪১ (১৭৬৩ শক)	"	তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত ব্রাহ্মসমাজের যোগ	২৫
১৮৪১	"	ব্রাহ্মসমাজে মাসিক উপাসনা আরম্ভ	২৫
১৮৪১ (১১ই মাঘ, ১৭৬৩ শক)	"	২১শে আশ্বিন তত্ত্ববোধিনীসভার সাম্বৎসরিক উপাসনার পরিবর্ত্তে ১১ই মাঘ সাংবৎসরিক উপাসনা	২৫

ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৪১ (১৭৬৩ শক)	কলিকাতা	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান	২৫

রামকমল সেন

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		কেশবচন্দ্র	
১৮৩৮, ১৯শে নভেম্বর (১৭৬০ শক, ৫ই অগ্রহায়ণ)	কলিকাতা (কলুটোলা)	কেশবচন্দ্রের জন্ম	৪১
...	...	কেশবচন্দ্রের বাল্যচরিত্র, আবদার-প্রিয়তা ও শুদ্ধচরিত্র	৪২।৪৩
...	...	বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রিয়তা, অধিনায়কত্বভাব	৪৪
১৮৪৫	কলিকাতা	কেশবচন্দ্রের ৭ বৎসর বয়সে হিন্দু-কলেজে ভর্ত্তি, অসাধারণ বুদ্ধির প্রভাব	৪৮
১৮৫২	"	Metropolitan Collegeএর উৎপত্তি। হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ	৪৯
১৮৫৩	"	কেশবচন্দ্রের Metropolitan Collegeএ অধ্যয়ন	৪৯
১৮৫৪	"	পুনরায় হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন (Note—এই ৫০ পৃষ্ঠার সংযোজন পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে)	৫০
১৮৫৪	"	ষোল বৎসর বয়সে পাঠত্যাগ	৫০
১৮৫২	"	মৎস্যাহারত্যাগ (চতুর্দ্দশ বৎসরে)	৫২
১৮৫৬	"	অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্ম্ম-জীবনের সঞ্চার	৫২
...	"	বৈরাগ্য-সঞ্চার	৫২-৫৩
১৮৫৬ ২৭শে এপ্রিল	"	বিবাহ (১৭৷৹ বৎসর বয়সে)	৫৪

সিংহল-ভ্রমণ

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
(১৭৮১ শক, ১২ই আশ্বিন)		কেশবচন্দ্রের 'নিউবিয়া' ষ্টীমারে সিংহলযাত্রা	৮১
১৮৫৯	পথে	সিংহল-ভ্রমণ বিষয়ে কেশবের ডায়েরী (Diary)	৮৩-১২৬
১৮৫৯, ৫ই অক্টোবর	সিংহল	সিংহলে (গলে) উপস্থিতি	৯৪
১৮৫৯, ২৭শে অক্টোবর	"	সিংহল হইতে কলিকাতা যাত্রা	১২৩
১৮৫৯, ৫ই নভেম্বর	কলিকাতা	কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন	১২৭
১৮৫৯, ২৫শে ডিসেম্বর (১১ই পৌষ, ১৭৮১ শক)	"	কেশবের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নিয়োগ এবং ধর্ম্ম-পিতা দেবেন্দ্রের সহিত অধিক সময় বাস	১২৮

বিষয়কর্ম্ম ও প্রবন্ধ (Tracts) লেখা

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৫৯, নভেম্বর	কলিকাতা	Bengal Bankএ কর্ম্ম	১২৯
১৮৬১, ১ জুলাই	"	হঠাৎ Bank of Bengalএর কর্ম্মত্যাগ	১৩০
১৮৬০, জুন	"	"Young Bengal, this is for you" প্রবন্ধ	১৩১
১৮৬০, জুলাই	"	"Be prayerful" প্রবন্ধ	১৩১
১৮৬০, আগষ্ট	"	"Religion of Love" প্রবন্ধ (২২ বৎসর বয়সে লিখিত) ইহাতে পরবর্ত্তী কালে প্রচারিত নব-বিধানের প্রায় সমস্ত ভাব ও	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উপকরণ নিহিত আছে	১৩১
১৮৬০, সেপ্টম্বর	কলিকাতা	"Basis of Brahmoism" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম-সহজ-জ্ঞানমূলক। ইহা মানবজাতিকে যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম অর্পণ করে, তাহাতে বিরোধ নাই, বিসংবাদ নাই, সাম্প্রদায়িকতা নাই। ইহা নববিধানের ভাবে পরিপূর্ণ	১৩২
১৮৬০, অক্টোবর	"	"Brethren, love your Father" প্রবন্ধ প্রকাশ—ঈশ্বরকে প্রত্যেক ব্যক্তির কি প্রকার ভালবাসা কর্ত্তব্য	১৩৩
১৮৬০, নভেম্বর	"	"Signs of the times"—স্বাধীনতা এবং উন্নতি ইহাই এ কালের জাগ্রত বাণী। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিনা অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার উনবিংশ শতাব্দীর ভাবোচিত নয়। ঈশ্বরে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ	১৩৪
১৮৬০, ডিসেম্বর	"	"An Exhortation" —সংসারাসক্ত হইলে কি প্রকার হীনাবস্থা হয়—সংসারের অসারত্ব	১৩৪
১৮৬১, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ	"	অষ্টম ও নবম প্রবন্ধ—সহজজ্ঞান যে সুদৃঢ় ভূমির উপর অবস্থিত, তাহা দেখান হইয়াছে	১৩৫

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬১, এপ্রেল	কলিকাতা	দশম প্রবন্ধ—কৃষ্ণনগরের খ্রীষ্টীয় প্রচারক ডাইসন সাহেবের ৬০টী প্রশ্নের উত্তর ও নূতন প্রশ্নগঠন	১৩৫
১৮৫১, মে	,,	একাদশ প্রবন্ধ—"Revelation" প্রকাশ। স্বয়ং ভগবান মনুষ্যের নিকট সত্য প্রকাশ করেন, ভগবানের বাক্য মানবহৃদয়ে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থে নহে। লিখিত গ্রন্থে সত্যের সঙ্গে অসত্য মিলিয়া গিয়াছে, সে জন্য কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত নহে। যে অংশ সত্য, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর গ্রন্থনিচয়ের মধ্য দিয়া, সমুদয় প্রকৃতির মধ্য দিয়াও মনুষ্যের হৃদয়ে সত্য প্রকাশ করেন। কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে অবমাননাসূচক বাক্যপ্রয়োগ ঘৃণার্হ	১৩৫
১৮৬১, জুন	,,	দ্বাদশ— "Atonement and Salvation"—ঈশ্বরের প্রেম পাপীর জন্যও উন্মুক্ত। উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিনা ঈশ্বরের করুণা পাওয়া যায় না। প্রায়শ্চিত্ত মানে, চিত্তের ঈশ্বরের দিকে অভিমুখীন হওয়া—পাপী পাপ করিয়া অনুতপ্ত হইলে তাহার চিত্ত ঈশ্বরের দিকে অভিমুখীন হয়	১৩৭

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
...	...	এই সকল প্রবন্ধপাঠে দেখা যায়, কেশবচন্দ্র প্রথম হইতে যে মূল-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে কখনও বিচলিত হন নাই বা অপর মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন নাই	১৩৮

বিবিধ কার্য্যাবলী ও ঘটনানিচয়

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬১, এপ্রিল	কৃষ্ণনগর	বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা অবস্থায়ই কেশবচন্দ্রের কৃষ্ণনগরে ধর্ম্মপ্রচা-রারম্ভ, কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা, পাদরী ডাইসন সাহেবের প্রত্যুত্তর	১৪০
১৮৬১, ১২ই মে	,,	খ্রীষ্টান পাদরীর পরাজয়—তত্ত্ব-বোধিনীতে কৃষ্ণনগরের প্রচার-বৃত্তান্ত (কেশবচন্দ্র-লিখিত)	১৪১
শ্রাবণ, ১৭৮৩ শক	কলিকাতা	ঐ বিষয়ে ১৭৮৩ শকের শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সম্পাদকের অভিমত	১৪৪
১৮৬১	কৃষ্ণনগর	ডাইসনের সহজজ্ঞানের বিরোধী প্রশ্ন সম্বন্ধে কেশবের উত্তর	১৪৬
১৮৬১, নভেম্বর (১৭৮৩ শক, অগ্রহায়ণ)	কলিকাতা	তত্ত্ববোধিনীতে কেশব-রচিত "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান" প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহা "সঙ্গতসভার" আলো-চনার ফল	১৪৯,১৫৭
১৮৬০ (১৭৮২ শকের মধ্যভাগ)	কলিকাতা	"সঙ্গত-সভা" প্রথম স্থাপিত ("সঙ্গত সভা" নাম মহর্ষির দেওয়া)	১৪৯

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬১, ২৬শে জুলাই	কলিকাতা	প্রথম ব্রাহ্মবিবাহানুষ্ঠান — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা সুকুমারী দেবীর বিবাহ। তদুপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশ কেশবচন্দ্রের দ্বারা নিবদ্ধ	১৬৫
১৮৬১, * ২২শে নভেম্বর (১২ই অগ্রহায়ণ, ১৭৮৩ শক)	„	দেশে প্রবল জ্বরের প্রাদুর্ভাব, উপশমের চেষ্টার নিমিত্ত অধিবেশন—কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও সেবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত	১৬৫,১৬৯
১৮৬১, ২২শে ডিসেম্বর	„	ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা—কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা—"কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশ্য নহে, বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধনকর ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করাও ইহার লক্ষ্য"	১৬৮
...	„	ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎকালীন অবস্থা	১৭১
১৮৬২, জানুয়ারি (১৭৮৩ শক, মাঘ)	„	দ্বাত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব—(আচার্য্যপদে বৃত হইবার তিন মাস পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে) কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা—"ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ইংলণ্ড, আমেরিকা সমুদয় এক করিবে"	১৭৩
১৮৬৩ (১৭৮৫ শক)	„	ব্রাহ্মবন্ধুসভা সংস্থাপন ও তাহার লক্ষ্য—ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান-	

* ইহার তারিখ ১লা ডিসেম্বর, ১৮৬১ খৃঃ দৃষ্ট হয়—Vide at page 89—Discourse and Writings (2nd Edition).

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		প্রচার, পুস্তকপ্রণয়ন, স্ত্রীশিক্ষা-বিধান ইত্যাদি	১৭৫
...	কলিকাতা	কেশবচন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা —অন্তঃপুরস্ত্রীশিক্ষা	১৭৫
...	"	ব্রাহ্মবন্ধুসভায় প্রচার সম্বন্ধে উপায় স্থিরীকরণ	১৭৭
...	"	মহর্ষি দেবের ব্রাহ্মবন্ধুসভায় বক্তৃতা	১৭৮
১৮৬১, ১লা আগষ্ট (১৮ই শ্রাবণ, ১৭৮৩ শক)	"	"Indian Mirror" (Fortnightly) প্রকাশিত হয়, মনোমোহন ঘোষ সাহায্য করেন, পামার সাহেব লিখিতেন	১৭৯
১৮৬২, ২৩শে জানুয়ারী (১৭৮৩ শক, ১১ই মাঘ)	"	নারীগণের অবরোধ-মুক্তি বিষয়ে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন—নিজ পত্নীকে মহর্ষির গৃহে আনয়ন	১৮০
"	"	দ্বাত্রিংশ মাঘোৎসব — মহর্ষির গৃহে অন্তঃপুরে উপাসনায় মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দান, কেশবের প্রার্থনা	১৮১
১৮৬২, ৩০শে জানুয়ারী	"	ভাই অমৃতলাল বসুর প্রথম পুত্রের নামকরণ। ব্রাহ্মণেতর জাতি কর্তৃক অনুষ্ঠানে কার্য্য—কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা	১৮২
১৮৬৪, ২রা আগষ্ট (১৯শে শ্রাবণ, ১৭৮৬ শক)	"	প্রথম অসবর্ণ বিবাহ ও তাহাতে কেশবচন্দ্রের পৌরোহিত্য	১৮৪

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬২, ১৯শে ডিসেম্বর	কলিকাতা	প্রথম পুত্রের জন্ম	২০১
১৮৬৩, ১১ই জানুয়ারি (১৭৮৪ শক, ২৮শে পৌষ)	"	স্বগৃহে ব্রাহ্মমতে পুত্রের জাতকর্ম্ম	২০২
১৮৬৩, ২১শে ফেব্রুয়ারি	"	ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে "ব্রাহ্মসমাজ ও সমাজসংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা —ধর্ম্মকে মূল না করিয়া দেশ-সংস্কার নিরতিশয় অনিষ্টের মূল	২০৫
১৮৬৩	"	ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মের গতি-রোধ, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কর্ত্তৃক 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার'—খ্রীষ্টান পত্রিকার প্রকাশ	২০৬
১৮৬৩, মে	"	খৃষ্টান প্রচারকগণ সহ বিরোধ বিষয়ে 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' উল্লেখ	২০৬
১৮৬৩, ২৮শে এপ্রিল (১৭৮৫ শক, ১৬ই বৈশাখ)	"	লালবিহারী দে প্রদত্ত 'Brahmic Intuition' বক্তৃতার উত্তরে কেশবচন্দ্রের 'The Brahmo Somaj Vindicated" বক্তৃতা (আদি ব্রাহ্মসমাজে)	২০৭
১৮৬৩	"	লালবিহারী দের "ব্রাহ্মধর্ম্মের সহজ-জ্ঞান" বিষয়ক লিখিত বক্তৃতায় অনেক অসত্য ও অলীক কথার উল্লেখ	২০৭
"	"	ঐ বক্তৃতাস্থলে কেশবচন্দ্র বিজ্ঞাপন দেন যে, ইহার প্রতিবাদ হইবে	২০৭

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬৪, ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৭৮৬ শক, ১৪ই আশ্বিন)	কলিকতা	ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমুদায় সমাজ মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন উদ্দেশ্যে, ৩০শে অক্টোবর "প্রতিনিধি সভা" প্রতিষ্ঠিত হইবার নোটিশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কেশবচন্দ্র সম্পাদকরূপে দেন	২২৮
১৮৬৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর	"	Medical College Theatreএ "Know thyself" বক্তৃতা	২২৯
১৮৬৪, অক্টোবর (১৭৮৬ শক, কার্ত্তিক)	"	"ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকার প্রথম প্রকাশ	২৩০
১৮৬৪, ৩০শে অক্টোবর (১৭৮৬ শক, ১৫ই কার্ত্তিক)	"	"প্রতিনিধিসভা" স্থাপন ও তাহার উদ্দেশ্য বর্ণন	২৩০
১৮৬৪ (১৭৮৬ শক, কার্ত্তিক)	"	পুনরায় উপবীতধারী উপাচার্য্যের কার্য্যারম্ভ	২৩২
১৮৬৪, ১৪ই ডিসেম্বর (১লা পৌষ, ১৭৮৬ শক)	"	কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ভার ট্রষ্টীরূপে প্রধান আচার্য্য স্বয়ং গ্রহণ করায়, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির কার্য্যভার ত্যাগ	২৩২
১৮৬৪	...	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকরূপে নিয়োগ ; প্রতাপচন্দ্রের প্রচারের দান-সংগ্রহের ভারপ্রাপ্তি ও কয়দিন পরে তাহার পরিত্যাগ	২৩৩

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬৪	কলিকাতা	বিবেকের জয়—ব্রহ্মজ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য কেশবের দলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা	২৩৩
১৮৬৪	„	বিবেকবাদী কেশবের দলের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে নির্ব্বাসন	২৩৪
১৮৬৫, ২৩শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ, ১৭৮৬ শক)	„	ট্রষ্টীগণ কলিকাতা সমাজের সম্পত্তি ও উপাসনাকার্য্য ইত্যাদির ভার গ্রহণ করিলে, উপাসনাদিঘটিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়, তজ্জন্য সমাজ-গৃহে কেশবচন্দ্রের প্রথম বক্তৃতা-দান—“সত্য সকলের জন্য”—ইহা লোক বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে	২৩৫
		(ব্রাহ্মধর্ম্মে সকলের অধিকার, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, ইংলণ্ডেরও ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহা জাতিগত বা সম্প্রদায়বদ্ধ নহে। জগৎ আমাদের দেবমন্দির, পরমেশ্বর উপাস্য দেবতা, স্বাভাবিক জ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র, উপাসনা মোক্ষপথ, সাধুগণ নেতা, ব্রাহ্ম সমাজ অসাম্প্রদায়িক; সকল জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব সঙ্কলন, দুঃখীদের সেবা কর্ত্তব্য — Vide Indian Mirror, Feb. 1, 1865)	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬৫, জানুয়ারী	কলিকাতা	Englishman পত্রিকায় দুই দলের বিরোধ বিষয়ে প্রবন্ধ	২৪০
১৮৬৫, ১লা ফেব্রুয়ারি	"	Indian Mirrorএ Englishmanএর লেখার উপরে কেশবচন্দ্রের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ	২৪১
১৮৬৪, ২৭শে নভেম্বর (১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৭৮৬ শক)	"	কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রতিনিধিসভার দ্বিতীয় অধিবেশন ও নিয়মাবলীর স্থিরীকরণ	২৪৫
১৮৬৫, ২৬শে ফেব্রুয়ারি (১৭৮৬ শক, ১৬ই ফাল্গুন)	"	সমাজে সভা করিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়ায়, চিৎপুর রোডে প্রতিনিধিসভার তৃতীয় অধিবেশন	২৪৭
১৮৬৫, এপ্রেল	"	কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর অনুরোধে ব্রাহ্মবন্ধুসভার বিশেষ অধিবেশন। ইংরাজী ভাষায় কার্য্যনির্ব্বাহ—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রবচনপাঠ, ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্যাখ্যানের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব বিষয়ে কেশবচন্দ্রের উপদেশ। পোপকৃত বৈশ্বজনীন প্রার্থনা-সঙ্গীত	২৫৩
১৬৮৫, ৭ই মে (১৭৮৭ শক, ২৬শে বৈশাখ)	"	প্রতিনিধিসভার চতুর্থ অধিবেশন	২৫৩

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬৫, ২রা জুলাই (১৭৮৭ শক, ১৯শে আষাঢ়)	কলিকাতা	সমাজের কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন, তদভাবে স্বতন্ত্রদিনে কেশবের দলকে উপাসনা করিতে দেওয়ার জন্য আবেদনপত্র ট্রষ্টী ও প্রধানাচার্য্যের নিকট প্রেরণ	২৫৬
১৮৬৫, ৬ই জুলাই (২৩শে আষাঢ়, ১৭৮৭ শক)	"	আবেদনের উত্তরে মহর্ষির অসম্মতি, পৃথক সমাজ স্থাপনে অমত নাই বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ	২৫৯
১৮৬৫, জুলাই	"	ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু সমাজের ক্রমোন্নতিবিষয়ক একখানি পত্র Indian Mirrorএ প্রকাশার্থ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন। তাহাতে প্রধানাচার্য্যের আদেশ —Indian Mirrorএ ভবিষ্যতে যে সকল লেখা সমাজ-সম্পর্কে যাইবে, তৎসমুদয় তিনি দেখিয়া না দিলে ছাপা হইবে না	২৬৫
"	"	পূর্ব্বোক্ত কারণে কেশবচন্দ্র Indian Mirrorএর কাগজপত্র নিজগৃহে আনিলেন। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু Publisher নিযুক্ত হয়েন	২৬৫
"	"	Indian Mirrorএ কেশবচন্দ্রের আত্মপরিচয় দান এবং মিরার পত্রিকা সম্বন্ধে বিরোধ বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তব্য	২৬৫
...	...	গোলযোগের কারণ ভাই মহেন্দ্রনাথ	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		বসুর ঐ পত্রখানির কতক অংশের মর্ম্ম ও কতক অংশের অনুবাদ	২৬৯
১৮৬৫, ২৩শে জুলাই, (১৭৮৭ শক, ৯ই শ্রাবণ)	কলিকাতা	সিন্দূরিয়াপটী গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে, কেশবচন্দ্রের "ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ" বিষয়ে বক্তৃতা	২৭১
...	"	কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া মণ্ডলী-বন্ধনের জন্য যত্ন	২৭২
১৮৬৫, ৩০শে জুলাই	"	প্রতিনিধিসভার পঞ্চম অধিবেশন	২৭২
১৮৬৫, ২৫শে আগষ্ট	"	সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত প্রণয়নের উদ্যোগ এবং পত্র প্রেরণ	২৭২
১৮৬৫, ২১শে অক্টোবর (৬ই কার্ত্তিক, ১৭৮৭ শক)	"	প্রতিনিধি সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন। কেশবচন্দ্র বলেন, প্রচারকেরা বেতনভোগী হইবেন না—তাঁহারা ঈশ্বরের দাস, মানুষ বা সমাজের দাস নহেন। তাঁহারা অবিভক্তচিত্তে আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিবেন, প্রতিনিধিসভা তাঁহাদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন	২৭৩
১৮৬৫	"	আন্দোলন খুব চলিল; কিন্তু প্রধান আচার্য্যের প্রতি কেশবচন্দ্রের অচলা ভক্তির বা	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		মহত্ত্বস্বীকারে সম্যক্ দৃষ্টির একটুও হ্রাস হয় নাই। এ বিষয়ে মিরারে প্রবন্ধ	২৭৭
১৮৬৫, অক্টোবর (১৭৮৬ শক, কার্ত্তিক)	কলিকাতা	সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লইয়া কেশবচন্দ্রের প্রচারার্থ পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রা	২৮৪
২৭শে অক্টোবর (১২ই কার্ত্তিক)	ফরিদপুর	ফরিদপুরে উপস্থিতি	২৮৪
২৯শে অক্টোবর (১৪ই কার্ত্তিক)	"	ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজে "ধর্ম্মের জীবন্ত ভাব" সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা	২৮৪
৩০শে অক্টোবর	"	ফরিদপুর হইতে ঢাকা যাত্রা	২৮৪
৩রা নভেম্বর	ঢাকা	ঢাকা নগরে উপস্থিতি	২৮৪
নভেম্বর	নৌকাপথে	পূর্ব্ববঙ্গে নৌকাযোগে ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ "True Faith" পুস্তিকা বিরচিত হয়	২৮৪
নভেম্বর	ঢাকা	জীবনবাবুর নাটমন্দিরে Faith, Love, Revelation, Catholicism বিষয়ে চারিদিন চারিটী বক্তৃতা। প্রিন্সিপাল ব্রেণেণ্ড (Brenand) সাহেবের আচার্য্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ	২৮৫
"	"	ঢাকাতেই 'ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা' ও 'ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা, বিষয়ে তাঁহার প্রথম মৌখিক বাঙ্গালা ভাষায় দুই দিন বক্তৃতা	২৮৬

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬৯, ৬ই ডিসেম্বর (১৭৯১ শক, ২২শে অগ্রহায়ণ)	ঢাকা	ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক — "সংসার ও ধর্ম্ম" বিষয়ে উপদেশ	২৯৩
৭ই ডিসেম্বর (২৩শে অগ্রহায়ণ)	"	ইংরাজী বক্তৃতা (True Life), সম্ভ্রান্ত হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ-গণের উপস্থিতি	২৯৩
"	"	ব্রহ্মমন্দিরে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ও কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি ৩৬ জন যুবকের প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণ,—"আধ্যাত্মিক পরিবার" সম্বন্ধে উপদেশ	২৯৩
১৮৬৬, ১লা জানুয়ারি	কলিকাতা	'Indian Mirror'এ "প্রতিনিধি-সভা" সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচারকার্য্যের প্রসারের বিবরণ	২৯৫
১৮৬৬, ২৩শে জানুয়ারি (১৭৮৭ শক, ১১ই মাঘ)	"	কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ষট্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক এবং পূর্ব্ব বৎসরে (১৮৬৫) ব্রহ্মানন্দ-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মিকা-সমাজের উৎসব কলি-কাতা ব্রাহ্মসমাজে নিষ্পন্ন হয়। ব্রহ্মোৎসবের কাজ মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ, কেশবচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মিলিয়া করেন	২৯৭
"	"	এই সাম্বৎসরিকে কেশবচন্দ্র "বিবেক ও বৈরাগ্য" বিষয়ে উপদেশ দেন। ইহাই কেশবচন্দ্রের কলিকাতা সমাজে শেষ উপদেশ	২৯৮

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		অক্টোবর Indian Mirrorএ তিনটী প্রবন্ধ (নূতন সংগঠনের কারণ প্রদর্শনার্থ)	৩১৫
১৫ই জুলাই	কলিকাতা	সহব্যবস্থানের বিসংবাদিতা (১ম)	৩১৫
১লা আগষ্ট	"	ধর্ম্মমতের বিসংবাদিতা (২য়)	৩১৮
১৫ই আগষ্ট	"	সমাজের পুনর্গঠন (৩য়)	৩১৯
১৮৬৬	"	ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপনের উদ্যোগ	৩২৫
"	"	ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বে সকল দেশ ও সম্প্রদায়ের শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত সত্য পুস্তকাকারে— "শ্লোক-সংগ্রহ" নামে প্রণয়ন—এই সময়ে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান	৩২৬
"	"	"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম-মন্দিরম্" ইত্যাদি। এই শ্লোক কেশবচন্দ্রের ভাব লইয়া উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত	৩২৬
১৮৬৬, ১১ই নভেম্বর (২৬শে কার্ত্তিক, ১৭৮৮ শক)	"	ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ — একশত বিংশতি জন ব্রাহ্মের আবেদনে, মিরারে ১লা নভেম্বর বিজ্ঞাপন দিয়া, চিৎপুর রোডে আহূত সভায় সংস্থাপন	৩২৬
...	...	ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		"ঈশ্বরের রাজ্য শব্দেতে নয়, কিন্তু শক্তিতে"	৩৮৪
১৮৬৭, জুন	কলিকাতা	ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বাবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া কেশবচন্দ্রের নিকট প্রতাপচন্দ্রের পত্র	৩৯৩
১৮৬৭, ৮ই জুন	"	কেশবচন্দ্রের প্রতাপচন্দ্রের পত্রের উত্তর	৩৯৪
...	"	দৈনিক উপাসনায় পূর্ব্বাবস্থার বিপরিবর্ত্তন ও ভক্তির সঞ্চার বিষয়ে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া প্রতাপচন্দ্রের সাক্ষ্যদান	৩৯৭
...	"	প্রার্থনাযোগে কেশবে ভক্তিসঞ্চার, ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির প্রবেশ	৩৯৮
১৮৬৭, ৫ই অক্টোবর (২০শে আশ্বিন, ১৭৮৯ শক)	"	ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ত্তন ও খোলের আগমন—প্রথম কীর্ত্তন আরম্ভ	৪০০
১৮৬৭, ২০শে অক্টোবর, (৪ঠা কার্ত্তিক, ১৭৮৯ শক)	"	১লা অক্টোবর মিরারের বিজ্ঞাপনানুসারে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে নির্দ্ধার্য্য বিষয় মধ্যে —১। প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে অভিনন্দনপত্র প্রদান। ২। "শ্লোক-সংগ্রহের" দ্বিতীয় সংস্করণ। ৩। রাজনিয়ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা নিরাকরণের উপায় অবধারণ ইত্যাদি	৪০৩

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬৭, ২১শে অক্টোবর, (৫ই কার্ত্তিক, ১৭৮৯ শক)	কলিকাতা	প্রধান আচার্য্যকে অভিনন্দনপত্র অর্পণ (সভার নির্দ্ধারণানুসারে, ৫ই কার্ত্তিক অভিনন্দনপত্র না দিয়া, ব্রাহ্মগণের নাম-স্বাক্ষরার্থ একমাসকাল প্রতীক্ষিত হইয়াছিল)	৪১৩
...	"	মহর্ষির প্রত্যুত্তর — "ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ" অধ্যায়ে পৃঃ ২৫—৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য (১৭৯০ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের ধর্ম্মতত্ত্বের ৩০শ সংখ্যায় প্রকাশিত)	৪১৬
১৮৬৭, ২৪শে নভেম্বর (৯ই অগ্রহায়ণ, ১৭৮৯ শক)	"	ব্রহ্মোৎসব প্রথম প্রবর্ত্তন কলুটোলা ভবনে—১লা ডিসেম্বরের Indian Mirrorএ উৎসবের বিবরণ	৪১৭
"	"	এই উৎসবে উপাসনা-প্রণালীর বিপরিবর্ত্তন	৪১৮
"	"	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সায়ংকালে ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তনের সময় উপস্থিত হন এবং ভাবে পূর্ণ হইয়া সায়ংকালীন উপাসনা করেন	৪২৩
১৮৬৭	"	বেথুন সোসাইটীতে "শিখজাতির ইতিহাস ও জীবনের কার্য্য" বিষয়ে বক্তৃতা	৪২৪
১৮৬৭, ২৪শে অক্টোবর	আমেরিকা	আমেরিকার "স্বাধীন ধর্ম্মসমাজের" সম্পাদক রেভ, জে, পটারের কেশবের নিকট পত্র	৪২৪

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		ও ধনী বিদ্বান্‌দিগের একত্র সমাগম এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণের উপস্থিতি। বিদ্বান্ সুশিক্ষিত লোকের পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান	৪৩২
১৮৬৮	কলিকাতা ও অন্যান্যস্থানে	ভক্তিপ্রচার — ভক্তিপ্লাবনে ভারত প্লাবিত ও ইংলণ্ডে সাড়া	৪৩৩
১৮৬৮	শান্তিপুর	ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতা— শান্তিপুরের ভাগবতরসজ্ঞ গোস্বামিগণ মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "শ্রীগৌরাঙ্গের পর আবার বঙ্গে ভক্তির পুনরভ্যুদয় হইল।"	৪৩৫
১৮৬৮, ২২শে ফেব্রুয়ারী (১১ই ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক)	ভাগলপুর	কেশবচন্দ্রের পরিবারসহ ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন। প্রাতে বাঙ্গলা ও সন্ধ্যায় ইংরাজিতে উপাসনা, ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ—"ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেম"	৪৩৭
১৮৬৮, ২৯শে ফেব্রুয়ারি	,,	অঘোরনাথকে পত্র—"ভক্তবৎসল ভক্তের নিকট থাকিবেনই"	৪৩৮
১৮৬৮, ১লা মার্চ্চ	মুঙ্গের	১লা মার্চ্চ মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিকে প্রাতের উপাসনাতে উপদেশ—"কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, তোমরা ঈশ্বরের ও সংসারের সেবা করিতে পার না"	৪৩৮

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		লরেন্সের আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ	৪৪৮
১৮৬৮, ২৩শে মে	বাঁকিপুর	বাঁকিপুরে ব্রহ্মোৎসব	৪৪৯
১৮৬৮, মে	মুঙ্গের	বাঁকিপুর হইতে মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন	৪৪৯
”	”	কেশবচন্দ্রের হৃদয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসের অধীন হইয়াও দর্শন-বিজ্ঞানের ভূমি অতিক্রম করে নাই	৪৫১
১৮৬৮, ৩রা জুন	”	ভাই গৌরগোবিন্দকে পত্র	৪৫৩
১৮৬৮, ৭ই জুন	”	মুঙ্গেরে দ্বিতীয় ব্রহ্মোৎসব	৪৫৩
১৮৬৮, ২১শে জুন	”	গঙ্গাতটে “পরলোক”সম্বন্ধে উপদেশ	৪৫৪
১৮৬৮, জুনের শেষভাগ	কলিকাতা	কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনের উদ্যোগ	৪৫৭
”	”	তৎসময়ে মিরারে “চিন্তা ও প্রার্থনা” প্রকাশ	৪৫৭
১৮৬৮, ৫ই জুলাই	”	ব্রাহ্মবিবাহবিধি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য, ১৫ই জুন "মিরারে" বিজ্ঞাপন দিয়া, ৩০০নং চিৎপুর রোডে প্রচারালয়ে কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের অধিবেশন	৪৬০
১৮৬৮, জুলাই	মুঙ্গের	মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন ও তথা হইতে সিমলা যাত্রা	৪৬৭
১৮৬৮, জুলাই—সেপ্টেম্বর	সিমলা	রাজপ্রতিনিধির অতিথি-স্বরূপে সপরিবারে সিমলায় অবস্থিতি	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬৮, ২৮শে ও ২৯শে মে	বোষ্টন	আমেরিকার "স্বাধীন ধর্ম্মসভার" সম্পাদক Rev. Potter ১৮৬৭খৃঃ ২৪শে অক্টোবর কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন, তদুত্তরে কেশবচন্দ্র যে পত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্র সম্বন্ধে অভিমত সভার ২৮শে ও ২৯শে মের বার্ষিক অধিবেশনের রিপোর্টে প্রকাশ এবং সে রিপোর্ট কেশবচন্দ্রের নিকট প্রেরণ	৫০৭
১৮৬৮	কলিকাতা	আমেরিকার 'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' সম্পাদক রেভ, পটারের ২৪শে অক্টোবরের পত্রপ্রাপ্তির পর তাঁহার নিকট কেশবচন্দ্রের পত্র	৫০৮
১৮৬৮, ২৯শে অক্টোবর	মাসাচুসেট	আমেরিকার 'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' সম্পাদক রেভ, পটারের মাসাচুসেট হইতে কেশবের পত্রের প্রত্যুত্তর	৫১৩
১৮৬৯, ২৩শে জানুয়ারি (১১ই মাঘ, ১৭৯০ শক)	কলিকাতা	উনচত্বারিংশ মাঘোৎসব—কলুটোলা আচার্য্যভবন হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে যাত্রা, সঙ্কীর্ত্তনের সময় জনৈক মুসলমান ভ্রাতার ও হিন্দু ভ্রাতৃদ্বয়ের "একমেবাদ্বিতীয়ং" "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" "সত্যমেব জয়তে" পতাকা ধারণ	৫১৫
"	"	"চল ভাই সবে মিলে যাই, সে পিতার ভবনে" দ্বার হইতে এই	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৬৯	কলিকাতা	জনসাধারণের নিকট কেশবের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। ঢাকা হইতে কেশবচন্দ্রের তথায় যাইবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ আসিল	৫২৫
১৮৬৯, ৮ই ফেব্রুয়ারি	হুগলী	"যথার্থ বিদ্যাশিক্ষা" বিষয়ে ইংরাজি বক্তৃতা	৫২৬
১৮৬৯, ২২শে ফেব্রুয়ারি	"	ক্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউটে "চরিত্রসংগঠন" বিষয়ে বক্তৃতা	৫২৬
১৮৬৯, ২৮শে ফেব্রুয়ারি	বরাহনগর	বরাহনগরে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্য্য করেন	৫২৬
১৮৬৯, ৬ই মার্চ্চ	ঢাকা	ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালসহ ঢাকাযাত্রা	৫২৬
১৮৬৯, ৮ই মার্চ্চ	"	ঢাকায় উপস্থিতি	৫২৬
১৮৬৯, ৯ই—৩০শে মার্চ্চ	"	ঢাকায় প্রচারের দৈনিক বিবরণ	৫২৭
১৮৬৯, ৩১শে মার্চ্চ	"	ঢাকা ত্যাগ	৫২৭
১৮৬৯, ৪ঠা এপ্রিল	শান্তিপুর	"ধর্ম্মশাসন" বিষয়ে বাঙ্গলায় বক্তৃতা	৫২৭
১৮৬৯	কলিকাতা	এই সময় কেশবচন্দ্র লণ্ডন হইতে একটী একেশ্বরবাদিনী নারীর ও অপর একটী নারীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগপূর্ণ পত্র এবং ওয়েকফিল্ডের "ব্যাণ্ড অব ফেথ" সভার সংস্থাপকের পত্র পান	৫২৮
১৮৬৯, ২৫শে এপ্রিল	মুঙ্গের	মুঙ্গেরে চতুর্থ উৎসব—প্রাতে কেশবচন্দ্রের উপাসনা, উপদেশ—'ঈশ্বরের পরিবার', সায়াহ্নে	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
(৪ঠা শ্রাবণ, ১৭৯১ শক)		এবং নিজ দ্বিতীয় পুত্রের (নির্ম্মলচন্দ্রের) জাতকর্ম্ম ও নামকরণ গোস্বামীর দ্বারা নিষ্পাদন	৫৫৬
১৮৬৯	কলিকাতা	১৮৬৪ খৃঃ শেষভাগ হইতে ছয় বৎসর কলিকাতা সমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের অবস্থা ও উপাসনার স্থানাভাব	৫৫৬
১৮৬৯, আগষ্ট	"	মণ্ডলীগঠনের উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর-কৃপায় মন্দিরলাভ	৫৫৭
"	"	মন্দিরের সহব্যবস্থান সম্পর্কে মিরারের কয়েকটী কথা	৫৫৮
"	"	মন্দির সম্পর্কে নিয়মাবলী	৫৫৯
১৮৬৯, ২০শে আগষ্ট	"	উপাসকমণ্ডলীর সভা	৫৫৯
১৮৬৯, আগষ্ট	"	মণ্ডলী-গঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ সম্বন্ধে মিরারের উক্তি	৫৬০
১৮৬৯, ২২শে আগষ্ট (৭ই ভাদ্র ১৭৯১ শক)	"	ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা-প্রতিষ্ঠা — কলুটোলা হইতে পদব্রজে গমন করিয়া বন্ধুগণের মন্দিরে প্রবেশ, ইংরাজি, বাঙ্গালা ও উর্দ্দুতে নিবদ্ধ নিয়মাবলী কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র ও রাধাগোবিন্দ দত্ত কর্ত্তৃক পাঠানন্তর, উৎকৃষ্ট পার্চ্চ-মেণ্টে লিখিত বঙ্গীয় নিয়মপত্র-	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		খানি কড়ির বোতলে ছিপিবদ্ধ করিয়া গৃহের মেজে স্থাপন ও তৎপর প্রাতঃকালীন উপাসনা	৫৬১
১৮৬৯, ২২শে আগষ্ট (৭ই ভাদ্র, ১৭৯১ শক)	কলিকাতা	সায়ংকালীন উপাসনার পূর্ব্বে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি ২১জন যুবা দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হয়েন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি, কেশবচন্দ্র বিশিষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন	৫৬৪
”	”	দুইটী মহিলাও ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন	৫৬৫
”	”	‘প্রেম ও উদারতা’ বিষয়ে সায়ংকালে উপদেশ	৫৬৫
”	”	“ইংলিশম্যান” ও “ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার” এই উৎসব ব্যাপারটীর উদারভাবে উল্লেখ	৫৬৫
”	”	মেহগনি কাষ্ঠনির্ম্মিত অতি সুন্দর বেদী ও আচার্য্যের পুস্তক রাখিবার একখণ্ড প্রস্তর ল্যাজারস্ কোম্পানীর দান ; বেদীর উপরিস্থ কার্পেটের মনোহর আসনখানি সিন্দূরিয়াপটীর মল্লিক পরিবারের জনৈক মহিলার দান	৫৬৭
১৮৬৯, ২৯শে আগষ্ট	কলিকাতা (ভাঃ ব্রহ্মমন্দির)	“ব্যাকুলতা” বিষয়ে উপদেশ	৫৬৭

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		ধর্ম্মের পরিণতি এবং ব্রহ্মমন্দির হইতে দীনদরিদ্রদিগকে দান করিবার ব্যবস্থা	৫৭৭
১৮৬৯, ১৩ই আগষ্ট	কলিকাতা	মিরার পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডগমনের ইচ্ছাপ্রকাশ	৫৭৯
...	ইংলণ্ড	কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডগমনের সংবাদে, ইংলণ্ডস্থ বন্ধুগণের আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র	৫৭৯
১৮৬৯, ৯ই নবেম্বর	"	ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের সভা করিয়া কেশবচন্দ্রের সাদর অভ্যর্থনার জন্য উদ্যোগ	৫৭৯
১৮৭০, ১৫ই ফেব্রুয়ারী	কলিকাতা	১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭০খৃঃ) ইংলণ্ড গমনের দিন স্থিরীকরণ	৫৭৯
১৮৭০, ২২শে জানুয়ারি (১০ই মাঘ, ১৭৯১ শক)	"	চত্বারিংশ মাঘোৎসবে, ২২শে জানুয়ারি প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্ণে নগরসংকীর্ত্তন	৫৮১
১৮৭০, ২৩শে জানুয়ারি (১১ই মাঘ, ১৭৯১ শক)	"	১১ই মাঘ দিনব্যাপী উৎসব	৫৮৩
১৮৭০, ২৪শে জানুয়ারি (১২ই মাঘ, ১৭৯১ শক)	"	মন্দিরে ইংরাজিতে উপাসনা, "অমিতাচারী সন্তানের আখ্যায়িকার" ব্যাখ্যান	৫৮৫
১৮৭০, ১১ই ফেব্রুঃ	"	সঙ্গতের বিবরণ—অনেক গুরুতর	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
(১লা ফাল্গুন ১৭৯১ শক)		কথা বলেন।—"গুরুস্বীকার কত দূর আবশ্যক"	৫৮৮
১৮৭০, ৬ই ফেব্রুয়ারী	লণ্ডন	উপাসকমণ্ডলীর মাসিক অধিবেশনে কেশবের নিবেদন	৫৯২
১৮৭০, ২রা ফেব্রুয়ারী	"	Town Hallএ "England and India" সম্বন্ধে দেশের নিকট বিদায়সূচক বক্তৃতা	৫৯৭
১৮৭০, ১৫ই ফেব্রুয়ারী	"	কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডযাত্রা — "Multan" নামক বাষ্পীয়পোতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সঙ্গে ভাই প্রসন্নকুমার সেন, আনন্দমোহন বসু, গোপালচন্দ্র রায়, রাখালদাস রায়, কৃষ্ণধন ঘোষ যান	৫৯৮
১৮৭০, ১৫ই ফেব্রুয়ারী— ২১শে মার্চ্চ	"	সমুদ্রপথের দৈনিক বিবরণ	৬০০
১৮৭০, ৪ঠা মার্চ্চ	"	এডেন হইতে ভারতীয় ব্রাহ্ম ভ্রাতৃবৃন্দকে কেশবের পত্র	৬০৫
১৮৭০, ২১শে মার্চ্চ	"	লণ্ডন নগরীতে উপস্থিতি— বিহারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, ও কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎকার	৬১৭
২২শে মার্চ্চ	"	মিস্ কলেটের সহিত সাক্ষাৎকার	৬১৮
২৩শে মার্চ্চ	"	Lord Lawrenceর গৃহে নিমন্ত্রণ এবং 'ইণ্ডিয়া অফিসে' গমন	৬১৮
২৪শে মার্চ্চ	"	মিস্ কবের বাড়ী নিমন্ত্রণরক্ষা,	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		Miss E. Sharp প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে উৎসাহশীল নরনারীগণের সাক্ষাৎলাভ	৬১৮
১৮৭০, ২৬শে মার্চ্চ	লণ্ডন	Female Suffrage Societyতে গমন (Mr. Mill, Mr. Jacob Bright, Lord Amberley, Mrs. Tailor (President), Mrs. Fawcell, Miss Tailor প্রভৃতির সঙ্গে দেখা)	৬১৯
২৮শে মার্চ্চ	"	Sir Harry Verney কেশবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগমন	৬১৯
২৯শে মার্চ্চ	"	প্রাতরাশের পর Lord Lawrenceএর সঙ্গে India Officeএ গমন—সেখানে Sir Robert Montgomery, Sir F. Currie, Sir Frederick Halliday, Mr. Manglesর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ; Elphinstone Club, Westminster Abbey, Parliament Houseএ গমন	৬২০
"	"	সায়ংকালে Mrs. Manningর বাড়ী বন্ধুসম্মিলনে গমন। Mr. Seelyর সহিত পরিচয়	৬২০
৩০শে মার্চ্চ	"	Miss Catherine Winkworth এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার	৬২১
৩১শে মার্চ্চ	"	Lord and Lady Lawrence-এর বাড়ী রাত্রিতে ভোজন,	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		সঙ্গে Crytsal Palace দর্শন, Mr. Spearsএর বাড়ী চা পান	৬২২
১৮৭০, ৬ই এপ্রিল	লণ্ডন	Universi y Annual Boat Race দেখিতে গমন	৬২৩
৭ই এপ্রিল	„	Sir Harry ও Lady Verneyর কেশবচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আগমন, Mr. Conwayএর গৃহে বন্ধুসম্মিলন	৬২৩
৮ই এপ্রিল	„	কেশবচন্দ্র House of Commons দেখিতে যান	৬২৩
৯ই এপ্রিল	„	Mr, Grand Duffএর বাড়ী প্রাতরাশ, Mr. Geddisএর সঙ্গে সাক্ষাৎকার	৬২৪
১০ই এপ্রিল	„	কেশবচন্দ্র মিষ্টার মার্টিনোর Chapelএ উপাসনা করেন ও "Living God" বিষয়ে উপদেশ দেন। এই প্রথম কার্য্যারম্ভ	৬২৪
১১ই এপ্রিল	„	Mr. Knowles আসিয়া কেশবের সঙ্গে দেখা করেন। General Low আসিয়া জল খাইবার নিমন্ত্রণ করেন	৬২৫
১০ই এপ্রিল	„	রবিবার মিঃ মার্টিনোর চ্যাপেলে "জীবন্ত ঈশ্বর" সম্বন্ধে উপদেশের মর্ম্ম	৬২৬
১২ই এপ্রিল	„	Hanover Square Roomএ কেশবচন্দ্রের অভ্যর্থনা—বহু গণ্য মান্য লোকের সমাগম	৬২৯

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭০, ১৩ই অপ্রিল	লণ্ডন	রাস্কেণ নামক ব্যক্তির কেশবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার	৬৩৮
১৪ই এপ্রিল	„	মিস্ত্রেস্ বিবানের সঙ্গে জলযোগ ও আলাপ, অন্য মিস্ সুসানা উইঙ্ক-ওয়ার্থের সঙ্গে সাক্ষাৎকার	৬৩৯
১৫ই এপ্রিল	„	গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে একটী অনুষ্ঠানপ্রধান চার্চ্চে গমন	৬৩৯
১৬ই এপ্রিল	„	Sir John Lowর সঙ্গে একটী চ্যাপেলে মিঃ মুল্লিনাউক্সের উপদেশশ্রবণ, তথায় লর্ড লরেন্স ও স্যার হ্যারি বারণের সঙ্গে সাক্ষাৎকাব, স্যার জন লোর পরিবারবর্গ সহ আলাপ, মিঃ মুল্লিনাউক্সের গৃহে জলযোগ এবং Miss Colletএর সঙ্গে দেখা করার জন্য গমন	৬৩৯
১৭ই এপ্রিল	„	Finsbury Chapelএ "অমিতাচারী সন্তান" বিষয়ে উপদেশদান	৬৪০
১৮ই এপ্রিল	„	Norfolk Hotel ত্যাগ করিয়া, ৪নং Woburn Squareএ বাস-গৃহ পরিবর্ত্তন। Lord Mayor-এর ভোজে উপস্থিতি	৬৪৩
১৯শে এপ্রিল	„	Goldingham ভবনে ভোজন	৬৪৩
২০শে এপ্রিল	„	মার্টিনো সাহেবের সঙ্গে দেখা	৬৪৪
২২শে এপ্রিল	„	Mrs. & Miss Manningর গৃহে গমন, জলযোগান্তে ক্রিষ্টাল প্যালেস দর্শন	৬৪৪

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭০, ২৩শে এপ্রিল	লণ্ডন	লেডি এডুওয়ার্ডের গৃহে গমন	৬৪৫
২৪শে এপ্রিল	„	Hackney Unitarian Chapelএ "প্রার্থনার সফলতা" সম্বন্ধে উপদেশ	৬৪৬
২৫শে এপ্রিল	„	Miss Cobbs ও অন্যান্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার	৬৪৭
২৬শে এপ্রিল	„	এসিয়া মাইনরের ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের কন্সল মিঃ পীবল্সের জনৈক প্রেততত্ত্ববাদী বন্ধুর সঙ্গে কেশবের সহিত সাক্ষাৎকার	৬৪৭
২৭শে এপ্রিল	„	গ্রোস্বেনর হোটেলে সায়ংকালে দার্শনিক পণ্ডিতগণ সঙ্গে ভোজন	৬৪৭
২৮শে এপ্রিল	„	কয়েকজনের সহিত প্রতিসাক্ষাৎকার, Sir Montgomeryকে বিবাহবিধি সম্বন্ধে সাহায্যার্থ অনুরোধ এবং সন্ধ্যায় Stamford Street Chapelএ সামাজিক সম্মেলনে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের সম্ভাষণ, তথায় কেশবচন্দ্রের নিবেদন	৬৪৮
২৯শে এপ্রিল	„	প্রাতে পিকাডিলিস্থ 'রাজকীয় শিল্পবিদ্যালয়' দর্শন, সন্ধ্যায় পোর্টলাণ্ড পাঠশালার বার্ষিক সম্মিলনে গমন	৬৫১
৩০শে এপ্রিল	„	মিন্ত্রেস স্কোয়ারের সায়ংসম্মিলনে হিক্সন পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎকার	৬৫১

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
	লণ্ডন	বলিয়া তাঁহার আনুকূল্যের জন্য অনুরোধ, অপরাহ্ণে Exeter Hallএ, Ragged School Union এ গমন	৬৫৯
১৮৭০, ১০ই মে,	,,	Cannon Street Hotelএ Congregational Union ভোজে বক্তৃতা	৬৬১
১১ই মে	,,	University of London নূতন গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে গমন। কেশবচন্দ্রের মহারাণী Victoriaকে প্রথম দর্শন	৬৬৪
১২ই মে	,,	লর্ড ও লেডি হটনের সঙ্গে জলযোগ, সায়ংকালে নিজ আবাসে খ্রীষ্ট-মণ্ডলীর বাহিরের লোকদিগকে লইয়া একটী সভাস্থাপনের জন্য সম্মিলন	৬৬৪
১৩ই মে	,,	East India Associationএ "Female Education in India" সম্বন্ধে Miss Carpenterএর বক্তৃতা—কেশবও কিছু বলেন	৬৬৫
১৪ই মে	,,	"Work-House" ও "অন্ধনিবাস" দর্শন	৬৬৬
১৫ই মে	,,	প্রাতঃকালে Stratford Artillery Hallএ "স্বর্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে, ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আর	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		কাহাকেও চাহি না" এই প্রবচন অবলম্বনপূর্ব্বক কেশবের উপদেশ। সায়ংকালে—Mile and Bomont Hallএ 'ঈশ্বরের অনন্ত প্রীতি' সম্বন্ধে কেশবের উপদেশ	৬৬৬
১৮৭০, ১৬ই মে	লণ্ডন	আলন সাহেবের গৃহে প্রাতরাশ, তথায় ধর্ম্মযাজকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলাপ	৬৬৭
১৭ই মে	,,	New Gate Prison, 'Times' পত্রিকার Press প্রভৃতি দর্শন, সায়ংকালে Finsbury Chapel এ 'Peace Society'তে কেশবের বক্তৃতা (যুদ্ধের বিরুদ্ধে)	৬৬৭
১৮ই মে	,,	টেম্পলে টেম্পলমাষ্টার রেভ, ডাঃ বহান সহ সাক্ষাৎকার ও জলযোগ	৬৭০
১৯শে মে	,,	Saint James Hallএ "United Kingdom Alliance"এ 'Liquor Traffic in India" বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা	৬৭১
২০শে মে	,,	Quakerদের প্রার্থনা-সমাজে গমন	৬৭৪
২১শে মে	,,	কয়েকজন বন্ধুসহ হাম্পটন কোর্টে চমৎকার আলেখ্য ও গৃহপ্রাচীরে "বিচিত্র বসন" দর্শন	৬৭৪
২২শে মে	,,	Brixton Unitarian Chapelএ "সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও" এই প্রবচন অবলম্বনে উপদেশ	৬৭৪

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		Street Baptist Chapelএ কেশবের উপদেশ	৭৩০
১৮৭০, ২৭শে জুন	Liverpool	Mount Street Instituteএ "নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতের অবস্থান" বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা	৭৩৫
২৮শে জুন	,,	Liverpoolএ একটী ক্ষুদ্র সভায় উপরোক্ত বিষয়ে বক্তৃতা	৭৩৫
২৯শে জুন—১৪ই জুলাই	,,	Mr. W. Dawbarn of Aigburthএর Liverpoolএর বাড়ীতে অসুস্থতাবশতঃ বিশ্রাম	৭৩৬
২০শে জুলাই	London	Great Queen Streetএ Free Mason's Hallএ ব্রহ্মবাদিগণের জন্য সভা-স্থাপনের অভিপ্রায়ে কেশবের বক্তৃতা	৭৩৯
১লা আগষ্ট	,,	Victoria Discussion Societyর মাসিক সভায় Architectural Galleryতে, Conduit Streetএ "ভারতের নারীগণ" সম্বন্ধে সভাপতি কেশবের বক্তৃতা	৭৪৩
,,	,,	Nottinghamএর যাজকদিগের সম্ভাষণ-পত্রের উত্তর	৭৪৮
৯ই আগষ্ট	,,	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে ১৩ই আগষ্ট সাক্ষাৎকারের জন্য ডিউক অব্ আর্গাইলের কেশবকে পত্র	৭৫০
১৩ই আগষ্ট	অসবরণ প্রাসাদ	মহারাণী Victoriaর সহিত কেশবের সাক্ষাৎকার	৭৫০

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
...	London	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর Col. Ponsonbyকে কেশবচন্দ্রের পত্র	৭৫২
১৮৭০, ২৩শে আগষ্ট	উইণ্ডসোর	Col. Ponsonby কেশবকে পত্র	৭৫২
২৭শে আগষ্ট	,,	Major General Sir Biddulphএর পত্র। কেশবচন্দ্রের Photo চাহিয়া পাঠান (মহারাজ্ঞী ও Princess Lewessএর আজ্ঞানুসারে)	৭৫৩
...	লণ্ডন	পত্রোত্তরে ফটোগ্রাফ প্রেরণ, মহারাজ্ঞী ও রাজকুমারীর স্মারকচিহ্ন গৃহে লইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ	৭৫৩
৯ই সেপ্টেম্বর	,,	মহারাজ্ঞীর একখানি ক্ষোদিত প্রতিকৃতি ও মহারাজ্ঞীর স্বহস্তে কেশবচন্দ্রের নাম লেখা দুইখানি গ্রন্থ উপহার পাইয়া মহারাজ্ঞীর সেক্রেটারীকে কৃতজ্ঞতাসূচক পত্র	৭৫৩
১৯শে আগষ্ট	Edinburgh	Queen St. Hallএ Philosophical Institutionএ "ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্পর্কীয় অবস্থা" সম্বন্ধে কেশবের বক্তৃতা	৭৫৪
২২শে আগষ্ট	Glasgow	City Hallএ অভ্যর্থনা ও কেশবচন্দ্রের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	৭৬২
২৭শে আগষ্ট	Leeds	Town Hallএ Civic Courtএ অভ্যর্থনা ও প্রত্যুত্তর	৭৬৩
২৮শে আগষ্ট	,,	Mill Hill Chapelএ "The	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		Street Baptist Chapelএ কেশবের উপদেশ	৭৩০
১৮৭০, ২৭শে জুন	Liverpool	Mount Street Instituteএ "নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতের অবস্থান" বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা	৭৩৫
২৮শে জুন	,,	Liverpoolএ একটী ক্ষুদ্র সভায় উপরোক্ত বিষয়ে বক্তৃতা	৭৩৫
২৯শে জুন— ১৪ই জুলাই	,,	Mr. W. Dawbarn of Aigburthএর Liverpoolএর বাড়ীতে অস্বস্থতাবশতঃ বিশ্রাম	৭৩৬
২০শে জুলাই	London	Great Queen Streetএ Free Mason's Hallএ ব্রহ্মবাদিগণের জন্য সভা-স্থাপনের অভিপ্রায়ে কেশবের বক্তৃতা	৭৩৯
১লা আগষ্ট	,,	Victoria Discussion Societyর মাসিক সভায় Architectural Galleryতে, Conduit Streetএ "ভারতের নারীগণ" সম্বন্ধে সভাপতি কেশবের বক্তৃতা	৭৪৩
,,	,,	Nottinghamএর যাজকদিগের সম্ভাষণ-পত্রের উত্তর	৭৪৮
৯ই আগষ্ট	,,	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে ১৩ই আগষ্ট সাক্ষাৎকারের জন্য ডিউক অব্ আর্গাইলের কেশবকে পত্র	৭৫০
১৩ই আগষ্ট	অসবরণ প্রাসাদ	মহারাণী Victoriaর সহিত কেশবের সাক্ষাৎকার	৭৫০

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		Living God in India and England" বিষয়ে উপদেশ *	
৪ঠা সেপ্টেম্বর	Islington	Unity Churchএ "I must say that, He is my Refuge and my Fortress : my God ; in Him will I trust" এই প্রবচন অবলম্বনে Farewell Sermon *	
৯ই সেপ্টেম্বর	Bristol	"British Institution"এ "Indian Association" স্থাপন	৭৬৮
১২ই সেপ্টেম্বর	London	Hanover Square Roomএ বিদায়ার্পণ জন্য সভা, ইংলণ্ড সম্বন্ধে কেশবের ধারণা প্রকাশ	৭৭১
১৭ই সেপ্টেম্বর	Southampton	Unitarian Churchএ বিদায় বাক্য। England ত্যাগ	৭৮৫
...	...	নিরামিশভোজী কেশবের ইংলণ্ডে ও জাহাজে আহার, পানীয়—জল, লেমনেড, গরম দুগ্ধ ; প্রাতরাশ—ভাত, মাখন, ভাজা, আলু, শাকশব্জী, দাল ; রাত্রে—ঐ প্রকার এবং ফল, পায়স, মিষ্ট বস্তু, ও কেক (ডিম না দেওয়া)	৭৯১
...	ইংলণ্ড	ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্র কি প্রকারে গৃহীত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে	

* K. C. Sen's "Lectures in England" দ্রষ্টব্য।

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		সকল নিকটবর্ত্তী হয়, ভগবান্ আপনাকে সেই উচ্চস্থানে আরূঢ় করিয়াছেন ও আপনার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এমন সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছেন যে, আপনি স্বভাবতঃই সেই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, যেখান হইতে স্বর্গরাজ্যের বিষয় সকল প্রত্যক্ষ দেখা যায় ও শুনা যায়।"(কেশবের বয়স তখন মাত্র ৩২ বৎসর)	৮৩৬
...	...	(১৪) অন্য একজন ধর্ম্মপরায়ণ ইংরাজের উক্তি—"মিষ্টার সেন, —তোমার সরলতার মধ্যে খ্রীষ্টের সরলতা দেখিতে পাই—তোমার বিশ্বাস, বিনয়, সুকোমল ভাব, প্রেম-প্রভৃতি গুণের মধ্যে খ্রীষ্টের গুণের প্রতিভা নিরীক্ষণ করি—আমি যত তোমার পদতলে বসিয়া তোমার কথা শুনি, ততই আমি খ্রীষ্টকে বুঝিতে পারি এবং যতই তোমাকে দেখি, তোমার ভাবের মধ্যে খ্রীষ্টকে দেখি।"	৮৩৭
১৮৭০, ২৫শে অক্টোবর (৯ই কার্ত্তিক, ১৭৯২ শক)	কলিকাতা	ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর East and West সম্মিলিত করিবেন, এজন্য কেশব উদ্যোগী হইয়া, তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মবন্ধুগণকে	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		নিম্নলিখিত পাঁচটী বিভাগ স্থাপন :— ১। সূত্রধরের কার্য্য ২। সূচীকার্য্য ৩। ঘড়ি মেরামত ৪। মুদ্রাঙ্কণ ও লিথোগ্রাফ ৫। Engraving	৮৪২
...	কলিকাতা	দাতব্য বিভাগে দরিদ্র বালকদিগকে মাসিক বৃত্তি, অন্ধ খঞ্জকে সাময়িক দান, পীড়িত দীন পরিবারে চিকিৎসক-প্রেরণ ও বিনামূল্যে ঔষধবিতরণ প্রভৃতি কার্য্য	৮৪৬
১৮৭১, ১লা ফেব্রুয়ারি	"	স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় স্থাপন (Native Ladies' Normal and Adult School পরবর্ত্তিকালে "Victoria Institution for Girls" নাম হইয়াছে।—Vide Report for Victoria Institution for 1922—23)	৮৪৭
১৮৭১, ১৪ই এপ্রিল	"	শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক "নারীজাতির উন্নতিবিধায়িনী সভা" স্থাপন	৮৪৭
১৮৭১, ২৪শে ফেব্রুয়ারী	"	"দেশীয় নারীগণের উন্নতি" বিষয়ে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা	৮৪৮
...	"	বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর কেশবচন্দ্রের মহর্ষির সহিত	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		গবর্ণর জেনেরেলের নিকট একটি অর্থশূন্য আবেদন প্রেরণ করেন	৮৮২
১৮৭১	কলিকাতা	Indian Mirrorএ কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আবেদন সম্বন্ধে প্রতিবাদ	৮৮৩
"	"	বালিকাগণের বিবাহবয়স সম্বন্ধে ডাক্তারদিগের মতামত	৮৮৩
"	"	বিবাহবিধি সম্বন্ধে পত্রিকাসকলের ও সভাসমূহের মতামত	৮৮৫
"	"	বিবাহবিধি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতামত	৮৮৭
১৮৭১, ৮ই অক্টোবর	"	আন্দোলনে যে সকল অসত্য ব্যবহারাদি প্রকাশ পায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্দিরে কেশবচন্দ্রের উপদেশ	৮৯৭
১৮৭১, ৩০শে সেপ্টেম্বর	"	Town Hallএ "বিবাহসম্পর্কীণ বিধি" বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ সেনের বক্তৃতা (কেশবচন্দ্র সভাপতি)	৯০০
"	"	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তাকে ধন্যবাদ দেন	৯০২
"	"	সভাপতি কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা	৯০৩
...	"	বিবাহবিধিসম্বন্ধে স্যার বার্টল ফ্রিয়ারের ইংলণ্ডস্থ জনৈক বন্ধুকে পত্র	৯০৮
১৮৭১, ২১শে ডিসেম্বর	"	Select Committeeর বিবাহবিধি সম্পর্কে মন্তব্য	৯০৯

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭২, ২২শে জানুয়ারি	কলিকাতা	কলুটোলাস্থ গৃহ হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হয় এবং গোলদিঘীতে বক্তৃতা	৯২০
১৮৭২, ২৬শে জানুয়ারি	”	কেশবের Town Hallএ "Primitive Faith and Modern Speculations" বিষয়ে বক্তৃতা	৯২২
১৮৭২, ২৪শে জানুয়ারি (১১ই মাঘ, ১৭৯৩ শক)	”	দ্বাচত্বারিংশ উৎসবে ১১ই মাঘ সায়ংকালের উপদেশে কেশবচন্দ্র বলেন, "ঈশ্বরের আদেশ-শ্রবণই ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র"	৯২৫
১৮৭২	”	নরনারীর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-কালীন বিমিশ্রভাবে একত্র উপবেশনের আন্দোলন	৯২৬
১৮৭২, ৫ই ফেব্রুয়ারি	বেলঘরিয়া	কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের উদ্যানে "ভারতাশ্রমের" প্রতিষ্ঠা	৯২৭
১৮৭২, ৬ই ফেব্রুয়ারি	”	রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও ৮ই ফেব্রুয়ারি নিহত হন। সেই উপলক্ষে কেশবের শোকপ্রকাশ-সূচক পত্র	৯২৯
১৮৭২, ১৮ই ফেব্রুয়ারি	”	সেই উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা—'রাজভক্তি' বিষয়ে উপদেশ	৯২৯
১৮৭২	কলিকাতা	Prince of Walesএর সাংঘাতিক পীড়া হইতে আরোগ্য-লাভ উপলক্ষে প্রার্থনা	৯৩২

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		বয়সে নারীগণের বিবাহনিবারণ এবং পতিতা নারীগণের উদ্ধার; সভার শেষে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেশবের তিনটী বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ :—(১) মুখে নহে, কার্য্যতঃ সংস্কার সাধন, (২) আত্মনির্ভর, (৩) উদারভাব।	৯৪৪
১৮৭২, ২৭শে মার্চ্চ	কলিকাতা	২৭শে মার্চ্চ হইতে ইংলণ্ডের বন্ধুগণ প্রেরিত Organ মন্দিরে ব্যবহার, কেশবের কৃতজ্ঞতাপত্র	৯৪৫
১৮৭২, ১৬ই সেপ্টেম্বর	”	Rev. Dull সাহেবের ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার, ব্রাহ্মবন্ধুসভায় “ব্রাহ্ম” নাম লইয়া আন্দোলন, ডল সাহেব বলেন—‘খ্রীষ্টধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম’, ডল সাহেবের মত-প্রকাশে যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক তাহার মীমাংসা	৯৪৬
১৮৭২, ৮ই মে—১৬ই আগষ্ট	”	কেশবচন্দ্র ‘Indo Philus’ (ভারতবন্ধু) নাম দিয়া Indian Mirrorএ গবর্ণর জেনারেল Lord Northbrookকে সম্বোধন করিয়া নয়খানি পত্র—৮ই, ১৭ই, ২১শে মে, ১২ই, ১৮ই, ২৩শে জুলাই, ১লা, ৮ই ও ১৬ই আগষ্ট তারিখে—বিদ্যাশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, শিল্প-	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
(২২শে শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক)		প্রণালী, প্রচারবিষয়ে অভাব-মোচন, প্রচারকপ্রেরণ ও পুস্তক-পত্রিকাদি-প্রচার বিষয়ে নির্দ্ধারণ	৯৫৬
১৮৭২, ১১ই নভেম্বর	কলিকাতা	প্রচারকসভার নির্দ্ধারণ—"এক জনের নির্দ্ধারণাপেক্ষা অধিক-সংখ্যকের নির্দ্ধারণ প্রবল। সর্ব্বাপেক্ষা সভাপতির নির্দ্ধারণ প্রবল। এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন"	৯৫৭
১৮৭৩, ১২ই জানুয়ারি	"	প্রচারকসভায় সহব্যবস্থান নির্ণয়	৯৫৭
১৮৭৪, ১লা জুন	"	প্রচারকগণের পরস্পর ব্যবহারাদি সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ—স্বাধীনতা ও অধীনতার সামঞ্জস্য	৯৫৯
১৮৭৪, ৯ই আগষ্ট	"	প্রচারকের বিরুদ্ধে কাহারও অভি-যোগ সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ	৯৫৯
১৮৭৪, ৬ই জুলাই	"	ব্রাহ্মগণের বিবাদ মীমাংসার জন্য শান্তিসভা স্থাপন	৯৫৯
১৮৭৪, ১লা জুন	"	প্রচারক ভিন্ন প্রচারকার্য্যের সহায়কগণ সম্বন্ধে নিয়ম	৯৬০
১৮৭৫, ১৯শে জুলাই	"	নিয়মাধীনতা ও আনুগত্যের বিধিতে সহব্যবস্থানের পূর্ণতা	৯৬০
১৮৭৩ ২২শে জানুয়ারি	"	ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসবে প্রাতে 'আমি আছি' বিষয়ে উপদেশ, অপরাহ্নে নগরকীর্ত্তনে ডল-সাহেব, একজন মুসলমান ও একজন হিন্দুস্থানীর পতাকাধারণ	৯৬৩

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭৩, ২৩শে জানুয়ারি	কলিকাতা	"ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য" বিষয়ে উপদেশ	৯৬৩
১৮৭৩, ২৫শে জানুয়ারি	"	Town Hallএ "Inspiration" সম্বন্ধে কেশবের বক্তৃতা	৯৬৪
১৮৭৩, প্রথমভাগে	"	স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর কলিকাতায় আগমন ও কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার	৯৬৭
১৮৭৩, ২৩শে ফেব্রুয়ারি	"	কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে গোরাচাঁদ দত্তের বাটীতে স্বামীজির সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর ও ধর্ম্ম' বিষয়ে বক্তৃতা। এতদ্ব্যতীত 'একেশ্বরের উপাসনা' ও 'মনুষ্যের কর্ত্তব্য' বিষয়ে আরও দুইটী বক্তৃতা দেন	৯৬৭
১৮৭৩, ১৬ই ফেব্রুয়ারী	"	'ঈশ্বরের পরিবার" বিষয়ে কেশবের উপদেশ	৯৬৭
১৮৭৩	"	কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মধর্ম্মের হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য "উপনয়ন-সংস্কারের" অভিনব উপায়ে, কেশবের মনোবেদনা	৯৬৯
১৮৭৩, ৪ঠা এপ্রিল	"	কেশবচন্দ্রের গৃহে সায়ং সমিতিতে রাজপ্রতিনিধি Lord Northbrookএর কন্যাসহ আগমন (দেশীয় ভদ্রগৃহস্থের গৃহে সপরিবারে রাজপ্রতিনিধির ১ম পদার্পণ)	৯৬৯
১৮৭৩, ১০ই এপ্রিল	"	Town Hallএ 'ভারতসংস্কার-সভার' দ্বিতীয় সাংবৎসরিকে, উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীজাতির	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		উন্নতি ও শৃঙ্খলোন্মোচন, দেশীয় বিদেশীয়গণের মধ্যে সদ্ভাব-বৃদ্ধি, দেশীয়গণের মধ্যে দলাদলি ভাব তিরোহিত হইয়া সদ্ভাব-স্থাপন, মতভেদ থাকিলেও বন্ধুত্ব-রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কেশবের উক্তি	৯৭১
১৮৭৩	কলিকাতা	স্ত্রীবিদ্যালয়ের সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয়, ব্রাহ্মিকাগণের জন্য ব্রাহ্মিকা-বিদ্যালয় স্থাপন	৯৭৩
১৮৭৩, ১৬ই সেপ্টেম্বর	,,	ব্রাহ্ম যুবকদিগের জন্য 'ব্রাহ্মনিকেতন' বোর্ডিং খোলা হয়	৯৭৪
১৮৭৩, ২০শে সেপ্টেম্বর	,,	রাজপথে অশ্লীল সং বাহির করা ও অশ্লীল চিত্রাদি বিক্রয় নিবারণের জন্য Town Hallএ সভা, সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তন্নিবারণের উদ্যোগ	৯৭৪
১৮৭৩, ২২শে সেপ্টেম্বর	,,	উত্তব পশ্চিমাঞ্চলে বন্ধুগণ সহ কেশবের প্রচারযাত্রা	৯৭৬
১৮৭৩, ২রা অক্টোবর	লক্ষ্ণৌ	অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব, কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন এবং কেশবের বক্তৃতা	৯৭৬
১৮৭৩, সেপ্টেম্বর	বাঁকিপুর	দুইদিন উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা ও কীর্ত্তনাদি	৯৭৭
,,	এলাহাবাদ	কয়েকদিন অবস্থান ও উপাসনাদি	৯৭৭
১৮৭৩, অক্টোবর	বেরিলী	নিত্য উপাসনা, সিটিহলে ইংরেজীতে দুটী বক্তৃতা	৯৭৭

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭৩, ২০শে নভেম্বর	আগ্রা	তদ্দেশীয় রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার	৯৮০
...	কানপুর	দুই দিন অবস্থান	৯৮১
...	জব্বলপুর	মর্ম্মরপ্রস্তরময় পর্ব্বত ও নর্ম্মদার শোভা দর্শন, নর্ম্মদায় স্নানান্তে উপাসনা, সায়ংকালে প্রকাশ্য স্থানে কেশবচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা	৯৮১
...	এলাহাবাদ	এলাহাবাদে আগমন	৯৮১
১৮৭৩, ২৮শে নভেম্বর	কলিকাতা	সাম্বৎসরিক উৎসবের জন্য বন্ধুগণ সহ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন	৯৮১
১৮৭৪, ১৭ই জানুয়ারি	"	ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বক্তৃতা	৯৮২
১৮ই জানুয়ারি	"	ব্রাহ্মসম্মিলনসভায় কেশবচন্দ্র সামাজিক শাসনের আবশ্যকতা বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন	৯৮২
"	"	সায়াহ্নে মন্দিরে 'পরিবারের একত্ব' বিষয়ে উপদেশ	৯৮৩
২৪শে জানুয়ারি	"	কেশবচন্দ্রের Town Hallএ "Kingdom of Heaven" বিষয়ে বক্তৃতা	৯৮৫
২০শে জানুয়ারী	"	সঙ্গতে পাপ ছাড়িবার উপায় বিষয়ে কেশবের উক্তি	৯৮৫
...	"	পরস্পরের বিচ্ছিন্নভাব পরিহার জন্য প্রচারকমহাশয়দের সম্বোধন করিয়া কেশবচন্দ্রের পত্র— "আমাকে ও বর্ত্তমান বিধানকে	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭৪, ২৯শে আগষ্ট	হাজারিবাগ	হাজারিবাগ হইতে ভাই প্রসন্নকুমার সেনকে কেশবচন্দ্রের লিখিত পত্র	৯৯৪
১৮৭৪ (শেষভাগে)	পশ্চিমাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চলে গমন, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ হইয়া ইন্দোরে উপস্থিতি, ইন্দোরে রাজনীতি সম্বন্ধে তুইটী উচ্চভাবের বক্তৃতা	৯৯৫
„	ইন্দোর	ভাই প্রতাপচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে ২৬শে নভেম্বর, ১৮৭৪ খৃঃ, কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য ভাই প্রসন্নকুমার সেনকে ইন্দোর হইতে পত্র	৯৯৬
১৮৭৫	কলিকাতা	কেশবচন্দ্রের কলিকাতায় প্রত্যাগমন, ভারতাশ্রমের বিরুদ্ধে বিরোধিগণের অযথা কুৎসা-প্রচার জন্য কেশবচন্দ্রের বিচারালয়ের সাহায্য-গ্রহণ	৯৯৭
১৮৭৫, ৩০শে এপ্রিল	„	প্রতিবাদিদ্বয় অনুতাপ প্রকাশ করায় মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হয়	৯৯৭
১৮৭৪, আগষ্ট	হাজারিবাগ	কেশবচন্দ্রের "সুখী পরিবার" পুস্তক প্রণয়ন (হাজারিবাগে অবস্থিতি কালে প্রণীত)	৯৯৭
		রাজনারায়ণ বসুর সহিত কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধ—রাজনারায়ণ বসুর নিকট কেশবের লিখিত কয়েকখানি পত্রে দ্রষ্টব্য :—	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭৪ ১৫ই সেপ্টেম্বর	কলিকাতা	কেশবের যত্নাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির পত্রের উত্তর এবং উপাসকমণ্ডলীর সভা আহ্বান	১০১০
১৮৭৪, ১৯শে সেপ্টেম্বর	„	উপাসকদিগকে বিধিপূর্ব্বক সভাবদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকগণের সভা, উপাসকমণ্ডলী স্থাপন	১০১০
১৮৭৪, ১৬ই সেপ্টেম্বর	„	১৫নং কলেজ স্কোয়ারে "কলিকাতা স্কুল" আনয়ন	১০১৭
...	„	কতকগুলি মূল মত লইয়া সন্দেহ, মূল মতগুলির বিরোধে বিচার উত্থাপন জন্য শিবনাথের সম্পাদকত্বে 'সমদর্শী' পত্রিকার প্রকাশ	১০১৯
১৮৭৫, ১৮ই জানুয়ারী, (৬ই মাঘ, ১৭৯৬ শক)	„	ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী স্বতন্ত্র স্থাপিত হওয়াতে, সঙ্গতসভা পুনঃ স্থাপন হইয়া প্রথম দিনে ব্রহ্মমন্দিরে উৎসব	১০২০
১৮৭৫, ২১শে জানুয়ারি	„	ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার মাসিক অধিবেশনের প্রস্তাবানুসারে পুনঃ সম্মিলনের জন্য মহর্ষির গৃহে অপরাহ্ণে উভয় ব্রাহ্মদলের সভা	১০২১
১৮৭৫, ২১শে জানুয়ারি	„	সায়ংকালে প্রচারকবর্গ কেশবের গৃহে উপবিষ্ট হইলে, মণ্ডলীর অন্যান্যের সঙ্গে অসদ্ভাব থাকিলেও, যাঁহারা উৎসবে কার্য্য করিবেন, সেই প্রচারকদিগের	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭৪, ১লা অক্টোবর,	কলিকাতা	ধর্ম্মতত্ত্বে "ঈশ্বরের নূতন বিধান" নামে প্রবন্ধ	১০২৬
...	"	প্রকাশ্যে "নূতন বিধান" উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ্যে মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা *	১০২৬
১৮৭৩, ২৬শে জানুয়ারী (১৪ই মাঘ, ১৭৯৪ শক)	ভারতাশ্রম	ভারতাশ্রমে ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশে বলেন, "মেয়েদিগকে ঘরে না দেখিয়া স্বর্গের মা মনে করিলেন, অবশ্যই তাহাদিগকে কোন শত্রু ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছিলেন"	১০২৬
১৮৭৫, ২৫শে জানুয়ারী, (১৩ই মাঘ, ১৭৯৬ শক)	কলিকাতা	ব্রাহ্মিকাদের উপদেশে বলেন, 'মাকে যদি না দেখিলে, তবে যে তোমরা মাতৃহীন'	১০২৭
১৮৭৪	বেলঘরিয়া—তপোবন	ভারতাশ্রমবাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে শৈথিল্য-দর্শনে বেলঘরিয়ার তপোবনে একা নির্জ্জনবাস ও যোগসাধন	১০২৯
১৮৭৪	কলিকাতা	তৃতীয় পুত্রের অসুস্থতার জন্য তপোবন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন	১০২৯
"	বেলঘরিয়া—তপোবন	কয়েকদিন পরে সহধর্ম্মিণীসহ বেলঘরিয়ার তপোবনে প্রত্যাগমন ও	

* এখনও কেশবের পরমহংসদেবের সহিত পরিচয় হয় নাই। পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বেই কেশবের মনে মাতৃভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় হইতে সঙ্গীতে ও উপদেশে মাতৃনামের উল্লেখ বিষয়ে ১০২৬ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

* (১৭৯৬ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত)

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। মণ্ডলীর দোষও কেশবচন্দ্র গোপন করিতেন না। (১৮ই এপ্রিল ও ৩০শে মে, ১৮৭৫ খৃঃ, ইণ্ডিয়ান মিরারে এইরূপ প্রকাশ করেন)	১০৪৮
১৮৭৫, ২২শে আগষ্ট (৭ই ভাদ্র, ১৭৯৭ শক)	কলিকাতা	ভাদ্রোৎসবে কেশবলিখিত 'কতকগুলি প্রশ্নোত্তর' মুদ্রিত হইয়া পঠিত হয়	১০৪৯
"	"	ব্রহ্মের ১০৮ নাম্ কেশব স্থির করেন এবং তাহা কীর্ত্তনীয়া কুঞ্জবিহারী দে সঙ্গীতে পরিণত করেন এবং উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ তাহা সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মস্তোত্রে নিবদ্ধ করেন	১০৪৯
১৮৭৫, ৬ই জুন	"	সঙ্গতে আলোচিত রিপুজয়ের উপায়	১০৪৯
১৮৭৫, জুন	গৌরিভা	প্রচারকার্য্য উপলক্ষে বন্ধুগণসহ পিতৃপৈতামহিক বাসস্থান গৌরিভায় গমন ও গমনের ফলে তথায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা	১০৫২
১৮৭৫, ২৯শে সেপ্টেম্বর	"	কান্তিচন্দ্র মিত্রকে লইয়া প্রচারার্থ পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা। লক্ষ্ণৌ সাম্বৎসরিক উৎসব সমাধা করিয়া দিল্লী, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য	১০৫২

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		এক সপ্তাহ মন্দিরের অভ্যন্তরে পাঠ ও কীর্ত্তন	১১২০
১৮৭৬, ২০শে আগষ্ট (৫ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক)	কলিকাতা	ভাদ্রোৎসব—কেশবচন্দ্র মস্তক-ঘূর্ণন রোগে অসুস্থ—প্রাতে প্রতাপচন্দ্র উপাসনার কার্য্য করেন	১১২০
„	„	প্রাতের উৎসবে উপদেশের শেষে কেশবের হৃদয়ভেদী প্রার্থনা (স্বর্গে উৎসব)	১১২১
„	„	অপরাহ্লে ধ্যানের উদ্বোধন, দীক্ষিত-গণের প্রতি উপদেশ, সায়ংকালে উপাসনা ও উপদেশ কেশবচন্দ্র নির্ব্বাহ করেন	১১২৩
১৮৭৬, ২৭শে আগষ্ট	„	প্রচারকদের বৈষ্ণবভাব বিশেষরূপে আয়ত্ত করিবার যত্ন বিষয়ে মিরার পত্রিকার লেখা	১১২৪
১৮৭৬,	„	বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সমগ্র-ভাবের পূর্ণতা অসম্ভব। কেশব বলেন—শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়নের এখনও সময় আসে নাই	১১২৪
১৮৭৬, ১৬ই অক্টোবর	„	১৭৯৮ শকের ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্ম-তত্ত্বে ত্রৈলোক্যনাথের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ	১১২৫
১৮৭৭, ২৮শে জানুয়ারি	„	Indian Mirrorএ, (January 28, 1877) কৃষ্ণ ও চৈতন্যের	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
...	দিল্লী	দরবার সংস্রবে কেশবচন্দ্রকে উপাধি-দানের প্রস্তাব ও কেশবের অসম্মতি প্রকাশ	১১৩৫
...	„	দিল্লীতে দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার	১১৩৫
১৮৭৭, ১৯শে—২৫শে জানুয়ারি	কলিকাতা	সপ্তচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব	১১৩৫
১৮৭৭, ২২শে জানুয়ারি	„	কেশবের Town Hall Lecture —"Disease and its remedy" (রোগ ও তাহার ঔষধ বিষয়ে)	১১৩৫
১৮৭৭, ২৩শে জানুয়ারী	„	১১ই মাঘের উৎসবে প্রাতে গাজীপুরের একটী পাখী অবলম্বনে এবং সন্ধ্যায় সাধুমহাজন সম্বন্ধে উপদেশ	১১৪২
১৮৭৭, ২৫শে জানুয়ারী	সাধনকানন মোড়পুকুর	সাধনকাননে উপাসনা, কেশবের কবিত্বরসপূর্ণ বক্তৃতা, অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর যোগ ও ভক্তিসাধন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ	১১৪৩
...	কলিকাতা	রামকৃষ্ণ পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের বন্ধুতা গাঢ় হইতে গাঢ়তর—উৎসবের পর পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রথম ব্রহ্মমন্দির মধ্যে প্রবেশ	১১৪৪
১৮৭৭, ৩রা মার্চ্চ	„	Lord Lyttonএর অনুরোধে কেশবের অতিরিক্ত Town Hall Lecture—"Philoso	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		phy and Madness in Religion" বিষয়ে। Viceroy Lord Lytton, Lady Lytton, Lieutenant Governor of Bengal প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন	১১৪৫
১৮৭৭, ২০শে জানুয়ারি	কলিকাতা	ব্রাহ্মগণের সাধারণ সভায় "ব্রাহ্ম-প্রতিনিধিসভা" সংগঠনের প্রস্তাবানুসারে তাহার উদ্দেশ্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞাপন (১২ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬৪ খৃঃ ৩০শে অক্টোবর কেশবের এই সভা স্থাপনের যত্ন)	১১৫০
...	"	প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মূলতত্ত্ব কেশবচন্দ্র প্রকাশ করেন	১১৫২
...	সাধনকানন মোড়পুকুর	সাধকাননে বাস এবং "আহ্বান" "আহ্নিক" "ভবনদী" প্রভৃতি সাতখানি Railway Tracts প্রণয়ন ও বিতরণ	১১৫৩
১৮৭৭, ১৯শে মে	কলিকাতা	ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা স্থাপন	১১৫৪
১৮৭৭, ১১ই জুলাই	"	কেশবচন্দ্রের গৃহে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন	১১৫৫

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭৭, ২৩শে সেপ্টেম্বর	কলিকাতা	কলিকাতা স্কুলগৃহে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন	১১৫৫
১৮৭৭, ৫ই জুলাই	”	ব্রহ্মমন্দিরে রবিবারের উপাসনা ব্যতীত বৃহস্পতিবার উপাসনা আরম্ভ হয়	১১৫৭
১৮৭৭, ১৯শে জুলাই	”	ব্রহ্মমন্দিরে বৃহস্পতিবারের উপাসনায়, সাধু অঘোরনাথের দস্যুগণের হস্ত হইতে বিমুক্তি উপলক্ষ্য করিয়া কেশবের উপদেশ—'মনের দুর্দ্দান্ত রিপুগণের বিকটাকার দর্শনে যখন প্রাণ নিরাশ হয়, তখন কেবল হরিনাম ভরসা, কেবল রসনা সহায়'	১১৫৭
১৮৭৭	”	Miss Mary Carpenterএর মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে, বেঙ্গল সোশিয়াল সায়েন্স এসোসিয়েশনে কেশবচন্দ্র তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে বলেন	১১৫৮
১৮৭৭, ১৩ই আগষ্ট	”	ব্রহ্মমন্দিরে মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষনিবারণের সাহায্যকল্পে বিশেষ সভা—কেশবচন্দ্রের উপদেশে দুর্ভিক্ষের ভীষণ অবস্থা বর্ণন ও দানসংগ্রহ	১১৫৯
...	...	সংগৃহীত অর্থ দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ বাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজের হস্তে প্রেরণ	১১৬৩
...	...	দুর্ভিক্ষ ফাণ্ডের উদ্বৃত্ত অর্থ আলবার্ট হলের ঋণশোধার্থ ঋণদান	১১৬৪

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭৮, ২৪শে জানুয়ারি	কলিকাতা	অপরাহ্নে Albert Schoolএ সুরাপাননিবারিণী "আশালতা" দল (Band of hope) গঠন। সুরাপাননিবারিণীর গান করিতে করিতে কমলকুটীরে গমন, তথায় কেশবচন্দ্রের উপদেশ	১১৭২
"	"	সায়ংকালে প্রতিনিধিসভার অধিবেশন—অসন্তুষ্টির সৃষ্টি	১১৭৫
১৮৭৮, ২৬শে জানুয়ারি	"	কেশবের Town Hall Lecture —"Behold the King of India is coming clad in righteousness and mercy"	১১৭৫
১৮৭৮, ২৭শে জানুয়ারি	"	দিনব্যাপী উৎসব—পাপীর প্রতি ঈশ্বরের করুণা বিষয়ে উপদেশ	১১৭৬
১৮৭৮, ২৮শে জানুয়ারি	"	সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ :— ১। লোভ বড় পাপ। ২। মিথ্যাকথা বলিবে না। ৩। অন্য লোকের স্ত্রীর প্রতি তাকান ভয়ানক পাপ। ৪। রাগ করিও না, ক্ষমার বড় গুণ। ৫। কাহাকে ঘৃণা করিও না, ঈশ্বরের নিকটে সকলেই সমান	১১৭৭
১৮৭৮, জানুয়ারি	কলিকাতা	উৎসবের মধ্যে জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশনর কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কুচবিহারের	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		তাহাতে কিভাবে তিনি বিবাহ দেন, তাহার প্রকাশ	১২৮০
১৮৭৮, ১০ই মার্চ্চ	কুচবিহার	কুচবিহার বিবাহ সম্বন্ধে কেশবের নিজ মত উপদেশে ব্যক্ত	১২৮০
১৮৭৮	ইংলণ্ড ইত্যাদি	বিদেশে কুচবিহার বিবাহ-আন্দোলনের ফল—মতামত—অনুমোদন, প্রতিবাদ ইত্যাদি	১২৮২
১৮৭৮,	কলিকাতা	প্রতিবাদ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের ভাব	১২৮৮
১৮৭৮, ৫ই মে,	"	কেশবচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। মন্দিরের বেদী কেশবচন্দ্র পুনরায় গ্রহণ করিয়া নিজ জীবন সম্বন্ধে প্রথম উপদেশে বলেন, 'আমার আচার্য্যপদ ঈশ্বরপ্রদত্ত'	১২৯১
১৮৭৮, ১২ই মে	"	দ্বিতীয় উপদেশে "আমি চোর, আমার ব্যবসায় চোরের ব্যবসায়" আত্মকথা বলেন	১২৯৮
১৮৭৮, ২৪শে মার্চ্চ (১২ই চৈত্র, ১৭৯৯ শক) রবিবার	"	মন্দিরে কেশবের উপদেশে বিলক্ষণ প্রকাশ পায় যে, ঘোর নিষ্ঠুর আক্রমণের ভিতরও কেশবচন্দ্র কি প্রকার প্রশান্ত ভাব রক্ষা করিয়াছেন ও ঈশ্বরের দয়া অনুভব করিয়াছেন। (এই দিন প্রতিবাদকারিগণ উপাসনায় ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করেন)	১৩০৩
১৮৬৯, জুন	খাঁটুরা	কেশবচন্দ্রের খাঁটুরাগ্রামে প্রথম গমন, তখন হইতেই ভ্রাতা ক্ষেত্র-	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
(জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহ, ১৭৯১ শক)		মোহন দত্তের গৃহে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে সাপ্তাহিক উপাসনা আরম্ভ হয়	১৩০৮
১৮৭৮, ১৯শে জুন (৬ই আষাঢ়, ১৮০০ শক)	খাঁটুরা	খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৮ই জুন কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ খাঁটুরা যান এবং ১৯শে জুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।	১৩০৮
"	"	প্রাতে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে "ঋষি ও ভক্ত" বিষয়ে উপদেশ	১৩০৯
...	...	গাজীপুরের পবনাহারী বাবার উক্তি—"কেশব বাবা যে কথা বলেন, সে অন্য দেশের শাস্ত্রের অতীত।" (ফুটনোট দ্রষ্টব্য)	১৩১৩
১৮৭৮, ১৯শে জুন	খাঁটুরা	অপরাহ্নে সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ	১৩১৫
...	"	খাঁটুরায় কেশবচন্দ্রের ব্যবহারাদি দেখিয়া ক্ষেত্রমোহন দত্ত বলেন, কেশবচন্দ্র আপনার বৈরাগ্য সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন রাখিতেন	১৩১৯
...	...	কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে খাঁটুরার ক্ষেত্রমোহন দত্তের স্মৃতিলিপি	১৩২১
...	...	ধর্ম্ম ও ঈশ্বরানুরাগবিহীন দেশ-সংস্কার সম্বন্ধে কেশবের কি মত, অন্যায়কারীর প্রতি সদ্ভাব দ্বারা তাহার চিত্তপরিবর্ত্তন কেশবের জীবনের যে মূলমন্ত্র এবং কেশবের স্থির ধীর প্রশান্ত ভাব	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		ইত্যাদি ক্ষেত্রমোহন দত্তের, স্মৃতিলিপিতে প্রকাশ পায়	১৩২৪
১৮৭৮	কলিকাতা	খাঁটুরা হইতে প্রত্যাগমনের পর কেশব ম্যালেরিয়া জ্বররোগে আক্রান্ত হন	১৩২৫
"	"	ভাগীরথীবক্ষে নৌকায় অবস্থান	১৩২৬
"	"	প্রতিবাদকারিগণের পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের রোগের জন্য দুঃখ-প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য লেখা হয়। (মফঃস্বলের একটী ব্রাহ্ম এরূপ প্রার্থনা করার প্রতিবাদ করেন — উক্ত পত্রিকা এ প্রতিবাদ সমীচীন মনে করেন না)	১৩২৭
১৮৭৮	কাশীপুর	নৌকায় ১২ই আগষ্ট কিঞ্চিৎ রোগ-বৃদ্ধি, দুদিন পরে স্বাস্থ্যপ্রত্যাবৃত্তির লক্ষণ, কিন্তু দৌর্ব্বল্য, এমন অবস্থায় নৌকা হইতে কাশীপুরে শিলবাবুদের উদ্যান-বাটীতে অবস্থান — রোগের উপশম	১৩২৮
১৮৭৮ ২৮শে আগষ্ট	কলিকাতা	একপক্ষকাল উদ্যানবাটীতে থাকিয়া গৃহে প্রত্যাগমন	১৩২৮
১৮৭৮, ১৫ই ও ২২শে সেপ্টেম্বর	"	ব্রহ্মমন্দিরে ১৫ই রবিবার একটী প্রার্থনা মাত্র করেন, ২২শে রবিবার আরাধনা পর্য্যন্ত করেন	১৩২৮

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭৮, ২৯শে সেপ্টেম্বর	কলিকাতা	মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ উভয় কার্য্যই করেন, উপদেশ — "দুর্গতিহারিণী" বিষয়ে	১৩২৯
১৮৭৮	"	পূর্ণিমার দিনে ভাগীরথীবক্ষে নৌকায় শারদীয় উৎসব করা স্থির হয় এবং ১৮০০ শকের ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে তাহার বিজ্ঞাপন	১৩৩১
১৮৭৮, ১০ই অক্টোবর (পূর্ণিমা তিথি)	"	প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ, মধ্যাহ্নে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গমন, বিশ্রামান্তে সায়ঙ্কালে ভাগীরথী-বক্ষে নৌকায় শারদীয় উৎসব	১৩৩২
"	"	সন্ধ্যায় ভাগীরথীবক্ষে উপদেশ	১৩৩৩
"	"	"মা গঙ্গে, তুমি প্রেমিকের সঙ্গে কথা কও" কেশবচন্দ্রের এই উক্তি লইয়া প্রতিবাদকারিগণের অতি-মাত্র ব্যঙ্গ (ফুটনোট দ্রষ্টব্য)	১৩৩৬
১৮৭৮, ১৭ই অক্টোবর	"	ভাই উমানাথ গুপ্ত সেবাশিক্ষার্থি-রূপে গৃহীত হন—কমলকুটীরে তাঁহাকে প্রথম উপদেশ	১৩৩৮
১৮৭৮, ১৮ই অক্টোবর	"	সেবাশিক্ষার্থী উমানাথকে "বিবেক-তত্ত্ব" বিষয়ে দ্বিতীয় উপদেশ	১৩৪১
১৮৭৮, ৪ঠা নভেম্বর	রাণীগঞ্জ	বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ কেশবের রাণীগঞ্জে গমন। মহেন্দ্রনাথ সঙ্গে যান	১৩৪৪
...	কলিকাতা	হিন্দু ও বৈষ্ণবভাবে ঈশ্বরের নব নব নাম গ্রহণে প্রতিবাদকারী-দের অভিমত	১৪৪৪

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		(৩) ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন বিভাগের মিলনের আশা কি আছে ?	১৩৫৪
		(৪) উপাসকমণ্ডলীমধ্যে বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের একতা কি প্রকারে সম্ভব ?	১৩৫৫
		(৫) "কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না" এই মূলতত্ত্বে প্রচারকপরিবারের আহারাদির ব্যবস্থা কি ?	১৩৫৬
		(৬) প্রচারকেরা স্বাধীন, না ক্রীত-দাসবৎ বাধ্য ?	১৩৫৬
		(৭) ভক্তির সঙ্গে নীতির সম্পর্ক কি ?	১৩৫৭
		(৮) ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে সম্প্রদায়বিভাগ সম্ভব কি না ? কতদূরই বা সম্ভব ?	১৩৫৭
		(৯) সাহজিক সত্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যে প্রভেদ কি ?	১৩৫৮
		(১০) বাহ্য উপকার জন্য প্রার্থনা অনু-মোদনীয় কি না ?	১৩৫৮
		(১১) ধর্ম্ম ও নীতির সম্পর্ক কি ?	১৩৫৯
		(১২) অধ্যয়নাভ্যাস কি পরামর্শসিদ্ধ ?	১৩৫৯
		(১৩) ব্রাহ্ম হইয়া কি বিশেষ বিধাতৃত্বে, দেবনিশ্বসিতে ও মহাজনসম্বন্ধীয় মতে বিশ্বাস না করিতে পারেন ?	১৩৬০
		(১৪) ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রতি-বাদের আন্দোলন কি স্থায়ী হইবে ?	১৩৬০

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		আখ্যায়িকাচ্ছলে "হরিদাস ও কড়িদাস" বিষয়ে উপদেশ	১৩৮৮
১৮৭৯, ২৮শে জানুয়ারি	সাধনকানন	'সাধনকাননে' উৎসব—উপাসনা, উপদেশ ও প্রার্থনা	১৩৯০
১৮৭৯	...	লিওনার্ড সাহেব লিখিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে নিরপেক্ষতার অভাব,—কেশবচন্দ্রের প্রতি বিশেষ অবিচার ও অনৃত-প্রচার	১৩৯১
১৮৭৯, ২৯শে জানুয়ারি	কলিকাতা	Albert Hallএ "ব্রহ্মবিদ্যালয়ের" পুনঃ প্রতিষ্ঠা, "ঈশ্বরের অস্তিত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা	১৩৯৩
৮ই ফেব্রুয়ারি	"	ব্রহ্মবিদ্যালয়ে 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ' বিষয়ে উপদেশ	১৩৯৫
২২শে ফেব্রুয়ারি	"	ব্রহ্মবিদ্যালয়ে "বিবেক" সম্বন্ধে উপদেশ	১৩৯৬
২৯শে মার্চ্চ	"	ব্রহ্মবিদ্যালয়ে 'ব্রাহ্মধর্ম, অদ্বৈতবাদ ও বহুদেববাদ' বিষয়ে উপদেশ	১৩৯৬
৫ই এপ্রিল	"	ব্রহ্মবিদ্যালয়ে "বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছা" সম্বন্ধে উপদেশ	১৩৯৭
১৯শে এপ্রিল	"	ব্রহ্মবিদ্যালয়ে 'অনন্ত অথচ জ্ঞেয় ঈশ্বর' বিষয়ে উপদেশ	১৩৯৭
২৬শে এপ্রিল	"	ব্রহ্মবিদ্যালয়ে "ঈশ্বরের বাণী" বিষয়ে উপদেশ	১৩৯৮
৩রা মে	"	ব্রহ্মবিদ্যালয়ে "জ্ঞান ও বিশ্বাস" বিষয়ে উপদেশ	১৩৯৯

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		হিন্দীতে বক্তৃতা, তৎপর নগর-কীর্ত্তন	১৪৯০
১৮৭৯, ১৫ই নভেম্বর	গয়া	ব্রাহ্মিকা-সমাজে উপদেশ, আহারান্তে বুদ্ধগয়ায় গমন, সেখানে সন্ধ্যায় বোধিদ্রুমতলে ধ্যান ও উপদেশ	১৪৯০
১৬ই নভেম্বর	„	প্রাতে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে উপাসনা, পর্ব্বতকে সম্বোধন করিয়া প্রকৃতির নিকটে শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ, সন্ধ্যায় সমাজগৃহে উপাসনা এবং আন্তরিক গয়াতীর্থ ও পরলোক সম্বন্ধে উপদেশ	১৪৯১
১৭ই নভেম্বর	„	প্রাতে উপাচার্য্যের গৃহে উপাসনা, সন্ধ্যায় গয়া স্কুলে "Dangerous Perhaps" বিষয়ে ইংরেজী বক্তৃতা	১৪৯৪
১৮ই নভেম্বর	„	গয়ালী ছোটালালের কেশবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ৫০ টাকা দান, প্রাতে এক বন্ধুর ভবনে উপাসনা, অপরাহ্ণে রমণার মাঠে "বাঙ্গালীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য" বিষয়ে প্রথমে ইংরাজী বক্তৃতা, তৎপর তিন তীর্থ (গয়া, কাশী ও বৃন্দবন) ও ব্রহ্মপ্রেম বিষয়ে হিন্দী বক্তৃতা	১৪৯৫
„	„	রমণার মাঠে বাঙ্গালীদের সম্বোধনের মর্ম্ম	১৪৯৬

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		হিন্দীতে বক্তৃতা, তৎপর নগর-কীর্ত্তন	১৪৯০
১৮৭৯, ১৫ই নভেম্বর	গয়া	ব্রাহ্মিকা-সমাজে উপদেশ, আহারান্তে বুদ্ধগয়ায় গমন, সেখানে সন্ধ্যায় বোধিদ্রুমতলে ধ্যান ও উপদেশ	১৪৯০
১৬ই নভেম্বর	"	প্রাতে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতে উপাসনা, পর্ব্বতকে সম্বোধন করিয়া প্রকৃতির নিকটে শিক্ষা বিষয়ে উপদেশ, সন্ধ্যায় সমাজগৃহে উপাসনা এবং আন্তরিক গয়াতীর্থ ও পরলোক সম্বন্ধে উপদেশ	১৪৯১
১৭ই নভেম্বর	"	প্রাতে উপাচার্য্যের গৃহে উপাসনা, সন্ধ্যায় গয়া স্কুলে "Dangerous Perhaps" বিষয়ে ইংরেজী বক্তৃতা	১৪৯৪
১৮ই নভেম্বর	"	গয়ালী ছোটালালের কেশবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ৫০ টাকা দান, প্রাতে এক বন্ধুর ভবনে উপাসনা, অপরাহ্ণে রমণার মাঠে "বাঙ্গালীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য" বিষয়ে প্রথমে ইংরাজী বক্তৃতা, তৎপর তিন তীর্থ (গয়া, কাশী ও বৃন্দবন) ও ব্রহ্মপ্রেম বিষয়ে হিন্দী বক্তৃতা	১৪৯৫
"	"	রমণার মাঠে বাঙ্গালীদের সম্বোধনের মর্ম্ম	১৪৯৬

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		উপাসনা, উপাসনায় নানকপন্থী সন্ন্যাসী নাগাজির যোগদান, নাগাজির আশ্রমে ভোজন, নাগাজির গ্রন্থসাহেব পাঠ, তৎপর শকটযোগে ভোজপুরের ভগ্নাবশেষ দর্শন, অপরাহ্নে পুনরায় অরণ্যে তরুমূলে বসিয়া কেশবের বন্যতরুদিগকে লক্ষ্য করিয়া সুমধুর স্বর্গের কথা ও প্রার্থনা	১৫০৩
১৮৭৯, ২৬শে নভেম্বর	ডোমরাও	সন্ধ্যায় স্কুলগৃহে "জাতীয় ভাব ও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম" বিষয়ে নাগাজি স্বামীর সভাপতিত্বে ইংরাজী ও হিন্দীতে বক্তৃতা, তৎপর ম্যানেজার জয়প্রকাশ লালের গৃহে আহারান্তে গাজীপুর যাত্রা। ডোমরাও রাজসরকার হইতে প্রচারের জন্য দুই শত টাকা দানপ্রাপ্তি	১৫০৫
১৮৭৯, ২৭শে নভেম্বর	গাজিপুর	Thornhill ঘাটে হিন্দী বক্তৃতা ও হিন্দীতে নগরসংকীর্ত্তন	১৫০৬
১৮৭৯, ২৮শে নভেম্বর	"	প্রাতে সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা, "ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার জীবন্ত সম্বন্ধ" বিষয়ে উপদেশ, সন্ধ্যার পর ভিক্টোরিয়া স্কুলে "Our March to the Promised Land" বিষয়ে কেশবের ইংরাজি বক্তৃতা	১৫০৭

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৭৯, ২৯শে ও ৩০শে নভেম্বর এবং ১লা ডিসেম্বর	শোণপুর	গাজিপুর হইতে ২৯শে নভেম্বর রাত্রে শোণপুরের বিখ্যাত মেলায় উপস্থিতি, মেলা দর্শন, ইংরাজি ও হিন্দিতে কেশবের বক্তৃতা, আরা যাত্রা	১৫০৮
১৮৭৯, ২রা ডিসেম্বর	আরা	অপরাহ্নে স্কুলপ্রাঙ্গণে হিন্দী বক্তৃতা, ভজন ও সংকীর্ত্তন; রাত্রে স্কুলগৃহে "Truth triumphs, not untruth" বিষয়ে কেশবের বক্তৃতা	১৫০৯
১৮৭৯, ৩রা ডিসেম্বর	"	আরা ত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা	১৫১০
১৮৭৯, ৪ঠা ডিসেম্বর	সাধনকানন	শ্রীরামপুরে নামিয়া সাধনকাননে উপস্থিতি ও বৃক্ষতলে উপবেশন—পরে বারাকপুর হইয়া কলিকাতা যাত্রা, সন্ধ্যাবেলায় কলিকাতায় উপস্থিতি	১৫১০
১৮৭৯, ৮ই ডিসেম্বর	কলিকাতা	প্রচারসম্বন্ধে প্রচারকসভার নির্দ্ধারণ	১৫১১
১৮৭৯, ১৪ই ডিসেম্বর	"	বিশ্বজননীর নামে Indian Mirrorএ ঘোষণা প্রকাশিত	১৫১১
১৮৭৯, ১৮ই ডিসেম্বর	"	কেশবচন্দ্রের "Materialism and Idealism" বিষয়ে বক্তৃতা (Medical College Theatre Hallএ)	১৫১৩
১৮৮০, ১৪ই জানুয়ারি	"	পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবের প্রথম দিনে প্রাতে নয় জন যুব-	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৮০, ২৬শে জানুয়ারি	কলিকাতা	প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও "তেজোময় ব্রহ্ম" বিষয়ে উপদেশ, অপরাহ্ণে নগরসংকীর্ত্তন—"নববিধান" ইত্যাদি অঙ্কিত পতাকা সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে বিডন উদ্যানে গমন	১৫৪১
"	"	বিডন উদ্যানে "গৌরচন্দ্র" বিষয়ে কেশবের উপদেশ	১৫৪৪
১৮৮০, ২৭শে জানুয়ারি	বেলঘরিয়া	বেলঘরিয়ার তপোবনে বৃক্ষতলে ধ্যানধারণা। সায়াহ্নে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের আগমন ও প্রসঙ্গ	১৫৪৫
১৮৮০, ২৮শে জানুয়ারি	উত্তরপাড়া	প্রচারযাত্রা—উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বাড়ী সংকীর্ত্তন	১৫৪৫
১৮৮০, ১লা ফেব্রুয়ারি	কলিকাতা	মন্দিরে—হরিসুন্দর বসু, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীশঙ্কর দাস প্রভৃতি দ্বাদশ জন কেশবের নিকট "ব্রহ্মসাধকব্রত" গ্রহণ করেন। ব্রতধারিগণকে কেশবচন্দ্রের উপদেশ	১৫৪৫
৮৮০, ১৬ই ফেব্রুয়ারি	বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমানে প্রচারযাত্রা	১৫৪৮
১৭ই ফেব্রুয়ারি	"	অপরাহ্ণে বর্দ্ধমানে নগরকীর্ত্তনে একজন মুসলমান মৌলবী কীর্ত্তনের পতাকা ধারণ করিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া গমন করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাছারীর মাঠে	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		(৪) ঈশ্বর ও স্বর্গস্থ সাধুগণের সহিত অধ্যাত্মযোগই সত্য স্বর্গ	১৫৮৫
		(৫) সকল দেশকালের সাধুমহাজনদিগকে সম্মান কর	১৫৮৬
		(৬) গোঁড়াম, ধর্ম্মান্ধতা ও পরমতা-সহিষ্ণুতা পরিহার কর	১৫৮৬
		(৭) বিশ্বাস ও বিজ্ঞানেরসমন্বয় সাধন কর	১৫৮৭
		(৮) ধর্ম্ম ও নীতি অবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হোক	১৫৮৭
		(৯) প্রার্থনাশীল হও	১৫৮৮
		(১০) সেণ্ট পলের ভাবে সকল মহাজনগণের নামে এই পত্র	১৫৮৯
...	নৈনীতাল	প্রচারকদিগের নাম "প্রেরিত" নামে পরিবর্ত্তন করিবার অভি-প্রায়ে কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধ (প্রচা-রকদিগের জীবনের কার্য্যের ব্যাখ্যান)	১৫৮৯
...	"	নৈনীতাল হইতে কেশবচন্দ্রের "কথোপকথন" প্রবন্ধ (অনু-বাদ)	১৫৯২
১৮৮০, ১৪ই ফেব্রুয়ারি	কলিকাতা	Albert Hallএ "ব্রহ্মবিদ্যালয়ে" কেশবের প্রারম্ভিক ইংরাজীতে বক্তৃতা (ঈশ্বর যেমন এক, তেমনি তাঁহার ধর্ম্মও এক ; যে বংশ হইতে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত উদ্ভূত হইয়াছে,	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		গণের অসন্তুষ্টি, কিন্তু কেশবের সঙ্গে অক্সফোর্ডমিশনের সভ্যদিগের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ	১৬৫৪
১৮৮১, ১লা—১২ই জানুয়ারি	কলিকাতা	একপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবের জন্য দ্বাদশদিনব্যাপী প্রাস্তুতিক সাধন	১৬৫৬
১লা জানুয়ারি	"	"রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ"	১৬৫৬
২রা জানুয়ারি	"	"নববিধান"	১৬৫৭
৩রা জানুয়ারি	"	"মাতৃভূমি"	১৬৫৮
৪ঠা জানুয়ারি	"	"গৃহ"	১৬৫৯
৫ই জানুয়ারি	"	"শিশু"	১৬৫৯
৬ই জানুয়ারি	"	"ভৃত্য"	১৬৬০
৭ই জানুয়ারি	"	"দীন"	১৬৬০
"	"	আর্য্যনারীসভার অধিবেশনে উৎসবে প্রস্তুতির জন্য উপদেশ	১৬৬১
৮ই জানুয়ারি	"	"যোগ"—(তিন বৎসর পরে যে দিনে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ হইবে, সেই দিনে এই বৎসরে এই যোগের প্রার্থনা করেন। স্বর্গারোহণদিনে তাই এই প্রার্থনাটী পঠিত হয়)	১৬৬২
৯ই জানুয়ারি	"	"মহাজন"	১৬৬৪
১০ই জানুয়ারি	"	"মানবহিতৈষী"	১৬৬৫
১১ই জানুয়ারি	"	"উপকারী"	১৬৬৬
১২ই জানুয়ারি	"	"বিরোধী"	১৬৬৬
"	"	নিশাজাগরণ (প্রত্যাদেশ, একাত্মতা, চিত্তশুদ্ধি)	১৬৬৭

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৮১, ১৩ই জানুয়ারি (১লা মাঘ, ১৮০২ শক)	কলিকাতা	"জয় মাতঃ, জয় মাতঃ, নিখিল জগতপ্রসবিনী" আরতির সঙ্গীত হইয়া উৎসবারম্ভ। আরতির অন্তে পরমমাতার স্তুতি	১৬৭০
১৪ই জানুয়ারি	"	কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে Albert Hallএ রাজা রামমোহনের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা	১৬৭২
১৫ই জানুয়ারি	"	মল্লিকের ঘাটে হিন্দি, বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা ভাষায় বক্তৃতা	১৬৭৩
১৬ই জানুয়ারি	"	প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা	১৬৭৫
১৭ই জানুয়ারি	"	ব্রহ্মমন্দিরে প্রতাপচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা	১৬৭৫
১৮ই জানুয়ারি	"	আশালতার নির্য্যাণ, কমলকুটীরে বক্তৃতা ও সুরারাক্ষসের দাহ	১৬৭৫
১৯শে জানুয়ারি	"	Albert Hallএ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক	১৬৭৫
২০শে জানুয়ারি	"	মঙ্গলবাড়ীর উৎসব ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন। এই অধিবেশনের একটী নির্দ্ধারণ এই: — "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের বিরোধিগণ, যাঁহারা বিবিধ উপায়ে ইহার কার্য্য প্রতি-রুদ্ধ করিতে যত্ন করিয়াছেন, ইহার সভ্যদিগের প্রতি অত্যা-চার করিয়াছেন, ইহার কার্য্য-কারকগণকে নিন্দিত ও অন্য	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		প্রকারে প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন, এই সভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন ; কেন না তাঁহারা পাকতঃ যথার্থ বিশ্বাসিগণের ভক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত করিয়াছেন।”	১৬৭৫
১৮৮১, ২০শে জানুয়ারি	কলিকাতা	এই অধিবেশনে প্রচারকদের নামের পূর্ব্বে “শ্রদ্ধেয় ভাই” সংযুক্ত হওয়ার প্রস্তাব কেশবচন্দ্র করেন	১৬৭৭
২১শে জানুয়ারি	”	আর্য্যনারীসমাজের উপাসনা	১৬৭৭
২২শে জানুয়ারি	”	কেশবচন্দ্রের Town Hallএ বক্তৃতা—‘We the Apostles of the New Dispensation’	১৬৭৮
২৩শে জানুয়ারি (১১ই মাঘ, ১৮০২ শক)	”	সমস্তদিনব্যাপী উৎসব—প্রাতে ‘ঈশ্বরের সখ্যভাব’ উপদেশ, সন্ধ্যায় নববিধানাঙ্কিত পতাকার উত্তোলন, নিম্নে বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষা, সকলের পতাকাস্পর্শ করিয়া ঈশ্বরকে প্রণাম, সায়ংকালের উপাসনায় পাঁচজনের দীক্ষা, ‘নববিধানের বিজয়নিশান’ উপদেশ	১৬৮৪
১৮৮১, ২৪শে জানুয়ারি (১২ই মাঘ, ১৮০২ শক)	”	নগরে মহা সঙ্কীর্ত্তন। কলুটোলা হইতে কমলকুটীর, সারকুলার রোড, বিডন ষ্ট্রীট হইয়া বিডন পার্কে প্রবেশ। “লা এলাহ ইল্লিল্লা” পতাকা একজন পঞ্জাবী ভ্রাতা ধারণ করেন	১৬৮৬

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		(৬) Henry Stanley Newman (Christian World, March, 1881)	১৭০১
১৮৮১, ২৮শে জানুয়ারী	কলিকাতা	প্রচারকগণের সভা "Apostles' Durbar" ("প্রেরিতগণের দরবার") নাম প্রাপ্ত হইল; প্রেরিত প্রচারক, প্রচারকার্য্যের সাহায্যকারী, গৃহস্থ প্রচারকের শ্রেণীবিভাগ	১৭০৫
১৮৮১, ৩০শে জানুয়ারী	"	প্রেরিতগণের কার্য্যক্ষেত্রবিভাগ	১৭০৭
৩১শে জানুয়ারী	"	দরবারে আচার্য্যের ও প্রেরিত-গণের প্রতিপালনের ভারার্পণ	১৭০৮
২১শে ফেব্রুয়ারী	"	দরবারে নববিধানের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা বিষয়ে কথোপকথন	১৭০৮
১৮৮১, ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৭ই ফাল্গুন, ১৮০২ শক)	ভাগলপুর	কেশবচন্দ্র ভাগলপুরের নবনির্ম্মিত ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠার কার্য্য করেন (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮০২ শক, ১লা চৈত্র, পৃঃ ৫৯ এবং Sunday Mirror, March 20, 1881 দ্রষ্টব্য)	
১৮৮১, ২রা মার্চ্চ	কলিকাতা	দরবারে New Dispensation পত্রিকা বাহির হওয়ার নির্দ্ধারণ	১৭০৮
১৫ই মার্চ্চ	"	কমলকুটীরে বসন্তপূর্ণিমা ও শ্রী-চৈতন্যের জন্মদিনে উৎসব ও পূর্ব্বদিন কেশবচন্দ্রের মস্তক-মুণ্ডন, অদ্য সন্ন্যাসগ্রহণ	১৭০৮

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৮১ ১৫ই মার্চ্চ	কলিকাতা	প্রেরিতগণের গলে মেডল প্রদান, প্রেরিতগণের প্রতি সেবক কেশবচন্দ্রের অগ্নিময় উপদেশ—"আমি তোমাদের গুরু নহি, তোমাদের সেবক ও বন্ধু"	১৭০৯
"	"	উপাসনান্তে কেশবের ভিক্ষাব্রত গ্রহণ	১৭১৩
"	"	সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে বসন্তপূর্ণিমা উপলক্ষে উপাসনা, প্রেরিতবর্গের একত্বপ্রদর্শন জন্য মিলিত আরাধনা, তৎপর কেশবের উপদেশ—"আকাশের চন্দ্র বড়, না, নবদ্বীপের চন্দ্র বড়"	১৭১৪
...	"	প্রেরিত-নিয়োগ বিষয়ে কেশবের ইংরাজী উক্তির অনুবাদ	১৭১৪
১৮৮১, ২৪শে মার্চ্চ	কলিকাতা	প্রেরিতবর্গের ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রচারার্থ যাত্রা	১৭১৭
১৮৮১, ২১শে মার্চ্চ	"	প্রেরিত-দরবারে প্রচারযাত্রা সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ	১৭১৯
...	"	জনৈক নববিধাননিন্দাকারীর গৃহে গিয়া প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তন	১৭১৯
১৮৮১, ১২ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ, ১৮০৩ শক)	"	প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে নববর্ষোপলক্ষে উপাসনা, নামকীর্ত্তনে প্রচার বিষয়ে কেশবের উপদেশ	১৭১৯
১৮৮১, ২৭শে এপ্রিল	"	নূতন প্রণালীতে নামকীর্ত্তনে প্রচার বিষয়ে ধর্ম্মতত্ত্বের মন্তব্য (১৬ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক)	১৭২০

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
		(৪) পাগল (১লা ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ)	১৭৫১
		(৫) পাগল ,, ,,	১৭৫৩
		(৬) যোগী (১৬ই শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ)	১৭৫৫
		(৭) যোগী	১৭৫৬
১৮৮১, ৪ঠা মে	কলিকাতা	খ্রীষ্টশিষ্যগণের প্রতি প্রীতি	১৭৫৭
১৮৮১	,,	New Dispensation পত্রিকায় কেশবের লেখা :—	
		(১) অপরিজ্ঞেয়বাদের তত্ত্ব (১৮০৩ শকের ১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ)	১৭৫৯
		(২) ক্ষমার শাস্ত্র (১৮০৩ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে. অনুবাদ)	১৭৬০
		(৩) নববিধান শিক্ষা (১৮০৩ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ)	১৭৬২
		(৪) নববিধানে নূতন কি ? (১৮০২ শকের ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ)	১৭৬৪
		(৫) চৈতন্যের দ্বিবিধ স্বভাব (১৮০৩ শকের ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুবাদ)	১৭৬৪
		(৬) উপন্যাস পাঠ (১৮০৩ শকের ১লা শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে অনুদাদ)	১৭৬৬
		(৭) সঙ্কোচ নয়, মেলান	১৭৬৭

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৮২, ৭ই জুলাই	দার্জিলিং	(১) কেশবচন্দ্রের দার্জিলিং হইতে মসূরী পাহাড়ে স্থিত মহর্ষিকে লিখিত পত্র	১৭৮৭
১৮৮২, ১৭ই জুলাই	মসূরী	(২) মহর্ষির উত্তর :— 'আমার কথার সায় তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি, এরূপ আঁর কাহারও নিকট হইতে পাই নাই'	১৭৮৮
১৮৮৩, ২৭শে সেপ্টেম্বর	তারাভিউ সিমলা	(৩) সিমলা পাহাড় হইতে কেশবচন্দ্রের মহর্ষিকে লিখিত পত্র	১৭৮৯
২৯শে সেপ্টেম্বর	হিমালয়	(৪) হিমালয় হইতে মহর্ষির উত্তর	১৭৯০
১৮৮৩, ১১ই অক্টোবর	কাণপুর	(৫) কাণপুর হইতে মহর্ষিকে কেশবচন্দ্রের শেষ পত্র	১৭৯১
১৮৮১, ২৩শে মে	মিসিগণ (আমেরিকা)	রেবারেণ্ড ই, এল, রেক্সফোর্ডের কেশবচন্দ্রকে পত্র	১৭৯২
...	কলিকাতা	কেশবচন্দ্রের উত্তর	১৭৯৪
...	...	W. Knightonএর Contemporary Reviewতে 'ব্রাহ্মসমাজের নূতন উদ্দেশ্য' প্রবন্ধ	১৭৯৫
...	...	এই কাগজে Miss Colletএর নাইটনের পত্রের প্রতিবাদ	১৭৯৬
...	...	মনিয়র ই নবেলির "খ্রীষ্ট কে" এই বক্তৃতার ফরাসী অনুবাদ এবং 'ইবাঞ্জেলিকাল ক্রিষ্টানে' পত্র	১৭৯৬
১৮৮০, ২২শে ডিসেম্বর	কলিকাতা	মনিয়র উইলিয়মকে প্রচারকসভা হইতে তাঁহার পত্রের প্রতিবাদ	১৭৯৭
১৮৮১, ৩রা অক্টোবর	"	ব্রাহ্মপ্রচারকসভা হইতে পুরাতন বন্ধু Mr. A. D. Tysenকে	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৮১, ১৫ই জানুয়ারী	কলিকাতা	ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে 'সংযম' ও সন্ধ্যায় 'হাস্ত' বিষয়ে উপদেশ	১৮২১
১৬ই জানুয়ারী	"	কমলকুটীরে Band of Hopeএর যাত্রা, সঙ্গীত ও অধিবেশন	১৮২২
১৮ই জানুয়ারি	"	Albert Hallএ Theological Classএর সাম্বৎসরিক—কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্ব	১৮২৩
১৯শে জানুয়ারী	"	Albert Hallএ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা, ভাই কান্তিচন্দ্রের বিবরণ পাঠ—পাওনাদারের গালাগালিপূর্ণ পত্রপ্রাপ্তি, কয়েকটী রহস্য ও পত্র	১৮২৪
২০শে জানুয়ারী	"	মঙ্গলবাড়ীর উৎসব	১৮৩২
২১শে জানুয়ারী	"	Town Hall Lecture—'Trinity' বিষয়ে	১৮৩৩
২২শে জানুয়ারী	"	সমস্তদিনব্যাপী উৎসব—প্রাতে 'সতীত্ব' বিষয়ে কেশবের উপদেশ	১৮৩৩
"	"	অপরাহ্ণে প্রার্থনা, ধ্যানের উদ্বোধন, সংকীর্ত্তন	১৮৩৮
"	"	সন্ধ্যায় 'শব্দ, এবং প্রতিশব্দ' বিষয়ে প্রতাপচন্দ্রের উপদেশ	১৮৩৯
২৩শে জানুয়ারী	"	আর্য্যনারী সমাজ	১৮৪৪
২৪শে জানুয়ারী	"	নগরসংকীর্ত্তন ও বিডন পার্কে 'যুগলভাব' বিষয়ে বক্তৃতা	১৮৪৫
২৫শে—২৮শে জানুয়ারী	"	কলিকাতায় পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে প্রচারযাত্রা	১৮৫১
৩০শে জানুয়ারী	বেলঘরিয়া	বেলঘরিয়া তপোবনে গমন	১৮৫১

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৮২, ২৮শে মে	কলিকাতা	কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও 'প্রেম' বিষয়ে উপদেশ	১৮৫৭
৮ই এপ্রিল	"	ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা	১৮৫৭
৪ঠা জুন	"	কেশবচন্দ্রের বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য সপরিবারে দার্জিলিং যাত্রা	১৮৫৮
...	"	দার্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে নববৃন্দাবন নাটকের প্রাস্তুতিক ব্যাপার এবং Native Ladies' Institution স্থাপন (পরবর্ত্তী কালে Victoria Institution নাম দেওয়া হয়।)	১৮৫৯
১৮৮২, ১লা মে	"	ঐ বিদ্যালয়ে ফাদার লাফোঁর চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা (বক্তৃতার পূর্ব্বে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কেশবচন্দ্রের নারীজাতির শিক্ষাপ্রণালী অগ্রাহ্য করাতে, নারীশিক্ষা-প্রণালী অন্য আকার ধারণ করে—তাঁহার মতে স্ত্রী ও পুরুষের একত্র সংমিশ্রণশিক্ষা সমুচিত নয়— নারী যাহাতে উৎকৃষ্ট মাতা, উৎকৃষ্ট কন্যা, উৎকৃষ্ট ভগিনী হন, এইরূপে তাঁহাদের শিক্ষা আবশ্যক।)	১৮৫৯
...	"	কৃষ্ণবিহারী সেনের ইতিহাস সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা	১৮৫৯
...	"	ভারতসংস্কারকসভা হইতে সিণ্ডি-	

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৮২, ১৮ই সেপ্টেম্বর	কলিকাতা	"ব্রহ্মে বিলীন" প্রার্থনা	১৯১১
১৯শে সেপ্টেম্বর	"	মুক্তিফৌজের বঙ্গে পদার্পণে, 'মুক্তিফৌজের বৈরাগ্য' প্রার্থনা	১৯১২
...	"	মুক্তিফৌজকে নববিধানের প্রেরিতবর্গের পক্ষ হইতে অভিনন্দন	১৯১৪
১৮৮২	"	মুক্তিফৌজের উপর বঙ্গের শাসনকর্ত্তার অত্যাচার সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বের (১৬ই আশ্বিন, ১৮০৪ শক) উক্তি	১৯১৭
১৮৮২, ৮ই অক্টোবর	"	অত্যাচার প্রতিবিধান জন্য Town Hallএ সভা—কেশব সভাপতি	১৯১৮
...	"	মেজর টকরকে কেশবচন্দ্রের সহানুভূতিসূচক পত্র (মুক্তিফৌজের 'ওয়ার ক্রাইয়ে' প্রকাশিত)	১৯১৮
...	"	অসুস্থতার মধ্যেও কার্য্যোদ্যম	১৯১৯
...	"	পারিবারিক সম্বন্ধকে উচ্চতম ভূমিতে প্রতিষ্ঠা জন্য ব্রতানুষ্ঠান	১৯২০
১৮৮২, ২৯শে অক্টোবর	"	কেশব-পত্নীর কেশভার উন্মোচন, স্বামী সহ যোগধর্ম্মসাধন, এক সপ্তাহের জন্য নিয়মানুবর্ত্তন	১৯২০
২৯শে অক্টোবর	"	যুগলব্রত গ্রহণের প্রার্থনা	১৯২১
৩০শে অক্টোবর	"	"সতীত্বলাভের অভিলাষ" প্রার্থনা	১৯২৪
৩১শে অক্টোবর	"	"একাত্মতা" প্রার্থনা	১৯২৫
...	"	বিরোধিগণের কেশবের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের ব্যর্থতা	১৯২৬
১৮৮২, ৭ই মে	Oxford	মোক্ষমূলারের পত্র	১৯২৭

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৮৩, ২১শে জানুয়ারী (৯ই মাঘ, ১৮০৪ শক)	কলিকাতা	ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব —প্রাতে কেশবের উপদেশ— "আত্মাই আমার বন্ধু—আত্মাই আমার শত্রু".	১৯৬১
২২শে জানুয়ারী	"	ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা ও ইংরেজীতে উপাসনা	১৯৬২
২৩শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ)	"	নগরসংকীর্ত্তন — বিডন পার্কে কেশবের শেষ বক্তৃতা, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে প্রতাপচন্দ্রের উপাসনা	১৯৬২
২৪শে জানুয়ারী	"	মঙ্গলবাড়ীর উৎসব ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার অবশেষ কার্য্য	১৯৬৬
২৫শে জানুয়ারী	"	আর্য্যনারীসমাজ	১৯৬৭
২৬শে জানুয়ারী	"	Band of Hopeএর উৎসব	১৯৬৭
২৭শে জানুয়ারী	"	'নবনৃত্য'—কমল কুটীরে	১৯৬৭
২৮শে জানুয়ারী	"	প্রাতঃসন্ধ্যা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, মধ্যাহ্নে কমলসরোবরে জলাভিষেক	১৯৬৭
২৯শে ও ৩০শে জানুয়ারী	"	প্রচার-সৈন্য-যাত্রা	১৯৭১
৩১শে জানুয়ারী	"	কমলসরোবরের চারিদিকে নির্জ্জন যোগসাধন, উৎসব-সমাপ্তি	১৯৭১
১৮৮৩, ফেব্রুয়ারি	কলিকাতা	Lord Bishop Johnsonকে কেশবচন্দ্রের পত্র	১৯৭২
...	...	এই পত্রপাঠে রোমাণ ক্যাথলিকগণের রুষ্টভাব	১৯৭৩

ইংরাজী সন	স্থান	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮৮৩, ১৩ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ, ১৮০৫ শক)	কলিকাতা	প্রচারকদিগের পুনর্ম্মিলন জন্য চারিটী ব্রত	১৯৮৬
১৮৮৩, ৮ই ফেব্রুয়ারী	,,	প্রথম পৌত্রের জন্ম	১৯৯১
১৮৮৩, ৯ই ফেব্রুয়ারি	কোচবিহার	দৌহিত্র কোচবিহার রাজকুমারের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন, কেশবচন্দ্র 'রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ' নাম প্রদান করেন	১৯৯১
১৮৮৩, ২৩শে এপ্রিল	কলিকাতা	সপরিবারে কেশবের সিমলায় যাত্রা	১৯৯১
১৮৮৩, ১৩ই মে	সিমলা	ইংরাজীতে New Samhita লিখিতে প্রবৃত্ত হন। অদ্য 'নব-বিধান' পত্রিকায় তাহার প্রথম মুদ্রণ প্রকাশ	১৯৯২
...	কলিকাতা	উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ দ্বারা নব-সংহিতা গ্রন্থের সংস্কৃতে অনুবাদ	১৯৯২
১৮৮৩, ৩১শে মে	সিমলা	সিমলা হইতে ভাই গৌর-গোবিন্দকে কেশবের পত্র	১৯৯২
...	,,	রাজ্যসম্পর্কে — রাজভক্তি সম্বন্ধে কেশবের আদর্শ	১৯৯৩
১৮৮৩, ২৪শে মে	,,	মহারাজ্ঞীর জন্মদিনে কেশবের প্রার্থনা	১৯৯৪
,,	,,	New Dispensation (Extra-ordinary Issue) পত্রে মহা-	

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	ফুটনোট	অগ্রহায়ণ সংখ্যা	শ্রাবণ সংখ্যা
৮	১১	তিরষ্কৃত	তিরস্কৃত
৮	ফুটনোট	১৭৮৭ শকের	১৭৬৮ শকের
		অগ্রহায়ণ সংখ্যা	১লা শ্রাবণ সংখ্যা
৫৮	ফুটনোট	১৭৫৪—১৭৫৫	১৮৫৪—১৮৫৫
১৬৫	২৬	১২ই অগ্রহায়ণ	১৭ই অগ্রহায়ণ
ঐ	ঐ	২২শে নভেম্বর	১লা ডিসেম্বর
৮৪৭	১৬	উপস্হিত	উপস্থিত
৮৫১	১	নিস্ফলতা	নিষ্ফলতা
১০২৩	১০	heaven	Heaven
১০৭৫	পৃষ্ঠাসংখ্যা	১৯৭৫	১০৭৫
১২০৪	২১	২৪শে মাঘ	২৪শে মার্চ্চ
১৬২৮	৬	দায়	যায়
১৬৭৭	২৮	উপাসন	উপাসনা
২১১৩	২৪—২৫	'অনুশীলন' ১ম ভাগে	'অনুশীলন' ১ম ভাগে (পূর্ব্বসংস্করণ)
২১১৮	২১	pp. 93-94,	pp. 93-94, Vol. I.
২১২৯	১২	ধর্ম্মপিতা রাজা রামমোহন রায়	ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায়
২১৩৬	৫	১৮৫১	১৮৬১

সংযোজন

১৭০৮ পৃষ্ঠায় ফুটনোট সংযোজন :—২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১ ইং তারিখে কেশবচন্দ্র ভাগলপুরের নবনির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য করেন।—(ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮০২ শক, ১লা চৈত্র, পৃঃ ৫৯, এবং Sunday Mirror, March, 20, 1881 দ্রষ্টব্য।)

২১১৩ পৃষ্ঠায় ২৬।২৭ পংক্তিস্থিত "ঐ মহাত্মা···ভক্তির যোগ্যপাত্র।" ইহার পরে সংযোজ্য :—

এই কথা 'অনুশীলনের' পরবর্ত্তী সংস্করণে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্করণের যে পাতায় এই কথা আছে, তাহার প্রতিলিপি (Photo-print) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য" গ্রন্থের মধ্যে আছে।